নরেন্দ্রনাথ মিত্র
রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৩

সম্পাদনা :

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রকাশক :

যোগজীবন চক্রবর্তী

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

মুদ্রক :

রচনাবলী-অংশ :

রবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

লিটারেরি প্রেস এণ্ড পাবলিসিটি প্রাইভেট লিমিটেড

১১৩বি, প্রিন্‌সেপ স্ট্রীট, কলকাতা-১৩

সংকলন, পরিশিষ্ট, তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ-পরিচয় :

দুলালচন্দ্র ভূঞ্যা

সুদীপ প্রিন্টার্স

৪/১এ, সনাতন শীল লেন, কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদপট :

রূপায়ণ

কলকাতা-৬

সূচীপত্র

উপন্যাস:

দ্বীপপুঞ্জ ৩

রূপমঞ্জরী ১৬১

অক্ষরে অক্ষরে ২৬১

ছোটগল্প:

অসমতল ৩৪১

নেতা ৩৪৩ চোর ৩৫২ চোরাবালি ৩৬২ লালবাম্মু ৩৭১ মদনভস্ম ৩৮০ রসাভাস ৩৮৮ স্পর্শ ৩৯৭ আবরণ ৪০৩ সত্যাসত্য ৪১০ রূপান্তর ৪১৮ পুনশ্চ ৪২৫ ফেরিওয়ালা ৪৩৬।

হলদে বাড়ি ৪৪৯

যৌথ ৪৫১ শম্বুক ৪৬৩ যযাতি ৪৭১ স্বখাত ৪৮১ রোগ ৪৯২ মহাশ্বেতা ৫০২ কুমারী শুক্লা ৫১১ পুনরুক্তি ৫২১ হলদে বাড়ি ৫৩৯ প্রতিদ্বন্দ্বী ৫৪৮ মালঞ্চ ৫৫৮।

সংকলন:

কবিতা:

মূক ৫৭৭

জোনাকি ৫৭৮

কানে কানে ৫৭৮ প্রিয়া প্রশস্তি ৫৭৯ স্মরণ ৫৮০ বিকাল ৫৮১ বরষা ৫৮২ প্রশ্ন ৫৮৩ আনমনা ৫৮৪ ভাষা ৫৮৫।

গল্প:

মৃত্যু ও জীবন ৫৮৭

জীবন-স্মৃতি:

আত্মকথা ৫৯৫

প্রবন্ধ:

গল্প লেখার গল্প ৬১৫

পরিশিষ্ট:

আমাদের কথা ৬২২

উপন্যাস

দীপপুঞ্জ

সন্তোষকুমার ঘোষ
বন্ধুবরেষু

নোট আর কাঁচা টাকায় ভরতি তবিলের গেঁজেটা সাবধানে কোমরের নীচে গুঁজে সুবল কেবল বারান্দা থেকে উঠানে নেমেছে আর ও-বাড়ির বুড়ো নবদ্বীপ অনুনাসিক স্বরে খেদ করতে করতে এসে উপস্থিত, 'ও বাবা সুবল, তোরা থাকতে এর কি কোন বিচার হবে না? অতবড় সোমত্ত ছেলে, কেবল বসে বসে খাবে আর ঝগড়া করবে?'

সুবল ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিরক্ত মুখে বলল, 'বাজারের যে বেলা হয়ে গেছে জ্যেঠামশাই।'

বুড়ো নবদ্বীপ কিন্তু পথ আগলেই রইল, বলল, 'বাজারে তো বাবা আমিও যাব, তার আগে তুই একবার চল, দেখে আয় কাণ্ডটা।'

বিষয়টা অবশ্য কৌতুকের। নবদ্বীপের ছেলে মুরলী নবদ্বীপকে মানছে না। নবদ্বীপ পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে ধনী, সমাজের একজন মোড়ল। তার দুর্বৃত্ত ছেলে তাকে গ্রাহ্য করছে না। আর এত লোক থাকতে নবদ্বীপ এসেছে সুবলের কাছে, সমাজে আজও যার কোন প্রতিষ্ঠা হয় নি, গঞ্জে খোলা জায়গায় চট পেতে বসে এখনও যাকে হলুদ আর শুকনো লঙ্কা বিক্রি করতে হয়। মনে মনে রীতিমত আত্মপ্রসাদ অনুভব করল সুবল। টাকাই সব নয়, বহু টাকার মালিক হয়েও নবদ্বীপ তার বুদ্ধিকে স্বীকার না করে পারছে না। মঙ্গলা অবশ্য বলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। মেয়েমানুষ, এ-সব জিনিস তার বোঝবার কথা নয়। ঘরের খেয়ে বনের মোষ যারা তাড়ায় তারাই জানে এতে কি উত্তেজনা, কি আত্মগৌরব। খোরাকটা চিরকাল লোকে ঘরেই খায়, কিন্তু বীরত্ব আর পুরুষত্ব দেখাতে হয় বনের মোষ তাড়িয়েই।

ঘরের ভেতর ঘন ঘন চুড়ির শব্দে বিরক্ত হয়ে সুবল নবদ্বীপকে বলল, 'আচ্ছা জ্যেঠামশাই, একটু দাঁড়ান। আমি এলাম বলে।' তারপর ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে গিয়ে সুবল ধমক দিল, 'কি অত চুড়ি বাজাচ্ছিলে কেন?'

মঙ্গলা বলল, 'কি আবার। ওই বুড়োর প্যানপ্যানানি শোনবার জন্যে তুমি বেলা দুপুর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি। বাপ-বেটায় যা করে করুক, সে-কথা তুমি শুনে কি করবে।'

মঙ্গলার এই কর্তৃত্বের ভঙ্গী সুবলের ভারি দুঃসহ লাগে। বউকে যত সে চেপে রাখতে চায়, ততই সে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। লম্বা-চওড়ায় সুবলকে সে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলে যেন তার ধারণা, ক্ষমতায়ও সে ছাড়িয়ে যাবে স্বামীকে!

সুবল ধমকের সুরে বলল, 'কি করব তা কি তোমার কাছে শুনতে হবে?'

মঙ্গলা জবাব দিল, 'আমার কথা যখন না শোন, তখনই তো ঠকো। কি দরকার আমাদের বাপ-বেটার বিবাদের মধ্যে যাবার? তোমার জ্যেঠার ছেলে তো আস্ত একটা গুণ্ডা, যত গুণ্ডা আর বদমাইসের দল তার পিছনে পিছনে ফেরে। যদি রাতে-বেরাতে এক ঘা দিয়ে বসে তখন কি হবে।'

সুবলের পৌরুষে ঘা দিয়ে কথা বলতে বেশ ভালোবাসে মঙ্গলা। আর সুবলের হাত নিশপিশ করতে থাকে, ইচ্ছে হয় দেয় এক ঘা বসিয়ে। কিন্তু সব সময়ে তেমন সুযোগ হয়ে ওঠে না। নবদ্বীপ ঘন ঘন কাসছে। সুবল সাড়া দিয়ে বলে, 'যাচ্ছি জ্যেঠামশায়।'

সুবল বাইরে এলে নবদ্বীপ বলে, 'কি ঠিক করলে বাবা। তোমরা দশজন থাকতে ও এমন অনাচার কদাচার করবে, বুড়ো বাপকে ধরে ধরে মারবে, এর কোন বিচার তোমরা করবে না?'

সুবল মনে মনে গর্ব বোধ করে। এক অসহায় অথর্ব বৃদ্ধ তার কাছে আশ্রয় চাইছে, সুবিচার প্রার্থনা করছে। দুর্বৃত্ত পুত্রের উৎপীড়ন থেকে তাকে রক্ষা করতে হবে। মঙ্গলা তাকে মানতে না চাইলে হবে কি, সমাজে ক্রমেই সম্মান আর প্রতিষ্ঠা বাড়ছে সুবলের। শরিকী ঝগড়া-বিবাদ মেটাতে সালিস হিসেবে বুড়োদের সঙ্গে সুবলেরও ডাক পড়ে আজকাল। সামাজিক দলাদলি, দরবারের বৈঠক, সুবলকে না হলে চলে না; বিয়ে শ্রাদ্ধে লোকজন খাওয়াবার সময় জিনিস-পত্রের অমন ঠিক ঠিক তায়দাদ করতে বুড়োরাও পারে না। চতুর, বুদ্ধিমান হিসেবে ক্রমেই নাম ছড়িয়ে পড়ছে সুবলের। কেবল মঙ্গলাই যেন তা স্বীকার করতে চায় না। না করে, না করল, তাতে কিছু এসে যাবে না সুবলের। আর সবাই তো মানে। এই নবদ্বীপ বা সুবলের চেয়ে লক্ষগুণ যে ধনী, যার জোতজমি আছে, মান-সম্মান প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির যার তুলনা নেই, সেও এসে সুবলের শরণ নিয়েছে, সালিস মেনেছে, বিচার করতে ডাকছে সুবলকে।

নবদ্বীপ বলল, 'চল বাবা, তুই ওর কাছ থেকে স্পষ্ট শুনে যা, ও চায় কি, ওর মতলবটা কি আসলে। ও কি চায় যে ওকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করি? কথাটা তুই ওর কাছ থেকে শুনে যা বাবা।'

সুবল সান্ত্বনার সুরে বলে, 'অত হতাশ হচ্ছেন কেন জ্যেঠামশায়, চিরকাল কি আর মানুষ একরকম থাকে, একদিন না একদিন শোধরাবেই।'

নবদ্বীপ উত্তেজিত হয়ে জবাব দেয়, 'শোধরাবে! শোধরাবে কি আর আমি না মলে? ওর নিজের বয়সই কি কম হল নাকি? চল্লিশের কাছাকাছি গেল না? মেয়ের বয়সই তো হল বার-তের বছর। অত বড় মেয়ের সামনে ও যা সব কেলেঙ্কারি করে, লজ্জায় আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে বাবা।'

নবদ্বীপের বড় টিনের ঘরটা ভেঙে রাজমিস্ত্রীরা পাকা কোঠা তৈরী করছে। বাড়িতে ঢুকে সেই দিকেই আগে চোখ পড়ল সুবলের। এসব দেখলে অবশ্য কারো মনে করা শক্ত যে, নবদ্বীপের চিত্তে একটুও সুখ নেই, আর ছেলের দুর্ব্যবহারে তার মুহুর্মুহু গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু নবদ্বীপ তেমনি সখেদে বলে যেতে থাকে, 'কিছু দণ্ড ছিল, কিছু দেনা ছিলাম রাজমিস্ত্রীদের কাছে আর জন্মে, তাই এসব করবার দুর্বুদ্ধি হয়েছে, নইলে আমি কি বুঝতে পাচ্ছি না, চোখ বোজবার সঙ্গে সঙ্গে একখানা ইটও দালানের থাকবে না, সব ও ওড়াবে। আমি কিন্তু ঠিক করে রেখেছি সুবল, একটা কাণাকড়িও ওকে আমি দিয়ে যাব না। বাড়িঘর বিষয়সম্পত্তি সব আমি কোন সৎকাজে দান করে যাব, পরকালের কাজ হবে তাতে।'

পূবের ভিটেয় আর দক্ষিণের ভিটেয় ছোট ছোট দুখানা টিনের ঘর। যে ঘরটা ভেঙে দালান হচ্ছে তার সমস্ত জিনিস-পত্র এনে এই দু ঘরে ঠাসা হয়েছে। পূবের ঘরই সবচেয়ে বেশী বোঝাই হয়েছে জিনিস-পত্রে। বাকি যে স্থানটুকু আছে দক্ষিণ দিকে সেখানে ছোট একটা তক্তপোশ। নবদ্বীপের জন্য মাদুরটা শুধু এখন পাতা রয়েছে, বিছানাটা সযত্নে একধারে গোটানো। তক্তপোশের নীচে নবদ্বীপের তামাক খাবার সরঞ্জাম। ঘরে ঢুকে নবদ্বীপ নিজেই তামাক সাজতে বসল। সুবলের দিকে তাকিয়ে দক্ষিণের ঘরের দিকে ইশারা করে বলল, 'দেখ গিয়ে ও ঘরে ঈজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বাবুর নভেল পড়া হচ্ছে, আর ওই বয়স্থা মেয়েটার সামনে বউয়ের সঙ্গে এই দিনের বেলায় ফষ্টি-নষ্টি করছে। যত অনাচার কদাচার —দু চোখে যা দেখতে পারিনে তাই। আরে হারামজাদা, বউকে অতই যদি ভালোবাসিস তবে অস্থানে-কুস্থানে গিয়ে এত কেলেঙ্কারি করিস কেন! কেন আমার টাকার এমন সর্বনাশ করিস! বউটাও দিনের পর দিন এমন ভালোমানষি আর ঠ্যাকারেপনা করে যে, দেখে আমার মাথা থেকে পায়ের তলা জ্বলে যায়।

যত বয়স হচ্ছে ততই যেন ওদের ঠ্যাকার বাড়ছে। ইচ্ছে করলে ওই বউ-ই কি ওকে ফেরাতে পারত না, স্বভাব জোর করে বদলাতে পারত না ওর? তোর জ্যেঠিমা মরে বেঁচেছে, আমি বুড়োমানুষ আমি আর কি করব বল, লজ্জা হয়। তোর বউয়ের মতো অমন শক্ত জবরদস্ত মেয়েমানুষ যদি আমার পুতের বউ হত তাহলে কি ছেলে আমার এমন বয়ে যেতে পারতো?'

কথাটা কেমন যেন কানে এসে খট করে বাজল সুবলের। তার স্ত্রী যে বেশ শক্ত মেয়েমানুষ, একথা পাড়ায় আর কারো জানতে বাকি নেই। একথা নিয়ে পাড়ায় বোধ হয় খুব আলোচনাও চলে। সুবলের কেন যেন মনে হয়--- শক্ত আর বুদ্ধিমতী স্ত্রী থাকা সত্যি সত্যি খুব গর্বের কথা নয়। স্ত্রীর প্রশংসার মধ্যে যেন স্বামীরই নিন্দা প্রচ্ছন্ন থাকে। সুবলের মনে ভয় হয় মাঝে মাঝে, তার সম্বন্ধে লোকে কি মনে করে? তারা কি সন্দেহ করে যে সুবলের বুদ্ধি মঙ্গলার কাছ থেকেই ধার করা? স্ত্রীর সুখ্যাতি যে বোকার মতো কেন মানুষ কামনা করে, সুবল তা বুঝে উঠতে পারে না। স্বামীর গৌরবে স্ত্রীর গৌরব বটে, কিন্তু স্ত্রীর গৌরবে স্বামীর গৌরব বাড়ে না। মঙ্গলার খ্যাতির কথা শুনে ভয় হয় সুবলের, ঈর্ষায় মুখ তার কালো হয়ে যায়। এর চেয়ে একজন রোগাটে আর বোকা স্ত্রী যদি থাকত সুবলের তাহলে যেন সে বেশি সুখী হত, সমাজের কাছে আরও মান থাকত তার।

নবদ্বীপ এতক্ষণ অনন্যচিত্তে হুঁকো টানছিল তামাকটা ভালো করে ধরিয়ে নেওয়ার জন্য। আগুনটা কলকের ওপর দপ করে জ্বলে উঠতেই আস্তে আস্তে কয়েকটা টান দিয়ে হুঁকোটা নবদ্বীপ সুবলের দিকে বাড়িয়ে দিল, 'রেখে দে সুবল।'

সুবল বারান্দায় হুঁকো রাখতে চলে গেল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুবল হুঁকো টানছে—ও-ঘরের জানালা দিয়ে দৃশ্যটা চোখে পড়তেই মুরলী সোল্লাসে বলে উঠল, 'আরে সুবলদা যে! কি ছাই বাজে তামাক টানছ বসে বসে, ভালো সিগারেট আছে, এস এখানে এস।'

থামে হুঁকোটা ঠেস দিয়ে রেখে সুবল যেতে যেতে বলল, 'আসছি।'

মুরলী বাড়িতেও বেশ সেজেগুজেই থাকে। পরিষ্কার মিহি একখানা ধুতি তার পরনে, দামী টুইলের হাফ-সার্ট গায়ে, দেখে মনে হয় এইমাত্র তার ইস্ত্রি ভেঙেছে। দাড়ির অঙ্কুরও দেখা যায় না তার মুখে। নিজে প্রত্যেক দিন সে ক্ষৌরি হয়, তারপর দামী স্নো মাখে। দেখে মনে হয়—সব সময়েই শরীরকে সে প্রসাধনের

ওপর রেখেছে। একেবারে কলকাতার ফিট্‌বাবু। এত পরিষ্কার জামা-কাপড় বাইরে বেরুবার সময়ও জোটে না সুবলের। শুধু সুবলের কেন, পাড়ার আর কারই বা জোটে !

সুবল ঘরে ঢুকতেই মুরলী একটা চেয়ার এগিয়ে দিল সুবলকে, 'এস এস সুবলদা।'

নিজের অপরিচ্ছন্নতায় সুবল অস্বস্তি বোধ না করে পারছে না। মুরলীর কাছে আসতে না আসতেই যেন ছোট হয়ে গেছে সুবল। আর যাই হোক, কলকাতায় ঘোরাঘুরি করে বড়লোকি চালটা বেশ শিখেছে। চিটেগুড়ের হাঁড়ি বয়ে বয়ে নবদ্বীপের মাথায় টাক পড়ে গেছে বলে মুরলী যে লম্বা লম্বা চুল পিছনের দিকে উল্টিয়ে রাখবে না, তার কি মানে আছে। সুবলের মনে হল, মুরলীর এই বিলাসিতায় নবদ্বীপেরও যেন গোপন প্রশ্রয় আছে, না হলে নবদ্বীপের নিজের রোজগারেরই তো সব টাকা, মুরলী তো এক পয়সাও আয় করে না, বাপের কারবার আজও তো সে মন দিয়ে দেখে না, তবু কেন নবদ্বীপ তাকে এমন করে টাকা নষ্ট করতে দিচ্ছে ! কষ্ট হয়ত নবদ্বীপ পায় টাকাগুলির এমন অপব্যয় হওয়ার জন্য, কিন্তু এক ধরনের আনন্দও হয়ত অনুভব করে নবদ্বীপ। বুড়ো বয়সে দশজনের সামনে বাবুগিরি করতে নিজে তো আর নবদ্বীপ পারে না ; কিন্তু মুরলীর পারতে কোন বাধা নেই। আর ইচ্ছে করলেই অমন করে চুল ওল্টাবার সাধ্য নেই টেকো নবদ্বীপের ; ছেলের কালো সুচিক্কণ চুলের জন্য অন্যের কাছে বোধ হয় গর্বই বোধ করে নবদ্বীপ, বাইরে লোকের কাছে যত বিরক্তিই সে দেখাক না কেন।

জিনিস-পত্র এ-ঘরে অপেক্ষাকৃত কম। এরই মধ্যে নিজের পছন্দমত ঘরখানাকে সাজিয়েছে মুরলী। থামে থামে নানা রকমের ফটো। কোনটাই ঠাকুর-দেবতার নয় এবং কোন কোনটার দিকে একেবারেই তাকানো যায় না। অবশ্য না তাকিয়ে যে পারা যায় তাও নয়। মুরলীর বিলাসিতা আর আড়ম্বরে নিজেকে ভারি দীন মনে হতে থাকে সুবলের। এমন লোককে কি করে বলা যায়, যাও দোকানে গিয়ে বসো, ঘাঁটো গিয়ে তামাকের পাতা ! এমন সাজ-সজ্জাওয়ালা বড়লোকের সামনে ও-কথা উচ্চারণ করতেই তো মুখে বেধে যায় ! অর্থই সব। মুরলীর মতো অর্থবান হতে না পারলে এবং চেহারায় বাড়ি-ঘরে আচার-ব্যবহারে অর্থের চাকচিক্য অমন করে ফোটাতে না পারলে মুরলীকে সে একটা কথাও বলতে পারবে না, যতই সে স্পষ্ট-বক্তা হোক, বুদ্ধিমান সালিস হিসাবে যতই তার নাম থাক পাড়ায়।

মুরলী সবুজ সেলুলয়েডের কেস থেকে সিগারেট বার করে বলে, 'ধরাও সুবদলা,

তারপর ব্যাপার কি। বুড়ো বুঝি সাত সকালে সালিসীর জন্তে টেনে এনেছে তোমাকে?'

সুবল বলে, 'সালিসী আবার কি, দোকান-পসার এখনো যদি বুঝে না নাও তবে আর নেবে কবে? বুড়োমানুষ কষ্টও তো হয়।'

মুরলী বলল, 'কষ্ট না ঘোড়ার ডিম। কষ্ট বুড়োর বাজারে একদিন না গেলেই বরং বেশি হয়, পেটের ভাত হজম হতে চায় না। আমার কথা বলো না, আমি গেলেও জ্বালা, না গেলেও জ্বালা। না গেলে বলবে, বসে বসে খাচ্ছিস। গেলে একটা সময়ও চোখের আড়ালে যাবে না, কেবলি সন্দেহ করবে টাকা সরাচ্ছি, সিন্দুক উপুড় করে ঢালছি ষাঁড়ের পায়ে। তার চেয়ে এই বেশ আছি। দিব্যি খাই দাই ঘুমোই, তাস-পাশা খেলি, চমৎকার সময় কাটে। এমন আরামের কথা তোমরা কেউ ভাবতেও পারো না।'

আরাম! সুবল ঘৃণা করে এই জীবনকে। অলস অকর্মণ্য ভাবে কেবল বাপের পয়সায় বসে বসে খাওয়া সুবল দু চোখে দেখতে পারে না। লোকেও তো ভালো বলে না মুরলীকে। আড়ালে সবাই তো নিন্দা করে। বলে, বাঘের পেটে বাগডাসা। কিন্তু শুকনো লঙ্কার বস্তা মাথায় নিয়ে দুপুর রাত্রে দু মাইল দূরের কুমারগঞ্জের বাজার থেকে ফিরে আসতে আসতে অনেকদিন মুরলীর উপর সুবলের ঘৃণার চেয়ে হিংসাই বেশি হয়, সাধ যায় বাগডাসা হতে।

মুরলী আবার বলে, 'যাও কাজে যাও সুবলদা, ও বুড়োর কথায় কান দিয়ে লাভ নেই।'

সুবলের কোন তিরস্কার উপদেশ ব্যঙ্গ বক্রোক্তি যেন গায়ে মাখবে না মুরলী। তার হাসি, এই ধরনের ঠাণ্ডা মেজাজ সবচেয়ে দুঃসহ লাগে সুবলের। এর চেয়ে যদি চটে উঠত মুরলী, যদি গরম হয়ে তর্ক-বিতর্ক করত, তা হলেও সুবলের যেন মান থাকত; কিন্তু মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে মুরলী যেন এই কথাই প্রমাণ করে দিল যে সুবলের সমালোচনায় কিছুই যায় আসে না তার। সুবলের হস্তক্ষেপ এতই ছেলেমানুষের মতো যে তাতে মুরলীর কান না দিলেও চলে। মুরলীর এই নীরব অবজ্ঞার সামনে নিজেকে সুবলের নিতান্তই অসহায় মনে হতে থাকে। অথচ সুবলের চেয়ে অন্তত তিন-চার বছরের ছোট হবে মুরলী। ছেলেবেলা থেকেই সে তাকে দেখে এসেছে। তবু কেন যে তার মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলতে পারে না সুবল, কেন যে তার তাচ্ছিল্য এমন নিঃশব্দে সে হজম করে যায় তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। নিজের এই দুর্বল ভীরুতার জন্ত নিজের ওপর রাগের

তার অবধি থাকে না। অথচ সুবল সত্যি সত্যি আজকাল আর একটা হেলনা ফেলনা নয়। পাড়ার একজন সে অন্যতম মাতব্বর। দক্ষিণ পাড়ায় বামুন কায়েতরা পর্যন্ত কোন কোন বিষয়ে আজকাল মাঝে মাঝে তার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে। সেই সুবল কিনা মুরলীর মতো লুচ্চা আর চালিয়াৎকে ভয় করে চলে, মুখের ওপর কড়া ধমক দিতে পারে না, কেমন যেন থতমত খেয়ে ঘাবড়ে যায়। নিজের ওপরেই দারুণ রাগ হয় সুবলের।

'চল সুবল, বেলা অনেক হয়ে গেছে', নবদ্বীপ তার ময়লা ফতুয়াটা গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

কাপড়ের নিচে লোহার চেনে ঝোলানো বড় বড় কয়েকটা চাবি ঝন ঝন করে উঠল। হাঁটবার সময়ও এই চাবির শব্দ শোনা যায়। নবদ্বীপ তাকে সত্যিই বাঁচিয়েছে। কুটিল হোক, ধূর্ত হোক এই নবদ্বীপকে সুবল বুঝতে পারে। এর সঙ্গে বেশ মিশতেও পারে সুবল। বয়সের ব্যবধানে কিছু যায় আসে না। নবদ্বীপের সঙ্গে তার কারবার-পত্র ব্যাবসা-বাণিজ্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলে, তার সঙ্গে সমান তালে চলতে সুবলের মোটেই অসুবিধা হয় না। কিন্তু তার ছেলে মুরলীর সঙ্গে কিছুতেই যেন পেরে ওঠে না সুবল। সে তার কয়েক পাতার ইংরেজী বিদ্যা আর ধোপদুরস্ত জামাকাপড় নিয়ে যখন তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকায় তখন চিত্ত জ্বলে যেতে থাকে সুবলের, তবু মুখ দিয়ে কোন প্রতিবাদের ভাষা বেরোয় না।

নবদ্বীপের বাড়ির উত্তর দিকে বিঘা দেড়েক জমিতে ছোট একটু সুপারি আর নারিকেলের বাগান। ভিটাটুকু নাকি ছিল নবদ্বীপের খুড়ো বৃন্দাবনের ; তার মৃত্যুর পর নানা ফন্দি ফিকির খাটিয়ে নবদ্বীপ জায়গাটুকুকে হাত করেছে। বৃন্দাবনের বিধবা স্ত্রী বহু চেষ্টা করেও তা উদ্ধার করতে না পেরে মনের দুঃখে কোন এক বৈরাগীর কাছে গিয়ে ভেখ নিয়েছিল। সে অনেক দিনের কথা। তারপর নবদ্বীপের নিজের হাতে রোয়া নারকেল গাছগুলি এত বড় বড় হয়েছে যে সে-সব গাছে উঠতে সবাই সাহস করে না সব সময়। এই বাগানের ভেতর দিয়েই বাড়ি থেকে বেরুবার পথ। তারপরই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা শুরু হয়েছে। সুবলকে সঙ্গে নিয়ে বাগানের ভিতর ঢুকে চার দিকে একবার সন্তর্পণে তাকিয়ে নবদ্বীপ ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর, বললে কি নবাব ?'

নবদ্বীপের এই ভঙ্গী দেখে সমস্ত শরীর জ্বলে গেল সুবলের। সুবল যে কিছুই বলতে পারে নি, নবাবকে শাসনের জন্য একটি আঙুলও যে তুলতে পারে নি,

নবদ্বীপ তা বুঝতে পেরেছে। এ সম্বন্ধে কোন সংশয়ই নেই সুবলের। তবু নবদ্বীপ এমন ভান করছে কেন? সুবলের মনে হল নবদ্বীপ নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছে আর বলছে—কি, খুব তো চোটপাট করে এসেছিলি, এখন কি হল! একটা কথাও কি বলতে পারলি আমার ছেলেকে? নবদ্বীপকে যে তার ছেলে মানে না, অপমান করে, সে কথা যেন ভুলেই গেছে নবদ্বীপ। হবু মোড়ল সুবলকে যে কোন কথাটি না বলে নাকাল হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে এতেই যেন নবদ্বীপের আনন্দ। সুবলের মনে হল এই যে সন্তর্পণে নবদ্বীপের ফিসফিসানি এ যেন সুবলকেই ব্যঙ্গ করা, সুবলের ব্যর্থ মাতব্বরীকেই মুখ ভেংচানো।

নবদ্বীপের সুপারির বাগান ছাড়ালেই ডিষ্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা। এই রাস্তা সোজা চলে গেছে উত্তরে কুমারগঞ্জের বাজারে। পাড়ার অন্যান্য ব্যবসায়ীরা অনেক দুরে এগিয়ে গেছে। নবদ্বীপরা রাস্তায় পড়তে না পড়তেই দলটা একটা বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুবল বলল, 'দেখছেন কত বেলা হয়ে গেছে? আজ একেবারে সকলের পেছনে পড়েছি আমরা। একটু জোর পায়ে হেঁটে চলুন জ্যেঠামশাই।'

নবদ্বীপ একটু হাসল, বলল, 'তোর কি বাপু, তুই তো বলেই খালাস। এই বয়সে এখনো যে হেঁটে চলে বেড়াতে পারছি এই তো তোদের ভাগ্যি। একবার বয়েসটা আমার মতো হোক তখন দেখব কত জোরে চালাতে পারিস পা।'

নিজের বয়সকে নবদ্বীপ আজকাল দু-এক বছর বরং বাড়িয়েই বলে; বার্ধক্যের ভঙ্গীকে বাড়িয়ে দেখায় তার চেয়েও বেশী। অথচ এমন এক সময় ছিল যখন লোকের কাছে নিজের বয়সকে আসল বয়সের চেয়ে দু-তিন বছর কম বলে প্রমাণ করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না নবদ্বীপের। কিন্তু এখন, বয়স যখন বেড়েই গেছে, বার্ধক্যের চিহ্ন যখন দেখা দিয়েছে সর্বাঙ্গে, তখন বয়সকে স্বীকার করাই ভালো। বয়সের কথা উল্লেখ করে যখন যা পাওয়া যায়—কোথাও বা শ্রদ্ধা, কোথাও বা অনুকম্পা, আজকাল আদায় করতে চায় নবদ্বীপ।

খানিকটা পথ এগোতেই ভ্রূকুঞ্চিত করে নবদ্বীপ একটু থমকে দাঁড়াল। সুবল বিরক্ত হয়ে বলল, 'আবার কি হল জ্যেঠামশাই।'

নবদ্বীপ বলল, 'দেখতো সুবল, কে আসছে, আমাদের বিনোদ না?'

সুবল বলল, 'তা ছাড়া আবার কে। দেখছেন না, মাথায় রঙীন চাদর জড়ানো, কাঁধে খোল, গলার ফুলের মালাটাও ভুলে ফেলে আসে নি। পেছনে আবার বোধ হয় একটা সাকরেদও জুটিয়ে এনেছে। এদিকে উনুনে তো হাঁড়ি চড়ে না।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিনোদের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সুবল আর নবদ্বীপের।

'ভালো আছেন রাঙা কাকা? ভালো তো সব পাড়ার?' বিনোদ সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল নবদ্বীপকে।

নবদ্বীপ হেসে ঘাড় নাড়ল।

কিন্তু বিনোদের ধরণধারণে রীতিমত রাগ হয় সুবলের। পাঁচ-সাত দিন বিনোদ গ্রামে ছিল না। জেলা শহরের কাছাকাছি গোঁসাইগঞ্জে গিয়েছিল কীর্তন গাইতে। মাঝে মাঝে এমন প্রায়ই সে যায় এখানে ওখানে। কিন্তু ফিরে এসে এমন ভাব দেখায়, যেন সে বহুদূরে বহুকাল বাস করে দেশে ফিরেছে। এমন দূর থেকে ওপর ওপর ভাবে কথা বলে বিনোদ, যেন সে এদের একজন নয়। খুব বড় রকমের চাকরি-বাকরি করে, খুব যেন একটা সম্মানী লোক। অন্য সকলের মতো সে যেন একজন সাধারণ মানুষ নয় পাড়ার। ওর ভাবভঙ্গী দেখে হাসিও পায়, আবার রাগও হয় সুবলের। না হয় গলায় একটু মেয়েলি মিষ্টত্বই আছে, কিন্তু তাই বলে কি সব সময়েই 'সখী ধর ধর' ভাবে থাকতে হবে!

বিনোদ বলে, 'আচ্ছা আমরা ভাই এগোই সুবল। তুমি তো যাচ্ছ দোকানে। সন্ধ্যের দিকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এস কিন্তু।'

সুবল জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

বিনোদ সলজ্জ হেসে বলে, 'এই একটু আসরের মতো বসাবার ইচ্ছে আছে। এই যে আমার সঙ্গের লোকটিকে দেখছ, এমন চুপচাপ ভালোমানুষের মতো থাকলে হবে কি, একটি খাঁটি জহরত। হাত ভারি মিঠে। জোর করে ধরে নিয়ে এসেছি, আসতে কি চায়।'

লোকটি লজ্জায় বিনয়ে একেবারে ভেঙ্গে পড়বার মতো হয়ে বলল, 'না না ওসব কিছু বিশ্বাস করবেন না দাদা, ভারি বাড়িয়ে বলার অভ্যেস বিনোদদার।'

বিনোদ বলল, 'সত্যিই বাড়িয়ে বলছি কিনা সন্ধ্যের সময়েই তার পরিচয় পাবে। একটু সকাল সকাল এস সুবল, আসবেন কিন্তু রাঙা কাকা।'

নবদ্বীপ বলল, 'আচ্ছা বাবা আচ্ছা।'

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে নবদ্বীপ বলল, 'ছেলেটি কিন্তু বেশ, কথাবার্তায় ভারি বিনয়ী। আর কী মিষ্টি স্বভাব। আমার বেশ লাগে। ওর বাবাও ছিল অমনি। বয়সে বড় হলে কি হবে, আমার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে সাহস করত না। বিনোদও হয়েছে ঠিক তেমনি। একটু সকাল সকালই ফেরা যাবে বরং, কি

বল সুবল? অনেক দিন বাদে একটু নামগান শোনাবার ইচ্ছে হচ্ছে।'

সুবল কোন জবাব দিন না। ইদানীং নবদ্বীপের ধর্মে-কর্মে বড় মতি দেখা যাচ্ছে। সাত খোপ কবুতর খেয়ে তপস্বী সেজেছে বেড়ালরাজ।

ঘরে বিনোদ যখনই ফিরে আসে তখনই খানিকটা মাতামাতি না করে ছাড়ে না। সুবলের মনে হয় এটা ওর নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা। পাড়ায় খোল বাজাতে, গান গাইতে সবাই কিছু না কিছু পারে। তার মধ্যে বিনোদের না হয় গলাটা একটু বেশি মিষ্টি, হাতটা একটু পরিষ্কার, কিন্তু তাই বলে সেটা কি এমন-ভাবে যখন তখন ঢাক পিটিয়ে বলে না বেড়ালে নয়? শুধু মিঠে হাত আর গলার জন্যই নয়, মিষ্টি স্বভাবের জন্যও বেশ খ্যাতি আছে বিনোদের। সে যে সচ্চরিত্র ভালোমানুষ একথা সবাই বলে। ও বাড়ির বিষ্টু খুড়ো বিনোদের প্রশংসায় সব চেয়ে উচ্ছ্বসিত। পূর্বজন্মের সাধনা আর সুকৃতি না থাকলে নাকি এমন গুণী হওয়া যায় না। আর এ সব গান বাজনা উঁচুদরের জিনিষ। উঁচু মন, সৎস্বভাব, ভগবদ্ভক্তি এ সব না থাকলে অমন নাকি হতে পারে না কেউ। ভেতরে ভেতরে সত্যিই নাকি একজন বড় রকমের সাধক এই বিনোদ। সুবল লক্ষ্য করেছে, বিনোদকে ছেলেবেলা থেকে সবাই যখন সাধু আর ভালোমানুষ বলত তখন খুব যে একটা ভয় আর শ্রদ্ধা করত বিনোদকে তা নয়। বরং খানিকটা ঠাট্টা, খানিকটা অনুকম্পার ভাবই মেশানো থাকত এই সব বিশেষণের মধ্যে। এমন কি বিনোদ নিজেই তাতে চটে উঠত অনেক সময়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সবই এখন সরে গেছে বিনোদের। এখন এসব তার প্রশংসা বলেই সে ভাবে। এবং নিতান্ত মিথ্যা ভাবে না। শুধু ঠাট্টাই নয়, আজকাল লোকে তাকে খানিকটা ভক্তি-শ্রদ্ধাও করে। সজ্জন সচ্চরিত্র বলতে বিশেষভাবে আজকাল বিনোদকেই বোঝায়। পাড়ার ফচকে ছোঁড়ারা তাকে দেখলে একটু সঙ্কুচিত হয়, এমন কি মুরলী পর্যন্ত বিনোদের সামনে কথাবার্তায় বেশ সংযত হয়ে ওঠে।

সুবল ভেবে পায় না, পাড়ার সবাই বিনোদের প্রশংসায় সত্যিই এমন পঞ্চমুখ কেন? বিনোদের সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, তার বিষয়বুদ্ধির অভাবটাও কি তার গুণ, ভালো-মানুষির পরিচয়? সংসারে বোকা, কি উদ্ভট পাগলাটে গোছের কিছু একটা না হলে কি ভালোমানুষ হওয়া যায় না? না হলে, বিনোদের স্বভাব চরিত্রের প্রশংসাই বিশেষভাবে এমন করে কেন করে লোকে? পাড়ায় আরো তো পাঁচজন আছে যারা চোরও নয়, বদমায়েসও নয়, কিন্তু তারা যেন লোকের চোখেই পড়ে না। বৈষয়িক বুদ্ধি যদি সুবলের মন্দই হয় তা হলে যখন তখন সুবলের আত্ত-ভাক্ত

পড়ে কেন? কেন মামলা-মোকদ্দমা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে লোকে সুবলের কাছে পরামর্শ করতে আসে? বিনোদের কাছে গেলেই পারে! কিন্তু প্রয়োজনের সময় সুবলকে না হলে লোকের চলে না, আর প্রয়োজনটা ফুরিয়ে গেলেই সেটা খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। তখন বিনোদের খোলের মিঠে আওয়াজ শুনতে লোকের মন আকুলি-বিকুলি করতে থাকে।

বৈষয়িকতায়, কূটবুদ্ধিতে সুবল দ্বিতীয় নবদ্বীপ সা হয়ে উঠেছে এমন একটা ধারণা যে লোকের মনে আছে তা সুবলের টের পেতে বাকি নেই। কিন্তু সংসারে ঠকে যাওয়াই যদি ভালোমানুষ আর মহত্তের লক্ষণ হয়, তাহলে সবাই ঠকতে এত ভয় পায় কেন? ওরা যখন বিনোদের সম্বন্ধে এমন মুগ্ধভাবে প্রশংসা করে, তখন সুবল বলে একটি লোক আছে, যার খোলে তেমন মিঠে হাত নেই, কিন্তু বিষয়বুদ্ধিতে পরিষ্কার মাথা, যা তাদের বিপদে-আপদে রক্ষা করে—একথা লোকের যেন খেয়ালই থাকে না। সুবলের কাছে যে তারা কত রকমের কত উপকার পায় সে-কথা সবাই যেন তারা ভুলে যেতে চায়। বিনোদের তুলনায় সুবল যেন একেবারেই তখন অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে তাদের কাছে।

কিছু দূর থেকে কুমারগঞ্জের বাজারের অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা যায়। দূর থেকে অবশ্য হট্টগোলকে গুঞ্জনের মতোই মনে হয়। কাছে গেলেই বোঝা যায় তা গুঞ্জন নয়। মাছের বাজারটা সব চাইতে আগে হওয়ায় গোলমালটা আরও বেশি করে কানে আসে। বাজারে ঢুকেই নবদ্বীপ আর সুবল দুটো আলাদা গলি দিয়ে যে যার দোকানের দিকে চলে যায়। পরস্পরের কাছে মৌখিকভাবে বিদায় নেবার প্রয়োজনও তারা বোধ করে না।

২

পুরোনো বাড়ির বড় পুকুরটার থাকার মধ্যে এখন শুধু পৌরাণিক কিংবদন্তীই আছে। বর্ষার সময় ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় জল খুব সামান্যই থাকে। আর জলের চেয়ে বেশি থাকে বড় বড় পানা। তাছাড়া মেয়েদের ব্যবহারের উপযোগিতাও আর এ পুকুরে নেই। বসতি সরে গেছে পশ্চিমের দিকে। পূবের দিকটা আজকাল একেবারেই ফাঁকা দেখায়। পূব পারে গদাই সা-র বাড়ি তবু খানিকটা আব্রুর কাজ করত। কিন্তু ক বছর হল শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে সেও উঠে গেছে এখান থেকে; যাওয়ার সময় ঘরখানা পর্যন্ত ভেঙে নিয়ে গেছে। শোনা যায়,

Uttarpara Jaikrishna Public

আগেই ও-পাড়ার হরেন বোসের নামে ভিটেটা সে কওলা করে দিয়ে টাকা নিয়ে রেখেছিল এখন পুকুর ঘাট থেকে সোজসুজি একেবারে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নতুন রাস্তা চোখে পড়ে, আর তারপর দেখা যায় মাঠ।

পুকুরটা পাড়ার মধ্যে সুবলের স্ত্রী মঙ্গলারই বেশি কাজে লাগে। ময়লা কাপড়-চোপড় কাচবার জন্য পনর-কুড়িখানা বাড়ি ডিঙিয়ে তাকে আর খালের ঘাটে যেতে হয় না। অনেকদিন এই পুকুরে সে কোন রকমে স্নানটাও সেরে নেয়। মঙ্গলার এই সুবিধার জন্য আজকাল অনেকেরই চোখ টাটায়। তার দেখাদেখি বনবাদাড় বাঁশঝাড় ভেঙে নিধিরাম সা-র বাড়ির বউরাও ইদানীং এ পুকুরে আসতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু যেটুকু জল আজকাল এ পুকুরে থাকে তা বলতে গেলে মঙ্গলার জন্যই। শুকনোর সময় মঙ্গলা ঘরদোর নিকাবার জন্য এই পুকুর থেকে ঝাঁকা ভরে মাটি কেটে নেয়। সেই সব গর্তের মধ্যেই জল এক-আধটু থাকে। কিন্তু এই মাটি নেওয়ার জন্যও কি কম ঝগড়া করতে হয় পুরনো বাড়ির সোনাখুড়ির সঙ্গে! সোনাখুড়ির চাইতে তার মেয়ে আলতা হয়েছে আরও এক কাঠি বাড়া। পুরনো বাড়িতে এখন এই মা আর মেয়েই আছে, আর তাদের সম্পত্তির মধ্যে আছে এই পুকুর। পুকুরে অংশ আছে সুবলেরও, অথচ সোনাখুড়ি আর আলতার ভাবভঙ্গিতে মনে হয় পুকুরটা যেন একা তাদেরই। বহুদিন মঙ্গলা সুবলকে বলেছে —এ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে। এত মামলা-মোকদ্দমা বোঝে সুবল, এতজনকে এত পরামর্শ দেয়, এটুকু কি আর পারে না; কিন্তু সুবলের যেন জেদ আছে একটা—মঙ্গলা যা বলবে তা সে কিছুতেই শুনবে না।

এক ঝুড়ি ক্ষারে দেওয়া কতকগুলি কাপড়-চোপড় কাঁধে নিয়ে কাচবার জন্য বড় পুকুরে এসেছিল মঙ্গলা। নোংরামি তার সহ্য হয় না। ঘরদোর তার নিকানো, ঝকঝকে তকতকে থাকে সবসময়, আসবাবপত্রও থাকে বেশ মাজাঘষা সাজানো গোছানো। সুবলের স্বভাবই বরং নোংরা। এ সম্বন্ধে কিছু বললে সুবল জবাব দেয়, অমন ফিটফাট পটের বিবি সব সময় সেজে থাকা মেয়েমানুষদেরই পোষায়, পুরুষদের চলে না। সেই সব পুরুষদের চলে যারা মেয়েমানুষ ঘেঁষা—যারা প্রায় মেয়েমানুষেরই সামিল।

পটের বিবি কথাটার মধ্যে একটু খোঁচা আছে। মঙ্গলার যে আজও কোন ছেলেমেয়ে হল না সেই খোঁচা।

ছেলেমেয়ে না থাকার জন্য ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ যে না আছে মঙ্গলার তা নয়। একসময় তাবিজ কবচ যে যা দিয়েছে তাই সে ব্যবহার করেছে, কিন্তু

কিছুতেই যখন কিছু হল না তখন সেসব দূর করে ছুঁড়ে ফেলতেও তার দ্বিধা হয় নি। পাড়াপড়শীরা বলেছে, মেয়েমানুষের কি অমন অধীর হলে চলে? কিন্তু মঙ্গলার স্বভাব ভারি একগুঁয়ে, তাছাড়া পরোক্ষে অহঙ্কারী দেমাকী বলে যে যেমন সমালোচনাই করুক, সামনে তার রাশভারিত্ব সবাই স্বীকার করে। সন্তান-হীনতার জন্য কারো কাছে দুঃখ জানাতে যায় না মঙ্গলা। তবু যেচে কেউ যদি সমবেদনা জানাতে আসে মঙ্গলার কাছে, সে মোটেই আমল পায় না। এই জিনিষটাই পাড়ার অনেকের সহ্য হয় না। ছেলেমেয়ে না থাকে থাক, কিন্তু তার জন্য হায়-আপসোসও থাকবে না—এ কেমন মেয়েমানুষ! একদিন নিধিরাম সা-র মেজ মেয়ে সুশীলা এসেছিল, সঙ্গে ছিল তিনটি ছেলেমেয়ে। তাদের হুড়োহুড়ি দাপাদাপিতে মঙ্গলা রীতিমত অস্বস্তি বোধ করেছিল। এমন দুরন্ত আর চঞ্চল আজকালকার ছেলেমেয়ে, ক মিনিটের মধ্যেই মঙ্গলার ঘরের জিনিষ-পত্র একেবারে তছনছ করে ফেলল। মুখে হাসি টেনেই মঙ্গলা বলেছিল, 'এত ঝক্কি পোয়াও কি করে ভাই চব্বিশ ঘণ্টা? আমি হলে তো অস্থির হয়ে যেতাম।'

কিন্তু সুশীলা চালাক মেয়ে, মঙ্গলার মনের ভাব বুঝতে তার দেরি হয় নি। বড় ছেলেটাকে একটা চড়, ছোট ছেলেটাকে একটা ঠোনা মেরে শাসন করে গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'অস্থির তুমি এখনই হয়ে উঠেছ বৌদি, আর ঝক্কির কথা বলছ—ঝক্কি মনে করলেই ঝক্কি। ভগবান মানুষকে মন বুঝেই ধন দেন কিনা।'

ঘাটে পৈঠার বালাই নেই। খেজুর গাছের একটা খণ্ড লম্বালম্বি ভাবে জল পর্যন্ত ফেলে দেওয়া হয়েছে। আলতার সাহায্যে মঙ্গলা নিজেই কিছুদিন আগে এটাকে ধরাধরি করে এনে এভাবে পৈঠার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। নানা কারণে আলতাদের সঙ্গে এজমালি ঘাটই রাখতে হয়েছে মঙ্গলাকে। পুকুরের উত্তর আর পশ্চিম দিকের পাড় অপেক্ষাকৃত খাড়াই আছে, কিন্তু তা এমন কাঁটা-জঙ্গলে ভরতি যে ব্যবহার করা চলে না। পুব আর দক্ষিণ দিকের পাড় দুটো ধ্বসে ধ্বসে প্রায় একেবারে সমতল হয়ে গিয়েছে। আলতা আর মঙ্গলা দুজনেই এই দক্ষিণ দিকের ঘাটেই আসে। ক্ষারে দেওয়া কাপড়-চোপড় নিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ রাস্তার দিকে খোলের ঠুং ঠাং আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঘাড় ফেরায় মঙ্গলা। বিনোদ যাচ্ছে খোল কাঁধে করে আর তার পিছনে পিছনে যাচ্ছে কোথাকার কে একজন বিদেশী লোক। মঙ্গলার মনে হল—ওরাও যেন এদিকে একবার চেয়ে এইমাত্র চোখ ফিরিয়ে নিল। তাড়াতাড়ি ঘোমটাটা আরও খানিকটা টেনে দিল মঙ্গলা।

'এত লজ্জার বহর কাকে দেখে বৌদি?'

পিছনে ফিরে মঙ্গলা দেখল একখানা এঁটো থালা হাতে নিয়ে আলতাও এসে দাঁড়িয়েছে।

মঙ্গলা একটু যেন থতমত খেয়ে গেল, 'কাকে দেখে আবার!'

আলতা একটু হাসল, 'বল কি! অতবড় ঘোমটাটা কি তাহলে মিছেমিছিই টানলে।'

মঙ্গলা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। বলল, 'একেবারে মিছেমিছিই বা হবে কেন। ভেবেছিলাম—কালো বদন আর হেরব না।'

আলতার নামের সঙ্গে আলতার রঙের মিল নেই। তার ঠাকুরদা মাধব সা বোধ হয় ঠাট্টা করেই এই নামটা রেখেছিল, কিংবা আঁতুড় ঘরে প্রথম দিন নাতনির গায়ের রং লাল দেখে তার মনে হয়েছিল, আলতার মতো লাল টুকটুকেই হবে মেয়ের রঙ। কিন্তু বয়স যত বাড়তে লাগল, আলতার বদলে আলকাতরার রঙই ফুটে বেরুতে লাগল তার গায়ে। সমস্ত পাড়ায় এমন কালো আর কুশ্রী মেয়ে দুটি নেই। চোখ মুখ যাই হোক— সারা পাড়ায় মেয়ে পুরুষ প্রায় সবার রঙই ফর্সা, কিন্তু আলতা এদের মধ্যে একটা বড় রকমের ব্যতিক্রম। শুধু রঙই নয়, শরীরের গড়নটাও আলতার অসুন্দর। যেমন মোটা, তেমনি বেঁটে। বয়স বাইশ-তেইশের বেশি নয়। কিন্তু দেখলে মনে হয়, তিরিশের ঘরে। পুরুষালি চেহারা, পুরুষালি গলা। তবু কালো কুৎসিত বললে আজকাল আলতার মুখ অত্যন্ত করুণ হয়ে ওঠে, আজকাল ও-কথাটাকে সে সহজভাবে নিতে পারে না। কিন্তু সে যে সুন্দর নয়—একথা বোঝবার বয়স তার বহু আগেই হয়েছে। তবু কথাটা বলে ফেলে মঙ্গলা বেশ একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। ঝগড়ার সময় খুবই ঝগড়া করে মঙ্গলা আলতার সঙ্গে। সামান্য বিষয় নিয়েই ঝগড়া বাধে। রান্না করবার জন্য বাঁশের শুকনো পাতা, ঘর নিকাবার গোবর নিয়ে, অথবা, পুকুরের মাটি নিয়ে ঝগড়া বেধে যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আম-জামের ভাগ নিয়েও কম কেলেঙ্কারি হয় না। এমন মাস যায় না যে মাসে পাঁচ-সাতদিন পরস্পরের মধ্যে কথা বন্ধ না থাকে। কিন্তু যখন ভাব হয়, তখন আলতাই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সখী মঙ্গলার। বছর পাঁচ-ছয়ের ছোট হবে আলতা তার চেয়ে, কিন্তু বয়সে আলতাকেই বড় বলে মনে হয়। শক্তিও রাখে সে পুরুষের মতো। অসুখে বিসুখে আলতাই আসে পরিচর্যা করতে। মায়ের পেটের বোনের মতো সে তখন শুশ্রূষা করে, কিন্তু ঝগড়া যখন বাধে, তখন সতীনের মতোই সে শত্রু হয়ে ওঠে। রাগ আর অনুরাগ—দুইই আলতার প্রচণ্ড। আলতার মোটা রসিকতাগুলো আগে তেমন পছন্দ করত না মঙ্গলা। কিন্তু শুনতে

শুনতে এমনই অভ্যাস হয়ে গেছে যে আলতার মুখে ওসব না শুনলেই যেন আর তার ভালো লাগে না আজকাল। বরং অনেক সময় মঙ্গলাই এমন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আলতার মুখ থেকে এসব বার করে।

মঙ্গলার পরিহাসটা আলতার মনে এবারও যে না বিঁধেছিল তা নয়, কিন্তু খোঁটাটা তার নিজের ঢঙে ফিরিয়ে দিতেও দেরি হল না। মুখখানা গম্ভীর করেই আলতা জবাব দিল, 'সে তো ঠিকই বউদি, অমন সুন্দরপানা মুখ পেলে কালো বদন আর দেখতে চায় কে!'

বিনোদ সাধুকে নিয়ে এই ধরণের রসিকতা আলতার মুখ থেকে শোনা মঙ্গলার অভ্যাস হয়ে গেছে। আগে ভারি রাগ করত মঙ্গলা, গালাগালি করত আলতাকে, কিন্তু আজকাল অনেক সময় এসব কথায় মুচকি হাসি হেসে বলে, 'মরণ তোর— নিজের সাধটা অন্যের ঘাড়ে চাপাবার ইচ্ছে বুঝি!'

আলতা জবাব দেয়, 'মরণ আমার, আমি কি এমনই ক্ষেপেছি যে বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে যাব। চাঁদপানা যাদের মুখ তারাই তো চাঁদের খোঁজ করে।'

মঙ্গলা বলে, 'পোড়াকপালী, চাঁদ আমার ঘরেই আছে, তার জন্য খোঁজ করতে বেরুতে হয় না রে।'

পাড়ার মধ্যে বিনোদ দেখতে সত্যিই সবচেয়ে সুন্দর। বেশ লম্বা দোহারা চেহারা। রঙ অবশ্য এ-পাড়ার অনেকেরই ফর্সা, তবু বিনোদের স্নিগ্ধ গৌরবর্ণ বিশেষভাবে চোখে পড়ে। নাক-চোখের গড়নও একেবারে নিখুঁত। কিন্তু বিনোদকে যে মঙ্গলার মনে মনে ভালো লাগে, তার রূপের জন্য নয়, তার মিষ্টি গলা আর মধুর ব্যবহারের জন্য। বিনোদের সঙ্গে কোনদিনই অবশ্য কথা বলে না মঙ্গলা, বিনোদেরও এ পর্যন্ত কোন উপলক্ষ্য হয় নি মঙ্গলার সঙ্গে কথা বলবার, কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে বিনোদকে আলাপ করতে শুনেছে অনেকদিন সুবলের সঙ্গে। স্বামীর তুলনায় অনেক ভদ্র, অনেক মার্জিত বলে মনে হয়েছে মঙ্গলার। এমন সুন্দর চেহারা, মিষ্টি গলা, আর চমৎকার স্বভাব নিয়ে সুবলের মতো খাঁটি ব্যবসায়ী বনে না গিয়ে বিনোদ যে অমন ভক্ত কীর্তনীয়া হয়ে উঠেছে সে ভালোই হয়েছে। মঙ্গলার মনে হয়, এ ছাড়া অন্য কিছু যেন তাকে মানাত না। অমন নরম মিষ্টি কথায় বিনোদ কি পারত সুবলের মতো পাড়ার মধ্যে অমন মোড়লি করতে, উকিল-মোক্তারদের মতো অমন বৈষয়িক চাল চালাতে, পাইকারদের সঙ্গে কখনও গরমে কখনও নরমে জিনিসপত্রের অমন দর-দাম করতে। পাইকারদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলে সুবল, কেউ কোন বিষয়ে পরামর্শ নিতে এলে তার বোকামিতে

সুবল কিভাবে রেগে গিয়ে তাকে গালাগালি করতে থাকে, তা ঘরে বসে মঙ্গলা প্রায়ই শুনতে পায়। এক এক সময় মঙ্গলা ভাবে, আচ্ছা, সুবল যদি অমন পাকা ব্যবসায়ী না হয়ে বিনোদের মতো নামকরা কীর্তনীয়া হত তাহলে! কিন্তু কল্পনাটা তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেয় মঙ্গলা, একটুও তার পছন্দ হয় না। দুর, ও-ধরণের স্বামীকে নিয়ে কি উপায় হত মঙ্গলার। স্বামী যে সুবলের মতো ছাড়া অন্য কারো মতো হতে পারে, একথা কিছুতে ভাবতেই যেন পারে না মঙ্গলা। বিনোদের মতো অমন নরম, 'ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না' গোছের মানুষ নিয়ে কেউ কি সংসার করতে পারে! বিনোদের স্ত্রী হয়ে মালতীকে কিভাবে কষ্ট পেয়ে মরতে হয়েছে তা কি চোখের ওপরই দেখে নি মঙ্গলা? দুদিন ধরে ঘরে খাবার নেই তো নেই-ই—বিনোদ কোথায় কীর্তনে মেতে রয়েছে, কোন খোঁজ নেই তার। আবার কীর্তন থেকে দু-চার টাকা হাতে নিয়ে যখন বিনোদ ফিরে এল তখন তার ফুর্তি দেখে কে। তিন-চারজন ভক্ত সঙ্গে করে সে হয়ত রাত দুপুরে এসে উপস্থিত হয়েছে। অতিথির উপযুক্ত সৎকারে আদরে আপ্যায়নে দু-এক-দিনের মধ্যেই বিনোদের হাতের টাকা নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর অলক্ষ্যে একটু একটু করে শেষ হয়েছে মালতী। বিনোদ আবার বেরিয়ে পড়েছে—তার অন্নের কখনও অভাব হয় নি। কত ভক্ত, কত গুণমুগ্ধ তার এখানে-ওখানে ছড়ানো। কিন্তু এমন দিনও গেছে শেষকালটায়, যে মালতী ধার চেয়ে পাড়ায় কারো কাছে একটি ক্ষুদকণাও পায় নি। কে ধার দিতে যাবে তাকে, যে হাত পেতে নিয়ে ফের হাত উপুড় করে না। তারপর মালতী যখন গুরুতর অসুখে পড়ল তখনো কি বিনোদ একবার খোঁজ নিয়েছে! সে তখন অষ্টপ্রহর, চব্বিশপ্রহরে মত্ত। শেষে অবশ্য একদিন জেলা শহর থেকে মোটরে করে একজন বড় ডাক্তারকে এনে হাজির করেছিল বিনোদ। বিনোদের কীর্তন শুনে এই ডাক্তারও নাকি বিশেষ মুগ্ধ হয়ে-ছিলেন, কিন্তু ডাক্তার যখন এসেছিলেন তখন আর তাঁর করবার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। মালতীর মৃত্যুর পর তার আত্মার সদ্গতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানের অবশ্য কিছু বাকি রাখে নি বিনোদ। আশপাশের ভক্তদের ডেকে নাম-সংকীর্তন করিয়েছিল, দীঘলকান্দির নাম-করা পাঠক নন্দকিশোর গোঁসাইকে দিয়ে ভাগবত পাঠ করিয়েছিলেন, বৈষ্ণব আর কাঙালি ভোজনেও কম ব্যয় হয় নি। এর সব টাকাটাই নাকি যুগিয়েছিল বিনোদের ভক্ত বন্ধুরা।

কাপড় কেচে মঙ্গলা ফিরে এসে দেখে বাইরের দাওয়ায় চুপচাপ বসে রয়েছে বিনোদের মা। কাপড়ের ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে মঙ্গলা বলল, 'কি ব্যাপার খুড়িমা,

কতক্ষণ এসেছেন ? আহা, অমন উটকো বসে রয়েছেন যে, পিঁড়িখানা টেনে বসলেই তো পারতেন।'

বিনোদের মা বলল, 'তাতে আর কি হয়েছে বউমা, অমন নিকানো পোঁছানো তোমার ঘরদোর, মাটিতে বসতেও সাধ যায়, আবার কারো বাড়িতে তার শোবার ঘরের বিছানায় বসতেও পিরবিত্তি হয় না। এমন লক্ষ্মী বউ এ গাঁয়ে তো ভালো, দশখানা গাঁয়েও খুঁজে মিলবে না একথা আমি ঢাক পিটিয়ে বলতে পারি।' তারপর একটু থেমে বিনোদের মা এদিকে-ওদিকে চেয়ে খানিকটা এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বলল, 'কিন্তু বিনোদ আবার কি কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে দেখ। পাঁচ-সাত-দিন ধরে বাড়িতে আসবার নাম নেই, খোঁজ নেই বুড়ি মা রইল, কি মরল। বেলা তুপুরের সময় কোত্থেকে এক লেজুড় জুটিয়ে এনেছে সঙ্গে। বলা নেই, কওয়া নেই, এখন আমি এই তুপুরের সময় কি দিয়ে কি করি বলো তো!'

এমন ঘটনা আজ নতুন নয়। বিনোদের মা যে এই জন্যই এসেছে, তা তাকে দেখেই মঙ্গলা বুঝতে পেরেছিল। তার মুখ শক্ত হয়ে এল। কথার কোন জবাব না দিয়ে দাওয়ায় দাঁড়িয়েই ঘরের মধ্যে টাঙানো বাঁশের আড়টা থেকে একখানা শুকনো কাপড় হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে নীরবে মঙ্গলা পিছনের দিকে চলে গেল কাপড় ছাড়তে।

বিনোদের মা চিন্তিত হয়ে উঠল একটু। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'চলে গেলে নাকি বউমা?'

মঙ্গলা কাপড় ছাড়তে ছাড়তেই নির্মমভাবে জবাব দিল, 'চলে আর যাব কোথায়, দেখছেন না কাপড় ছাড়তে এলাম, বসুন, আসছি।'

একটু পরে মঙ্গলা ফিরে আসতে বিনোদের মা বলল, 'বিনোদই আমাকে পাঠিয়ে দিল তোমার কাছে, বলল, আর কারো কাছে গেলে তো কিছু হবে না মা, ও বাড়ির সোনাবৌদির কাছ থেকে একবার ঘুরে এস, লক্ষীর ভাণ্ডার কোন দিন বন্ধ থাকে না, এই বেলাটা কোন রকম চালিয়ে নিতে পারলে রাত্রের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

মঙ্গলার মুখ একটু বুঝি আরক্ত হয়ে উঠল, 'ছিঃ আমার কথা বললেন তিনি?'

বিনোদের মা একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো মঙ্গলার দিকে, তারপর মিশি-রঞ্জিত দাঁত বার করে একটু হেসে বলল, 'তোমার কথাই তো বলল বউমা। ছেলেকে আমার অমন হাবাগোবা দেখলে কি হয়, সে মানুষ চেনে। কারো মুখের দিকে সে তাকায় না। কিন্তু কার মন যে কি রকম তা সে জানে।'

মঙ্গলা ভেতরে ভেতরে একটু যেন শিউরে উঠল। তবু একটু ইতস্তত করে বলল, 'কিন্তু খুড়িমা—'

বিনোদের মা বলল, 'ওঃ তোমাকে বুঝি বলিই নি কি দরকার, তা সে কথা কি তোমাকে বলবার দরকার হবে মা? দুজনের যোগ্য দুমুঠো—। তোমার কাছে কোন লজ্জার বালাই নেই। আপনজনের কাছে আবার লজ্জা।'

মঙ্গলা ঘরে ঢুকতে যাবে এমন সময় রান্নাঘরের পাশে রয়না গাছটার গা ঘেঁষে বিনোদ একটু ব্যস্তভাবে দ্রুতপদে এসে দাঁড়াল, 'তুমি এখানে মা, আমি এদিকে পাড়া ভরে খুঁজে খুঁজে হয়রান।'

ঘোমটা টানবার আগে মঙ্গলা একবার ঘাড় বেঁকিয়ে বিনোদের দিকে না তাকিয়ে পারল না, তারপর তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বিনোদের কথায় মঙ্গলার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। তা হলে এতক্ষণ বিনোদের মা যে সব কথা বলছিল তা সবই মিথ্যা! বিনোদ তার মাকে বিশেষ করে মঙ্গলার কাছেই পাঠায় নি, তাই সমস্ত পাড়া ভরেই তাকে সে খুঁজে বেড়িয়েছে এবং অন্য কোথাও না পেয়েই এখানে এসেছে, পাড়ার অন্য কোন বাড়িতে ধার না পেয়ে বিনোদের মাকে যেন আসতে হয়েছে এখানে। বুড়ি তা হলে এতক্ষণ ধরে সব মিথ্যা কথা বলছিল বানিয়ে বানিয়ে মঙ্গলার কাছে। বুড়ির দিকে তাকাতেই দেখল বিনোদের মা মুখ টিপে একটু হাসল, তারপর বলল, 'কিন্তু বাবা, মিথ্যে হয়রান হতে তুই গেলিই বা কেন! আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে তা তো তুই জানতিসই।'

ঘরের মধ্যে মঙ্গলার মুখ ঈষৎ লাল হয়ে উঠল। ছলনাটা তাহলে বিনোদের মার নয়, বিনোদের নিজেরই। সে যে সোজাসুজি তার মাকে মঙ্গলার কাছে পাঠিয়েছে ধারের জন্য, একথা লজ্জায় সে স্বীকার করতে পারছে না। এত লজ্জা কেন বিনোদের? বিনোদের লজ্জার কথা ভেবে মঙ্গলার নিজেরই যেন লজ্জা করতে লাগল। বিনোদের মার দেরি দেখে কি বিনোদ এখানে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে, না অন্য কোন কারণ আছে তার? মঙ্গলা মনে মনে হাসল, তারপর গোঁসাই গোবিন্দকে যেমন সিধে দেয় তেমনি করে বড় একখানা থালায় চাল ডাল, দুটো আনাজ সাজিয়ে মঙ্গলা বিনোদের মার সামনে এনে রাখল। বিনোদের মা ডালা থেকে সেগুলি আস্তে আস্তে আঁচলে ঢালতে ঢালতে বলল, 'বাঁচালে বউমা, হাত পাতলে কোন দিন তুমি না করেছ যে আজ করবে? টাকা পয়সা অনেকেরই থাকে বউমা, কিন্তু এমন কলজে থাকে ক জনের?'

ধার পাওয়ার জন্য বিনোদ কিন্তু মুখে কোন রকম কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করল না, এ সব যেন চোখেই পড়ল না তার। শুধু যাওয়ার সময় বলে গেল, 'সন্ধ্যের সময় দয়া করে একটু পায়ের ধুলো দেবেন বউদি। নামকীর্তনের আসর বসাবার ইচ্ছে আছে। একজন গুণী লোককে ধরে এনেছি, শুনবেন কি রকম গলা। যাবেন কিন্তু।'

বিনোদের মা বলল, 'যাবে রে যাবে, তোর আর অত করে বলবার দরকার হবে না। মা আমার কীর্তনের ভারি ভক্ত। গানের সামান্য আওয়াজ শুনলে পর্যন্ত কান খাড়া করে থাকে।

বিনোদের মার এত বেশি ঘনিষ্ঠতা বিশেষ ভালো লাগে না মঙ্গলার। কেমন যেন বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়, আর বিনোদই বা কি রকম মানুষ, তার মার সামনে মঙ্গলাকে কীর্তন শোনবার জন্য অমন করে নিমন্ত্রণ না করলেই কি হত না? মনে মনে কী ভেবেছে বিনোদের মা? তার মিষ্টি কথা, মুখ টিপে হাসা, গায়ে পড়ে অমন সোহাগ দেখানো, মঙ্গলার বুঝি ভালো লাগে ভেবেছে? এসব মঙ্গলা সহ্য করতে পারে না। মানুষ বড় সহজ নয় বিনোদের মা, কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করলে মঙ্গলাও ছেড়ে কথা কইবে না, তেমন বাপের ঝি সে নয়।

৩

পুরনো কর্মচারী নীলকমল ঘর ঝাঁট দিয়ে সমস্ত দোকান ঘরটায় এক গাড়ু জল ছিটিয়ে দিল; তারপর গদির কাঠের বড় লাল দেরকোর ওপরকার প্রদীপটা জ্বালিয়ে দিল দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে। পুরনো পিতলের ধুনুচিটার রঙ এত কালো হয়ে গেছে যে পিতল বলে চেনাই যায় না। খানকয়েক নারকোলের ছোবড়ার খণ্ড ভরে ধুনুচিটাও নীলকমল ধরাল। ধুপের খুঁচিটা থেকে সামান্য একটু ধুপের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিল ধুনুচির মধ্যে। তারপর গঁদির তিনটে হাতবাক্সের সামনে ধুনুচিটা বার কয়েক ঘোরাতে ঘোরাতে অনুচ্চস্বরে তিন-চারবার বলল, 'হরিবোল, হরিবোল।'

গদির ওপর মাঝখানের বড় হাতবাক্সটা সামনে করে উটকোভাবে নবদ্বীপ এতক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে নীলকমলের সায়ংকৃত্যের দিকে চেয়েছিল। হরিধ্বনি শুনে নিতান্ত অভ্যাসবশে হাত দুখানা জোড় করে একবার কপালে ছোঁয়াল। নীলকমল ততক্ষণে এক টুকরো ছেঁড়া খবরের কাগজ দিয়ে হারিকেনের চিমনি মুছতে বসে গেছে।

নবদ্বীপ বলল, 'এ সব আগেই ঠিক করে বলতে পার না নীলু? এখন চিমনি মুছবে তবে আলো ধরাবে!'

নীলকমলের ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠল, বলল, 'কি করব বড়কর্তা, আমাকে কি একমুহূর্তও বসে থাকতে দেখেন? এখন এসব জিনিসও যদি আমাকে দেখতে হয়—রাখালকে বলে বলে আমি হয়রান হয়ে গেলাম।'

নবদ্বীপ ওকথার জবাব না দিয়ে বলল, 'রাখালই তো গেল বুঝি সুবলের ওখানে?'

নীলকমল ঘাড় নাড়ল।

নবদ্বীপের ইচ্ছা ছিল সন্ধ্যাসন্ধিই বাড়ি ফিরবে আজ। সুবলকে সেকথা বলেও রেখেছিল। কিন্তু সন্ধ্যা উতরে যাচ্ছে অথচ সুবলের দেখা নেই। তার হিসাব-নিকাশ তহবিল মিলানো আর হয় না। টাকা-কড়ির মুখ এই প্রথম কেবল দেখা আরম্ভ করেছে কিনা সুবল। মত্ততা তো থাকবেই। মনে মনে হাসল নবদ্বীপ। অবশ্য সুবল যদি বলতো তার দেরি হবে তাহলে নবদ্বীপ আর তার জন্য অপেক্ষা করত না। এতক্ষণ প্রায় বাড়ি ধরধর হত। কিন্তু এখন একা একা যেতে ভাল লাগে না। তা ছাড়া অন্য কারো চেয়ে সুবলকে সঙ্গী হিসাবে পেতেই বেশি ভালো লাগে নবদ্বীপের।

গরহাটবারের দিনগুলিতে বেচাকেনা যা হবার সকালে বাজারের সময়েই প্রায় শেষ হয়ে যায়। বিকালের দিকে দু-একজন পাইকার আসে, আসে সমবয়সী অন্যান্য দোকানদাররা। তামাক খায়, পাঁচ রকমের কথাবার্তা বলে, জিনিস-পত্রের বাজার দর সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আগে এ সব ব্যাপারে নবদ্বীপের উৎসাহের অন্ত ছিল না। ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয়ে বাজারের সবাই তাকে বিচক্ষণ বলে জানে। প্রয়োজন মতো অনেকেই তার কাছে এসে বুদ্ধি-পরামর্শ নেয়। কারবার নবদ্বীপের তামাকেরই, কিন্তু এমন কোন জিনিস নেই বাজারে নবদ্বীপ যার খোঁজখবর না রাখে কিংবা তার ব্যবসা না বোঝে। ইদানীং মাঝে মাঝে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে নবদ্বীপ, কেমন যেন অন্যমনস্ক বীতস্পৃহ দেখা যায় নবদ্বীপকে। গান-বাজনা, কীর্তন, ভাগবত যদি কোথাও হয় ধারে কাছে, নবদ্বীপকে আসরের মধ্যে গিয়ে বসতে দেখা যায়। দেখে মনে হয় সে যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে রসগ্রহণের জন্য, চিত্তবিনোদনের জন্য অন্য কোন অবলম্বন যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে নবদ্বীপ, শুধু কারবার-পত্রে তার মন আর যেন আটকে থাকতে চাচ্ছে না। কিন্তু এ ধরনের মনোভাব বেশি দিন থাকে না নবদ্বীপের। হঠাৎ আবার একদিন ব্যবসায়ে তার

দ্বিগুণ মনোযোগ দেখা যায়। কাজকর্মের শৈথিল্যের জন্য কর্মচারীদের ধমকায়, খুচরো খদ্দেরদের একটা পয়সাও ছাড়তে চায় না।

একটু পরেই নবদ্বীপের ছোকরা কর্মচারী রাখাল এসে ঘরে ঢুকল। নবদ্বীপ বলল, 'কি বলল, হয়েছে তার ?'

রাখাল জবাব দিল, 'আজ্ঞে, বললেন তো আসছি, তুই যা।'

নবদ্বীপ হতাশাব্যঞ্জক ভঙ্গী করে বলল, 'তবেই হয়েছে, তার আসছি মানে তো আরো একটি ঘণ্টা।'

কিন্তু এক ঘণ্টা লাগল না, তার আগেই এসে সুবল আজ উপস্থিত হল। খেয়াঘাটে যাওয়ার পথটায় চট বিছিয়ে হলুদ, আদা, শুকনো লঙ্কা বিক্রি করে সুবল।

হ্যারিকেন ধরিয়ে প্রস্তুত হয়েই সুবল এসেছিল, ঘরে ঢুকেই বলল, 'চলুন জ্যেঠামশাই। গাজনহাটির একজন পাইকার এসেছিল, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে একটু দেরি হয়ে গেল, তা বিনোদের কীর্তন আরম্ভ হতেও দেরি আছে। সবে তো সন্ধ্যে হল।'

নবদ্বীপ একটু যেন লজ্জিত হয়ে বলল, 'কীর্তনের জন্যে আর কি। বিনোদের কীর্তন যেন শুনিই নি কোনদিন ! সেজন্যে নয়। রাতে-বিরাতে চলা-ফেরা করতে আজকাল ভারি অসুবিধা হয় সুবল। যে পথটুকু আগে এক লাফে পার হয়েছি এখন সেই পথে নামলেই চিন্তা হয় কখন ফুরোবে। রক্তের জোর কি চিরকাল সমান থাকে মানুষের ?'

নবদ্বীপের দিকে চেয়ে বেশ একটু মায়াই হয় সুবলের। এই ক বছরে নবদ্বীপ যেন হঠাৎ বড় বেশি বুড়ো হয়ে পড়েছে। বয়সও অবশ্য সত্তরের কম হয় নি। কিন্তু কিছুদিন আগেও তার বয়সটা এমন স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যেত না। তা ছাড়া বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বহুদিনের ব্যাধি অম্লশূলটাও বেড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে নবদ্বীপকে ভারি কাতর হয়ে পড়তে দেখা যায় আজকাল। এক একবার মনে হয় এ যাত্রা বুঝি আর টিকবে না, কিন্তু অদ্ভুত বুড়োর জান্, দুদিন যেতে না যেতেই আবার বেশ শক্ত হয়ে ওঠে।

মাঝে মাঝে খাদ আছে রাস্তায়।

বর্ষার সময় যাতে নৌকা বেরোতে পারে সেজন্য জায়গায় জায়গায় খানিকটা ফাঁক রাখা হয়েছে। এ সব জায়গায় পাকা পুল করে দেবার জন্য টাকা নাকি মঞ্জুর

হয়েই আছে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একখানা তক্তাও দেখা গেল না। বর্ষার সময় কাছাকাছি যাদের বাড়ি তারাই জুটে বাঁশের সাঁকো বেঁধে কাজ চালিয়ে নেয়। একটা মোটা বাঁশ থাকে পায়ের নিচে আর খানিকটা উঁচুতে অপেক্ষাকৃত সরু একটা বাঁশ বেধে দেওয়া হয় হাত দিয়ে ধরবার জন্য, কিন্তু জল শুকাতে না শুকাতে যে যত আগে পারে তাড়াতাড়ি সাঁকোর বাঁশ আর খুঁটোগুলি সরিয়ে নিয়ে নিজের নিজের কাজে লাগায়।

ওঠানামা করতে, বিশেষ করে রাত্রে সত্যিই বেশ একটু কষ্ট হয় আজকাল। একটা জায়গায় নামতে নামতে নবদ্বীপ খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলে, 'না আর পারি নে বাপু, একবার ঘাড় ধরে নামাবে আর একবার কান ধরে ওঠাবে। এর চেয়ে আগের মেঠো পথই ছিল ভালো।'

ফিরে দাঁড়িয়ে সুবল হাত ধরে উঠতে সাহায্য করে নবদ্বীপকে। তার শক্ত সবল মুঠোর মধ্যে লোলচর্ম অস্থি-সর্বস্ব বুড়োর হাতখানা অসহায়ভাবে নিস্পন্দ হয়ে থাকে। অদ্ভুত অনুভূতি জাগে সুবলের মনে। এই মূহূর্তে নবদ্বীপকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সে যেন ভাবতেই পারে না! অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সে অনুভব করে নবদ্বীপের সঙ্গে। সস্নেহ ভৎ´সনার ভঙ্গীতে বলে, 'উঠতে নামতে পারেন না, সে কথা বললেই তো পারেন। তা তো নয়, নিজের গোঁ মতো চলে এলেন চিরকাল। সব বয়সেই কি তা চলে? পড়ে-টড়ে গিয়ে একটা বিপত্তি ঘটিয়ে বসবেন আর কি। আর সে মেড়াটাকেই বা বাড়িতে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন কেন; সে কি এখন এসব দেখাশোনা করতে পারে না?'

ছেলের ওপর যত বিদ্বেষভাবই থাকুক, নিজে যত গালাগালিই করুক, অন্যে সামান্য কিছু বললেও নবদ্বীপের কেমন যেন অসহ্য হয়ে ওঠে। তবু এক্ষেত্রে স্পষ্টত সুবলের সে প্রতিবাদ করে না, বলে, 'তবেই হয়েছে। ওর হাতে দেখাশোনার ভার দিলে দুদিনের মধ্যেই সব লোপাট হয়ে যাবে, দেখাশোনার জন্যে আর কারো দরকারই হবে না তখন। কোন কাণ্ডজ্ঞান কি জন্মেছে ওর? একটা দশ বছরের ছেলের যে বুদ্ধি আছে ওর তাও নেই।'

নবদ্বীপের কথার ভঙ্গীতে মনে হয় বুদ্ধি না থাকাটা সত্যিই যেন তেমন দোষের নয় মুরলীর পক্ষে। আর আসলে দশ বছরের বেশি বয়স যেন মুরলীর হয় নি আজও।

সুবলের মন আবার একটু একটু করে বিরূপ হতে থাকে। মুরলীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলে, 'তা ছাড়া রাত্রে তো আপনি দোকানেই থাকতে পারেন ইচ্ছে

করলে। আসা যাওয়ার এমন কষ্ট তাহলে রোজ রোজ আপনাকে পেতে হয় না।'

সুবলের এ পরামর্শও নবদ্বীপ খুব ভালো ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। বলে, 'এক একদিন তো তাই ভাবি, যাব না আর বাড়িতে, তেমন কোন টান তো আর নেই যে আসতেই হবে, তবু থাকতে পারি কই।'

খানিকটা দুর থেকেই বিনোদের বাড়ির খোলের আওয়াজ শোনা যায়। গানের পদ বোঝা যায় না, কিন্তু বিনোদের দরাজ সুমিষ্ট গলা এতদুর পর্যন্ত ভেসে আসে। এদিক থেকে পাড়ায় ঢুকে দু-তিনখানা বাড়ির পরেই বিনোদের বাড়ি। বাড়িগুলির ওপর দিয়ে যেতে যেতে নবদ্বীপ আর সুবলের চোখে পড়ে বাড়ি কয়েকখানায় যেন আর জনপ্রাণী নেই। একেকখানা বাড়িতে অনেকগুলি করে সরিক। ঘরগুলির বেশির ভাগই তালাবন্ধ। সব বিনোদের কীর্তন শুনতে গিয়েছে! দু-একখানা ঘরে কেবল মিটমিট করে আলো জ্বলছে। নিতান্ত নতুন বউ যারা, তারাই দু-একজন রয়েছে বাড়ি পাহারা দিতে।

বিনোদের বাড়িতে পা দিতেই দেখা গেল বিনোদ বিনয় করে যেমন বলেছিল আসর তত ছোট হয় নি। উঠানে, আনাচে-কানাচে একটুও ফাঁক নেই দাঁড়াবার মতো। সমস্ত বাড়িটা লোকে একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে। দক্ষিণপাড়া থেকে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা এসে একদিকে বসেছে। পূবের দিকে একটা কোণ ঘেঁষে বসেছে নমঃশূদ্রের দল। কিন্তু তারা সংখ্যায় বেশি নয়। এই পাড়ার লোকেই বাড়ি ভরে গেছে। ঘরের ভেতর, বারান্দায়, পাড়ার ঝি-বউরা গিসগিস করছে।

নবদ্বীপ আর সুবলকে দেখে পাশের বাড়ির ফটিক সম্বর্ধনা করে বলল, 'আসুন ঠাকুরদা, এস সুবলকাকা!'

তারপর চাপাচাপি করে ফটিক তাদের বসবার জায়গা করে দিল। বিষ্টু সা হুঁকোটা টান দিয়ে বলল, 'ধর হে নবুদা।'

নবদ্বীপ হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিল, কিন্তু টান দেওয়ার আগে বিষ্টুকে একবার জিজ্ঞাসা করল, 'আছে কিছু এতে?'

বিষ্টু সজোরে ঘাড় নেড়ে বলল, 'টান দিয়েই দেখ।'

দীঘলকান্দি থেকে নন্দকিশোর গোঁসাই এসেছেন। আসরের মাঝখানে বড় একখানা আসন পেতে তাঁকে বসানো হয়েছে। চোখে চোখ পড়তে দুর থেকেই হাত জোড়করে মাথা নুইয়ে নবদ্বীপ তাঁকে প্রণাম করল। নন্দকিশোর স্নিগ্ধ একটু হেসে ঘাড় নাড়লেন।

কীর্তন তখন বেশ জমে উঠেছে। আশেপাশে দু-তিনখানা খোলের মৃদু মৃদু

আওয়াজ হচ্ছে। মন্দিরা বাজছে কয়েক জোড়া। বিনোদই মূল গায়েন। গোঁসাইকে বিনোদ প্রথমে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু তিনি পাল্টা বিনোদকেই অনুরোধ করে গান গাইতে বলেছেন। নন্দকিশোর আজকাল আর তেমন পরিশ্রম করতে পারেন না। তাছাড়া তেমন গলাও আর নেই। নন্দকিশোর বলেছেন, 'নিজের বাড়ি বলে বুঝি সঙ্কোচ হচ্ছে তোমার বিনোদ ? কিন্তু আসল ভক্তের কি আর নিজের বাড়ি অন্যের বাড়ি আছে ? আমি বলছি তুমি গাও। এতগুলি লোক এসেছে তোমার গান শোনবার জন্য। এ তো কথকতা নয় যে আমার নাম শুনে তারা আসবে।'

নন্দকিশোর অত্যন্ত স্নেহ করেন বিনোদকে। শিষ্য তো এ পাড়ায় প্রায় তাঁর সকলেই, কিন্তু বিনোদকে তিনি ঠিক শিষ্যের মতন দেখেন না। ছোট ভাইয়ের মতোই দেখেন। অবশ্য বিনোদ নন্দকিশোরের সাক্ষাৎ-শিষ্য নয়, তাঁর বাবার শিষ্য। কিন্তু বিনোদের সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত অন্তরঙ্গতা। নন্দকিশোরের নিজের ছেলেমেয়ে কিছু নেই। কথকতা করে এবং শিষ্যবাড়ি থেকে যা আয় হয় তা তিনি নিজের খেয়ালেই ব্যয় করেন। মাঝে মাঝে তীর্থপর্যটনে বের হন, বিনোদ যায় সঙ্গে। কোন জায়গায় কীর্তন কথকতার আমন্ত্রণ পেলে বিনোদকে তিনি সঙ্গে নিতে ভোলেন না। বাড়ি থাকলে বিনোদ ডাকামাত্রই তিনি চলে আসেন। ঠিক শিষ্য-বাড়িতে আসার মতো এখানে আসেন না, বিনোদের বাড়ি যেন তাঁর নিজেরই বাড়ি। বিনোদের অবস্থার কথা জেনে নিজের গাঁট থেকেই পয়সা খরচ করেন এখানে এসে। বিনোদ মাঝে মাঝে জিভে কামড় দিয়ে বলে, 'আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে হবে গোঁসাইদা, বলেন কি !'

নন্দকিশোর হেসে বলেন, 'তোর সংসার চালাবার জন্যে তো আর দিচ্ছি না, এ দিচ্ছি ভক্তদের সেবার জন্যে। তা আমার বাড়িতেও যা তোর বাড়িতেও তাই।'

আজও গোঁসাইদার পায়ের ধুলো নিয়ে বিনোদ আসরে নেমেছে। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই নিজের ভাবে বিনোদ নিজেই এত বিভোর হয়ে গেছে যে, মনে হয় তার বাহ্যজ্ঞান কিছুমাত্র নেই। একখানা গরদের কাপড় বিনোদের পরণে। সাধারণত কীর্তন ভাগবত ইত্যাদির সময় এই কাপড়খানাই সে নেয়। ফুল কোঁচাটা সামনে ঝোলানো। গায়ে কোন আবরণ নেই। তার উজ্জ্বল গৌরবর্ণের ওপর কোন আবরণের প্রয়োজনই যেন হয় না। কেবল মাজায় একখানা রঙীন নীল চাদর বাঁধা। শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, এই চাদরখানা প্রায় সব সময়েই সঙ্গে রাখে বিনোদ। ভারি পছন্দ করে বোধ হয় এখানা। কোমর খানিকটা

বাঁকিয়ে, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে বিনোদ তখন গাইছে, 'তোরা কে কে যাবি আয় রে, মন্মথ যায় রে।'

সমস্ত গোপিনীদের মন মথন করে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তার অপরূপ ভঙ্গিতে পথ দিয়ে চলে যাচ্ছেন। জীবন যৌবন মন প্রাণ সমস্ত তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে চাচ্ছে।—'মন্মথ যায় রে।'

যতবার এই কলিটুকু বিনোদ তার অপরূপ সুর ও ভঙ্গিতে ফিরে ফিরে ধরছে, ততই এই অংশটুকুর মাধুর্য যেন বেশি নিবিড় হয়ে উঠছে।

এই দুটি লাইন আরও কতদিন পাড়ার লোক শুনেছে। কিন্তু প্রতিবারই বিনোদের কণ্ঠে যেন তা নতুন হয়ে ওঠে—তার মাধুর্যের শেষ হতে চায় না। কীর্তন গাইবার সময় বিনোদ নিজেও এত মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়ে যে, তার মুগ্ধতাই যেন সকলের মনে সংক্রমিত হয়ে যায়। ঘন ঘন বিনোদের রোমাঞ্চ হতে থাকে, চোখের জল বাধা মানে না। অভিভূত ও আবিষ্ট হয়ে যাওয়ার মধ্যে যে অদ্ভুত আরাম আছে, বিনোদের সঙ্গে সকলেই যেন তার অংশ গ্রহণ করে এবং গ্রহণ করে কৃতজ্ঞ হয়। এই বিনোদ যে পাড়ার সেই বিনোদ সাধু—যার সারল্য নিতান্তই বোকামির সামিল, যার বিষয়বুদ্ধিহীনতা মূঢ়তার নামান্তর মাত্র, একথা এই মুহূর্তে ধারণায় আনা যেন সম্ভবপর হয় না। শুধু নিজের আবিষ্টতা আর সুমিষ্ট কণ্ঠের সাহায্যে অতিপরিচয়ের তুচ্ছতা থেকে বিনোদ যেন তার চারিদিকে ক্ষণিকের জন্য এক অপরিচয়ের মায়ামণ্ডল সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে থেকেও যেন সে নেই, যেন অনেক দূরে চলে গেছে—হাত দিয়ে যেখানে ওরা ওকে স্পর্শ করতে পারছে না, ধারণায় আনতে পারছে না মনের ভাবনা বেদনা দিয়ে।

এসব ব্যাপারে খুব গভীরভাবে আবিষ্ট কোনদিনই হতে পারে না নবদ্বীপ। এক সময়ে এ ধরণের মাতামাতিটাকে সে বেশ পরিহাসের চোখেই দেখত। দশায় পড়ে গড়াগড়ি খাওয়াটাকে তার কাছে ভক্তির লোক-দেখানো আতিশয্য বলে মনে হত। কিন্তু পাড়ার দু-চারজন চ্যাংড়া ছেলেই এ ধরণের সমালোচনা করে, বুড়ো হয়ে এ ধরণের মনোভাব তার পক্ষে যেন মানায় না। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের যেন একটু দুর্বলতাই এসেছে এসব বিষয়ে। লোকে যেন না বলে বুড়ো হয়েও লোকটার স্বভাব বদলালো না। নবদ্বীপের মনে হয়, না-বদলানোটাই বার্ধক্যের পক্ষে অশোভন।

আট-ন বছরের সুন্দরপানা একটি ছেলে নবদ্বীপের পিঠের ওপর বার বার

ঝিমিয়ে পড়ছিল। ঘাড় ফিরিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মায়া হলেও পিঠের শুকনো হাড়ের ওপর বার বার ছেলেটি এমনভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ায় শারীরিক কষ্টই হচ্ছিল নবদ্বীপের। অবশেষে এক সময় নবদ্বীপ বেশ একটু ঝাঁজিয়ে উঠল, 'কে রে ছোঁড়া, ঘুম পাচ্ছে তো চলে যা না বাড়িতে।'

বিষ্টু সা পাশেই বসেছিল। তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'আয় রে নিমু এদিকে আয়। একে চিনতে পারলে না নবুদা? ও আমার নাতি, মেজ ছেলে মুকুন্দের ঘরের।'

বিষ্টু সার নাতি হলেই যে তার নবদ্বীপের পিঠের ওপর ঢুলে পড়বার অধিকার জন্মাবে তা নয়। তবু অভিভাবকের সামনেই ছেলেটিকে অমন করে ধমকানোর জন্য বেশ একটু লজ্জিত হল নবদ্বীপ। বলল, 'ওঃ, তোমার নাতি? তাই বলো! তা ওকে এখন কারো সঙ্গে বাড়িতেই পাঠিয়ে দাও না বিষ্টু, ছেলে মানুষ, কেন মিছেমিছি কষ্ট পাচ্ছে।'

অনেক সময় চোখেই ঠাহর হয় না, অনেক সময় আবার পরিচয় না করিয়ে দিলে সমবয়সীদের এসব পৌত্র-প্রপৌত্রদের যথার্থই চিনতে পারে না নবদ্বীপ। লোক কি কম হয়েছে পাড়ায়। কোণে কানাচে যেখানে যে যতটুক জায়গা পেয়েছে কেবল ঘর তুলেছে। লাগা-লাগা ঘিচি-ঘিচি সব ঘর, আর এক একটা ঘরে লোকজন ছেলেপুলে একেবারে ঠাসা। নবদ্বীপ আর একবার আসরটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। সমস্ত বাড়িটায় তিল ধরবার আর জায়গা নেই। ভাবলে বিস্ময় লাগে, একই বংশের একই গোষ্ঠীর লোক এরা। কোন বাড়িতে কেউ হলে কি মরলে, পাড়াসুদ্ধ এখনো প্রায় সকলেরই অশৌচ হয়। কারো বা ডুবমাত্র, কারো বা তিন দিন, আর দু-এক পুরুষের মধ্যে হলে তিরিশ দিন। এমনও হয়, একই ঘরে বুড়োকর্তার হয়ত একমাসই অশৌচ পড়ল, আর তার নাতি-নাতনীরা ডুব দিয়ে মুক্ত হয়ে এল। সবাই এরা পরস্পরের জ্ঞাতি। কিন্তু জন্ম-মৃত্যু ছাড়া সব সময় কি সে-কথা মনে রাখা যায়?

বিষ্টু বলল, 'গান কেমন লাগছে নবুদা?'

নবদ্বীপ মাথা নাড়ল, 'না, যত ঠাট্টা-তামাসাই করি না, গানের নিন্দে কেউ করতে পারবে না বিনোদের।'

কোন সাজ-পোশাক নেই, সিন-সিনারিও নেই, নতুন কোন বিষয়বস্তুও নেই, সেই চিরকালের রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা, তাও গাইছে পাড়ারই বিনোদ, তবু লোক জমতে বাকি থাকে নি।

কীর্তনও ক্রমেই বেশ জমে উঠেছিল। শ্রোতাদের মধ্যে মাঝে মাঝে আলাপ-আলোচনাটা কোন কোন জায়গায় একটু আধটু শ্রুতি-গোচর হয়ে উঠলেই ফটিক সা দাঁড়িয়ে উঠে কড়া ধমক দিচ্ছিল। মায়ের কোলে শিশুরা মাঝে মাঝে কেঁদে উঠলে ফটিক বিরক্তি গোপন না করে চেঁচিয়ে উঠছিল, 'মাই দেন মুখে, মাই দেন।'

এসব সামান্য গোলমালে তেমন কোন রসভঙ্গ হচ্ছিল না। হঠাৎ বিনোদের বাড়ির পিছনে কলাবাগানটার দিকে একটু বেশী রকমের সোরগোল উঠল যেন। ইতিমধ্যেই কয়েকজন লোক উঠে গিয়ে ওদিকে ভিড় জমিয়ে তুলেছে। শান্তিরক্ষক ফটিক তাদের বসিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'কি ব্যাপার, হয়েছে কি ? গানটাকে কি তোমরা মাটি না করে ছাড়বে না ?'

দু হাত দিয়ে ভিড় সরিয়ে ফটিক আরো এগিয়ে যেতেই মুরলীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। মুরলী কোন রকমে যেন পাশ কাটিয়েই যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু ফটিক একেবারে সামনা-সামনি জিজ্ঞাসা করে বসল, 'সোরগোল কিসের ?'

মুরলী নিমেষের জন্য একটু থমকে গেল তারপর সপ্রতিভ-ভাবে বলল 'যেতে দাও, যেতে দাও, মেয়েদের সোরগোল, তার আবার একটা মাথামুণ্ড আছে নাকি ?'

ফটিক বলল, 'কিন্তু ব্যাপারখানা কি ?'

ততক্ষণে কীর্তন রেখে আরো অনেকে এসে চারদিকে ঘিরে ধরেছে, এত কলরোলের মধ্যেও দু-তিনজন প্রৌঢ়ার তীক্ষ্ণ উচ্চকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, 'ছি ছি ছি, বুড়ো হয়ে গেলি, তবু স্বভাব বদলালো না।'

'নিজের মেয়ের বয়সী একটা মেয়ে—'

'পাড়ায় কি পুরুষ আছে কেউ, সব ভেড়ার দল, না হলে এই লোক কি উঠে আবার এতদিন ধানের ভাত খেতে পারত ? একদিন ধরে হাড়গোড় গুঁড়ো করে দিত না ?'

নিজেদের শক্তির ওপর এই কটাক্ষে পুরুষরা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল, নানারকম গালিগালাজ শাসন তিরস্কারের ঝড় ছুটল, কিন্তু সাহস করে সহসা কেউ হাত তুলল না মুরলীর গায়ে। বিষয়টা কি তাও পরিষ্কার করে বোঝা গেল না। ততক্ষণে নবদ্বীপ আর সুবল এসে দাঁড়িয়েছে। নন্দকিশোরও উঠে এসেছেন আসন ছেড়ে।

নবদ্বীপ বলল, 'আগে এদের একটু থামিয়ে দাও তো সুবল, বিষয়টাই শুনব, না এদের গোলমালই শুনব ?'

সুবলের কিছু বলতে হল না। নবদ্বীপের গলায় আগের মতো জোর আজকাল না থাকলেও ধমক দেওয়ার ভঙ্গিটি তেমনই আছে। গোলমাল অনেকটা কমে গেল। তাছাড়া সবারই মনে হল, ঠিক কথা, ঘটনাটাই ভালো করে শোনা হয় নি এখনো।

যে কয়েকজন প্রৌঢ়া একেবারে পুরুষের ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল নবদ্বীপ তাদের একজনকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছিল, সত্যি করে বল তো নস্থর মা, ব্যাপারখানা কি ?'

এত লোক থাকতে তাকেই হঠাৎ ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করায় নস্থর মা প্রথমটা যেন একটু ঘাবড়ে গেল। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে বেশ আত্মস্থ হয়ে উঠল। নবদ্বীপের সুরটা এমনি, যেন এই গোলমালের জন্য নস্থর মা-ই দায়ী। যেন নস্থর মা-ই এই ঘটনাটাকে তৈরী করে তুলছে। আর অকারণে নবদ্বীপকে এই তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে আসতে হয়েছে বলে যেন নবদ্বীপের বিরক্তির অবধি নেই। নস্থর মার ওপর নবদ্বীপের কেমন একটা আক্রোশ বহুদিন থেকেই আছে তা এই মুহূর্তে তার মনে পড়ে গেল। মাথার কাপড়টা আর একটু নামিয়ে দিল নস্থর মা, কিন্তু গলা মোটেই নামাল না ; বেশ চড়া ঝাঁঝালো সুরেই জবাব দিল, 'সত্যি কথাই বলব, কারো ভয়ে ইঁদুরের গর্তে গিয়ে ঢুকবে এমন বাপের ঝি নস্থর মা নয়। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করে দেখ না রঙ্গীকে ?'

রঙ্গী নামে কারো কথা সহসা নবদ্বীপের মনে পড়ল না। বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বলল, 'আবার রঙ্গীকে ধরে টানাটানি কেন, তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, যদি কিছু জান তুমিই বল না। চেঁচাচ্ছিলে তো তুমিই সবচেয়ে বেশি।'

নস্থর মা তেমনি ধারালো গলায় জবাব দিল, 'রঙ্গীকে নিয়ে টানাটানি আমি করতে যাই নি, গিয়েছিল তোমার গুণধর ছেলে, কেন গিয়েছিল তাকেই জিজ্ঞেস কর। নিজের মেয়ের বয়সী একরত্তি একটা ছুঁড়ি, তার হাত ধরে টানতে যায়, লজ্জাও করে না, ঝাঁটা মারতে হয় অমন হতভাগার মুখে। সেই ছেলের হয়ে উনি আবার ওকালতি করতে এয়েছেন।'

মুহূর্তের জন্য নবদ্বীপ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে কথা বেরলো না। কিন্তু নবদ্বীপ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুরলী রুখে উঠল, 'এসব তোমার একেবারে নিজের চোখে দেখা, না ছোট জ্যেঠি ?'

কিন্তু নস্থর মা কিংবা আর কেউ বলবার আগেই নিজের ছেলের ওপরই ঝাঁজিয়ে উঠল নবদ্বীপ, 'সরে যা, সরে যা এখান থেকে, আমার চোখের সামনে থেকে দুর হয়ে যা, লজ্জা করে না মুখ ফুটে আবার কথা বলছিস তুই ?'

সকলের সামনে মুরলীকে ওভাবে তিরস্কার করায় অনেকেই খুশি হয়ে উঠল নবদ্বীপের ওপর। না, কেবল ছেলের পক্ষ টেনে কথা বলবার লোক নবদ্বীপ নয়। তাহলে পাড়ার মাতব্বর বলে দশজনে তাকে এমন করে মানত না।

ছেলেকে তিরস্কার করেই নবদ্বীপের গলা আবার স্বাভাবিক পর্দায় নেমে এল। বেশ কোমল, মধুর স্বরে নবদ্বীপ বলল, 'কিন্তু তুমি যে অসম্ভব কথা বলছ নস্থর মা।'

এ যেন শুধু একটা প্রতিবাদ নয়, এ নবদ্বীপের স্থির দৃঢ় বিশ্বাস। এর প্রতিবাদ নস্থর মার মুখ দিয়েও সহসা বেরলো না। নবদ্বীপ বলল, 'তবু কথাটা যখন উঠেছেই সংশয় ভঞ্জন হওয়াই ভালো। বেশ, তুমিও যখন নিজের চোখে কিছু দেখ নি, রঙ্গী না বেঙ্গী কার কথা বললে, তাকেই জিজ্ঞেস করে দেখি।'

বিষ্টু সা বলল, 'থাক না নবুদা, যেতে দাও, যেতে দাও যত সব—'

নবদ্বীপ মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, তা হয় না, ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়াই ভালো বিষ্টু। না হলে অনেকের মনেই হয়ত একটা ধুরকুচি থেকে যাবে। ডেকে আন রঙ্গীকে।'

সুবল এতক্ষণ প্রায় চুপ করেই ছিল, এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি যে বলেন জ্যেঠামশাই! এই ভিড়ের মধ্যে সোমত্ত মেয়েটাকে না নিয়ে এলেই আপনার চলবে না। সারা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছে, কেলেঙ্কারির ওপর আর একটা কেলেঙ্কারি করবেন আপনি। জিজ্ঞেসবাদ যদি কিছু করতেই হয়, বিনোদের ঘরের মধ্যে চলুন।' তারপর যারা চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, সুবল তাদের তাড়া দিয়ে উঠল, 'যাও, হয় আসরে গিয়ে বস, না হয় বাড়ি চলে যাও। কোত্থেকে একটু গন্ধ পেয়েছে আর সব মাছি এসে উড়ে পড়েছে,—সব সমান।'

যেতে যেতে কে একজন অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলল, 'বাবারে বাবা, গন্ধ তোমরা বের করতে পার আর আমাদের নাকে গেলেই দোষ!'

বিনোদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কীর্তন আর নতুন করে জমে উঠল না। অগত্যা কীর্তন বন্ধ করে দিতে হল বিনোদকে। নিজের বাড়ির ওপরই এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটায় তার কুণ্ঠা আর লজ্জার অবধি রইল না। সকলের কাছে হাত জোড় করে বিনোদ বলতে লাগল, অবিলম্বেই আর একদিন সে আয়োজন

করবে কীর্তনের। সেদিনও যেন সকলের পায়ের ধূলো পড়ে এখানে।

এসব গোলমালে রঙ্গীর মার শরীর কাঁপছিল থর থর করে। ভারি সাদাসিধা আর ভীতু ধরণের মেয়েমানুষ সুলোচনা। এতদিন বিয়ে হয়েছে কিন্তু কেউ এপর্যন্ত তার ঘোমটা একটু খাটো হতে দেখে নি কিংবা বড় করে কথা বলতে শোনে নি তাকে। লক্ষ্মী, লজ্জাশীলা বউ হিসাবে বেশ সুনাম আছে তার পাড়ায়। সুলোচনা এসেছিল তার বিধবা জায়ের সঙ্গে। সম্পর্কে জা হলেও বয়সে প্রায় সুলোচনার মার বয়সী মানদা। নিজের ছেলেপুলে কিছু নেই। জা'র ছেলেমেয়ের ওপর বেশ স্নেহ আছে মানদার। পৃথক অন্নে থাকলেও এবং কখনো কখনো খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ বাধলেও মধু তার বউদির ওপর খুব নির্ভর করে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে প্রায়ই গাওয়াল করতে বের হয় মধু। চার-পাঁচদিনের মধ্যে আর ফিরে আসে না। তার স্ত্রী-পুত্রের দেখাশেনো এই মানদাই তখন করে।

সুলোচনাকে কাঁপতে দেখে মানদা বলল, 'অমন ভয় পাচ্ছিস কেন ছোট-বৌ। শুনিই না ব্যাপারটা কি হয়েছিল, যদি অন্যায় কিছু করে থাকে, বড়লোকের ছেলে বলে ছেড়ে কথা বলব নাকি আমরা, তা মনেও করিস নি।'

সুলোচনা বলল, 'না দিদি, শোনাশুনির আর দরকার নেই। বাড়ি চল। আমি আসতেই চাই নি; এপাড়ার ভাব-সাব আমার জানতে বাকি নেই। এরা নিজেদের মাংস নিজেরা খায়। ওবছর মাত্র বিয়ে হয়েছে মেয়ের, জামাইয়ের কানে যদি এসব কথা ওঠে, কি হবে বল দেখি! একেই ওরা দিতে চায় না মেয়েকে, এরপর তো আনবার কথা তোলাই যাবে না। যাক, যা আমার কপালে আছে তা তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না, এখন বাড়ি চল।'

কিন্তু বাড়ি চল বললেই চলা যায় না। অন্য সব মেয়ের দল এসে ততক্ষণে রঙ্গীকে ঘিরে ধরেছে, কারোরই কৌতূহলের শেষ নেই। অসহায়ভাবে সুলোচনার মনে হল, এই ভিড়ের মধ্যে থেকে মেয়েকে উদ্ধার করে সে বুঝি আর বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না।

এমন সময় আসতে দেখা গেল সুবলকে। একটু দূর থেকেই সুবল ধমকের সুরে বলল, 'আবার জটলা পাকানো হচ্ছে। যাও, বাড়ি যাও সব।' তারপর মানদাকে লক্ষ্য করে বলল, 'বউঠান, রঙ্গীকে নিয়ে একবার এস তো এ ঘরে।'

মানদা মাথার কাপড় টেনে দিয়ে অনুচ্চ কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'তদন্ত তল্লাসের কোন দরকার নেই আমাদের, অমনিতেই যথেষ্ট হয়েছে। চল্ রঙ্গী, বাড়ী যাই আমরা।'

সুবল বলল, 'আঃ, কেন মিছে রাগ করছ বউঠান, শুনতেই দাও না আগে ব্যাপারখানা। কোন অন্যায় যদি হয়ে থাকে তার বিধান কি করব না আমরা? কাউকে খাতির করে কথা বলবে, সুবল সা তেমন লোকই নয়।'

ঘর একখানাই, কিন্তু তার মধ্যে তিন চারটে প্রায় খোপ। দুধারে বারান্দা আছে, বারান্দায় ছোটবড় তিনটে করে খোপ। মনে হয়, বিনোদের বাবা যেন অনেকগুলি ঘরের সাধ এই একখানা ঘর তুলে মিটিয়েছিল। এই একটা উত্তরের ভিটা ছাড়া সরিকী অংশে আর কোন স্থান মেলে নি বিনোদের। বড় ঘরের কানাচ দিয়ে পাক করবার জন্য আর একটু চালার মতো কোন রকমে কেবল তোলা হয়েছে। ঘরে দামী আসবাব-পত্রের অভাব থাকলেও হাঁড়িকুড়ি আর দড়ির সিকের অভাব নেই। বিনোদের বাবা যেমন অনেক ঘরের শখ মিটিয়েছিল একখানা ঘর তুলে তেমনি বিনোদের মা আর বউয়েরও বোধ হয় আসবাব-পত্রের সাধ মিটাতে হয়েছে নানা আকারের হাঁড়িকুড়ি জড় করে, আর নানান রঙবেরঙের সিকে তৈরী করে।

রঙ্গীকে নিয়ে সুবল ঘরে ঢুকতেই উপস্থিত সকলের মনে হল—যত তাচ্ছিল্য করে তার নাম উচ্চারণ করছিল নবদ্বীপ, তত তুচ্ছ করবার মতো মেয়ে এ নয়। মধু সার মেয়ে যে এত সুন্দরী, এটা যেন হঠাৎ আজ সকলের চোখে পড়ল। পনর-ষোল বছরের একটি বিবাহিত মেয়ে—সিঁথিতে সিঁদুর জলজ্বল করছে। কিন্তু এই সিঁদুর স্নিগ্ধ মাঙ্গল্যের চেয়ে তার প্রসাধনের উগ্রতাই যেন বাড়িয়ে তুলেছে। কোন এক রহস্য রাজ্যের যেন সন্ধান পেয়েছে এই মেয়েটি, কোন এক ঐশ্বর্য সম্ভারের, যার জন্য তার অহঙ্কার যেন সর্বাঙ্গে ফুটে বেরুতে চাচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে বোধ হয় মনে মনে সম্পর্কের হিসাব করে নবদ্বীপ বলল, 'মধুর মেয়ে বুঝি তুমি—তাই বলো। রেবতীর ছেলে মধু আমার নাতি হয় সম্পর্কে। খুব দুরের নয়। এখনো চার পুরুষের মধ্যে আছে। আমার ঠাকুরদার সঙ্গে ওর ঠাকুরদার বাবা বাড়ির অংশ নিয়ে ঝগড়া করে ওই আলাদা ভিটেয় গিয়ে ঘর তুলেছিল। বাবার কাছে গল্প শুনেছি। কিন্তু দুরে গিয়ে ঘর বাঁধলেই কি আর আত্মীয়-স্বজন দুরে সরে যেতে পারে। তবে আর রক্তের টানের কথা বলে কেন লোকে, পূর্বপুরুষে যা করেছে করেছে, মধুর বাবার সঙ্গে কোন দিন আমার অসম্প্রীতি ছিল না, বরং বেশ ভক্তিশ্রদ্ধা করত। মধুও হয়েছে তেমনি। বেশ লোক, কারোর সাতে-পাঁচে নেই আর এমন খাটিয়ে ছেলে পাড়ায় আর কাউকে দেখবে না তোমরা। এখন ভাগ্যে যদি বেড় না পায়, তাহলে আর কি করবে।

যাকগে বিষয়টা কি হয়েছিল মা—বল দেখি। আমার কাছে আবার লজ্জা কিসের তোমার!'

এ কথায় মাথা নীচু করে মেয়েটি মুচকি হাসল। এ হাসির অর্থ ভালো করে যেন বুঝতে পারল না নবদ্বীপ। একটু পরেই নবদ্বীপ আবার অসঙ্কোচে বলে চলল, 'বুঝতে পারছি, পথ দিয়ে আসতে আসতে তোমাকে দেখে ঠাট্টা পরিহাস করতে গিয়েছিল বোধ হয় মুরলী। ওর ওই অভ্যেস। আসলে লোক যে তত খারাপ তা নয়, কিন্তু ঠাট্টা পরিহাস করতে গিয়েই যত বদনাম রটেছে ওর পাড়ায়। মাত্রা রাখতে জানে না। কিন্তু তোমার সঙ্গে তো ওর দাদু-নাতনী সম্বন্ধ। বাড়াবাড়ি করতে যদি গিয়েই থাকে, মলে দিলে না কেন কান। হতভাগা কোথাকার', বলে নবদ্বীপ হেসে উঠল। দু-একজন জোর করে ঠোঁটের ওপর একটু হাসি টানতে চেষ্টা করলেও বাকি কয়েকজন সে চেষ্টাটুকুও পর্যন্ত করল না, তাও অবশ্য দৃষ্টি এড়াল না নবদ্বীপের। কিন্তু বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ নেই। ব্যাপারটার এখানেই যেন শেষ হয়ে গেছে; এরপর আর কিছু বাকি থাকতে পারে না, এমনিভাবেই নবদ্বীপ উঠে পড়ল। 'যাও বেশ রাত হয়ে গেছে, বাড়ি যাও এখন মা-জ্যেঠির সঙ্গে। কিছুর মধ্যে কিছু না, মিছেমিছি এমন কীর্তনটাই তোমার মাটি হয়ে গেল বিনোদ! ভগবান গলা সত্যি দিয়েছিলেন বটে তোমাকে। জিজ্ঞেস করে দেখ সুবলকে, কীর্তন শোনবার জন্য ওকে আমি বেলা দুপুর থেকে কেবল তাড়া দিচ্ছিলাম। কিন্তু যত রাজ্যের বিভ্রাট দেখ তো। আমার নেই ভাগ্য তা তুমি করবে কি। লোকের স্বভাব যে তিলকে তারা তাল করে তুলবেই। তাদের জ্বালায়—' বলে নন্তুর মার দিকে একটু কটাক্ষ করল নবদ্বীপ। প্রত্যুত্তরে নন্তুর মা কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুবল তাকে জোর করে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আর কথা নয় জ্যেঠি, বাড়ি যাও, রাত যথেষ্ট হয়েছে।'

লাঠি তুলে নিয়ে নবদ্বীপ বলল, 'হ্যাঁ রাত বেশ হয়েছে, কি রকম অন্ধকার দেখেছ, আলোটা ধরে আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে কে? সুবল যাবে? আচ্ছা থাক, দরকার নেই, যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে তোমার। বিনোদ তুমিই বল তো কাউকে আলোটা একটু ধরবে সঙ্গে সঙ্গে।'

বিনোদ বলল, 'চলুন, আমিই যাচ্ছি।'

সুবল বলল, 'থাক না, বিনোদ তোমার আর কষ্ট করতে হবে না, আলো তো আমার সঙ্গেই আছে। জ্যেঠামশাইকে এগিয়ে দিয়ে একটু ঘুরেই যাব না হয়।'

নবদ্বীপ বলল, 'কীর্তন এভাবে ভেঙে যাওয়ার জন্যে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে বিনোদ। আচ্ছা ভগবান যদি শুনতে দেন কোনদিন, নিজের বাড়িতে বসেই একদিন কীর্তন শুনব তোমার।'

বিনোদ সবিনয়ে মাথা নাড়ল।

৪

নবদ্বীপকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সুবল ফিরে গেল গম্ভীর মুখে। চটি জুতার শব্দ করতে করতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল নবদ্বীপ। ঘরখানা অন্ধকার। ঢুকতে ঢুকতে নিজের মনেই বিড়বিড় করে নবদ্বীপ বলতে লাগল, 'গুঁতো-টুতো খেয়ে কোনদিন যে পড়ে মরি তার ঠিক কি। কপালে শেষ পর্যন্ত তাই আছে আমার। এখান থেকে এখন সরে যাওয়াই আমার ভালো! এতখানি রাত হয়েছে, ঘরে সন্ধ্যেটা পর্যন্ত দেওয়ার সময় হয় নি কারো। কত কাজ। দিন রাত তো দেখি কেবল গুজগুজ আর গুজগুজ।'

গুজগুজ করবার মতো মনের অবস্থা আজ ছিল না মনোরমার। মেয়েকে নিয়ে কীর্তন শুনতে সেও গিয়েছিল বিনোদের বাড়ি। সেখানকার কাণ্ড সে প্রত্যক্ষ করে এসেছিল। পাছে সবাইয়ের কৌতুক এবং অনুকম্পার বস্তু হতে হয় এই ভয়ে আগেই মেয়েকে নিয়ে সে সরে পড়েছিল। ফিরে এসে দেখে, মুরলী তার আগেই এসে বসে আছে বারান্দায়।

'মারের ভয়ে গর্তে এসে লুকিয়েছ বুঝি? লজ্জা করে না মুখ দেখাতে। দড়ি জোটে না গলায় দেওয়ার মতো। লোকের কাছে আর মুখ দেখাতে পারি না আমি।' মনোরমা ঝাঁজিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু অদ্ভুত সহিষ্ণুতা মুরলীর। শরীরে যেন তার রাগ নেই একেবারে। এই নিক্রোধ ইদানীং এত বেড়েছে যে স্ত্রীর রাগের উত্তরে প্রায়ই সে রসিকতা করে।

মুরলী বলল, 'তাই তো, এমন সুন্দর মুখ লোককে ডেকে দেখাতে পার না, বড়ই দুঃখের কথা তো।'

মনোরমা অবাক হয়ে যায়। এই কিছুক্ষণ আগে যে-লোক এমন একটা অপকর্ম করে এসেছে এবং ধরা পড়ে অপমানের একশেষ হয়েছে, সে কি করে এমনভাবে হাসি-তামাসা করতে পারে! চক্ষুলজ্জা বলতে কি এক ফোঁটা পদার্থ নেই মানুষটার শরীরে!

শ্বশুরের পায়ের শব্দ আর বিড়বিড় বকুনি শুনে কমিয়ে রাখা হ্যারিকেনের আলোটা আর একটু চড়িয়ে দিয়ে সেটা হাতে করে এ-ঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল মনোরমা। নবদ্বীপের কথা তার কানে গিয়েছিল। অবশ্য কানে যাতে যেতে পারে সেদিকে নবদ্বীপেরও লক্ষ্য ছিল। মনোরমা এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'অন্ধকারে ঢোকেন কেন এসে ঘরে? আপনার পকেটেই দেশলাই থাকে। একটা কাঠি জেলে নিলেই তো পারেন।'

নবদ্বীপ বলল, 'হুঁ, বিড়িটা-সিড়িটা ধরাবার জন্য একটা মাত্র দেশলাই আমার কাছে থাকে, তাই বা সহ্য হবে কেন? একবেলা যে একমুঠো মুখে দিই বাড়িতে বাড়িতে এসে, তাও এদের দু চোখের বিষ। নিজে উপোস করে থেকে তোমাদের গুষ্টির পিণ্ডি যোগাতে পারলেই ভালো হয়, না?'

কোথায় দেশলাইয়ের কাঠি, আর কোথায় বা উপোস করে থাকা। অবশ্য নিজের দেশলাইটার ওপর চিরদিনই একটু বেশি মমতা আছে নবদ্বীপের, পারতপক্ষে একটা কাঠিও সে খরচ করতে চায় না। তার সমস্ত কার্পণ্য এই দেশলাইতে এসে চরমে উঠেছে। এটা বহুদিন মনোরমা কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু কৌতুক বোধ করবার মতো মনের অবস্থা সব সময় থাকে না। তা ছাড়া একেক সময় মনোরমার মনে হয় যে, ইচ্ছা করেই নবদ্বীপ এই দেশলাইয়ের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। একটা দেশলাইয়ের জন্য সত্যি সত্যিই কি অত মমতা থাকতে পারে লোকের! নবদ্বীপের ঘরে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে সেটা কমিয়ে রেখে যাবারও উপায় নেই। ঘরে ঢুকে হ্যারিকেনের আলো জ্বলতে দেখলেই নবদ্বীপ রেগে ওঠে, 'তেল খুব সস্তা হয়েছে বুঝি বাজারে?'

কেরোসিনের ডিবাও জ্বালিয়ে রাখা যায় না। সেটা আরো দপ দপ করে জ্বলে। নবদ্বীপ বলে, 'নবাবের বেটি কোথাকার। রাস্তা থেকে ওর রোশনাই দেখা যায়। আক্কেল দেখ, এমন আগলা ভাবে আলো কেউ জ্বালিয়ে রাখে ঘরের মধ্যে, ঘরদোর না পুড়িয়ে ও ছাড়বে না।'

মহামুস্কিল হয়েছে মনোরমার বুড়ো শ্বশুরকে নিয়ে। তার ঘরে আলো জ্বালালেও দোষ, না জ্বালালেও দোষ।

হ্যারিকেন হাতে নীরবে মনোরমা ঘরে গিয়ে ঢুকল। গাড়ু আর গামছা ছিল দরজার একটা পাল্লার আড়ালে, তা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'হাত-মুখ ধুয়ে আসুন। আমি পাকের ঘরে যাচ্ছি।'

মনোরমা চলে যাবার উদ্যোগ করতেই নবদ্বীপ বাধা দিয়ে বলল, 'শোন।'

মনোরমা ফিরে দাঁড়ালে নবদ্বীপ বলল, ‘ওর জন্য আমাকে কি এখন দেশত্যাগী হতে বল তোমরা? আমি যতক্ষণ, তারপর একবার চোখ বুজলে হাড়গোড় ভেঙ্গে ওকে যদি লোকে রাস্তায় ফেলে না রাখে তো কি বলেছি আমি।’

মনোরমা বলল, ‘সে যা হবার হোক, আমি আর কিছুর মধ্যে নেই আপনাদের। আমাকে দিয়ে আসুন রসুলপুরে। চোখের ওপর কতকাল আর মানুষ এসব সহ্য করতে পারে।’

নবদ্বীপ বলল, ‘আমি করছি কি করে! আমার কথাটা একবার ভেবে দেখ দেখি, কত শান্তি আমার মনে।’

বহুদিন বাদে পুত্রবধুর সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গভাবে কথা বলবার অবকাশ এসেছে নবদ্বীপের। অনেকদিন ধরে মনোরমা যেন বহু দূরে সরে ছিল। স্বামীর স্বভাবের সঙ্গে ইদানীং বেশ একটা বনিবনাই যেন করে নিয়েছিল মনোরমা। যা কোনদিন সারবে না তার জন্য ক্ষোভ করে আর অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কি। কিছুতেই যেন কিছু এসে যায় না, এসব অনাচার কদাচারে কোনরকম আপত্তিই যেন মনোরমার নেই, এমনি সহিষ্ণুতাই সে অভ্যাস করছিল। এসব ঘটনা একটু আধটু মাঝে মঝে ঘটা সত্বেও মনোরমা মুরলীকে আদর-যত্নের ত্রুটি করত না, বরং ইদানীং তার সোহাগটা নবদ্বীপের কাছে যেন বেশ একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হত। বয়সের সময় খুব মান-অভিমান, কপাল চাপড়াচাপড়ি করে এখন পীরিতের জোয়ার এসেছে মনোরমার মনে। অথচ নবদ্বীপের এতে খুশি হওয়াই উচিত ছিল। প্রথম থেকে মনোরমাকে এই ধরণের নির্দেশ উপদেশই তো সে দিয়ে আসছে।

‘আমি পুরুষমানুষ, সব কথা তো তোমাকে বলতে পারি নে বউমা, তোমার শাশুড়ী থাকলে বলতে পারত, শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে পারত। মেয়েমানুষের অত তেজ, অত জেদ কি ভালো বউমা, মেয়েমানুষের মনের আগুন মনেই রাখতে হয়, বার করে দিলে তাতে নিজের কপালই আগে পোড়ে। পুরুষমানুষ, বার-টান যদি একটু থাকেই, তুমি যা করছ তাতে তো ও আরো ঘরের বার হয়ে যাবে। ওকে যদি ঘরমুখী করতে চাও, ঘরের দিকে ওর টান যাতে বাড়ে সেদিকে তোমার মন দিতে হবে। বরং সাধারণে যেমন করে তার চেয়ে বেশি আদর-যত্ন করতে হবে, ওর খেয়াল মতো, খুশি মতো চলতে হবে। নিতান্ত ছোটটি তো নও, এসব তোমাকে বলে দিতে হবে কেন! শেখাতেই বা তোমাকে হবে কেন।’

কিন্তু শেখাবার প্রয়োজন তেমন না থাকলেও, শেখাবার দিকে বেশ ঝোঁকই ছিল নবদ্বীপের। ঘরে আর কোন লোক ছিল না। নবদ্বীপের এক বোন

ছেলেপুলে নিয়ে নিজেই বর্ষার সময় নৌকা করে এখানে বেড়াতে আসত। এসে দু-একদিনের বেশি থাকতে পারত না। বড় সংসার, অনেক দায়িত্ব, অনেক কাজ। নবদ্বীপের পক্ষ থেকেও খুব যে বেশি গরজ দেখা যেত বোনকে রাখবার জন্য তা নয়। মুরলী যখন বাইরে বাইরে থাকত, বেশি রকম বাড়াবাড়ি করত, নবদ্বীপ মনোরমাকে নিজের কাছে ডেকে আনত। নানারকম কথা বলে বোঝাতে চেষ্টা করত, সান্ত্বনা ভরসা দিত। নিজের ছেলের ব্যবহারের জন্য মনোরমার কাছে লজ্জার যেন শেষ ছিল না নবদ্বীপের। নবদ্বীপ যেন নিজে অগাধ স্নেহ দিয়ে এবং স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ কাপড় গয়না দিয়ে সেই লজ্জা খানিকটা ঢাকতে চেষ্টা করত। মাঝে মাঝে ছেলের পক্ষ নিয়ে কথা বললেও নবদ্বীপের আন্তরিকতা মনোরমাকে আকৃষ্ট করেছিল। একই দুঃখ এবং অশান্তিভোগের মধ্যে দিয়ে পরস্পরের ওপর তারা সহানুভূতিশীল হয়ে উঠত। ক্রমে ক্রমে এমন হল যে, বয়সের বাধা ডিঙিয়ে নবদ্বীপ আর মনোরমার সম্পর্ক যেন বন্ধুত্বের পর্যায়ে এসে পৌছল। সমস্ত বৈষয়িক পরামর্শ চলে মনোরমার সঙ্গে, এমন কি, কি ভাবে কতটুকু শাসনের দ্বারা মুরলীর স্বভাবচরিত্র বদলানো যেতে পারে, কি কি উপায় অবলম্বন করা যায়, সে-সব পরামর্শও নবদ্বীপ করত মনোরমার সঙ্গে। এমন ভাবে কথা বলত নবদ্বীপ যে মুরলী তার নিজের কাছে যেমন শিশু, মনোরমার কাছেও যেন তেমনি। নবদ্বীপের মুরলীকে শাসনের যেমন অধিকার আছে, মনোরমারও যেন তেমনই। নবদ্বীপের কথাবার্তায়, সস্নেহ ব্যবহারে দুঃখটাকে আর যেন তেমন দুঃখ বলে মনে হত না মনোরমার। নবদ্বীপ তার সম অংশ গ্রহণ করায় দুঃখের ভার বরং লঘু হয়ে পড়ত। এত বড় যে দুর্ভাগ্য, তাও অনেক সময় উপভোগ্য হয়ে উঠত, মনোরমার কাছে। নবদ্বীপ মুরলীর ছেলেবেলার গল্প করত। তখন থেকেই যে অস্বাভাবিক দুরন্ত ছিল মুরলী, মাঝে মাঝে তার সরস বর্ণনা শোনাত মনোরমাকে।

'ছেলেবেলা থেকেই ও অমনি। মাত্র সাত-আট বছর যখন বয়েস তখনই লুকিয়ে লুকিয়ে ও হুঁকো টানত। একদিন আমার চোখে পড়ে গেল। মনে করিস না মা-মরা ছেলে বলে আমি কেবল আহ্লাদই দিয়েছি ওকে। মাঝে মাঝে এমন শাসন করতাম যে পাড়াপড়শীর বউ-ঝিরা পর্যন্ত চোখের জল ফেলত। বলত, ছেলেটাকে কি মেরে ফেলবে? এক-একদিন সত্যিই আধমরা করে শ্বাসমাত্র রেখে ছেড়ে দিতাম, এমন কড়া ছিল আমার শাসন। তামাক খাওয়ার জন্যে কত শাস্তি কতবার ওকে দিয়েছি শুনবি? প্রথম প্রথম ধমক, চোখ রাঙানো, মারধোর খুব চলল, কিছুতেই কিছু হয় না, শেষে একদিন কাঠিতে করে গোবর তুলে দিলাম ওর

মুখে পুরে তারপর হুঁকো আর কল্কে গলায় বেঁধে কান ধরে ঘুরিয়ে আনলাম পাড়া ভরে। তবু কি লজ্জা হল?'

মুরলীর অপূর্ব বেশ মনে মনে কল্পনা করে মনোরমা হেসে উঠেছিল, 'তবু তো তামাক খাওয়া ছাড়াতে পারেন নি।'

নবদ্বীপও সহাস্যে নিজের শাসনের ব্যর্থতা স্বীকার করে বলেছিল, 'না, পারলাম আর কই, যা ও একবার ধরে তা কোনদিনই ছাড়ে না; ওর ওই স্বভাব।'

দুজনের সেই হৃদ্য সম্বন্ধ কেমন করে যে চিড় খেয়ে গেল, কেমন একটু একটু করে মনোরমা দূরে সরে গেল, তা নবদ্বীপ বুঝে উঠতে পারল না। নদীর মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের মধ্যেও জোয়ার ভাঁটার টানে মনোরমা যখন দূরে সরে গেল, নবদ্বীপের স্নেহ-সহানুভূতির প্রয়োজন তার পক্ষে যত কমে আসতে লাগল, নবদ্বীপ মনে মনে তত ক্ষুব্ধ হল, ক্রুদ্ধ হল, কিন্তু আর কিছু করতে পারল না। মেয়ে হবার পর থেকে মনোরমার মনোনিবেশের আর এক বস্তু বাড়ল। মেয়েকে খাওয়াতে পরাতে সাজাতেই তার সময় কাটে। তেমন আর নিঃসঙ্গ বোধ করে না মনোরমা। মেয়ের মধ্যেই তার আনন্দ আর কল্পনা মুক্তি লাভ করে। তাছাড়া স্বামীর দিকেও বেশ ঘেঁষে এল মনোরমা। মুরলীর উচ্ছৃঙ্খলতার বেগ কমতে থাকায় মুরলীও অনেকখানি লভ্য হয়ে এল। তাছাড়া বাইরের টান যতই মুরলীর থাকুক, সে যখন ভালোবাসে তখন গভীরভাবেই ভালোবাসে—একথা মনোরমার বুঝতে বাকি রইল না। আদরে উচ্ছ্বাসে সেইসব মুহূর্তে মনোরমাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় মুরলী। নিবিড় সান্নিধ্যের জন্য নিজের সঙ্গে যেন নিশ্চিহ্ন করে মিশিয়ে ফেলবে মনোরমাকে, পিষে মেরে ফেলবে। কোন ব্যবধান থাকতে দেবে না, মনোরমা লীন হয়ে যাক মুরলীর অণু-পরমাণুর মধ্যে। তখন কি কেউ কল্পনাও করতে পারে, মুরলী আরো অনেক নারীকে এমন নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করতে পারে!

নবদ্বীপ কিছু বলে না। ভাবে, মেয়েমানুষ এমনি স্বার্থপর। এখন সময় পেয়েছে কি না, তাই বুড়ো শ্বশুরের সেবা-শুশ্রূষার কথা একবার মনেও পড়ে না। এখন স্বামী আর মেয়েই তার সব। কিন্তু এই যে আদর-সোহাগ কার দৌলতে, বুড়ো বয়স পর্যন্ত উদয়াস্ত পরিশ্রম করে খাইয়ে বাঁচাচ্ছে কে, এত বাবুগিরি বিলাসিতা কার পয়সায়? একটা পয়সাও কি কোনদিন আয় করে দেখেছে মুরলী! তার নিজের এত সাজ-সজ্জার বহর, বউয়ের ভারি ভারি গয়না, এমন কি মেয়ের গলার ধুকধুকিখানা পর্যন্ত নবদ্বীপের টাকায়। অথচ সেই নবদ্বীপ আজ নিতান্তই

একজন বাইরের লোক, কারো লক্ষ্য নেই, কারো মমতা নেই তার ওপর, সে কেবল টাকা যোগাবার যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এমনই সংসারের নিয়ম।

আজ আবার বহুদিন বাদে শ্বশুরের অস্তিত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার কথা মনে পড়ছে মনোরমার। তার সতেজ অভিযোগের ভঙ্গিতে যে হতাশা এবং করুণ আর্ততা ফুটে উঠল, তার মধ্যে সেই পুরনো ঘনিষ্ঠতার যেন খানিকটা আভাস পেল নবদ্বীপ। তবু সহজে নবদ্বীপ ধরা দিল না, পরম উদাসীনভাবে বলল, 'সে কি কথা, ঘরদোর সংসার গেরস্থালী সবই তো এখন তোমাদের। আমি আর কে, আমারই বরং তোমাদের কোন কিছুর মধ্যে এখন আর থাকা উচিত নয়। বাকি কটা দিন কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই হল।'

এসব যে নবদ্বীপের অভিমানের কথা, তা মনোরমার বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু কেন এই অভিমান! সাধ্যমতো এখনো মনোরমা শ্বশুরের সেবা-পরিচর্যা করে, খোঁজখবর, তত্ত্বতল্লাস নেয়। তবু কেন যে নবদ্বীপের মন ওঠে না, তা বুঝতে পারে না মনোরমা। মাঝে মাঝে এও মনে হয়, বুড়ো হলে মানুষের স্বভাব এমনই খুঁতখুঁতে হয়ে পড়ে। সব সময়েই বুড়োমানুষের মনে মনে আশঙ্কা থাকে, এই বুঝি তাকে কেউ গ্রাহ্য করল না অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা করে চলে গেল। ছেলেমানুষ যেমন স্নেহের কাঙাল, বুড়োমানুষও তেমনি শ্রদ্ধা কুড়োতে ভালোবাসে। না হলে নবদ্বীপ তো জানে এখনো সংসারের সে-ই সর্বময় কর্তা, তাকে যত্ন করবে না, তার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাবে, এমন সাধ্যই কারো নেই, তবু তার মর্যাদা হারাবার এমন আশঙ্কা কেন, আদর-যত্নের জন্য কেন এমন কাঙালপনা!

মনোরমা কিছুক্ষণ চুপ করে তার প্রথম কথার পুনরাবৃত্তি করে, 'রাত হয়ে গেছে, হাতমুখ ধুয়ে রান্নাঘরে আসুন, আমি ভাত বাড়ি গিয়ে।'

খেতে বসে নবদ্বীপ জিজ্ঞাসা করে, 'মুরলী খেল না?'

মনোরমা ঘাড় নেড়ে জানায়, মুরলী আগেই খেয়ে নিয়েছে। সাধারণত সন্ধ্যার একটু পরেই রাত্রের খাওয়া সেরে নেওয়া মুরলীর অভ্যাস। আর নবদ্বীপের ঠিক তার উল্টো। কারবার-পত্র, নানারকম দরবার-পরামর্শ সারতে সারতেই তার অনেক রাত হয়ে যায়। তবু মনে মনে নবদ্বীপ প্রত্যাশা করে, মুরলী তার জন্য প্রতীক্ষা করবে। কথা বলতে বলতে খেতে তার ভালো লাগে। কিন্তু মুরলী আর সে একই সময় পাশাপাশি বসে খাচ্ছে, এমন ভাগ্য নবদ্বীপের খুব কমই হয়। এ নিয়ে মনে মনে বেশ ক্ষোভও আছে নবদ্বীপের। মাঝে মাঝে মুরলীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'পুরুষমানুষ যে অত সকাল সকাল কি করে খায়, আমি ভাবতেই

পারি না।' কিন্তু নবদ্বীপের এসব কথা আজকাল গায়ে লাগে না মুরলীর। বাপের প্রায় কোন মন্তব্যেই আর কান দেয় না মুরলী। প্রতিবাদও করে না। এই ঔদাসীন্যই নবদ্বীপকে সব চেয়ে বেশি আঘাত করে।

নবদ্বীপ বলল, 'আর ললিতা? সে খেয়েছে তো, না না-খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে?'

মনোরমা জবাব দিল, 'সেও খেয়েছে তার সঙ্গে।'

নবদ্বীপের মনে পড়ল মুরলীর ভারি বাধ্য মেয়ে হয়েছে ললিতা, বাপকে ভারি ভালোবাসে। ভাগ্য ভালো মুরলীর। সন্তান অবাধ্য হলে যে কি দুঃখ পেতে হয় তা তাকে টের পেতে হল না।

খেতে খেতে নবদ্বীপ বলল, 'তা হলে তুমিই বুঝি শুধু বাকি আছ?'

মনোরমা কোন জবাব দিল না।

নবদ্বীপ বলল, 'আমার ভাত বেড়ে রেখে খেয়ে নিলেই পার কাজকর্ম সেরে, কখন কোন সময়ে ফিরব তার ঠিক নেই, অত কষ্ট করবার দরকার কি।'

মনোরমা জানে এটা নিতান্তই নবদ্বীপের মুখের কথা। বাড়ির একজন মানুষ বাকি থাকতে যে কোন মেয়েমানুষ আগে খেয়ে উঠবে, একথা নবদ্বীপের পক্ষে ধারণায় আনাই কষ্টকর।

নবদ্বীপ এক ঢোক জল খেয়ে নিল, 'কিন্তু বললে কি হবে, ওটা তোমাদের মেয়েমানুষের স্বভাব। তোমার শাশুড়ীও অমনি ছিল। কতদিন বলে গেছি, আমার রাত হবে, তুমি খেয়ে নিও; একদিনও আমার আগে সে খায় নি। কিন্তু তুমি তো ছেলেমানুষ তোমার খেয়ে নিতে তো কোন দোষ নেই।'

মনোরমার মনে হয়, নবদ্বীপ যেন হঠাৎ অত্যন্ত উদার এবং স্নেহশীল হয়ে উঠেছে।

'ছেলেমানুষ!', মনোরমা একটু হাসতে চেষ্টা করে।

'না, ছেলেমানুষ কিসের, তুমি একেবারে বুড়ি হয়ে গিয়েছ। বুড়ি বললেই বুঝি খুশি হও?'

খাওয়া শেষ করে নবদ্বীপ উঠে পড়ে। জলের ঘটিটা শ্বশুরের হাতে তুলে দেয় মনোরমা। এই কিছুক্ষণ আগে যে লজ্জাকর ব্যাপারটা ঘটে গেল বিনোদের বাড়িতে, তার জন্য যতখানি বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হবার কথা ছিল নবদ্বীপের, তার কিছুই তো তার কথাবার্তায় টের পাওয়া যাচ্ছে না। বরং নবদ্বীপকে বেশ খানিকটা খুশি বলেই মনে হচ্ছে। অথচ এতখানি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবার,

অমন খুশি হয়ে ওঠবার কী এমন ঘটল। মনোরমা অবাক হয়ে ভাবে।

মুখ ধুয়ে এসে নবদ্বীপ বলল, 'যাও, আর দাঁড়িয়ে থেক না, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড় গিয়ে।'

মনোরমা বলল, 'আমি আর খাব না, ক্ষিদে নেই তেমন।' তারপর বোধ হয় একটু ইচ্ছাকৃত দরদ দেখিয়েই বলল, 'যাই আপনার বিছানা ঝেড়ে দিয়ে আসিগে।'

নবদ্বীপের কণ্ঠ আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠল, 'পাগলী মেয়ে, ক্ষিদে নেই না আরো কিছু। রাগ করে না খেয়ে থেকে নিজের আত্মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি। ওসব চালাকি চলবে না, তুমি খেতে বসবে তবে আমি যাব, এই দাঁড়িয়ে রইলাম আমি দরজার সামনে। যাও, খেতে বস গিয়ে।'

একটু যে দেখানো বাড়াবাড়ি ভাব আছে নবদ্বীপের কথায় তা বেশ বোঝা যায়। তবু এই স্নেহটুকু ভালো লাগল মনোরমার। মিষ্টি কথা মৌখিক হলেও শুনতে তো মিষ্টিই লাগে। তাছাড়া একেবারে মৌখিকই বা হবে কেন, শাশুড়ী নেই, জা নেই ; কিন্তু এসব যে মনোরমার নেই এবং এসবের অভাব যথাসম্ভব মিটানো দরকার, তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার, অমন বৈষয়িক পুরুষমানুষ হয়েও সেকথা তো নবদ্বীপের মনে রয়েছে। মনোরমার সুখ-সুবিধার জন্য চেষ্টাও করেছে নবদ্বীপ এক সময়, সেকথা মনোরমার যেন নতুন করে আজ আবার মনে পড়ল।

নবদ্বীপ দাঁড়িয়েই আছে দেখে মনোরমা বলল, 'আপনার আর কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, ঘরে যান।'

'খেতে বস আগে।'

'বললাম যে ক্ষিদে নেই।'

'আবার বলে ক্ষিদে নেই।' নবদ্বীপ সস্নেহে ধমক দিল।

মনোরমা একটু হেসে একখানা থালা নিয়ে হাঁড়ি থেকে ভাত বাড়তে বসল নিজের জন্য।

৫

খেয়ে দেয়ে রান্নাঘর গুছিয়ে মনোরমা একবার নিজের ঘরে ঢুকল, তারপর আস্ত একটা পান মুখে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মুরলী চুপচাপ শুয়ে

শুয়ে সব লক্ষ্য করল আর মনে মনে একটু হাসল। যেদিন এসব কাণ্ড করে বসে মুরলী সেদিন স্বামীর প্রতি ঔদাসীন্য আর শ্বশুরের ওপর মনোযোগ বেড়ে যায় মনোরমার। যেন এমনি করেই মুরলীর ব্যবহারের সে প্রতিবাদ করতে চায়। মুরলী চুপ করে থাকে, বিন্দুমাত্র ঈর্ষাও সে প্রকাশ হতে দেয় না। সে জানে তাহলে মনোরমা আরও সুবিধা পেয়ে যাবে। যদি সে জানতে পারে এতে মুরলী মনে মনে ঈর্ষা বোধ করে, তাহলে এই উপায়টা মনোরমা আরও বেশি করে অবলম্বন করবে। তার চেয়ে চুপ-চাপ থেকে ঔদাসীন্যের জবাব ঔদাসীন্যে দেওয়া অনেক ভালো। মনোরমাকে বুঝতে দেওয়া ভালো যে তার রাগ-অনুরাগে অবজ্ঞা-আদরে কিছুই এসে যায় না মুরলীর। তা ছাড়া এই মুহূর্তে মনোরমার মনোভাব নিয়ে মাথা ঘামাবার সত্যিই মুরলীর অবসর ছিল না। মনোরমা কখন নেপথ্যে সরে গিয়েছিল, তার স্থানে রঙ্গীর উজ্জ্বল মুখ উজ্জ্বলতর হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল মুরলীর। কি অদ্ভুত উত্তেজনাময় অনুভূতি। এমন তীব্রতার স্বাদ বহুদিন যেন মুরলী ভুলে ছিল, কিংবা কোনদিনই যে এ স্বাদ সে পেয়েছে এই মুহূর্তে সে-কথা মুরলীর মনে পড়তে চায় না।

মনোরমা যা-ই বলুক মুরলী সত্যি সত্যিই বুড়ো হয়ে পড়ে নি, এমনকি দেহে মনে সামান্য প্রৌঢ়ত্বের লক্ষণও দেখা যায় নি মুরলীর। কামনার এই উগ্র উন্মত্ততাই তার প্রমাণ। অপরিণামদর্শী উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে নিজের যৌবনকে যেন আবার নতুন করে অনুভব করে মুরলী।

কোন সম্মানহানির ভয়, কোন ভবিষ্যৎ কেলেঙ্কারির ভয়ই তাকে নিরস্ত করতে পারে নি। অত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব করে, ভেবে-চিন্তে পা ফেলতে পারে না মুরলী, মেয়েদের মন বোঝবার তার সময় হয় না, দরকারও হয় না। এই যে কোনরকম অবকাশ না দিয়ে নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্তে রঙ্গীকে সে নিজের বুকের মধ্যে উন্মত্তভাবে জড়িয়ে ধরেছিল এর মধ্যে যে দুঃসাহসিকতা আছে, মন বোঝা-বুঝি করতে গেলে তা পাওয়া যেত না। শুধু কামনার উগ্রতাই নয়, এর মধ্যে নিজের শারীরিক পরিচয় পেয়েও খুশি হয় মুরলী। কোন মেয়ে স্বেচ্ছায় সলজ্জে এসে তার কাছে আত্মনিবেদন করেছে এমন ভাগ্য খুব কমই ঘটেছে মুরলীর। অত সময় নেই, অত সহিষ্ণুতা নেই তার। স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ ঠিক প্রথমেই তার কাছে কেউ করে নি। সে ছিনিয়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে জোর করে। আজও রঙ্গী যখন ছোট পাখীর মতো তার বাহু বেষ্টনীর মধ্যে ছটফট করছিল তখন চমৎকার লাগছিল মুরলীর। নিরীহ আত্মসমর্পণের চেয়ে এ অনেক ভালো।

আত্মসমর্পণ তো শেষে ওরা এক সময় করেই, কিন্তু তার আগে ওদের এই ক্ষণিক বিদ্রোহ দেখবার মতো।

রঙ্গী কিন্তু বেশ চালাক মেয়ে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ লোকের কাছে সে করল বটে, কিন্তু নিজের জাতমান বাঁচিয়ে। মুরলী তাকে বুকের সঙ্গে গাঢ়ভাবে জাপটে ধরে নি। কেবল হাত ধরেছিল। এতে রঙ্গীর নিজের মানও বেঁচেছে, মুরলীর অপরাধও অনেকখানি লঘু হয়েছে। মুরলী মনে মনে হাসল। আর একটু বেশী চালাক যদি মেয়েটা হত তাহলে ওটুকুও আর বলত না। সম্ভবত স্বামীর কাছে এটুকুও গোপন করবার মতো বুদ্ধি তার হবে।

হঠাৎ রঙ্গীর স্বামী অজিত ছোকরার কথা মনে পড়ে গেল মুরলীর। এ গ্রামের জামাই। বেশ বড়লোকের ছেলে, কলকাতায় থেকে ডাক্তারী পড়ছে। এক ছুটিতে শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসেছিল সেবার। অজিত যে তার কথাবার্তায় বেশ মুগ্ধ হয়ে গেল সেকথা মুরলীর বুঝতে মোটেই বাকি ছিল না। বিশেষ করে তার অনিয়মিত, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের আভাস পেয়ে অজিত যেন আরো উল্লসিত এবং আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিল। শুধু আভাস ইঙ্গিতেই সে তৃপ্ত থাকতে চায় নি, বিশদ বিবরণ শোনবার জন্য কী আগ্রহ, কী ঔৎসুক্য তার। আজ যদি এ কাহিনী তার কানে যায়—নিশ্চয়ই যাবে—মুরলীর ওপর তার কি তেমন সপ্রশংস মনোভাব থাকবে, ভক্তজনোচিত আকর্ষণ থাকবে তেমনি, যেমন থাকে বিনোদের প্রতি বিনোদের ভক্তদের ?

কিন্তু বিনোদের যেমন ভক্ত আছে তেমন কি একজনও আছে মুরলীর ? বিনোদের চারপাশে যারা ভিড় করে থাকে তারা যেভাবে শ্রদ্ধা করে বিনোদকে, মুরলীর সাকরেদ দলের কি তেমন মনোভাব আছে মুরলীর ওপর ? মুরলীর মনে হল আর যা-ই করুক তারা তাকে শ্রদ্ধা করে না, সমবয়সী ইয়ার বলেই মনে করে। এই মুহূর্তে বিনোদের মতো সম্মান এবং শ্রদ্ধা পাবার আকাঙ্ক্ষাটা মুরলীর মনে তীব্র হয়ে উঠল।

আর এই মেয়েটি, এই রঙ্গী ? সে-ই বা তাকে কি চোখে দেখবে এর পর ? মুহূর্তের জন্য জোর করে তাকে মুরলী বুকে চেপে ধরেছিল বটে, কিন্তু সব সময়েই তো আর তাকে এমন করে কাছে টানা যাবে না! তার আয়ত্তের বাইরে দূরে দাঁড়িয়ে যদি সে অনুকম্পা এবং অবজ্ঞার হাসি হাসেই, তাহলে কী করতে পারবে মুরলী ? মুহূর্তের দৈহিক সান্নিধ্য লাভ করতে গিয়ে এই মেয়েটির মনে চিরকাল তাকে ঘৃণ্য হয়ে থাকতে হবে।

জীবনে আরো অনেকবার এই ধরনের অনুশোচনায় মুরলী ছটফট করেছে। কিন্তু অনুশোচনায় যথার্থ কোন লাভ হয় না, কোন শিক্ষা হয় না। অনুশোচনাও এক রকমের বিলাস, নিজেকে নিপীড়ন করবার অদ্ভুত আনন্দ। বিশেষত এই ধরনের অনুশোচনা মুরলীকে খানিকক্ষণের জন্য মনমরা করে রাখবার পরেই তাকে আরো হিংস্র উন্মত্ত করে তোলে। শ্রদ্ধা ভালোবাসা যখন সে পাবেই না তখন এই মাংসল আরাম যত বেশী সে পারে আদায় করবে। একটা মেয়ে দূর থেকে বহুদিন পর্যন্ত তার সম্বন্ধে কী ভাব মনে পোষণ করবে সে ভাবনা ভেবে কী লাভ মুরলীর?

শ্বশুরের পরিচর্যা সেরে অনেকক্ষণ পরে ঘরে ঢুকল মনোরমা। এতক্ষণ ওদের কথাবার্তা, আলাপ পরামর্শের ফিসফিস শব্দ মাঝে মাঝে মুরলীর কানে আসছিল। নিজেকে এভাবে অন্যের আলোচ্য বিষয় হিসেবে দেখতে এক এক সময় মন্দ লাগে না। মন্দ লাগে না নিজেকে অন্যের হাতে সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দিতে। শ্বশুর আর পুত্রবধূতে মিলে তার চরিত্র সংশোধনের ভার নিয়েছে ভেবে মুরলীর হাসি পায়। আচ্ছা, সত্যি সত্যিই যদি মুরলী হঠাৎ একদিন সচ্চরিত্র হয়ে ওঠে, বাপের মতো বৈষয়িক হয়ে বিষয়কর্মের দিকে গভীর মন দেয়, তাহলেই নবদ্বীপ কি অবিমিশ্র আনন্দ লাভ করবে? তাহলে এত রাত পর্যন্ত আর কোন বিষয় নিয়ে নবদ্বীপ এমন করে মনোরমার সঙ্গে আলাপ জমাতে পারে? মনে মনে কৌতুক বোধ করে মুরলী।

ঘরে ঢুকে মনোরমা নিজের বিছানা একটু ঝাড়ল। খাটের একপাশে একেবারে বেড়া ঘেঁষে কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে মেয়ে ললিতা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদিকের খাটে মুরলী এইমাত্র পাশ ফিরে যে ঘুমের ভান করল, তা বেশ বুঝতে পারল মনোরমা। আসলে মুরলী যে একটুও ঘুমোয় নি তা সে জানে। মুরলী যাতে ঘুমোতে না পারে এইজন্যই তো সে খাওয়াদাওয়ার পর এতক্ষণ এত কষ্ট করে ওঘরে গিয়ে বসেছিল। কিন্তু মুরলীও যে জেগেই আছে হাতে হাতে তা প্রমাণ করে না দিতে পারলে মনোরমার রাত জাগার কষ্ট যেন বৃথা হয়ে যায়।

মশা গুনগুন করছে ঘর ভরে। তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করে মশা তাড়িয়ে মশারি ফেলে দিতে দিতে মনোরমা নিজের মনেই যেন বলল, 'আচ্ছা নবাবের বেটি হয়েছে, নিজের মশারিটাও নিজে ফেলে নিতে পারবে না। ওর আর দোষ কি, আদর দিয়ে দিয়ে একজন যদি মাথা খেয়ে দেয়, আমি তার কি করতে পারি।'

কিন্তু অভিযোগ সত্ত্বেও মুরলীর কাছ থেকে কোন জবাব মিলল না। মনোরমা

একটু চুপ করে রইল। মশারির মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে চার পাশ ঘুরে ঘুরে মশারির চারধার বেশ করে গুঁজে দিল। তারপর হঠাৎ এক সময়ে মশারির মধ্য থেকে বেরিয়ে এল মনোরমা। মুরলীর খাটের কাছে গিয়ে আবার সে পাখা দিয়ে মশা তাড়াতে আরম্ভ করল। দেখা গেল মুরলীও মশারি টাঙিয়ে শোয় নি। কাপড়ের খুঁটটা জড়িয়ে মশার কামড় থেকে কোন রকমে আত্মরক্ষা করছে, তবু মশারি টাঙ্গায় নি।

মশারিটা ফেলে দিয়ে মনোরমা বলল, 'পড়ে পড়ে মশার কামড় খাবে তবু মশারিটা টাঙিয়ে নেবে না। কেন, এক-আধদিন নিজের হাতে টাঙিয়ে নিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?'

মুরলী বলল, 'একজন যদি আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খেয়ে দেয়, আমি তার কি করতে পারি বল।'

মনোরমা বলল, 'মরণ আমার, বয়ে গেছে আমার অমন মানুষকে আদর জানাতে। কত মর্যাদা রাখেন আদরের। এর চেয়ে গাছ-পাথরকে ভালোবাসলেও শান্তি পাওয়া যায়।'

মুরলী কোন জবাব দিল না। একটু চুপ করে থেকে মনোরমা নিজেই আবার বলল, 'রাগ করলে?'

মুরলী বলল, 'না, রাগ তো তোমারই করবার কথা।'

হ্যারিকেনটা খাটের নীচে মিটমিট করে জ্বলছিল। মনোরমা ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে সেটা একেবারে নিভিয়ে দিল। স্বামীর প্রায় গা ঘেঁষে শুয়ে মনোরমা আস্তে একটু নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'না, রাগ করে আর লাভ কি?'

৬

কিন্তু কেলেঙ্কারিটা সেই রাত্রে বিনোদের ঘরে বসে যত সহজে নবদ্বীপ মিটিয়ে দিয়ে এসেছিল, আর খানিকটা মান-অভিমানের পর মুরলী আর মনোরমার মধ্যে যত অল্প সময়ে মিটে গিয়েছিল, পাড়ায় তত সহজে এবং তত তাড়াতাড়ি মিটল না। পুরুষদের তাসের আড্ডায়, মেয়েদের স্নানের ঘাটে, বিকালে জল আনবার সময় হাসিতে ইশারায় আলোচনার উপাদেয়তা কেবল বেড়েই চলতে লাগল। নবদ্বীপ কি মুরলীকে দেখলে পুরুষেরা তবু থামে, কথা ঘুরিয়ে নেয়; কিন্তু মনোরমাকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। তার উপস্থিতিতে মেয়েদের কথার রস যেন

আরও গাঢ় হয়ে জমে, নিগূঢ় ব্যঞ্জনা গূঢ়তর হয়, কথা শেষ হয়ে গেলেও তার তির্যক ভঙ্গিটুকু চোখ আর ঠোঁটের কোণ থেকে যেন কিছুতেই সরতে চায় না।

পাছে কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সেই ভয়ে মনোরমা আজ বেশ দেরি করেই জল নিতে এসেছিল। ছোট একটি কলসী কাঁখে মায়ের সঙ্গে ললিতাও এসেছে ঘাটে। মনোরমা ইচ্ছে করেই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেরোয়। পুরনো হয়ে গেলেও সে এ গাঁয়ের বউ; একা একা ঘাটে যাতায়াত করা তার পক্ষে শোভন নয়। কিন্তু মেয়ে সঙ্গে থাকলে আর নিন্দার কথা ওঠে না। ললিতার বয়স যখন তিন বছর তখন থেকেই সে মার রক্ষয়িত্রী। প্রতি বছর নবদ্বীপ নাতনীকে একটি করে কলসী কিনে দিয়েছে। ললিতার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কলসীর আকারও একটু করে বেড়ে চলেছে।

আজ ললিতাকে সঙ্গে রাখার মনোরমার আরও একটু উদ্দেশ্য ছিল। ভেবেছিল মেয়ের সামনে মুরলীর সম্বন্ধে যা তা কেউ আর বলতে পারবে না। শত হলেও দশ-এগারো বছরের মেয়ে, না বোঝে কি। তার সামনে সকলেই একটু রেখে ঢেকে কথা বলবে।

কিন্তু উদ্দেশ্য মনোরমার সম্পূর্ণ সিদ্ধ হল না। সন্ধ্যা প্রায় ঘোর হয়ে এলেও দেখা গেল মঙ্গলা আর আলতা ঘাট থেকে এখনো যায় নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি সব হাসি মসকরা করছে। মনোরমার বুঝতে বাকি রইল না হাসাহাসিটা তাকে দেখে ইচ্ছে করেই ওরা বাড়িয়েছে। কোন কথা না বলে পাশ কাটিয়ে নদীর মধ্যে খানিকটা নেমে মনোরমা কলসী ভরতে যাচ্ছে, মঙ্গলা বলল, 'এই যে এস সোনা বউ, এতক্ষণ তোমাদের কথাই হচ্ছিল।'

মনোরমা শুকনো মুখে বলল, 'আমাদের কথা!'

মঙ্গলা একটু হাসল, 'তা ছাড়া আবার কি, তোমাদের কথাই তো এখন পাড়ার মুখে মুখে। বড় ঘরের বড় বড় সব কথা।'

মনোরমা বলল, 'বড় বড়ই তো দিদি। ছোট মুখে তাই তো তা আটকে থাকে না, মুখ খুলতে না খুলতে পথে ঘাটে যেখানে সেখানে বেরিয়ে আসে।'

মঙ্গলা কঠিন স্বরে বলল, 'ভারি যে দেমাক দেখছি সোনাবউ, বড় ঘরের বড় বড় কর্তারা যখন ছোট কাজ করতে যায় তখন দোষ হয় না, দোষ কেবল ছোট মুখে তাদের কথা ওঠে বলে, না?'

জলভরা কলসীটা মনোরমা ততক্ষণে কাঁখে নিয়েছে। মেয়েকে বলল, 'চল ললিতা সন্ধ্যে হয়ে গেছে।' তারপর মঙ্গলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'গায়ে পড়ে

৪

ঝগড়া করবার তোমার ভারি সাধ মঙ্গলাদি। বড় ঘরের মানুষ তোমার তো কিছু করতে যায় নি, কিন্তু গায়ের ঝালটা যেন তোমারই সবচেয়ে বেশি হয়েছে।'

বলে মনোরমা আর দাঁড়াল না।

মঙ্গলা পিছন থেকে ডেকে বলল, 'পালাচ্ছ কেন সোনা বউ, কথার জবাবটা একবার শুনেই যাও না। গায়ের ঝালটা কেন আমার বেশি হয়েছে একবার শুনে যাও ভালো করে।'

কলসী কাঁখে মনোরমা তখন খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়েছে। নিজে কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে মেয়েকে কি যেন বলে দিল।

ললিতা তোতাপাখির মতো দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'মার অত সময় নেই জ্যেঠিমা, যাকে শোনালে তোমার গায়ের ঝাল মিটবে তাকেই শুনিয়ো।'

মঙ্গলা আলতাকে সাক্ষী মেনে বলল, 'শোন, অতটুকু মেয়েকে দিয়ে কি একবার বলিয়ে নিলে শোন ঠাকুরঝি। শিখিয়ে পড়িয়ে ওই এক ফোঁটা মেয়েটার পর্যন্ত ওরা মাথা খেয়ে দিচ্ছে। আর দু-একটা বছর যেতে দাও, তারপর ওই মেয়ে যদি পাড়ার সমস্ত ছেলের মাথা না খায় তো কি বলছি।'

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। আলতার কালো মুখ ভাল করে দেখা গেল না। আলতা বলল, 'চল বউদি বাড়ি চল। দু-এক বছর পরে পাড়ার ছেলেদের মাথা যদি ও খেতেই থাকে তা নিয়ে তোমার অত দুর্ভাবনা কেন! এরপরও যদি তোমার ছেলে হয় তার মাথা এত বড় হবে না যে, ও মেয়ের তা খেতে লোভ যাবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মঙ্গলা বলল, 'আমারই ঘাট হয়েছিল আলতা ঠাকুরঝি, চোরের সাক্ষী যে গাঁটকাটা ভুলে গিয়েছিলাম।'

পাড়ার ছেলেদের মাথা খাওয়ার দুর্নাম মাঝে আলতার নামেও শোনা যায়।

সমস্ত পথটা কলসী কাঁখে দুজনে নীরবে হেঁটে এল। দুজনেই ভাবল কথায় কথায় কি কথা এসে পড়ল। অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে তারা ঝগড়া করে বসল সখীতে সখীতে। দুজনেই ছেড়েছে একেবারে মারাত্মক অস্ত্র। বন্ধ্যাকে সন্তানহীনার দুঃখ মনে করিয়ে দিয়েছে আলতা। বালবিধবাকে চরিত্রহীনতার খোঁটা দিয়েছে মঙ্গলা। কেউ কাউকে এতটুকু ছেড়ে দেয় নি। অথচ এই মুহূর্তে ঝগড়া করবার তাদের একটুও ইচ্ছা ছিল না। দুজনেরই ইচ্ছা করতে লাগল এই সামান্য ব্যাপারটার এখানেই মিটমাট করে ফেলে তারপর মনের আনন্দে কালকের

সেই কেলেঙ্কারির আলোচনা আবার আরম্ভ করে, কিন্তু অভিমানে কারোর মুখ দিয়েই কথা বেরোল না। কে আগে যেচে মান খোয়াতে যাবে।

ঘরে এসে ভরা কলসীটি আস্তে নামিয়ে রাখল মঙ্গলা। প্রদীপের সলতেটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ধরিয়ে দিল। ডাল তরকারি রান্না করাই আছে। শুধু ভাতটা রাঁধলেই এবেলা হবে। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন আলস্য আসে শরীরে, এমন অনিচ্ছা আসে মনে যে, দুজনের জন্য ভাতটাও মঙ্গলার রাঁধতে ইচ্ছা করে না। এমন অদ্ভুত অবস্থা হয় মনের যে, হাজার ঝগড়া আর হাজার কান্না-কাটি করেও তার সেই ভার যেন আর নামানো যায় না। ছেলেবেলার সেই বোবা পিসির কথা মনে পড়ে মঙ্গলার। কতদিন তাকে দুর্বোধ্য ভাষায় ঝগড়া করতে দেখেছে মার সঙ্গে, কতদিন দেখেছে দুর্বোধ্য ভঙ্গিতে কাঁদতে। মঙ্গলা আড়ালে গিয়ে মুখে আঁচল চেপে হেসেছে। কিন্তু বোবা পিসির কথা মনে করে আজ আর তার হাসি পায় না। মনে হয় কথা-বলা মানুষও হঠাৎ একেক সময় ওই রকম যেন বোবা হয়ে যায়। কেঁদে চেঁচিয়ে হাজার মাথা কোটাকুটি করলেও মনের কথা কাউকে বোঝান যায় না। আকুলি-বিকুলি দেখে বাইরের মানুষ ছেলেবেলার অবুঝ মঙ্গলার মতোই মুখে আঁচল চেপে হাসে, কিন্তু ভিতরের মন ঘরের ভরা কলসীর মত থম থম করতে থাকে।

সত্যিই তো মঙ্গলার কোন ক্ষতি তো করে নি মুরলী; তবে কেন সে গিয়েছিল তার বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে? কিন্তু মানুষ কি কেবল নিজের ক্ষতির জন্যই সব সময় ঝগড়া করতে যায়, নিজের ক্ষতির ভয়েই সর্বদা তটস্থ থাকে? তাহলে পাড়াসুদ্ধ লোক মুরলীর এমন নিন্দা করছে কেন? ক্ষতি তো আর পাড়াসুদ্ধ লোকের করে নি মুরলী, এক সঙ্গে পাড়ার সমস্ত বউ-ঝির গায়ে তো হাত দেয় নি! তবে? তবু মঙ্গলা এসব আলোচনায় যোগ দিলে, অনাচারের কদাচারের প্রতিবাদ জানালে, অন্যে তো দূরের কথা তার ঘরের লোকই তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়। সকালে এই নিয়ে সুবলের সঙ্গেও তার কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে।

সুবল তখনও বিছানা থেকে ওঠেনি। মঙ্গলা কল্কেতে সযত্নে তামাক ভরে তার ওপর মালসা থেকে ঘুঁটের আগুন তুলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ভালো করে ধরিয়ে হুঁকোয় করে সুবলের হাতে দিয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ গো, কি ঠিক হল তোমাদের?'

সুবল জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কিসের?'

'মুরলী ঠাকুরপোর!'

কথা নেই বার্তা নেই, সুবল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তেলে-বেগুনে-জ্বলে

উঠেছিল, 'সকাল বেলা একটা ভালো কথা নেই, ঠাকুর-দেবতার নাম নেই মুখে, কেবল মুরলী ঠাকুরপো আর মুরলী ঠাকুরপো! দিনরাত ওই লুচ্চা বদমাশটার নাম ছাড়া আর কিছু বুঝি মনে আসে না তোর?'

মঙ্গলা মুখ লাল করে বলেছিল, 'ছিরি দেখ কথার। আমি যেন সোহাগ করে তার নাম নিয়েছি!'

সুবল বলল, 'গলাখানা যেমন গদ-গদ শোনাচ্ছিল তাতে তাইতো মনে হয়। রক্ষে যে পরের মেয়ের হাত ধরে টেনেছিল, তোর নিজের হাত ধরে টান দিলে না যেন কি-ই করতি।'

মঙ্গলা বলল, 'ছি ছি ছি, ওঠো যাও মুখখানা একবার ধুয়ে এস ভালো করে। মঙ্গলার হাত ধরে টান দিতে সাহস পায় এমন পুরুষ আছে নাকি তোমাদের গাঁয়ে?

সুবল তাড়াতাড়ি তার হাতখানা খপ করে ধরে ফেলে বলেছিল, 'একেবারেই নেই নাকি?'

মঙ্গলা এই সোহাগে ভোলে নি, ঝট করে তার হাতখানা স্বামীর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, 'না। একেবারেই নেই। ধরতে দিই বলেই না, ধরতে পার! না হলে কি যোগ্যতা আছে তোমার হাত ধরবার একবার ভেবে দেখ মনে মনে।'

সুবল বলেছিল, 'তাতো ঠিকই, যে হাতে গয়না দিতে পারি না, রকম-বেরকমের শাড়ি, সেমিজ এনে দিতে পারি না, স্ত্রীর সে হাত ধরতে যাওয়ার যোগ্যতা তো নেইই। তাইতো বলি এত দুঃখ এত আফসোস যখন তোর মনে তখন একবার হাত বদল করে দেখ না, কপাল বদলায় কিনা।'

তারপর সুবল একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিল, 'রাগ হয় কি সাধে? মেয়েমানুষ ঘরের কাজ-কর্ম নিয়ে থাকবে। এ সব সামাজিক দলাদলি দণ্ডবিচারের মধ্যে মাথা দেওয়া কি ভালো, না, লোকেই তাতে ভালো বলে? পাড়া ভরে সবাই যখন বলাবলি করে, সুবলের বউয়ের বড় পুরুষালি চালচলন, পুরুষালি কথাবার্তা, —তখন আমার মনটা কেমন করে বল দেখি?'

রাগ করে স্বামীর কথার কোন জবাব দেয় নি মঙ্গলা। ঘর গৃহস্থালি ছাড়া অন্য কোন কিছু সম্বন্ধে সামান্য একটু কৌতূহল দেখালেও সুবল তাকে এমনি ধমকাবে, লোকনিন্দার ভয় দেখাবে। কিন্তু মঙ্গলা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না এতে নিন্দাটা কিসের। সুবল বলে, পুরুষের ব্যাপারে মেয়েদের কেন মাথা দিতে যাওয়া। কিন্তু

পুরুষ যখন অন্যায়ভাবে মেয়েদের গায়ে হাত দিতে আসে তখনও কি সেটা কেবল পুরুষদের ব্যাপারই থাকে? সে সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলে, মতামত জানাতে গেলে, নিন্দা হবে পাড়ায়? হয়ত হবে, মঙ্গলা তেমন নিন্দাকে ভয় করে না মোটেই।

সন্ধ্যার খানিক বাদেই সুবল ফিরে এল। হাত-মুখ ধুয়ে অভ্যাসমতো দু-চারবার কর গুনে মিনিটখানেকের মধ্যে আহ্নিকটাও সেরে নিল। তারপর রান্না-ঘরে এসে মঙ্গলা যেখানে ভাত রাঁধছে তার খানিকটা দূরে একখানা পিঁড়ি পেতে বসে বলল, 'যাক, দেরি হলেও ভাগ্য ভালো যে ভাত আজ এক সময় না এক সময় জুটবেই। সকাল বেলায় যে মুখ দেখে গিয়েছিলাম তাতে তো ভরসাই ছিল না, মুখ থেকে নেমে হাঁড়ি আজ সত্যিই উনুনে চড়বে।'

আগুনের আঁচে মঙ্গলার গৌরবর্ণ মুখখানা রক্তাভ দেখাচ্ছিল। মুখ না ফিরিয়েই সে বলল, 'ঝগড়া ছাড়া মুখে বুঝি আর কিছু আসে না তোমার?'

'না, সত্যি মুখটাই ভারি খারাপ হয়ে গেছে মঙ্গল বউ। মনের সোহাগের কথাগুলোও মুখে আসতে না আসতে ঝগড়া হয়ে বেরোয়।'

মঙ্গলা বলল, 'আমার সোহাগেও দরকার নেই, ঝগড়াতেও দরকার নেই।'

মঙ্গলা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ফেন ঝরাবার জন্য উপুড় করে রাখল।

সুবল বলল, 'কিন্তু একটা খবর বোধ হয় অত খানি অদরকারী মনে হবে না।'

মঙ্গলা তেমনি নিরাসক্ত ভাবেই জবাব দিল, 'না, কোন খবরেই আর আমার দরকার নেই।'

সুবল এবার কোন রকম ভূমিকা না করেই বলল, 'হাট থেকে ফেরবার পথে আমাদের কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেছে। নবদ্বীপ জ্যেঠার ওসব কথার কারসাজিতে এবার আর কেউ ভুলবে না। রীতিমতো বিচার হবে মুরলীর। রঙ্গীর পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে মুরলীকে।'

মঙ্গলা এবার মুখ মুচকে একটু হাসল, 'তাতে তার খুব বেশি আপত্তি হবে বলে তো মনে হয় না।'

সুবল বলল, 'আপত্তি হলেই তাকে ছাড়বে কে। কিন্তু আপত্তি হবে না কেন শুনি!'

মঙ্গলা বলল, 'কেন হবে? যারা মেয়েদের হাত ধরতে ভালোবাসে, পা ধরতে তাদের অত মান যায় না। মেয়েদের হাত-পা দুইই তাদের কাছে সুন্দর। হাতের মুঠোয় ধরে রাখবার যোগ্য। তাছাড়া মুরলী ঠাকুরপো হয়ত আর একটা

আশাতেও পা ধরতে রাজী হবে। পা ছুঁতে না ছুঁতে রঙ্গী হয়ত লজ্জায় খপ করে তার হাতখানাই ধরে ফেলবে। আর তোমাদের সমস্ত সামাজিক চক্রান্ত মিথ্যে হয়ে যাবে।'

ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে যাচ্ছিল সুবল। কিন্তু গ্রাসটা ফের থালার ওপর নামিয়ে মঙ্গলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। হঠাৎ এত রস জমল কি করে মঙ্গলার মনে। যে মুখ এতক্ষণ হাঁড়ির মতো ভার হয়ে ছিল, মুরলীর অবৈধ প্রেমের প্রসঙ্গ উঠতে না উঠতে সে মুখ আঙুরের মতো টলটল করছে। তাহলে মুরলীর শাস্তি হোক তা কি সত্যিই চায় না মঙ্গলা? শাস্তি দেওয়ার নামে সরস আলোচনার কৌতুক করবার ইচ্ছা ছাড়া তার মনে আর কিছু নেই!

'তাহলে মুরলীর কি রকম শাস্তি তোর পছন্দ?' সুবল ভাত খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করে।

মঙ্গলা গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলে, 'বা রে, তোমাদের পুরুষদের ব্যাপারে আমার আবার একটা পছন্দ-অপছন্দ কিসের! এসব বিষয়ে আমাদের মাথা ঢোকাতে যাওয়াই তো অন্যায়।'

বলে মঙ্গলা কি এক ছলে ঘরের বাইরে চলে যায়।

সুবল গম্ভীর মুখে ভাত খায় আর ভাবে, তাকে তুচ্ছ করবার এই আর এক কৌশল শিখেছে মঙ্গলা। যে-কাজে মঙ্গলাকে সে আমল দিতে চায় না, তাকে ঠাট্টা-তামাসায় এমন ভাবে সে উড়িয়ে দেয় যেন সে-কাজটা আসলে কোন কাজই নয়, ছেলেখেলা মাত্র। রাগের জবাবে রাগটা কি করে দেখাতে হয়, তা সুবল জানে, কিন্তু হাস্যপরিহাসের ঠিক পছন্দসই জবাবটা তার মুখে চট করে আসে না, সব সময়েই তো আর ধমক দিয়ে মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় না, বিশেষত সে মুখ যদি মেয়েদের সুন্দর মুখ হয়।

৭

সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে মেয়েকে নিয়ে ঘরের বারান্দায় মধু সা গরুর দড়ি পাকাতে বসেছিল। এক পাশে একটা চিমনি-ফাটা হ্যারিকেন জ্বলছে। এক গোছা পাট পায়ের নিচে চেপে রেখে তার থেকে একেক চিলতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মধু দড়িতে গুছি ভরছিল আর খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রঙ্গী এক হাত থেকে আর এক হাতে দড়ির ছুটো অংশ বার বার বদলে নিচ্ছিল।

গাওয়াল থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দুটো ঘটনার কথা মধু সার কানে গিয়েছে। তার মধ্যে একটি হল নবদ্বীপ সার লম্পট ছেলে মুরলীর মধুর মেয়ের হাত চেপে ধরার কাহিনী। দু নম্বর হল দড়ি ছিঁড়ে মধুর গরু প্রতিবেশী নিতাই সার বাড়ির লাউয়ের ডগায় মুখ দিয়েছিল বলে তার পিঠে নিতাইয়ের লাঠি ভাঙবার বৃত্তান্ত।

মধুর স্ত্রী সুলোচনা দুটো প্রসঙ্গেই সমান উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আশ্চর্য পুরুষ মধু, এত কিছুতেও তার চালচলনে কথাবার্তায় বিন্দুমাত্র উত্তেজনা বা অসহিষ্ণুতার লক্ষণ দেখা যায় নি। কেবল একটু 'হুঁ' ছাড়া আর কোন কথা নেই তার মুখে। গরুর গা-ভরা ছড়ির দাগগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে, মেয়ের চুড়িভরা হাতখানাও মধু একটু দেখে নিয়েছে। গরুর গায়ের মতো নির্যাতনের চিহ্ন অবশ্য মেয়ের গায়ে নেই। হাতভরা সোনা আর রঙবেরঙের কাচের চুড়িগুলো ঝকঝক করছে, মুখেও কোন দুঃখ-বিষাদের আভাস নেই।

দড়িতে গুছি ভরতে ভরতে মধু এক সময় জিজ্ঞাসা করল, 'ভালো কথা রঙ্গী, অজিতের কলকাতার ঠিকানাটা যেন কি ?'

রঙ্গী একবার তার বাবার দিকে তাকাল, তারপর মুখ নামিয়ে বলল, 'সাতের দুই ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড। চিঠি আমি লিখেছি কলকাতায়।'

'লিখেছিস নাকি ? কি লিখেছিস ?'

রঙ্গী একটু যেন ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'লিখেছি আমার ভারি অসুখ, কলকাতায় যাওয়া খুব দরকার।'

মধু বলল, 'হ্যাঁ তাই ভালো, এ-সব গোলমালের মধ্যে তোর এখন থেকে কাজ নেই।'

অত্যন্ত নির্বিরোধ মানুষ মধু, কোন রকম গোলমালের মধ্যে সে যেতে চায় না। গরুর জন্য দড়ি পাকাতে পাকাতে মেয়ের কথাই সে এতক্ষণ ভাবছিল। ভবিষ্যতে গরু যাতে আর না ছুটে যায় সে ব্যবস্থা নতুন দড়িতেই হবে, কিন্তু মেয়েকে তো আর বেঁধে রাখা চলবে না; তাকে পাঠাতে হবে জামাইয়ের কাছে। অথচ মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজে থেকে জামাইকে চিঠি লেখাটাও ভালো দেখায় না। সে হয়তো ভাববে মেয়েকে তারা আর খেতে-পরতে দিতে পারছে না, মাসখানেক যেতে না যেতেই অধীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ তো খাওয়া-পরার প্রশ্ন নয়, মান-মর্যাদার কথা। এতদিন মধু আগলেছে, এখন যার জিনিস সে এসে নিয়ে যাক। মধু হাঁফ ছেড়ে বাঁচুক। যা হোক, মেয়েকে তার বুদ্ধিমতী বলতে হবে। জামাইয়ের

কাছে বছর দুয়েক থেকে সে কেবল চিঠি লিখতেই শেখে নি, রেখে ঢেকে কখন কতটুকু লেখা দরকার সে কৌশলও দিব্যি আয়ত্ত করেছে। রঙ্গীর শরীর খারাপ শুনে জামাই ছুটে আসবে, তারপর এসে তাকে অসুস্থ না দেখে অবাক হলেও নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে। মন খারাপ হওয়াকে শরীর খারাপ বলার রেওয়াজ তো ও-বয়সের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আছেই।

'মধুদা বাড়ি আছ নাকি, ও মধুদা!'

গলা শুনে মধু দড়ি পাকান রেখে হ্যারিকেনটা উঠনের দিকে বাড়িয়ে ধরল, 'কে! সুবল নাকি, এত রাত্রে যে?'

সুবল বলল, 'এই এলাম গল্পসল্প করতে, তুমি তো আর যাবে না মানুষের বাড়ি।' কিন্তু গল্প করতে কেবল সুবল একাই আসে নি, তার সঙ্গে ফটিক এসেছে, বুড়ো বিষ্টু সা এসেছে, বেঁটে বলাই, এমন কি নিতাই পর্যন্ত দলের সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছে।

মধু প্রথমটা ভারি বিব্রত বোধ করল, তারপর ব্যস্ত হয়ে সবাইকে বারান্দায় ডেকে এনে বলল, 'এস এস, আসুন বিষ্টুকাকা, ব্যাপার কি!' তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে মধু বলল, 'যা তো মা, ঘর থেকে মাদুরটা এনে পেতে দে তো এঁদের।'

রঙ্গী মাদুরটা হাতে করে নিয়ে আসতেই ফটিক তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিল, 'দাও দাও, আমরাই পেতে নিতে পারব।'

বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে রঙ্গী সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল প্রত্যেকের কথা। ঘরের মধ্যে সুলোচনা কি যেন করছিল। হঠাৎ এত লোকজনের আনাগোনা দেখে মেয়ের কাছে এসে ফিস ফিস করে বলল, 'হ্যাঁ রে, এরা আবার আজ এসেছে কেন রে?'

রঙ্গী ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে ইশারায় মাকে থামতে বলে বলল, 'চুপ করে শোন।'

কোন রকম ভূমিকা না করে সুবল একেবারে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়ি এসে সব শুনেছ বোধ হয় মধুদা?'

মধু নিতান্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলল, 'কিছু কিছু শুনেছি। বাকী সব বোধ হয় তোমাদের কাছ থেকেই শুনতে পারব।'

মধুর কথা বলবার ধরন দেখে উপস্থিত সকলেই মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। যেন সাহায্যের জন্য নয়, পরামর্শের জন্য নয়, সাড়ম্বরে কেবল কেলেঙ্কারীর কাহিনী

শোনাবার জন্যই জোট বেঁধে মধুর কাছে সবাই এসেছে। মধুর বিপদে মজা দেখা ছাড়া যেন আর কারো কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীদের ওপর মধুর এত খারাপ ধারণাই বা থাকবে কেন ? কি এমন অপরাধ করেছে তারা ?

মনের রাগ যাতে কথার মধ্যে না ফুটে বেরোয় তার সাধ্যমত চেষ্টা করতে করতে সুবল বলল, 'দুঃখু অবশ্য তোমার মনে হবারই কথা মধুদা। মনের আর দোষ কি ! সাতে নেই, পাঁচে নেই, নিতান্ত নিরীহ মানুষ তুমি, অথচ ব্যাপারটা কিনা গড়ালো তোমার ওপর দিয়েই। তুমি কেন, সবাই এতে দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু মনের দুঃখ কেবল মনে পুষে রাখলে তো হবে না, একটা বিহিত এবার এর করতেই হবে।'

মধু ফটিককে ডেকে বলল, 'আয় না ফটিক, হাতে হাতে দড়িটা একটু ফিরিয়ে দে, কথায় কথায় কাজও এগুবে', তারপর সুবলের কথার জবাবে বলল, 'বেশ, তোমরা পাঁচজনে মিলে কর না একটা বিহিত।'

ফটিক এবার আর ধৈর্য রাখতে পারল না। বলল, 'দেখ মধুদা, বিহিত আমরা একটা করব বলেই এসেছি, কিন্তু তোমার রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছে, দায়টা যেন পাঁচজনের, এ ব্যাপারে তোমার কিছুই এসে যায় নি।'

সুবল ফটিককে ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'আঃ! থাম না ফটিক। শোন মধুদা, আমরা ঠিক করেছি সেদিনকার অপকর্মের জন্যে দশজনের সামনে মুরলীকে রঙ্গীর পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে।'

কথা শুনে ঘরের ভেতরে সুলোচনা মাথা নাড়ল, 'না বাপু আর আমি ওই বদমাশের সামনে নিজের মেয়েকে বার করব না। তা সে এসে পা-ই ধরুক আর যাই করুক।'

সেদিন কিছুটা ভয় পেলেও আজ সমস্ত ব্যাপারটা রঙ্গীর কাছে কৌতুকের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। সুবলের প্রস্তাব মতো দৃশ্যটা কল্পনা করে সে মনে মনে আরো কৌতুক বোধ করল। নিতান্ত মন্দ হয় না তাহলে। বেশ মজা হয়। মুরলী এসে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার দুখানা পা চেপে ধরবে আর রঙ্গী গম্ভীরভাবে বলবে, 'ক্ষমা করলাম', ভারি চমৎকার হবে। কিন্তু গাম্ভীর্য ঠিক মতো রাখতে পারবে তো রঙ্গী ? সেই মুহূর্তে তার আবার হাসি পেয়ে যাবে না তো ?

কিন্তু রঙ্গীর মার মতো তার বাবাও প্রস্তাবটা মোটেই অনুমোদন করল না। বলল, 'সেবার গঞ্জে মনোমোহন অপেরায় যাত্রার মধ্যে এমন একটা দৃশ্য ছিল। লম্পট এসে মা বলে ক্ষমা চাইছে। মুরলীর শাস্তির কথা মাথায় আসবার আগে

সেই পালাটার কথা বোধ হয় তোমার মনে পড়েছিল সুবল। কিন্তু যাত্রার পালা আর আমাদের এই গাঁয়ের ব্যাপার তো এক রকম নয় ভাই। অবশ্য কথাটা রাষ্ট্র হলে যাত্রার চেয়েও বেশি ভিড় হবে। কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছ আমার ঘরদোরের অবস্থা। অত লোকজনকে জায়গা দেব কোথায়?' বলে মধু একটু হাসল, তারপর বলল, 'ও-সব পা-টা ধরিয়ে কোন লাভ হবে না সুবল, বরং পা দুখানা তার ভেঙে রেখে দিতে পারলে কাজ হয়, কিন্তু এসব কাজ তখন তখনই যা করবার করে ফেলতে হয়। পরে সলাপরামর্শ, বৈঠক-মজলিস ছাড়া আর কিছু তেমন হয় না।'

কোন উত্তাপ উত্তেজনা নেই, অর্ধেক পাকানো দড়ি আর পাটের গোছা এক পাশে গুছিয়ে রাখতে রাখতে নিতান্ত শান্তভাবে কথাগুলি মধু বলল।

বুড়ো বিষ্টু সা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বুড়ো হয়েও কথা বেশি বলবার অভ্যাস তার বাড়ে নি, সকলের কথা শুনতে শুনতে নিবিষ্ট মনে এতক্ষণ সে হুঁকো টানছিল। ইচ্ছা সত্ত্বেও হুঁকোটা কেউ তার হাত থেকে চেয়ে নিতে পারে নি। পুরো এক ছিলিম তামাক একাই শেষ করে দিয়ে হুঁকোটা বেড়ার ধারে ঠেস দিয়ে রাখল বিষ্টু সা। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'পা ভাঙাভাঙি তো নিতান্ত কম হয় নি মধু, মারধোর এর আগে যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু ফল হল কই! স্বভাব কি কেউ ওর ফেরাতে পারলে।'

বিষ্টু সা'র সুরটা কারো ভালো লাগল না। তার কথার মধ্যে বেশ যেন একটু প্রশ্রয় আছে।

কথাটা যে মোটেই স্থানোপযোগী কি সময়োপযোগী হয় নি, সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বিষ্টু সা'র তা বুঝতে বাকি রইল না, কিন্তু তাই বলে সঙ্গে সঙ্গেই নিজের কথা বিষ্টু সা ফিরিয়ে নিল না, বা একেবারে উল্টো কথা বলতেও শুরু করল না, ধীরে-সুস্থে রয়ে-সয়ে একটু একটু করে কথার মোড় ঘোরাতে লাগল। বিষ্টু সা বলল, 'কথাটা বিশ্বাস করা একটু শক্তই। যে মারের চোটে ভূত পালায় সেই মারে মানুষের স্বভাব বদলায় না, এ কেমনতর কথা হল! কিন্তু মুরলীর স্বভাবখানা যদি একবার চিন্তা করে দেখ, তাহলে তোমরাও বলবে যে আমি ঠিকই বলছি। মার খেয়ে মুরলীর কিছুই হয় নি। বলতে গেলে এসব আরম্ভ করেছে তো ও প্রায় সেই চোদ্দ-পনের বছর বয়েস থেকে, ঠোঁটে গোঁফের রেখা দেখা দেওয়ার আগেই তো বাজারের অস্থানে কুস্থানে যাতায়াত তার শুরু হয়ে গেছে।'

মধু বাধা দিয়ে বলল, 'সে গল্পে আর কি হবে বিষ্টু খুড়ো। সে তো আমরা সবাই জানি।'

ঘরের মধ্যে মার পাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে রঙ্গী ওদের সব আলাপ-আলোচনা শুনছিল। বিষ্টু সার কথায় সে যেমন কৌতূহল বোধ করল, বাপের বাধা দেওয়ায় সে তেমনি বিরক্ত হয়ে উঠল। এই এক ধরনের স্বভাব তার বাবার। সব সময়ই গম্ভীর মুখে গম্ভীর মেজাজে থাকে, কোন রকম আমোদ-প্রমোদ গল্পগুজব তার ভাল লাগে না। অতটা বাড়াবাড়িও যেন ভালো নয়!

মধুর কথার জবাবে বিষ্টু সা অল্প একটু হাসল, বলল, 'তা জানবে না কেন বাপু! সে-সব কীর্তিকাহিনী আশেপাশের পাঁচখানা গাঁয়ের লোক পর্যন্ত জানে, তোমরা তো তোমরা। তা সবই যখন জান, এই বিষ্টু সার হাতেই মুরলী কি রকম মার খেয়েছে তাও নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের। বলতে গেলে এ-সব বদখেয়ালের জন্যে আমিই ওকে প্রথম শাসন করি। প্রায় বছর তিরিশেক আগেকার কথা, মুরলীর বয়স কত হবে তখন? পনের-ষোলর বেশি নয় নিশ্চয়ই। অথচ সেই কচি বয়সেই একেবারেই পেকে উঠেছে। একদিন তো একেবারে আমার চোখে পড়ে গেল। ঘয়ে ঘরে বাকী বকেয়া আদায় করে হাট থেকে ফিরছি। বেশ একটু রাতই হয়ে গেছে। অন্ধকারও খুব। বাজার ছাড়িয়ে কেবল কালীবাড়ির কাছটিতে এসেছি, দেখি শ্রীমান পাড়ার ভেতর থেকে বেরুলেন। পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, হাত বাড়িয়ে কব্জিটা শক্ত করে চেপে ধরে বললুম—এই হারামজাদা, এখন পর্যন্ত নাক টিপলে দুধ গলে আর তুই এখন থেকেই—কান ধরে টানতে টানতে একেবারে নবুদার সামনে এনে হাজির করে বললুম, দেখ ছেলের কাণ্ড—তা মিথ্যে বলব না, শাসন নবুদাও নিতান্ত কম করেনি। কতদিন তো মেরে মেরে মুখ দিয়ে রক্ত বের করে ছেড়েছে। কিন্তু স্বভাব কি শোধরালো!'

সুবল এতক্ষণ ধরে কি যেন ভাবছিল, বিষ্টু সার কথা শেষ হলে মধুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'না মারধোরের মধ্যে আমিও আর যেতে চাই না মধুদা। এককালে ওসব খুব একচোট হয়েছে। এখন আর ওসবের মধ্যে গিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে এবার শাস্তি দাও সমাজ থেকে। উৎসবে আয়োজনে বিয়েতে অন্নপ্রাশনে ওর যাতায়াত বন্ধ করে দাও। কোন কাজকর্মে তো নয়ই, অমনিতেও ও যেন কারো বাড়ি গিয়ে বসবার যায়গা না পায়, বা পান-তামাক না পায়।'

সুবলের সাহস এবং স্পষ্টবাদিতা দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে গেল। নবদ্বীপের ছেলেকে একঘরে করে রাখার কথা শুধু মনে মনে ভাবাই নয়, প্রকাশ্যে দশজনের সামনে সে-কথা উচ্চারণ করতে সুবল একটুও ভয় পায় না। সকলেই অবাক হয়ে ভাবল এতখানি জোর সুবল পেল কোথা থেকে। নবদ্বীপের সঙ্গে সুবলের যে

একটু রেষারেষি আছে তা পাড়ার সবাই জানে। সুবলের অসাক্ষাতে প্রত্যেকে তা নিয়ে একটু আধটু কৌতুকও করে। নবদ্বীপ বা কি, আর সুবলই বা কি! এ যেন, লাখোপতির সঙ্গে কুঁড়েঘরের মালিকের মন কষাকষি। কিন্তু একটা কথা ভেবে সবাই মনে মনে খুশি হয়। আর কিছু না হোক এমন একজন লোক অন্তত তাদের ভেতরে আছে যে নবদ্বীপের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলতে পারে। শক্তিতে কুলাক আর না কুলাক ঘাড় সোজা করে অন্তত তার সামনে রুখে দাঁড়াতে পারে।

নবদ্বীপও কারও পর নয়। সেও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর একজন, রক্তের সম্বন্ধ তার সঙ্গেও সকলের আছে। কিন্তু খানিকটা বুদ্ধির জোরে, খানিকটা কপাল জোরে কয়েক হাজার টাকার মালিক হয়ে সে যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। গঞ্জের ওপর পোতা বাঁধান সতীশের টিনের ঘরে তার মস্ত বড় তামাকের গুদাম, হাজার হাজার টাকা খাটছে তামাকের কারবারে, বছর বছর হাজার হাজার টাকা লাভ হচ্ছে, ফলে বাড়িতেও দোতলা দালান উঠছে নবদ্বীপের। তা উঠুক। পাড়ার মধ্যে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একজন অবস্থাপন্ন হলে, মানুষের মত মানুষ হলে, সকলেরই গৌরব। কিন্তু নবদ্বীপের ভাবভঙ্গিতে বেশিক্ষণ যেন একথা মনে রাখা যায় না। টাকা-পয়সার মুখ দেখেছে বলে জাতেও যেন সে অনেক ধাপ ওপরে উঠে গেছে। বামুন-কায়েতের মতোই সে যেন বহু উঁচু সমাজের মানুষ। বেশভূষা কথাবার্তা তার সাদাসিধেই আছে, কিন্তু ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তেই যে সে জমকাল পোশাক পরতে পারে এ সম্বন্ধে নবদ্বীপ নিজেই শুধু সচেতন নয়, অন্য সবাইকে সচেতন করে রাখবার কৌশলও জানে। ধনী নবদ্বীপের কাছ থেকে প্রয়োজন পড়লে হাত পেতে সবাই নেয় কিন্তু ভেতরে ভেতরে সুবলের মতো প্রত্যেকে তাকে হিংসাও করে। তাই সুবল যখন নবদ্বীপের বিরুদ্ধে কিছু বলে তখন অনেকেই নিজের নিজের মনের কথা তার মুখে শুনতে পেয়ে খুশি হয়ে ওঠে।

সুবলের কথায় শান্ত নির্বিরোধ এবং ভীতু স্বভাবের মধু পর্যন্ত মনে মনে বেশ একটু উত্তেজনা বোধ করল। কিন্তু জবাব অবশ্য সে দিল তার স্বভাবসিদ্ধ নিরুত্তেজ নৈরাশ্যের ভঙ্গিতেই। বলল, 'তোমার প্রস্তাবটি তো খুবই ভালো সুবল, কিন্তু—'

সুবল অসহিষ্ণু ভাবে বলল, 'তোমার কিন্তু কিন্তু শুনলে গায়ে জ্বর আসে মধুদা। কিন্তু-টিন্তু এখন থাক। বলি আমরা যা করব তাতে রাজী আছ কি না।'

মধু শান্ত ভাবে হাসল। বলল, 'কি করতে চাও তাই আগে শুনি।'

সুবল বলল, 'বেশী কিছু নয়, একটু ছোট মতো শনি পূজার কেবল আয়োজন কর বাড়িতে। শনি দিয়েই পাড়ার শনি ছাড়াব।'

মিনিটে মিনিটে নতুন নতুন ফন্দি উদ্ভাবন করতে সুবল অদ্বিতীয়, নবদ্বীপের মতো ভেবেচিন্তে অমন সূক্ষ্ম পাকা চাল সে চালতে পারে না; অত ধৈর্য নেই, অত বুদ্ধিও নেই, কিন্তু যে কোন বিষয়ে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পৌঁছবার এবং সেই অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করবার মতো সাহস আর একগুঁয়েমি দুইই সুবলের আছে।

বিষ্টু সা খানিকক্ষণ সুবলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কিন্তু নবদ্বীপ সার সঙ্গে দলাদলি করাটা কি ভালো হবে সুবল, আর দলাদলি করে কি তার সঙ্গে পারবে?'

সুবল বলল, 'আমরা পারি আর না পারি আপনি যে পারবেন না সে কথা জানতে বাকি নেই। মধুদা আমার কথার জবাব কিন্তু এখনো পাই নি।'

মধু একবার দোরের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে তাকাল। সুলোচনা মাথা নাড়লে মধু সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে সুবলকে বলল, 'তোমরা যা করবে তাতেই রাজী আছি সুবল, কিন্তু—'

সুবল তীক্ষ্ণ একটু হাসল, 'কিন্তু নিজে কিছু করতে রাজী নই?'

মধু অপ্রতিভ ভাবে বলল, 'মানে হাঙ্গামাটা নানা কারণে এ বাড়িতে না হওয়াই ভালো, বুঝতেই পারছ। আগে মেয়েটিকে পার করে দিই।'

সুবল বলল, 'ওর পারাপারে কিছু আসে যায় না। আচ্ছা, হাঙ্গামার জায়গা আমরাই দেব। সেজন্য ভেব না মধুদা, তুমি কেবল কয়েক হাঁড়ি রসের যোগাড় রেখ।'

৮

নিমন্ত্রণ না করে নবদ্বীপকে অপমান করার উদ্দেশ্যে নিজের বাড়িতে শনির পূজা করবার আগে সুবল একবার বিনোদকে গিয়ে ধরল। বলে কয়ে নবদ্বীপের বিরুদ্ধতা করতে আর কেউ সাহসী হবে না, পাড়ায় নবদ্বীপ অনেকেরই মহাজন, প্রত্যেকের সঙ্গেই তার জটিল রকমের আর্থিক সম্বন্ধ আছে। ভেতরে ভেতরে তাকে ঈর্ষা করলেও সেই সম্বন্ধ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এক পারে বিনোদ। তার দোকানপাট নেই, ব্যবসাবাণিজ্য নেই, স্ত্রীপুত্র ঘরসংসার কিছু নেই। খোল-করতাল নিয়ে বছরের বেশীর ভাগ সময় সে তো গ্রামের বাইরেই থাকে।

নবদ্বীপকে তার ভয় কিসের? তাছাড়া বিনোদের বাড়িতে শনি পূজা হলে নবদ্বীপকে নিমন্ত্রণ না করার অজুহাত অন্য ভাবেও দেওয়া চলবে। বিনোদ বলতে পারবে যে সে নিতান্ত অবৈষয়িক, সংসারের ব্যাপারে কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ। মোটেই চৌকশ ধরনের নয়। একদিকে নজর দিতে গেলে আর একদিকে তার চোখ থাকে না। কে কাকে নিমন্ত্রণ করেছে, না করেছে তার কিছু খেয়াল নেই। না হলে ইচ্ছা করে কি আর নবদ্বীপের মতো লোককে সে অনিমন্ত্রিত রেখেছে। নবদ্বীপ বুঝবে সবই কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কিছু বলতে পারবে না। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।

কিন্তু যে সব কথা বিনোদ নবদ্বীপকে বলতে পারত, সেই কথাগুলোই বলে বসল সুবলকে। বিনোদ বলল, 'সত্যিই তো সুবলদা অত সব হাঙ্গামায় আমার দরকার কি? এখন তো বলতে গেলে আমি দেশান্তরীই হয়েছি। নিতান্তই বাড়ি বলতে একখানা ঘর আছে আর ঘরের মধ্যে বুড়ো মা এখনো মরে নি, আমার সংসারীর লক্ষণ তো এই। এর জন্যে দলাদলি, লৌকিকতা, সামাজিকতার মধ্যে না যাওয়াই ভালো। বেশ আছি, খোল কাঁধে নিয়ে এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই। যখন স্মরণ কর এসে উপস্থিত হই, দয়া করে যদি শুনতে চাও সাধ্যমতো শক্তিমতো ভগবানের নাম শোনাই। ব্যস, আমার কাজ শেষ। সবাই কি আর সব কাজ পারে! না, সকলের সব রকম যোগ্যতা থাকে সুবলদা। তা ছাড়া শনিবার পর্যন্ত তো আমি বাড়িতে থাকতেও পারব না। তার আগেই আমাকে যেতে হবে। গোলকগঞ্জের পোদ্দারদের কথা দিয়ে এসেছি।'

সুবল দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আচ্ছা, যেও।'

স্বামীর মুখ থেকে সব কথা শুনল মঙ্গলা, হেসে বলল, 'কেমন, হল তো? গরীবের কথা বাসি হলে কাজে লাগে। বোঝা গেছে তোমাদের পুরুষদের মুরোদ। আচ্ছা বেশ, তোমার দলে আর কেউ না আসে, আমি তো আছি। অত ভাবনা কেন?'

সুবল ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপ কর মাগী। সব সময় অত রঙ্গরস ভালো লাগে না।'

মঙ্গলা বলল, 'রঙ্গরস নয়, সত্যি বলছি। পুজো আমার বাড়িতেই হবে। তুমি আর সব যোগাড় দেখ। ভেতরের সব আমি যদি একা সামলাতে পারি, তুমি বাইরেটাই বা পারবে না কেন? আর পাঁচজনের দরকার নেই, আমরা দুজনেই যথেষ্ট।'

সুবল মুহূর্তকাল স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। জোরালো ভাষায় দৃঢ় ভঙ্গিতে যখন মনের সংকল্প প্রকাশ করে মঙ্গলা, বেশ দেখায় তাকে। সুন্দর মুখে কঠিনের ছাপ লাগে। নাক ঠোঁট চিবুক মনে হয় যেন পাথর থেকে কুঁদে বেরিয়েছে।

ঘরে যাই হোক, বাইরের সংসারে যে দুজনই যথেষ্ট নয়, একথা সুবল জানে। তবু মেয়েছেলেব মুখে এই ধরনের মিথ্যা দম্ভ শুনতে বেশ লাগে। কেউ একজন যখন বলে, আমিই তো আছি আর দশজনকে দিয়ে তোমার দরকার কি, তখন সেই দশজনের জন্যেও মন আকুলি বিকুলি করে—আমার যে একজন আছে, দশজনকে তা না শুনিয়ে এলে সাধ মেটে না। একজনের মুখের মিষ্টি বাইরের দশজনের মুখেও যেন মধু মাখিয়ে দেয়।

স্বামীকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মঙ্গলা বলল, 'কি দেখছ অমন করে? আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

সুবল সস্নেহে বলল, 'দেখছি তোর ক্ষ্যাপামি। মাঝে মাঝে আমার রাশভারি বুদ্ধিমতী বউও কেমন পাগলাটে ধরনের হয়ে ওঠে তাই দেখছি। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা এখন মনেও নেই।'

মঙ্গলা বলল, 'থাক রঙ্গরসে আর কাজ নেই। আমি কি রঙ্গরসের মানুষ নাকি তোমার, যে ওসব কথা বলছ আমাকে। গাল দেবে ধমকাবে লাথি মারবে, আমি আছি সেই জন্যে। রসের কথা বলবার জন্যে মনের মতো বউ একজন ঘরে এনে নাও, তারপর বলো।'

সুবল মুচকি হেসে তামাক সাজতে বসল।

দলাদলির ভয়ে বিনোদের পিছিয়ে যাওয়ার কথা শুনে মঙ্গলার ভারি খারাপ লেগেছে। দু হাতে চাল ডাল ধার নেওয়ার সময় বিনোদ মঙ্গলার বাড়িতে আসবে কিন্তু মঙ্গলার স্বামীর একটা অনুরোধ সে রাখবে না। নানা অজুহাতে তা এড়িয়ে যাবে। মানুষের এমন ব্যবহার কেউ সহ্য করতে পারে? মঙ্গলা যেন আশা করেছিল, যেহেতু মঙ্গলার স্বামী গেছে তার কাছে, যেহেতু মঙ্গলার নামের গন্ধ আছে ব্যাপারটার মধ্যে, শুধু সেই লোভেই বিনোদ সুবলের সব কথায় রাজী হয়ে যাবে। আর তাতে মান বাড়বে মঙ্গলারই, স্বামীর কাছে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় থাকবে। সময়ে অসময়ে বিনোদকে মঙ্গলার চাল ডাল তরকারি ধার দেওয়াটাও সুবলের কাছে সঙ্গত এবং সার্থক মনে হবে। কিন্তু বিনোদ তার ধার দিয়েও ঘেঁষল না; এক কথায় বলে দিল সে বৈরাগী বাউণ্ডুলে মানুষ, সামাজিক দলাদলির

ব্যাপারে সে নেই। বৈরাগী বাউণ্ডুলে হওয়ার মধ্যে ভারি তো পৌরুষ, ভারি যেন গৌরবের কথা সেটা। বউ মরে গেছে তবে আর কি! বউ যেন সংসারে কারো আর মরে না, সেজন্য সংসার ছাড়তে হবে? সমাজ সামাজিকতা ছেড়ে বাউণ্ডুলে হতে হবে। বেঁচে থাকতে সেই বউয়ের যেন কত যত্ন করত বিনোদ, কত ভালোবাসত। সে সব কিছু নয়; আসলে বিনোদ ফাঁকে ফাঁকে থাকতে চায়, সব রকম ঝামেলা ঝক্কি এড়িয়ে চলতে চায়। এ স্বভাব তার বউ বেঁচে থাকতেও ছিল, বউ মরে যাওয়ার পরও আছে। ভারি ভয়কাতুরে মানুষ বিনোদ, মোটেই পুরুষমানুষের মতো নয়। মেয়েমানুষ হয়েও মঙ্গলার যতখানি সাহস আছে, যত মনের জোর আছে, বিনোদের তার শতাংশের একাংশও নেই। যদি মঙ্গলার মতো মেয়েমানুষের হাতে পড়ত বিনোদ, মঙ্গলা তাকে শাড়ি পরিয়ে রান্নাঘরে পাঠাত, নিজে বেরোত হাটবাজারে। বিনোদের শাড়িপরা ঘোমটা দেওয়া রূপ মনে মনে কল্পনা করে মঙ্গলা হেসে উঠল।

সুবল তামাক টানতে টানতে বলল, 'কি হল, হাসছিস যে অমন করে?'

মঙ্গলা একটু যেন চমকে উঠল, তারপর বলল, 'তোমাদের দেশের পুরুষদের সাহসের কথা ভেবে। হাটবাজার করে দাও। শনির পুজো করে দলাদলি দেখবে আমি একাই বাধাব। মোড়লীটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে।'

সুবল হুঁকোটা স্ত্রীকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'তার আগে এইটা ধর।'

মঙ্গলা ছাড়াও সুবলের সহায় অবশ্য জুটল, পাড়ার অনেকেই আকারে ইঙ্গিতে জানাল তারা পিছনে আছে। সুবলকে শুধু সাহস করে একটু এগিয়ে যেতে হবে। আর এগিয়ে যাওয়ার মত ক্ষমতা পাড়ায় সুবলের ছাড়া কারই বা আছে। দশজনে তাকে মানে-গোনে, গঞ্জে ব্যবসার অবস্থা তার মন্দ নয়, হাত পাততে হয় না কারো কাছে; সংসারে ছেলেপুলে নেই, ঝক্কি ঝামেলা নেই; ঘরে বাইরে কেবল স্বামী আর স্ত্রী। কাউকে ভয় করতে যাবে সুবল কি জন্যে, ইচ্ছা করলে যে কোন রকম ঝুঁকিই তো সে নিতে পারে।

সুবল মনে মনে ভারি খুশি হয়ে উঠল। এতগুলি লোক বিশ্বাস করছে তাকে, এতগুলি লোক নির্ভর করছে তার ওপর; এখন পিছিয়ে গেলে ওরা মনে করবে কি! নবদ্বীপ তার যত ক্ষতি করতে পারে করুক, পাড়ার দশজনের কাছে মুখ হারাতে সুবল পারবে না।

দিন তিনেক আগে থাকতেই উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হল। কুড়ি তিনেক

খেজুর গাছ কাটে সেখেদের ইয়াসিন। তাকে বলে রসের বন্দোবস্ত ঠিক রাখা হল। বাগান থেকে এক ছড়া পাকা কলা দিল ফটিক, মধু সা নিজে দিল ছড়া তিনেক, বাকি সব গঞ্জের হাট থেকে সুবল আর ফটিক কিনে আনল। দুদিন ধরে আলতা আর তার মাকে নিয়ে মঙ্গলা ঢেঁকিতে চাল কুটে গুঁড়ো তৈরী করল। অদ্ভুত উৎসাহ তার এসব কাজে ; কোন ক্লান্তি নেই যেন হাওয়ায় ভেসে চলছে।

পুজোর দিন ভোরে ফটিক আর পাশের বাড়ির নিতাইকে নিয়ে সুবল দুধ কিনতে গেল বাজারে। গোটা পাঁচেক পিতলের কলসী নিল সঙ্গে। পাড়া-পড়শীরা দুধের দামটা চাঁদা করে দিতে চেয়েছিল কিন্তু সুবল নিতে রাজী হয় নি। শুধু কলসী ধার নিয়েছে আর দুধ ভরা কলসী বয়ে আনবার জন্যে চেয়েছে লোক। না হয় পনের-বিশ টাকাই খরচ হবে এই শনির পুজোয়। এর জন্যে আবার চাঁদা তুলবে নাকি সুবল? চাঁদা দিতে হবে না কাউকে, শুধু গায়ে খেটে সাহায্য করলেই চলবে।

ঘর পাঁচ-ছয় সাহার ব্রাহ্মণ আছে গ্রামে। সুবল নিজের পুরোহিত ভুবন চক্রবর্তীকে গিয়ে আগেই খবর দিয়ে এল। সন্ধ্যার পর ছোট্ট একটু চাঁদোয়া টাঙানো হল উঠোনে। তার তলায় হবে পুজো। নারায়ণ সম্বন্ধে তো আপত্তি নেই কিন্তু শনি ঠাকুরকে ঘরে আহ্বান করবে কে? তিনি বাইরে বসেই পুজো নিন, এবং খুশি হয়ে বাইরে থেকেই নিষ্কৃতি দিয়ে যান গৃহস্থকে। তাঁর অর্চনা প্রসন্নতার জন্যে নয়, তাঁর অপ্রসন্নতার ভয়ে।

উঠোনে চাঁদোয়ার তলে ছোট ছোট দুখানি জলচৌকি পাতা হয়েছে। জল-চৌকির ওপর নীল লাল রঙের কাপড়ের টুকরো বিছিয়ে দিয়েছে মঙ্গলা। নীল রঙ শনির প্রতীক, রক্ত রঙ সত্যনারায়ণের। বারকোশ ভরেছে ফুল বেলপাতায়। দীপ জ্বলছে, ধূপ পুড়ছে। প্রতিদিনের অতি পরিচিত এই উঠোনটি হঠাৎ আজ এক পবিত্র পূজামণ্ডপে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে।

দুধারে সারিতে সারিতে জ্বাল দেওয়া রসের ভাঁড়, দুধের ভাঁড়। ফলমূল নৈবেদ্যের সঙ্গে কলাপাতায় কলা আর চালের গুঁড়ো স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে। পুজো শেষ হলে দুধে আর চালের গুঁড়োয় সিন্নি তৈরী হবে।

সামনে মাদুরের ওপর আগন্তুকদের আসন। সবেমাত্র দু-একজন আসতে শুরু করেছে। প্রথম দিকটায় সমাগম এমন অল্পসল্পই হয়। পুজো যখন শেষ হয়ে আসে, আয়োজন শুরু হয় প্রসাদ তৈরী করবার, লোকের ভিড় তখন বাড়তে থাকে।

শীতের রাত্রে বাইরে হিমের মধ্যে আগাগোড়া বসে থাকবার মতো নিষ্ঠাবান ভক্ত খুব বেশি মেলে না।

কিন্তু শনির পূজো শুরু হয়ে প্রায় শেষে হবার উপক্রম হল, লোকজন আসবার লক্ষণ তখনও দেখা গেল না। ভুবন চক্রবর্তীর অনুমতি নিয়ে ফটিকের ভাইপো রতন শনি ঠাকুরের পুঁথি পড়তে শুরু করল। কিন্তু মাঝে মাঝে শনির প্রীত্যর্থে উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি ঘোষণা করবার মতো দু-তিনজনের বেশি লোক জুটল না।

হঠাৎ নবদ্বীপদের বাড়ির ওদিক থেকে প্রবল শব্দে কাঁসর ও শঙ্খের শব্দ শোনা গেল। সুবল আর ফটিক পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ব্যাপার কি? পাল্লা দিয়ে নবদ্বীপও পুজো শুরু করল নাকি?

আন্দাজ অনুমানের প্রয়োজন রইল না। ফটিক নিজে গিয়ে গোপনে গোপনে খোঁজ নিয়ে এল। সত্যিই তাই। নবদ্বীপও সাড়ম্বরে আজ বাড়িতে নারায়ণ-পুজোর আয়োজন করেছে। উদ্যোগ পর্বের কথা কিছুমাত্র আগে থাকতে প্রকাশ করে নি। ভিতরে ভিতরে সব অনুষ্ঠান আয়োজন শেষ করেছে। তারপর সন্ধ্যার সময় বাড়িতে বাড়িতে নিজে এসে প্রত্যেককে নিমন্ত্রণ করে গেছে নবদ্বীপ। শুধু বাদ দিয়েছে ফটিক আর সুবলকে। দুধে রসে আর চালের গুঁড়োয় মিশিয়ে তরল কাঁচা সিন্নির ব্যবস্থা নয়, পাকা প্রসাদের বন্দোবস্ত করেছে নবদ্বীপ। দু-চারখানা বাতাসা নয়, বাজার থেকে মণে মণে সন্দেশ আর রসগোল্লা আনিয়েছে, পেটভরে প্রসাদ বিতরণ করা হবে নিমন্ত্রিতদের। যার যতখানি চাই। কোন রকম সঙ্কোচ, কোন রকম লজ্জা যেন কেউ না করে।

ব্যাপারটা কিছু কিছু প্রত্যেকেই জানে। অথচ সুবলকে সকলেই গোপন করে গেছে। আর কেবল গোপন করাই নয়, সুবলের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে, নির্লজ্জের মতো তারা গিয়ে জুটেছে নবদ্বীপের ওখানে। ফটিক বলল, 'মানুষের কথার চেয়ে, মান সম্মানের চেয়ে, বাজারের সন্দেশ-রসগোল্লার দামই কি এত বেশি হল সুবল দা?'

শনির পুজো শেষ হল, সত্যনারায়ণের পুজো শেষ হল, কিন্তু প্রসাদ নেওয়ার জন্যে নিমন্ত্রিত কাউকে আসতে দেখা গেল না। ছেলেপুলে দু-চারজন যারা এসেছিল, ফলের টুকরো আর বাতাসা দিয়ে সুবল তাদের বিদায় করল।

ফটিক বলল, 'এস সুবলদা, প্রসাদ মেখে ফেলি, তারপর ঘটি ভরে ভরে হতভাগাদের গলার ভেতরে ঢেলে দিইগে চল।'

সুবল বলল, 'না, তার চেয়ে নদীর জল ভালো।'

মঙ্গলা বলল, 'বল কি! গায়ের রাগে টাকা-পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস নষ্ট করে ফেলবে? এ যে চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো শোনাচ্ছে। প্রসাদ আর কেউ না খেতে আসে, আমরা নিজেরা তো আছি। এত কষ্ট করে দুধ জ্বাল দিলাম, রস জ্বাল দিলাম, চালের গুঁড়ো করলাম, পা ব্যথা হয়ে গেল ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে, এখন সব নদীর জলে ফেলে দিয়ে আসবে। আহাহা, কি সোহাগের কথাখানা রে। বালাই নিয়ে মরি অমন রাগের।'

সুবল ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপ! নাটাপানা চোখ ঘুরিয়ে অমন ঢঙ করে আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবি নে, খবরদার। তোর কথা শুনলে পায়ের তলা থেকে মাথার তেলো পর্যন্ত আমার জ্বলে ওঠে। নদীর জলে না ফেলে দিস তো নিজে বসে বসে গিলতে থাক। তারপর গিলে পেট ফুলে মর।' তারপব ফটিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর রাত বাড়িয়ে কি হবে ফটকে। প্রসাদ মাখতে হয় মাখ, না মাখতে হয় ফেলে দে। রাত বাড়াস নে।'

আর কোন কথা না বলে সুবল গিয়ে তামাক সাজতে বসল।

সুবল যা-ই বলুক, প্রসাদ একেবারে না তৈরী করলে চলে না। আলতা খেটেছে, ফটিক খেটেছে, কিছু ওরা এখানে বসে থাক, কিছু বাড়িতে নিয়ে যাক আর সকলের জন্য। আলতা আর ফটিককে নিয়ে মঙ্গলা প্রসাদ মাখতে শুরু করল। অবশ্য সুবলের কথার ভঙ্গিতে এসব জিনিস তার আর ছুঁতেও ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু এ তো কেবল স্বামী-স্ত্রীর রাগারাগি মান-অভিমানের ব্যাপার নয় যে মঙ্গলা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে! দুজনই হক, একজনই হক, বাইরের লোক যখন সামনে আছে তখন ওদের যত্নও করতে হবে, খাতিরও করতে হবে। মনের জ্বালা মনে রেখে হাসিমুখে দু-চারটে কথা না বললেও চলবে না।

দুধের সঙ্গে রস মিশিয়ে তার মধ্যে চালের গুঁড়ো ঢালতে ঢালতে আলতা বলল, 'হল কি তোমার? মুখ যে একেবারে অন্ধকার করে রইলে। সোয়ামীর কথায় অমন মুখ ভার করে থাকতে হয় নাকি বউদি।'

মঙ্গলা বলল, 'না তা কি আর হয়! সোয়ামী মুখ ঝামটাই দিক আর লাথিই মারুক, মুখ-ভার করাটা মেয়েমানুষের অপরাধ।'

আলতা বলল, 'অপরাধ ছাড়া কি? কথায় বলে মুখচন্দ্র। এ তো আর আকাশের চাঁদ নয় বউদি যে মেঘে ঢাকবে, অমাবস্যায় দেখা যাবে না। মুখের চাঁদের মেঘও নেই, অমাবস্যাও নেই, সব সময় কেবল পূর্ণিমা।'

মঙ্গলা বলল, পূর্ণিমা কতক্ষণ থাকত, গোয়ামীর লাথি খেলেই একবার বুঝতে পারতিস।'

আলতা গভীর খেদের অভিনয় করে বলল, 'কি করে বুঝব বউদি, বুঝবার আগেই কপাল গেল পুড়ে। এখন তো মনে হয় বেঁচে থেকে চব্বিশ ঘণ্টা সে যদি লাথিও মারত, তাহলেও টুঁ শব্দটি করতাম না, জীবন ধন্য মনে করতাম।'

ঠাট্টার ভঙ্গিতে কথাটা আরম্ভ করেছিল আলতা কিন্তু শেষের দিকে গলাটা যেন তার অন্য রকম শোনাল। চোখ তুলে তার মুখের দিকে তাকাল মঙ্গলা। দশ-এগার বছর বয়সের সময় আলতার স্বামী মারা গেছে। বিয়ে হয়েছিল ন বছরে। তারপর কৈশোর থেকে আরম্ভ করে ভরা যৌবনকাল পর্যন্ত লাথি মারবার মতো পুরুষ না হক, পায়ে পড়বার মতো মানুষ যে দু-একজন না এসেছে আলতার, তা নয়—মঙ্গলা সে সব খবর রাখে। কিন্তু তবু আলতার দুঃখ যায় নি, আশা মেটে নি। পুরুষমানুষ দু-চারদিনের জন্য মনের মানুষ হয়ে পায়ে ধরে সেধেছে, চিরকালের ঘরের মানুষ হয়ে পায়ে রাখে নি—সেই দুঃখ কি এতই দুঃসহ লাগছে আলতার? লাথি খেয়ে খেয়ে মঙ্গলার কিন্তু মাঝে মাঝে অন্য রকম সাধ যায় আজকাল। ইচ্ছা হয় দেখতে পুরুষমানুষ পা চেপে ধরলে কেমন লাগে। এতকাল তো পুরুষের পায়ের ওপর মাথা কুটে কুটে কপাল ফুলে গেল, এবার নিজের পায়ের ওপর ওদের কারো কপাল ঠোকা দেখতে ইচ্ছা করে। তাতে নিজের কপাল যদি পোড়ে পুড়ুক। সে পোড়ার মধ্যে হয়ত সুখ আছে।

প্রসাদ মেখে সাধাসাধি করে সুবলকে খাওয়াল আলতা, খাওয়াল মঙ্গলাকে। তারপর ছোট কলসীটার এক কলসী তরল সিন্নি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে গেল বাড়িতে। নারায়ণের প্রসাদ ঘরে নিলে দোষ নেই। যাওয়ার সময় ফটিকও এক কলসী নিয়ে গেল সঙ্গে। লোকজন তেমন কেউ না আসায় ভাগে অপ্রত্যাশিত ভাবে বেশিই পড়েছে ফটিকের। সুবলের মতো মনে তার অত ক্ষোভও নেই, দুঃখ নেই। ফটিক চলে যাওয়ার পর সুবল আর এক ছিলিম তামাক ভরল, তারপর আস্তে আস্তে টানতে টানতে আজকের ব্যাপারটার কথা আত্তোপান্ত ফের চিন্তা করে দেখল। বিশ্বাসঘাতক দুর্বল ভীরু প্রতিবেশীদের কথা মনে হতেই মন তার আরেকবার ধ্বক করে জ্বলে উঠল। কল্কেতে তামাক পুড়তে লাগল আর ভেতরে ভেতরে পুড়তে লাগল সুবলের মন। এর প্রতিশোধ সে নেবেই নেবে। সহজে ছাড়বে না। সুবলকে যেন তেমন নির্বোধ অক্ষম পুরুষ বলে কেউ না ভাবে।

মঙ্গলা ধীরে সুস্থে সব মুছল, গুছাল। জিনিসগুলি একে একে ঘরে নিয়ে

যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে দিতে লাগল—যেন কোন তাড়া নেই, ব্যস্ততা নেই, সমস্ত রাতই পড়ে আছে তার কাজের জন্য। তবু এক সময় কাজ শেষ হল। সুবল একটু আগেই বারান্দা থেকে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। কাজ সেরে মঙ্গলাও এবার দোর বন্ধ করতে যাবে হঠাৎ দেখা গেল বাঁশের ঝাড়ের ভিতর দিয়ে হ্যারিকেন হাতে কে যেন এদিকে এগিয়ে আসছে। আসতে আসতে লোকটি একেবারে উঠোনের ওপর এসে উঠল। মঙ্গলা ঘোমটা টেনে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ঢুকবে, লোকটি তার মুখের সামনে হ্যারিকেন উঁচু করে ধরে বলল, 'পালাচ্ছ কেন বউদি? আমি বাঘ ভালুক নই।'

হ্যারিকেনের আলোয় মঙ্গলাও দেখল মুরলীকে। এর আগেও অনেকবার দেখেছে সে।

সুবলের মা যখন বেঁচে ছিল, মুরলী প্রায়ই আসত এ-বাড়িতে। আমের সময় আম খেত, পিঠের সময় পিঠে। নবদ্বীপের সঙ্গে সুবলের ভিতরে ভিতরে তখন এমন রেষারেষির সম্পর্ক ছিল না। বৈকালে সুবলের মা প্রায়ই নবদ্বীপের কাছে গিয়ে হাত পাততো, মুখে দু-চারটে রুক্ষ কথা বললেও নবদ্বীপ তাকে একেবারে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিত না। শাশুড়ী মারা যাওয়ার পরও মুরলী মাঝে মাঝে এসেছে, কথা বলতে চেষ্টা করেছে মঙ্গলার সঙ্গে। কিন্তু সমস্ত পাড়া ভরে তখন মুরলীর দুর্নাম। মনে মনে কৌতূহল যতই থাকুক, মুখ ফুটে তার সঙ্গে কথা বলতে মঙ্গলার সাহস হয় নি। কে কখন কি বলে বসবে তার ঠিক কি। আর মুরলীর সঙ্গে কথাবার্তা বলা সুবলের যে পছন্দ নয় তাও তার বুঝতে বাকি থাকে নি। কোন কোন সময় সুবল স্পষ্টই তাকে নিষেধ করে দিয়েছে, 'খবরদার, ওর সামনে বেরুবি নে; লোক ও ভালো নয়।' কিন্তু মুরলী যখন বিজয়ার দিন এসে মঙ্গলার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছে, পায়ের ধুলো তুলে নিয়েছে, তখন ধান-দূর্বা তার মাথায় দিতে দিতে মুরলীর সঙ্গে কথা না বলে থাকা মঙ্গলার পক্ষে সম্ভব হয় নি। লোক যতই খারাপ হক মুরলী, তাতে মঙ্গলার কি! পায়ের ধুলো যে নিতে আসে তার মন্দত্বের কথা কি মনে থাকে? কিন্তু গৃহস্থের বউকে তো কেবল পায়ের ধুলো দিলেই চলে না। পূজা-পার্বণের দিনে কেউ এলে হাতে তার একটু মিষ্টিও দিতে হয়, মিষ্টিমুখে দুটো কথাও বলতে হয়।

কোন কোন সময় হেসে বলেছে, 'আপনার ভক্তি দেখে যে ভয় হয় ঠাকুরপো। অত ভক্তি যেন কিসের লক্ষণ লোকে বলে।'

মুরলী জবাব দিয়েছে, 'চোরের। কিন্তু তোমার অত ভয় কিসের বউদি?'

'কেন চুরি যাওয়ার মতন কোন জিনিস কি আমার নেই ?'

মুরলীও হেসেছে, 'খুব আছে। কিন্তু বড় কড়া পাহারায়। আমার মতো ছিঁচকে চোরের সাধ্যি কি সেখানে হাত বাড়ায়।'

মঙ্গলা জবাব দিয়েছে, 'সে কথা মনে থাকে যেন।'

সে-কথা অদ্ভুত ভাবে মুরলী মনে রেখেছে। দু-একটা ঠাট্টা তামাসার কথা ছাড়া আর কোন রকম আপত্তিজনক ব্যবহার মুরলী তার সঙ্গে করে নি। মনে মনে এর জন্য গর্ব বোধ করেছে মঙ্গলা। এ কেবল বাইরে কড়া পাহারার ভয় নয়, এর চেয়েও শক্ত পাহারা মুরলী ডিঙিয়ে গেছে। আসলে সুবলকে নয়, ভয় করে মুরলী মঙ্গলাকেই। তার রাশভারি স্বভাবের কাছে দুনিয়ার কোন লম্পট আমল পায় না, পায়ের ধুলো ছাড়া আর কোনদিকে সাহস পায় না হাত বাড়াতে।

তারপর অন্যদিকে মন গিয়েছে মুরলীর, অন্যের দিকে মন গিয়েছে। বয়স বাড়া সত্ত্বেও বিশ্রী কেলেঙ্কারী কাণ্ড করেছে পাড়ার মধ্যে। শুনে মঙ্গলার ঘৃণা হয়েছে, রাগ হয়েছে, কেমন এক ধরনের দুঃখও যে না হয়েছে তা নয়।

মিনিট খানেক নিঃশব্দে হ্যারিকেনটা উঁচু করেই রাখে মুরলী। তারপর সেটাকে নামিয়ে নিয়ে বলল, 'দেখলে তো ? ঘুচল তো এবার ভয় ?'

মঙ্গলা বলল, 'মানুষ কি কেবল বাঘ-ভাল্লুককেই ভয় করে ?'

মুরলী বলল, 'পুরুষমানুষের ভয় কেবল বাঘ-ভাল্লুককেই। মেয়েমানুষের ভয়ের জিনিস অবশ্য আরো আছে।'

মঙ্গলা বলল, 'না। ভয় মেয়েমানুষেরও কেবল বাঘ-ভাল্লুক দেখলেই হয়। ইঁদুর টিকটিকি ছুঁচো চামচিকে দেখলে তাদের যে গা শিরশির করে ওঠে, সেটা ভয়ে নয় ঘেন্নায়। বসুন। ডেকে দিচ্ছি আপনার দাদাকে।' তারপর ঘরের মধ্যে গিয়ে মঙ্গলা স্বামীকে ডেকে তুলল, 'ওঠো, ঠাকুরপো এসেছেন।'

সুবল ততক্ষণ নাক ডাকাচ্ছিল। এদিক থেকে ভারি চমৎকার স্বভাব সুবলের। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বোজে আর চোখ বোজবার সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে নাক ডাকতে শুরু করে।

সুবল চমকে উঠে বসল, 'কে ? কে এসেছে ?'

মঙ্গলা আবার বলল, 'ওবাড়ির মুরলী ঠাকুরপো।'

সুবল বিস্মিত হয়ে বলল, 'মুরলী! কেন ? এত রাত্রে মুরলী এখানে এসেছে কেন ?'

মঙ্গলা বলল, ‘কেন আবার ? মজা দেখতে। আমরা কি রকম অন্ধ হয়েছি তাই নিজের চোখে দেখে যেতে।’

সুবল বলল, ‘হুঁ।’ তারপর মুরলীকে ডেকে বলল, ‘বাইরে কেন, ঘরে এসে বস মুরলী। তারপর, এত রাত্রে কি মনে করে ?’

মুরলী জবাব দিল, ‘মনের কথা তো বউদির মুখে এই মাত্র শুনলে। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? তোমার ভারি অবিশ্বাসী খুঁতখুঁতে ধরনের মন সুবলদা। না, ঘরে যাব না, রাত হয়েছে। মিষ্টির হাঁড়িটা তুলে রাখ বউদি। এটা শনির নয়, নারায়ণের প্রসাদ। ঘরে নিলে দোষ হবে না।’

মঙ্গলা বেরিয়ে এসে বলল, ‘নারায়ণের প্রসাদ ঘরে আমরা নিয়েছি ঠাকুরপো। আর দরকার নেই। ওটা নিয়ে যাও, ললিতা আর তার মাকে দিও।’

মুরলী বলল, ‘তাহলে সুবলদা, তুমি নিজেই এসে তুলে নিয়ে যাও। পরের মেয়ে কেবল বাইরের শত্রুতাটুকুই বোঝে, বাইরের রেষারেষি রক্তারক্তিই তার চোখে পড়ে, ভেতরের রক্তের টান সে ধরবে কি করে! বুড়ো বললে, আহা এত লোক খেল, কেবল সুবল আর বউমাই বাদ যাবে! দলাদলি যখন আরম্ভ করেছে তখন ডাকলে তো আর তারা আসবে না। তুই যা, নিজে গিয়ে প্রসাদ দিয়ে আয় ওদের। আর কারো হাতে পাঠাতে ভরসা হয় না বাপু, হয়তো তাকে অপমান করে বসবে। কিন্তু তোকে দু-চারটে কথা শুনিয়ে দিলে তো আমার গায়ে লাগবে না। বলবি, সামাজিক ভাবে দলাদলি করুক, রাগারাগি করুক, না আসতে চায়, না আসুক আমার বাড়ি। কিন্তু ঘরে বসে জ্যেঠার দেওয়া প্রসাদ খেলে তার মানও যাবে না, জাতও যাবে না।’

মুরলীর কথার ভঙ্গিতে সুবলের বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল। পরস্পরের মধ্যে নিকটতর রক্তের সম্বন্ধকে যেন নতুন করে অনুভব করল সুবল। মুরলী যেন কোন অপরাধ করে নি, সুবল যেন তার শাস্তির জন্য দল পাকাবার চেষ্টা করে নি, নবদ্বীপের আশ্বাস এবং আশ্রয় পেয়ে সুবল যেন হঠাৎ ভারি তৃপ্তি বোধ করল ; ভারি নিশ্চিন্ত হল, পরাজয়ের গ্লানি রইল না তার মনে।

সুবল বলল, ‘অত করে তোমাকে বলতে হবে না মুরলী. জ্যেঠার মনের ভাব আমি জানি।’

মুরলী বলল, ‘না জানবার তো কথা নয় সুবলদা, বাবা যে আমার চেয়েও তোমাকে বেশি ভালোবাসেন বেশি নির্ভর করেন তোমার ওপর, এ তো গ্রামসুদ্ধ লোক দেখেছে।’

সুবল কথা না বলে মৃদু একটু হাসল।

মুরলী হ্যারিকেনটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'তা হলে প্রসাদটা তুলে রাখ, আমি চলি।'

কিন্তু মুরলী চলে যাওয়ার আগেই মঙ্গলা এল ঘর থেকে বেরিয়ে, বলল, 'দাঁড়ান।'

মুরলী ফিরে তাকাল। মঙ্গলার পরনে অনেককালের পুরোন গরদের একখানা শাড়ি, পুজো-পার্বণের দিনে মঙ্গলা এখানা বার করে পরে। কিন্তু এই রঙ-ফিকে-হয়ে-যাওয়া খাটো জীর্ণ গরদের শাড়িখানায় মঙ্গলার রূপ যেন আরো বেশি করে খুলেছে। মঙ্গলাকে মনে হচ্ছে তপস্বিনী সন্ন্যাসিনীর মতো। মুখখানা শুকনো শুকনো রুক্ষ, কিন্তু সেই কঠিন মুখে মঙ্গলা যখন বিদ্যুতের মতো এক ঝিলিক হাসল সে হাসি চোখে এসে বিঁধলেও মুরলী চোখ বুজতে পারল না।

মঙ্গলা বলল, 'দাঁড়ান, দাদার সঙ্গে খুব তো আপস নিষ্পত্তি করলেন। প্রসাদ কি কেবল দিয়েই যাবেন, নিয়ে যাবেন না? পুজো তো আমাদেরও হয়েছে।'

মুরলী বলল, 'দিচ্ছ কই যে নেব? দিয়ে দেখ নিই কি না নিই।'

'তাহলে আসুন, বসুন এসে ঘরে।'

'কিন্তু এত রাত্রে আবার ঘরে কেন, যা দেবার এখানেই দাও।'

'থাক আর লজ্জার দরকার নেই। এবার চলে আসুন ঘরে।'

ঘরের ভিতরে আসন পেতে দুখানা ঠাঁই করল মঙ্গলা। পিতলের রেকাবিতে শশা আর আখের টুকরো সাজিয়ে দিল, পাথরের বাটি ভরে দিল তরল সিন্নি। মুরলীর আনা মিষ্টিগুলি দুভাগ করে দুজনের পাতে তুলে দিল।

সুবল বসতে বসতে বলল, 'আবার আমাকে কেন?'

মঙ্গলা মুরলীকে যা বলেছিল সুবলকেও তাই বলল, 'থাক আর লজ্জা করতে হবে না।'

মুরলী বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওকি সবই আমাদের পাতে দিয়ে দিলে যে। নিজের জন্যে তো কিছুই রাখলে না?'

মঙ্গলা জবাব দিল, 'না। পরের মেয়ে কি অত সহজে ভোলে? আপস নিষ্পত্তি কি আর এত সহজে হয় তার সঙ্গে? এ তো রক্তের টান নয়।' বলে মঙ্গলা মুখ মুচকে একটু হাসল।

আর সেই হাসির ভঙ্গিতে অকস্মাৎ মুরলীর রক্তের সমুদ্র যেন উত্তাল হয়ে উঠল। মুরলী মনে মনে ভাবল, এও এক রকমের টান, কেবল এর ধরন আলাদা।

৯

কলকাতা থেকে মধু সার জামাই অজিত এল তার স্ত্রী রঙ্গীকে নিয়ে যেতে। এক বছর বাদে এক সপ্তাহের ছুটিতে এসেছে শ্বশুরবাড়ি। কোথায় মুখে থাকবে প্রসন্নতার ছাপ, কথাবার্তায় থাকবে খুশির আমেজ, তা নয় কঠিন গাম্ভীর্যে মুখখানা তার থমথম করছে। এই মুখ ভার হওয়ার হেতু যে কি তার শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুমান করতে বাকি রইল না। পথে নিশ্চয়ই কেউ সাতখানা বানিয়ে জামাইয়ের কান ভারি করে দিয়েছে। শত্রুর তো অভাব নেই পাড়ায়। ভালো কেউ করতে পারুক আর না পারুক, মন্দ করতে পারে অনেকেই।

কোনরকমে মাথাটা একটু নিচু করে প্রণাম পর্ব সারল অজিত, কুশলপ্রশ্নের জবাব দিল শুষ্ক কণ্ঠে, জলখাবারের প্রায় সব জিনিসই থালায় ফেলে একথা ওকথার পরই হঠাৎ শাশুড়ীকে বলে বসল, 'কালই ভোরে আমায় রওনা হতে হবে। ওকে বলবেন রাত্রেই যেন সব গুছিয়ে-টুছিয়ে রাখে।'

সুলোচনা শুকনো মুখে একটু হাসল, 'এত তাড়া কিসের বাবা। এতদিন বাদে এই তো এলে, দুদিন থাক—।'

অজিত বলল, 'না, হয়ে উঠবে না। কাল ভোরেই—'

সুলোচনা এবার একটু তরলস্বরে বলতে চেষ্টা করল, 'আচ্ছা, সে ভোরের তো এখনো দেরী আছে। রাতটা তো আছে মাঝখানে।'

অজিত এবার সোজা শাশুড়ীর দিকে তাকাল। সুলোচনা লজ্জিত হয়ে বলল, 'মানে এসব কথার আলোচনা রাত্রেই করা যাবে। তোমার শ্বশুরও তখন ফিরবেন হাট থেকে।'

মাঝখানে রাতটা আছে। অজিতের মনে হল রাতটা না থাকাই ভালো ছিল। রঙ্গী কোন কথা স্পষ্ট করে লেখে নি, কিন্তু বিষ্টু সা ইঙ্গিতে তাকে অনেক কথাই জানিয়ে দিয়েছে। কুমারগঞ্জ থেকে হাটের সওদা নিয়ে সে অজিতের নৌকায় উঠে বসেছিল। বলেছিল, 'এতটা পথ বোঝাবিঁড়ে নিয়ে হেঁটেই যেতে হত, কিন্তু তোমার নৌকা যখন পেয়ে গেলাম নাতজামাই, তখন আর হেঁটে মরব কোন দুঃখে।'

তারপর বলব না বলব না করে, চেপে যাচ্ছে চেপে যাচ্ছে ভাব দেখিয়ে বিষ্টু সা অনেক কথাই বলেছে। অজিত মুখ বিকৃত করে একবার বলেছে, 'থাক।' কিন্তু পরমুহূর্তে আবার জিজ্ঞাসা করেছে, 'হুঁ, তারপর?'

রাত্রে রঙ্গী একটু বিশেষ ধরনের সাজগোজ করল। ট্রাঙ্ক থেকে নামিয়ে জমকালো শাড়ি পরল একখানা। কলকাতা থেকে আসবার সময় অজিত নিজে হাতে এখানা কিনে এনেছিল। পায়ে আলতা, কপালে টিপ। পান আর খয়েরের রসে ঠোঁট দুটি রঞ্জিত হয়ে উঠল। খোঁপার মধ্যে গোঁজা সোনার চিরুনি ঝিক-মিক করতে লাগল, আর তেলের গন্ধে ঘর উঠল ভরে।

অজিত কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'এই বেশেই কি সেদিন কীর্তনে গিয়েছিলে নাকি?'

রঙ্গী যেন চমকে উঠল, সেই অপ্রীতিকর অপবিত্র প্রসঙ্গ স্বামীর মুখে কেন! মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে রঙ্গী বলল, 'তোমার কি তাই বিশ্বাস হয়?'

অজিত বলল, 'বিশ্বাসের কথা থাক। আমার বিশ্বাসের কি মান রেখেছ?'

রঙ্গী সাহস করে আরও একটু ঘেঁষে বসল স্বামীর কাছে, তারপর খুব কোমল মিনতিপূর্ণকণ্ঠে বলল, 'সত্যি করে বল তো, কে কি বলেছে তোমাকে? মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে কে তোমার মন খারাপ করে দিয়েছে।'

অজিত বলল, 'বানিয়ে বানিয়ে!'

রঙ্গী বলল, 'বানিয়ে ছাড়া কি! ওবাড়ির মুরলীদা তো সম্পর্কে আমার ঠাকুরদা হয়।'

অজিত হাসল, 'সম্পর্কে কি হয় জানি নে, কিন্তু বয়সে নিশ্চয়ই ঠাকুরদার বয়সী নয়।'

রঙ্গী বলল, 'তার আমি কি জানি। ঠাকুরদার সম্পর্ক ধরে কেউ যদি একটু ঠাট্টা-তামাসা করতে আসে আমি তো আর বলতে পারি নে, আগে ঠাকুরদার বয়স হক তারপর এসব কথা বলতে এস।'

অজিত বলল, 'সে তো ঠিকই। সেকথা বলতে প্রাণে যে বাজে। কিন্তু তামাসাটা নাকি একটু বাড়াবাড়ি ধরনের হয়ে গিয়েছিল শুনতে পাচ্ছি।'

রঙ্গী দমল না, বলল, 'শুনবে না কেন? বাড়িয়ে বাড়িয়ে যদি কেউ বলে কানে, বাড়াবাড়ির মতোই শোনায়। আর পোড়া দেশের লোক পারে তো কেবল ওই। রান্নাঘরের হাঁড়িতে কুকুরে এসে মুখ দিলে যত রাগ যায় তাদের হাঁড়ির ওপর। কুকুরের কিছুই করতে পারে না। কেবল কাছা আঁটে আর কোমর বাঁধে।'

অজিত স্ত্রীর দীপ্ত ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে মনে যেমন ভেবেছিল, রঙ্গী ঠিক তেমনটি করল না দেখে সে খুশিই হল। রঙ্গী যদি অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে থাকত, কান্নাকাটি করত কিংবা পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইত, তাহলে

তার সম্বন্ধে সন্দেহ আরো বাড়ত অজিতের। কিন্তু ঘাড় বেঁকিয়ে রাগে মুখ লাল করে রঙ্গী যে অজিতকে কতগুলি কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিল, তখন কান তৃপ্ত না হলেও মনের জ্বালা যে অজিতের অনেকখানি শান্ত হল, একথা তার মুখের ভাবে গোপন রইল না।

পরদিন ভোরে অজিতকে আরও প্রসন্ন দেখাল। রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে শাশুড়ীর তৈরী চা আর জলখাবার খেতে খেতে কলকাতার গল্প করল। শ্বশুরকে নিতান্ত আপনজনের মতো জানাল নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। বেলগাছিয়া কলেজে হাউস সার্জনগিরি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তার। এবার অজিত নিজেদের গাঁয়েই ডিস্‌পেনসারি খুলে বসবে। সে অঞ্চলে ভালো ডাক্তার নেই। দশখানা গাঁয়ের মধ্যে অজিতই হবে প্রথম এম-বি ডাক্তার। রোজগারও হবে, দেশের সেবাও হবে।

পুরোপুরি এক সপ্তাহ অবশ্য অজিত রইল না; দিন পাঁচেক কাটিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে সে কলকাতায় রওনা হল। কিন্তু এই কদিনের মধ্যেই শ্বশুরের পাড়া প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে নানা রকম টিপ্পনী আর মন্তব্যে সমস্ত পাড়াকে বেশ চঞ্চল করে তুলল। অজিতের চলে যাওয়ার পরও পুরুষদের তাসের আড্ডায় আর মেয়েদের জলের ঘাটে কেবল তার কথাই আলোচনা হতে লাগল।

কেবল টীকাটিপ্পনীই নয়, আচারে আচরণে অজিত আরও কিছু শিক্ষা দিয়ে গেছে গাঁয়ের লোককে। মাঝখানে একদিন নবদ্বীপ নিজে এসেছিল নিমন্ত্রণ করতে, 'দুপুরে আজ তোমার মেয়েজামাইকে আমার ওখানে নিয়ে যাচ্ছি মধু', তারপর অজিতের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'গরীবের বাড়িতে এ বেলা দুটি শাকান্ন মুখে দিতে হবে বাবাজী। আমার বউমার ভারি ইচ্ছে তোমাদের দুজনকে এক সঙ্গে বসে খাওয়ায়।'

অজিত হাত জোড় করে জবাব দিয়েছিল, 'আজ্ঞে না, মাফ করবেন। জানেনই তো, ডাক্তার মানুষ! যেখানে সেখানে পাত পাততে সংস্কারে বাধে।'

যেখানে সেখানে! রাগটা মনে মনে হজম করে নবদ্বীপ মুখে হাসি টেনে বলেছিল, 'যেখানে সেখানে নয় হে বাবাজী, আমার বাড়িও তোমার শ্বশুড়বাড়িই। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করে দেখ তোমার শাশুড়ীকে।' তারপর রসিকতার তাৎপর্যটুকু নিজেই ব্যাখ্যা করে বলেছিল, 'মধু আমার নাতি হয় সম্পর্কে।'

অজিত বলেছিল, 'আজ্ঞে তা জানি, আপনাদের দেশের নাতিনাতনি-ঠাকুরদার

সম্পর্কের মাধুর্যের কথা কিছু কিছু আমিও শুনেছি। কিন্তু তার মধ্যে বিদেশীকে দয়া করে টেনে আনবেন না। তার চেয়ে এক কাজ করুন না কেন তাঁরৈ মশাই! আমাদের অল্পবয়সী ঠাকুরদা ঠানদিকেই বরং এখানে পাঠিয়ে দিন। আমারও ভারি ইচ্ছা ওঁদের দুজনকে একসঙ্গে দেখি। আমার মতো ওঁদের তো আর এমন শুচিবাই নেই, আহারে বিহারে কোন বাদবিচারও নেই।'

নবদ্বীপ তবু শুকনো মুখে হেসেছিল, 'কানে শোনা এক কথা, চোখে দেখা আর এক। তাদের কি আছে কি নেই নিজের চোখেই একবার দেখে এস না বাবাজী।'

প্রত্যুত্তরে অজিত শহুরে কায়দায় আর একবার মাত্র অল্প একটু হাত জোড় করেছিল, কোন কথা বলে নি।

কিন্তু মঙ্গলা যখন এ-বাড়ি বেড়াতে এসে অজিত আর রঙ্গীকে নিমন্ত্রণ জানাল, অজিত না তো করলই না বরং সানন্দে রাজী হয়ে গেল। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই গিয়ে উপস্থিত হল সুবলের বাড়ি, পিঁড়ি পেতে বসল, গাঁয়ের কথা শুনল, শহরের কথা শোনাল, তারপর পেট ভরে খেয়ে প্রসন্নমনে ফিরে এল। আসবার সময় বলল, মঙ্গলার মতো এমন বউ এ গাঁয়ে তো ভালো এ অঞ্চলেও নেই। শহরের রীতিমত লেখাপড়া জানা ভদ্রঘরের বউ-ঝিয়ের সঙ্গেও সে নাকি তাল রেখে চলতে পারে। রঙ্গী একবার মুচকি হেসে আর কারো কানে না যায় এমন স্বরে স্বামীকে বলেছিল, 'কাকীমা কিন্তু সম্পর্কে তোমার শাশুড়ী হন, ভুলে যেয়ো না।' অজিত সে কথা কানে তোলে নি।

সুবলকেও কম সার্টিফিকেট দিয়ে যায় নি অজিত। এ গাঁয়ে পুরুষমানুষ সত্যিই যদি কেউ থাকে, সে সুবল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি কিছুটা প্রতিবাদ করবার সাহস থাকে, সুবলেরই আছে। সব কথা অজিত রঙ্গীর কাছে শুনেছে। শুধু রঙ্গী কেন, গাঁয়ের সব লোকই একথা বলত যদি নবদ্বীপের ভয়ে মুখ তাদের বন্ধ হয়ে না থাকত।

শুনে সুবল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। শনির পূজায় তার পরাজয়ের গ্লানি আর অগৌরব এতদিনে যেন মুছে গেল। পাড়ার সমস্ত লোক সুবলের বাড়ি নিমন্ত্রিত হয়ে নবদ্বীপের বাড়ি গিয়ে খেলে কি হবে, পৃথিবীতে এমন লোকও আছে যে তাদের মতো নয়, যে অসংকোচে নবদ্বীপকে প্রত্যাখ্যান করে সুবলের বাড়ি এসে নির্ভয়ে পাত পেড়ে বসতে পারে, মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে পারে সুবলের পৌরুষ আর মহত্ত্ব। সঙ্গে সঙ্গে সুবলের খানিকটা ভাবান্তরও হয়েছিল।

সেদিন দলাদলিতে কোণঠাসা হয়ে সুবলের যেমন নবদ্বীপের সঙ্গে রক্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের-কথা মনে পড়ে গিয়েছিল আজ অজিতের অজস্র প্রশংসায় আর অভিনন্দনে সুবল অন্য রকম অনুভব করল।

সুবলের মনে হল রক্তগত ঐক্য নবদ্বীপের সঙ্গে তার থাকলেও সুবল সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ ; তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা আলাদা, ভালো-মন্দ বোধ আলাদা। পাড়ার লোকের সত্যি সত্যি সে যতখানি উপকার করতে চায়, যেমন চায় গাঁয়ের ব্রাহ্মণ-কায়স্থের সমাজে তাদের মান বাড়ুক, তাদের ভিতরকার অনাচার কদাচার দূর হক, লেখাপড়া শিখে বাইরের পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তাদের ছেলেপুলেরা মেলামেশা করুক—কিন্তু এ ধরনের কোন ইচ্ছাও নেই, তেমন কোন চেষ্টাও নেই নবদ্বীপের। কেবল তার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আছে বলে তার মতো চাল সুবলও মাঝে মাঝে চালতে যায় বলেই কি নবদ্বীপ আর সুবল এক রকমের মানুষ? পাড়ার লোক যখন মাঝে মাঝে বলে, বুদ্ধিতে কৌশলে সুবল এ পাড়ার ভবিষ্যৎ নবদ্বীপ সা তখন খুশি হওয়ার সঙ্গে সুবল একটু ক্ষুণ্ণ হয়। বুদ্ধি হয়ত সুবলের আছে, কিন্তু সে বুদ্ধি কি নবদ্বীপের মতো অমন ক্রুর আর কুটিল! না, বুদ্ধি তেমন বাঁকা না হওয়া পর্যন্ত লোকে বুদ্ধিকে বুদ্ধি বলে না।

সুবলের বাড়ি এসে নিমন্ত্রণ খাওয়ার কথা খানিকক্ষণ বাদেই নবদ্বীপের কানে গিয়েছিল। কিন্তু মনে মনে প্রচণ্ড রাগ হলেও বাইরে কোনরকম চাঞ্চল্য কি ভাব-বৈলক্ষণ্য নবদ্বীপ দেখায় নি। কার জামাই কার বাড়িতে এসে খেল না খেল সেই মেয়েলি ব্যাপারে মন দেওয়ার মত সময় কি নবদ্বীপ সার আছে, না থাকলে ভালো দেখায়? সুবল প্রস্তুত হয়েই ছিল। যদি এটা নিয়ে নবদ্বীপ আবার কোন চক্রান্ত করবার চেষ্টা করে, সুবল তাকে সহজে ছাড়বে না, গতবারের মতো ভয়ে চুপ করেও থাকবে না। কিন্তু নবদ্বীপকে এসব ব্যাপার নিয়ে মোটেই আর মাথা ঘামাতে দেখা গেল না। গঞ্জের ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, ব্যস্ততা নেই কেবল মুরলীর। তার হাট-বাজার নেই, বেচাকেনা নেই, সংসারের কিছুই তাকে দেখতে শুনতে হয় না। ভোরে উঠে নবদ্বীপ যায় গঞ্জে, মনোরমা সংসারের কাজে মগ্ন থাকে, ললিতা মাঝে মাঝে মায়ের ধমক খেয়ে সংসারের কাজে লাগে, তারপর একটু ফাঁক পেলেই পালায়, পাড়ায় গিয়ে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জোটে। মুরলী সঙ্গী পেলে প্রায়ই তাসপাশা খেলে, কোনদিন গঞ্জের লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে আনা নভেলের দু-চার পাতা পড়ে, পড়তে পড়তে ঘুমোয়। বিকেলের দিকে দেহের প্রসাধন শুরু হয়। দাড়ি

কামায়, টেরি কাটে, মুখে স্নো-পাউডার মাখে, তারপর ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় পরে বেড়াতে বেরোয় গঞ্জের দিকে। যে গঞ্জ তার বাবার, তার পাড়াপ্রতিবেশীর কর্মস্থল, যেখানে তারা গ্রীষ্মের দিনে ঘামে-ধুলোয় মাখামাখি হয়ে থাকে, বর্ষার এক হাঁটু কাদার মধ্যে পান সুপুরি হলুদ লঙ্কা বিক্রি করে, মুরলী সেজেগুজে সেখানে বেড়াতে যায় সান্ধ্য আমোদ-প্রমোদের জন্য। যে সব জায়গায়, যে সব বাসা বাড়িতে তার পাড়া প্রতিবেশীরা ঢুকবারও সাহস করে না, মুরলী সে সব জায়গায় সাদর অভ্যর্থনা পায়। ছোট দারোগার চেম্বারে বসে সে প্রথমটা বাংলা খবরের কাগজ পড়ে, চা খায়; তারপর রাত যত বাড়তে থাকে তত পানীয় বদলায়, পানপাত্র বদলায়, ছোট দারোগা আর মুরলীর মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত প্রভেদ লুপ্ত হয়ে যায়। নারী সম্বন্ধে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলে মুরলী। তাদের দেহ-মন আয়ত্তে আনবার কলাকৌশলগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়, আবার স্বাদ যখন একঘেয়ে হয়ে আসে তখন নিরাপদে এবং অল্পায়াসে কি করে তাদের বর্জন করতে হয় সে বিদ্যা সম্বন্ধেও মুরলী তার তরুণ দারোগা বন্ধুকে অবহিত করে তোলে।

মুরলী জানে এই বর্জনের বিদ্যাটা সহজ নয়। কোন মেয়ের দেহ-মন অধিকার করা যত কঠিন, প্রয়োজন শেষ হলে সেই অধিকার সরিয়ে আনা আরও শক্ত। প্রায়ই দেখা যায় মুরলীর যখন কাজ শেষ হয়েছে, আসক্তি মিটেছে, ঠিক তখনই হয়ত মেয়েটি কি বধূটি চোখের জলে মুরলীর দু পা ভিজিয়ে দিতে শুরু করল, কিংবা দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধরে রাজ্যের সোহাগের কথা বলতে আরম্ভ করে দিল। যে একদিন কিছুতেই আসতে চায় নি, সে আজ যেতে চায় না, যে একদিন ধরা দিতে চায়নি, সে আজ কিছুতেই ছাড়া পেতে রাজী নয়।

এমন বিপদে মুরলীকে প্রত্যেকবারেই পড়তে হয়েছে। বারবার প্রতিজ্ঞা করেছে মুরলী আর আসবেনা এ সব ব্যাপারের মধ্যে। এই মোহভঙ্গের মতো শাস্তি আর নেই। প্রত্যেকবারই কোন না কোন সময় এমন একটি দশা আসবেই যখন কাজল-কালো চোখ দুটির সেই রহস্যময় দৃষ্টিকে মনে হবে গরুর চোখের মতো নির্বোধ নিরুত্তেজ, যখন আবেগরুদ্ধ গদগদ ভাষাকে মনে হবে ন্যাকামি, প্রত্যেকটি চাল-চলন আচার-আচরণকে দুঃসহ বোকামি বলে ঠেকবে। এই মোহ একদিন না একদিন ভাঙবেই। কিন্তু ফের আবার মোহ যখন আসে তখন সেই ভাঙবার কথা মনে থাকে না, মন এমনিই মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে।

রঞ্জীর ব্যাপারটা এত সহজে এত তাড়াতাড়ি মিটে যাওয়ায় মুরলী মনে মনে খানিকটা স্বস্তিই বোধ করল। যদিও নবদ্বীপের ভয়ে আর বুদ্ধির কৌশলে পাড়ার

পাঁচজনে মুরলীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করে নি, সুযোগও পায় নি, তবু মুরলীর মনে কিসের একটা অস্বস্তি অনুক্ষণ কাঁটার মতো বিঁধছে। তার অদক্ষ কাঁচা কাজের সাক্ষী হয়ে মেয়েটা এখানে পড়ে থাক, আর লোকে আকারে ইঙ্গিতে তাই নিয়ে হাসি মস্করা করুক, তা মুরলী কিছুতেই চায় না। তার চেয়ে মেয়েটা এখান থেকে সরে গেলেই ভালো। তুদিন বাদে লোকেও ভুলবে, মুরলীও ভুলবে।

কিন্তু রঙ্গীকে নিয়ে চলে যাওয়ার আগে তার স্বামী অজিত যখন তার সম্বন্ধে বেশ খানিকটা কটু মন্তব্য করে গেল, নবদ্বীপের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে সুবলের বাড়িতে খেয়ে তার বউ মঙ্গলার শতমুখে প্রশংসা করে গেল, তখন আকস্মিক অপ্রত্যাশিত একটা ঈর্ষার খোঁচা লাগল যেন মুরলীর মনে। অজিত যেন শুধু নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এ গ্রাম থেকে বিদায় হয় নি, অন্য একজনের স্ত্রীর মনেও নিজের প্রভাব রেখে গেছে। অবশ্য সে স্ত্রী মুরলীর নিজের নয়। তবু ঈর্ষার জ্বালাটা মুরলী নিজেই অনুভব করল। স্ত্রী মনোরমার মুখে কিছু কিছু গল্প শুনতে পেয়েছে মুরলী। অজিত যেদিন রঙ্গীকে নিয়ে যায় মঙ্গলা স্বেচ্ছায় গিয়ে তাদের মালপত্তর বাঁধতে সাহায্য করেছে, গুছিয়ে দিয়েছে বাক্স পেটরা, নদীর ঘাট অবধি তাদের এগিয়ে দিয়ে এসেছে। মঙ্গলার বয়সী আর কোন বউই পাড়ার অন্য বাড়ির জামাই-কনের সঙ্গে এমন করে মেলা-মেশা করতে সুযোগ পায় না। কিন্তু মঙ্গলার কিছুতেই আটকায় না। মাথার ওপর তার শাশুড়ী নেই, স্বামীর ওপর তো সর্বদাই টেক্কা দিয়ে চলে, এই বয়সেই একেবারে রাশভারি বড়লোকের বাড়ির গিন্নিবান্নির মতো চালচলন! তবু এই স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতার জন্য মঙ্গলার বদনাম হয় না। কারণ মঙ্গলাকে দিয়ে অনেক কাজ হয়। বিয়ে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কারো বাড়িতে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের আয়োজন হলে রাঁধবার জন্য ডাক পড়ে মঙ্গলার। রান্নার এমন মিঠে হাত আর কারো নেই। কোন রকমের অসুখবিসুখ কারো হলে মঙ্গলা যায় শুশ্রূষা করতে। সেবা-যত্নেও ভারি অনলস আর নিপুণ তার হাত। ছেলেপুলের ঝামেলা না থাকায় মঙ্গলার বেশ সুবিধাই হয়েছে। ঘরে কাজ নেই, ঘরে তার মন নেই; তুহাতে নির্বিচারে বাইরের লোকের প্রশংসা কুড়িয়েই সে খুশি।

এতদিন এই সদগুণের ডিপো বউটির সম্বন্ধে মুরলীর কোন ঔৎসুক্য ছিল না। নিজের স্ত্রীর মতোই অত্যন্ত ঠাণ্ডা এবং নিরস প্রকৃতির মেয়েমানুষ বলে মনে করত মুরলী। কিন্তু সেদিন শনির পুজোর রাত্রে মঙ্গলার যেন আর এক পরিচয় পেয়ে এসেছে সে। তার বিরূপতাও মুরলীর ভালো লেগেছে। ভাল লেগেছে তার সরাসরি সতেজ কথাবার্তা, তার স্পর্ধিত সপ্রতিভতা মুরলীকে যেন আরো মত্ত

করে তুলেছে। মুরলী লক্ষ করেছে পাড়ার অন্য বউঝিরা তাকে দেখলেই তাড়াতাড়ি আড়ালে পালায়, তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে। কিন্তু মঙ্গলাকে কোনদিন অমন সে পালিয়ে যেতে দেখে নি। সহজভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলেছে, হাসিঠাট্টা করেছে, কিন্তু এতটুকু বাড়াবাড়ি করবার সাহসও কোনদিন মুরলীর হয় নি। মঙ্গলার দুচোখের দৃষ্টি ঘৃণায় আর অবজ্ঞায় এমন কঠিন এমন বিরূপ দেখিয়েছে যে মুরলী এক পা-ও আর এগুতে পারে নি। হরিণীর চোখের মতো মেয়েদের চোখে যে ভয়, তার মধ্যে হয়ত প্রশ্রয় আছে. কিন্তু ঘৃণায় যে-চোখ আবিল, দুচোখ মেলে তার দিকে তাকানো যায় না। নীরস নিষ্প্রাণ বলে মঙ্গলাকে মুরলী এতদিন বাদ দিয়ে এসেছে, কিন্তু হ্যারিকেনের আলো মুখের ওপর ফেলে আলোর চেয়েও উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত যে মুখ তার চোখে পড়েছে সে মুখ ভোলবার নয়। সে মুখের দিকে তাকিয়ে ধারণা বদলে গেছে মুরলীর। নীরস নয়, রস মঙ্গলায় মধ্যেও আছে, কিন্তু সে রস তাল আর খেজুর গাছের মতো কঠিন আবরণের মধ্যে। তা হক, বাইরের আচ্ছাদন যত শক্ত ভিতরে রসের মাদকতা তত বেশি।

রান্নাঘরে দুধের কড়াটা ভালো করে ঢেকে রেখে মনোরমা এসে স্বামীর পাশে দাঁড়াল, খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল মুরলীর সেই তদ্গত ভাব। তারপর অল্প একটু হেসে বলল, 'খুব বুঝি দুঃখ হয়েছে মনে, না ?'

মুরলী একটু যেন চমকে উঠল, তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেন, দুঃখ হবে কেন ?'

মনোরমা মুখ মুচকে হাসল, 'শিকার যে হাতছাড়া হয়ে গেল।'

মুরলীর মুখে একটু যেন বেদনার ছাপ পড়ল, কিন্তু পরক্ষণেই সে নিতান্ত লঘু তরল কণ্ঠে জবাব দিল 'তাই ভেবেই নিশ্চিন্ত আছ বুঝি ? শিকার কি আমার একটি যে হাতছাড়া হয়ে গেলেই হাত গুটিয়ে বসে থাকব ?'

মনোরমা বলল, 'তাহলে আজ থেকেই ফের হাতড়াতে শুরু করে দাও।'

মুরলী হাসল, 'দেখা যাক। তোমার কিন্তু মোটেই নির্ভয় হওয়ার কারণ নেই, পৃথিবীতে যতদিন একটি মেয়েও থাকবে ততদিন তোমার সতীনের শেষ হবে না।

মনোরমা বলল, 'তাই নাকি ? ইস, সেই ভয়ে তো দিন রাত আমার ঘুম হচ্ছে না।'

কি একটা কাজে মনোরমা একটু বাদেই সরে গেল সেখান থেকে।

ভয় না হয় নেই, কিন্তু দুঃখও কি নেই মনোরমার মনে? স্ত্রীর হাবভাব চালচলন দেখে একেকবার তাই অবশ্য মনে হয় মুরলীর। মনোরমার আর সেই জোর নেই, জিদ নেই, সেই কান্নাকাটি ঝগড়াঝাঁটি নেই। আজকাল অদ্ভুত ভাবে শান্ত হয়ে গেছে মনোরমা। এতদিনে সে ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে। এখনো আগের মতোই একেকদিন মদে বেসামাল হয়ে যখন অনেক রাত্রে ঘরে ফেরে মুরলী, মনোরমা সেকালের মতো আর তুমুল কোলাহল বাধায় না, দোর বন্ধ করে বলে না, 'এখানে আবার কেন? যেখানে ছিলে সেখানেই থাক গিয়ে।' বরং শান্তভাবেই আজকাল এসে দরজা খোলে মনোরমা, অপ্রকৃতিস্থ স্বামীর সেবাপরিচর্যা করে, সস্নেহ শাসনে খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, বাতাস দেয়, হাত বুলিয়ে দেয় কপালে। আগেকার মতো দেওয়ালে নিজের কপাল ঠুকতে যায় না। ভারি শান্ত ভারি লক্ষ্মী বউ হয়েছে আজকাল মনোরমা। মুরলী মনে মনে ঠিক এমনটিই বোধ হয় চেয়েছিল। মুরলী যাই কিছু করুক না মনোরমা মুখ বুজে থাকবে চোখ বুজে সব সহ্য করবে। কিন্তু আজ মনোরমা সত্যি সত্যিই যখন মুরলীর পছন্দ মতো আদর্শ স্ত্রী হয়ে উঠেছে তখন মুরলীর মনে হচ্ছে মনোরমা মাটির মতো সহিষ্ণু আর শান্ত হওয়ায় মুরলীরও অর্ধেক জীবন যেন মাটি হয়ে গেছে। উচ্ছৃঙ্খলতায় আর তেমন রঙ নেই, মত্ততায় নেই আর তেমন উত্তেজনা। ভিতর থেকে নরম একখানা হাতে কেউ যদি হাত টেনে না ধরে বাইরের ছুটোছুটিতে কি আর তেমন আনন্দ পাওয়া যায়? ঘরের কোণে বসে কেউ যদি চোখের জল না ফেলতে থাকে, বাইরের আগুন নিয়ে খেলা কি আর তেমন জমে?

অবশ্য খুব দাপাদাপি ছটফট করবার মতো শরীরের শক্তিও আজকাল আর তেমন নেই মনোরমার। বছর দশেক আগে মেয়ে হওয়ার সময় সেই যে শহরের ডাক্তার এনে অপারেশন করাতে হয়েছিল, তারপর থেকে শরীরও আর তার ভালো হল না, ছেলে-পুলেও কিছু হল না।

আগে আগে মনোরমা স্বামীকে বলত, 'এসব অনাচার কদাচার না করে বিয়ে কর আরেকটা। বেশ থাকবে, মেয়ে হবে, ছেলে হবে—'

মুরলী হাসত, 'কিন্তু তোমার যে সতীনের ঘর।'

মনোরমা জবাব দিত, 'আহা হা, সতীন যেন আমার একেবারেই নেই—'

মুরলী বলত, 'থাকলই বা, ঘরের এক সতীনের চেয়ে বাইরের হাজার সতীনও

অনেক ভালো। তারা বড় জোর স্বামীর ভাগই নেয়, ঘর-সংসারের ভাগ নিতে আসে না।'

নতুন বউ এনে নাতির মুখ দেখবার জন্য প্রথম নবদ্বীপও কম চেষ্টা করে নি, কিন্তু আরো অনেক আকাঙ্ক্ষার মতো এ আশাও মুরলীকে দিয়ে সফল হয় নি। রাতের পর রাত বাজারের মেয়েছেলের ঘরে কাটিয়েছে মুরলী, পরের বউ-ঝিয়ের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করেছে, তবু নবদ্বীপের ইচ্ছামতো উপদেশ মতো, ঘরে একটি স্বাস্থ্যবতী বউ নিয়ে আসে নি। বলেছে, 'ছেলে না হয় নাই হল, কিন্তু তার জন্য আপনার বউমার ওপর অবিচার করতে পারি না, তার তো কোন অপরাধ নেই—।'

নবদ্বীপ রুষ্ট হয়ে উঠেছে, 'নতুন বিয়ে না করেই যেন খুব সুবিচার করছ তার ওপর।'

কিন্তু নবদ্বীপ স্বীকার না করলেও মনোরমা স্বামীর এই মহত্ত্বটুকু যে মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছে তার হাব-ভাবে চাল-চলনে এ কথা মুরলীর কাছে গোপন থাকে নি। অনেক অনাচার অত্যাচারের মধ্যেও দাম্পত্য জীবনের এই মাধুর্যটুকু মনে মনে উপভোগ করেছে মুরলী। মনোরমার এই কৃতজ্ঞতা আর নিজের এই অল্প একটু স্বার্থত্যাগ, অপরিমেয় ক্ষতির সামান্য একটু পরিপূরণের চেষ্টায় যে আনন্দ তার সঙ্গে বাইরের উচ্ছল ফেনিল রাত্রিগুলির তুলনা হয় না—একথা মুরলী অনেকবার অনুভব করেছে। অনেকবার প্রতিজ্ঞা করেছে এবার থেকে শান্ত ও ভদ্রভাবে দিন কাটাবে। কিন্তু দুদিন কাটতে না কাটতেই যেই চোখে পড়েছে অন্য কোন নারীর দুর্বোধ্য সঙ্কেতময় চোখ, অনাস্বাদিত দুটি অধরোষ্ঠ, অমনি নতুনত্বের নেশা আর বৈচিত্র্যের মোহ মুরলীকে উন্মত্ত করে তুলেছে; যেন এমন রহস্য আছে তার মধ্যে, এমন স্পর্শসুখ আছে সেই অস্পৃষ্ট ত্বকে, যার স্বাদ, যার সন্ধান মুরলী এতকাল পায় নি। ঘরের শান্ত মাধুর্য দুপায়ে ঠেলে মুরলী ফের সেই দুষ্প্রাপ্যার পিছনে পিছনে ছুটেছে, পায়ে পায়ে ঘুরেছে।

রঙ্গী তার চোখের সামনে থেকে সরে যাওয়ায় একদিক থেকে যেমন এক ধরনের নিষ্ফল আক্রোশের জ্বালা মনে মনে অনুভব করছিল মুরলী, তেমনি আর এক রকমের তৃপ্তিও বোধ করছিল। যাক, কেলেঙ্কারিটা এবার অল্পেই মিটেছে, ঘোরাঘুরি ছুটোছুটির প্রয়োজন শেষ হয়েছে। এবার থেকে শান্ত, নিভৃত, নিরবচ্ছিন্ন সংসার-জীবন। অন্য পাঁচজনের মতো মুরলীও ব্যবসাবাণিজ্য করবে, ছোট মেয়ে ললিতাকে লেখাপড়া শিখিয়ে আদব-কায়দায় চাল-চলনে কলকাতার

শিক্ষিত উচ্চজাতের ভদ্রসমাজের মেয়ের মতো করে গড়ে তুলবে, মেয়েমানুষ নিয়ে আর কোন রকম ছেলেমানুষি করবে না মুরলী।

কিন্তু মনোরমার মুখে মঙ্গলা আর অজিতের পরস্পরের প্রশংসা আর গুণগ্রাহিতার কথা শুনে অদ্ভুত এক ঈর্ষাব কাঁটা মুরলীর মনে এসে বিঁধল। সমস্ত সাধু-সংকল্প সেই কাঁটায় গাঁথা হয়ে গেল। অবশ্য এই কাঁটার খোঁচার মধ্যে যদি কেবল যন্ত্রণাই থাকত, তাহলে কোন না কোন উপায়ে তার উপশমেরও চেষ্টা চলত, কিন্তু এই তীব্র জ্বালার মধ্যে এক ধরনের আনন্দও আছে। কাঁটার দলের মধ্যে আছে ফুল, আছে ফুলের মতো একখানি মুখ। বার বার ইচ্ছা করতে লাগল মুরলীর কোন না কোন ছলে একবার গিয়ে দেখে আসে সেই মুখ, মুখোমুখি বসে ছু-একটি কথা বলে আসে। কিন্তু দীর্ঘদিনের কাববারে নারীচরিত্র সম্বন্ধে মুরলীর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে নিজের ইচ্ছার ওপর খুব বেশি নির্ভর করবার সাহস আর মুরলীর নেই। অতি গরজে সব পণ্ড করে লাভ নেই কিছু।

দিনকয়েক কাটল। মঙ্গলার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার নতুন নতুন কৌশল আসতে লাগল মুরলীর মাথায়। মাত্র কয়েক মিনিটের পথ, কয়েকখানা বাড়ির পরেই বাড়ি, কিন্তু মুরলীর ভাবভঙ্গীতে মনে হল দুরত্বের যেন আর সীমা নেই। এই পথটুকু পার হতে যেন অসংখ্য রকমের যানবাহন আর অনন্য-সাধারণ সাহসের প্রয়োজন। মন দিয়ে যাকে একান্তভাবে কামনা করছে মুরলী, তার সঙ্গে বাইরের ব্যবধানকে দুর্লজ্ঘ্য দুরতিক্রম্য বলে কল্পনা করে, আর সেই সাত সমুদ্র তের নদী পার হবার নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করেও মুরলীর কম আনন্দ হচ্ছে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে মঙ্গলা একটু ঘুমোবার আয়োজন করছিল। সাধারণত দিনে সে ঘুমোয় না। পাট আর পাড়ের সুতো দিয়ে কোনদিন শিকে বোনে, কোনদিন বা খেজুরের পাতার মাদুর আর আসন, নিতান্তই যেদিন মন টেঁকে না ঘরে সেদিন দরজায় তালা দিয়ে আলতাদের বাড়ি যায় কড়ি খেলতে। কিন্তু খেলাতেও বিশেষ মন বসে না মঙ্গলার। কোনদিন দু-এক হাত খেলে, কোনদিন বা কেবল বসে বসে অন্য সকলের খেলা দেখে। বউ-ঝিদের ছেলে কাঁদে, কোলের মেয়ে বুকের দুধ টানে, কোন কোনটি বা পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরে, তবু তাদের মা-জ্যেঠিদের নেশা চটে না। দানের পর দান দেয়, এক দুই করে ঘরের পর ঘর গুনতে থাকে। খানিকক্ষণ বসে থেকে হঠাৎ এক ফাঁকে উঠে আসে মঙ্গলা।

ঘরে আজও মঙ্গলার মন টিকছিল না। ইচ্ছা করছিল না বোনার কাজ নিয়ে বসে। কিন্তু শরীরেও তেমন জুত পাচ্ছিল না যে উঠে গিয়ে কারো বাড়িতে বসে কড়ি খেলে কি গল্পগুজব করে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও পাতলা একখানা কাঁথা মুড়ি দিয়ে মঙ্গলা শুয়ে পড়েছিল। অবশ্য বেশিক্ষণ যে সে এভাবে থাকতে পারবে না, শুতে না শুতেই মঙ্গলা তা টের পেয়েছিল। আর খানিকক্ষণ বাদেই তার পিঠে ব্যথা করতে শুরু করবে, নিঃশ্বাস আসতে চাইবে বন্ধ হয়ে, তখন তাকে উঠে বসতেই হবে।

কিন্তু শুয়ে কাঁথাটা মুখ পর্যন্ত টেনে দিয়ে কেবল একটু চোখ বুজেছে মঙ্গলা, দোরের বাইরে থেকে মিষ্টি গলা ভেসে এল, 'জ্যেঠিমা, ঘুমিয়েছ নাকি, ও জ্যেঠিমা ?'

মঙ্গলা মাথা তুলে দোরের একটা পাল্লা একটু ফাঁক করে বলল, 'কে ?'

ললিতা ততক্ষণে সেই ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। বিনা ডাকেই মঙ্গলার বিছানার একপাশে ললিতা বসে পড়ল, তারপর তার কপালে ছোট হাতখানি চেপে ধরে খানিকটা উদ্বেগ মেশানো গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি অসুখ করেছে তোমার জ্যেঠিমা ? জ্বর ?'

নিজের হাতখানা তুলে সেই কচি হাতখানা চেপে ধরল মঙ্গলা, ভারি মিঠে লাগল ললিতার গলা, ভারি নরম, ভারি মধুর মনে হল ললিতার সেই হাতখানির স্পর্শ। না, জ্বর মঙ্গলার হয় নি, কিন্তু হলেই যেন আজ ভালো হত।

মঙ্গলার মনে পড়ল সেদিন সন্ধ্যাবেলা নদীর ঘাটে মায়ের শিখিয়ে দেওয়া কি কর্কশ কথাগুলিই না বলেছিল মেয়েটা। রাগে দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছিল মঙ্গলা, ইচ্ছা হয়েছিল ছুটে গিয়ে দুহাতে চেপে ধরে ওর গলা। আর আজ সেই গলা চিনির মতোই মিষ্টি, মধুর চেয়েও মধুর। সেই সব শেখানো কথা আজ হয়ত ওর এক বর্ণও মনে নেই, বেমালুম সব ভুলে বসে আছে। মঙ্গলা মনে মনে ভাবল, ভারি অদ্ভুত এই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মন, ভারি চমৎকার তাদের মুখের কথা। এমন যদি একটি মেয়ে থাকত মঙ্গলার, সে কিছুতেই তাকে কড়া কথা, খারাপ কথা শেখাত না, শত্রুকে বলবার জন্যও নয়। বেছে বেছে ভালো ভালো শ্লোক মুখস্থ করাত, শুনে লোকের কান জুড়িয়ে যেত। আর মেয়ে না হয়ে যদি এমন একটি ছেলে থাকত মঙ্গলার, সে তাকে অজিতের মতো শহরে পাঠাত ডাক্তারি পড়তে, সুবলের মতো কিছুতেই লঙ্কা হলুদের ঝাঁকা মাথায় বয়ে গঞ্জে গঞ্জে হাটে হাটে বিক্রি করতে দিত না।

হঠাৎ নিজের ভাবনার কথা টের পেয়ে মঙ্গলা মনে মনে লজ্জিত হয়ে উঠল। ছি ছি ছি, এসব কি ভাবছে! ছেলেমেয়ে না ঢেঁকি! ঘর নোংরা করত, দোর নোংরা করত, ঝেড়ে পুঁছে গুছিয়ে তুলতে মঙ্গলার জান যেত শেষ হয়ে। দুচক্ষে তাদের আবার দেখতে পারত নাকি মঙ্গলা? দেখে তো পাড়ার পাঁচজন বউ-ঝিকে। একপাল ছেলেপুলে নিয়ে কি সুখেই না এক-একজন আছে!

তবু ললিতার হাতখানা মঙ্গলার হাতের মধ্যে ধরাই রইল। মুঠির ভিতরে নিয়ে হাতখানিতে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে মঙ্গলা বলল, 'হঠাৎ এসময়ে কেন এলি রে ললিতা? এই দুপুর বেলায় এক গা গয়না নিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিস! ভয় করে না, বাপ-মা বকবে না তোকে?'

ললিতা ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, 'হুঁ বকবে না হাতি! বাবাই তো চুপি চুপি আমাকে তোমার কাছে পাঠিযে দিলে।'

কথা শুনে মঙ্গলার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। এবার ললিতার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মঙ্গলা। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের দশ বছর বয়স কম নয়। এই বয়সে মঙ্গলার বিয়ে হয়েছিল, অনেক কিছু বুঝতে হয়েছিল। কিন্তু ললিতার মুখের দিকে তাকিয়ে মঙ্গলা আশ্বস্ত হল, ওর মুখে কোন ছলনা নেই, কোন কুটিল ধূর্ততা নেই, খোলা মনে সাদাসিধে ভাবেই কথাটা বলে ফেলেছে ললিতা। তবু মুরলীর কথা ভেবে মঙ্গলার মন ছি ছি করে উঠল। কোন রকম কাণ্ডজ্ঞান চক্ষুলজ্জা যদি থাকে লোকটার। শেষ পর্যন্ত কিনা নিজের মেয়েকে পাঠিয়েছে তার খোঁজ নিতে!

মঙ্গলা বলল, 'কিন্তু তোর বাবাব এত ভয় কিসের রে ললিতা যে চুপি চুপি তোকে আমার কাছে সে পাঠিযে দেয়?'

ললিতা বলল. 'বাঃ রে ভয়ের জন্য বুঝি! তুমি কিচ্ছু বোঝ না জ্যেঠিমা, ভয় নয়, মজার জন্যে।'

মঙ্গলা বিস্ময়ের ভান করে বলল, 'মজার জন্যে! এতে মজার আবার কি হল, তা তুইই জানিস আর তোর সেই মজাদার বাবা জানে। যাকগে, এই দুপুর রোদে টো টো করে ঘুরে বেডাবি. না শুয়ে থাকবি আমার কাছে?'

ললিতা হেসে উঠল, 'তুমি একেবারে ঠিক আমার মার মতো কথা বল জ্যেঠিমা। তুমি কি আমার মা, আর আমি কি বিশুর বোন টগরির মতো কচি খুকি যে তোমার কাছে আমি চুপটি করে শুয়ে থাকব? কত রাজ্যের কাজ পড়ে আছে আমার।'

ললিতার কথা বলার ভঙ্গি দেখে হাসি পেল মঙ্গলার। বলল, 'তাই নাকি?

তাহলে যাও কাজকর্মের তোমার আমি ক্ষতি করতে চাই নে! এতক্ষণে তোমার একপাল ছেলেমেয়ে বোধহয় মা-মা বলে কান্না শুরু করে দিয়েছে। গোটা দুয়েক মোয়া দিচ্ছি নিয়ে যাও। হাতে দিয়ে তাদের শান্ত কর'—বলে মঙ্গলা সত্যিই বিছানা থেকে উঠে কালোরঙের ছোট একটি মেটে হাঁড়ির ভিতর থেকে সদ্যবাঁধা দুটি মুড়ির মোয়া বের করে ললিতার হাতে দিল। লোভে আর উল্লাসে ললিতার চোখ দুটি যে চকচক করে উঠল তা মঙ্গলার চোখ এড়াল না।

মঙ্গলা বলল, 'এখানে বসেই খেয়ে নে ললিতা।'

ললিতা বলল, 'তা খেতে পারি। কিন্তু তুমি আবার কিছু ভাববে না তো জ্যেঠিমা। আমার হয়েছে মহা মুশকিল। এখানে বসে খেলে তুমি ভাববে হ্যাংলা, আবার বাড়িতে নিয়ে গেলে মাও তাই মনে করবে।'

মঙ্গলা মৃদু হেসে বলল, 'কথা শোন মেয়ের! এই বয়সেই একেবারে বুড়ির একশেষ হয়ে উঠেছিস তুই।'

শক্ত মুড়ির মোয়া ছোট ছোট দাঁতে ভেঙে ভেঙে খেতে লাগল ললিতা। আর মঙ্গলা এক লক্ষ্যে তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। যেন দশ বছর বয়সের হৃষ্টপুষ্ট বাড়ন্ত গড়নের মেয়ে নয় ললিতা। বয়স কমতে কমতে মঙ্গলার চোখে সে যেন অনেক ছোট হয়ে গেছে। যখন ওর বয়স আরো কম ছিল, যখন এক বছরও পোরে নি ওর বয়স, তখন কেমন দেখতে ছিল ললিতা, একটু ছুঁলে একটু আদর করলে তখনো কি ও এতখানি খুশী হয়ে উঠত, আহ্লাদে এমনি চক চক করত ওর চোখ?

মোয়া খাওয়া শেষ করে রান্নাঘরে গিয়ে গ্লাসে করে নিজেই জল গড়িয়ে খেল ললিতা, মঙ্গলার গামছায় মুখ মুছে বলল, 'যাই জ্যেঠিমা। মোয়া খাওয়ার কথা কাউকে যেন আবার বলো না। কে কি ভাববে তার ঠিক কি।'

মঙ্গলা বলল, 'আচ্ছা গো আচ্ছা, বুড়িঠাকরুন, আর তোমাকে বুড়োটেপনা করতে হবে না। এবার এস।'

ললিতার চলে যাওয়ার পর মঙ্গলার মনে হল ছেলেপুলে সম্বন্ধে হঠাৎ সে যেন ভারি আদেখলেপনা করে ফেলেছে। ভাগ্যিস ললিতা ছাড়া আর কেউ এখানে ছিল না। তা হলে সন্তানহীনা মঙ্গলার এমন কাঙালপনা দেখে নিশ্চয়ই মনে মনে সে হাসত। ললিতার মতো ছেলেপুলে সম্বন্ধে পাছে মঙ্গলাকেও কেউ হ্যাংলা মনে করে সেজন্য সতর্কতার অন্ত নেই তার। নিজের কোলেই যখন কিছু এল না, তখন পরের ছেলেপুলে নিয়ে টানাটানি করতে বড় একটা সাধ যায় না মঙ্গলার। বরং

এমন একটা ভাব দেখিয়ে বেড়ায় যেন ছেলেপুলে সম্বন্ধে তার মোটেই কোন আসক্তি নেই , ছেলেমেয়ে না হওয়ার জন্য একটুও দুঃখ নেই মনে। কিন্তু ভাব-টাকে একনাগাড়ে খুব বেশি দিন বজায় রাখতে রাখতে হঠাৎ এক এক মুহূর্তে ধরা পড়ে যায় মঙ্গলা, হয়ত অন্যের চোখ এড়িয়ে, মা-জ্যেঠিদের চোখের আড়ালে তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে আচমকা হঠাৎ এক ফাঁকে আদর করে নেয়, কিন্তু চোখ ঠেরে নিজের মনকে থামাতে পারে না, অত অল্পে অত তাড়াতাড়ি নিজের শূন্য হৃদয়কে ভরতে পারে না, বুকটা অনেকক্ষণ ধরে কেবলি খালি খালি লাগতে থাকে।

১০

ফাল্গুন মাস পড়তে না পড়তেই পাড়ায় এবার বসন্ত শুরু হল। আম গাছগুলিতে নতুন বোল এল, গাব গাছের ডালে ডালে তামাটে কচি পাতার উদ্গম হল, ফুল ধরল মুরলীর চারা গাছগুলিতে, আর সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়া গেল বিষ্টু সার নাতি নিমাই সার মার অনুগ্রহ হয়েছে।

প্রথমটায় এ খবরে কেউ যে তেমন বিচলিত হল, তা নয়। জল বসন্ত এ অঞ্চলে প্রত্যেক বছরেই দু-একজনের হয়ে থাকে। তার জন্য ডাক্তার কবিরাজ লাগে না, ওষুধপথ্যেরও বিশেষ দরকার হয় না। নমঃশূদ্র পাড়ার নন্দর মা খবর পেয়ে নিজেই আসে, মন্ত্র পড়ে, জলপড়া দেয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে বলে, পথ্য-া পথ্যের বিধান করে আর তার বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মা শীতলার কাছে রোগীর ইচ্ছা-মত ও সাধ্যমত মানত করবার অনুরোধ জানায়। কিছুদিন পরই রোগ নিরাময় হয়। সুতরাং এজন্য কাউকেই বড় একটা বিচলিত হতে দেখা যায় না। রোগী বাড়িতে মশারির মধ্যে শুয়ে কখনো বা ছট্‌ফট্‌ করে, কখনো ঘুমায়। বাড়ির পুরুষেরা দৈনন্দিন হাটে বাজারে যায়, অবসর সময় তাস খেলতে বসে। মেয়েরা রাঁধাবাড়া এবং ঘরে আরো পাঁচটা কাজকর্ম সেরে অন্য শরিকের বউ-ঝিদের সঙ্গে গল্প করে, ঝগড়া করে, ঘরের রোগ যে কারো মনকে খুব অশান্ত এবং উদ্বিগ্ন করে করে তোলে তা সহসা মনে হয় না।

কিন্তু নিমাইয়ের গায়ে দু-একটা বসন্তের গোটা উঠতে না উঠতেই তার মা ননীবালা সেই যে ছেলের মাথার শিয়রে গিয়ে বসেছে আর তাকে সহজে ওঠান যায় নি। অনেক সাধ্যসাধনা করে তবে দুবেলা দুটি তাকে খাওয়ানো যায়।

কোনদিন দু-এক গ্রাস মুখে দেয়, কোনদিন বা দেয়ও না, বসবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে আসে।

ছেলের বউয়ের কাণ্ড দেখে গন্ধেশ্বরী দিনরাত তাকে ধমকাচ্ছে তো ধমকাচ্ছেই।

'মার দয়া এই কি প্রথম দেখলাম বাছা? কিন্তু তোমার মতো এমন আদিখ্যেতা আমার বাপের বয়সেও দেখি নি। দিনরাত কু-ভাবনা ভেবে ভেবে ওর অমঙ্গল ডেকে না এনে তুমি ছাড়বে না। আর না খেয়ে না দেয়ে কেবল ছেলের কাছে বসে থাকলেই বুঝি রোগ সারে, না তার চেষ্টা-যত্ন আছে, ওষুধপথ্যি আছে। এই বুড়ো বয়সে দুবেলা ছ-সাতজনের পিণ্ডির ব্যবস্থা করব, রোগীর পথ্য করব, সব এক জায়গায় এনে দেব আর ছেলের সামনে গিয়ে তুমি চুপচাপ বসে বসে ভাববে, মজা মন্দ নয়।'

অন্যদিন হলে ননীবালা শাশুড়ীকে এত কথা বলবার সময় দিত না, রুখে মুখের ওপর এক কথায় তিন কথা শুনিয়ে দিত; কিন্তু আজ যেন ননীবালার মুখ দিয়ে কথা মোটে বেরোতে চায় না। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর ননীবালা আস্তে আস্তে বলল, 'কটা দিন যাক, তারপর তো সব আবার করতেই হবে।'

গন্ধেশ্বরী তবু গজ গজ করতে করতে বলল, 'হ্যাঁ, এতদিন করে সব উল্টিয়ে দিয়েছ, এরপর কটা দিন বাদে কি করবে না করবে তা আমার জানাই আছে।'

কথাটা ননীবালার কানে গেল কি গেল না। নন্দর মা নিমাইকে প্রথমটা দেখেই যে রকম মুখের ভাব করেছিল সেই দৃশ্যটা তার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠতে লাগল।

শাশুড়ী বাড়িতে ছিল না। ননীবালা নন্দর মার পিছনে পিছনে গেল, 'অমন করে আঁতকে উঠলে কেন মাসী? নিমুর আমার খারাপ জাতের কিছু হয় নি তো! জল বসন্ত তো ঠিক?'

নন্দর মা আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে একটু হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা ঠিক যেন তেমন করে ফুটে উঠল না।

নন্দর মা বলল, 'কি যে বল বউমা? খারাপ জাতের কেন হতে যাবে। তবে ঠিক জল বসন্তও নয়। জাতটা একটু আলাদা ধরনের। সাবধানে রাখবে, ভয় কি! মা শেতলা আছেন আমার বাড়িতে, জাগ্রত দেবতা। তাঁকে ডাক, তিনিই রক্ষা করবেন। ভয় কি!'

সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে সুবল হলুদ আর শুকনো লঙ্কার ঝাঁকা নিয়ে পাশের গাঁ চরকান্দার হাটে বেরিয়ে গেলে মঙ্গলাও তাড়াতাড়ি নেয়ে-খেয়ে নিল। তারপর আলতাদের বাড়ি গিয়ে বলল, 'চল ঠাকুরঝি, ও বাড়ির নিমুকে একবারটি দেখে আসি।'

আলতা বলল, 'বল কি বউদি, এই দুপুরের সময়!'

মঙ্গলা বলল, 'এবাড়ি থেকে ও বাড়ি, তার আবার সময় আর অসময়! আচ্ছা চল তুই না হয় আমাকে পৌঁছে দিয়েই চলে আসবি।'

আলতা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে মঙ্গলার সঙ্গে চলল। তার দ্বিধা দেখে মনে মনে হাসল মঙ্গলা। এসব রোগব্যাধিকে আলতা ভারি ভয় করে। সহজে কাছে ঘেঁষতে চায় না। কিন্তু প্রাণের ওপর এত মায়া কেন আলতার! স্বামী নেই, সংসার নেই, ছেলেপুলে নেই, পরের মন যুগিয়ে, পরের সংসারে কাজকর্ম করে মা আর মেয়ের দু বেলার অন্ন জোটাতে হয়, তবু তো বাঁচবার সাধের অন্ত নেই আলতার। আর তার তুলনায় মঙ্গলা বলতে গেলে ঢের সুখে আছে, কিন্তু তাই বলে অত ভয়ে ভয়ে বাঁচতে মঙ্গলার প্রবৃত্তি হয় না। মরণ যদি আসে আসবে। তার জন্য মঙ্গলা অমন সব সময় পাহারাদারী করবে না।

মুকুন্দ আর ননীবালা যে ছোট টিনের ঘরখানায় থাকে সেই ঘরের মেঝেতেই রুগ্ন ছেলের বিছানা করে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির অন্য ঘরখানা বড়। জানালা-দরজাও এর চেয়ে বেশী। কিন্তু সেখানায় বিষ্টু সা বড় ছেলের ঘরের নাতি-নাতনি নিয়ে থাকে। তা ছাড়া হাঁড়িকুড়ি বাক্স-সিন্দুকে সে ঘরে আর পা ফেলবার জায়গা নেই। এই ছোঁয়াচে রোগীকে সে-ঘরে কি করে রাখা যায়।

ননীবালা ছেলের মাথার কাছে নিশ্চল হয়ে বসেছিল, মঙ্গলা আর আলতাকে দেখে বলল, 'এস দিদি।' তারপর উঠে গিয়ে ছোট ছোট দুখানা পিঁড়ি পেতে দিল বসতে।

আলতা একবার ভাবল দোর থেকেই ফিরে যায়, কিন্তু মঙ্গলা যখন ঘরে ঢুকে পিঁড়িতে গিয়ে বসল, তখন তার পক্ষে এভাবে ফিরে যাওয়াটা ভালো দেখায় না, তাই পাশের পিঁড়িতে সেও গিয়ে বসল।

মঙ্গলা বলল, 'কেমন আছে এখন? মশারিটা তোল দেখি, কি রকম উঠেছে দেখি একবার।'

ননীবালা নিঃশব্দে মশারির একটা দিক তুলে ধরল।

ছোট ছোট ক্ষতে নিমাইয়ের সর্বাঙ্গ একেবারে ছেয়ে গেছে, নিমাই এতক্ষণ

তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো ছিল, এবার জেগে উঠে যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করেছে। আলতা আতঙ্কে চোখ বুজল। একটু পরে বলল, 'আমি যাই বউদি।'

মঙ্গলা ঘাড় নেড়ে বলল, 'আচ্ছা।'

তারপর ননীবালার শঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে মঙ্গলা বলল, 'খুব উঠেছে দেখতে পাচ্ছি। তা এক হিসেবে ভালো। অত ভাববার কি আছে!'

'তুমি আমাকে মিথ্যে ভরসা দিচ্ছ দিদি। জাতটা ভালো নয়।'

মঙ্গলা তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ননীবালাকে চুপ করতে বলল। আট ন বছরের ছেলে নিমাই, ভালোমন্দ সবই সে বোঝে। এসব কথা কানে গেলে মনটা তার কেমন করতে থাকবে।

মঙ্গলা ধমকের সুরে বলল, 'কোন কাণ্ডজ্ঞান যদি তোমার থাকে, যাও এবার উঠে গিয়ে নেয়ে খেয়ে এস। আমি বসি এখানে।'

মঙ্গলা ননীবালার হাত থেকে পাখা তুলে নিল। ননীবালা মঙ্গলার দিকে তাকিয়ে কি একটু দেখল, তারপর বলল, 'তুমি বেশ আছ দিদি, ছেলেপুলে মানুষের না হওয়াই ভালো।'

মঙ্গলা একটু হাসল, 'সে কথা ঠিক। কিন্তু ছেলেপুলের যখন অসুখবিসুখ হয় কেবল তখনই এসব কথা মানুষের মনে আসে। কিন্তু ছেলে যখন সুস্থ হয়ে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে আদর করবে, তখন কথাটা একবার বলো দেখি, শুনব। নাও এবার ওঠ।'

মঙ্গলা আর একবার তাড়া দিল ননীবালাকে।

গন্ধেশ্বরী এতক্ষণ কি কাজে ব্যস্ত ছিল। মঙ্গলার সাড়া পেয়ে এঘরে উপস্থিত হয়ে বলল, 'এই যে মা এসেছ। আচ্ছা, তোমরাই বল অসুখ-বিসুখ সকলের ঘরেই হয়, কিন্তু এমন আদিখ্যেতা দেখেছ কোথাও?'

শাশুড়ী আসার সঙ্গে সঙ্গেই ননীবালা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলা গন্ধেশ্বরীর কথার জবাবে বলল, 'তা, কি আর করবেন খুড়িমা, সকলের মনের জোর তো সমান নয় আর আপনার মেজবউ একটু বেশি ঘাবড়ে যাওয়া প্রকৃতির মানুষ। বেচারাকে দোষও দেওয়া যায় না, ওই তো একটি মাত্র সলতে সম্বল। নিমুর পরে বুঝি তিনটি হয়েছিল? না খুড়িমা? ভাগ্যটা দেখুন একবার। তিনটিই—। ঘাবড়াবার যে কথাই খুড়িমা!'

ননীবালার ওপর মঙ্গলার এই ধরনের সহানুভূতিতে গন্ধেশ্বরী একটু লজ্জিত না হয়ে পারল না! মঙ্গলার মতো একজন বাঁজা মেয়েমানুষ মৃতবৎসার দুঃখ,

ছেলের অসুখে মায়ের গভীর উদ্বেগের কথা, এমন ভাবে বুঝল কি করে! বিশেষ করে যে মঙ্গলা নিতান্ত কাঠখোট্টা স্বভাবের মানুষ, ছেলেপুলে যে দুচক্ষে কোন দিন দেখতে পারে না, তার মুখে এসব কথা কেবল নতুন আর অদ্ভুতই নয়, মধুরও শোনাল গন্ধেশ্বরীর কাছে। অপ্রতিভের মত গন্ধেশ্বরী বলল, 'সে তো ঠিকই মা, সেকথা যখন ভাবি—'

মঙ্গলা সযত্নে নিমাইয়ের বিছানা ঝাড়ল, টুকটাক জিনিসপত্রগুলি এলোমেলো হয়েছিল, গুছিয়ে রাখল একদিকে, ধুনুচিতে ধুনো ছিটিয়ে দিল একটু, নিমাই জল চাওয়ায় ঝিনুকে করে অল্প একটু ডাবের জল খাইয়ে দিয়ে ফের পাখা নিয়ে এসে বসল।

আর একবার ঘুরে এসে গন্ধেশ্বরী ঘরের অবস্থার দিকে তাকিয়ে খুশী হয়ে বলল, 'এখন বোঝা যায় যে ঘরে মা লক্ষ্মীর পা পড়েছে। কিন্তু বেলা যে অনেক হল, তোমার কি নাওয়া-খাওয়া নেই মা?'

মঙ্গলা বলল, 'কিছু ভাববেন না খুড়িমা, আমি সব সেরে এসেছি।'

নিমাইয়ের কাছে সারা দুপুর আর বিকালটা কাটিয়ে সন্ধ্যার একটু আগে মঙ্গলা বাড়ি ফিরল। গন্ধেশ্বরী নিজেই এগিয়ে দিয়ে এল; ফেরবার সময় বলল, 'তুমি কালও একবার এসো মা, তোমাকে দেখলে ভারি ভরসা পাই। কেমন দেখলে আমার নিমুকে? মনে ভারি চিন্তা ঢুকেছে মা, কি আছে ভাগ্যে কে জানে।'

মঙ্গলা শুকনো মুখে বলল, 'কিছু ভাববেন না।'

সন্ধ্যার পর আরও কিছুক্ষণ কাটল। তারপর হাট সেরে সুবল ফিরল ঘরে। থলিতে করে মাছ আর তরকারি নিয়ে এসেছে।

সুবল থলেটা স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নে ধর, চিংড়ি মাছ আর কুমড়ো। সেদিনের মতো অত ঝোল ঝোল নয়, বেশ একটু শুকনো শুকনো করে রাঁধবি আজ বুঝলি।' কিন্তু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে সুবল রান্নার নির্দেশ দেওয়া বন্ধ করে বলল, 'ব্যাপার কি! আজ আবার হঠাৎ অমন মুখ গোমড়া করে রয়েছিস যে!'

মঙ্গলা স্বামীর হাত থেকে থলেটা নিতে নিতে জবাব দিল, 'সব সময়েই মুখখানাকে মানুষ হাসিখুশী ভরা রাখতে পারে নাকি?'

সুবল বলল, 'মেয়েমানুষের তাই রাখতে হয়। সব সময় না হক, সোয়ামী যখন হাটবাজার থেকে হয়রান হয়ে ফেরে তখন অন্তত হাঁড়িপানা একখানা মুখ নিয়ে সামনে হাজির হতে নেই।'

মঙ্গলা স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে কি একটু দেখল, তারপর অদ্ভুত একটু হেসে বলল, 'বেশ তো, হাঁড়িপানা মুখ আর না ভালো লাগে, ছুঁড়িপানা মুখ একখানা দেখেশুনে এবার নিয়ে এস। সে তো আমি অনেককাল থেকেই বলছি।'

বলে মুখ ঘুরিয়ে মঙ্গলা মাছ-তরকারির থলেটা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

বারান্দায় বালতিতে জল তোলা রয়েছে। কাছেই ফিতেওয়ালা খড়ম জোড়া, ছোট একটা ঘটির ওপর ভিজে গামছাখানা ভাঁজ করে রেখে দিয়েছে মঙ্গলা। সবদিন এসব চোখে পড়ে না সুবলের। যেদিন পড়ে সেদিন হঠাৎ যেন ভারি অদ্ভুত লাগে। অনেককালের ভুলে যাওয়া প্রিয় কোন গানের সুর মনে পড়বার প্রসন্ন মাধুর্যে সমস্ত অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে তার। মুহূর্তকাল আগে যতখানি ক্ষোভ সুবলের মনে এসে জমা হয়েছিল, মঙ্গলার চির পরিচিত এইটুকু মাত্র সেবার পরিচয়ে তার অনেকখানিই যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সুবল মনে মনে ভাবল মঙ্গলার মুখের ভাব মাঝে মাঝে বদলায় বটে, কিন্তু হাত দুখানির সেই নিপুণ মধুর পরিচর্যাটুকু তেমনিই আছে।

হাতমুখ ধুয়ে তামাক সাজতে বসল সুবল। মালসায় আগুন গনগন করছে। কাছেই হুঁকো-কল্কে, আগুন তুলবার চিমটে, ছোট একটা বাঁশের চোঙায় সুবলের নিজের হাতে মাখা তামাক গুলি করে রাখা। কল্কেতে আগুন দিয়ে হুঁকোর ওপর তুলে গোটা কয়েক টান দিয়ে সুবল তামাকটা একটু ধরিয়ে নিল, তারপর হুঁকোটা হাতে নিয়েই দাঁড়াল গিয়ে মঙ্গলার রান্নাঘরের সামনে। হুঁকোতে আরো কয়েকটা টান দিয়ে সুবল মঙ্গলাকে উদ্দেশ করে বলল, 'বলি ব্যাপারখানা কি? একটু শোনা যায় না? এর মধ্যে গূহ্য কথা-টথা কিছু আছে?'

মঙ্গলা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'গূহ্য কথা আবার কি। ওবাড়ির মুকুন্দ ঠাকুরপোর ছেলের মায়ের দয়ার কথা শুনেছ তো?'

'হ্যাঁ, শুনলুম, খুব নাকি উঠেছে। তাই কি?'

মঙ্গলা তরকারি কোটা রেখে স্বামীর দিকে চেয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অথচ চাপা ফিসফিসানির স্বরে বলল, 'খুব মানে দারুণ। দেখ, আমার কিন্তু মোটেই ভালো মনে হচ্ছে না। নিমাইকে দেখে আসা অবধি এত খারাপ লাগছে।'

'ওবাড়ি গিয়েছিলে বুঝি দেখতে?'

'হ্যাঁ, এতক্ষণ তো সেখানেই ছিলাম। উঃ! সমস্ত দুপুরটা ভরে ছেলেটা

কেমন ছটফট করেছে আর যন্ত্রণায় চেঁচিয়েছে। আহা, ওইটুকু তো ছেলে। তুমি যদি দেখতে—'

সুবল এক লক্ষ্যে স্ত্রীর মুখের দিকেই চেয়ে দেখছিল। এ যেন আর কারো মুখ। এ মুখে মঙ্গলার সেই স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণবুদ্ধির ছাপ নেই, আছে কেবল পরের ছেলের জন্য অতিরিক্ত কাতরতা। উদ্বেগে ব্যাকুল সেই মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কেন যেন সুবলের ভারি দুঃসহ লাগল। রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'তাকে দেখবার আর দরকার কি, তোমার দশা দেখেই বুঝতে পারছি।'

হুঁকোয় আবার মুখ দিল সুবল। তারপর খড়মের শব্দ করতে করতে ঘরের দিকে চলে গেল।

মঙ্গলা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে স্বামীর যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল। তারপর কি মনে হওয়ায় নিজেই একটু হাসল। অদ্ভুত স্বভাব সুবলের আর কি অদ্ভুত তার মন! নিজের ছেলেপুলে হল না বলে অন্যের ছেলেকে আদর করাই যে সে সহ্য করতে পারে না, তাই নয়, অসুখবিসুখে মঙ্গলা যদি গিয়ে কারো ছেলেমেয়ের একটু সেবা-যত্ন করে তাতেও সুবলের বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকে। যেন সুবলকে ফাঁকি দিয়ে সুবলের কাছে গোপন রেখে একা একা সে কোন নিষিদ্ধ জিনিষ উপভোগ করছে, সুবলকে তার ভাগ দিচ্ছে না।

পাড়ার কোন ছেলেপুলে সম্বন্ধে সুবলের মন যে স্নেহপ্রবণ নয়, তা মঙ্গলা জানে। তারা কেউ এলে, হৈ চৈ করলে সুবলের বিরক্তির অবধি থাকে না, এমন কি তাদের মা-বাপের কাছে পর্যন্ত অশোভনভাবে মনের সেই বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলে। ছেলেপুলে নেই বলেই যে অন্যের ছেলেমেয়ে নিয়ে অতিরিক্ত রকমের আদর-আহ্লাদ করা, তাদের কোলেপিঠে নিয়ে ডলে কচলিয়ে চুমু খেয়ে সোহাগ জানান, ঘরের নাড়ু-মোয়া তাদের হাতে দেওয়া, গাঁটের পয়সা খরচ করে তাদের খেলনা কিনে দেওয়া—এ সব আদেখলেপনা মঙ্গলারও নেই। কিন্তু তাই বলে কারো অসুখবিসুখ হলেও যে চোখ উলটিয়ে থাকতে হবে, এমনই বা কোন কথা আছে! আহা! ওই তো কচি বয়স। ওই বয়সেই রোগের যন্ত্রণা কি ও সহ্য করতে পারে। যে-সব ছেলেমেয়ে খুব চঞ্চল আর দুরন্ত, অসুখ-বিসুখ হলে তারাই যেন এলিয়ে পড়ে সব চেয়ে বেশী। মঙ্গলা এ রকম অনেক দেখেছে, এমন নরম আর অসহায় হয়ে পড়ে, যে মায়া হয় দেখলে। ইচ্ছা হয় সেই রুগ্ন দুর্বল শিশুকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আগলে রাখে। তা কি করবে মঙ্গলা। সকলের মন তো

আর সুবলের মতো নিষ্ঠুর নয়। মায়া-দয়া, স্নেহ-মমতা, সকলেই তো আর মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারে না।

সুবল খেয়ে গেলে নিজের খাওয়া সেরে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে ঘরে এল মঙ্গলা। পিতলের ছোট পানের বাটা টেনে নিয়ে ভালো করে একটি পান সাজল : তারপর পানটি মুখে ফেলে দীপ নিবিয়ে আলগোছে স্বামীর পাশে এসে শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। ভাবল সুবলই প্রথমে কোন একটা কথা বলবে, কি হাতখানা তুলে দেবে গায়ের ওপর, যেমন অন্যান্য দিন করে। কিন্তু সুবলের দিক থেকে তেমন কোন সাড়াশব্দ এল না, অথচ মানুষটি যে দিব্যি জেগে আছে, মঙ্গলা তা জানে। আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল, তারপর মঙ্গলা স্বামীর গায়ে অল্প একটু ঠেলা দিয়ে বলল, 'কথা বলছ না যে, কি ভাবছ ?'

অন্ধকারের মধ্যে যেন অনেক দূর থেকে সুবল বলল, 'ভাবছি একটি পোষ্যপুত্র নিলে কেমন হয়। ছেলেপুলে যখন হলই না, আর হবেই না।'

মঙ্গলা বিস্মিত হয়ে বলল, 'পোষ্যপুত্র !'

সুবল বলল, 'হাঁ খুব অল্প বয়স, দেখতে শুনতে বেশ ভালো, এমন একটি ছেলে চেয়ে-চিন্তে জোগাড় করে নিয়ে পোষ্য রাখাটা মন্দ কি। সুখের সময় সোহাগ করতে পারবে, অসুখের সময় শুশ্রূষা করতে পারবে, বেশ হবে। শত হলেও মেয়েমানুষ তো। কোলের মধ্যে কিছু একটা না পেলে মনটা খাঁ খাঁ করতে থাকে, তাই নয় ?'

অন্ধকারের মধ্যে মঙ্গলার অল্প একটু হাসির শব্দ শোনা গেল, 'এতদিনে তাহলে কথাটা বুঝতে পেরেছ। আর আমার আফসোস কিসের। কিন্তু পোষ্য যে নেবে বিষয়সম্পত্তিটা আগে একটু ভালো মতো করে নাও, জমিয়ে নাও লাখখানেক টাকা, না হলে ছেলে এসে ওড়াবে কি ?'

মঙ্গলা আবার হেসে উঠল।

এই হাসির শব্দ সুবলের পরিচিত। মঙ্গলা ফের তার সেই প্রগলভতায় ফিরে এসেছে। এই হাসি দিয়ে মঙ্গলাকে মঙ্গলা বলে ফের চিনতে পারছে সুবল। অন্যের ছেলের বসন্ত হয়েছে বলে সেই উদ্বেগ অশান্তি এখন আর নেই, নেই সেই অতিবাৎসল্যের নরম ভিজে ভিজে কথা ; এ হাসির মধ্যে তীক্ষ্ণতা আছে, উপ-হাসের খোঁচা আছে, তবু এ হাসি সুবলের স্ত্রী মঙ্গলার। এখন অনায়াসে সুবল তাকে নিজের রোমশ বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারে, আদরে সোহাগে দুজনেই এমন অস্থির আর উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারে যে, পৃথিবীর অন্য কোন কথাই তাদের

মনে উঠবে না, মুখে আসবে না। কিন্তু কেন জানি সুবলের আজ ওসব প্রবৃত্তিই হল না, ইচ্ছা হল হাতটা একবার এগিয়ে দিয়ে মঙ্গলাকে অন্তত একটু স্পর্শ করে, কিন্তু হাতখানা যেন নড়তে চাইল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মঙ্গলা বলল, 'কি হল রাগ করলে নাকি?'

সুবল বলল, 'না।'

মঙ্গলা আর একটু সরে এসে সুবলের গা ঘেঁসে বলল, 'তবে অমন করে রয়েছ যে?'

সুবল তেমনি নিস্পৃহ উদাস গলায় বলল, 'এমনিই।'

কথার ভঙ্গির মধ্যে কথার ধ্বনির মধ্যে অদ্ভুত এক দূরত্বের ভাব। মঙ্গলা বুঝে উঠতে পারল না হঠাৎ আজ কি হল সুবলের। নিজেদের দারিদ্র নিয়ে ঠাট্টাতামাসা তো মঙ্গলা এমন অনেকদিনই করে। সুবল চটে যায় রাগ করে, কিন্তু কোনদিনই গম্ভীর হয়ে চুপ করে থাকে না। তবে কি ছেলেপুলে নিয়ে যেসব কথা এতক্ষণ হল, সেই জন্যই মন খারাপ হয়েছে সুবলের? আহা বেচারা। যেন সুবল নিজেই একটি ছেলেমানুষ। মনে মনে অনর্থক কষ্ট পাচ্ছে। তাকে শান্ত করবার জন্য, সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মৃদু হেসে মঙ্গলা তাকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে গেল। কিন্তু সুবল আস্তে আস্তে তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে তেমনি নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'এখন থাক মঙ্গল, ঘুমো, একটু ঘুমোতে দে।'

মঙ্গলা আহত হয়ে বলল, 'তা হলে তুমি সত্যিই রাগ করেছ।'

সুবল বিরক্ত হয়ে বলল, 'না এখনো করি নি, কিন্তু অমন ন্যাকামি করলে সত্যিই এরপর রাগ হবে।'

মঙ্গলা পাশ ফিরে শুয়ে বলল, 'রাগ অন্য মানুষেরও হতে পারে। তারও রক্ত-মাংসের শরীর, কিন্তু দুপুর রাতে রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটির চেয়ে ঘুমান ভালো।'

আজ সমস্ত দুপুর আর বিকেলটা পরের বাড়িতে গিয়ে আদর আপ্যায়ন প্রশংসা সুখ্যাতি কম পায় নি মঙ্গলা। গন্ধেশ্বরীর মতো জবরদস্ত ঝগড়াটে কুঁদুলে মেয়েমানুষও মঙ্গলাকে বহুবার মা লক্ষ্মী বলে আদর করেছে। তার বলবার ভঙ্গিতে আন্তরিকতা সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। নিমাইয়ের মাও কতবার বলেছে, 'দিদি, তোমার মতো মানুষ হয় না। তোমার প্রশংসা পাড়ার সব বাড়িতে।'

কিন্তু সেসব স্তুতি-প্রশংসা এই মুহূর্তে মঙ্গলার কাছে যেন একেবারেই নিরর্থক হয়ে গেছে। একরাত্রের স্বামীর এই একটুখানি অবজ্ঞায়, একটুখানি ঔদাসীন্যে মঙ্গলার মনে দুঃখ যেন উদ্বেল হয়ে উঠতে চাচ্ছে। একজন মানুষের সামান্য একটু

ছোঁয়ায় একটু কথায় যে আনন্দ, হাজার হাজার লোকের প্রশংসা কুড়িয়েও কি তা মেলে? তাতে কি তেমন করে মন ভরে, বুক জুড়োয়? মঙ্গলার মনে হতে লাগল এ যেন কেবল একটি রাত নয়, জীবন ভরে রাতের পর রাত যেন সে এমনই বঞ্চিত রয়ে গেছে, কাঙালিনীর মতো একজনের পিছনে পিছনে ফিরেছে, কিন্তু সমস্ত অন্তর দিয়ে কিছুই সে তাকে কোনদিন দেয় নি, কিছুই নয়।

১১

ভোর হতে না হতেই বিনোদের মা সৌদামিনী এসে উপস্থিত হল, 'উঠেছ নাকি বউমা?'

মঙ্গলা উঠেছে অনেকক্ষণ, মুখ হাত ধুয়ে ঘর ঝাঁট দিয়েছে, উঠান ঝাঁট দিয়েছে তারপর উঠানে গোবর জলের ছড়া দেওয়ার আয়োজন করেছে। শরীরই খারাপ থাকুক আর মনই খারাপ থাকুক, নিতান্ত শয্যাগত না হয়ে পড়লে এসব দৈনন্দিন সাংসারিক কাজের একচুলও এদিক-ওদিক হয় না মঙ্গলার। অভ্যস্ত কাজগুলি শুরু না করতে পারলে অস্বস্তি যেন আরো বেশি লাগে।

মঙ্গলা সৌদামিনীর কথার জবাবে বলল, 'উঠব না কেন খুড়িমা, রাত কি এখন ভোর হয়েছে নাকি?'

সৌদামিনী বলল, 'না, তা হবে কেন মা, বলে কোথাকার লোক এর মধ্যে কোথায় চলে গিয়েছে। আমার বিনোদও তো গোঁসাই-কান্দা এতক্ষণ ধর ধর হল বলে। কিন্তু তোমার তো বউমা কোন ঝক্কি ঝামেলা নেই। বেলা দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলেই বা কি।'

মঙ্গলা গম্ভীর মুখে বলল, 'সে তো ঠিকই। রাত পোহাতে না পোহাতে এত সাত তাড়াতাড়ি বিনোদ ঠাকুরপোরই বা গোঁসাই-কান্দা যাওয়ার কি দরকার পড়ল। গাঁয়ে মার অনুগ্রহ শুরু হয়েছে বলে নাকি?'

সৌদামিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত মঙ্গলার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এ তোমার কি রকম কথার ধারা বউমা। সকাল বেলায় তুমি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্য কোমর বেঁধে লাগলে নাকি? বিনোদ গেছে তার নিজের কাজে। গোঁসাই-কান্দার রায়বাড়ির ছোটকর্তা খবর পাঠিয়েছেন, তাই গেছে। তার সঙ্গে গাঁয়ে মার অনুগ্রহ হওয়ার কি সম্বন্ধ!'

মঙ্গলা হাসিমুখে বলল, 'কথায় কথায় আপনি এমন চটে যান খুড়িমা, যে

আপনাকে কিছু বলবার জো নেই। সত্যি সত্যিই কি বিনোদ ঠাকুরপো প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে? আমি তামাসা করছিলাম।'

সৌদামিনী তেমনি অপ্রসন্ন গলায় বলল, 'এও কি তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের কথা হল বউমা? পাড়া ভরে তোমার বুদ্ধির আমরা কত তারিফ করি। আর তুমি কি না বললে তামাসা করছিলাম। আমার মত বুড়ো মানুষের সঙ্গে তোমার কি তামাসা করবার সম্পর্ক?'

মঙ্গলা তেমনি হাসিমুখেই জবাব দিল, 'ভারি অন্যায় হয়ে গেছে খুড়িমা। কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন, আপনি বারান্দায় উঠে বসুন, আমিও ততক্ষণ উঠানটা সেরে আসি।'

সৌদামিনী বলল, 'না বউমা, বসব না, পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমারই তো বলতে হবে। যত দায় পড়েছে আমার। এসব দিকে আর তো কারো কোন চৈতন্য নেই। থাকলে এসব রোগ-ব্যামো হবেই বা কেন। সব পাড়া ঠাণ্ডা রইল, আর মা অনুগ্রহ করলেন এখানে এসে! ছোটখাট পাপতাপ কিছু না থাকলে কি এমন হয়? শুনেছ বোধ হয় মুকুন্দর বউটার গায়েও ফুটে বেরিয়েছে।'

মঙ্গলা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি যে কাল বিকেলেও তাকে ভালো দেখে এলাম।'

সৌদামিনী বলল, 'আর আমি এইমাত্র সেখান থেকে আসছি। এখন কেবল এই রকমই শুনবে বউমা। সকালে দুজনের, বিকেলে পাঁচজনের, এমনি করেই ছড়াবে। আর দেরি কর না, এখনো ভালোয় ভালোয় মা শীতলা রক্ষাচণ্ডীর কুলো নামাও। মা যদি রক্ষা করেন তবেই সব রক্ষা পাবে, না হলে ডাক্তার বৈদ্যের সাধ্য নেই যে এ রোগে—'

মঙ্গলা বলল, 'বেশ তো, আপনারা পাঁচজনে যদি মত দেন—'

সৌদামিনী একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'মত না দেওয়ার আবার কি আছে। সবাই মত দেবে। দেবদেবতার ব্যাপার। একি খেলার কথা যে ইচ্ছা হল মত দিলাম আর ইচ্ছা হল দিলাম না।'

মঙ্গলা বলল, 'কিন্তু করতে চান কবে?'

সৌদামিনী জবাব দিল, 'কবে আবার, কালই। দেরি করবার আর সময় আছে নাকি? কালই তো মঙ্গলবার, বেশ যোগ্য দিন পড়েছে, কালই করতে হবে পুজো।'

মঙ্গলা বলল, 'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি হয়ে উঠবে? দুখানা প্রতিমাও তো দরকার।'

সৌদামিনী বলল, 'সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। মোহন বৈরাগীর ঘরে অমন দু-চারখানা প্রতিমা সব সময় তৈরীই থাকে। খরচ পাওয়া মাত্র দু-দণ্ডের মধ্যে রঙ করে দেবে। শীতলা রক্ষাচণ্ডী যদি গড়ানো নাই থাকে, পুরনো মনসা কি জগদ্ধাত্রীর রঙ ফিরিয়ে মোহন কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। নিদেন পক্ষে পুরনো রাধা কি লক্ষ্মী সরস্বতীর দুখানা হাতের সঙ্গে আরো দুখানা হাত জুড়ে নিলেই হবে। সে জন্যে ভেবো না তুমি। যারা এসব কাজ করে তাদের ঘরে কত রকমের প্রতিমা থাকে। নগদ টাকা পেলেই তোমার দরকার মতো রঙ বদলে দেবে, নাম বদলে দেবে।'

মঙ্গলা মুখ মুচকে একটু হাসল, 'লোকে যে বলে সব দেবতাই এক, কথাটা তাহলে মিথ্যে নয়।'

সৌদামিনী দার্শনিকের মতো মুখ গম্ভীর করে বললে, 'কে বলল মিথ্যা। শোন নি সেবার কথক ঠাকুরের মুখে, তিনি এক থেকে বহু আবার বহু থেকে এক। কিন্তু দেবদেবতার নামে অমন করে হাসতে নেই মঙ্গল বউ, ওতে অমঙ্গল হয়, একেই তো দেশের যা অবস্থা—'

মঙ্গলা অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে রইল।

সৌদামিনী বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রত্যেকের কাছেই কথাটা পাড়তে লাগল এবং অবিলম্বে পুজো করার প্রয়োজনীয়তা সকলকে বুঝিয়ে দিল।

নবদ্বীপ বলল, 'বেশ তো করে-কম্মিয়ে নাও, আমি তো আছিই।' বলেই গঞ্জের দিকে যেতে উদ্যত হল নবদ্বীপ।

সৌদামিনী বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু আরও একটা কথা আছে যে ধন ঠাকুরপো।'

নবদ্বীপ একটু বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, 'আবার কি কথা!'

সৌদামিনী বলল, 'ওমা, আসল কথাই তো রয়ে গেল। টাকা পয়সার দরকার না?'

নবদ্বীপ বলল, 'বেশ, দশজনে যা দেবে আমিও তাই দেব।'

খাটো ঘোমটার আড়ালে সৌদামিনী একটু হাসল, 'এ কি একটা কথার মতো কথা হল ধন ঠাকুরপো। আপনি কি পাড়ার আর দশজনের মতো! ঠাট্টা-তামাসা রাখুন। কাজটা অবশ্য দশজনেরই। কিন্তু হাতের দশটা আঙুল কি সমান? তা

ছাড়া বৈঠক করে মাথট তুলে যে কাজে হাত দেবেন তার সময় কই। অত দেরি মার কি এবার সইবে! দেখেছেন না পাড়ার অবস্থা। পুজোর খরচটা আপনিই চালিয়ে দিন। তারপর সবাইয়ের কাছ থেকে যে মাথট ওঠে আপনি নিয়ে নেবেন।'

নবদ্বীপ মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'দেখি ভেবে।' তারপর সোজা বাজারের পথ ধরল।

সৌদামিনী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল। ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়াল মুরলী; তারপর সৌদামিনীকে ডেকে বলল, 'রাগ করলেন নাকি খুড়িমা। ভাববেন না আপনি। বাবার ঐ রকমই কথাবার্তা। আপনি যান, অন্য জোগাড়-টোগাড় দেখুন। পুজো কালকেই হবে। টাকা পয়সার জন্যে আটকাবে না।'

সৌদামিনী বলল, 'বেঁচে থাক বাবা, ভারি খুশী হলাম তোমার কথা শুনে। এই তো কথার মতো কথা। দশজনের অবস্থা তোমরা না দেখলে, দেখবে কে। ভগবান দেখতে দিয়েছেন তোমাদের।'

যেতে যেতে সৌদামিনী ভাবল, না মুরলীর যত নিন্দা লোকে করে আসলে তত মন্দ সে নয়। ছেলেটির চরিত্রই কেবল নেই, তা ছাড়া আর সবই আছে। আলাপ-আপ্যায়নে কি রকম প্রাণ কেড়ে নেয়, দয়া-দাক্ষিণ্যে হাত কত দরাজ। দরকারের সময় টাকাটা আধুলিটা থেকে পাঁচ-দশ টাকা পর্যন্ত সৌদামিনী মুরলীর কাছ থেকে পেয়েছে। কোন বারই মুরলী না করে নি। শোধ দেওয়ার জন্য তাগিদ দেয় নি আর পাঁচজনের মতো। ভারি চমৎকার ছেলে। মুরলীর নিন্দা শুনলে, তার কোন রকম কোন লাঞ্ছনার কথা শুনলে সৌদামিনীর মনে কেমন যেন একটা খোঁচা লাগে। আহা এত ভালো ছেলে, স্বভাব-চরিত্রটা যদি শুধু একটু ভালো হত তাহলে লোকে আর অমন করে বলতে পারত না। এ নিয়ে কোন কোন সময় মুরলীকে একটু আধটু বোঝাবারও চেষ্টা করেছে সৌদামিনী, 'ওসব এখন ছেড়ে দাও বাবা, অমন লক্ষ্মীর মতো বউ রয়েছে ঘরে, মেয়ে রয়েছে তোমার।' মুরলী হেসে মাথা নেড়েছে, 'ওসব থাক খুড়ি মা, আর কি কি যেন সব বলছিলেন তাই বলুন।'

সৌদামিনী আহত হয়ে চুপ করে গেছে। তারপর মনে মনেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে, এক একজনের থাকে এ রকম দোষ। বয়সে ভাটি না পড়লে যায় না। কারো কারো বুড়ো বয়সেও থাকে। এমন সৌদামিনী অনেক দেখেছে।

শীতলা রক্ষাচণ্ডী পুজোর কথাটা পাড়ায় প্রচারিত হতে বেশি সময় লাগল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তোড়জোর শুরু হয়ে গেল। সময় বেশী নেই, কয়েকটা ঘণ্টা কেবল মধ্যে। লোক গেল মদন বৈরাগীর বাড়ি প্রতিমার ব্যবস্থা করতে। সুবল নিল চাঁদা তোলার ভার। ফটিককে বলল, 'ওসব হবে না, দশজনের পুজো দশজনের চাঁদাতেই হবে, হতে পারে মুরলীরা বড় লোক। তাই বলে গোটা কয়েক টাকা বেশী দিয়েছে সেই খোঁটা দেবে বছর ভরে আর বাপবেটায় সকলের ওপর মাতব্বরি করবে, তা চলবে না।'

কথাটা অনেকেরই পছন্দ হল না। দেব-দেবীর পুজোয় নিজেদের কল্যাণের জন্য চাঁদা তো সাধ্যমত প্রত্যেকে দেবেই, কিন্তু মুরলী যদি কিছু বেশি খরচ করে তো করুক না। তাতে আমাদের ফুর্তির মাত্রাটা বাড়বে, প্রসাদের পরিমাণ এবং উৎকর্ষ বেশি হবে সে সুবিধাটুকু সকলেই ভোগ করবে। তা নিয়ে সুবলের এত মাথাব্যথা কিসের, এত মান-অপমান বোধই বা কিসের জন্য!

পুজো হবে ঘাটের ধারে, হিজল গাছের তলায়। শীতলা রক্ষাচণ্ডীর পুজো প্রতিবারই এখানে হয় বলে এ অঞ্চলে এর আরেক নাম হয়েছে ঘাট পুজো। শুধু এ পাড়ায় নয়, ব্রাহ্মণ কায়স্থদের পাড়ায়ও সবাই নদীর ঘাটে আসে পুঁজো করতে। একেক পাড়ার দখলে দু তিনটি কি তারও বেশি আছে ঘাট। কিন্তু নির্বিচারে সব ঘাটে পুজো নেই। যে ঘাটে পুরুষানুক্রমে বছরের পর বছর পুজো হয়ে আসছে সে ঘাট যত অপরিসর আর যত অসুবিধাজনকই হক পুজো সেখানেই হবে। গায়ের জোরে আর টাকার জোরে কায়েত পাড়ার বোসেরা একবার ঘাট বদলে ছিল। বছরও ঘুরল না, সেই বোসেদের বাড়ির চার-চারজন মানুষ খাটে চড়ে এল সেই ঘাটে। এর পর কোন পাড়ায় শিগগির আর এ রকম গোঁয়ার্তুমি কেউ করে নি।

নদীপারের এ সব চটানে বর্ষার সময় অবশ্য ডুব-জল থাকে। তখন নদী হয় সমুদ্রের মতো। বর্ষার শেষে সেই জল সরে গিয়ে থক থক করতে থাকে কাদা। সারাটা অগ্রহায়ণ মাস ভরে সেই কাদা একটু একটু শুকিয়ে আসে। পৌষ মাসে শুকাতে থাকে নদী। পারের দিকটা প্রসারিত হতে হতে এত বড় হয় যে সেখানে ছোটখাটো পূজার্চনা কেন, দু-চার গাঁয়ের মানুষের মেলাও বসিয়ে দেওয়া যায়।

আগের দিন বিকেলে সৌদামিনী, আলতা আর তার মাকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটের

ধারে হিজল গাছের তলাটা ভালো করে ঝাঁট দিয়ে গোবর জল ছিটিয়ে এল। পরদিন ভোরে গোবরের লেপ পড়ল আর একবার। দণ্ড চারেক বেলা হতে না হতেই লোকজনে গিজগিজ করতে লাগল ঘাট। মদনের বাড়ি থেকে মাথায় করে প্রতিমা নিয়ে এল ছেলেরা। শীতলা আর রক্ষাচণ্ডী। শীতলার 'হাতে ঝাঁটা মাথায় কুলো, চম্পকবর্ণা। রক্ষাচণ্ডীর চার হাতে, শঙ্খ, চক্র, পদ্ম আর বরাভয়। হাত কয়েক ব্যবধান রেখে ছোট দুখানা জলচৌকি পেতে বসান হল প্রতিমা। ঘাটের কাছাকাছি যে সব বাড়ি, সেই সব বাড়ি থেকে আসতে লাগল মাদুর, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁজ। বারকোষ ভরে ফুল বেলপাতা পুজোর বিচিত্র রকমের উপচার।

ভোর হতে না হতেই পাড়ার বউ-ঝিরা সব নদীতে গিয়ে স্নান করে এসেছে। তারপর চলেছে সাজসজ্জার পালা। অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী যারা তাদের বউ-ঝিদের বাক্স সিন্দুক থেকে বেরুচ্ছে ভারি ভারি সোনার গহনা, আর যে সব মেয়ের স্বামী-পুত্রেরা নিতান্তই অল্প মূলধনের ব্যাপারী, বাজারের মাঝখানে খোলা জায়গায় পাটের চট পেতে বসে যারা পদ্মপাতায় নুনের পুঁটুলি বেঁধে খদ্দেরের হাতে তুলে দেয়, তাদের ঝাঁপিতে বাক্সে সোনাদানা অবশ্য অত নেই। তবু দু-চারখানা গহনার সঙ্গে রঙীন শাড়ি-সেমিজ প্রায় সকলের তহবিল থেকেই বেরুচ্ছে। এসব শাড়ি সচরাচর বউদের গায়ে ওঠে না। পূজা-পার্বণ উৎসব-আনন্দের জন্যেই এসব তোলা থাকে। বছরের অন্য সব দিন আটপৌরে খাটো খাটো ময়লা আর জীর্ণ শাড়িতে দিন কাটে। কেবল এই সব বিশেষ দু-একটি দিনের জন্য নামে রঙ-বেরঙের শাড়ি। আর সেই শাড়ির সঙ্গে সঙ্গে রঙ ধরে মনে, চোখের কোণে আর ঠোঁটের কোণে সেই রঙীন আনন্দ ঝিলিক দিতে থাকে। সাধারণ সব গৃহস্থ বউদের মনে হয় দেবলোকের অপ্সরীর মতো। সমস্ত গাঁ-খানারই যেন রূপ বদলে যায়, রঙ বদলে যায়।

গাঁয়ের বউ-ঝিদের জীবনে এই দিনটি বছর বছর এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। সারাটা বছর রান্নাঘর থেকে শোবার ঘরে আনাগোনায় কাটে, বড়জোর শাশুড়ি-ননদের অভিভাবকতায় পুকুরের ঘাট কি নদীর ঘাট পর্যন্ত সীমাটা একটু বিস্তৃত হয়; কেবল এই শীতলা রক্ষাচণ্ডীর পুজোর মতো দিনটিতে পৃথিবীটা আকস্মিকভাবে অনেকখানি ব্যাপক হয়ে দেখা দেয়। এদিন দলের সঙ্গে বউ-ঝিরা মাণতে মাণতে সমস্ত গাঁ, গাঁয়ের সমস্ত বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতে পারে। অনেক আম কাঁঠালের বাগান, ঝোপে জঙ্গলে ভরা পোড়ো ভিটে, আর বাঁশের ঝাড়ের

ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। খাটো ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে নানারকমের গাছপালা, নানা আকারের ঘরবাড়ি, অপরিচিত অর্ধপরিচিত মানুষের নানা ধরনের মুখ। মানুষের বিভিন্ন রকমের গলা কানে অদ্ভুত শোনায়। বিস্তৃতি আর বৈচিত্র্যের মাঝখানে সেই শোবার ঘর আর ছোট্ট রান্নাঘর কোথায় মিলিয়ে যায়, মনেই থাকে না যে আবার সেখানে তাদের ফিরে যেতে হবে।

সিন্দুরের পুত্তলি আঁকা নতুন দুখানা বড় বড় কুলো শীতলা রক্ষাচণ্ডীর পায়ে ছুঁইয়ে আনা হয়েছে। এই কুলো নিয়ে মেয়েদের দল বেরোবে মাগুনে। প্রত্যেকের বাড়ি থেকে গৃহিণীরা চাল ঢেলে দেবে এই কুলোয়। মেয়েদের কাঁখ থেকে কাঁখে কুলো ফিরতে থাকবে। চালের ভারে কুলো যখন ভেঙে পড়তে চাইবে, চালগুলি ঢেলে দেওয়া হবে বয়স্কদের কাঁধের ধামায়, তারপর ধামায়ও যখন চাল আর ধরতে চাইবে না সামনে যে বাড়ি পাওয়া যাবে সে বাড়ির হেফাজতেই চালগুলি রেখে আসা হবে।

সমস্ত বাড়ির মাগুন শেষ হয়ে গেলে এই চাল কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে গেলেই চলবে।

নবদ্বীপের বাড়ি থেকেই কুলো প্রথম বেরোবে। বছর বছর এই নিয়মই চলে আসছে। নবদ্বীপের স্ত্রী মাতঙ্গিনী বেঁচে থাকতে সে-ই রক্ষাচণ্ডীর কুলো আগে কাঁখে নিত। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই সম্মান দেওয়া হবে এখন তার পুত্রবধূ মনোরমাকে। শীতলার কুলো প্রথম নেয় বিনোদের মা সৌদামিনী। তারপর পালাক্রমে দুখানা কুলোই বিভিন্ন বাড়ির বউ-ঝিদের কাঁখে কাঁখে ঘোরে।

এবার কিন্তু ভালোমানুষি করতে গিয়ে প্রায় একটা গোলমাল বাধিয়ে তুলল ওবাড়ির বিষ্টু সার বউ।

উঠানে আলপনা দেওয়া দুখানা পিঁড়ির ওপর কুলো দুখানা পাশাপাশি রয়েছে। কাছাকাছি কয়েক বাড়ির বউ-ঝি যারা ইতিমধ্যে দলে এসে জুটতে পেরেছে পিছনে দাঁড়িয়েছে সারি বেঁধে। ঘর থেকে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে এল মনোরমা। পাতলা চেহারা সোনার ভরিতে ভারি হয়ে উঠেছে। গা দেখা যায় না, মনোরমার সর্বাঙ্গে কেবল পাকা সোনার দ্যুতি ঝিক ঝিক করছে। গায়ে সোনার গহনা প্রত্যেকেরই দু-চারখানা করে আছে। কিন্তু মনোরমার ঐশ্বর্যের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। তার দিকে তাকিয়ে আর সকলের চোখ শুধু ঝলসেই গেল না, ঈর্ষায় জ্বলতেও লাগল।

পাশেই দাঁড়িয়েছিল মঙ্গলা, সেই পুরনো লালপেড়ে গরদের শাড়িখানা পরনে।

গলায় একগাছি সরু হার আর হাতে কয়েক গাছা করে চুড়ি ছাড়া আর কোন অলঙ্কার নেই। কিন্তু এইটুকু সজ্জাতেই মঙ্গলার ভারি অদ্ভুত এক রূপ খুলে গেছে। যেন এর চেয়ে বেশি অলঙ্কার তাকে মানায় না। মঙ্গলাকে দেখা যাচ্ছে স্তব্ধ গম্ভীর একখানা শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো! অলঙ্কার যেন প্রতি অঙ্গে থমকে আছে।

বিষ্টু সার বউ মঙ্গলার দিকে খানিকক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, 'এই পুজোআচ্চার দিনে মাকেই কিন্তু আমাদের মানায় ভালো! যেন সাক্ষাৎ একেবারে মঙ্গলচণ্ডীর মূর্তি। তোমাদের অনেক কালের নিয়ম না হলে মঙ্গলাই এসে না হয় আগে তুলত রক্ষাচণ্ডীর কুলো। চমৎকার মানাত কিন্তু। কাল আমার নিমাইয়ের পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় বসে ছিল। নিজের ছেলের জন্যেও মানুষে অতখানি করতে পারে না। বউ উঠে আসতে নিমাই বলে কি, ঠাকুমা আমার কাছে এসে মা রক্ষাচণ্ডী বসেছিল, আমি স্বপ্নে দেখলাম। মনে মনে ভাবলাম, আহা! তাই যেন হয়। আমার মা মঙ্গলার হাত দিয়ে রক্ষাচণ্ডীই তোকে যেন রক্ষা করেন। আসছে বারে আমি জোড়া মূর্তি গড়িয়ে পুজো দেব। মাগুন সাঙ্গ হলে বিকেলের দিকে একবার যেয়ো কিন্তু বউ মা। রাত থেকে ওর মা আবাগীও পড়েছে। কেন, এখন দেখিস না তোর ছেলে? হাড় আমার চিবিয়ে খেলে সবাই মিলে।'

কথা একবার আরম্ভ করলে নিমাইয়ের ঠাকুমা কোনদিন থামতে জানে না। মাঝখানে পড়ে কাউকে না কাউকে থামাতেই হয়। মনোরমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'যাক, আপনাদের বাদ-বিসংবাদের কথা এখানে শোনবার তো কারো সময় নেই খুড়িমা, সে ঝগড়া বাড়ি গিয়ে বউয়ের সঙ্গেই করবেন।' তারপর একটু শ্লেষের হাসি হেসে ঝাঁজ দিয়ে বলল, 'এবার আপনাদের যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে রক্ষাচণ্ডীর কুলো স্বয়ং মঙ্গলচণ্ডীর কাঁখেই প্রথমে তুলে দেবেন, বেশ তো তাই দিন, তাতে আপত্তির তো কারো কিছু নেই।'

কিছুক্ষণের জন্য কারো মুখে কোন কথা বেরোল না।

ঘরের মধ্যে মুরলী ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে মেয়েদের সব কথা শুনছিল; মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে তাকাচ্ছিল বাইরের দিকে। মনোরমার কথা শেষ হতে না হতে এবার সে একেবারে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল. কৃত্রিম একটু কাশি দিয়ে বলল, 'এদিকে আসুন খুড়িমা, আপনাদের বিবাদটা কি নিয়ে একটু শুনি।'

মুরলীর সাড়া পেয়ে অন্যান্য বউ-ঝিরা যেন হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে নড়েচড়ে উঠল,

তারপর সেইখানেই ফের সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কাছাকাছি কোন বেড়ার আড়াল থাকলে যেন সেখানে গিয়ে মুরলীর দৃষ্টি থেকে তারা আত্মগোপন করত। তাদের ভাব দেখে মুরলী মনে মনে হাসল। সৌদামিনী আর বিষ্টু সার স্ত্রী এগিয়ে এল মুরলীর সামনে।

সৌদামিনী বলল, 'না; বিবাদ আবার কোথায় দেখলে বাবা।'

বিষ্টু সার স্ত্রী হাসির ভান করে বলল, 'এসব আমাদের মেয়েদের মেয়েলী কথাবার্তা—'

মুরলী হেসে বলল, 'তবু তার মধ্যে পুরুষের মতামত খানিকটা থাকা ভালো। কুলো নেওয়া নিয়ে যে নিয়ম চলে আসছে তাই চলবে। এ বাড়ির বউই চিরকাল কুলো প্রথম তোলে, আজও সেই তুলবে, এখানে আর কারো কথা তো উঠতেই পারে না, তা তিনি আপনাদের রক্ষাচণ্ডীই হন আর মঙ্গলচণ্ডীই হন।'

কয়েকটি অল্পবয়সী মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। মঙ্গলার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল পাতলা গৌরবর্ণ চামড়ার নিচে রক্ত যেন টলটল করছে।

নিজেকে এতক্ষণ ভারি অসহায় বোধ হচ্ছিল মনোরমার। স্বামী হঠাৎ তার পক্ষ সমর্থন করতে আসায় সে একটু লজ্জিত হলেও মনে মনে বেশ খানিকটা গর্ব আর আনন্দও বোধ করল।

মুরলী অসচ্চরিত্র, পাড়া-বেপাড়ার অন্যান্য মেয়েরা তার মন আকর্ষণ করে। ঘর ছেড়ে তাদের পেছনে যে ছোটে মুরলী, এতে দুঃখ আর দুর্ভাগ্য যত বড়ই থাকুক, অপমানটাই মনোরমার মনে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে বেঁধে। অন্যান্য মেয়ের কাছে সে মুখ দেখাতে পারে না, সামনে আড়ালে তাদের নীরব আর সরব সমালোচনা মনোরমার চোখ কানকে পীড়িত করতে থাকে। রূপের যদি তেমন জলুস থাকত মনোরমার, গুণের যদি থাকত তেমন মুগ্ধ করার শক্তি, তাহলে কি আর মুরলীর অমন বারটান হত। ছলাকলায় সেবাযত্নে আদরে-সোহাগে স্বামীকে যে সে একান্ত করে ঘরে রাখতে পারে না, সে তো মনোরমারই দোষ, মনোরমারই অক্ষমতা। কিন্তু আজ একবাড়ি লোকের সামনে মুরলী যে তার সম্মান রাখবার জন্য এগিয়ে এল এতে কি মনোরমার সেই অপমানের অনেকখানি ক্ষালন হয়ে গেল না। মনোরমা কি এখন সকলের মুখের ওপর শুনিয়ে দিতে পারবে না যে আসলে স্ত্রীকেই ভালোবাসে মুরলী, তার মানসম্মান রাখবার জন্যই সে ব্যাকুল। অন্য মেয়েদের পিছনে যে সে ছোটে, সেটা তার খেলা, সেটা তার কৌতুক ছাড়া আর কিছু নয়।

আর কোন কথা উঠল না, কিছুক্ষণের মধ্যেই কুলো নিয়ে মেয়েদের দল বেরিয়ে পড়ল গাঁয়ের পথে পথে। তারা একেক বাড়িতে ওঠে আর কলকণ্ঠে সমস্বরে হুলুধ্বনি দেয়। তাদের কথায় শুকনো পাতাগুলি মর্মরিত হতে থাকে, এতক্ষণে বোঝা যায় সত্যিই এ অঞ্চলে বসন্ত বাঁধা পড়েছে এদের আঁচলে।

কুলোর সঙ্গে সঙ্গে খানিকক্ষণ ঘুরবার পর মঙ্গলা হঠাৎ বলল, 'আমি ভাই যাই।'

বিস্মিত হয়ে অনেকেই মঙ্গলার দিকে তাকাল, 'সে কি মঙ্গলাদি, এখনই যাবে কোথায়!'

'যাই একটু নিমাইয়ের মার কাছে, শুনেছি তারও গায়ে বসন্ত উঠেছে, রোগা ছেলে নিয়ে একা একা পড়ে আছে বেচারা।'

বলেই চলতে শুরু করল।

কয়েকজন পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কেউ কেউ একটু মুচকি হাসল। 'নিমাইয়ের মার কাছে যাওয়া একটা অছিলা। আসলে রাগ আর অভিমান হয়েছে মঙ্গলার। দেখলে না রক্ষাচণ্ডীর কুলো একবারও সে কাঁখে নিলে না। সত্যি, বাড়ির ওপর পেয়ে মুরলী সা একেবারে যা তা শুনিয়ে দিল। এর একটা প্রতিবাদ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রত্যেকেই একেবারে মুখ বুজে রইল, যেন ছুঁচ-সুতোয় সেলাই করে রেখেছে ঠোঁট দুটি, খুলবার জো নেই।'

হারান সার মেয়ে পুনটুরী বলল, 'এখন তো খুব খই ফুটছে মুখ দিয়ে, তখন বললেই পারতে, বুঝতাম ক্ষমতা।'

পাড়া ছাড়িয়ে দল এবার অন্য পাড়ায় এসে পড়েছিল। ঝোঁকের মাথায় খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে মল্লিকদের গাব আর খুদে জাম গাছের ভিটায় এসে মঙ্গলারও হঠাৎ তা খেয়াল হল। কিন্তু তাই বলে মঙ্গলা একটুও বিচলিত হয় না; এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় কেন, এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়েও মঙ্গলা ইচ্ছা করলে একা একা চলে যেতে পারে। আর এ তো তার চেনা পথ, ফি বছরেই একবার এখান দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। পথের কথা নয়, নিজের বিসদৃশ আচরণের কথাই এতক্ষণে মনে পড়ল মঙ্গলার। কুলোর সঙ্গে সঙ্গে শেষ পর্যন্ত না গিয়ে এভাবে একা একা চলে আসায় সবাই যে তার অসাক্ষাতে খুব হাসাহাসি করবে তাতে মঙ্গলার সন্দেহ রইল না। হাসুক। অসাক্ষাতে ওরা যাই বলাবলি করুক, হেসে একেবারে যতই গড়িয়ে পড়ুক, মঙ্গলার সাক্ষাতে তাকে যে ওরা তুচ্ছ করতে পারে না, রীতিমত ভয় করে, এ তো মঙ্গলা দেখেছে। অসাক্ষাতে

কে কি করল না করল, বলল না বলল, তা নিয়ে মঙ্গলা মাথা ঘামাতে যায় না। কিন্তু মুরলীকে কিছু শুনিয়ে দিয়ে আসা উচিত ছিল,। ঠিক ঝগড়ার মতো করে নয়, শ্লেষ করে খোঁচা দিয়ে দিয়ে, মুরলীকে ঠিক সম্বোধন করে নয়, আর কারো সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মুরলীর কথাগুলির বেশ শানানো জবাব দিয়ে আসা যেত, এমন স্বযোগ কি আর কোন দিন হবে যে পাড়ার অতগুলি বউ-ঝির সামনে মাত্র কয়েকটি কথার খোঁচায় মুরলীকে সে চরম অপমান করে একেবারে নির্বাক করে দিতে পারবে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে মঙ্গলার খেয়াল হল যে বিষ্টু সার বাড়ি নয়, অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরে ফিরে সে একেবারে নিজেদের বাড়িতে এসেই উপস্থিত হয়েছে। এই ভুলে মনে মনে একটু যেন পরিতৃপ্তিই বোধ করল মঙ্গলা। থাক ভালোই হল, নিজের ঘরে গিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে পারবে, একটু গড়িয়ে নেওয়া যাবে। তারপরে না হয় যাবে নিমাই আর তার মাকে দেখতে। এবেলা রান্না খাওয়ার ঝঞ্ঝাট নেই, নিতান্ত ছেলেপুলে যারা থাকতে পারে না, তারা ছাড়া বয়স্কদের মধ্যে পাড়ায় কেউ আজ আর এবেলা ভাত খাবে না, ঘাটের পুজো শেষ হলে সেখানেই পেট ভরে চরু খাবে। মিষ্টি ছাড়া কেবল দুধের আর চালের মিষ্টান্ন। অথচ অদ্ভুত তার স্বাদ। কিন্তু কেবল ঐ একদিন ঘাটে ঠাকুরের হাতে যেমন তেমন করে আধাআধি জল মেশান দুধে মোটা চাল সেদ্ধর স্বাদ বছর ভরে মুখে লেগে থাকে, ঘরে খাঁটি দুধে অনেক যত্ন করে নিজের হাতে তৈরী জিনিসেও তেমন স্বাদ পাওয়া যায় না। স্ববল অবশ্য বলে, সারাদিন উপবাসের পর বিষ পর্যন্ত অমৃতের মতো ঠেকে। সে কিন্তু মঙ্গলার মতো একেবারে না খেয়ে থাকে না।

স্ববল সকালে মুড়িচিঁড়া পেট ভরে খেয়ে নেয়। তারপর যায় ঘাটে। সতরঞ্চি বিছিয়ে সকাল থেকেই সেখানে পুরুষরা তাসপাশা খেলতে শুরু করে। কোন বেটাছেলেই প্রায় বাড়ি থাকে না, সমস্ত পাড়াটা এই একটি মাত্র দিন তারা মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে আসে। মেয়েরা দিন ভরে মাগুন মাগে, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একেক বাড়িতে বসে বিশ্রাম করে, গল্প করে, পরস্পরের খোঁজখবর নেয়। ঘর-সংসারের জন্য তাড়া নেই, কোন চিন্তা নেই। পুরুষদের মধ্যেও দু-চারজন ছাড়া এদিন ব্যবসা-বাণিজ্যে কেউ বড় একটা যায় না। একেক গাছের তলায় ছোট ছোট মাদুর বিছিয়ে তাসপাশা বসে, জন চারেকে খেলে আর বিশ-পঁচিশজন তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে খেলা দেখে, তামাক ভরে আর তামাক

খায়। এমন যে কাজের মানুষ সুবল সেও আজ ওদের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে। সারাদিনের মধ্যেও আজ আর তার দেখা মিলবে না।

বাড়িতে পা দিয়েই মঙ্গলা চমকে উঠল। উঠানের ওপর সজনে গাছটির ধারে কে ওখানে দাঁড়িয়ে, ও-বাড়ির মুরলীর মতো মনে হচ্ছে যেন! আরো কয়েক পা এগোতেই মঙ্গলার আর কোন সংশয় রইল না মুরলীই। বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। ও আবার এসেছে কেন এখানে! মঙ্গলাকে দেখে মুরলীও ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। মঙ্গলা কোন কথা বলবার আগেই মুরলী বলল, 'ক্ষমা চাইতে এলাম।'

মুরলীর মুখের মৃদু হাসি দেখে অবশ্য মনে করা যায় যে, সত্যিই সে কোন অপরাধ করেছে কিংবা অপরাধের জন্য নিদারুণ গ্লানিতে তার অন্তর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মঙ্গলা একবার সভয়ে চারিদিকে তাকাল। খাঁ খাঁ করছে দুপুরের রোদ। সমস্ত পাড়াটা জনশূন্য পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছে। সবচেয়ে কাছে একমাত্র আলতাদের বাড়ি। কিন্তু মা আর মেয়ে দুজনেই তো বেরিয়েছে কুলোর সঙ্গে, মনের সাধে সমস্ত গ্রাম আজ তারা ঘুরবে, তারপর ফিরবে একেবারে সেই বিকেল বেলায়। বাড়ির তিনদিকে পাতলা আগাছার জঙ্গল, ফাঁকে ফাঁকে পড়শীদের তালা দেওয়া ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে।

মঙ্গলা বলল, 'দরকার নেই আমার ক্ষমায়। আর অপরাধ করলে তো তার ক্ষমা। এবার আপনি বাড়ি যান মুরলী ঠাকুর পো', বলে বারান্দায় উঠে মুরলীর দিকে পিছন ফিরে ঘরের তালা খুলল মঙ্গলা তারপর দরজা ঠেলে সোজা ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে।

মুরলী মনে মনে হাসল। আশ্চর্য, মঙ্গলার মতো জবরদস্ত মেয়েও তাকে ভয় করে! এ ভয় কি মঙ্গলার মুরলীকে, না নিজেকেই নিজে ভয় করছে মঙ্গলা?

মুরলী উঠান থেকে উঠল বারান্দায়, বারান্দা থেকে একেবারে দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, হেসে বলল, 'সেই ভালো, খোলা উঠানে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলাটা ভালো দেখাচ্ছিল না। তাছাড়া তুমি যে ভাবে চারদিকে বার বার তাকাচ্ছিলে। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। তার সত্যি জবাব দেবে?'

মঙ্গলা শক্ত হয়ে বলল, 'না, আমার জিজ্ঞাসায়ও দরকার নেই, জবাবেও দরকার নেই। বাড়ি যান এবার আপনি।'

মুরলীর যেন সে কথা কানেই গেল না। সে তার আগের কথার জের টেনেই বলল, 'সত্যি সত্যি অমন করে কি দেখছিলে বলো তো? কিসের ভয় করছিলে?

লোকজন কেউ নেই বলে, না লোকজন হঠাৎ কেউ এসে পড়েতে পারে বলে ?'

মঙ্গলা বিস্ময়ে এক মুহূর্ত চুপ করে রইল, জবাব যেন সহসা তার মুখে যোগাল না।

মুরলী এই অবসরে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা দিল ভেজিয়ে।

আর দু-তিন হাত জায়গা মাত্র ব্যবধান। কিন্তু মঙ্গলা কোন রকম বাধা দিল না, আতঙ্কে ভয়ে কোন রকম চীৎকার করে উঠল না, কেবল অদ্ভুত একটু হাসল, তারপর খুব শান্ত কিন্তু কঠিন কণ্ঠে বলল, 'আচ্ছা মুরলী ঠাকুরপো, তোমার তো ধর্ম নেই, লজ্জা নেই, মান-অপমান বোধ নেই, কিন্তু জীবনেরও কি কোন ভয় নেই তোমার ?'

মুরলী যেন মুহূর্তকাল স্তম্ভিত হয়ে রইল, এতক্ষণ কোন মোহ না থাক, অনুরাগ না থাক, দুচোখ ভরে হরিণীর মতো ভয় ছিল মঙ্গলার। আর তার সেই ভয়ই মুরলীকে মুগ্ধ করেছিল, আকর্ষণ করে আনছিল। সেই ভয়ের বদলে দুচোখ কেবল ঘৃণা আর অবজ্ঞায় ছেয়ে আছে মঙ্গলার। ঠাণ্ডা নিরুত্তেজ নিরুত্তাপ ঘৃণা। নারীর চোখের ভয়েরও তবু যেন একটা রঙ আছে, উত্তাপ আছে, কিন্তু এমন ঘৃণার সঙ্গে এর আগে কোনদিন যেন পরিচয় ঘটে নি মুরলীর। তার সেই ঘৃণার স্পর্শে মুরলীর সমস্ত মোহ সমস্ত বাসনা যেন কঠিন নিশ্চল বরফের স্তূপে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর মুরলী বলল, 'জীবনের ভয় ? না, তাও বোধ হয় নেই। তাহলে তোমার সামনে এমন করে এসে দাঁড়াতে পারতাম না।

'এতক্ষণে মঙ্গলার মুখে হাসি ফুটল, ঘৃণার বদলে দুচোখে তরল কৌতুক যেন টলটল করতে লাগল, বলল, 'আমার সামনে দাঁড়ালে তোমার জীবনের পর্যন্ত আশঙ্কা আছে, এত ভয়ও ছিল তোমার মনে। আমার শক্তির ওপর এতখানি বিশ্বাস ছিল যে তোমাকে মেরে পর্যন্ত ফেলতে পারি !'

চাপা হাসিতে সমস্ত মুখ ছেয়ে গেল মঙ্গলার। টোল পড়েছে দুটি গালে।

মুরলী সেই দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'তা ছিল।'

মঙ্গলাও তেমনি সহাস্যে বলল, 'তবু এসে দাঁড়িয়েছ আমার সামনে। দুরু দুরু বুকে মরবার এতখানি ভয় নিয়েও !'

মুরলী মঙ্গলার দিকে তাকাল। সেই বরফের স্তূপ কখন গলতে শুরু করেছে। রঙ্গে অরে কৌতুকে মঙ্গলাকে মনে হয় স্রোতস্বিনীর মত। কলকণ্ঠে দুটি কান ভরে

নিল মুরলী। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যা, তবু দাঁড়িয়েছি। কেন না তোমার মধ্যে মরেও সুখ, তোমার মধ্যে পুড়েও আনন্দ।'

বলতে বলতে এগিয়ে এসে সহসা দুই হাতে মুরলী মুখখানি তুলে ধরল মঙ্গলার। হাতের তলে ঢাকা রইল খানিক আগের খুশীতে উজ্জ্বল সেই টোল পড়া গাল দুটি!

চমকে মঙ্গলা ঈষৎ আর্তনাদ করে উঠল, 'পায়ে পড়ি, পায়ে পড়ি তোমার, আমায় ছেড়ে দাও, ও গো আজ নয়, আজ নয়।'

মুরলী থমকে দাঁড়াল। বলল, 'কেন?'

মঙ্গলা বলল, 'আজ যে রক্ষাচণ্ডীর পূজা—'

মুরলী আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল তার মুখ, সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিল মঙ্গলার, লালপেড়ে গরদের শাড়িতে মঙ্গলাকে দেবী-মন্দিরের পূজারিণীর মতোই মনে হচ্ছে বটে।

কোনদিন এমন হয় নি মুরলীর। এত সান্নিধ্যে এসে কোন মেয়ে তার কাছ থেকে ছাড়া পায় নি। কিন্তু মঙ্গলা পেল। রক্ষাচণ্ডীর দোহাই পেড়ে নয়, ওসব মুরলী গ্রাহ্য করে না, কিন্তু মঙ্গলার ভয়, তার কাতর অনুনয়কে কি গ্রাহ্য না করলে চলে?

গাব আর চোখউদানি গাছের পাতলা জঙ্গল পার হতে হতে মুরলীর দুই কান ভরে যেন তখনো বাজতে লাগল, 'আজ নয়—আজ নয়।'

কিন্তু আশ্চর্য, এই নিষেধে মুরলীর মন ক্ষোভে আর নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ল না, মঙ্গলার নিষেধ মধুর সঙ্গীতের মতোই মুরলীর মনের মধ্যে ধ্বনিত হতে লাগল। আজকের এই নিষেধে যেন কেবল নিষেধই নেই, আর একদিনের আবাহনের গুঞ্জনও রয়েছে।

১২

যথারীতি সমারোহের সঙ্গে ঘাটের শীতলা পূজা শেষ হল। পাড়ার ছেলে-বুড়ো স্ত্রী-পুরুষ সবাই ঘাটের চটানে বসে কলার পাতায় পেট পুরে প্রসাদ খেল। পুরোহিত প্রচুর দক্ষিণা পেয়ে প্রসন্ন মনে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, 'মা এবার ঠাণ্ডা হবেন। আর কোন ভয় নেই।'

সমস্ত রাতটা অদ্ভুত এক অবস্থার মধ্যে কাটল মঙ্গলার। অনেক রাত পর্যন্ত

ঘুম এল না। চোখ বুজলেই মুরলীর সেই মুগ্ধ দুটি চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখতে পায়। সে দৃষ্টিতে সমস্ত শরীর মঙ্গলার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এই শিহরণের মধ্যে আনন্দ আর আতঙ্কের অনুভূতি যেন মেশামেশি করে রয়েছে।

পাশে শুয়ে সুবল দু-একবার বলল, 'হয়েছে কি, অমন করছিস কেন? শরীর কি খারপে লাগছে?,

মঙ্গলা বলল, 'না।'

সুবল পাশ ফিরল।

পাতলা তন্দ্রার মধ্যে মঙ্গলার মনে হল দুখানা হাতে কে যেন তার মুখখানাকে আবার তুলে ধরছে। মঙ্গলা গালে হাত বুলাল। মুরলীর আঙুলগুলির স্পর্শ এখনো যেন লেগে রয়েছে।

মঙ্গলার মনে পড়তে লাগল, আগেও অনেকদিন মুরলীর এই দৃষ্টি সে লক্ষ্য করেছে। কথা বলতে বলতে অনেকবার অপলকে তার মুখের দিকে তাকিয়েছে মুরলী। হাসি তামাসাচ্ছলে সে এর আগেও কতবার মঙ্গলাকে স্পর্শ করতে গেছে, কিন্তু মঙ্গলা তার মতলব বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়েছে নিজেকে, কিছুতেই ধরা দেয় নি। পাড়ায় মুরলীর অখ্যাতি, বয়স নির্বিশেষে, রূপগুণ নির্বিশেষে সমস্ত মেয়ে সম্বন্ধেই তার অস্বাভাবিক লুব্ধতা মঙ্গলার মনে তার সম্বন্ধে তেমন কোন মোহের সঞ্চার করতে দেয় নি, বরং এক ধরনের ঘৃণা আর অবজ্ঞার ভাবই এনেছে। কিন্তু মুরলীর আজকের কামনার এই উগ্রতা অভূতপূর্ব। এই উন্মাদনার তীব্র আবেগে মুরলীর সমস্ত কলঙ্ক যেন আগুন হয়ে জ্বলে উঠেছে। আর সেই অগ্নিময় উত্তাপ মঙ্গলার শরীরের সমস্ত রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন সঞ্চারিত হয়ে গেছে। মুরলীর চরিত্রে যে কোন রকম নিষ্ঠা নেই, প্রশংসনীয় কোন রকম গুণই যে তার মধ্যে নেই, তাকে যে বিশ্বাস করা চলে না, মুহূর্তের জন্যও যে তার উপর নির্ভর করা চলে না, এসব বিবেচনার কথা সেই উত্তাপে জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। নিজের দেহমনকে একান্ত করে সেই উগ্র কামনার কুণ্ডে সঁপে দেওয়ার কল্পনা রাত্রির অন্ধকারে বার বার মঙ্গলার মনে আসতে লাগল, আর বার বার নিজের মনকে সে ধমক দিয়ে বলে উঠল, ছিঃ! কিন্তু ধমকটা যেন তেমন জোর শোনাল না, তার ভিতরকার প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়টাই যেন মনের মধ্যে বার বার উঁকি দিতে লাগল। আর এই লুকোচুরি সমস্ত অন্তর দিয়ে উপভোগ করতে লাগল মঙ্গলা। আর্তনাদে অনুনয়ে আজ যদি অমন করে মুরলীকে বাধা না

দিত মঙ্গলা, তাহলে কি হত, তাহলে কিইবা হত না! কল্পনা করে মঙ্গলা আর একবার শিউরে উঠল।

অন্য দিনের মতোই খুব ভোরে ঘুম ভাঙল মঙ্গলার। ঘরের মধ্যে তখন পাতলা অন্ধকার। আবছা আবছা দেখা যায় সুবলের মুখ। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস আসছে। শিকের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে মঙ্গলার নিজের হাতে বাঁধা লাউয়ের মাচা, লাউপাতাগুলি বেশ বড় বড়। ডগাগুলি মোটা মোটা। ছোট বড় নানা আকারের লাউ নিচে ঝুলে পড়েছে।

ঘরের এদিকটায় আগে জানালা ছিল না। সুবল নিজেই করাত দিয়ে বেড়া কেটে এখানে জানালা করে দিয়েছে। মঙ্গলার ঠিক শিয়রের কাছটায়। হাতুড়ী বাঁটালি দিয়ে ঠুকঠুক করে নিজেই বানিয়েছে কাঠের দুটো পাল্লা। সুবল না জানে এমন কাজ নেই। ঘুমন্ত সুবলের দিকে একবার তাকাল মঙ্গলা। অমন যে জবরদস্ত পুরুষ সেও কেমন শিশুর মতো কোলকুঁজো হয়ে ঘুমাচ্ছে দেখ। তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ ভারি মায়া হল, ভারি আপন বলে মনে হল মঙ্গলার। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কালকের নির্লজ্জ দুপুর আর সেই দুপুরকে ঘিরে গভীর রাত্রির গভীর অন্ধকারে নিজের অশোভন অসম্ভব যত কামনা-কল্পনার কথা। সমস্ত মন মঙ্গলার ছি ছি করে উঠল। ঘুমন্ত স্বামীর পাশে শুয়ে কি বাজে চিন্তায়, কি পাপ চিন্তায় না তার রাত কেটেছে। ছি ছি ছি! পাশ ফিরে স্বামীকে সে আলগোছে একটু জড়িয়ে ধরল। পাতলা অন্ধকারে সব যে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেখবার আর কেউ নেই, এমন কি সুবল নিজেই চোখ বুজে ঘুমাচ্ছে, নিজের চোখ তো তবু চেয়ে রয়েছে। মঙ্গলার লজ্জাটা যে সেই দুটো পোড়া চোখের কাছেই বেশি।

কিন্তু আলগা আলিঙ্গনের চেয়ে ভোর ভোর সময়কার পাতলা তন্দ্রাটুকুর উপর সুবলের আসক্তি বেশি; সেই তন্দ্রাচ্ছন্নতার ভিতর থেকেই সুবল বলল, 'আঃ! এখন ওঠ মঙ্গলা, ভোর হয়ে গেছে। কি যেন বলে, কাল গেলে মাংটামি সার। রাত কাটালি মড়ার মতো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এখন সকাল বেলায় সোহাগের ঘটাখানা দেখ। একবার ওঠ দেখি লক্ষ্মী, উঠে ভালো করে এক ছিলিম তামাক ভরে নিয়ে আয় দেখি।'

ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তামাক খাওয়া সুবলের সবচেয়ে বড় নবাবী। আর সে তামাক বউয়ের হাতের ভরা না হলে তার মন ওঠে না।

অন্যদিন মঙ্গলা মুখে আগে নানা ওজরআপত্তি জানায়। বলে, 'আমি কি দাসী-বাঁদী, আমি কি ঝি-চাকর, যে সকালবেলায় সব কাজ ফেলে তোমার তামাক সাজতে শুরু করব। সারা দিন এই তামাকের বিশ্রী গন্ধ আমার হাত থেকে যায় না। পারব না আমি, দরকার থাকে নিজে খাও গিয়ে সেজে।'

কিন্তু আজ আর কোন কথা বলল না মঙ্গলা। কোন বাদ-প্রতিবাদ করল না। একেবারে লক্ষ্মী বউয়ের মতোই বিনা বাক্যে উঠল বিছানা থেকে, তারপর চলল তামাক সাজবার আয়োজনে।

হুঁকো কল্কে, তামাকের টিকা, আগুন-মালসা সব শোবার ঘরের এককোণে সাজানই থাকে। সন্ধ্যার সময়ই এসব ঠিকঠাক করে রাখে মঙ্গলা। রাত্রে প্রায় রোজই সুবলের একবার তামাক খাওয়া চাই।

কল্কেতে তামাক ভরে আগুন-মালসা থেকে চিমটে দিয়ে আগুন তুলতে গিয়ে মঙ্গলা দেখল মালসা যেন একেবারে জল হয়ে গেছে, একটুও আগুন নেই তাতে। আগুন করবার অবশ্য উপায় আছে আরো। শুকনো নারকেলের ছোবড়া থেকে চিলতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গুলি পাকিয়ে তাতে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে দিলেই হবে। নারকেলের ছোবড়াগুলি আছে বারান্দায় একটি ঝাঁকার মধ্যে।

কিন্তু ছোবড়া আনবার জন্য দোর খুলে বেরিয়ে বারান্দায় কেবল পা দিয়েছে এমন সময় মঙ্গলা দেখতে পেল, বিনোদের মা সৌদামিনী প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে।

মঙ্গলার হাতের কল্কে হাতেই রইল, বলল, 'ব্যাপার কি খুড়িমা?'

সৌদামিনী বলল, 'আর ব্যাপার। সব শেষ হয়ে গেল বউ।'

মঙ্গলার বুকের ভিতর ধক করে উঠল, বলল, 'কার কি হল? একবার খুলেই বলুন না।'

সৌদামিনী বলল, 'মুকুন্দের ছেলের কথাই বলছি। ভোর ভোর সময় শেষ হয়ে গেল। এদিকে মা-টা তো একেবারে বেহুঁস।'

খবর শুনে মঙ্গলা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। নিমাই মারা গেল! মনে পড়ল কাল বিকালে তাকে মঙ্গলার দেখে আসবার কথা ছিল; আর সেই বিকালটা সে কি করে কাটিয়েছে! ছি ছি ছি! ধিক্কার আর আত্মগ্লানিতে মঙ্গলার অন্তর ভরে উঠল। মনে পড়ল মঙ্গলার, নিমাই তাকে রক্ষাচণ্ডীর মূর্তিতে স্বপ্ন দেখেছিল, এমন কি নিমাইয়ের ঠাকুমারও একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল, সতীসাধ্বী মঙ্গলা রক্ষাচণ্ডীরই প্রতিনিধি। এই নিয়ে মুরলীর স্ত্রী মনোরমা অবশ্য শ্লেষ আর ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিল। আজ তার সেই উপহাসটাই সত্য হয়ে দাঁড়াল। নিমাইয়ের

শ্রদ্ধা আর তার ঠাকুমার বিশ্বাসের মর্যাদা মঙ্গলা রাখতে পারল না। মঙ্গলার মনে হতে লাগল, নিমাইয়ের যে এত তাড়াতাড়ি মৃত্যু হল, এ কেবল তারই পাপে, আর কিছুর জন্য নয়। আত্ম-নিবেদনের জন্য সে অবশ্য মুরলীর কাছে নিজে এগিয়ে যায় নি, কিন্তু মুরলীকে সে তেমন করে বাধাও তো দেয় নি। সে নিন্দা করে নি, তিরস্কার করে নি, তার এই অশোভন অন্যায় আচরণের। বরং রাত্রির অন্ধকারে মঙ্গলা তার সঙ্গ মনে মনে উপভোগ করেছে। নিজের মনের কাছে তো কোন পাপ গোপন নেই মঙ্গলার। আজ এই দিনের আলোয় রাত্রির সেই মত্ততার কথা মনে করে লজ্জা আর গ্লানির সীমা রইল না মঙ্গলার।

নারকেলের ছোবড়ার ভিতরের আঁশ চিলতে করে সযত্নে দুহাতের তালুতে গুলি পাকাল মঙ্গলা। আগুন ধরাল দিয়াশলাইয়ের কাঠি জেলে, তারপর তামাক-ভরা কল্কের উপর সেই জলন্ত ছোবড়ার গুলি রেখে চিমটের মাথা দিয়ে ভেঙে তাকে গুঁড়ো করে দিল। হুঁকোটা স্বামীর হাতে দিয়ে মঙ্গলা বলল, 'তুমি ততক্ষণ তামাক খাও, আমি একটু নিমাইদের বাড়ি থেকে আসি।'

নিমাইদের বাড়ি বলতেই মঙ্গলার বুকের ভিতরটা যেন ধক্ করে উঠল। নিমাইদের বাড়ি, কিন্তু নিমাই আর নেই। সুবল বলল, 'এই সাত সকালে পাড়া বেড়ানর এত সখ কেন?'

বেশ একটু চেষ্টা করেই মেজাজটা মঙ্গলা চড়তে দিল না। ক্ষণিকের জন্য অনুশোচনাটা বোধ হয় মনের মধ্যে তখনও ছিল।

মঙ্গলা বলল, 'পাড়া বেড়ান নয় গো। নিমাই আজ ভোরের সময় মারা গেছে, তার মা রয়েছে বেহুঁস হয়ে। ওবাড়ির বিনোদ ঠাকুরপোর মা এসে বলে গেলেন। আমাকে এখন একটু যেতেই হবে। ভয় নেই, বেশী দেরী হবে না। তোমার তামাক খাওয়া শেষ হতে না হতেই ফিরব।'

বলে মঙ্গলা আর দাঁড়াল না।

পথে আকস্মিক ভাবে দেখা হয়ে গেল বিনোদের সঙ্গে। বাঁশ ঝাড়ের কাছটায় আর একটু হলে তারা একেবারে একজন আর একজনের গায়ের ওপর পড়ে গিয়েছিল আর কি। অন্যমনস্কের মতো বিনোদ ছুটছিল হন হন করে। খাটো ঘোমটায় মুখ ঢেকে মঙ্গলাও প্রায় চলছিল পুরুষের বেগে, কাছাকাছি এসে দুজনেই থমকে দাঁড়াল।

অপ্রতিভ হয়ে বিনোদ বলল, 'মাফ কর বউঠান, আমি আগে দেখতে পাই নি।

মঙ্গলা একবার ভাবল, কিছু না বলেই সে চলে যায়। বিনোদের সঙ্গে সে

কোনদিন সামনাসামনি কথা বলে না, কিন্তু আজ হঠাৎ কি খেয়াল হল কথা বলতে।

মৃদুস্বরে মঙ্গলা বলল, 'মাফ করবার কি আছে। আমিও তো ঠিক পথ দেখে চলছিলাম না, কিন্তু এখনই গাঁয়ে ফিরলেন যে!'

মঙ্গলার কথা বলায় কম বিস্মিত হয় নি বিনোদ, কিন্তু কথার ধরনে আরও বেশি বিস্মিত হল; বলল, 'কেন, গাঁয়ে ফিরব না কেন?'

মঙ্গলা বলল, 'গাঁ থেকে রোগব্যামো যে এখনো যায় নি বরং আরও বাড়ছে।'

বিনোদ এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর বলল, 'কে বলেছে আপনাকে যে রোগব্যামোর ভয়ে আমি গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম।'

বিনোদের গলার স্বরে কেমন যেন একটা বিস্ময় আর বেদনার আভাস ফুটে বেরল। তাতে আরও যেন কিছু কৌতুক বোধ করল মঙ্গলা, মৃদু কিন্তু পরিহাস-তরল কণ্ঠে জবাব দিল, 'ও! লোকে যা বলাবলি করছিল তাহলে তা নয়?'

বিনোদ বলল, 'লোকে বলাবলি করছিল বলেই আপনি বিশ্বাস করলেন! আমি গিয়েছিলাম কীর্তনের দল আনতে, ভেবেছিলাম নগরকীর্তনে বেরব। কিন্তু এখানকার অসুখের খবর যেন কি করে আগেই পৌঁছে গেছে সেখানে, কেউ আসতে চাইল না বউঠান। কেবল ওজর-আপত্তি আর অছিলা-অজুহাত। আগের মতো কারোরই আর মনের জোর নেই বউঠান, ভগবানের নামের কাছে যে এই সব রোগব্যাধি টিঁকতে পারে না—এ বিশ্বাস আর নেই মানুষের মনে। সেই জন্যই তো রোগ-শোক দুঃখ-দুর্দশা মানুষকে বেড়াজালে এমন করে ঘিরে ধরেছে চার পাশ থেকে।'

বিনোদের গভীর বিশ্বাস আর গভীর বেদনাবোধ টলে উঠল মঙ্গলার মন। দুটো চোখ ছল ছল করে উঠল, কিন্তু জবাব দিল সে তেমনি তরল স্বরেই, বলল, 'আমিও তাই বলি ঠাকুরপো। সেদিন যখন আর নেইই তখন তার জন্যে হায় আপসোস করে আর লাভ কি? তার চেয়ে আপনিও এদিনের মানুষ হয়ে পড়ুন চট্ করে।' বলে মঙ্গলা হাঁটতে শুরু করল।

বিনোদ কিছুক্ষণ বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। আর পাঁচজনের মতো মঙ্গলাও কি ঠাট্টা করে গেল বিনোদকে! কিন্তু ঠাট্টা হলেও আর পাঁচজনের ভঙ্গির সঙ্গে মঙ্গলার বলবার ভঙ্গির মিল নেই। তার কথার মধ্যে অনেক মাধুর্য আছে, আছে অনেকখানি আপন আপন ভাব। এমন ঠাট্টা বা এমন গঞ্জনা কেবল এক-জনের মুখেই শুনেছে বিনোদ। তার মৃত স্ত্রীর মালতীর মুখে। অনেক কাল বাদে

তার কথা মনে পড়ে বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠল বিনোদের। কিন্তু চেষ্টা করেও মালতীর মুখের আদলটা বিনোদ আর মনে আনতে পারল না, কেবল ছাঁদ আসতে লাগল সেখানে মঙ্গলার মুখের। মঙ্গলা বলেছে বিনোদকে, এদিনের মানুষ হয়ে পড়ুন চট্ করে। কথাটার মানে কি? তবে কি সত্যিই একালের এদিনের মানুষ নয় বিনোদ, মঙ্গলার কালের মঙ্গলার দিনের, মঙ্গলার পছন্দের মানুষ নয়? কথাটার অর্থ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ বিনোদের অদ্ভুতভাবে মনে পড়ে গেল মঙ্গলা আজ তার সঙ্গে প্রথম কথা বলেছে। বিনোদ যেদিনের মানুষই হক তার সঙ্গে মঙ্গলার আজ এই প্রথম কথা-বলার দিন।

নিমাইদের বাড়িতে কাঁদছে কেবল নিমাইয়ের ঠাকুমা। নিমাইয়ের মা মুর্ছিত হয়ে পড়ে আছে এক পাশে। সেদিকে ফিরেও কেউ তাকাচ্ছে না। বিষ্টু সা মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছছে আর বসে বসে তামাক টানছে। কিন্তু এত বড় ঘটনাতেও নিমাইয়ের বাবা মুকুন্দর কোন ভাববৈলক্ষণ্য ঘটে নি। খাটো ঘোমটার ফাঁকে একবার তার মুখের দিকে তাকাল মঙ্গলা। ঠাণ্ডা, কালো পাথরের মতোই ঠাণ্ডা আর শুষ্ক মুকুন্দের মুখ! যেন কিছুই ঘটে নি, যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না! অথচ গত বছরের আগের বছর একটি মেয়ে মারা যাওয়ায় এই মানুষটি কেঁদে একেবারে ভাসিয়ে দিয়েছিল। দাপাদাপি, ধুলোয় গড়াগড়ি করেছিল ঠিক মেয়েমানুষের মতো।

মঙ্গলা গিয়ে ঢুকল মুকুন্দর ঘরের মধ্যে। সেখানে নিমাইয়ের মা রয়েছে সংজ্ঞাহীন হয়ে। পাড়ার আরও দু-চারজন বয়স্কা গিন্নীবান্নির দল সেখানে এসে জড়ো হয়েছে।

মঙ্গলাকে দেখে নিমাইয়ের ঠাকুমা আর একবার তারস্বরে কেঁদে উঠল, 'আর কি দেখতে এসেছ মা, নিমাই আমার চলে গিয়েছে। বড় ভালোবাসত নিমাই তোমাকে, বড় আদরের ছেলে ছিল নিমাই তোমার মা।'

মঙ্গলা আর্দ্রকণ্ঠে বলল, 'অমন করবেন না খুড়িমা। এবার বউকে দেখুন।' বলে জলের ঝাপটায় ও পাখার বাতাসে নিমাইয়ের মার জ্ঞান ফিরাবার জন্য চেষ্টা শুরু করল মঙ্গলা।

নিমাইয়ের ঠাকুমা বলল, 'তুমিই দেখ মা, তুমিই দেখ। হতভাগীকে ডেকে তোল, জাগাও হতভাগীকে। চোখ মেলে দেখুক কে ওর ছেলেকে কেড়ে নিয়ে

গেল। পারে যদি ধরুক টেনে হতচ্ছাড়া মুখপোড়া সেই যমকে। শেষে মানুষকে যে তুষবে তা কিন্তু পারবে না, তা কিন্তু পারবে না।'

শ্মশানে যাবার আয়োজন হতে লাগল। জন কয়েক মিলে একটি ছোট মতো আম গাছ পেড়ে ফেলেছে মাটিতে। গামছা মাজায় বেঁধে কুড়ুল দিয়ে চেলা করছে তা। ঠক ঠক শব্দ ভেসে আসছে ঘরের মধ্যে। আসছে তাদের বিড়ি-তামাক চাইবার তাগিদ। তাদের মধ্যে সুবলেরও সাড়া পেল মঙ্গলা, এতক্ষণে সেও এসে পৌঁছেছে। কার যেন হাতের কুড়ুল কেড়ে নিয়ে সুবল বলছে, 'দে, আমার কাছে দে কুড়ুল। 'ওই ভাবে কুড়ুল ধরলে তাতে পা কাটে, কাঠ কাটে না।'

নিঃশব্দে শ্মশানযাত্রীদের ফাইফরমাশ খাটছে মুকুন্দ। এগিয়ে দিচ্ছে আগুন, তামাক, দা কুড়ুল; দড়ি পাকাবার জন্য ঘরের ভিতর থেকে একসময় পাট নিয়ে গেল এক গোছা। মঙ্গলা মনে মনে ভাবল, অদ্ভুত মানুষ! একমাত্র ছেলে চলে গেল, বউটা এমন মর মর ঘরের মধ্যে, কিন্তু কোন শব্দ নেই মুখে, একফোঁটা জল নেই চোখের কোণে! একেক পুরুষ একেক রকম। কিন্তু সব পুরুষই কোন না কোন রকমে রহস্যময়। সুবল, মুরলী, বিনোদ, মুকুন্দ. কত যে বিচিত্র রকমের মানুষ আছে এই পাড়াটুকুর মধ্যে তার ঠিক নেই। কারোরই যেন তল নেই কোন। জানালার নিচে ঢালু জায়গাটা এখন শুকনো খট খট করছে, ভরা বর্ষার সময় একদিন ওখানেই থৈ মিলবে না।

১৩

কিন্তু মানুষের মনের শ্মশানবৈরাগ্য আর দেহের রোগব্যাধি চিরদিন থাকবার জন্য নয়। ভুগে ভুগে কেউ মরে, কেউ ফের তাজা হয়ে ওঠে। হাড়ে মাংস গজায়, ভাঙ্গা চোয়াল ভরে ওঠে, তারপর সেই ভরাপুরো মুখের উপর চিক্ চিক্ করতে থাকে লাবণ্য। মনের শ্মশানেও চিতা নেবে, বাতাসে উড়তে থাকে ভস্মের রাশ, শেষে একসময় কোথায় উধাও হয়ে যায়। তারপর সেই চিতার এক কোণে অলক্ষ্যে গজিয়ে ওঠে তুলসীর চারা, সবুজ শ্যামল পাতার ভিতর থেকে ছড়ায় ছড়ায় বেরোতে থাকে তুলসীমঞ্জরী।

সাহাপাড়ার মারী বসন্তও মাসখানেক যেতে না যেতেই প্রশমিত হয়ে এল। নিমাইয়ের মতো আরো কেউ কেউ মরল, তার মার মতো ভুগে উঠল আরো অনেকে, হাতে পায়ে নাকে মুখে গভীর ক্ষতগুলি ভরে উঠতে লাগল, সেই সঙ্গে শুকিয়ে আসতে লাগল শোকের অশ্রু, নিবে আসতে লাগল হৃদয়ের জ্বালা।

শুকাবার লক্ষণ দেখা গেল না কেবল আলতার। মারাত্মক বসন্তে অনেকদিন ভুগে ভুগে যদিও বা সে বেঁচে উঠল, সারা মুখের ক্ষত-চিহ্নগুলি তার চেহারাকে আরও বিকৃত এবং কুশ্রী করে তুলল। তার চোখ বেয়ে সেই যে জলের ধারা নামল, দিনেরাতে তার আর বিরাম রইল না।

বাল বিধবা আলতার রূপ অবশ্য কোন দিনই ছিল না, এমন কি রূপের প্রয়োজন তার যে আছে, কি থাকতে পারে একথাও কোনদিন কারো মনে হয় নি। যারা বুড়ো আর হিসেবী তারা বরং বিধবা আলতার এই কুরূপে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। রূপের অভাবটা তার নিজের পক্ষেও ভালো, পাড়ার সব ছেলেছোকরার পক্ষেও কল্যাণকর। যে রূপের নির্দিষ্ট শাস্ত্রসঙ্গত কোন ভোক্তা রইল না, অশাস্ত্রীয় কাজে প্রলুব্ধ করবার জন্য সে রূপেরই বা থেকে দরকার কি। সে রূপ চিতার আগুনে ঝলসে দিতে পারলেই সকলের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

তবু বুড়োদের হিসাব ঠিক মিলল না। রূপ না থাকা সত্ত্বেও পাড়ার কিশোর-বয়সী কৌতূহলী ছেলেদের আলতা যে-কোন রূপবতীর মতোই তার চারপাশে আকর্ষণ করতে লাগল। তাদের কাছে রূপটা বাহুল্য, রহস্যটাই বড়। প্রথম বিড়ি খাওয়ার অভিজ্ঞতাটি কোন ছেলের পক্ষেই খুব প্রীতিকর নয়। গন্ধে নাক সিঁটকে আসে, কাসতে কাসতে বমি আসবার জো হয়, চোখ দিয়ে বেরোয় জল। তবু বিড়ি তাদের আকর্ষণ করে। প্রীতির জন্য নয়, সুখের জন্য নয়, সেই অদ্ভুত অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে যে অভিনব অনাস্বাদিত রস আর রহস্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে শুধু তার জন্যই।

নারীহৃদয়ের; নারীদেহের অজ্ঞাত রহস্যের হাতছানি দিয়ে আলতাও তাদের অনেককে কাছে ডেকে আনল। রসোপভোগের হাতেখড়ি হল বহু কিশোরের, বহু যুবকের। বৃদ্ধেরা প্রমাদ গণল। শাসন তিরস্কারের ধারা বইল বহুমুখী হয়ে। এর জন্য আলতাকেও মাঝে মাঝে কম বিপদ, কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় নি। প্রথম প্রথম প্রায়ই এদিক ওদিক তাকে গা ঢাকা দিতে হত। তারপর একদিন সবই শান্ত হয়ে এল। সয়ে গেল, হজম হয়ে গেল সব। পাড়ার লোকের কৌতূহলী দৃষ্টি পাত্রান্তরে গিয়ে পড়ল। আলতার প্রণয়ীর দল ছেলেপুলে নিয়ে হয়ে উঠল সংসারী। সুখদুঃখে মিশান সেই স্মৃতি রইল কেবল আলতার।

সেই রহস্যের টানে এপাড়ার অনেকেই এসেছিল আলতার কাছে কাছে। একমাত্র বিনোদকেই আলতা টেনে আনতে পারে নি। বোকা বিনোদ, ভালো-মানুষ বিনোদ, কীর্তনীয়া, বাউল বৈরাগীর মতো উদাসীন বিনোদ অন্য সকলের

কাছেই উপেক্ষিত হয়েছে, কিন্তু আলতার চোখে সে রয়েছে কিন্নরের মতো। কতবার ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হয়েছে সেই রূপের সমুদ্রে, দুইহাতে আঁজলায় আঁজলায় যদি মুখে তোলা যেত তাহলে বিনোদের সেই তরল লাবণ্যের ধারা যেন আকণ্ঠ পান করত আলতা। কিন্তু কিছুতেই তাকে ধরা-ছোঁয়া যায় নি। কোনরকম রঙ্গ-রসিকতার ইঙ্গিতে বিনোদের চোখ ভর্ৎসনায় তিরস্কারে বিরূপ হয়ে উঠেছে। ক্রমেই দূরে সরে গেল বিনোদ। আলতা আহত হয়ে, বিস্মিত হয়ে ভেবেছে অঙ্গে অঙ্গে যার এত রূপ, কণ্ঠে যার এত মাধুর্য, হৃদয় তার এমন পাষাণ, এমন নীরস হল কেন!

আলতার এই দুর্বিপাকে মনে মনে মঙ্গলা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল, কিন্তু তার শোকের তীব্রতা দেখে সে স্তব্ধ হয়ে রইল। এত কথা বলতে পারে মঙ্গলা, কিন্তু আলতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কোন কথাই যেন তার মুখে এল না। এবারকার বসন্তে মুকুন্দর ছেলে মরেছে, চার বছরের একটি মেয়ে গেছে ফটিকের, স্বামী মরেছে ওপাড়ার খোঁড়া সোহাগীর, কিন্তু আলতার ভাবখানা দেখে মনে হল যেন সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তারই। বিকৃত বিরূপ হয়ে বেঁচে থাকার মতো এমন শাস্তি এমন দুঃখ যেন আর কিছুতে নেই!

আলতার মুখোমুখি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল মঙ্গলা। তারপর বলল, 'তবু তো বেঁচে উঠেছ ঠাকুরঝি।'

আলতা বলল, 'তুমি আমায় ঠাট্টা করছ বউদি। এই প্রাণের কোন দাম আছে? লাভ নেই কোন এই রকম বেঁচে থাকার।'

মঙ্গলা বলল, 'কেন, লাভই বা থাকবে না কেন! খাওয়াপরা দেখাশোনা কিছুই তো তোমার আটকাচ্ছে না।'

আলতা বলল, 'কিন্তু আমার দিকে মানুষ যে আর তাকাবে না, ভয়ে আর ঘেন্নায় আমার মুখের ওপর থেকে তারা যে চোখ ফিরিয়ে নেবে।'

মঙ্গলা বলল, 'তুমি অবাক করলে ঠাকুরঝি। নিজের ক্ষতির চেয়ে আর কেউ যে চোখ তুলে তোমার দিকে তাকাবে না এই দুঃখই তোমার মনে এত বড় হয়ে উঠল!'

আলতা এক মুহূর্ত চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'মুখের দিকে মানুষের না তাকাবার দুঃখ তুমি বুঝতে পারবে না বউদি। নিজের তোমার রূপ আছে কি না। পাড়া ভরে মানুষ নানা ছলে ঘোমটার ভিতরে তোমার মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে কিনা, তাই এ দুঃখের কথা তুমি ভাবতেও পার না। নিজের চোখ-মুখ

তো মানুষ নিজে দেখতে পায় না, সেই চোখ-মুখের দিকে অন্যে যখন তাকায়, অন্যে যখন চেয়ে দেখে তখনই তো খেয়াল হয়, চোখ-মুখ বলে একটা জিনিস আমার আছে। না হলে নিজের কথা, নিজের চোখ-মুখের কথা মানুষের কত সময় মনে থাকে বউদি। গা-ভরা তোমার রূপ, তাই মানুষের রূপ না থাকার দুঃখে তোমার হাসি পেতে পারে, কিন্তু ভগবান নাই করুন, এই রূপ যদি কোনদিন যায়, এই রূপ যদি হঠাৎ একদিন খোয়াতে হয়, তাহলে সেইদিন আমার দুঃখ বুঝতে পারবে, মানে বুঝতে পারবে আমার কথার।'

শুনতে শুনতে গায়ের মধ্যে শির শির করে উঠল মঙ্গলার। এমন করে আলতাকে কথা বলতে সে কোনদিন শোনে নি। অবশ্য নিজের রূপ না থাকার দুঃখ এর আগেও সে অনেকবার অনেক দিন জানিয়েছে, মঙ্গলার রূপ থাকা নিয়ে ঈর্ষাও নানা ঢঙে নানা ভঙ্গিতে আলতা না করেছে এমন নয়। কিন্তু আজকের মতো এমন গভীর স্বরে অন্তরের অন্তস্তল থেকে আলতা কোনদিন কথা বলে নি। সেই চটুল প্রগল্‌ভ হালকা স্বভাবের মানুষও যে এমন করে কথা বলতে পারে, তা নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করত না মঙ্গলা, বিশ্বাস করত না নিজের চোখে না দেখলে।

আলতার রূপ হারাবার দুঃখ মঙ্গলাকে আজ তার নিজের সম্বন্ধে যেন হঠাৎ সচেতন করে তুলল। মনের মধ্যে চিন্তিত ভাবে অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়ে বাড়ি ফিরে এল মঙ্গলা। ঘরের মধ্যে দক্ষিণ দিকে মাঝখানের খুঁটিটার পেরেকের সঙ্গে বড় একখানা হাত-আয়না ঝুলান আছে মঙ্গলার, স্নান করে এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মঙ্গলা মাথা আঁচড়ায়, রোজ সিঁথিতে কপালে সিঁদুর পরে। ঘরে ঢুকেই আয়নাখানা পেড়ে নিজের মুখের সামনে সেখানা তুলে ধরল। ভারি সুন্দর লাগল যেন আজ নিজের মুখকে, নতুন করে চোখে পড়ল নিজের রূপ। সেবা-শুশ্রূষার সময় কত বসন্ত রোগীকে ছুঁতে হয়েছে, নাড়াচাড়া ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়েছে। ছোঁয়াচে রোগ তো, হঠাৎ তারও যদি হয়ে বসত, আর সেই রোগে আলতার মতো তার নিজেরও চোখ-মুখ যদি বিকৃত হয়ে যেত! কল্পনা করতেই ভয়ে চোখ যেন বুজে এল মঙ্গলার। তাহলে কি এমন করে চোখের সামনে আয়নাখানা তুলে ধরতে পারত মঙ্গলা, পারত নিজের দিকে এমন করে অপলকে তাকিয়ে থাকতে! নিজের রূপকে আজ হঠাৎ ভারি দামী, ভারি মহার্ঘ বলে মনে হল মঙ্গলার। যেন হারাতে হারাতে তা হারায় নি, যেন দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য লোভনীয় সামগ্রীকে হারাতে হারাতে মঙ্গলা ফের ফিরে পেয়েছে।

একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ছাড়া চড়া রকমের সাজসজ্জার দিকে মঙ্গলার কোনদিন লক্ষ্য ছিল না। রূপ যে তার আছে এ তথ্য তার কাছে গোপন থাকবার কথা নয়, গোপন ছিল না, কিন্তু সে সম্বন্ধে এমন সচেতন ভাবও তার মনে কোনদিন আসে নি। যত্ন করে নি, সাজায় নি নিজের দেহকে, যেন অত্যন্ত উদাস অমনোযোগের সঙ্গেই এতদিন বয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ নিজের দিকে তাকিয়ে মঙ্গলার যেন নতুন করে মনে হল এ দেহ দুর্লভ, এই রূপ পরম আদরের, পরম উপভোগের সামগ্রী।

মনে পড়ল নিজের সম্বন্ধে সে যে নিজেই কেবল এতদিন উদাসীন ছিল তাই নয়, তার স্বামী সুবলও তাই। মঙ্গলার রূপ নিয়ে তাকেও কোনদিন উৎফুল্ল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখা যায় নি। মঙ্গলার যে রূপ আছে সেটা যেন তেমন কোন বিস্ময়ের বস্তু নয় সুবলের কাছে, গর্ব অহঙ্কারের বস্তু নয়। সেই রূপের দিকে না তাকালেও যেন চলে, তার কথা কোনদিন একটু উল্লেখ না করলেও যেন কিছু এসে যায় না।

'মঙ্গল বউঠান!'

চমকে উঠে মঙ্গলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যায় লাউয়ের মাচা, ডান দিকের আগাছার ঝোপটা, জন-মানুষ আর কিছু দেখা যায় না। এ গলা তো ভুলবার নয়, এ কণ্ঠে গায়ের সমস্ত রোমগুলি খাড়া হয়ে উঠল মঙ্গলার।

মুরলী ততক্ষণে বাইরে থেকে জানলার শিক ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ফিস ফিস করে আর একবার ডাকল মুরলী, 'মঙ্গল, মঙ্গল বউঠান।'

এক মুহূর্তে যেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মঙ্গলা। তারপর জানলার আরও কাছে এসে তেমনি ফিস ফিস করে বলল, 'তোমার কি লজ্জা নেই মুরলী ঠাকুরপো!'

মুরলী বলল, 'না।'

মঙ্গলা বলল, 'কিন্তু ঘেন্নাপিত্তি, তাও কি সব ধুয়ে মুছে ফেলেছ! এত নিষেধ করেছি, এত বারণ করেছি তবু কি তুমি শুনবে না? আমার স্বামীর কাছে সব না বলা পর্যন্ত কিছুতেই কি থামবে না তুমি? এত দিন তো বেশ চুপচাপ ছিলে, আজ আবার এমন মতি হলো কেন?'

মনে হলো মুরলী যেন একটু হাসল, 'এ মতি কেবল আজই নয় মঙ্গল বউঠান। এ মতি মন থেকে আমার একদিনও মিলায় নি। তারপরও রোজ আমি এসেছি।'

মঙ্গলা শিউরে উঠল, 'রোজ!'

মুরলী বলল, 'হ্যাঁ রোজ। দিনে একবার না একবার পলকের জন্যও তোমাকে না দেখে গিয়ে আমি থাকতে পারি নি। তুমি চলেছ, ফিরেছ, ঘর গুছিয়ে, ঘাট থেকে কাঁখে করে জল ভরে নিয়ে এসেছ কলসীতে। ঝোপের আড়াল থেকে এক একদিন এক এক ভঙ্গিতে তোমাকে দেখেছি। কিন্তু আয়নায় এতক্ষণ ধরে নিজের মুখ দেখতে কোনদিন দেখি নি। কি দেখছিলে নিজের মুখে?'

মঙ্গলার সমস্ত শরীর আবার যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে মঙ্গলা বলল, 'তোমরা কি দেখ?'

মুরলী বলল, 'আমরা যা দেখি তা কেবল মুখে বললে ফুরোয় না মঙ্গল বউঠান, সর্ব অঙ্গ দিয়ে তা আমরা বলতে চাই।'

তারপর আস্তে আস্তে ঘরের কানাচ ঘুরে দোর ঠেলে প্রায় নিঃশব্দে কখন যে মুরলী তার পাশে এসে দাঁড়াল তা যেন মঙ্গলার খেয়ালই রইল না। মুরলীর সবল বাহু বেষ্টনীর মধ্যে মুহূর্তের জন্য একবার যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল মঙ্গলা, কিন্তু সে স্বর তার কণ্ঠের মধ্যেই রুদ্ধ হয়ে রইল।

ঘরে ঘরে বাকি-বকেয়া আদায় করে সওদাপত্র সেরে হাট থেকে ফিরতে বেশ একটু রাতই হলো সুবলের। মাছ আর তরকারির থলে হাতে নিয়ে একগাছা শুকনো পাকাটির মুখে আগুন জেলে সুবল নিজের বাড়ির উঠানের উপর এসে দাঁড়াল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা সড়ক বেয়ে অন্য হাটুরেদের সঙ্গে বাজার-দর আর পাড়ার হালচাল নিয়ে আলোচনা করতে করতে এতক্ষণ আঁধারে আঁধারেই এসেছে সুবল। কৃষ্ণপক্ষের রাত হলেও তারার আলোয় বেশ পথ দেখা যায়, কিন্তু অসুবিধা হলো নিজেদের গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে। ঝোপঝাড় গাছপালায় মাথার উপকার আকাশও দেখা যায় না, পায়ের নীচের মাটিও চোখে পড়ে না, তবু ছেলেবেলা থেকে এ পথ সকলেরই চেনা, একেবারে মুখস্থের মতো হয়ে গেছে। উঁচু নীচু জায়গায় অভ্যস্ত পা আপনা থেকেই ওঠে নামে, চোখের সাহায্যের দরকার হয় না, কিন্তু ফটিকদের ঘরের কাছে উঁচু একটা গাছের শিকড়ে বেশ বড় রকমেরই এক হোচট খেল সুবল। সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠল সে ফটিককে, 'বাড়ির পথঘাটও একটু পরিষ্কার করে রাখতে পারিস না ফটকে? দিনের পর দিন তোরা কি হয়ে উঠলি বল দেখি!'

ফটিক অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'রাস্তাটা সত্যিই ভারি খারাপ হয়েছে। একটা আলো এখান থেকে নিয়ে যাও সুবলদা।'

বাড়িতে ডেকে পাকাটি জেলে কেবল আলোর ব্যবস্থাই করে দিল না ফটিক, তার আগে সযত্নে এক ছিলিম তামাক ভরেও খাওয়াল। সুবল খুশী হয়ে বলল, 'যাই এবার, বউটা একা একা রয়েছে।'

উঠানে উঠে জ্বলন্ত পাকাটির মুখটা মাটিতে চেপে ধরে আগুন নিবিয়ে ফেলল সুবল। তারপর ঘরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। সমস্ত ঘরটা অন্ধকার, ভিতর থেকে একটুও আলো আসছে না, ব্যাপার কি! এত সকাল সকাল ঘরে দোর দিয়ে শুয়ে পড়ল নাকি মঙ্গলা। এমন তো কোনদিনই হয় না, কি হলো আজ তার হঠাৎ।

পা টিপে টিপে অগত্যা সুবল দোরের সামনেই এসে দাঁড়াল, 'কিরে, আজ সন্ধ্যা হতে না হতেই চোখে ঘুমের ঘোর নেমে এল না কি মঙ্গল বউ, ওঠ দোর খুলে দে।'

ঘরের ভিতর থেকে কোন সাড়া এল না। বিরক্ত হয়ে দোরে একটা ধাক্কা দিতে গিয়ে পড়তে পড়তে সুবল সামলে নিল। দোরটা আলগোছে ভেজান রয়েছে ভিতর থেকে, খিল দেওয়া নেই।

ঘরে ঢুকে নিজের পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বালল সুবল। তারপর মঙ্গলার ভাব দেখে চমকে উঠল, ম্লান আলোয় চোখে পড়ল বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে মঙ্গলা, বেশবাস আলু-থালু, মাথায় আঁচল নেই, চুলের রাশ এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কাঠির আগুন যতক্ষণ না আঙুলে এসে ছুঁল, তাপ লাগল আঙুলে, ততক্ষণ দুই আঙুলের মাঝখানে কাঠিটা ধরে রইল সুবল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মঙ্গলার দিকে। তারপর কাঠিটা নিবে গিয়ে আবার অন্ধকার হয়ে গেল ঘর।

সুবল এবার উচ্চকণ্ঠে আদেশের সুরে ডাকল, 'মঙ্গলা।'

শুয়ে শুয়ে মঙ্গলা সবই টের পাচ্ছিল। বাইরে থেকে নাম ধরে ডেকে সুবল ঘরে ঢুকল, দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকে আলো জ্বালল, কিন্তু তবু উঠি উঠি করে উঠতে ইচ্ছা করল না মঙ্গলার। অদ্ভুত একটা অবসাদ আর আলস্যে সমস্ত অঙ্গ যেন শিথিল অবশ হয়ে এসেছে, কিছুতেই তারা যেন বশে আসবে না মঙ্গলার। কিন্তু সুবলের শেষবারের ডাকে মঙ্গলা আর শুয়ে থাকতে পারল না, ধড়মড় করে উঠে বসল।

সুবল বলল, 'সন্ধ্যার সময় এমন গা ছেড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলি যে! হয়েছে

কি তোর, ঘরে আলো নেই, দোরটা খোলা, যদি চোরটোর কেউ ঢুকত ঘরে।'

মঙ্গলা কোন কথা বলল না, বালিশের তলা থেকে দেশলাই বের করে নিঃশব্দে উঠে মাটির দীপটা জ্বালাল। কিন্তু সোজাসুজি স্বামীর মুখের দিকে আজ আর তাকাতে পারল না মঙ্গলা, জবাব দিল না তার কথার।

সুবল ছাড়ল না, বিরক্ত হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল, কথা বলছিস না যে? ছুঁচ সুতো দিয়ে কেউ কি ঠোঁট দুটো সেলাই করে রেখে গেছে নাকি তোর?'

মঙ্গলা মৃদু স্বরে বলল, 'শরীরটা ভালো নেই আজ।'

সুবল অবাক হল। শরীর ভালো না থাকার কথা মঙ্গলা সহজে বলে না। এমন কি জ্বর-জ্বারি অসুখ-বিসুখ হলেও মুখে কখনো বলে না যে দেহ তার খারাপ হয়েছে।

সুবল একটু নরম স্বরে বলল, 'শরীর ভালো না থাকার মতো কি হল আবার। তোদের মেয়েমানুষের দেহ আর মেয়েমানুষের মন এক আজব জিনিস। সময় নেই, অসময় নেই, খারাপ হলেই হল।'

মঙ্গলা এ কথারও জবাব দিল না। নিরুত্তরে মাটির দীপ থেকে কেরোসিনের ডিবাটা ধরিয়ে নিল, তারপর হাটের থলে হাতে করে চলল রান্নাঘরের দিকে।

সুবল চটে উঠে বলল, 'এতখানি রাতের মধ্যে উনানও ধরাতে পারিস নি! শরীর এতই পচে গলে গেছে একেবারে? বেশ তাহলে ফের গিয়ে শুয়ে থাক তুই, রান্নার দরকার নেই আর, এখন হাঁড়ি চড়ালে ভাত ফুটতে ফুটতে রাত ভোর হয়ে যাবে।'

মঙ্গলা ম্লান একটু হাসল, 'না গো না, রাতের এখনও অনেক বাকি, হাত মুখ ধুয়ে তোমার এক ছিলিম তামাক শেষ হতে না হতে ভাত-তরকারি আমার নেমে যাবে, ভেবো না।'

যেন অবুঝ ক্ষুধার্ত ছোট ছেলেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে মঙ্গলা। তেমনি শান্ত আর স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ। কিন্তু সুবলের মনে হল মঙ্গলার হাসিতে যেন তেমন ঔজ্জ্বল্য নেই, এ হাসি যেন সত্যিই কোন অসুস্থ মানুষের।

খানিক বাদে সুবল গিয়ে মঙ্গলার রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াল। কড়াতে কি একটা তরকারি চাপিয়ে দিয়েছে মঙ্গলা।

সুবলের পায়ের শব্দে মঙ্গলা ফিরে তাকাল, কৈফিয়তের সুরে বলল, 'একটুখানি সবুর কর, বেশি দেরী নেই আর।'

সুবল বলল, 'তুই ভেবেছিস কি বল দেখি, আমি কি কচি ছেলে নাকি যে খিদেয় একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছি।'

মঙ্গলা কোন জবাব দিল না।

একটু চুপ করে থেকে সুবল বলল, 'কিন্তু শরীর যদি খারাপই হয়েছিল এত রাতে ফের কষ্ট করে এলি কেন রাঁধতে, একবেলা না হয় মুড়িচিঁড়ে খেয়েই থাকতাম, এত কষ্টের দরকার ছিল কি।'

মঙ্গলা কোন কথা বলল না। চোখ দুটো তার অকস্মাৎ ছলছল করে উঠল। সুবলের এত স্নেহের, এত বিশ্বাসের, এত ভালোবাসার কোন মর্যাদাই সে আর রাখে নি।

অন্যদিনের মতোই ঠাঁই করে ভাত বেড়ে স্বামীকে মঙ্গলা খেতে দিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো প্রতি গ্রাসে আজ আর সে ফোড়ন কাটল না, অভিযোগে, আক্রোশে, পরিহাসে মুহূর্তে মুহূর্তে রূপান্তর ঘটল না অপরূর আয়ত সুন্দর দুটি চোখের। আনত চোখ দুটি মাটির দিকেই সারাক্ষণ নিবদ্ধ হয়ে রইল।

খেতে খেতে সুবল বলল, 'রান্নার সময় বৈয়ম ভরে বুঝি নুন নিয়ে বসেছিলি আজ। সব তরকারিতে মুঠোয় মুঠোয় নুন দিয়েছিস ছড়িয়ে।'

মঙ্গলা চমকে অপরাধীর স্বরে বলল, 'পুড়ে গেছে বুঝি?'

সুবল রসিকতা করে বলল, 'না পুড়বে কেন, চমৎকার স্বাদ হয়েছে, ভেবেছিলি যত নুন খাওয়াবি তত গুণ গাইব।'

কিন্তু মঙ্গলার চোখের দিকে তাকিয়ে সুবলের হাসি থেমে গেল, বড় বড় চোখ দুটির কোলে অশ্রু টলটল করছে মঙ্গলার। গাল দুটিতে ভিজে দাগ এখনও লেগে রয়েছে জলের।

থমকে মুহূর্তকাল সুবল চুপ করে রইল, তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোর মঙ্গল বউ, সত্যি করে বল দেখি। লুকোস নি কিন্তু আমার কাছে।'

মঙ্গলা মুখ নিচু করে জবাব দিল, 'কিছু হয় নি, তুমি খাও।'

কিন্তু হাতের গ্রাস মুখে না তুলে সেটিকে আবার ভাতের থালার ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে সুবল জবাব দিল, 'কি করে খাই বল। নুনে পোড়া তরকারি এক-আধদিন জিভে সয় বলে, তুই কি ভেবেছিস চোখের জলে নোনতা ভাত-তরকারিও মানুষের মুখে রোচে?'

পিঁড়ি থেকে সুবল তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই মঙ্গলা আর্তস্বরে বলে উঠল, 'উঠ না, মাথা খাও আমার, আমি আবার সব রেঁধে দিচ্ছি।'

সুবল বলল, 'আজ কি অত কষ্টে। দেহ যখন সত্যিই তোর ভালো নেই মঙ্গলা, জোর করে কেন এলি রাঁধতে। কিন্তু ভেবে অবাক হচ্ছি এই দণ্ডকয়েকের মধ্যে কি এমন মারাত্মক ব্যাধি তোর হল যে বিছানা ছেড়ে তুই উঠতে পারিস নে, রাঁধতে বসলে চোখ দিয়ে তোর জল বেরোয় ঝরঝর করে!'

জলের ঘটিটা তুলে নিয়ে আঁচাবার জন্যে বেরিয়ে এল সুবল। খড়মের শব্দ খট খট করতে করতে লাউমাচা ছাড়িয়ে উঠানের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে থেমে গেল। স্বামীর অর্ধভুক্ত ভাতের থালার দিকে তাকিয়ে মঙ্গলা বসে রইল স্তব্ধ হয়ে।

১৪

বসন্ত মারীর সময় পাড়ার অনেকদিনের বুড়ো নিধু সারও হঠাৎ মৃত্যু হল। বসন্তে নয়, দুদিনের জর বিকারে। পাড়ার সবাই বলল, 'ভালোই হয়েছে, বেশিদিন ভুগতে হয় নি বুড়োকে, কষ্ট পেতে হয় নি বেশি।'

চার ছেলে, চার জনই পৃথগন্ন। বাড়ির সরিকানা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি, মামলা-মোকদ্দমাও মাঝে মাঝে হয়। বছরে তিন মাস করে বুড়ো বাপ এককে ছেলের ঘরে খেয়েছে। ব্যাধির চিকিৎসা শুশ্রূষা নিয়ে চার ভাই আর বউয়ের মধ্যে অনেকবার অনেক ঠেলাঠেলি হয়েছে। কিন্তু কোন ছেলের কোন খরচপত্র না করে বুড়ো যখন এবার সত্যি সত্যি মরেই গেল, বড় ভাই কুঞ্জ অন্য ভাইদের ডেকে প্রস্তাব করল, 'এতকাল যা হয়েছে হয়েছে, বাবার শ্রাদ্ধটা আয় চারজনে মিলেমিশেই করি। বুড়োর মনের ইচ্ছাও ছিল তাই। অন্তত তার শেষ কাজটায় যেন আমাদের মধ্যে কোন রেষারেষি ঠেলাঠেলি বিবাদ বিসংবাদ না হয়।' বলতে বলতে কুঞ্জর গলা ধরে এল।

ভাইরা পরস্পরের দিকে তাকাল। প্রত্যেকের হাতে একখানা করে কুশাসন, পরনে তেউনি, গলায় একটা করে ধরা। এতদিনে যে নতুন করে আবিষ্কার করল তারা আপন চার ভাই, একই বাপমায়ের সন্তান। অকস্মাৎ একই অনুভূতিতে চারজনের চোখ ছল ছল করে উঠল।

তিরিশ দিন অশৌচ পালনের পর শ্রাদ্ধ! উদ্যোগ আয়োজন গোড়া থেকেই

শুরু হল। চার ভাইকে এমন একসঙ্গে চলা-ফেরা কাজ-কর্ম করতে দেখে পাড়ার সবাই অবাক হয়ে গেল।

কিন্তু চার ভাই মিললে হবে কি, পাড়ার দলাদলিটা এই উপলক্ষে ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। নবদ্বীপের দোকান ঘরে, বাড়ির বেড়াঘেরা বারান্দায় প্রায়ই ছোট ছোট বৈঠক বসতে লাগল। কুঞ্জদের চারভাইকে হাত করে সুবলের ছোট দলটিকে এবারও কিভাবে জব্দ করা যায়, হুঁকো টানতে টানতে নবদ্বীপ সে সম্বন্ধে মাথা খেলাতে লাগল।

সুবল মঙ্গলাকে বলল, 'দেখছিস বুড়োর কাণ্ড। তলে তলে কেবল আমাকে অপদস্থ করার চেষ্টা। কিন্তু আমিও একবার দেখে নেব। ওদের চেয়ে আমরা কুঞ্জদের আরো নিকট জ্ঞাতি। এখনো তিন পুরুষ পার হয় নি। আমাকে বাদ দিয়ে কি করে সে পারে একবার দেখব।'

মঙ্গলা বলল, 'দল বল তো তোমারও আছে। এত ভয় কিসের ওদের।'

কিন্তু কথাটায় তেমন জোর লাগল না। দলাদলিতে তেমন যেন উৎসাহ দেখা গেল না মঙ্গলার।

এদিকে আর এক কথা শোনা গেল ওপক্ষ থেকে। নবদ্বীপের দলাদলির চেষ্টায় মুরলী নাকি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এবার বাধা দিয়েছে। মুরলী বলেছে, 'ওসব এবার থাক বাবা! ওরা চার ভাই যখন একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছে, আমরাও মিলেমিশে তাদের বাড়িতে সব নিমন্ত্রণ রাখতে যাব, তাছাড়া সুবলদার সঙ্গে আবার একটা দলাদলি কিসের, তার সঙ্গে কোন বাদ-বিসংবাদ তো নেই আমাদের।'

নবদ্বীপ নাকি ভ্রূ কুঞ্চিত করে জবাব দিয়েছে, 'আছে কি না আছে, তার তুই কি বুঝবি? চিরকাল ইয়ে নিয়ে কাটালি, পুরুষ মানুষের সমাজ সামাজিকতা দলাদলির তুই কিছু বুঝিস, না জানিস, যে এর মধ্যে কথা বলতে এসেছিস!'

কিন্তু মুরলী তার বাবার ধমকে ভয় পায় নি। দলাদলির প্রস্তাবে কান না দেওয়ার জন্য মুরলী কুঞ্জদের চার ভাইকে গিয়েও নাকি অনুরোধ করেছে। নবদ্বীপের সাঙ্গপাঙ্গদেরও শ্লেষ আর তিরস্কার করতে বাকি রাখে নি। কোন বারই এসব ব্যাপারে মুরলীর উৎসাহ দেখা যায় না। বিয়ে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে বড় একটা যোগও দেয় না সে। কিন্তু এবারকার সামাজিক ব্যাপারে তার সাগ্রহ সহযোগ রীতিমত বিস্ময়কর হয়ে উঠেছে। আরও আশ্চর্য লাগছে বাপের বিরুদ্ধে সুবলকে সে সমর্থন করছে বলে। অবশ্য মুরলী কোনদিনই

পিতৃভক্ত নয়। কিন্তু ঘরের মধ্যে যত তর্ক বিতর্ক, ঝগড়াঝাঁটিই বাপের সঙ্গে মুরলী করুক, বাইরে কোনদিনই সে নবদ্বীপের বিরোধিতা করে নি।

এবার তার এই নতুন ধরণের আচরণে আভাসে ইশারায় পাড়ায় আর একটা কথাও ফিসফিস শব্দে শোনা যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে মুরলীর সঙ্গে সুবলের স্ত্রীর মাখামাখির ব্যাপারটা। ইতিমধ্যে মেয়েপুরুষ অনেকেরই বিষয়টা চোখে পড়েছে। অনেকেই একাধিক দিন তাদের দুজনকে নিভৃতে আলাপ করতে দেখেছে। কেউ কেউ নাকি সুবলের অনুপস্থিতিতে তার বাড়ি থেকে বিভিন্ন সময়ে মুরলীকে বেরিয়ে আসতেও দেখে ফেলেছে। মঙ্গলার দেমাক, তার সাহস, এত কালের তার নির্মল স্বভাব-চরিত্রের খ্যাতির কথা মনে করেই তুলি তুলি করে কথাটা তেমন ভাবে তুলতে সাহস পায় নি। তাছাড়া সুবলের একরোখা স্বভাবের কথাও লোকে জানে। কিন্তু সুবলের ওপর মুরলীর এই পক্ষপাতিত্বে চাপতে চাপতেও কথাটা আবার উঠে পড়েছে! ঘরে ঘরে গুজগুজ ফিসফিস চলছেই।

বিষ্টু সা সেদিন স্পষ্টই বলল, 'অবশ্য বউমা সম্বন্ধে এসব কথা মুখে আনাও পাপ। ছেলেবেলা থেকেই তো আমরা দেখে আসছি। এমন বউ পাড়ায় আর দুটি নেই। পরের বিপদে আপদে তাকে ডেকে আনতে হয় না, মা লক্ষ্মী নিজেই যেচে এসে উপস্থিত হন। উৎসব অনুষ্ঠানে বাড়িতে মঙ্গল বউমা না এলে মনে কারো ফুর্তি লাগে না। রান্নাবাড়ায় এমন মিষ্টি হাত পাড়ায় আর কোন বউ-ঝিয়ের নেই। কিন্তু—' বিষ্টু সা গলা খাটো করে বলল, 'মুরলী তো গাঁয়ের একেবারে মার্কামারা ছেলে। তার সঙ্গে কি বউমার এমন মেলামেশা করতে দেওয়াটা তোমার ঠিক হয়েছে সুবল, কথায় বলে সন্ন্যাসী চোর নয় দ্রব্যে ঘটায়। বউমাকে তোমার একটু সতর্ক সাবধান করা উচিত ছিল সুবল।'

সুবল মুখ লাল করে বলল, 'কি উচিত না উচিত সে আমি বুঝব বিষ্টু খুড়ো। আমার বউয়ের স্বভাব-চরিত্র আমি জানি। তার সম্বন্ধে আর কারো মাথা ব্যথার দরকার করে না। আর এও ঠিক অসতী বলে যে মুহূর্তে তাকে আমি বুঝতে পারব, পরের মুহূর্তে আমার ঘরে তার আর স্থান হবে না, তার হাজার গুণ থাকলেও না। বউকে ভালোবাসলেও তার দুশ্চরিত্রতা সহ্য করবার মতো পুরুষ সুবল সা নয়।'

বিষ্টু সা, ফটিক, নিধিরাম সবাই থতমত খেয়ে গেল। সুবলের ক্রোধদীপ্ত চোখের দিকে তাকিয়ে সামনাসামনি কেউ কোন প্রতিবাদ করতে সাহস করল না।

ঘরে এসে সুবল জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কি শুনছি?'

স্বামীর দিকে তাকিয়ে মঙ্গলার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, ঢিপ ঢিপ করতে লাগল বুকের মধ্যে। নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে মুখ নিচু করে বলল, 'কি শুনেছ না বললে, আমি কি করে বুঝব।'

নতমুখ স্ত্রীর দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল সুবল। তারপর বলল, 'যা শুনেছি তা তুই মনে মনে জানিস, তুই মনে মনে বুঝেছিসও। ঘৃণায় আমি কথাটা মুখে আনতে পারব না—একথা জানিস বলেই কি শুনেছ জিজ্ঞাসা করতে তোর মুখে আটকায় নি।'

মরিয়া হয়ে মনের মধ্যে এবার কৃত্রিম জোর আনতে চেষ্টা করল মঙ্গলা। দৃপ্ত ভঙ্গিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার মুখের কথা বাদ দাও। স্পষ্টকথা তাতে কোনদিনই আটকায় না। কিন্তু তোমার জিভেতেও তো ভালোমন্দ, কোন কথা কোনদিন আটকে থাকতে দেখি নি। কি শুনেছ, বলেই ফেল না। অত ঢাকঢাক গুড়গুড়ের দরকার কি।'

সুবল বলল, 'না দরকার আর আমার কোন কিছুতেই আজ নেই। এতই যদি স্পষ্টবাদিনী, আমার কথার সত্যি করে জবাব দে দেখি, বুঝব কেমন বাপের বেটি তুই।'

মঙ্গলা বলল, 'বাপ-মা তুলে দরকার কি, যা বলবার বলে ফেললেই হয়।'

সুবল হঠাৎ কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'রাঁধতে গিয়ে সেদিন এত যে চোখের জল ফেললি তার কারণটা কি? মুরলীকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে হল বলে? বেরসিকের মতো বাড়ি ফিরে আমি ভারি অন্যায় করেছিলাম, মনে ভারি দাগা দিয়েছিলাম তোর, না?'

নিরুত্তরে মঙ্গলা সেখান থেকে উঠে যাচ্ছিল, হঠাৎ থাবা দিয়ে সুবল তার হাতখানা ধরে ফেলল, 'চলে যাচ্ছিস যে বড়, জবাব দিয়ে যা আমার কথায়।'

মঙ্গলা ম্লান একটু হাসতে চেষ্টা করল, 'জবাব দেওয়ার কি আছে। তোমার মুখে নাকি কোন কোন কথা আবার আটকে যায়, ভাবছি সে কথাগুলি কোন ধরনের।'

সুবল বলল, 'না আর আটকাবার মতো কিছুই নেই। ভয়-ডর, লজ্জা-ঘৃণা বলতে কিছুই যখন তুই বাকি রাখিস নি, সত্যি করে বল দেখি তারপর আর কদিন এসেছিল সে?'

হাত ছাড়িয়ে নিতে এবার আর কোন চেষ্টা করল না মঙ্গলা, চেষ্টা করল না

বৃথা আত্মরক্ষার, বলল, 'এতই যখন জান দিনগুলিও কি মনে মনে গুণে রাখ নি তুমি।'

মঙ্গলার স্পর্ধায় এক মুহূর্ত যেন স্তম্ভিত হয়ে রইল সুবল, তারপর পরম ঘৃণায় হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বলল, 'সব কটি দিন গুণে না রাখলেও দু-একদিনের কথা তো বলতে পারি। পরের হাটবার তাড়াতাড়ি করতে করতেও বৃষ্টির জন্য একটু রাত হয়ে গেল ফিরতে। সেদিন আর আগের মতো বোকামি করিস নি। বেশ সেয়ানা হয়ে উঠেছিস তত দিনে। এসে দেখি ঘরে আলোও জ্বলছে, বেশবাসও বেশ ঠিকঠাক করে নিয়েছিস। রান্না করতে গিয়ে সেদিন আর চোখ দিয়ে জল ঝরে নি, তার বদলে চোখের কাজল চকচক করে উঠেছে। বলিহারি তোদের সততাকে।'

মুহূর্তের জন্য আরক্ত হয়ে উঠল মঙ্গলার মুখ। তারপর আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সুবলের স্থির তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে সর্বাঙ্গ যেন থরথর করে কেঁপে উঠল মঙ্গলার। কিন্তু আশ্চর্য, সুবল রাগের মাথায় অমানুষিক কোন কাণ্ডই করে বসল না। ছুটে গিয়ে গলা টিপে ধরল না মঙ্গলার, উঁচু করে তুলল না চুলের মুঠি ধরে। আগে আগে ছোটখাটো সামান্য একটু আধটু অবাধ্যতায় যেসব শাস্তি তাকে দিয়েছে সুবল, তার কণামাত্রেও এবার আর তার উৎসাহ দেখা গেল না। নিতান্ত শান্ত-শিষ্ট ঠাণ্ডা মানুষের মতোই বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে গেল।

গঞ্জের মধ্যে দেখা হল নবদ্বীপের সঙ্গে। সুবলকে দেখামাত্রই নবদ্বীপ নিজে এগিয়ে এল তার কাছে। তারপর অত্যন্ত অবলীলায় যেন পরম স্নেহে সুবলের কাঁধে হাত রাখল নবদ্বীপ। গলা নামিয়ে বলল, 'এই যে সুবল, তোমাকেই খুঁজছিলাম আমি।'

নবদ্বীপের স্পর্শে ঘৃণায় সর্বাঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে উঠল সুবলের। বাপ-বেটা কাউ-কেই চিনতে আর বাকি নেই তার। বুড়ো শকুন বন্ধুত্বের ছলে আবার কোন সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে কে জানে! সর্বনাশের কিই-বা আর বাকি আছে সুবলের।

সুবল নীরস রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'হঠাৎ আমাকে আবার আপনার কি দরকার পড়ল জ্যেঠামশাই। দলাদলি করে আমাকে কোণঠাসা করবেন, সেকথাটা নিজের মুখেই শুনিয়ে দিতে চান বুঝি। কিন্তু সে তো আমি আগেই শুনেছি।'

নবদ্বীপের চোখেমুখে যেন একটা বেদনার ছায়া পড়ল। বলল, 'না দলাদলির কথা নয়, সুবল। সে তো সবাই জানে। এ অন্য কথা।'

সুবল বলল, 'তাহলে বলেই ফেলুন কথাটা।'

নবদ্বীপ এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'না, এখানে নয়। কথাটা একটু গোপনীয় সুবল। আমার গুদাম ঘরে চল। সেখানেই সুবিধা হবে।'

ঘৃণায় আর আক্রোশে সুবলের মন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নবদ্বীপের ভাবভঙ্গি দেখে কৌতুক আর কৌতূহলও তার কম হচ্ছিল না। কি বলে বুড়ো শকুন শোনাই যাক না। দেখাই যাক তার এবারকার চালটা!

তামাকের গুদাম ঘরে গুটি দুই কর্মচারী ছিল। তাদের ইশারায় বেরিয়ে যেতে বলে সুবলকে পাশে ডেকে বসাল নবদ্বীপ। তারপর বলল, 'তুই ভুল করেছিস সুবল। এরপর আর তোর সঙ্গে দলাদলির প্রবৃত্তি নেই আমার।'

সুবল বলল, 'এরপর মানে! কিসের পর? কিসের কথা বলছেন আপনি?'

নবদ্বীপ একবার সুবলের দিকে তাকাল, তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'এই যে লোকে যা তা সব বলাবলি করছে, কানাকানি ফিসফিস করছে যত সব অবিশ্বাস্য অকথ্য কথা নিয়ে। এরপর আর তাদের নিয়ে দল পাকাতে একটুও ইচ্ছে নেই আমার। এই ঘরের তলায় বসে তোকে দিব্যি করে বলছি সুবল, আজ থেকে দলাদলি আমি একেবারেই ছেড়ে দিলাম।'

সুবল অদ্ভুত একটু হাসল, 'মিছামিছি অতবড় দিব্যিটা কেন করতে গেলেন জ্যেঠামশাই, আপনার ভয় কিসের। আপনার পাহারা ডিঙিয়ে মুরলীর কোন ক্ষতি করবার সাধ্য যে আমার নেই তা তো আপনি আমার চেয়েও ভালো জানেন।'

নবদ্বীপের ছোট ছোট নিষ্প্রভ চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য যেন একবার জ্বলে উঠে আবার স্তিমিত হয়ে গেল।

নবদ্বীপ বলল, 'রাগে তোর মাথার ঠিক নেই সুবল, এ-সব কথা শুনলে অবশ্য তা থাকেও না। মুরলীর ক্ষতির ভয় আমি এক ফোঁটাও করি না, যে গুণধর ছেলে আমার, তার মন্দেতে আবার ক্ষতি বৃদ্ধি! আমি ভাবছি তোদের কথা।'

সুবল বলল, 'আমাদের কথা!'

নবদ্বীপ পুনরাবৃত্তি করে বলল, 'হ্যাঁ, তোদের কথাই। যে রকম একরোখা গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ তুই, নিজের হাতে নিজের কোন ক্ষতি তুই না করে বসিস এই আমার ভাবনা, কিন্তু এ সব বাজে কথায় বাজে গুজবে নিজের মাথা খারাপ করে ফেললে তো চলবে না বাবা। এ সময় মাথা ঠিক রাখতে পারলেই তো পা ঠিক থাকবে, চাল ঠিক থাকবে, চলন ঠিক থাকবে। মাতব্বরী মাতব্বরী করিস

বাপু, এখানেই হল আসল মাতব্বরী, আসল বুদ্ধির পরীক্ষা। পরের বুদ্ধিতে নিজের সংসার তুমি ছারেখারেও দিতে পার, আবার তেমন বুদ্ধিমান পুরুষ হলে এই সব ঝড়-ঝাপটার মধ্যে নিজে ঘরসংসার বেশ সামলেও রাখতে পার। বুদ্ধিমানের মতো চললে একটু টোলও পড়বে না তোমার সংসারে, তোমার সংসারও বাঁচবে, সমাজও বাঁচবে!'

সুবল অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'আপনি বলতে চান কি? যা বলবেন সোজাসুজি পরিষ্কার করে বলুন জ্যেঠামশাই। অত ঘোরপ্যাঁচ আমার ভালো লাগে না।'

নবদ্বীপ একটু হাসল, 'সংসারটাই যে বড় ঘোরপ্যাঁচের বাবা। মোটেই সোজা নয়, মোটেই স্পষ্ট আর পরিষ্কার নয়, সুতরাং তার কথা সোজা হবে কি করে?' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এসব বাজে গুজবে কান দিও না, বিশ্বাস কর না এসব। জোর করে তাদের মুখের উপর বলে এস যে তাদের কথা তুমি মোটেই বিশ্বাস করনি। তাতে মান বাঁচবে। তারপর স্ত্রীকে গোপনে গোপনে শাসন করতে হয়, কর। রাখ চোখে চোখে, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যেও না! তাতে মন বিগড়ে যাবে, শান্তি নষ্ট হবে দুজনেরই, ঘরসংসারে সে মন দিতে পারবে না, আর আয়-উপার্জন তোমার খারাপ হতে থাকবে। পুরুষের যে বাপু নানান জ্বালা, তাকে সব দিক দেখতে হয়, তার আটপিঠে না হলে চলে না।'

সুবল চলে আসার সময় নবদ্বীপ আবার বলল, 'দলাদলি সম্বন্ধে কোন চিন্তা-ভাবনা তোমাকে করতে হবে না সুবল। সেসব আমি দেখব।'

হলও তাই, দলাদলি করতে যেমন নবদ্বীপ ওস্তাদ, দলাদলি মিটাতেও তেমনি। কোনরকম গোলমাল গণ্ডগোলই নিধু সার শ্রাদ্ধে সে হতে দিল না। একটা দিন দোকান কামাই করে শ্রাদ্ধ-বাড়িতে নিজে সে উপস্থিত রইল। শ্রাদ্ধের বেদীতে পুরোহিতের মন্ত্রপড়া থেকে শুরু করে নিমন্ত্রণের প্রত্যেকটি বৈঠকে সে চোখ রাখল, তার ব্যবস্থায় বড় রকমের কোন ত্রুটিবিচ্যুতির কথা কেউ তুলতে পারল না।

শ্রাদ্ধের পর রামায়ণ হল এক পালা। কুঞ্জ বলল, 'আমাদের বিনোদ সাধুর কীর্তন-টির্তন কিছু হবে না?'

বিনোদ বলল, 'না কুঞ্জকাকা, গলা ভালো নেই। আমাকে মাফ করুন এবার।'

নামকীর্তন বা পদকীর্তনের নামে বিনোদের আনন্দের অন্ত থাকে না। একবারের বেশি দুবার বলতে হয় না তাকে। পাড়ায় কোন উপলক্ষ ঘটলেই নিজে যেচে গিয়ে কীর্তনের উদ্যোগ-আয়োজন করে। এবাড়ি ওবাড়ি থেকে চেয়ে-চিন্তে

মাদুর শতরঞ্চি এনে নিজেই আসর সাজায়, চৌদ্দলাইট টাঙিয়ে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করে। এসব ব্যাপারে একাধারে নিজেই সে একশ।'

কিন্তু বারবার সাধাসাধি সত্বেও কীর্তন গাইতে বিনোদকে এবার রাজী করান গেল না। একবার বলল, 'গলা খারাপ', আর একবার বলল, 'ভগবানের নাম খুশী মনে না করতে পারলে করতে নেই কুঞ্জ কাকা; তাতে যে শোনে তারও তৃপ্তি হয় না, যে গায় তারও নয়।'

কুঞ্জ বিস্মিত হয়ে ভাবল এমন নির্বিরোধ শান্ত সহজ মানুষ বিনোদের অখুশী হবার মতো কি হল হঠাৎ!

নিজের মনের অশান্তি আর চাঞ্চল্যের কথা ভেবে বিনোদ নিজেও কম বিস্মিত হয় নি। সেদিন মঙ্গলার প্রথম সম্ভাষণ তার শ্লেষ আর পরিহাস বিনোদের মনে অদ্ভুত একটা ভাবাবেশের সৃষ্টি করেছিল। কীর্তনের ভাবাচ্ছন্নতার মতো এই আবেশটাকেও মনে মনে উপভোগ করেছিল বিনোদ; শত তিরস্কার, শত ভর্ৎসনাতেও মনকে এই আনন্দরতি থেকে সে নিবৃত্ত করতে পারে নি।

এর আগে মঙ্গলা কোনদিন তার সঙ্গে কথা বলে নি। কিন্তু সময় অসময়ে দরকার মতো বিনোদের অতিথি-অভ্যাগতের জন্য চাল-ডাল তেল-নুন চাওয়া মাত্রই মঙ্গলা যুগিয়েছে। কোনদিন কোন কার্পণ্য দেখায় নি, অপ্রসন্ন করে নি মুখ। গোঁসাই গোবিন্দর অর্চনার জন্য কতদিন বিনোদ মঙ্গলার নিজ হাতে রোয়া গাছ থেকে গাঁদা ফুল তুলে নিয়েছে, ঘরের কানাচের দোপাটি ফুলের ছোট ছোট গাছ থেকে লাল আর সাদা ফুলে ভরে নিয়ে গেছে সাজি। অন্য বাড়ির বউ-ঝিয়ের মতো ঘরের ভিতর থেকে কোন নিষেধ জানায় নি মঙ্গলা, কোন আপত্তি করে নি। মঙ্গলার আঙিনায় যে ফুল ফোটে তা যেন কেবল বিনোদের গোঁসাই গোবিন্দর পূজায় লাগাবার জন্যই। এই ফুলের আর যেন কোন প্রয়োজন নেই, আর যেন সার্থকতা নেই কোন। যেদিন বিনোদ নিজে আসতে পারে নি, সাজি পাঠিয়ে দিয়েছে মাকে দিয়ে। সাজির ভিতর তোলা ফুলগুলির সাজাবার ধরন দেখেই বিনোদ বুঝতে পেরেছে এ তার মার হাতের কাজ নয়। মঙ্গলার সেই দান, সেই নীরব-প্রীতি বিনোদ নিঃশব্দ আনন্দেই গ্রহণ করেছে।

তারপর সতীসাধ্বী বুদ্ধিমতী সহৃদয়া বলে পাড়া ভরে মঙ্গলার যত নাম ছড়াতে লাগল, বিনোদের মন গর্বে আর আনন্দে ততই যেন পূর্ণ হয়ে উঠল। মঙ্গলার খ্যাতিতে লাভ কি বিনোদের! লাভ নয়ই বা কেন, সাধু-সজ্জন বলে বিনোদেরও তো খ্যাতি আছে, ভালো কীর্তন গায় বলে নাম আছে তার গ্রাম গ্রামান্তরে।

সেই খ্যাতির সঙ্গে যেন মঙ্গলার খ্যাতি মিশে গেছে, সেই নামের সঙ্গে যেন মিলে গেছে মঙ্গলার নাম। কথা মঙ্গলা তার সঙ্গে নাই বলল, প্রত্যক্ষ আলাপ নাই থাকল পরস্পরের মধ্যে, কিন্তু পরিচয়ও তাই বলে নেই একথা তো সত্য নয়। বরং এই পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মিল, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা যদি কারো সঙ্গে থাকে তো কেবল বিনোদের সঙ্গেই আছে মঙ্গলার। অন্তরের এই মিল, মনের এই মাধুর্যকে অতি লোভে কাঙালপনা করে বিনোদ নষ্ট করে ফেলবে না। কীর্তন-রসের মতো বৈষ্ণব মহাজনদের পদলালিত্যের মতো এই গোপন রসঘন সম্বন্ধটুকু অন্তরের মধ্যে বিনোদ উপভোগ করবে। রাধাকৃষ্ণের আসল মিল তো এই অন্তর্লোকেই, ভক্তের হৃদিবৃন্দাবনেই তো তাঁদের যথার্থ ভাবসম্মেলন।

এতকাল পরে, এত বছর পরে মধুর ভাবঘন মৌনতা ভঙ্গ করে সেদিন সকালে, নির্জন বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে মঙ্গলা তার সঙ্গে কথা বলে ফেলল। নিন্দা করল তার কীর্তনের, ব্যঙ্গ করল। ভীরু পুরাকালের মানুষ বলে খোঁচা দিতেও ছাড়ল না। বিনোদ দেখল যতখানি সে ভেবেছিল তত মিল মঙ্গলার সঙ্গে তার নেই, মত ও পথের স্বভাবেরও ভেদ আছে অনেকখানি। কিন্তু তাই বলে মন বিরূপ হয়ে উঠল না বিনোদের, এক ধরনের মোহ ভাঙল বটে, কিন্তু আর এক ধরনের মোহও মনের মধ্যে তিলে তিলে গড়ে উঠতে লাগল। মৌনতা আর কথা তো এক জিনিস নয়। কথায় ধ্বনিও আছে, ধারও আছে। তার ধরন আলাদা, স্বাদ আলাদা। খোঁচা কিছু বিনোদের মনে লাগল বটে, কিন্তু মৌচাক থেকে খোঁচায় কেবলই মধু ঝরে পড়তে লাগল। তারপর সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত মধুক্ষরণ হঠাৎ সেদিন স্তব্ধ হয়ে গেল বিনোদের। নিজের মায়ের মুখেই শুনতে পেল বিনোদ কথাটা। মঙ্গলার সঙ্গে মুরলীর নাম জড়িয়ে নানা কানাঘুষো চলছে পাড়ায়।

বিনোদ বলল, 'ছিঃ, ওসব বাজে কথায় কান দিও না মা। যেও না ওসব ইতর আলোচনার মধ্যে। কোথায় মঙ্গল বউঠান আর কোথায় মুরলী! ছিঃ!'

সৌদামিনীর মুখে বেদনার ছায়া পড়ল। একটু কাল চুপ করে থেকে সৌদামিনী বলল, 'আমিও তো তাই জানতাম বিনোদ। আর যাই হোক, মঙ্গলার কোন দিন এমন মতিগতি হবে না। কিন্তু মানুষের মনের গতি কখন যে কোন দিকে যায় তা আগে থেকে কারো জানবার সাধ্য নেই। দেখিস নি টাটকা ঘাস-বিচালি ফেন-কুঁড়ো ফেলে গরুতে মাঝে মাঝে গেরস্তের ছাইয়ের কুলোয় মুখ দেয়, আহ্লাদ করে জিভ দিয়ে ছাই চাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এও তেমনি। আমাদের গেরস্তের বউ-ঝিদেরও সেই রকম হয় মাঝে মাঝে। ভালো জিনিস মুখে রোচে

না, ছাই চাটতে সাধ যায়, সোনা রুপো ফেলে ভাঙা কাচ কুড়িয়ে আঁচলে ভরে তোলে। আমার নিজের চোখে যদি না দেখতাম তাহলে আমিও কি বিশ্বাস করতাম এসব কথায়।'

সৌদামিনী নিজের চোখে কি দেখেছে তা লজ্জায় বিনোদও জিজ্ঞাসা করল না, সৌদামিনীও বলল না। কিন্তু কেমন একটা অশুচি মালিন্যে বিনোদের সারা মন কালো হয়ে উঠল। মঙ্গলার কলঙ্ক যেন বিনোদকেও স্পর্শ করেছে, কুৎসিত অপবিত্র করে দিয়েছে তার জীবনকে।

কীর্তন গাইতে বিনোদ রাজী না হওয়ায় দীঘলকান্দী থেকে নন্দকিশোর গোঁসাইকে ডেকে আনল কুঞ্জ। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণের মুখে একটু ভাগবত পাঠ শুনুক পাড়ার লোক, এত শোক-দুঃখ বিপদ-আপদের পরে একটু শান্তি আসুক মনে। এ অঞ্চলের মধ্যে পাঠ আর ব্যাখ্যা মোটামুটি ভালোই করেন নন্দকিশোর, বেশ লালিত্য আছে তাঁর গলায়।

কথায় কথায় নন্দকিশোরকে বিনোদের ভাবান্তরের কথাও বলল কুঞ্জ, জানাল কীর্তন গাইতে তার অসম্মতির কথা।

নন্দকিশোর শুনে হাসলেন, 'জান কুঞ্জ, শ্রীরাধার মতো ভক্তেরও মান-অভিমান আছে। বিনোদের সেই অভিমান হয়েছে আমার বঙ্কুবিহারীর উপর। মানভঞ্জন তিনি নিজে এসেই করবেন, সে জন্য আমাদের ব্যস্ত হতে হবে না।'

নন্দকিশোর এসে বিনোদের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ মুচকে একটু হাসলেন, যেন কিছুই তাঁর জানতে বাকি নেই। তাঁর অনুরোধ বিনোদ অবহেলা করতে পারল না, আসর সাজাতে হল কুঞ্জর বাড়িতে, সকলের সঙ্গে উপস্থিত থাকতে হল ভাগবত পাঠের সভায়।

বাড়ির অন্দরের উঠানে চিক ঝুলান বারান্দায় মেয়েদের বসবার ব্যবস্থা হল। পুরুষরা বসল বাড়ির উঠানে, ঝালর দেওয়া সামিয়ানার তলায়। উঠানের দক্ষিণ দিকে ছোট আধহাত উঁচু একটি তক্তপোষের উপর পুরু তোষক পেতে তার ওপর ধবধবে সাদা চাদর বিছিয়ে নন্দকিশোরের আসন তৈরী হল। মোটা ভাগবতের ওপর শ্বেতচন্দন মাখান তুলসীপত্র রাখলেন নন্দকিশোর, পাশের শ্বেত পাথরের রেকাবী থেকে একটা এলাচির দানা মুখে তুলে দিলেন। তারপর মৃদু হেসে নন্দকিশোর জিজ্ঞাসা করলেন বিনোদকে, 'কোন উপাখ্যান আজ পাঠ হবে বিনোদ?'

নবদ্বীপ সা, বিষ্টু সার মতো প্রাচীন লোক উপস্থিত থাকতে সরাসরি তাকেই

উপাখ্যানের কথা জিজ্ঞাসা করায় বিনোদ ভারি লজ্জিত হল। একটু চুপ করে থেকে বিনোদ সবিনয়ে বলল, 'প্রভুর যা অভিরুচি। সভাস্থ দশজনে যা শুনতে চান—'

নন্দকিশোর স্মিতমুখে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'তুমিই বল বিনোদ, তাতে কোন দোষ হবে না। দশজনের কথা ভক্তজনের মুখ দিয়েই বেরোয়।'

নবদ্বীপ বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমিই বল বিনোদ, প্রভু যখন আদেশ করেছেন—'

বিনোদ একটু ইতস্তত করে বলল, 'তাহলে কুব্জার উপাখ্যানই বলুন প্রভু।'

কুব্জার উপাখ্যান! অক্রুর সংবাদ, কংস বধ—এত সব চমৎকার চমৎকার পালা থাকতে বিনোদ চাইল কিনা কুব্জার উপাখ্যান শুনতে! আসরের অনেকের মুখই অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

কিন্তু নন্দকিশোর আগের মতোই হেসে বললেন, 'বেশ, তাই শোন।'

কণ্ঠে অন্তরের সমস্ত মাধুর্য ঢেলে কথকতা শুরু করলেন নন্দকিশোর। ভাগবত থেকে দু-একটি শ্লোক মাঝে মাঝে সুললিত স্বরে পড়ে যান আর তার ব্যাখ্যায় দৃষ্টান্তে উপমায় অলংকারে কখনো বা নিজের সামান্য এক-আধটু অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে শাখায় উপশাখায় পত্রপুষ্পে পল্লবিত করে তোলেন সেই শ্লোক।

মথুরার অন্যান্য নাগরিকদের মতো কুব্জারও সাধ হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকে একবার সে দু-চোখ ভরে দেখে আসবে। রূপের আধার শ্রীকৃষ্ণ। একবার তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকালে চোখ পলক ফেলতে ভুলে যায়। নয়ন থেকে মন, মন থেকে অন্তর কাণায় কাণায় সেই রূপের সুধায় ভরে ওঠে, মাধুর্যের অবধি থাকে না। কুব্জারও সাধ হল নয়ন ভরে, হৃদয় ভরে সমস্ত জীবন ভরে সেই রূপামৃত পান করতে।

কিন্তু কি করে, কোন লজ্জায় সেই পরমতম রূপবান পুরুষের কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে কুব্জা। তার যে শুধু রূপ নেই তাই নয়, কুরূপেরও অন্ত নেই তার। পিঠের উপর বিশাল এক কুঁজ উঁচু হয়ে রয়েছে। বিসদৃশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোন সুষমা সামঞ্জস্য নেই, এ অঙ্গ বিকল, ও অঙ্গ বিকৃত। লাবণ্য নেই, শ্রী নেই যৌবন যায় যায় প্রায়। সঙ্কোচে দীনতায় কুব্জার পা সরে না, দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসে জলে।

কিন্তু কংসের আদেশ, যেতেই হবে। এই কুরূপা কুদর্শনা গতযৌবনা কুব্জাই কৃষ্ণের মতো ব্যভিচারী লম্পটের যোগ্য প্রণয়িনী। বাঁকা কুব্জার সঙ্গে চমৎকার

মিল হবে বঙ্কুবিহারীর। সপারিষদ কংসের উচ্চ উপহাসে চমকে ওঠে মথুরা নগরী, পশুপক্ষী অবোধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

শেষ পর্যন্ত পরম কুণ্ঠায়, পরম লজ্জায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে হল কুব্জাকে। ভাবল আত্মগোপন করে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থেকে তাঁকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখে আসবে। নিজের এই কুরূপ, বিকৃত, বিকলাঙ্গ দেহ তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরে তাঁর চোখকে পীড়িত করবে না।

কিন্তু নিজে লুকালে হবে কি, পিঠের কুঁজ তো লুকায় না কুব্জার। পর্বত শৃঙ্গের মতো সবাইকে ঢেকে সব কিছুকে আড়াল করে, বার বার কেবলই শ্রীকৃষ্ণের চোখে সেটা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। আত্মগোপন করলে হবে কি, শ্রীকৃষ্ণের কাছে তো মনের কোন ভাব গোপন থাকে না। কুব্জার কুণ্ঠিত লজ্জিত অপ্রকাশিত আত্ম-নিবেদনও যথাসময়ে যথাস্থানে গিয়েই পৌঁছায়।

মৃদু হেসে ভিড় ঠেলে শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে চললেন। অসম্ভাষিত, অবজ্ঞাত রূপবতীরা ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল এখানে ওখানে ; শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে ধরলেন কুব্জার হাত। সমস্ত অন্তর থরথর করে কেঁপে উঠল কুব্জার। সে স্পর্শে অশ্রু উদ্বেল হয়ে উঠল চোখে, তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে উঠল অন্তরের রসসিন্ধুতে। সেই প্লাবনে কোথায় মিলিয়ে গেল কুব্জা, কোথায় ভেসে গেল কুরূপ! সুচারুদর্শনা, ষোড়শী তন্বী মুগ্ধদৃষ্টিতে একবার দেখল নিজেকে আর একবার সেই পরম রূপময়ের দিকে লাজনত অনুরাগে মধুর চোখ মেলে তাকাল।

কথা শেষ হলেও তার ধ্বনি যেন থামতে চায় না। মুগ্ধ শ্রোতাদের চোখের সামনে থেকে মিলাতে চায় না প্রেমের স্পর্শে সেই নবরূপযৌবনময়ী নারী, পদ্মের কলির মতো যার হাতখানি শ্রীকৃষ্ণ ধরে রেখেছেন আপন মুঠির মধ্যে।

আসর ভাঙল অনেক রাত্রে। মুগ্ধ কৃতার্থ শ্রোতার দল নন্দকিশোরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে একে একে বিদায় নিল। গুরু-প্রণাম সেরে ভাবমুগ্ধ আবিষ্ট মনে বিনোদও চলল বাড়ির দিকে। সৌদামিনীর মৃদু ধমক আর অনুরোধেও শুতে গেল না বিছানায়। ছোট উঠান ভরে ধীরে ধীরে কেবল পায়চারী করতে লাগল, মনে পড়তে লাগল তার মঙ্গলার কথা। মনে পড়তে লাগল কুব্জার কথা ; কুব্জার কুরূপ তো কেবল বাইরের নয়, তার দৈন্য আর মালিন্য অন্তরেরও। কিন্তু প্রেমাস্পদার দেহমনের সমস্ত কুশ্রীতা, সমস্ত মালিন্য নির্মল হয়ে উঠতে পারে একমাত্র প্রেমের স্পর্শে, প্রেমের দৃষ্টিতে। যেখানে প্রেম রয়েছে, সেখানে কলঙ্ক নেই, দৈন্য নেই, গ্লানি নেই, আছে শুধু অন্তরের বাহিরের নয়নাভিরাম রূপ। তা চিরপবিত্র চিরনির্মল।

ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল আস্তে আস্তে। কৃষ্ণা একাদশীর ক্ষীণ চাঁদ উঠল আকাশে। মৃদু হাওয়ায় দূর থেকে কিসের একটা অদ্ভুদ স্নিগ্ধ গন্ধ ভেসে আসতে লাগল। এ গন্ধ ফুলের নয়, ঘাসপাতার নয়, এ গন্ধ কি পৃথিবীর নিজের?

কিন্তু এ গন্ধের সঙ্গে মেয়েদের চুলের গন্ধের কেমন যেন একটা মিল আছে, মিল আছে গন্ধ তেলের! যেদিক থেকে গন্ধটা আসছে সেদিকে তাকাতেই বিনোদ বিস্মিত হয়ে গেল। আগাছার ভিতর দিয়ে আবছা জ্যোৎস্নায় কে এক নারী তারই দিকে আসছে। মাথায় আঁচল নেই তার, চুলের রাশ পিঠ ভরে ছড়ান। এগুতে এগুতে সে একেবারে অত্যন্ত কাছে চলে এল বিনোদের। কোন কথা বলবার আগেই সে হঠাৎ বিনোদের পায়ের ওপর ভেঙ্গে পড়ল। ঘন চুলের রাশে পা ঢেকে গেল বিনোদের।

অদ্ভুত এক সম্মোহনের ভিতর থেকে বিনোদ অস্ফূট কণ্ঠে বলল, 'কে, কে তুমি?' তারপর আস্তে আস্তে হাত ধরে তাকে তুলতে চেষ্টা করল। বিনোদের স্পর্শে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল মেয়েটির, সে আর্তস্বরে বলে উঠল, 'আমি আলতা। তোমার ছোঁয়ায় কুব্জার মতো আমিও কি বদলে যেতে পারি না?'

বিনোদ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হাত ধরে আবার তাকে তুলতে চেষ্টা করে স্নিগ্ধ স্বরে বলল, 'এখন তুমি বাড়ি যাও আলতা। তোমার কথা আমি গুরুকে জিজ্ঞাসা করব।'

১৫

সুবল মনে ভেবে দেখল নবদ্বীপের কথাই ঠিক। ব্যাপারটা নিয়ে হৈ চৈ করলে সবদিক থেকেই লোকসান। পাড়ার লোক মজা দেখবার জন্য তাহলে আরও বেশি করে জটলা পাকাবে। কেলেঙ্কারি তাতে বাড়বে বই কমবে না। এদিকে মুরলীও খুব সাবধান হয়ে যাবে, তাকে আর আয়ত্তের মধ্যে পাবে না সুবল।

কিন্তু মঙ্গলার ভাবগতিক দেখে সুবল অবাক হয়ে গেল। এরই মধ্যে সে বেশ সামলে নিয়েছে। জল আনছে, ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, রান্নার জন্য বঁটি পেতে লাউ কুটছে আগের মতো। যেন কিছুই হয় নি, কিছুতেই কিছু এসে যায় নি তার। কিন্তু সুবলের অনেক এসে যায়। অপরাধিনী, অবিশ্বাসিনী স্ত্রী তার চোখের সামনে এমন নির্ভীক ভাবে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে তা দেখে গা জ্বলে যায় সুবলের। কথা কম বলে মঙ্গলা, হাসে আরও কম। কিন্তু হাত দুখানাকে এক

মুহূর্তও বিশ্রাম দেয় না। ঘর-সংসারের কোন না কোন কাজে হাত তার লেগেই আছে। এত কাজ সে কোত্থেকে জড় করল! ভিতরে ভিতরে যে সংসার পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে তাতে ঘি ঢেলে লাভ কি মঙ্গলার!

মৌনমুখী, শান্ত, কর্মরত মঙ্গলাকে দেখে রাগ আরও বেড়ে যায় সুবলের। হাত নিসপিস করতে থাকে, কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ গিয়ে তো আর চুলের মুঠি ধরে মানুষ টেনে তুলতে পারে না বউকে, কিংবা ইচ্ছা হলেও পিঠের উপর দমাদম লাথি মারতে শুরু করা যায় না। মারধোরের জন্য শরীরের মধ্যে সত্যি সত্যি ততখানি আর উত্তেজনাও বোধ করে না সুবল। ভিতরে ভিতরে একটা নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে তার অন্তরও যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা আর নিশ্চল হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দেয় সুবল। বুক ফুলিয়ে চোখ রাঙিয়ে দশজনের সামনে সে যা বলে এসেছিল তার কিছুই সে করতে পারে নি। স্ত্রীকে সন্দেহ করলেও ঘর থেকে তাকে বের করে দেয় নি, বরং দিনের পর দিন একই ঘরের তলায় তাকে নিয়ে বাস করছে। সেবা নিচ্ছে। হাতের ভাত খাচ্ছে তার। তার হাতেরই পাতা বিছানায় রাতের পর রাত অঘোরে ঘুমাচ্ছে। আর মুখ বুজে নিশ্চয়ই মজা দেখছে মঙ্গলা, তার কাপুরুষতায় আড়ালে গিয়ে মুখ টিপে হাসছে।

রান্নাঘরে দোরের কাছে গিয়ে সুবল বলল, 'আজ থেকে আমার জন্য তোর আর চাল নিতে হবে না মঙ্গলা, রাঁধতে হয় নিজের জন্যই রাঁধিস।'

মঙ্গলা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কেন, আজ থেকে কি উপোস করে থাকতে চাও না কি?'

তর্কের সুযোগে উৎফুল্ল সুবল রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'কেন রে মাগী, আমি উপোস করব কোন দুঃখে। আমার চাল আমার ডাল, আর গোবিন্দ বুঝি তোর।'

মঙ্গলা তেমনি মৃদু শান্তভাবে বলল, 'তবে যে বলছিলে রাঁধতে হবে না তোমার জন্য।'

সুবল বলল, 'হ্যাঁ আমার জন্য তোকে আর রাঁধতে হবে না। নিজের ভাত আমি নিজে রেঁধে খাব। তোর হাতে আর নয়।'

মঙ্গলা অদ্ভুত ম্লান একটু হাসল, 'কেন, এতদিন বাদে কি হল আমার হাতে।'

শ্লেষে আর ব্যঙ্গে বিকৃত দেখাল সুবলের মুখ, 'তা তো বটেই। হাতের আর দোষ কি, ঠোঁট এঁটো হয়, মুখ এঁটো হয়, কিন্তু হাত তো আর মেয়েমানুষের এঁটো হয় না। হাতেরও জাত যায় না, ভাতেরও জাত যায় না।'

ক্লান্ত করুণ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে মঙ্গলা মুখ ফিরিয়ে আবার রান্নায় মন দিল।

কিন্তু ওই বলা মাত্রই। আলাদা রাঁধবার জন্য কোন আগ্রহই দেখা গেল না সুবলের। অন্যদিনের মতো আজও স্ত্রীর বাড়া ভাত সামনে নিয়েই খেতে বসল। কিন্তু ভাত-তরকারি মেখে মুখে দেওয়ার আগে সস্নেহে পোষা বিড়াল ছানাটিকে বাঁ হাতে কাছে টেনে নিয়ে এল সুবল। তারপর ভাতের গ্রাসের খানিকটা, প্রত্যেক তরকারি থেকে কিছু কিছু পাতের নিচে নামিয়ে রেখে বিড়ালটিকে লক্ষ্য করে সুবল বলল, 'খা, তুই আগে খেয়ে পরীক্ষা করে দেখ। মরিস না হয় মরবিই, অত ভয় কিসের। তোর চেয়ে একটা মানুষের জীবনের দাম অনেক বেশি।'

স্বামীর কাণ্ড দেখে মঙ্গলা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ক্ষীণ করুণ স্বরে তার সমস্ত সত্তা যেন আর্তনাদ করে উঠল, 'দিন রাত এমন করে দগ্ধে না মেরে আমাকে একেবারে মেরে ফেল, একেবারে মেরে ফেল, পায়ে পড়ি তোমার।'

সুবল অদ্ভুত উল্লাসে এবার গ্রাসের পর গ্রাস মুখে পুরতে লাগল। একেবারে না মেরে ফেললেও মঙ্গলাকে মৃত্যুযন্ত্রণা দেওয়া যায়। মারণাস্ত্র সুবলের তূণ থেকে এখনো তাহলে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি!

কিন্তু যে চরম মৃত্যুবান মঙ্গলার ভিতরে থেকে একটু একটু করে প্রস্ফুট হয়ে উঠছে, সুবলের অনভ্যস্ত চোখ এতদিন তা এড়িয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু এবার আর এড়াতে পারল না।

সেদিন হাট থেকে ফিরবার পথে সহচর ফটিকই বলল কথাটা। খানিক ইতস্তত করে বলল, 'খবরটা সত্যি নাকি সুবলদা?'

সুবল বলল, 'কি খবর?'

ফটিক বলল, 'আটকুঁড়ো নাম এবার নাকি ঘুচতে চলল তোমাদের?'

সুবলের সমস্ত মুখে যেন রক্ত এসে ভিড় করল। অন্ধকারে ফটিকের তা চোখে পড়ল না।

দম নেওয়ার জন্য একটু সময় নিল সুবল, তারপর ধমকে উঠল ফটিককে, 'কি যা তা বলছিস। নিজের বউ গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়োয় কিনা তাই পরের সম্বন্ধেও ওসব ঠাট্টা-তামাসা ছাড়া আর কিছু আসে না তোদের।'

ধমক খেয়ে ফটিক কিন্তু মোটেই ভড়কে গেল না, 'সত্যিকথাই বলেছি সুবল দা। আমার বউটার আক্কেল পছন্দ ভারি কম। বছরের পর বছর কেবল বিয়োচ্ছে

তো বিয়োচ্ছেই। কিন্তু গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে হওয়া পুরনো পোয়াতি কিনা, তাই নতুন পোয়াতির লক্ষণ দেখলেই চট করে বুঝতে পারে, তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। জল আনতে গিয়ে বউঠানকে আজ সে নিজের চোখে দেখে এসেছে। কথাটা তার মুখেই আমার শোনা।'

সুবল কোন কথাই বলল না। নীরবে অন্ধকারের মধ্যেই পথ চলতে লাগল।

গলাটা কেশে পরিষ্কার করে নিরীহ ভালোমানুষের মতো ফটিক আবার বলল, 'তা তোমার এত লজ্জা কিসের সুবল দা। এ তো শুভ সংবাদ। এতকাল পরে বংশের দুলাল আসছে ঘরে, এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে। বেশ জাঁকজমক করে বউয়ের সাধ দাও একদিন। নিমন্ত্রণ করে খাওয়াও আমাদের।'

সুবল বলল, 'সেজন্য ভাবনা কি। আর কাউকে না করতে পারলেও তোদের নিশ্চয়ই বলব ফটকে, তোকে আর তোর বউকে।'

স্বামীর দৃষ্টি লক্ষ্য করে আরক্ত মুখে চোখ নামিয়ে নিল মঙ্গলা, কিন্তু পরক্ষণেই অদ্ভুত একটা ভয়ে মুখ তার ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এক মুহূর্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে সুবল ডাকল, 'মঙ্গলা।'

পুরুষের সেই বজ্রকঠিন কণ্ঠে মঙ্গলার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল, সেই আহ্বানের উপযুক্ত সাড়া যোগাল না মঙ্গলার মুখে। কিন্তু তাই বলে চোখ দুটি মাটির দিকেও নিবদ্ধ রাখতে পারল না। চুম্বকের মতো তার চোখকে সুবলের সেই রূঢ় রুক্ষ কণ্ঠ ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করে নিল। শঙ্কিত ভয়ার্ত চোখ তুলে স্বামীর দিকে তাকাল মঙ্গলা।

সুবল আর কোন কথা বলল না। কেবল তার চোখ থেকে চরম ঘৃণা আর বিদ্বেষের দুঃসহ হিংস্র জ্বালা মঙ্গলার সেই বিবর্ণ স্তিমিত চোখ দুটির উপর বিচ্ছুরিত হতে লাগল।

পাড়া ভরে আবার কানাকানি ফিসফিসানি উঠল। চোখ ঠেরে হাসাহাসি গা-টেপাটেপি চলল মেয়ে মহলে। এতদিনে বন্ধ্যাত্বের দুঃখ ঘুচল মঙ্গলার। বাঁজা বলে আর কেউ তাকে খোঁটা দিতে আসবে না। মঙ্গলার শাশুড়ী বেঁচে থাকতে শত তাবিজ-কবচ মান্সি-মানত জলপড়া তেলপড়ায়ও যা হয় নি, এতদিন পরে সেই অসাধ্য আজ সাধন করেছে মঙ্গলা। শাশুড়ী বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই ভারি খুশী হয়ে উঠত, দুহাত তুলে বাহবা দিত বউকে।

সন্তানসম্ভবা হয়ে এতদিন পরে রঙ্গীও এসেছে বাপের বাড়ি। খবর পেয়ে মধু গিয়ে নিয়ে এসেছে মেয়েকে। স্ত্রীকে পাঠাতে এবার আর আপত্তি করে নি অজিত। আপত্তির কোন কারণও নেই। প্রথম প্রথম এ অবস্থায় মায়ের কাছেই রাখা ভালো। সেবাযত্ন মায়ের কাছে যেমন হয় তেমন আর কোথাও হয় না। অজিতের মা-খুড়িরা নিজেরাই বলেছে এ কথা।

পাড়ার বউ-ঝিদের কথার বাঁকা বাঁকা ভঙ্গি দেখে রঙ্গীও মুখ টিপে একটু হাসল। ও বাড়ির বরুণ সার স্ত্রী চম্পা তাকে আস্তে একটু ঠেলা দিয়ে বলল, 'হাসছিস কেন লো রঙ্গী, মিছে বলছি নাকি আমরা। খবর শুনে খুশী হয় নি তোর শাশুড়ী? গয়না-গাঁটি কে কি দিয়েছে একটু দেখাই না আমাদের।'

কিন্তু লজ্জায় চুপ করে থাকার মেয়ে রঙ্গী নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে জবাব দিল চম্পার কথার। বলল, 'গয়না-গাঁটির এখনই কি চম্পা বউদি, একেবারে কোলের উপর তুলে দিতে না পারলে কি পুরস্কার মেলে। এ তো আর আমাদের বরুণদা নয়।'

এদিকে পারতপক্ষে আজকাল আর বাড়ির বার হয় না মঙ্গলা। কাজকর্ম বাড়ির কাছের পুকুরেই যেমন তেমন করে সেরে নেয়। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে রাঁধবার জন্য আগের মতো আর ডাক পড়ে না তার, কারো অসুখ-বিসুখ হলে রোগীর মা-বোনেরা সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাকে ডাকতে আসে না, তবু মেয়েদের ভিড় হয় মঙ্গলার বাড়িতে। কৌতুক আর কৌতূহল ভরা চোখে তাদের অনেকেই মঙ্গলার দিকে তাকিয়ে থাকে, কেউ কেউ এটা ওটা প্রশ্নও করে। গৃহিনী গোছের প্রৌঢ়ারা অযাচিত উপদেশ দিয়ে যায়, এ সময় খুব সাবধানে চলাফেরা করা উচিত মঙ্গলার, শত হলেও পোয়াতি তো নতুন। তাদের উপদেশ আর পরামর্শের মধ্যে বাঁকা শ্লেষটাই ফুটে বেরোয়, কিন্তু মঙ্গলা কোন জবাব দেয় না, প্রতিবাদ করে না কোন রকম।

বেশ একটু জাঁকজমক করেই রঙ্গীর সাধ দিল মধু। একমাত্র মেয়ের প্রথম সন্তান হতে যাচ্ছে। একটু কিছু না করলে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেই বা কি বলবে, মেয়েও ভাববে বাপটা একেবারেই কৃপণ। সাধ্যমতো নিকট আত্মীয় দশ-পনের জনকে এই উপলক্ষে মধু নিমন্ত্রণ করে খাওয়াল।

কিন্তু সাড়া শব্দ নেই সুবলের বাড়িতে। কে কি বলছে না বলছে, ভাবছে না

না ভাবছে, সেদিক যেন ভ্রুক্ষেপ নেই সুবলের। সব সময়ই অন্যমনস্ক দেখায় তাকে, মনে হয় কি একটা মতলব আঁটছে মনে মনে।

১৬

খবরটা মনোরমাই নিয়ে এল স্বামীর কাছে, 'শুনেছ, ওবাড়ির মঙ্গলাদির নাকি ছেলেপুলে হবে।'

মুরলীর চমকে ওঠাটা মনোরমার দৃষ্টি এড়াল না। জোড়া ভ্রূর মাঝখানটা কুঞ্চিত হল একটু, অদ্ভুত একটু হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। মনোরমা বলল, 'বাঃ চুপ করে কেন, এমন চমৎকার একটি খবর আমি আনলাম, পুরস্কার কিছু দাও।'

মনোরমার কথার ভঙ্গিতে মুরলীর মুখটা যেন একটু আরক্ত হয়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আবদার তো তোমার মন্দ নয় সোনাবউ পাড়া ভরে যত রাজ্যের পরের বউয়ের ছেলেপুলে হবে, আর সেই খবর শুনে শুনে নিজের বউকে পুরস্কার দিতে হবে আমায়! খবরটা নিজের হলেও না হয় বুঝতাম।'

আঘাতে আর লজ্জায় মনোরমারও মুখের রঙ বদলাল। তারপর মৃদু কণ্ঠে মনোরমা জবাব দিল, 'খবরটা কেবল কি পরেরই ?'

জবাব শোনবার জন্য মনোরমা আর সেখানে দাঁড়াল না।

তার সেই মৃদু কণ্ঠ, তার চলে যাওয়ার ভঙ্গিটি অনেকক্ষণ ধরে মুরলীর যেন চোখে লেগে রইল। কেমন একটু বেদনার ছোঁয়াচ লাগল মনে। মঙ্গলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার শুরু থেকেই মনোরমা জানে। তাকে কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারে নি মুরলী, ফাঁকি দিতে খুব চেষ্টাও করে নি। কিন্তু এই নিয়ে আগের মতো কোঁদল করে নি মনোরমা, মাথা-খুঁড়ে কেঁদে চেঁচিয়ে ঝগড়া করতে আসে নি স্বামীর সঙ্গে। এতদিনে সে যেন বুঝে নিয়েছে স্বামীর এই স্বভাব কোনদিন শোধরাবে না। মান-অভিমান, কান্নাকাটি, তিরস্কার-গঞ্জনা সব বৃথা, সব নিষ্ফল! কিছুতেই আর বদলাবার আশা নেই মুরলীর, ভালো হবার আশা নেই। স্বামীর কাছে নয়, এতকাল পরে ভাগ্যের কাছে যেন সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে স্থির শান্ত হয়ে গেছে মনোরমা।

স্বামীর সামনে খাবার এনে দিয়ে মনোরমা হয়ত কাছে দাঁড়িয়েছে, মুরলী অনুরাগসূচক কিছু একটা বলতে চেষ্টা করতেই মনোরমা সরে গেছে সেখান থেকে, 'থাক, ওসব কথা আমাকে কেন, আমার নতুন সতীনকে বল।'

মুরলী বিস্মিত হবার ভান করছে, 'সতীন সতীন করেই তুমি গেলে, নতুন সতীন আবার কে!'

মনোরমা যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে আবার অদ্ভুত একটু হেসেছে, 'নামটা আমার মুখ থেকে আর নাই বা শুনলে। তোমার মতো অত সুন্দর করে মোলায়েম করে তো আর বলতে পারব না কথাটা, ভারি খারাপ শোনাবে আমার মুখে। শত হলেও সতীনই তো।'

বলে সেখান থেকে সরে গেছে মনোরমা। এই সামান্য ঈর্ষা, সামান্য খোঁচা এইটুকুই তার সম্বল, এর বেশি আর মনোরমা আজকাল এগোয় না। মুরলী অনেকবার বিস্মিত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ভেবেছে কেন এগোয় না মানারমা! কেন পা জড়িয়ে ধরে বলে না, 'তোমাকে আর এক পাও আমি নড়তে দেব না?' গলা জড়িয়ে ধরে মুখ লুকিয়ে কেন আর বলে না মনোরমা, 'আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারবে না তুমি, আর কারো কাছে যেতে দেব না তোমাকে।'

সেই উদ্দামতার বদলে মনোরমা কেবল আজকাল সামান্য একটু আধটু খোঁচা দিয়েই ক্ষান্ত হয়, সামান্য একটু আধটু শ্লেষ আর পরিহাস করেই সে সম্পূর্ণ নীরব, সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যায়। ঝড় নেই, তরঙ্গ নেই, যেন প্রাণও আর নেই মনোরমার মধ্যে।

কিন্তু মঙ্গলার সন্তান সম্ভাবনার খবরটুকু দিয়ে যে লজ্জা আর গ্লানি, যে ঈর্ষা আর নৈরাশ্য মনোরমা আজ প্রকাশ করে গেল, তার যেন তুলনা নেই। সামনে থেকে সরে গেলেও মনোরমার সরে যাওয়ার ভঙ্গি মুরলীর মনের মধ্যে কেমন একটু আলোড়ন সৃষ্টি করে তুলল। তবু কথাটা কি সত্যি! তাহলে মঙ্গলা নিজেই কেন বলল না তাকে!

সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলার মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভেসে উঠল মঙ্গলার লজ্জায় আনত দুটি চোখ, মুখের আরক্ত আভাস, মুরলীর মনে হল মঙ্গলাও তাকে বলেছে। আর সেই প্রকাশ এমন বেদনার নয়, এমন জ্বালা আর হতাশার ভিতর দিয়ে নয়। সে প্রকাশের ধরন আলাদা। তাতে সুস্পষ্ট ভাষা ছিল না, ইশারা ছিল। তাতে শঙ্কা ছিল, সঙ্কোচ ছিল, কিন্তু চাপা একটা আনন্দের আভাস গোপন ছিল না। মূর্খ মুরলী তা লক্ষ্য করে নি, খেয়াল করে দেখে নি। নিজেকে নিজে ধিক্কার দিল মুরলী। নিন্দা করল নিজেকে।

বিষয়টা যতই সে ভাবতে লাগল, খানিক আগের বেদনা, বিহ্বলতা ততই

মিলিয়ে আসতে লাগল, অদ্ভুত একটা উল্লাসে মন ভরে উঠল মুরলীর। এর আগে অন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রণয়ের এ ধরনের পরিণতিতে সে বিরক্ত হয়েছে, ভীত হয়েছে। আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সেই সম্ভাবনাকে মুছে ফেলতে, না হয় বহু দুরে সরে এসেছে, সরিয়ে দিয়েছে নির্মমভাবে। সন্তানের মা তো ঘরেই আছে তার, বাইরে সে কেবল চায় প্রেয়সীকে। কিন্তু মঙ্গলার খবর শুনে আজ মন অন্যরকম হয়ে গেল মুরলীর, আনন্দের একটা তীব্র অনুভূতিতে অন্তর তার পূর্ণ হয়ে উঠল। একথা যদি সত্য হয় তাহলে নতুন করে মঙ্গলাকে পাবে মুরলী, সম্পূর্ণ করে পাবে। এ সত্যকে যদি স্বীকার করে মঙ্গলা তাহলে এক নিগূঢ় অচ্ছেদ্য বন্ধনে মুরলীর সঙ্গে সারা জীবনের জন্য জড়িয়ে পড়বে মঙ্গলা, সে বাঁধন কোনদিন খুলবে না, শিথিল হবে না।

কিন্তু এই সত্যের আর একটা দিকের কথা ভেবে মুরলী হঠাৎ চমকে উঠল, শঙ্কিত হয়ে উঠল মঙ্গলার জন্যে। মঙ্গলার পক্ষে এই সম্ভাবনা কেবল আনন্দের নয়, গৌরবের নয়, পরম লজ্জার পরম অপমানেরও। এর পরেও স্বামীর সন্দেহ-সঙ্কুল দৃষ্টির তলে কেমন করে দিন কাটছে মঙ্গলার, ভেবে শিউরে উঠল মুরলী। পাড়া ভরে এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, কানে কানে এই নির্লজ্জ ফিসফিসানি, চোখে চোখে এই শাণিত শ্লেষ, এর মধ্যে অসহায় মঙ্গলার জীবন পলে পলে কি ভাবে দুঃসহ হয়ে উঠছে তা যেন মুরলী চোখের সামনে দেখতে পেল। কোন নারীর জন্য এমন বেদনাময় অনুভূতি মুরলীর জীবনে এই প্রথম। এতকাল নারী ছিল তার কাছে কেবল দেহসর্বস্ব, কেবল আঙ্গিক রূপের আধার, কেবল শারীরিক আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি, কিন্তু মঙ্গলার জন্য এই দুর্ভাবনা, এই বেদনার ভিতর দিয়ে সে যেন নতুন করে দেখতে পেল নারীর হৃদয়, পরিচয় পেল নিজের হৃদয়ের। অশ্রুতে উল্লাসে জীবনের এক অনাস্বাদিত রসের যেন সন্ধান পেল মুরলী। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সমস্ত অন্তরের মধ্যে সেই রসকে সে সঞ্চারিত করে নিল। তারপর এক সুস্পষ্ট দৃঢ় সঙ্কল্পে আরাম-কেদারা ছেড়ে শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। দ্বিধা দ্বন্দ্ব, বর্তমান ভবিষ্যৎ, পরিণাম পরিণতি কোন কথাই আর তার মনে রইল না।

আজও সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। আকাশে শ্রাবণের মেঘ ঘনতর। খাল আর নদীর জল উপচে পড়ে প্লাবিত করে দিয়েছে সমস্ত পাড়াটিকে। প্রত্যেক বাড়ির নিচে জল। কোথাও কোথাও বা উপরেও উঠে এসেছে। এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি যাওয়ার জন্য বাঁশের সাঁকো বানিয়েছে গৃহস্থেরা। এক ঘর

থেকে আর এক ঘরে যাওয়ার জন্যও ছোট ছোট সাঁকো তৈরী হয়েছে কোন কোন বাড়িতে।

ঘাটের ছইওলা বড় নৌকাখানা আর চাকর নিয়ে গঞ্জে গেছে নবদ্বীপ। দোকানের বেচা-কেনার হিসাবপত্র সেরে ফিরতে রাত হয়ে তার। পাড়ার ব্যবসায়ীদের অনেকেই ছোট ছোট ডিঙি নৌকায় গেছে চরকুসুমপুরের হাটে। এই বর্ষার সময় কুমারগঞ্জের চেয়েও বড় হাট মেলে সেখানে। বেশি দামে বিকায় মালপত্র। সব জিনিস ছোট হাটখোলায় ধরে না। বহু জিনিসের বেচা-কেনা হয় নৌকায় নৌকায়। নদীর সাত-আটটি বাঁক টেনে হলুদ তেল লঙ্কা নুনের জন্য পান সুপারি নিয়ে এ পাড়ার সাহারাও যায় সেই হাটে। পড়তা বেশি পড়ে বলে কষ্টটা তেমন গায়ে লাগে না। শুকনোর সময় খাটে পাগুলি, বর্ষার সময় তারা বিশ্রাম পায়, হাত দুটির পালা হয় শুরু। বৈঠা টেনে টেনে হাতের গুলি ফুলে ওঠে, কড়া পড়ে যায় তেলোতে, কিন্তু কষ্টটা খুব দুঃসহ বলে মনে হয় না কারো। বাপ-দাদার আমল থেকেই এই চলছে। পয়সা রোজগার হয় এমনি করেই।

নৌকা পাড়ায় সকলের নেই। যাদের আছে তাদের খাতির বেশি ; মান-মর্যাদা আদর, এই বর্ষার সময় তাদের বহুগুণ বেড়ে যায়। নৌকার মালিক মাঝখানে বসে জল সেঁচে, হুঁকো টানে আর ফাঁকে ফাঁকে রঙ্গরসের কথা বলে। আরোহীরা সমস্ত পথ বৈঠা টেনে যায় আর বৈঠা টেনে ফেরে।

নৌকা নিয়ে সুবলও যে হাটে গেছে তা মুরলী জানে। হাট-বাজারে যাওয়া আজকাল কমিয়ে দিয়েছে সুবল। মঙ্গলা বেশিক্ষণ যাতে তার অনুপস্থিতির সুযোগ না পায় সে সম্বন্ধে সুবল খুব দূরের কোন হাটে গঞ্জে বড় একটা যায় না। দৈনন্দিন বাজারে যাওয়ার সময়ও আলতার মাকে রেখে যায় পাহারায়। কিছুকাল ধরে মঙ্গলার সাক্ষাতের কোন সুযোগ পায় নি মুরলী। এর মধ্যে অনেকবার সুবলের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠেছে সুবলের ঠোঁটে, হিংস্রতায় জ্বলে উঠেছে চোখ। সুবল যে সব জানে তা সে মুরলীর কাছে গোপন রাখে নি, গোপন রাখে নি তার প্রতিহিংসার ইচ্ছাকে। সুবল তার উপর আজও যে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে নি, হাতের বৈঠা কোন না কোন সময় তার মাথা লক্ষ্য করে যে মেরে বসে নি, মুরলী তাতে বিস্মিত হয়েছে। সুবলের ভাবখানা এই, মুরলী তার হাতের মুঠোর ভিতরেই যেন আছে, যে-কোন সময়ে তাকে টিপে মারলেই হবে। সত্যি সত্যি না মেরে মারবার ভয় দেখিয়ে মুরলীকে মেরে রাখার দিকেই যেন তার ঝোঁক বেশি। চলতে ফিরতে শুতে বসতে কখনো

যেন মুরলী স্বস্তিতে থাকতে না পারে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত ত্রাসে আর শঙ্কায় যেন কাটাতে হয় মুরলীকে। কোন পথে, কোন পদ্ধতিতে, দিন রাতের কোন মুহূর্তে সুবলের প্রতিশোধ মুরলীর ওপর উদ্যত হয়ে উঠবে তা বুঝতে না পেরে মুরলী যেন সর্বদা ভীত আর বিহ্বল হয়ে থাকে।

সুবলের চলাফেরা এবং চোখ-মুখের ভঙ্গি দেখে নবদ্বীপও যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে তা মুরলী জানে।

সেদিন গঞ্জ থেকে ফিরে এসে নবদ্বীপ তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়েছিল।

হুঁকো টানতে টানতে হঠাৎ যেন একটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে এমনি ভঙ্গিতে ছেলেকে বলেছিল নবদ্বীপ, 'এখানে থেকে আর দরকার নেই তোর, বিনিগদিতে চলে যা।'

বিনিগদি এখান থেকে বিশ ক্রোশ দূরে, অন্য মহকুমার মধ্যে, নাম-করা গঞ্জ। পাইকারী দরে তামাক কিনবার জন্য সেখানে নবদ্বীপের ছোট একটি আড়ত আছে। বার মাস একজন কর্মচারী থাকে, মাল কেনে, চালানের ব্যবস্থা করে, দরের ওঠানামা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখে নবদ্বীপকে।

মুরলী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন, বিনিগদি যাব কেন!'

নবদ্বীপ জবাব দিয়েছিল, 'ব্যবসাবাণিজ্য দেখবার জন্য নয়, তোর নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য। যে-সব কেলেঙ্কারির কথা শুনছি তাতে কোন দিন যে অপঘাত-টপঘাত—। তার চেয়ে বিনিগদিতে গিয়ে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকাই ভালো। সুবল যে রকম গোঁয়ার—'

এরপর পিতা-পুত্র দুজনেই পরস্পর মুহূর্তকাল অদ্ভুত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

একটু চুপ করে থেকে মুরলী জবাব দিয়েছিল, 'সেজন্য আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। অপঘাতেই যদি মরি তাতেই বা আপনার ক্ষতি বৃদ্ধি কি।'

হুঁকোয় টান দিতে দিতে নবদ্বীপ শান্তভাবে বলেছিল, 'সে কথা ঠিক।'

মুরলীর ছোট ডিঙিখানা যখন প্রায় নিঃশব্দে সুবলদের ঘাটে এসে ভিড়ল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। খানিকক্ষণ কান খাড়া করে রইল মুরলী। আলতার মার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ছোট একটা কলসী নিয়ে মঙ্গলা ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে দেখতে পেল মুরলী। আনন্দে আর উত্তেজনায় বুকের রক্ত যেন উত্তাল হয়ে উঠল তার।

ঘাটে এসে থমকে দাঁড়াল মঙ্গলা, অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'তুমি!'

মুরলী বলল, 'হ্যাঁ।'

এই দুটি অনাবশ্যক শব্দ বিনিময়ের পর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, যেন পৃথিবীর আর সমস্ত কথাই তাদের কাছে নিরর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে।

একটু পরে মুরলী জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ?'

মনে হলো মঙ্গলা যেন একটু হাসল, বলল, 'খুব ভালো।'

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুরলী বলল, 'তাহলে যাই এবার?'

মঙ্গলার হাসি এবার স্পষ্ট অনুভূত হলো। সুমিষ্ট তরল কণ্ঠে মঙ্গলা বলল, 'অভিমান হলো বুঝি। যাবে কেন, ঘরে এস।'

মুরলী বিস্মিত না হয়ে পারল না। কোনদিনই এত নিঃসঙ্কোচে এমন বিনা দ্বিধায় সরাসরি তাকে ঘরে যেতে বলে নি মঙ্গলা। ঘনিষ্ঠতম পরিচয়ের সান্নিধ্যের পরেও নয়। আজ হঠাৎ এমন নির্ভীক হল কি করে মঙ্গলা, এত সাহস তার এল কোত্থেকে!

মাটির দীপটি নিবু নিবু করে জ্বলছিল ঘরের মধ্যে। মঙ্গলা সলতেটা একটু সামনের দিকে সরিয়ে এনে উজ্জ্বল করে দিল।

মুরলী একটু শঙ্কিত হয়ে উঠে বলল, 'ওকি করছ?'

মঙ্গলা অদ্ভুত একটু হাসল, 'ভয় করছে না কি তোমার! করে তো করুক। যা হবার হক লুকোচুরি করতে আমি আর পারব না।'

মুরলী বলল, 'লুকোচুরি করবার আর জোও তো নেই।'

তার দৃষ্টি লক্ষ্য করে মঙ্গলার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। চোখ নামিয়ে বলল, 'লোকে যে তোমাকে খারাপ বলে সে কথা মিথ্যা নয়।'

মুরলী বলল, 'তা হবে, কিন্তু সত্যই তোমাকে আজ অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে মঙ্গলা!'

মঙ্গলা আড়চোখে একবার মুরলীর চোখের দিকে তাকাল। মুরলীর মুগ্ধ কণ্ঠ আর মুগ্ধ চোখে যেন একই কথা উচ্চারণ করছে। মঙ্গলার মনে পড়ল অন্য দুটি চোখের কথা। মুগ্ধতা নয়, মাধুর্য নয়, সেই দুটি চোখ থেকে কেবল দুঃসহ ঘৃণা আর বিদ্বেষের আগুন জলে উঠেছিল, সে আগুন তাকে এখনো দগ্ধ করে চলেছে। কিন্তু আজ আর কোন ক্ষোভ নেই মঙ্গলার; কোন দুঃখ নেই। সমস্ত জালা যেন আজ তার প্রশমিত স্নিগ্ধ হয়ে গেছে। পৃথিবীতে কেবল অগ্নিবর্ষী চোখই নয়, কেবল ঘৃণা-নিন্দা ব্যঙ্গ-শ্লেষের ঘোলাটে চোখই নয়, আরও দুটি চোখ তার জন্য রয়েছে, যারা মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দিকে তাকিয়ে

তৃপ্তি আর মাধুর্যে অন্তর পূর্ণ করে নেয় এমন একটি পুরুষ পৃথিবীতে আজও তার জন্য আছে।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকার পর মুরলী বলল, 'লুকোচুরি করতে আমিও চাই নে। চল চলে যাই এখান থেকে।'

মঙ্গলার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল, 'চলে যাব কোথায় বল তো?'

মুরলী বলল, 'যে কোন জায়গায়। কিন্তু এখানে আর নয়। এই নিন্দা-অপমান ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে এক মুহূর্তও আমি আর তোমাকে থাকতে দেব না। এখানে তুমি বাঁচবে না মঙ্গলা। এখান থেকে তোমাকে আমায় সরিয়ে নিতেই হবে।'

গভীর আবেগে মুরলীর গলা রুদ্ধ হয়ে এল।

কিন্তু এর জবাবে অত্যন্ত তরল লঘুকণ্ঠে বলে উঠল মঙ্গলা, 'কিসে করে সরাবে বল দেখি। তোমার ঐ ডিঙি নৌকায় কি দুজনে আমরা ধরব? বড় বড় নদীনালা পার হতে পারব ওতে করে?'

মঙ্গলার এই লঘু ভঙ্গিতে অত্যন্ত আহত হলো মুরলী। বলল, 'যাওয়ার তোমার যদি মত থাকে মঙ্গলা, তাহলে ডিঙির বদলে ঘাসী নৌকার ব্যবস্থাও যে হতে পারে তা তুমি জান। আর মনের যদি জোর থাকে, তেমন যদি তেজ থাকে মনে, তাহলে ডিঙি ছাড়া দুজনে কেবল সাঁতরেও তো পারাপার হতে পারি।'

তরল এক ঝলক হাসি যেন উছলে উঠল মঙ্গলার দুই ঠোঁটে, 'না মুরলী ঠাকুরপো, তুমি পারলেও আমি পারব না। এ অবস্থায় সাঁতরাতে গেলে ডুবে মরতে হবে।'

মুরলী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর ক্ষুব্ধ আহত কণ্ঠে বলল, 'তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে চাও না। তুমি ভেবেছ তোমাকে ডুবে মরতে দিয়ে আমি সাঁতরে উঠে আসব।'

মঙ্গলা তরল কণ্ঠ অকস্মাৎ ভারি গভীর শোনাল, 'ছিঃ! মুরলী ঠাকুরপো। তা নয়, অবিশ্বাস তোমাকে আর আমি এক ফোঁটাও করি নে। কিন্তু তোমার বউ রয়েছে, মেয়ে রয়েছে, কারবার বিষয় সম্পত্তি রয়েছে তোমার বাবার। কেবল আমার জন্যই এসব তুমি ছেড়ে আসবে কোন দুঃখে।'

মুরলী ম্লান একটু হাসল, 'নিজের জন্য একটুও আমার দুঃখ নেই মঙ্গল বউঠান, কিন্তু সব ছেড়ে আসতে তোমারই বোধ হয় দুঃখ হচ্ছে।'

হঠাৎ মঙ্গলা দুই ঠোঁটের উপর তর্জনীটা চেপে ধরে অস্ফুট স্বরে বলল, 'চুপ।'

তারপর এক মুহূর্ত কান খাড়া করে থেকে বলল, 'তুমি যাও, এক্ষুনি যাও।

ওরা আসছে, ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে। খালের মুখ থেকে বৈঠার শব্দ পাচ্ছি, তুমি আর দেরি কর না।'

মুরলীও বলল, 'আসে তো আসুক। লুকোচুরি আমারও আজ ভালো লাগছে না মঙ্গলা। জীবন ভরে তো কেবল লুকোচুরিই করলাম।'

কিন্তু শেষের কথাগুলিতে মোটেই যেন কান দিল না মঙ্গলা, দ্রুতকণ্ঠে বলল, 'তোমার কি মাথা-খারাপ হয়েছে! শিগগির ওঠ, শিগগির। ডিঙি নিয়ে এক্ষুনি বাঁশ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে চলে যাও।'

মুরলী বলল, 'না।'

শঙ্কিত ভাবে হঠাৎ মুরলীর দুখানি হাত ধরে মঙ্গলা ব্যাকুল স্বরে বলল, 'না নয়, মুরলী ঠাকুরপো, মাথা খাও কথা শোন আমার, ওঠ—ডিঙি নিয়ে এক্ষুনি চলে যাও।'

দুহাত ধরে মুরলীকে জোর করেই যেন তুলে দিল মঙ্গলা। ভেজান দরজার পাল্লা খুলে দিয়ে কাতর স্বরে ফের বলল, 'আর দেরি কর না, কথা শোন আমার।'

মুরলী বলল, 'কিন্তু তুমি—'

মঙ্গলা বলল, 'আমার কথা পরে বলব, শিগগির—'

ডিঙিতে উঠে অন্ধকারের মধ্যে বৈঠার খোঁচ দিতে দিতে মুরলী ভাবল, এবার তার বাপের কথাতেই রাজী হয়ে যাবে সে। থাকবে গিয়ে সেই বিনিগদির গঞ্জে। এখানে বসবাসের সমস্ত প্রয়োজন যেন তার শেষ হয়ে গিয়েছে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই সুবলের ডিঙি এসে ঘাটে ভিড়ল। ধক করে উঠল মঙ্গলার বুক।

একটু একটু বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হাতের বড় শাল কাঠের বৈঠাখানা ঠক করে দাওয়ার বেড়ায় ঠেকিয়ে রেখে ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল সুবল।

মাটির দীপ তেমনি জ্বলছে। দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে মঙ্গলা।

ঘরে ঢুকে সুবল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মঙ্গলার দিকে তাকাল, রূঢ় কর্কশ স্বরে বলল, 'নাগর বুঝি আজও এসেছিল তোর?'

একটু ঢোক গিলে মঙ্গলা বলল, 'ও ছাড়া বুঝি আর কোন কথা নেই তোমার?'

সুবল হঠাৎ দুহাতে মঙ্গলার দুই বাহুমূল চেপে ধরে দেহের সমস্ত শক্তিতে প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'কথার অত ঘোরপ্যাঁচ আমি শুনতে চাই নে। সত্যি করে বল, এসেছিল কিনা?'

মঙ্গলা বলল, 'এসেছিল।'

সুবল দৃঢ় মুষ্টিতে মঙ্গলার দুটো কাঁধ ধরে রেখে তীব্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এমন স্পষ্ট কথাই চাই আমি।'

তারপর আস্তে আস্তে স্ত্রীর বাহুমূল থেকে নিজের বজ্রমুষ্টি শিথিল করে এনে মঙ্গলার দিকে তাকিয়ে সুবল অদ্ভুত একটু হাসল, 'ভেবেছিলি, এখনিই বুঝি গলা টিপে ধরব। খুব ভয় হচ্ছিল না?'

মঙ্গলা বলল, 'গলা টিপে তুমি যে কোন সময়ই ধরতে পার, কিন্তু তা বলে ভয় হবে কেন আমার?'

আগেকার সেই জেদ, সেই তেজ মঙ্গলার মনে যেন আবার ফিরে এসেছে। বাঁশের ছিটে কঞ্চির মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে। সুবল তাকে ভেঙে ফেলতে পারে, কিন্তু নোয়াতে কিছুতেই পারবে না।

সুবল সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীকে এবার ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা যা। সাহসের বহর কতখানি সময়কালেই দেখব।'

আজও নিঃশব্দে মঙ্গলা রান্নাবাড়া সারল, খেতে দিল স্বামীকে, সামান্য কিছু নিজেও খেয়ে নিল, তারপর পান মুখে দিয়ে মেঝেয় আলাদা একটা বিছানা করে শুয়ে পড়ল। সুবল চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল স্ত্রীকে। সে দৃষ্টিতে কোন মোহ নেই, স্নেহ নেই, সহানুভূতি নেই। নিতান্ত নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে সুবল কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মঙ্গলার দিকে। কিন্তু সেই নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। চেয়ে থেকে থেকে তীব্র ক্রোধে আর হিংসায় চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল সুবলের, জ্বলে যেতে লাগল বুকের মধ্যে। একই ঘরের ভিতর একই চালার নিচে থেকেও মঙ্গলা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে তার কাছ থেকে, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

এই ভালো। কাছে থাকলেও সুবল তাকে স্পর্শ করতে পারত না। ছুঁতে গেলে গা ঘিনঘিন করত। এমন কি, ভিন্ন বিছানার মধ্যে মঙ্গলার শিথিল অবসন্ন দেহভার সুবলের কাছে দুঃসহ রকমের অশুচি আর অপবিত্র মনে হতে লাগল। এই ঘরে তার উপস্থিতিটুকুও যেন সুবল আর সহ্য করতে পারবে না। মঙ্গলার মৃদু শ্বাসপ্রশ্বাসেও যেন ঘরের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠবে।

অথচ একদিন দুদিন নয়, আঠার বছর ধরে দিনের পর দিন মঙ্গলা এই ঘরের মধ্যে তার পাশে পাশে রয়েছে। তার গায়ের গন্ধে ভরে উঠেছে ঘরের বাতাস, পায়ে পায়ে রূপার মল ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে। ঘুম ভাঙবার পরেও চোখ বুজে উৎকর্ণ হয়ে

সেই মদের শব্দ শুনেছে সুবল। তারপর কওয়া নেই, বলা নেই, মঙ্গলা একদিন ছিঁড়ে ফেলল সেই মদের তোড়া। বলল, 'মদ উঠে গেছে। তখন কত হবে তার বয়স, দশ-এগারোর বেশী নয়। সুবলের মনে পড়ল সেই বয়স থেকেই কি রকম ঝগড়াই না করত মঙ্গলা। সুবলই ইচ্ছা করে ঝগড়া বাধাত। আম-জামের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করত, দুধের সর চুরি করেছে বলে মিথ্যা বদনাম দিত বউয়ের। রেগে চটে মঙ্গলা অস্থির হয়ে উঠত, অস্থির করে তুলত স্বামী আর শাশুড়ীকে। গায়ের রাগে চুল ছিঁড়ত নিজের, দাঁতে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলত নতুন শাড়ির পাড়। সুবল দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখত আর হাসত। আসল ঝগড়ার বদলে বানানো ঝগড়া এমন মধুর ছিল তখন। সুবলের মা বউয়ের পক্ষ নিয়ে ছেলেকে ধমকাত, বকত। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিত বউয়ের।

তারপর এমন দিনও এসেছে যখন বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে সুবলের মাকে চোখের জল ফেলতে হয়েছে। সুবল দিনের বেলায় মার পক্ষ নিয়ে বউকে বকত, গাল দিত অশ্লীল ভাষায়, এমন কি মারধোরও করত কোন কোনদিন। কিন্তু রাত্রে মতিগতি একেবারে উল্টে যেত সুবলের। নিজে যেচে শতবার করে অপরাধ স্বীকার করত, গায়ে পিঠে পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিত, বউকে খুশী করবার জন্য মায়ের অসংখ্য রকম নিন্দা আর বদনাম শোনাত তার কানে কানে। সুবলের অনুশোচনার ভঙ্গি দেখে মঙ্গলা শেষ পর্যন্ত না হেসে পারত না। স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলত, 'থাক, আর পাপ বাড়িও না আমার।'

কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। আজ আর কোন পাপের ভয় নেই মঙ্গলার। সুবলের পৌরুষকে সে যেন দুপায়ে মাড়িয়ে থেঁতলে দিয়েছে। এত জেদ, এত স্পর্ধা মেয়েমানুষের! ধিক্কারে গ্লানিতে সমস্ত মন ভরে উঠল সুবলের। ছি ছি ছি! আজ স্বামীর ঘরের মধ্যে পরপুরুষকে ডেকে আনে মঙ্গলা, শুধু আড়াল রাখে চোখের। কিন্তু দুদিন বাদে তার সন্তান যখন এই ঘরের মধ্যেই নড়ে চড়ে বেড়াবে তখন সেই আড়ালটুকুও আর থাকবে না। সুবলের চোখের সামনেই তাকে আদর করবে, সোহাগ করবে মঙ্গলা, নাওয়াবে খাওয়াবে ঘুম পাড়াবে, বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমু খাবে অসংখ্যবার, তারপর হয়ত এক সময় সুবলের কোলের ওপর ঝুপ করে বসিয়ে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসবে। বুকের ভেতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে সুবলের, কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বলতে পারবে না, পাছে পাড়াপড়শীর কারও কানে যায়। ছি ছি ছি! এত ভীরু এতই কি কাপুরুষ সুবল যে দিনের পর দিন নিজের মনের মধ্যে এই অনাচার সে সহ্য করবে, জীবন-

তবে এই অশুচি, অন্যের উচ্ছিষ্ট অস্পৃশ্যা এক নারীদেহকে নিঃশব্দে বয়ে বেড়াবে ? রক্ত কি এমনই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সুবলের, বুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি এমনই অসাড় আর পঙ্গু হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য ? অদ্ভুত এক বিদ্বেষ আর আক্রোশে হাতের মুঠি বজ্রের মতো কঠিন হয়ে উঠল সুবলের, বুঝি তার চেয়েও নির্মম হয়ে উঠল হৃদয়।

ঘুম মঙ্গলার চোখেও আজ ছিল না। অন্ধকারে চুপচাপ ঘুমের ভান করে শান্ত ভাবে পড়ে থাকলেও নানা উল্টোপাল্টা অসংলগ্ন ভাবনায় মন তার উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। কেবল আলাদা বিছানা নয়, সুবলের কাছ থেকে সে যেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে। বছরের পর বছর এই মানুষটির সঙ্গেই যে সে একটানা ঘর-সংসার করেছে তা যেন আর বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না মঙ্গলার। কোন বন্ধন নেই, কোন আকর্ষণ নেই, স্বামীর কাছ থেকে জ্বলন্ত ঘৃণা আর বিদ্বেষ ছাড়া মঙ্গলা আর কিছু আশা করতে পারবে না জীবনে। যা ঘটেছে এর পর সুবল আর তাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না, বিশ্বাস করতে পারবে না, ভালোবেসে নিজের কাছে ডেকে নিতে পারবে না। মঙ্গলা নিজেই কি ফিরে যেতে পারবে ? তবু দিনের পর দিন বছরের পর বছর এই ঘরের মধ্যেই কাটাতে হবে মঙ্গলাকে। সুবলের দুচোখের আগুন তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করবে, তার প্রতিটি কথা বিষ ঢেলে দেবে কানের মধ্যে। দিন রাত ছটফট করে মরবে মঙ্গলা, তবু সত্যি সত্যি মরতে পারবে না। কেন, মৃত্যু কি এর চেয়েও ভয়ঙ্কর ! এই জীবনের চেয়েও দুঃসহ ?

কিন্তু, যে আসছে তার মুখ না দেখেই মরবে ? এতকাল ধরে গোপনে গোপনে যার প্রতীক্ষা করছে, মনে মনে হাজার রকমে যার চেহারা গড়ে তুলেছে, তাকে একবার চোখের দেখা না দেখেই চোখ বুজবে মঙ্গলা ? কেমন হবে তার হাত-পার গড়ন, কেমন হবে রঙ, কেমন হবে মুখের ডৌল তো একবার নিজের চোখে দেখে যাবে না ? কেন মরবে মঙ্গলা, কার ভয়ে, কিসের দুঃখে ? সুবল না ডাকুক, আর একজন তো আজ সন্ধ্যায় তাকে ডাক দিয়েছিল। ডিঙি এনে বেঁধেছিল ঘাটে। সে ডিঙিতে যে-কোন মুহূর্তেই তো উঠে বসতে পারে মঙ্গলা, ভেসে যেতে পারে যেদিকে দুচোখ যায়। তারপর কোথাও না কোথাও, কোন না কোনদিন সে ডিঙি আর এক ঘাটে এসে ভিড়বেই। ঘাটের পাড়ে বাঁধা হবে এমনি ঘর, আঙিনায় লাউ কুমড়োর মাচা এমনি খাড়া হয়ে উঠবে, চার পাশে থাকবে এমনি

পাড়াপড়শীর দল, তাদের মধ্যেও এমনি আদর, এমনি সম্মান আর শ্রদ্ধার পাত্রী হবে মঙ্গলা আর তাদের মধ্যেও এমনি মাতব্বরি করবে মঙ্গলার স্বামী।

স্বামী! কথাটা মনে হতেই মঙ্গলার সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। ছি ছি ছি! না না না, মুরলী কোনদিন মঙ্গলার স্বামী হতে পারে না। ভাবতে যেন কেমন লাগে, কেমন যেন বিসদৃশ শোনায় কথাটি।

কিন্তু নিজের মনোভাবে পরক্ষণে নিজেরই হাসি পেল মঙ্গলার। যত অদ্ভুত আর যত বিসদৃশই শোনাক, এর পর থেকে স্বামী বলে স্বীকার করতে হবে মুরলীকে। কোন জানাশোনা চেনা জায়গায় তো তা সম্ভব হবে না, তার জন্য খুঁজে নিতে হবে অচেনা অজানা এক দেশ, মুখ-না-চেনা, নাম-না-জানা, মানুষের দেশে ঘর বাঁধতে হবে তার জন্য। ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে হবে পাছে লোকে তাদের চিনে ফেলে, পাছে দুজনের আসল সম্পর্ক তাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। সেজন্য সতর্ক হয়ে থাকতে হবে সব সময়। কিন্তু সহস্র সতর্কতা সত্ত্বেও একদিন যদি সেকথা বেরিয়ে পড়ে, মঙ্গলার নিজের ছেলেরই যদি কানে ওঠে একদিন সেকথা।—তাহলে? তাহলেও কি ছেলের মুখের দিকে তাকাতে পারবে মঙ্গলা, তাহলেও কি ছেলে তার মুখ দেখবে, মধুর কণ্ঠে মা মা বলে ডাকবে মঙ্গলাকে? গ্লানি আর অপমানের যে কালি এখন থেকেই তার মুখে মাখিয়ে রেখেছে মঙ্গলা, এর পরেও কি সে মুখ দুচোখ মেলে মঙ্গলা দেখতে পারবে? মুখ দেখাতে পারবে না বলে আজ মঙ্গলা স্বামীর কাছ থেকে পালাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে আবাল্যের পরিচিত পাড়াপড়শীদের কাছ থেকে, সেদিন নিজের সন্তানের কাছ থেকে ফের পালিয়ে আসতে হবে। এই পালাবার পালা একবার যদি শুরু করে মঙ্গলা, জীবনে তা আর শেষ করতে পারবে না! তার চেয়ে এমন ভাবে কি পালান যায় না যার শুরুতেই শেষ? এক অদ্ভুত মাদকতায় মঙ্গলার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সেই ভালো, সেই ভালো। সেখানে পাড়াপড়শীর নিন্দা অপবাদ তেরছা চাউনি আর বাঁকা বাঁকা কথা নাগাল পাবে না মঙ্গলার, সুবলের অগ্নিবর্ষী চোখ মিথ্যাই তাকে খুঁজে মরবে, সকলের অলক্ষ্যে কেবল একজনের চোখ কেবল ছলছল করে উঠবে, দামী পালঙ্কে সযত্নে পাতা পুরু আর নরম বিছানায় রূপসী স্ত্রীকে পাশে নিয়ে শুয়েও তার সেই ছলছল করা চোখ থেকে জলের ধারা রাতের পর রাত নিঃশব্দে নামবে। তার কথা ভেবে মৃত্যুতেও সুখ মঙ্গলার, মৃত্যুতেই সুখ।

'মঙ্গলা!'

সুবলের গলা শুনে মঙ্গলা চমকে উঠল। কিন্তু সাড়া দিল না। এ যেন আর

কারও গলা। এমন মোলায়েম স্বরে অনেককাল মঙ্গলাকে ডাকে নি সুবল! হঠাৎ কি হল তার। মন না বদলালে কি মানুষ এমন করে স্বর বদলাতে পারে।

আরও বার দুই ডাক শুনবার পর মঙ্গলা মৃদুকণ্ঠে সাড়া দিয়ে বলল, 'বল'।

সুবল তেমনি শান্ত মধুর স্বরে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি ?'

মুহূর্তকাল চুপ করে রইল মঙ্গলা, তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'হ্যাঁ।'

সুবল মনে মনে হাসল। একবার যদি মিথ্যাচার শুরু করে মেয়েমানুষ, ভুলেও সে আর সত্যের ধার দিয়ে যায় না। কারণে অকারণে অসত্য আপনিই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। তার জন্য চেষ্টা করতে হয় না সব সময়।

কিন্তু সুবল তো মেয়েমানুষ নয়। তাই খানিকক্ষণ তাকে একটু চেষ্টা করতে হল, মনে মনে বেশ গুছিয়ে নিতে হল কথাগুলি। সুবল বলল, 'আমিও ঘুমিয়েছিলাম। কিন্তু এই মাত্র অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম।'

মঙ্গলা বলল, 'কি স্বপ্ন!'

তেমন যেন ঔৎসুক্য আর আগ্রহ ফুটে উঠল না মঙ্গলার গলায়। কিন্তু সুবল ভ্রূক্ষেপ করল না, বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বলল, 'দেখলাম, তুই আর আমি আমাদের ডিঙি নৌকোয় বুড়ো শেওড়াতলায় পুজো দিতে চলেছি।'

মঙ্গলা চুপ করে রইল।

সুবল বলে চলল, 'স্বপ্ন দেখব তার আর আশ্চর্য কি। মা তো মানত করেই ছিলেন। পাঁচ সাত দশ ক্রোশের মধ্যে কোন দেবদেবতা আর ফকির-দরবেশ তো তাঁর বাকি ছিল না। কিন্তু শেওড়াতলার বুড়োবাবার কাছে আমি নিজে যে কিছুদিন আগেও মানত করে রেখেছিলাম একথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

মঙ্গলা আস্তে আস্তে বলল, 'কিসের জন্য ?'

সুবল মধুর ভঙ্গিতে বলল, 'আঃ, কিচ্ছু যেন জানিস না! কিসের জন্য আবার, ছেলের জন্য।'

অন্ধকারে সমস্ত মুখ মঙ্গলার আরক্ত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যে লজ্জায় কোন কথাই বেরুল না তার মুখ দিয়ে। একটু বাদে মঙ্গলা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, 'কিন্তু তা তো তোমার এখনো হয় নি।'

'তোমার' কথাটা খচ করে কানে বাধল সুবলের। কেবল মিথ্যাই নয়, নির্মম নিষ্ঠুর সত্যও মেয়েমানুষের মুখ থেকে অজান্তে অনায়াসে বেরিয়ে আসে। তারা জানতেও পারে না, ভ্রূক্ষেপও করে না তাদের মুখের কথা কত তীক্ষ্ণ! আর একজনের বুকে তা কত নৃশংস ভাবে গিয়ে বিদ্ধ হতে পারে।

ঠাণ্ডা মেজাজটা আর রাখতে পারল না সুবল, কঠিন শ্লেষে জবাব দিল, 'আহা আমার না হয় নাই হল, তোর তো হতে যাচ্ছে। এমনই বা কজনের হয়। এর জন্যও তো মানত পূজোটা আমাদের দিয়ে আসা দরকার। বিপদ আপদের কথা বলা তো যায় না।'

মঙ্গলা স্তব্ধ হয়ে রইল। খানিক আগের কণ্ঠের মধুরতা তাহলে ভান, ওটা কেবল সুবলের গলারই, মনের নয়। এরপর এরকমই হবে, এমনি চলবে। বিনা কারণে কথায় কথায় সেই কথাটা খুঁচিয়ে তুলবে সুবল, একমুহূর্তও সে স্থির থাকতে দেবে না, ভুলে থাকতে দেবে না। তবুও কি বেঁচে থাকতে হবে মঙ্গলাকে? অসহায়ের মতো মুখ বুজে প্রতি মুহূর্তে এমনি করে সবকিছু সহ্য করতে হবে তাকে? সুবল তাকে অনাহারে রাখবে না, কিন্তু প্রতিটি গ্রাসের সঙ্গে তার এই কুৎসিত শ্লেষের বিষ মিশিয়ে দেবে। সুবল তাকে ঘরেই ঠাঁই দেবে, মুখ ফিরিয়ে নেবে না, বরং রোজ দুবেলা তার মুখোমুখিই দাঁড়াবে, মঙ্গলার মুখে থুথু ছিটিয়ে দেওয়ার জন্য। মঙ্গলা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারবে না, একটুও আপত্তি করতে পারবে না, কারণ অপরাধ তারই, আর সেই অপরাধের জন্য দুঃসহ শাস্তি জীবনভর কাছে থেকে তার মাথা পেতে নিতে হবে। এর পরও কি বেঁচে থাকতে চায় মঙ্গলা, বেঁচে থাকতে পারে! কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবল মঙ্গলা, তারপর তার কণ্ঠে যেন অপূর্ব এক উৎসাহের জোয়ার নেমে এল।

মঙ্গলা বলল 'ঠিক বলেছ, বিপদ আপদের কথা কিছু বলা যায় না, ছেলে হওয়ার সময়ও তো মরে যেতে পারি, বেশি বয়সে এ সব হলে নাকি তার খুবই আশঙ্কা থাকে। বাবা যখন স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন চল দুজনে মিলে একটা ডাব-নারকেল অন্তত দিয়ে আসিগে সেখানে, ঘটা করে ঢাকঢোল পিটিয়ে পূজোটা না হয় পরেই দিও।'

ঠোঁট টিপে মঙ্গলা নিজের মনেই অদ্ভুত একটু হাসল।

কথাটা সুবলই তুলবে তুলবে করছিল। কিন্তু মঙ্গলা নিজেই কথাটা পাড়ায় সে ভারি কৌতুক বোধ করল। ওষুধ ধরেছে তাহলে। মৃত্যুর ভয়ই মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

সুবল জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাল। টিপ টিপ করে বৃষ্টি নেমেছে। বাতাস বইছে উল্টোপাল্টা। কে জানে কোথাও হয়ত তুমুল ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, সাইক্লোন হচ্ছে হয়ত, বন্যায় ভেসে যাচ্ছে না-জানি কতদেশ। সে বন্যা, সেই ঝড়

এখানে কি আসতে পারল না। কেবল তা কি সুবলের বুকের মধ্যেই তোলপাড় করতে থাকবে, বাইরে একবারও তার দেখা মিলবে না।

কি একটু চিন্তা করে সুবল বলল, 'কিন্তু বাইরে এখনো টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, শুনতে পাচ্ছিস ? সারারাত ধরে এমনি চলেছে, তবু আকাশটা পরিষ্কার হল না।'

মঙ্গলা বলল, 'ও, ওইটুকু বৃষ্টিতে কি হবে। ওর জন্য ভেব না, একটু বাদেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

সুবল বলল, 'তাহলে তাই চল, ছইটা তুলে নিচ্ছি ডিঙিতে। ছইয়ের তলায় দিব্যি আরামে বসে বসে যাবি। বৃষ্টির একটা ফোঁটাও গায়ে লাগবে না। এ আমার নিজের হাতের বাঁধা ছই। সেই ভালো মঙ্গলা স্বপ্ন যখন দেখলাম, বুড়োকে আজই গিয়ে প্রণামটা সেরে আসি, এরপর কবে সময় হয় না হয়, দোষ ফুরিয়ে রাখা ভালো। রাত প্রায় ভোর ভোর ভোর হয়ে এল। বেতীবাগের শেওড়াতলা আর কতটুকুই বা পথ। মাত্র দুটো বাঁক ঘুরলেই তো গিয়ে পৌঁছব। তারপর রোদ উঠতে উঠতে ফিরে আসব দুজনে, কেউ জানতেও পারবে না।'

মঙ্গলারও মনে হল, ঠিকই বলেছে সুবল। এইই যথার্থ সময়। কেউ জানতে পারবে না, কারো চোখে পড়বার ভয় নাই। তারপর যা হয় হবে, মঙ্গলা আর দেখতে আসবে না।

বৃষ্টির জলে ডিঙি প্রায় ডুবুডুবু হয়ে রয়েছে। সুবল উঠে গিয়ে জল সেঁচে ফেলল নৌকার। ছোট ছইখানা মাথায় করে বয়ে নিয়ে ডিঙির ওপর রেখে দিল, মঙ্গলাও ততক্ষণে তৈরী হয়ে নিয়েছে। বাসি কাপড় ছেড়ে পরেছে সেই লাল পেড়ে গরদের শাড়ি। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে মোটা রেখায়, কপালে সুগোল করে দিয়েছে আলগা সিঁদুরের ফোঁটা। ছোট্ট পিতলের রেকাবিতে একটু রক্তচন্দন, কয়েকটা ঝুমকো জবা আর বেলপাতাও তুলে নিয়েছে, শেওড়াতলায় পূজা দিতে যাচ্ছে সে স্বামীর সঙ্গে। ভরা কলসিটির সামনে দাঁড়িয়ে মঙ্গলা একটু ইতস্তত করল। কোন ছলে এটাও কি সঙ্গে নেবে ? পরে ভাবল দরকার নেই। এই ভরা বর্ষায় যে স্রোত চলেছে খালে তাতে হাতীকে পর্যন্ত ভাসিয়ে নিতে পারে। শেওড়াতলায় যেতে একটা ঘোলাজলের ঘুর্ণিও পড়বে পথে, মঙ্গলার মনে পড়ে গেল। তাতেও যদি না কুলোয় শেষ সম্বল মঙ্গলার মনের জেদ আর শাড়ির আঁচল তো সঙ্গেই রইল।

সুবল মঙ্গলার দিকে আড়চোখে একটু তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে

নিল। নিতান্ত মন্দ দেখাচ্ছে না তো? তা দেখাবেই বা কেন। বেশবাশে ভুলাবার স্বভাবটা ওরা মরলেও ছাড়ে না। এই ওদের আনন্দ, এই ওদের নেশা। কোন একজনকে ভুলাতে পারলেই ওরা খুশী। সে দেবই হক আর দুর্বৃত্তই হক। কিন্তু সুবল আর ভুল করবে না।

কোমর থেকে বড় একটা চাবি বের করে সুবল নৌকোর তালা খুলল, শিকলটা সশব্দে ফেলে দিল নৌকোর খোলের মধ্যে। ঝনঝন শব্দে একটু যেন চমকে উঠল মঙ্গলা, তারপর নিঃশব্দে গিয়ে বসল ছইয়ের ভিতর। ডাঙ্গায় বৈঠা দিয়ে জোরে একটা খোঁচা দিল সুবল, ডিঙি নৌকো নড়ে উঠে বেশি জলের দিকে ভেসে পড়ল।

কেবল ভোর-ভোর হয়েছে। বৃষ্টি আর পড়ছে না। কিন্তু আকাশের এমনি অবস্থা যে-কোন সময় প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামাতে পারে। সারাটা পাড়া যেন সংজ্ঞাহীনের মতো পড়ে আছে, কোন সাড়াশব্দ নেই। চারদিকে থই থই করছে জল, মাঝে এক একখানা বাড়ি সেই জলের মধ্যে টিলার মতো কোন রকমে ভেসে রয়েছে। অনন্ত সমুদ্রে যেন শান্ত ঘুমন্ত এক একটি দ্বীপ। অনন্ত মাস্টারের প্রাইমারী স্কুলের 'সরল ভূ-বিজ্ঞানে'র কথা সুবলের মনে পড়ল। কি চমৎকার ছিল সেই পাঠশালার ছেলেবেলার দিনগুলি। কেবল ভূ-বিজ্ঞানটা সুবলের ভালো লাগত না, কিছুতেই মুখস্থ হতে চাইত না সংজ্ঞাগুলি। মানচিত্রের সামনে বেত হাতে দাঁড়িয়ে পরীক্ষার সময় বেতের ডগার মতোই থরথর করে কাঁপত, একটা নগরও চোখে পড়ত না, সমুদ্রের মধ্যে সবগুলি দ্বীপ একসঙ্গে জড়িয়ে যেত, হারিয়ে যেত। হাতের বেত কেড়ে নিয়ে মাস্টারমশাই পিঠের ওপর সপাসপ চালাতেন। সুবল ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত।

এখন কিন্তু আর ভুল হয় না, এখন প্রত্যেকটি দ্বীপই সুবল স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে। এখন দ্বীপ দেখাতে বললে সে দেখিয়ে দেবে এখানকার মানুষগুলিকেই। দেখাবে নিজেকে, দেখাবে মঙ্গলাকে, দেখাবে মুরলী আর নবদ্বীপকে। সবাই স্বার্থ-পরতায় ঘেরা, স্বার্থচিন্তায় এক থেকে অন্যে বিচ্ছিন্ন। সে ভাবছে নিজের কথা, মঙ্গল ভাবছে তার কথা। এই ভাবনার সমুদ্র সাঁতরে একজন আর একজনকে ছুঁতে পারে না, ছুঁয়ে আসবার প্রবৃত্তিও নেই সুবলের। কত কাছে রয়েছে মঙ্গলা, তবু কত দূর দুরান্তরে। দুজনের মাঝখানে থই থই জল, তল নেই তার।

স্রোতের বেগ বাড়ছে নদীতে। বাতাসের ঝাপটা আসছে উল্টোপাল্টা। এখা-নেই হাল ছেড়ে দেবে নাকি সুবল। নৌকার মুখ চরকিবাজির মতো কেবল ঘুরবে আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে জল উঠবে ডিঙিতে, গাঙের সমস্ত জল তার নৌকার খোলে

এসে ঢুকবে। ভয়ে কি চেঁচিয়ে উঠবে মঙ্গলা। মুখে হাতখানা কিছুক্ষণ চেপে রাখলেই হবে। তারপর ডুবন্ত ডিঙির ছইয়ের ভিতর থেকে শত চেষ্টাতেও আর মঙ্গলা বেরুতে পারবে না। যত ছটফট করবে, যত হাত-পা নাড়বে, চুলেতে শাড়িতে তত জড়িয়ে যাবে। কিন্তু এখানে নয়, আসুক সেই ঘোলা জলের ঘুর্ণি। সেখানে আপনা থেকেই সব হবে। নিজের হাতে সুবলকে আর কিছুই করতে হবে না।

মঙ্গলাও অপেক্ষা করছে সেই আবর্তের। বেতীবাগের মেলায় নৌকায় করে যাতায়াতের পথে কতবার দেখেছে এই সর্বনাশা ভয়ঙ্কর ঘুর্ণি। অন্যসব মেয়ে দেখে চোখ ফিরিয়েছে, কিন্তু ঝুঁকে পড়ে অপলক চোখে ঘুর্ণির দিকে চেয়ে ছিল মঙ্গলা। চেয়ে চেয়ে দেখেছে ঘুর্ণ্যমান জলের কুণ্ডলী। যেন নীচে কেউ একজন অসহ্য যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করছে। কি হয় দেখবার জন্য মঙ্গলা কোন বার বা ফেলে দিয়েছে একটা সুপারি, কোন বার বা একটা নারকেল। সেগুলো পাকে পাকে জলের টানে কোথায় অতলে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তারপর বহু দূরে গিয়ে হয়ত ফের ভেসে উঠেছে। মা গঙ্গা, মঙ্গলাকে যেন আর ভেসে উঠতে না হয়।

সুবল কি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়বে তার পিছনে? বোধ হয় না। খানিকক্ষণ সে হয়ত অবাক হয়েই তাকিয়ে থাকবে, কি ঘটল কিছুই বুঝে উঠতে পারবে না। ততক্ষণে একেবারে অথৈ জলে তলিয়ে গেছে মঙ্গলা। তারপরেও কি সুবল লাফ দিয়ে পড়বে তাকে টেনে তুলবার জন্যে? তার ওপর এখনও কি এতই দরদ আছে সুবলের যে তার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে যাবে? বয়ে গেছে সুবলের। সুবল বরং রেহাই পাবে, নিষ্কৃতি পাবে চিরদিনের জন্য। কে জানে এই জন্যই সুবল তাকে টেনে এনেছে কি না। না হলে দেব-দ্বিজে হঠাৎ সুবলের ভক্তি এত প্রবল হয়ে উঠল। কেন যে এই বৃষ্টি বাতাসের মধ্যে শেওড়াতলার বুড়ো বাবাকে প্রণাম করবার জন্য স্ত্রীকে নিয়ে এমন ছোট্ট ডিঙিতে সে ভেসে পড়ল। এমন ভক্তি তো কই তার আর কোনদিন দেখা যায় নি। কে জানে কি মতলব আছে তার। কে জানে আরো কি ভেবেছে মনে, মঙ্গলার মতো একই কথা সে ভাবছে কি না তাই বা কে জানে। কিন্তু যাই ভাবুক, যার যত রকম মতলবই থাক সব মতলবকে আজ ভণ্ডুল করে দিয়ে যাবে মঙ্গলা। চিরকাল নিজের মতলব নিজের জেদ সে বজায় রেখেছে, আজও তাই রাখবে। তার ওপর দিয়ে আর কাউকে সে জিততে দেবে না।

ঠক করে কি একটা শব্দ হল হঠাৎ। চমকে উঠল মঙ্গলা, চমকে উঠল আত্মমগ্ন সুবল। দুজনেই সমস্বরে বলল, 'কি হল।' তারপর নিমেষের মধ্যে সুবল বুঝতে

পারল ব্যাপারটা। তলা ফুটো হয়ে নৌকার মধ্যে জল উঠছে বগবগ করে। না বুঝবার কিছু নেই। এদিক ওদিক দেখেই নৌকা বেয়ে চলেছিল সুবল। চোখা খুঁটো জলের মধ্যে উঁচু হয়ে ছিল। শুকনোর সময় এদিক দিয়ে যে সাঁকো বাঁধা হয়েছিল খালের এপার থেকে ওপারে, বোধ হয় তারই কোন জলমগ্ন খাড়া খুঁটির উপর উঠে পড়েছিল নৌকা। গাব আর আলকাতরার পোঁচ লাগালেও ডিঙির বহুকালের জীর্ণ তক্তাগুলি সে খোঁচা সহ্য করতে পারে নি।

দুহাতে বৈঠা টেনে পারের কাছে আসতে না আসতেই প্রায় ডুবু ডুবু হয়ে পড়ল। কত বড় ছেঁদা হয়েছে কে জানে। নৌকার সমস্ত খোলটা জলে ভরে গিয়েছে, পাটতনের তক্তাগুলো ভাসছে তার উপর। পিছনের শাড়ি ভিজে উঠেছে মঙ্গলার, আর হয়ত এক মুহূর্তও সইবে না। ছইয়ের ভিতর থেকে কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসে মঙ্গলা দু হাতে জড়িয়ে ধরল সুবলকে, অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে, 'ওগো বাঁচাও।'

অনেককাল পরে সুবলের সর্বাঙ্গ যেন আবার শিউরে সাড়া দিয়ে উঠল, কিন্তু মুখে কোন কথা ফুটল না।

বাতাসের ঝাপটা তেমনি উল্টোপাল্টা বয়ে চলেছে। স্রোতের টানে নৌকা কিছুতেই ঠিক রাখা যাচ্ছে না, এই ডুবন্ত নৌকাকে পারে নিয়ে যাওয়ার কোন আশাই আর নেই। বৈঠা ফেলে দিয়ে মঙ্গলাকে সুবল আঁকড়ে ধরল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন, সাঁতার তো একটু একটু জানিসই। আমার পিঠে সামান্য একটু ভর দিয়ে থাকতে পারবি না খানিকক্ষণ। এটুকু সাঁতরে যেতে কত সময়ই বা লাগবে।'

মঙ্গলা কোন কথা বলল না। আঠার মতো সে লেগে রয়েছে সুবলের দেহের সঙ্গে। সুবল ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে। জলের মধ্যে মানুষের ভার কমে যায়—এমন কি গর্ভিণী নারীকেও মনে হয় সোলার মতো হালকা।

রূপমঞ্জরী

হেমেন্দ্রনাথ মিত্র
কল্যাণীয়েষু—

প্রহর খানেক রাত হয়েছে কি হয়নি এরই মধ্যে বাঁশঝাড়ের আড়ালে সমস্ত পাড়ার বাড়িগুলি একেবারে নিঝুম হয়ে গেছে। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। জ্ঞাতি-ভাই ভুবনের পোড়ো ভিটা পেরিয়ে গগন ঢুলী নিজেদের উঠানে এসে দাঁড়াল। একবার তাকাল মেয়ের ঘরের দিকে। ঝাঁপ এঁটে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে মেয়ে। মনের রাগে একটু দাঁত কিড়মিড় করল গগন। তারপর নিজের ঘরের সামনে গিয়ে ক্লান্তস্বরে ডাকল, 'কই গো নন্দর মা ঝাঁপ খুলে দাও।'

ভারি পাতলা ঘুম লক্ষ্মীর। স্বামীর ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। পিঠ চাপড়ে ছেলেকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে কখন নিজেরও একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। তাড়াতাড়ি দিয়াশলাই-এর কাঠি জেলে দীপের সামনে ধরল লক্ষ্মী। কিন্তু সলতে রয়েছে একেবারে দীপের মধ্যে। নিবাবার সময় নিজেই লক্ষ্মী টেনে রেখেছিল। ফুঁ দিয়ে তো নিবাতে নেই তাতে অকল্যাণ হয় গৃহস্থের। সলতের মুখ পর্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতে পোড়াছাই কাঠি গেল নিবে। দুবারের বার লক্ষ্মী কাঠি ধরাতে যাচ্ছে, অসহিষ্ণু গগন ধমক দিয়ে উঠল বাইরে থেকে, 'বলি হল কি, মরে রয়েছিস নাকি ঘরের মধ্যে!'

গগনের ক্লান্ত গলা এবার কর্কশ আর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

পরমুহূর্তে দীপ জেলে ঘরের ঝাঁপ খুলে লক্ষ্মী দাওয়ায় নেমে মিষ্টিকণ্ঠে বলল, 'এসো।'

ভারি ঠাণ্ডা মেজাজ লক্ষ্মীর। বকে ধমকে গালাগালি দিয়ে সহজে তাকে রাগানো যায় না।

কিন্তু গগনের রাগ তখনও পড়ে নি। 'এতক্ষণে ঘুম ভাঙল বুঝি! বলি ঘুমিয়ে-ছিলি না মরেছিলি?'

প্রৌঢ় স্বামীর গালাগাল শুনলে আজকাল আর দুঃখ হয় না লক্ষ্মীর, বরং মুশকিল হয় হাসি সামলানো নিয়ে। রাগের সময় লক্ষ্মীর মুখে হাসির আভাস দেখলে গগন ভারি চটে যায় আর গগন যত চটে লক্ষ্মীরও হাসি পায় তত বেশি। এখনও ঠোঁট টিপে হাসি চাপল লক্ষ্মী তারপর বলল, 'কি যে বল, মরব কেন! ভিন গাঁয়ে গেছে ঘরের মানুষ এতখানি রাতেও ফিরছে না, তার জন্য ভাবনা চিন্তা নেই

শরীরে যে মরব! গাল দিয়ো পরে। আগে খবর শুনি। যে জন্য গেছলে তার কি হল বল। পেলে নাকি সনাতনের দেখা?'

দাওয়ায় উঠে বিরস মুখে তামাক সাজতে বসল গগন। তারপর কর্কশ স্বরে বলল, 'না না। পেলে তো বলতামই। গাঁয়ে নেই সনাতন। বায়না পেয়ে বাজাতে গেছে হরলালের দলের সঙ্গে।'

লক্ষ্মী এবার শঙ্কিত হয়ে বলল, 'তাহলে উপায়! তোমার বায়নার কি হবে?'

হুঁকো টানতে টানতে গগন উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'ন্যাকামি করিসনি মাগী! কি হবে জানিস নে? বেকুব বেল্লিক বনতে হবে লোকের কাছে, বেইজ্জৎ হতে হবে।

গগন জোরে হুঁকোয় আরও কয়েকটা টান দিয়ে বলল, 'কিন্তু এর শোধ আমি না তুলে ছাড়ব না বলে দিচ্ছি। যাদের জন্যে আমাকে মুখ হারাতে হল তাদের মুখ আর আমি ভোরে উঠে দেখব না। রাত পোয়াতে না পোয়াতে যেন ওরা আমার ভিটে ছেড়ে চলে যায়। ভরত ঢুলীর ঘর যেন আমার ভিটের ওপর আর না থাকে কাল।'

লক্ষ্মী সভয়ে বলল, 'থামো, থামো, খেয়ে-দেয়ে আগে ঠাণ্ডা হয়ে নাও তারপর কি করা যায় না যায় ঠিক করো।'

সশব্দে ঘরের ঝাঁপ খুলে উঠান পেরিয়ে সিন্দুর ততক্ষণে একেবারে বাপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'বাবা!'

গগন একটু চমকে উঠে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। ফিকে অন্ধকারে একখানা ধারাল তরবারি যেন তার সামনে ঝলসে উঠেছে।

সিন্দুর বলল, 'কি দোষ করেছি আমরা যে রাত দুপুরে এসে অমন গালাগাল শুরু করেছ? পান থেকে চুন খসলেই দিনের মধ্যে সতেরবার তুমি আমাদের ভিটে থেকে তুলে দাও আর ঘর ভাঙো। বেশ তো, তোমার জামাই আসুক বাড়িতে তখন বলো এসব কথা। ক্ষেমতা থাকে তখন ভেঙো ঘর, তুলে দিয়ো ভিটে থেকে। খালি বাড়ি পেয়ে কেবল মেয়েমানুষের কাছে মিথ্যে চেঁচামেচি করছ কেন?'

ক্ষমতার কথায় গগন যেন একেবারে ক্ষেপে উঠল। 'কি, আমার ক্ষেমতা নেই বলছিস! আমার ভিটেয় থাকবি আর আমাকেই তাচ্ছিল্য করবি? আজই যদি তুলে দিই ভিটে থেকে কি করতে পারিস শুনি? ভারি মানওয়ালী হয়েছিস না? ঘরজামাইয়ের মাগের আবার মান!'

লক্ষ্মী করুণ চোখে একবার সিন্দুরের দিকে তাকাল তারপর অনুনয়ের সুরে বলল, 'তুমি ঘরে যাও মেয়ে। বুড়ো মানুষের সব কথায় কি আর কান দিতে হয় ?'

গগনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লক্ষ্মী। বয়সে সিন্দুরের চেয়ে দু'তিন বছরের ছোটই হবে। সিন্দুর কখনো তাকে নাম ধরে ডাকে কখনো বলে, বউ। কিন্তু লক্ষ্মী তাকে মেয়ে ছাড়া ডাকে না। কেবল সতীনের মেয়ের প্রভাব প্রতিপত্তির ভয়ে নয়, সিন্দুরকে লক্ষ্মী মনে মনে ভালও বাসে। রাগ হলে ভারি কড়া কড়া কথা বলে সিন্দুর। বাপের মতোই গালাগাল করে কিন্তু মেজাজ যখন আবার ভালো থাকে, লক্ষ্মীর গলা জড়িয়ে ধরে সোহাগ জানাতেও তার জুড়ি মেলে না। কানে কানে ফিসফিস করে অনেক কথা বলে তখন সিন্দুর। স্বামীর আদর-আহ্লাদের অনেক গোপন আর নতুন পদ্ধতির কথা লক্ষ্মীকে শোনাতে থাকে। হিংসা যে এক-আধটু লক্ষ্মীর না হয় তা নয়, কিন্তু লজ্জা যেন আরও বেশি হয়ে ওঠে, মৃদু কণ্ঠে নিষেধ করে, 'থামো থামো, আমি না সম্পর্কে মা হই তোমার !'

সিন্দুর ঠোঁট উলটে বলে, 'ঈস, মা না আরও কিছু, সই, তুই আমার সই হোস লক্ষ্মী। সই ছাড়া মনের কথা আর কার কাছে কই বল।' বলতে বলতে লক্ষ্মীকে দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরে সিন্দুর।

লক্ষ্মীর সর্বাঙ্গ শিরশির করে ওঠে। অমন সুন্দরী মেয়ের বাহুবন্ধনের ভিতর থেকে নিজের মিশ কালো রঙ আর চেপটা নাক-মুখের জন্য লক্ষ্মীর কুণ্ঠার যেন অবধি থাকে না। সত্যি, এমন রূপ নিজেদের জাতের মধ্যে আর কারো দেখে নি লক্ষ্মী। এই নিয়ে পাড়ার অবশ্য অনেকেই অনেক রকম কানাকানি বলাবলি করে, সিন্দুর নাকি পুরোপুরি ঢুলীদের জাতের মেয়ে নয়। কিন্তু লক্ষ্মী ওসব অকথা কুকথায় কান দেয় না। ওসব নিশ্চয়ই হিংসার কথা। সিন্দুরকে দেখে পাড়ার কোন মেয়ের না হিংসা হয় ! কেবল লক্ষ্মীর হয় না। তার রূপের দিকে চোখ মেলে চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে লক্ষ্মীর।

কিন্তু রাগলে সিন্দুর একেবারে অন্যরকম মূর্তি ধরে ; তখন বাপের মতোই কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না তার।

আজও লক্ষ্মীর কথার জবাবে সিন্দুর একেবারে জ্বলে উঠল, 'থাক থাক দরদ দেখাতে হবে না। চিনতে আর বাকী নেই কাউকে। দু' চোখের বিষ হয়েছি আমরা। তুলে দিতে পারলেই বাঁচো। কিন্তু সিন্দুরকে তোলা অত সহজ নয়।'

হতভম্ব হয়ে চুপ করে রইল লক্ষ্মী। জবাব দিল গগন, 'তুলব না করব কি

শুনি ! খুব তো ছটফট করছিস। ভরত জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিল আর তুই একবার 'মানা করতে পারলি নে তাকে।'

গগনের গলায় অভিযোগ আছে কিন্তু আগের মত তেমন তীব্র শাসানি আর নেই।

সিন্দুর তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল, 'কে বলেছে তোমাকে জাত-ব্যবসা ছেড়েছে সে ?'

গগন বলল, 'ছেড়ে দেওয়া ছাড়া কি। এর আগের বারেও তো দরকারের সময় পাই নি। ধুলগাঁয়ের সনাতনকে দিয়ে কাজ চালাতে হয়েছে। আচ্ছা জামাই মিলেছিল ভাগ্যে !'

সিন্দুর বলল, 'এখন যত দোষ হল বুঝি জামাইয়ের। মানুষ নেই ঘরে, তুমি কোন্ ভরসায় বিয়ের বায়না নিলে শুনি !'

গগন আবার গর্জে উঠল, 'বোশেখ মাসে ঘর ছেড়ে কোন্ আক্কেলে সে বেরোয় ? তিন-চারটে বিয়ের তারিখের কথা খেয়াল নেই তার !'

মনে মনে স্বামীর ত্রুটির কথা অস্বীকার করতে পারে না সিন্দুর। করাতের কাজ ছেড়ে এই সময় চলে আসা সত্যিই তার উচিত ছিল। দলের মধ্যে একমাত্র সানাইওয়ালা ভরতই। পাড়ার আর কেউ সানাই ধরতে জানে না। কেবল ফুঁ দিলেই তো আর সুর ওঠে না সানাইতে ! বিদ্যা শিখতে হয়। সে বিদ্যা সবচেয়ে ভালো করে জানে ভরত। দেশভরে ভরতের সানাই-এর সুখ্যাতি করে লোকে এমন ওস্তাদ নেই কাছে-ধারে। কতবার কত জায়গা থেকে সানাই বাজিয়ে ভরত মেডেল নিয়ে এসেছে। উজ্জ্বল পালিস করা রূপার মতই চক্‌চক্ করে উঠেছে সিন্দুরের চোখ।

রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করেছে সিন্দুর, 'কত দাম হবে ?'

ভরত মুখ টিপে হেসেছে, কোন জবাব দেয় নি।

সিন্দুর অধীর হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করেছে, 'বল না গো, কত দাম জিনিসটার ?'

ভরত তেমনি সহাস্যে জবাব দিয়েছে, 'কত আর, তিন-চার টাকা।'

একসঙ্গে তিন-চার টাকা খুব কমই হাতে এসে পৌঁছেছে সিন্দুরের। তবু এত গৌরবের জিনিসের দাম এত কম শুনে মুখ ম্লান হয়ে গেছে তার। 'দুর, আমার বিশ্বাস হয় না। তুমি মিছে কথা বলছ। আমি তো ভেবেছি এর দাম তিন-চার শো টাকা '

ভরত হো হো করে হেসে উঠেছে, 'কেবল তিন-চারশো? তিন-চার হাজার সিন্দুর, তিন-চার হাজার।'

অমন যে চালাক আর মুখরা মেয়ে সিন্দুর সেও স্বামীর দিকে বোবার মত কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে বলেছে. 'সত্যি তিন-চার হাজার। সে ক' কুড়ি টাকা গো?'

ভরত এবার আর হাসে নি. গম্ভীর স্বরে জবাব দিয়েছে, 'অনেক কুড়ি।'

সিন্দুর স্বামীকে অবিশ্বাস করে নি, সসম্ভ্রমে বলেছে, 'তাহলে জিনিসটা কোথায় রাখি বল দেখি! ঝাঁপির মধ্যে? কিন্তু সেটা যে ভাঙা। এত করে বললাম আকাঠার বাক্সটা নিয়ে যাও ছুতোর-বাড়ি, তালা-চাবির জন্যে আলতারাফ করিয়ে আনো। তা তোমার সব তাতে গাফলেতি।'

ভরত আবার হেসে উঠেছে, 'ঝাঁপিও লাগবে না, বাক্সও লাগবে না, সব দামী জিনিসই কি আর বাক্স-ঝাঁপিতে তালা-চাবি দিয়ে রাখা যায়? তাহলে তো তোকেও রাখতুম।'

সিন্দুর লজ্জিত হয়ে বলেছে, 'আহা!'

ভরত বলেছে, 'বোকা মেয়ে কিছু জ্ঞানগম্যি নেই তোর একেবারে, ওই রূপার চাকতিটুকুর অত দাম হয় বুঝি? তা নয় আসলে দাম হল ওস্তাদের নামের। দাম হল ওস্তাদের মানের। তা কি বাক্স-সিন্দুকে থাকে। তার চেয়ে মেডেলখানা ঝুলিয়ে রাখ তোর গলায় লোকে দেখলেই চিনতে পারবে ভরত সানাইদারের বউ।'

সিন্দুর এবার ঠাট্টাটা বুঝতে পেরেছে স্বামীর, জিনিসটার আসল দামও যেন আন্দাজ করতে পেরেছে খানিকটা। চোখে আর ঠোঁটে হাসির ঝিলিক ছিটিয়ে বলেছে, 'আর মেডেল না ঝুলালে বুঝি কেউ তোমার বউ বলে চিনতে পারবে না!'

ভরত পরম নিঃসংশয়ে জবাব দিয়েছে, 'পারবেই তো না, ভাববে বসন্ত কাঁসীদারের—'

সিন্দুর হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরেছে স্বামীর।

জবাব না পেয়ে গগন আবার কি বলতে যাচ্ছিল। মেয়ের অন্যমনস্ক মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটু যেন থমকে গেল। এতক্ষণ বাদে পশ্চিমের দিকে একটুকরো চাঁদ উঠেছে আকাশে। তার ফিকে আলোয় ভারি নরম আর মধুর দেখাল সিন্দু-

য়ের মুখ। কেমন একটু ধক্ করে উঠল গগনের বুকের মধ্যে। দেড় বছরের মা-মরা মেয়েকে আট-ন' বছর নিজের বুকের ভিতরে রেখে মানুষ করেছে গগন। বিয়ের পরেই চোখের আড়াল হয়ে যাবে সেই ভয়ে খুঁজে-পেতে মা-বাপ-মরা ভরতকে এনে ঘরজামাই করে রেখেছে নিজের ভিটের ওপর। তখন থেকেই ভালো সানাই বাজাতে পারত ভরত। গগনের উৎসাহে ভরতের গুণ আরও বেড়েছে, উন্নতি হয়েছে বিস্তার। কত বিয়ে আর অন্নপ্রাশনের আসর মাত করে দিয়েছে শ্বশুর-জামাইতে। প্রাণভরে প্রশংসা করেছে লোক। ঢোলে যেমন পরিষ্কার হাত গগনের, সানাইতে তেমনি ভরতের গলা। জামাইয়ের গর্বে গগনের বুক ফুলে উঠেছে। দেশ-বিদেশে বলে বেড়িয়েছে যোগ্য মেয়ের যোগ্য জামাই পেয়েছে গগন। সেই ভরত,—সেই সাধের জামাই গগনের, কি অদ্ভুত রকমেরই না বদলে গেছে আজ! সানাই এখন সে ছুঁতেই চায় না প্রায়। শুকচাঁদ ভূঁইমালীর সঙ্গে গঞ্জে-বন্দরে করাত টানাই এখন তার পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জামাইয়ের জন্যে সমাজের মানীগুণী পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করে গগনের। দুঃখে বুক ফেটে যায়।

একটু চুপ করে থেকে গগন মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে ফিরবে কিছু বলে গিয়েছিল?'

সিন্দুর মাথা নেড়ে জানাল, 'না।'

গগনের আর একবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, 'না! সে কথা বায়না নেওয়ার সময় বললি নি কেন? তখন কেন বললি যে আজও আসতে পারে কালও আসতে পারে।'

কারো ধমক সওয়া সিন্দুরের ধাতে নেই তা সে বাপেরই হোক আর স্বামীরই হোক। গগনের ধমকে সিন্দুরও ঘাড় বাঁকিয়ে রুক্ষস্বরে জবাব দিল, 'আন্দাজ করেছি বলেই বলেছি। কিন্তু তুমিই বা কোন্ আক্কেলে মেয়েমানুষের একটা আন্দাজী কথার উপর বায়না নিতে গেলে? তখন মনে ছিল না যে এখন দুষতে আসছ আমাকে!'

গগন বলল, 'দুষছি কি কেবল আমি, পাড়া ভরে লোক ছি ছি করছে তোদের ব্যাভারে। ঘরজামাইকে দরকারের সময় ঘরে পাব না এমন কথা শুনেছে নাকি কেউ কোনখানে!'

একটু রাগলেই ঘরজামাই বলে খোঁটা দেওয়া আর ভিটে থেকে ঘর তুলে দেওয়ার ভয় দেখানো অভ্যাস হয়ে গেছে গগনের। ভরতের মুখের সামনে এসব

কথা বলতে গগন সাহস পায় না। সিন্দুর যখন একা একা থাকে তখন বলে। ভরতের কানে যে এসব কথা না যায় তা নয় কিন্তু ভরত জবাব দেয়, 'সাক্ষাতে বলুক না দেখি, বুঝব কতখানি বুকের পাটা। আমি যে এ ভিটেয় আছি তা তোর এক বাপের নয় সাত বাপের ভাগ্যি। বুঝিয়ে বলিস বাপকে।'

স্বামার কথা বাপকে বুঝানো যায় না, বাপের সব কথা বলা যায় না স্বামীকে। মাঝখান থেকে সিন্দুর কেবল কথা শুনে মরে। অবশ্য কেবলই যে শোনে তাই নয়. শোনাতেও ছাড়ে না।

গগনের কথার জবাবে সিন্দুর বলল, 'আহা-হা! কত নাখো টাকার সম্পত্তি নিখে দিয়েছে জামাইকে যে রাতদিন ঘরে বসে থাকলেই তার পেট ভরবে।'

গগন বলল, 'তাই বলে কেবল বুঝি করাত টেনে বেড়াবে সে! দু'চারখানা বিয়ের মাসও বাদ দেবে না?'

সিন্দুর বলল. 'কেন বাদ দেবে শুনি? দু'দিন বাঁশী বাজিয়ে খেয়ে মাসের পর মাস উপোস করে মরবার জন্যে? নাতিকে খেয়ে বুঝি আশ মেটে নি এবার জামাইকেও—?'

বাধা দিয়ে গগন চীৎকার করে উঠল, সিন্দুর'!

সিন্দুর বলল, 'তা ছাড়া কি। মনে নেই আকালের বছরের কথা! সাতদিন ধরে উপোস করে পড়েছিলাম। চেয়েও দেখ নি! কচু সেদ্ধ পাতা সেদ্ধ খেয়ে ভেদবমি হয়ে মরল ছেলেটা, ফিরেও তাকাও নি। সাধে তোমার দল ছেড়েছে জামাই? সাধে কি সানাই ছেড়েছে? করাত টানে বেশ করে। দু'পয়সা যাতে আসবে তাই করবে। বয়স থাকলে গা-গতর থাকলে তুমিও তাই করতে। পারছ না বলেই হিংসায় ফেটে মরছ।'

মেয়ের কথায় মুহূর্তকাল হতভম্ব হয়ে রইল গগন। তারপর ধরা গলায় বলল 'এমন কথা তুই আমাকে বলতে পারলি সিন্দুর! মুখে একবার বাধল না? ছেলে কি তোর একার গেছে? দু'দুটি ছেলেমেয়ে আমার যায় নি? ঘরে ঘরে উপোস করে থাকে নি মানুষ, সোয়ামী-পুত মরেনি আর কারো? কার কি করবার সাধ্য ছিল তখন? কে তাকাতে পারত কার দিকে?'

এতক্ষণ চুপ করেছিল লক্ষ্মী। সিন্দুরের কথায় তার মনেও এবার রাগ আর দুঃখ প্রচণ্ড হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে নতুন করে মোচড় দিয়ে উঠল দু'বছর আগেকার ছেলেমেয়ে মরার শোক। অভিমান নয়, এবার সিন্দুরের ওপর দারুণ ঘৃণাই হল লক্ষ্মীর। তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে স্বামীর হাত ধরে এক ঝটকা

টান দিয়ে লক্ষ্মী বলল, 'কাকে কি বলছ তুমি? চল ঘরে চল। জন্মপিশাচের সঙ্গে আবার কথা!'

দাওয়ায় পইঠার পাশে কানা-ভাঙা একটা কালো মাটির কলসীতে জল এনে রেখেছে লক্ষ্মী। গগন ভালো করে হাত-পা ধুয়ে নিল সেই জলে। তারপর ঘরে গিয়ে খেতে বসল। কাঁসা-পিতলের বাসন-বাটি আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বলে বলে চড়ুই ডাঙার হাট থেকে গগনকে দিয়ে একখানা কলাই-করা এনামেলের থালা কিনিয়েছে লক্ষ্মী। রাঁধা-চালার কাজ মাটির বাসনকোসনেই চলে। কিন্তু পোড়া মাটির থালায় করে স্বামীর সামনে ভাত বেড়ে দিতে ভারি দুঃখ লাগে লক্ষ্মীর। মনে পড়ে বাপের বাড়ির সম্পন্ন অবস্থার কথা। ভদ্রলোক বাবুলোকদের মত তার বাপ-খুড়ো মদন ঋষি, বদন ঋষি এখনো ঝকঝকে কাঁসার থালায় ভাত খায়। পাইকারকে চামড়ার যোগান দিয়ে তারা অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। সে কথা উল্লেখ করলে গগন মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'তা ফেরাক। তবু তারা চামার। জাত ঢুলি নয় গগন ঢুলীর মত।'

মোটা চালের থালাভরা ভাত। পাটকেলে রঙের পোড়া মাটির ছোট্ট গামলা থেকে একহাতা ডাল তুলে দিল লক্ষ্মী। তারপর দিল খানিকটা পাটশাক সিদ্ধ।

যাতায়াতে চারক্রোশ পথ হেঁটে এসে অত্যন্ত খিদে পেয়ে গেছে গগনের। পরম পরিতুষ্টির সঙ্গে থাবায় থাবায় গোগ্রাসে সে ভাত গিলতে লাগল। তারপর এক সময় থমকে গিয়ে লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডাল-তরকারি আছে তো তোর জন্যে? সব দিয়ে ফেললি না তো আমাকে?'

লক্ষ্মী মুখ মুচকে একটু হাসল, 'এতক্ষণ বাদে বুঝি মনে পড়ল সে কথা। রেখেছি, আমার জন্যেও রেখেছি। ভাবনা নেই তোমার। ও কি, সব ভাত মেখে নিলে যে! মাছের তরকারি আছে। বলতে বলতে ডাঁটা আর কুচো চিংড়ির তরকারিভরা ছোট একটা পিতলের বাটি গগনের পাতে উপুড় করে ঢেলে দিল লক্ষ্মী।

গগন খুশি হয়ে বলল, 'আহা-হা সব দিলি কেন! মাছ পেলি কোত্থেকে?'

লক্ষ্মী বলল, 'সিন্দুর আনিয়েছিল বাজার থেকে। রাঁধা তরকারি সে একটু রেখে গেছে তোমার জন্যে।'

গগন হঠাৎ ভাতের থালা থেকে হাত তুলে বসল, 'আর তাই তুই ঢেলে দিলি আমার পাতে! এই তোর আক্কেল হয়েছে নন্দর মা?'

সভয়ে শঙ্কিত মুখে লক্ষ্মী বলল, 'কেন কি হয়েছে তাতে?'

ধমকে উঠে গগন বলল, 'হয়েছে কি তাতে! তুই আমাকে কি ভেবেছিস বল্

দেখি? বাপ না আমি! মেয়ে হয়ে ওর ছেলে খাওয়ার খোঁটা দিয়েছে না আমাকে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের কানে শুনলি না তুই? এর পরও সেই মেয়ের রাঁধা মাছ-তরকারি গলা দিয়ে গলবে আমার! ঘেন্না-পিত্তি নেই আমার শরীরে? মানুষের দেহ না আমার?'

মাখা ভাত ফেলে উঠে দাঁড়াল গগন, বলল, 'আঁচাবার জল দে। হয়ে গেছে আমার খাওয়া।'

লক্ষ্মী অনুনয়ের সুরে বলল, 'মাথা খাও আমার, উঠো না! আমি দোষ করে থাকি আমাকে বকো মারো যা খুশি করো। অন্নলক্ষ্মীর ওপর কিসের রাগ। গেরস্থর অমঙ্গল হয়। তাতে, দেশের অমঙ্গল হয়। মনে নেই সে বছরের কথা?'

গগন দ্বিমনা হয়ে পিঁড়ির ওপর ফের বসতে বসতে বলল, 'কিন্তু এ ভাত আমার গলা দিয়ে কিছুতেই নামবে না নন্দর মা। নিতান্তই দিব্যি দিলি তাই বসলাম।'

লক্ষ্মী কোন কথা বলল না। স্বামীর পাতের কাছে চুপ করে বসে রইল। দিব্যি না দিয়ে কি উপায় ছিল তার। বাপ-মেয়ের ঝগড়া তো মাসের মধ্যে তিরিশ দিনই লেগে আছে। অকথা কুকথা সিন্দুরের মুখ থেকে কি আজ এই প্রথম বেরুল! সেই রাগে আধপেটা খেয়ে সারারাত মানুষটি বিছানায় এপাশ ওপাশ করুক জেনেশুনে তাই বা লক্ষ্মী সয় কি করে!

খাওয়ার পর আর এক ছিলিম তামাকের ধোঁয়া পেটে যাওয়ায় গগনের মেজাজটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এল। হুঁকোর মাথা থেকে কলকেটা খুলে রেখে গগন স্ত্রীকে বলল, 'ঘরে ঝাঁপ এঁটে ছেলে নিয়ে যেমন ঘুমাচ্ছিলি তেমনই আরও খানিকক্ষণ ঘুমো, আমি ঘুরে আসি পাড়া থেকে।'

লক্ষ্মী আপত্তি করে বলল, 'কি করবে পাড়ায় গিয়ে? এত রাতে কে তোমার তরে জেগে বসে আছে শুনি?'

গগন বলল, 'না জেগে থাকে ডেকে জাগিয়ে নেব। কালকের একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। ভালো হোক মন্দ হোক সানাইদার ঠিক করতেই হবে একজন। লোকের কাছে বেল্লিক বনতে পারব না।'

লক্ষ্মী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তার চেয়ে একাজ তুমি ছেড়ে দাও। হাত বান্ধে পা বান্ধে মন বান্ধে কে! একাজে কারো মনই যখন নেই, তুমি কেন মিথ্যে সাধাসাধি টানাটানি করে মরছ!'

গগন মনে মনে হাসল। আসলে লক্ষ্মী চায় না যে গগন ঢোল কাঁধে কাঁধে

দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াক। তার চেয়ে তার বাপ-খুড়োর চামড়ার ব্যবসাকে লক্ষ্মী বেশি মানজনক মনে করে। লক্ষ্মীর সবই ভালো। শান্ত-মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং প্রায় মেয়ের বয়সী হলেও কোনদিন অন্য কোন পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। সে-সব দোষ ছিল সিন্দুরের মা'র। ভালো রকমই ছিল। কিন্তু লক্ষ্মীর ওসব কিছুই নেই। তেল সাবান শাড়ী গয়না নিয়ে দাবিদাওয়াও নেই মুখে। এসব দিক থেকে বেশ ভালো মেয়েই বলতে হবে লক্ষ্মীকে। কেবল তার একটা জিনিস পছন্দ হয় না গগনের। বাপের বাড়ির অবস্থা আর মান-মর্যাদা নিয়ে লক্ষ্মীর ভারি দেমাক। স্বামীর পেশাকে, গাঁয়ে গাঁয়ে ঢোল বাজিয়ে বেড়ানোকে লক্ষ্মী খুব হেনস্থা করে। লক্ষ্মী যেন জেনেও জানতে চায় না, বুঝেও বুঝতে চায় না ঢুলী হিসাবে গগনের নামডাক খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা। তার সেই যে ধারণা হয়ে গেছে তার বাপের চামড়ার কারবারের চেয়ে আর কোন ভালো কাজ নেই তা লক্ষ্মীর মন থেকে কিছুতেই আর ঘুচাতে পারল না গগন।

কেবল লক্ষ্মীর দোষ দিলেই বা কি হবে পাড়ার লোকের মনোভাবও তাই। কারোরই সাধ নেই, সখ নেই, ইচ্ছা নেই দলটাকে ভালো করে গড়ে তোলে, যাতে নামডাক হয় দলের সেই চেষ্টা করে। দলই বা কই! মরে-হেজে পাড়া প্রায় শূন্য হয়ে গেছে। নিজের বয়সী মানুষ আর চোখে পড়ে না গগনের। ছেলে-ছোকরা যা দু'চারজন আছে অন্য কাজকর্ম করে। নিজের জামাই ভরতের মতই করাত টানে, কামলা খাটে, কেবল পূজা-পরব, বিয়ে, অন্নপ্রাশনের হিড়িকের সময় এসে ঢোল কাঁধে করে দাঁড়ায়। তাও সব সময় সবাইকে পাওয়া যায় না। সেধে ডেকে খুঁজে-পেতে গগনকেই আনতে হয় তাদের। কিছু বললে জবাব দেয়, 'আরে জ্যাঠা, রেখে দাও তোমার পিত্তিপুরুষের কথা। পেট বাঁচলে তো বাপের নাম।' সে কথা ঠিক। আগের মত পয়সা আর মান-সম্মান নেই এ কাজে। পুজো-পার্বণের সংখ্যা কমেছে। অনেক পুজো গৃহস্থেরা কেবল কাঁসর-ঘণ্টাতেই সারে। খবর দেয় না ঢুলীদের। বিয়ে অন্নপ্রাশনে গেলেও কেবল মজুরীর টাকাটাই মেলে। আগেকার মত পুরনো কাপড়-চোপড় কি জিনিসপত্র বকশিশ আর কেউ দিতে চায় না। বকশিশ তো ভালো মুড়ি-গুড়ে জলখাবার আর দু'থালা ভাত ঢুলীদের খেতে দিতে অনেক কর্তা-গিন্নীর মুখ ভার হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বায়নার সময়েই চুক্তি করে যায়, না, জলখাবারের ব্যবস্থা হবে না। তার চেয়ে বরং মাথা প্রতি ছ'পয়সা দু'আনা হারে পয়সা ধরে নাও। বায়নাপত্রও কমেছে। আগে যেখানে চার ঢোল ছ' ঢোল না হলে বিয়েই হত না, এখন সে-সব জায়গায় বায়না আসে মাত্র

দু' ঢোল এক কাঁসি এক সানাইয়ের। তবু কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এই ক'টি জিনিসই যোগাড় করা ভার হয়ে পড়ে গগনের। ঢোল মেলে তো সানাই মেলে না, সানাই-দার জোটে তো ঢুলী একজন কম পড়ে। কেবল কি তাই! এই সব ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে বাজিয়ে মোটে সুখ পায় না গগন। কারোরই হাত পরিষ্কার নয়। মুহূর্তে মুহূর্তে তাল কাটে। সকাল সন্ধ্যায় বছরে দু'চার দিনও যদি তালিম না দেয় তাল ঠিক থাকবে কি করে! রাগে গা জ্বলে যায় গগনের, বুক জ্বলে যায়। বকে ধমকে সবাইকে একশেষ করে। সঙ্গীদের বেতালা বাজনায় সমস্ত দুনিয়াটাকেই তালকাটা বলে মনে হয় গগনের।

তবু যেমন করেই হোক ওদেরই ভিতর থেকে কাউকে দিয়ে সানাইদারের কাজটা কাল চালিয়ে নিতে হবে। মোহন ঢুলীর ছেলে নিতাই নাকি পারে এক-আধটু ফুঁ দিতে। তাকে গিয়ে এখনই বলে রাখা দরকার।

লক্ষীকে ঘরে গিয়ে ঘুমোতে বলে গগন নিতাইদের বাড়ির পথ ধরল।

লক্ষী পিছন থেকে ডেকে বলল, 'অন্ধকারে কেন যাচ্ছ অমন করে! দাঁড়াও লণ্ঠনটা জ্বেলে দিই। গরমের দিন। পথঘাট ভালো নয়। রাত করে নাম করতে নেই, মা মনসার চেলারা বাইরে বাইরেই থাকে। দোহাই তোমার লণ্ঠনটা নিয়ে যাও।'

গগন ধমক দিয়ে উঠল, 'থাম্ থাম্, আদিখ্যেতা তোর রাখ নন্দর মা। এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি যাব তার আবার লণ্ঠন! কত কষ্টে যোগাড় করেছি এক বোতল কেরোসিন। তা পুড়িয়ে সাবাড় না করা পর্যন্ত বুঝি আর নিশ্চিন্ত হতে পারছিস না?'

তারপর স্ত্রীর অভিমান ক্ষুব্ধ মুখের দিকে চেয়ে গলার স্বরটাকে নরম করে গগন বলল, 'কিছু ভয় নেই তোর যা শুয়ে থাক গিয়ে। চুলে একটু একটু পাক ধরেছে বলে ভেবেছিস বুঝি চোখের জ্যোতিও আমার ধরে এসেছে! তা নয়। এখনো বেশ ঠাহর পাই। চিনতে মোটেই ভুল হয় না। পথ চিনতেও না, মানুষ চিনতেও না।'

লক্ষী মুখ টিপে একটু হাসল। সে তো কোনদিন বলে না যে গগন বুড়ো হয়ে পড়েছে বা সেজন্য তেমন হায় আফসোসও কোনদিন প্রকাশ করে না লক্ষী। তবু নিজেকে একটু কমবয়সী বলে প্রমাণ করতে অমন সব অদ্ভুত চেষ্টা করে কেন গগন! জোয়ান মানুষকে কি তার মুখ ফুটে বলতে হয় সে জোয়ান! তার মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়।

উঠান থেকে পথে নেমে গগনের মনে হয় লণ্ঠনটা ধরিয়ে আনলেও নিতান্ত মন্দ ছিল না। বাঁশঝাড়ে আর আগাছার জঙ্গলে মাথার ওপরকার আকাশ কি পায়ের তলার মাটি কিছু চোখে পড়ে না। অমাবস্যার কাছাকাছি তিথি। অন্ধকারটা ভারি ঘনই হয়েছে এখানে। হঠাৎ আর একজন লোকের প্রায় গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল গগন। সামলে নিতে নিতে রুক্ষস্বরে গগন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কে?'

'আমি কেশব।'

গগন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'ও কেশব! দেখেশুনে পথ চলতে পারিস নে? মাধব দাসের আখড়া থেকে গাঁজা টেনে ফিরলি বুঝি!'

গগনের ধমকে কিন্তু কেশব মোটেই ভড়কাল না। তরল কণ্ঠে হেসে উঠে বলল, 'মাথা ঘুরে গায়ের ওপর এসে পড়লে তুমি, আর গাঁজা খাওয়ার বদনাম দিচ্ছ আমাকে! এত রাতে যাচ্ছ কোথায় শুনি?'

গগন বলল, 'যাচ্ছিলাম তো নিতাইর কাছে। সে কি বাড়ি এসেছে না আখড়ায় বসে এখনো গাঁজা টানছে, সত্যি করে বল্ দেখি?'

কেশব বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি, তুমি কোন খবর রাখ না দেখছি ঢুলীর পো। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

গগন বলল, 'ধুলগাঁ গিয়েছিলাম সানাইদারের খোঁজে। সেখানে পেলাম না সনাতনকে। কিন্তু নিতাইর কথা কি বলছিস তুই! তাকে তো দুপুরের পরেও দেখা গেছে বাড়িতে।'

কেশব বলল, 'তা তো দেখা গেছে। কিন্তু এক ছিলিম গাঁজা ট্যাঁকে গুঁজে সন্ধ্যার পর সে যে চড়ুইডাঙা রওনা হয়ে গেল।'

গগন বলল, 'চড়ুইডাঙা কেন! সেখানে কি?'

কেশব বলল, 'ভুলে গেলে নাকি সব? সেখানে তার শ্বশুরবাড়ী না? সেখান থেকে খবর নিয়ে এসেছিল তার ছোট শালা। বার কয়েক দাস্ত-বমি হয়ে বউ নাকি নিতাইর যায় যায়। তবু আখড়ার লোভ ছেড়ে নিতাই যেতে চায় না। ঠেলেঠুলে আমিই পাঠিয়ে দিলাম জোর করে।'

গগন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিঃশব্দে ফিরে এল। অন্ধকারে হতাশ ক্ষীণকণ্ঠ শোনা গেল একটু, 'তবে আর গিয়ে কি হবে!'

কেশব এল পিছনে পিছনে, আগের মতই তরল স্বরে বলল, 'ব্যাপার কি, হল কি

তোমার? নিতাইর বউয়ের অসুখের খবরে তুমি অমন করে মিইয়ে পড়লে কেন ঢুলী খুড়ো?'

গগন বিরক্ত হয়ে বলল, 'ইয়ারকি দিসনে কেশব। তোর বাপের বয়সী বয়স না আমার!'

কেশব বলল, 'আহা-হা তা তো বটেই! কিন্তু ব্যাপারটা কি আমাকে ঠিক করে বল দেখি।'

শেষের দিকে গলার স্বরে তরল পরিহাসের বদলে বেশ একটু আন্তরিকতা ফুটে উঠল কেশবের। বাঁশের ঝোপ থেকে খোলা পরিষ্কার জায়গায় দুজনে ততক্ষণ বেরিয়ে এসেছে। মাথার ওপরে জলজল করছে তারাভরা আকাশ। গগন ফিরে দাঁড়াল। আবছা আলোয় পরস্পরের দিকে তাকাল দুজনে।

গগন বলল, 'চণ্ডীপুর সরকার-বাড়ি বিয়ের বায়না আছে কালকে। দুই ঢোল, এক কাড়া, কাঁসি আর সানাই। ভরত এসে পৌছাল না জানিস তো, নিতাইও গেল শ্বশুরবাড়ি। সানাই ধরবার আর লোক নেই পাড়ায়। আমি এখন কি উপায় করি বল তো!'

কেশব বলল, 'আমাকে নাও না। অমন দু'-এক বিয়ের সানাই আমিও তো দিয়ে আসতে পারি বাজিয়ে।'

গগন আবার চটে উঠে বলল, 'ফের তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা শুরু করলি কেশব?'

কেশব বলল, 'ঠাট্টা করব কেন ঢুলী খুড়ো, সত্যি বলছি। তুমি তো জানো এক ভরত ছাড়া তোমাদের ঢুলীপাড়ার কারো চেয়ে সানাই আমি খারাপ বাজাই নে। সেবার স্কুলের মাঠে সানাই-এর পাল্লা দিয়েছিলাম মনে আছে?'

গগন বলল, 'আছে। কিন্তু সে তো বাজিয়েছিলি সখ করে, আহ্লাদ করে। এ তো আর সে রকমের বাজনা নয়। আমাদের দলের সঙ্গে অন্য গাঁয়ের বিয়ে-বাড়িতে বাজাতে হবে। ভুঁইমালীর ছেলে তুই। সেরকম অন্যায় অনুরোধ তোকে কেন করতে যাব।'

কিন্তু কেশবের মনের ভিতরে উল্লাস যেন উপচে পড়ছে। ফের তরল কণ্ঠে জবাব দিল কেশব, 'রেখে দাও তোমার ন্যায় অন্যায়। নিতাই ঢুলীর ঘরে পান্তাভাত খেয়ে খেয়ে জাতজন্ম কিছু বাকি আছে নাকি যে ভুঁইমালী ভুঁইমালী করছ! যদি বল তো সঙ্গে যেতে পারি। দেখবে কি রকম সানাই একখানা বাজাই।'

কথাটা নিতান্ত অসম্ভব লাগল না গগনের। কেশব ভুঁইমালীর ছেলেই বটে। কিন্তু মা-বাপও নেই নিকট-আত্মীয় বলতেও কেউ নেই। স্বভাব প্রকৃতিও নিতান্তই

বাউণ্ডুলে গোছের। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হতে চলল কিন্তু নির্দিষ্ট কোন কাজকর্মে তার মন এল না। সেবার এক যাত্রার দলের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। চেহারা সুন্দর বলে ভারি পছন্দ হয়েছিল অধিকারীর। কিন্তু সেখানেও বেশিদিন টিকতে পারে নি। ফিরে এসেছে গাঁয়ে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি ফাইফরমাস খাটে খোরাকটিও সেবেলার মত জোটে সেখানে। সন্ধ্যার পর গিয়ে জোটে মাধব বৈরাগীর আখড়ায়। সেখানে গাঁজা টানে, তার ভিক্ষার চালে ভাগ বসায়। পাড়ার নিতাই ঢুলীর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছেলেবেলা থেকে। যেদিন অন্য কোথাও জোটে না সেদিন যায় তার বাড়ি। ভুঁইমালীরা সবাই দুর দুর করে। যেদিন মাধব বৈরাগী আর নিতাইও তাড়া দেয় সেদিন ফের গাঁ থেকে উধাও হয় কেশব। জাতজন্ম বাছবিছার সত্যিই তার কিছু নেই। গুণের মধ্যে কেবল একটা গুণ তার আছে। বাঁশী আর সানাই মোটামুটি সে ভালোই বাজায়।

খানিকক্ষণ কি চিন্তা করে গগন বলল, 'কিন্তু তোর কথায় বিশ্বাস কি! গাঁজার ঘোরে তুই এখন যা বলছিস একটু পরেই তো তা ভুলে যাবি।'

কেশব বলল, 'কিচ্ছু ভুলব না ঢুলীখুড়ো। তুমি মোটেই ভেব না। দু' ছিলিমের দামটা কেবল দাও আমাকে, দেখবে সব মনে থাকবে আমার।'

গগন ভেবে দেখল। কেশব গাঁজা খায়, নিজের খেয়াল মত চলে কিন্তু কথা দিলে তার বড় একটা নড়চড় করে না। দেখাই যাক না। ওকে দিয়ে কাজটা যদি কোনরকমে চালিয়ে নেওয়া যায় মন্দ কি। কথা যদি কেশব রাখে ভালোই না হলে উপস্থিত মত কোন একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। সানাইদার নেই বলে বিয়ের বায়না তো আর নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

ঠিক হল রাত থাকতে থাকতে উঠে কেশব গিয়ে খালপারের বটতলার ঘাটে গগনের জন্য অপেক্ষা করবে। দলের সঙ্গে না যাওয়াই তার ভালো। ভুঁইমালীদের কেউ দেখে ফেললে হয়তো কিছু বলতে পারে। অবশ্য কেশব কি করল না করল, খেল না খেল তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কেশবও কারো কোন তোয়াক্কা রাখে না। নিজের জাতের চেয়ে অন্য জাতের লোকের সঙ্গেই তার খাতির আর মেলা-মেশা বেশি। তার মধ্যে উত্তরপাড়ার ব্রাহ্মণ কায়েতরা আছে, মধ্যপাড়ার কুণ্ডু চৌধুরীরা আছে, আর আছে এ পাড়ার ঢুলীরা। ঢুলীদের সঙ্গেই যে কেশবের সব-চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা, গোপনে গোপনে এদের ভাতও সে খায় তা তারাও জানে। কিন্তু তা নিয়ে আগু বাড়িয়ে কেউ কোন কথা বলতে যায় না, পাছে খাওয়ার সময় কেশব তাদের কারো বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়।

কথাবার্তা সব ঠিক করে বাড়ি ফিরে এল গগন। ছেলে নিয়ে লক্ষ্মী পড়ে পড়ে একপাশে ঘুমাতে লাগল কিন্তু রাতভর গগন কেবলই এপাশ ওপাশ করল। কিছুতেই ঘুম আর হল না ভালো করে। বহুদিন বাদে দলবল নিয়ে চণ্ডীপুরের সরকার-বাড়িতে বাজাতে যাওয়ার সুযোগ যখন এল দেখা গেল গগনের দলও নেই বলও নেই। এক সময় এই পাড়াতেই তিন-তিনটে ঢুলীর দল ছিল। চব্বিশ ঘণ্টা প্রায় শোনা যেত ঢোলের শব্দ। বিয়ে অন্নপ্রাশনের বড় বড় বায়না এলে তিনদিন আগে থেকে সমানে তালিম দেওয়া হ'ত দলের লোকদের। এসব গগনের ছেলেবেলার কথা। বড় হয়ে নিজে দল গড়ল গগন। সে দল কতবার ভেঙেছে কতবার ফের গড়ে উঠেছে কিন্তু এবারকার মত এমন করে কোনদিনই দল একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি। পাড়ায় পাড়ায় গাঁয়ে গাঁয়ে মানুষ হাতড়ে বেড়াতে হয় নি ঢোল আর সানাই ধরবার জন্য। দিনকাল একেবারেই বদলে গেছে। এমন যে আদরের ঘরজামাই ভরত তাকেও দরকারের সময় কাছে পাওয়া যায় না। এর চেয়ে আফসোসের আর কি আছে গগনের।

তখনো বেশ রাত আছে খানিকটা। গগন মেয়ের ঘরের ঝাঁপের কাছে এসে দাঁড়াল। সানাইটা চেয়ে নিয়ে রাখতে হবে আগেই।

'সিন্দুর, ও সিন্দুর, একটু ওঠ দেখি মা!'

গগনের গলার স্বর বেশ নরম, মিষ্টি মিষ্টি।

দু'-তিন ডাকের পর ঘুম ভাঙল সিন্দুরের। কিছুক্ষণ কান খাড়া করে থেকে বলল, 'কি বলছ?'

গগন বলল, 'ওঠ্ এবার রাত আর বেশি নেই।'

সিন্দুর বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি করব উঠে?'

গগন একটু চুপ করে থেকে বলল, 'উঠে তোদের সানাইটা একবার দিবি, বায়না তো রাখতেই হবে। সঙ্গে করে নিয়ে যাই জিনিসটা, তারপর কাউকে দিয়ে যেমন-তেমন করে চালিয়ে নেব কাজ।'

কেশবের কথাটা আগেই ভাঙল না গগন। দরকার কি!

সিন্দুর শুয়ে শুয়েই ঘরের ভিতর থেকে জবাব দিল। বলল, 'কিন্তু ও সানাই তো আমি দিতে পারব না।'

গগন অবাক হয়ে বলল, 'পারবি না! কেন?'

সিন্দুর বলল, 'তোমার জামাইর নিষেধ আছে। তার হাতের জিনিস তার মত না নিয়ে কাউকে দিতে পারব না আমি।'

গগন বলল, 'কিন্তু সেবারও তো দিলি।'

সিন্দুর বলল, 'ইচ্ছা হল দিলাম। তাই বলে বার বারই দিতে হবে এমনই বা কি দায়ে পড়েছি!'

মনের মধ্যে রাগ উত্তাল হয়ে উঠল গগনের। ইচ্ছা করতে লাগল ঝাঁপ ভেঙে অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, একগুঁয়ে মুখরা মেয়েটাকে চুলের মুঠি ধরে এখনই টেনে নিয়ে আসে বাইরে। কিন্তু বহুকষ্টে মনের রাগ মনেই চেপে রাখল গগন। সিন্দুর যে রকম মেয়ে তাতে ওভাবে কোন ফল হবে না। খুন করে ফেললেও ওর জিনিস অমন করে আদায় করা যাবে না এমনই জেদী মেয়ে সিন্দুর। হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ে গেল গগনের। ভারি টাকার লোভ মেয়েটার। সেবার সানাই নিয়ে কিছুই ওকে দেওয়া হয় নি। বোধ হয় সেই আখেজ মনে আছে। সেইজন্যই ছাড়তে চাইছে না। কথাটা মনে হতেই ভারি দুঃখ হল গগনের, খচ করে উঠল বুকের ভিতরে। অল্প বয়সে মা-মরা একমাত্র মেয়ে। নিজের হাতে কোলে-পিঠে মানুষ করা। মনে পড়ল কোথাও বাজাতে বেরবার সময় সিন্দুরকে কারো কাছে রেখে যাওয়াই দায় হয়ে পড়ত। কিছুতেই তার কাছ ছাড়া হতে চাইত না সিন্দুর। অনেক ভুলিয়ে-টুলিয়ে খেলনা আর খাবার হাতে দিয়ে তাকে পাশের বাড়ির হরিদাসের বৌয়ের কাছে রেখে যেত। তারপর দলের সঙ্গে ঢোল কাঁধে ক্রোশের পর ক্রোশ হাঁটতে থাকত গগন। মাঠ পার হ'ত নদী পার হ'ত খেয়ায় কিন্তু মেয়ের কাছেই পড়ে থাকত মন। বাড়ি এলে ছোট ছোট দুখানি হাত দিয়ে সিন্দুর তার গলা জড়িয়ে ধরত, ঠোঁট ফুলিয়ে বলত, 'আর তো ফেলে যাবে না আমাকে? নিয়ে যাবে সঙ্গে?'

নেয় কি করে। ছেলে তো নয় মেয়ে। দলের লোকের ঠাট্টার ভয়ে সিন্দুরকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারত না গগন কিন্তু বাড়িতে যতক্ষণ থাকত কাছে কাছেই সে রাখত মেয়েকে। পাঁঠার চামড়ার ছাউনি লাগাত ঢোলে। সিন্দুর তার পাশে বসে চেয়ে চেয়ে দেখত। বেতের ধামা বাঁধত, সাজি বাঁধত গগন, সিন্দুর বসে থাকত এক নিরিখে। ছ'-সাত বছর বয়স থেকে দেখে দেখে সেও ধামা-সাজি বাঁধতে শিখল, শিখল বাঁশের কাজ। পাড়ার সবাই বলত, 'মেয়ে বটে তোমার একখানা গগন। ছেলে হলে এর দাম হ'ত লাখ টাকা।'

গগন বলত, 'কি জানি কি হ'ত। আমার সিন্দুরের দাম কিন্তু লাখ টাকার চেয়ে ঢের বেশি।'

সেই সিন্দুর একেবারে পর হয়ে গেছে! বাপ বলে গ্রাহ্যই করে না গগনকে। ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ বুঝতে চায় না বাপের। কেবল বোঝে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ। আম নিয়ে জাম নিয়ে ডাল-পাতার ভাগ নিয়ে লক্ষ্মী আর তার ছেলেমেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে। কুটোগাছটিও সে ছাড়তে চায় না। গগন যে বুড়ো হয়েছে, তার যে অভাবের সংসার সে সম্বন্ধে একটুও মায়া-দয়া নেই তার। পয়সা ছাড়া কিছু চেনে না সিন্দুর।

গগন এবার ভাবল কাজ নেই ওর সানাই নিয়ে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল এটি কোনও কাজের কথা নয়। সানাই খুঁজতে যাবে আবার কোথায়। পাড়ায় আর দ্বিতীয় সানাই নেই। একটু চুপ করে থেকে গগন আবার অনুনয় বিনয় শুরু করল, 'অমন অবুঝের মত করিস নে সিন্দুর ওঠ্। সানাই ছাড়া কি করে বায়না রাখতে যাব বল দেখি! উঠে আমাকে দে সানাইটা। কথা দিচ্ছি ফিরে এলে একটা টাকা তোকে আমি দেব।'

সিন্দুর যেন আরও জলে উঠল, 'ইস, আবার টাকার লোভ দেখানো হচ্ছে! খুব টাকাওয়ালা মানুষ হয়ে গেছ বুঝি আজকাল। কাল রাতে যে গালাগালগুলো দিলে ভেবেছ টাকায় তা বুঝি ধুয়ে যাবে, না?'

ঝাঁপ খুলে সিন্দুর এবার সানাইটা এনে হাতে দিল গগনের। বলল, 'দেখ, জিনিসের যেন কোন ক্ষেতি না হয় আমার। যে মানুষ, তাহলে কিন্তু আর রক্ষা থাকবে না।'

গগন বলল, 'না না কিছু ভয় নেই তোর।'

কিন্তু মনে মনে ভাবল আদিখ্যেতা দেখ মেয়েটার। আর একজন কেউ একটু বাজালে যেন ক্ষয়ে যাবে ওদের সানাই। ক্ষমতায় মেজাজে তার স্বামীর পৌরুষ যে অনেক বেশি ঘরজামাই হলেও সে যে শ্বশুরের চেয়ে বড় এই মিথ্যা বড়াইটা গগনের কাছে না করলেই যেন চলে না সিন্দুরের। গগন মনে মনে একটু হাসল। এখনও তার ঢের দেরি। করাত টেনে বেশি টাকাই রোজগার করুক আর যাই করুক মানে মর্যাদায় এ গাঁয়ে গগনকে ছাড়িয়ে যেতে আরেকবার জন্মাতে হবে ভরতকে, এ জন্মে কুলোবে না।

ভোর ভোর সময় যাত্রার আয়োজন শুরু হল। পাড়া থেকে ঢোল কাঁধে করে এল যাদব আর রামলাল। বার-তের বছরের ছোকরা নিমাই এল সঙ্গে। কাঁসি

বাজাবে সে। এরই মধ্যে বেশ তাল-তেহাই জ্ঞান হয়েছে ছোঁড়ার। বেশ পরিষ্কার হাত।

অনেক কালের পুরোনো তালি লাগানো কালো রঙের হাতা-কাটা কোটটা পরে নিল গগন। খুঁজে-পেতে একটা কৌটার ভিতর থেকে দু'খানা রূপোর মেডেল বের করে লক্ষ্মী স্বামীর হাতে এনে দিল। বাসি-বিয়ের দিন ভোরে মলা বাজাবার সময় গগন মেডেল দু'খানা পকেটের কাছে গুঁজে নিতে পারবে। যাদব আর রামলালও যথাসাধ্য সেজেগুজে এসেছে। চৌধুরী-বাড়ি থেকে সেবার একটা পুরোনো পাঞ্জাবি পেয়েছিল যাদব। একটু বড় বড় হয় গায়ে। কাঁধের কাছে একটু ছেঁড়াও আছে। তবু সেই ছেঁড়া জায়গাটা একটু গুঁজে দিয়ে আস্তেন দুটি গুটিয়ে জামাটাকে যাদব বেশ মানানসই করে নিয়েছে। রামলালের অবস্থাটা আরও কিছু ভাল। নিজেরই ছিটের শার্ট আছে তার। দিব্যি মানিয়েছে গায়ে। উৎসাহে প্রত্যেকের মুখ জলজল করছে।

তাদের দিকে তাকিয়ে চোখ তৃপ্ত হয়ে গেল গগনের। মনটা আনন্দে ভরে উঠল। আগেকার দিন আর নেই। তখনকার মত বড় দলও আর নেই। দু'-চার-জন ছেলে-ছোকরাকে নিয়েই আজ বেরুতে হচ্ছে। তবু তো দল একেবারে ভেঙে যায় নি। তবু তো নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ছেলেদের নিয়েই আজ বাজাতে যেতে পারছে গগন। যতই বেয়াড়া বদমাস হোক, অন্য কাজকর্ম করে বেড়াক গগনের ডাকে তবু তো সবাই ঢোল কাঁধে এসে জুটেছে। আর অন্যসময় যে যাই করে বেড়াক না কেন সবাইকেই তো এখন জাত ঢুলী বলে মনে হচ্ছে। হাসিখুশিতে ভরে উঠেছে তো সবারই মুখ।

উঠান থেকে পথে নামবার সময় গগনের নির্দেশ মত সবাই একটু কাঠি দিল ঢোলে। নিজেদের কানেই আওয়াজটা ভারি মধুর লাগল।

উঠানের পুবপ্রান্তে বিচেকলার গাছ হয়েছে দু'-তিনটে। ছেলে কোলে নিয়ে লক্ষ্মী এসে দাঁড়াল সেখানে। একটু দেরি করে এল সিন্দুর। মাঠের আল বেয়ে গগনের ছোট দল তখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। সিন্দুরকে দেখে লক্ষ্মী কোন কথা বলল না। কিন্তু সিন্দুরই এবার এগিয়ে এসে একহাতে গলা জড়িয়ে ধরল লক্ষ্মীর, বলল, 'মানুষটির সত্যই কোন আক্কেল হল না রে!'

লক্ষ্মী বলল, 'কোন্ মানুষটার? তোর বাবার?'

সিন্দুর একটু হাসল, 'না রে না, বাবার জামাইর কথা বলছি।'

কিন্তু মুখের হাসি সত্ত্বেও চোখটা যেন একটু ছলছল করে উঠল সিন্দুরের। গলাটা মনে হল ধরা ধরা।

বিয়ের বায়না সেরে দল নিয়ে গগন ঢুলী ফিরে আসবার আগেই কথাটা পাড়ায় পাড়ায় জানাজানি হয়ে গেল। জামাইয়ের বদলে ভুঁইমালীদের কেশবকে নিয়ে গেছে গগন। সানাইদারের কাজ তাকে দিয়েই সারবে। বর-কনের বিয়ের মুকুট পৌঁছে দিতে গিয়েছিল মুকুন্দ মালাকার। পথে সে নিজের চোখে দেখে এসেছে কেশবকে। ঢুলীর দলের সঙ্গে মিশে সানাই হাতে কেশব যাচ্ছে চণ্ডীপুরের দিকে।

ঢুলীপাড়ার দক্ষিণে দশ-বার ঘর ভুঁইমালীর বাস আছে ফুলবাগ গাঁয়ে। কথাটা শুনে তারা সবাই অপমানিত বোধ করল। এত বড় স্পর্ধা হয়েছে ঢুলীদের যে ভুঁইমালীর ছেলের জাত মারতে চায় তারা! গাঁজাখোর মাথায় ছিটওয়ালা কেশবটারই না হয় কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, জাতজন্ম বিচার নেই, বোধ নেই মান-অপমানের; কিন্তু গগন ঢুলীর আক্কেলখানা কি! মরবার বয়স হতে চলল আর এ হিসেবটা তার হল না। কোন্ বুদ্ধিতে সে নিয়ে গেল অন্য জাতের ছেলেকে। আড়ালে আবডালে নয়, নিস্তব্ধ রাত্রে পা'ড়াপড়শীর ঘরের বারান্দায় নয়, একেবারে প্রকাশ্যভাবে ভিন্ন গায়ে ভিন্ন জাতের দলে বিয়ের মত বৃহৎ সামাজিক ব্যাপারে যে সানাই বাজাবার জন্যে গগন তাকে টেনে নিয়ে গেল, একবার সে ভেবে দেখল না তার পরিণামটা কি! না কি সে ভেবেছে ভুঁইমালীরা একেবারে মরে গেছে, জাতসুদ্ধ উজাড় হয়ে গেছে তারা গাঁ থেকে।

পাড়ার মধ্যে মোড়ল জলধর। ষাটের কাছাকাছি বয়স। মাথার চুলে পাক ধরলেও এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা; ঘরের ভিত্ আর শ্রাদ্ধের বেদী বাঁধায় একসময় বেশ নামডাক ছিল জলধরের। যেমনি তাড়াতাড়ি চলত তার কোদাল তেমনি সুন্দর আর মজবুত হ'ত হাতের কাজ। আজকাল অবশ্য কোদাল সে প্রায় ধরেই না। কেবল ভিটেবাড়ির মালিক চৌধুরীরা যদি কোন ক্রিয়াকার্যে ডাকেন তাহলে যায়। মাটির ভিতের তো আর তাঁদের দরকার নেই, দোতলা পাকা বাড়ি উঠেছে তাঁদের, কেবল শ্রাদ্ধশান্তির সময় গিয়ে খোঁজখবর নিতে হয় জলধরকে কাজকর্মের দরকার আছে কিনা। মাঠে বিঘা পাঁচেক জমি আছে জলধরের। চাষআবাদ ছেলেরাই করে। দেখাশোনা খবরদারির ভার শুধু জলধরের ওপর।

মুকুন্দ মালাকারের কাছে জলধর নিজেই এল ভাল করে কথাটা শুনতে।

দাওয়ায় বসে মুকুন্দ বিড়ি বাঁধছিল। জলধরকে দেখে জলচৌকিখানা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এস মালী জেঠা এস। তারপর খবর কি, বল দেখি?'

জলধর একটু ভ্রূকুটি করল। প্রায় ছেলের বয়সী বয়স মুকুন্দের। কিন্তু ঐ বয়সী স্বজাতের ছেলেরা যেমন 'আসুন বসুন' বলে সম্মান সমীহ দেখায় জলধরকে, মুকুন্দের কাছ থেকে ঠিক সেইরকম শ্রদ্ধা জলধর কোনদিন পায় না। ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের ছেলে-ছোকরারা যে ধরনে কথাবার্তা বলে, যে রকম সম্বোধন করে মুকুন্দও ঠিক সেই রকম করতে চায় জলধরের সঙ্গে। যেন কায়েতপাড়ার কাছে বাড়ি বলে মুকুন্দ নিজেও কায়স্থদের পর্যায়ে উঠেছে। অবশ্য জাত হিসাবে ফুলমালী মালাকারেরা ভুঁইমালীদের চেয়ে দু'-এক ধাপ ওপরেই। সমাজে বসে না খেলেও ইদানীং হাতের জল প্রায় ভুঁইমালীদেরও চল হয়ে গেছে। বাড়িটাড়িতে এলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের ছেলেরা জলধরের বউ-ঝি কি নাতি-নাতনীদের হাতের জল খেতে আজকাল কোন আপত্তি করে না। কিন্তু মুকুন্দরা প্রকাশ্যভাবেই এ গাঁয়ে জলচল হয়েছে একপুরুষ আগে মুকুন্দের বাবা যুধিষ্ঠির মালাকরের সময় থেকে।

যুধিষ্ঠির প্রায় সমবয়সী ছিল জলধরের। বিয়েতে অন্নপ্রাশনে সোলার মুকুট তৈরি করত। মাটি দিয়ে যে শ্রাদ্ধের বেদী গড়ে তুলত জলধর নানা আকারের নানা রঙের সোলার ফুল দিয়ে সেই বেদী সাজাবার ভার ছিল যুধিষ্ঠিরের। পূজায়-পার্বণে হাতের তৈরী সোলার ফুল দিয়ে যেত সে বাড়িতে বাড়িতে। গাছের হাজার ফুল থাকলেও মালীর সোলার ফুল না পাওয়া পর্যন্ত পূজা হ'ত না গৃহস্থের। পূজার পর বাড়ি বাড়ি ঘুরে যুধিষ্ঠির পার্বণী আদায় করত। ঘরের সবচেয়ে বড় ধামাটি নিত সঙ্গে। মুড়ি-মুড়কি নারকেল নাড়ুতে ভরে আনত সেই ধামা। তখন থেকেই জাত হিসাবে প্রতিবেশী ভুঁইমালীদের চেয়ে সে যে উঁচুতে এমন একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল যুধিষ্ঠিরের মনে। গাঁয়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরাও তার সেই ধারণার সমর্থন করত। তবু মুকুন্দের মত এতখানি অহঙ্কার কোনদিন ছিল না যুধিষ্ঠিরের। জলধরের বাপ-খুড়োকে সে সমীহ করত, বন্ধুর মত ব্যবহার করত জলধরের সঙ্গে। কিন্তু গাঁয়ের এম-ই স্কুলে দু'-এক বছর পড়ে আর উঁচু জাতের সঙ্গে একটু বেশি মেলামেশা করে মুকুন্দর চালচলন আচার-ব্যবহারটাও হয়েছে কিছু চড়া চড়া গোছের। ভুঁইমালীদের সে স্পষ্টই ছোটজাত বলে মনে করে। কিন্তু কথাবার্তা আলাপ-ব্যবহারও করে যেন খানিকটা উঁচু জায়গা থেকে। কিন্তু দেমাকের মত অবস্থাটা চড়ে যায় নি মুকুন্দের বরং যুধিষ্ঠিরের তুলনায় পড়েই গেছে। যুধিষ্ঠিরের মত তেমন চমৎকার মুকুট আর ফুল তৈরি করতে পারে না মুকুন্দ। তার কাজের চাহিদাও আর ঠিক

তখনকার দিনের মত নেই। বিয়ের জন্যে বর-কনের মুকুটের চাহিদাটা এখনও আছে কিন্তু শ্রাদ্ধের বেদী সাজানো কিংবা পূজা-পার্বণে মালীর তৈরী ফুল নেওয়ার রেওয়াজটা ক্রমেই উঠে যাচ্ছে। পূজা-পার্বণের সংখ্যাও গেছে কমে। ছেলেবেলায় বাপের সঙ্গে সঙ্গে ধামা মাথায় নিয়ে ঘুরত মুকুন্দ কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর ধামা নিয়ে বেরুনো সে বন্ধ করেছে। একবার একটি চাকর রেখেছিল ধামা বইবার জন্যে কিন্তু লোকে ঠাট্টা-তামাশা করায় তাকে ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে। খরচেও পোষায় নি তাছাড়া। বিয়ের পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে কোন ছেলেপুলে হয় নি মুকুন্দের। হবে না বলেই সকলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু বছর দেড়েক হল জন্মেছে একটি বাচ্চা। ধামা বইবার বয়স তার হয় নি, আর মুকুন্দের ছেলে ধামা কোনদিন বইবেও না। মুকুন্দের স্ত্রী রতি বলে বিশু বড় হয়ে বি. এ., এম. এ. পাশ করে চাকরি করবে গিয়ে শহরে। সোলার ফুল তৈরী করবার কাজ কোনদিন সে করবে না। পৈতৃক পেশা মুকুন্দ নিজেও অনেকবার ছেড়ে দেবে ভেবেছে, আংশিকভাবে ছেড়েও দিয়েছে কিন্তু তার বদলে ভালরকম টাকাপয়সা আসে তেমন কোন কাজে স্থায়ী এবং পাকাপাকিভাবে হাত দিতে পারে নি। তেল-নুন মসলাপাতির দোকান দিয়েছিল একবার গাঁয়ের বাজারে। তাতে লোকসান দিয়ে কিছুকাল হল বিড়ি বাঁধতে শুরু করেছে। এতেও যে তেমন কিছু সুবিধা হচ্ছে বাড়িঘর আসবাবপত্রের চেহারা দেখে তা মনে হয় না। বরং ভুঁইমালীরা দরকার হলে কোদালের বদলে কুড়ুল করাত ধরে, বর্গা চষে, ধান-পাট কাটে কিন্তু তাদের সঙ্গে মিশে মুকুন্দ মালাকারের সে-সব করবার জো নেই। একটু মিহি ধরনের কাজ না হলে মান বাঁচে না মুকুন্দের।

বিড়ির গোড়ায় সবুজ সুতোর গিঁট দিয়ে বাড়তি অংশটুকু কাঁচিতে কেটে ফেলে জলধরের দিকে মুখ তুলে তাকাল মুকুন্দ। তারপর আর একবার জিজ্ঞাসা করল, 'খবর কি জেঠা! নাও, বিড়ি নাও একটা। খেয়ে দেখ দেখি কড়া হয়েছে কিনা।'

বড় একটা ডালার ওপর মুখপোড়া বিড়ি ছোট ছোট বাণ্ডিলে বাঁধা ছিল। তার থেকে একটা বিড়ি তুলে নিয়ে জলধরের হাতে দিল মুকুন্দ, তারপর ঘরের আধা ভেজানো দরজার দিকে তাকিয়ে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে ডাক দিয়ে বলল, 'দেশলাইটা ফেলে দাও তো এখানে।'

ফেলে দিতে বললেই অবশ্য দিয়াশলাইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল না রতি। দরজার আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়াশলাই-এর বাক্সটা জলধরের প্রায় সামনে দাও-

য়ার মেঝের উপর আস্তে রেখে দিল। নীলরঙের কাঁচের চুড়ি আর শাঁখা পরা নিটোল পরিপুষ্ট শ্যামবর্ণের একখানি হাত। জলধর আর মুকুন্দ দুজনেই সেই হাতের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কাঠি জ্বেলে বিড়ি ধরিয়ে জলধর জিজ্ঞাসা করল, 'ছেলে কই মুকুন্দ ? ঘুমুচ্ছে বুঝি !'

মুকুন্দ মৃদু হেসে বলল, 'হ্যাঁ। এই বয়সটাই সুখের জেঠা। খাওয়া আর ঘুমনো ছাড়া আর কোন দায় নেই সংসারে।'

জলধর সংক্ষেপে বলল, 'তা ঠিক।' তারপর শিশু বয়সের সুবিধা সুযোগের আলোচনা ছেড়ে ধাঁ করে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আমাদের কেশবকে নাকি তুমি গগন ঢুলীর দলের সঙ্গে যেতে দেখে এসেছ মুকুন্দ !'

মুকুন্দ আড়চোখে একবার জলধরের মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'দেখলাম তো তাই।'

জলধর জিজ্ঞাসা করল, 'হাতে নাকি সানাই ছিল তার ?'

মুকুন্দ বলল, 'হ্যাঁ, সানাইও একটা দেখলাম তার হাতে।'

জলধর বলল, 'শুধু দেখলেই—কিছু বললে না ? গগন ঢুলীকে কি কেশবকে একবার জিজ্ঞাসাও করলে না সে কেন যাচ্ছে ওই সঙ্গে ?'

উত্তেজনার আভাস পাওয়া গেল জলধরের গলায়।

মুকুন্দ মুচকি হেসে বলল, 'জিজ্ঞাসা করলে ওরা ভারি চক্ষুলজ্জায় পড়ত জেঠা। সত্য কথা চট্ করে বলতে পারত না গোপনও রাখতে পারত না আমার কাছে। মুখে ওরা কিছু না বললেও বুঝতে তো কিছু আমার আর বাকি থাকত না। তার চেয়ে দেখি নি দেখি নি করে আমিও পাশ কাটিয়ে এলাম ওরাও পাশ কাটিয়ে ডানদিক দিয়ে সরে গেল। সেই ভাল হয়েছে।'

এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল জলধরের, একটু বেশি মাত্রায়ই চড়ে গেল গলাটা, কর্কশ কটুকণ্ঠে জলধর বলে উঠল, 'কিন্তু বাপের বেটা যে, আর বুকের পাটা যার আছে সে অমন পাশ কাটিয়ে আসে না মুকুন্দ। অনাচার অত্যাচার দেখলে রুখে দাঁড়ায়, দু'-চার কথা বলে কয়ে একটা বিধি-বিহিত করে তবে ফেরে।'

শান্ত বিবেচক ধরনের মানুষ মুকুন্দ। ধৈর্যশীল বলে খ্যাতি আছে তার। সহসা মাথা গরম আর মুখ খারাপ করে বসে না সে। দত্তবাড়ির এম. এ. পাশ করা সুবিমল তার আদর্শ। ছুটিছাটায় কলকাতা থেকে যখনই সে বাড়ি আসে মুকুন্দ গিয়ে বসে তার কাছে, আলাপ করে—কথাবার্তা বলে। সুবিমলও বেশ পছন্দ করে মুকুন্দকে। পাশে বসিয়ে তাসের সঙ্গী পর্যন্ত করে নিতে কোন সঙ্কোচ করে

না। তাকে দেখে শিখেছে মুকুন্দ। ভিতরে ভিতরে রেগে আগুন হলেও দাঁত-মুখ না খিঁচানোটাই যে ভদ্রতা এ বোধ মুকুন্দর হয়েছে সুবিমলের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করে। হেসে হেসে কথা শুনিয়ে দিতে পারলে শ্রোতার জ্বালাটা যে আরও বেশি হয় এও মুকুন্দ বহুবার বহু জায়গায় পরখ করে দেখেছে।

জলধরের কথা শুনে সুবিমলের কায়দায় মুখের হাসিটুকুকে অবশ্য ঠিক অটুট রাখতে পারল না মুকুন্দ, কিন্তু তাই বলে মুখ-চোখ বিকৃত হতেও দিল না। নিরুত্তেজ শান্ত স্বরেই বলল, 'এর আবার একটা বিধি-বিহিতের কি আছে জেঠা! তাছাড়া আমি বিধি-বিহিত করতে গেলে তা শুনতই বা কে। তোমাদের ভিতর থেকে কেউ হ'ত তা হলেও না হয় কথা ছিল। তাছাড়া জাত যে কেশব কেবল আজই দিল তাও তো নয়।'

মুকুন্দ একটু হাসল, 'বলতে গেলে ঢুলীপাড়ার ভাত খেয়েই তো ও মানুষ। চিরদিনই তো ও তোমাদের জাতে ঠেলা, পায়ে ঠেলা। ধরতে গেলে সমাজের বাইরের মানুষ। কেশব ভুঁইমালী সানাই-ই ধরুক আর ঢোলই ধরুক ফুলবাগের ভুঁইমালীদের যে তাতে মান যাবে সত্যি বলছি জেঠা তা আমার মনেই হয় নি। মনে হলে নিশ্চয়ই দু'কথা বলতাম গগনকে। তোমার মত অতখানি বুকের পাটা না থাকলেও এক আধবার রুখেও দাঁড়াতাম, দু'-একটা কানমলাও অন্তত দিয়ে আসতাম কেশবকে।'

মনে মনে ভারি আত্মপ্রসাদ বোধ করল মুকুন্দ। ঠাণ্ডা মেজাজে ঠিক সুবিমল-বাবুর মতই বলতে পেরেছে কথাগুলো, আর অবিলম্বে ফল ফলেছে তার। রাগে আর উত্তেজনায় ছটফট করে উঠেছে বুড়ো জলধর ভুঁইমালী।

জলচৌকি ছেড়ে তড়াক করে সত্যিই লাফিয়ে উঠল জলধর। বলল, 'থাক, থাক কেশবকে কানমলা দেওয়ার মত আরও লোক আছে ভুঁইমালীপাড়ায়। তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। জলধর ভুঁইমালী এখনও বেঁচে আছে। সে স্বজাতের ছেলে-ছোকরার বাঁদরামির শাসন করতে জানে আবার ভিন্ন জাতের লোকের অবিচার অপমানের শোধ নিতেও কোনদিন ভয় করে না।'

উঁচু দাওয়া থেকে নামবার জন্যে খেজুরে পৈঠা আছে গোটা তিনেক। কিন্তু সেই পৈঠা বেয়ে নামবার মত সবুর সইল না জলধরের। দাওয়া থেকেই লম্বা পা বাড়িয়ে দিল উঠানের ওপর। কিনারের খানিকটা ভেঙে পড়ল নীচে। জলধর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হনহন করে মুকুন্দর উঠান পার হয়ে নামল গিয়ে রাস্তায়।

হতবাক হয়ে তার দিকে একটু তাকিয়ে ছিল মুকুন্দ। স্ত্রীর হাসির শব্দে চমকে উঠে ফিরে তাকাল, বলল, 'হাসছ যে!'

রতি বলল, 'হাসব না? রাগের মাথায় বুড়ো আমার ডোয়া ভেঙে দিয়ে গেল যে। ছুটে ধর গিয়ে শীগগির। তোমারই বা অত কুঁজড়ো বুদ্ধি কেন বাপু! কুমড়োর বিচির মত পেটভরা অত খোঁচামারা কথা কিসের জন্যে! হয়ে গেছে দেশলাইর কাজ? নেব?'

'দাঁড়াও।'

কাঠি জেলে নিজে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে দিয়াশলাইটা স্ত্রীকে ফেরত দিল মুকুন্দ। হাতের পাতায় হলদে ছোপ লেগেছে রতির। বোধ হয় বাটনা বাটতে বাটতে উঠে এসেছে। রতি বলল, 'না, দাঁড়ানোয় কাজ নেই, এবার যাই। এখানে দাঁড়ালেই তো বসে বসে তুমি কেবল মুখ চালাবে। হাতের কাজ আর চলবে না। এতখানি বেলার মধ্যে ক'শো বিড়ি বাঁধা হল শুনি?'

মুকুন্দ বলল, 'মনিব নাকি তুমি আমার যে হিসাব নিচ্ছ কাজের?'

রতি বলিল, 'মনিব ছাড়া কি! তুই থেকে তুমি বলতে শুরু করেছ। এখন যে-আজ্ঞা আর 'আপনি' ধরলেই হল।'

কথাটা রতি আরও কয়েকদিন বলেছে মুকুন্দকে। স্বামীর মুখে সব সময় 'তুমি তুমি' যেন ভারি পোশাকী পোশাকী লাগে। কেমন যেন পর পর মনে হয় স্বামীকে। কখনও বা নিজেকেই ঠেকে পরস্ত্রীর মত। কিন্তু মুকুন্দ তা বলে মত বদলায় নি। পাড়ার ভদ্রঘরের স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের সম্বোধন সে লক্ষ্য করে শুনেছে। দত্তবাড়ি, বোসেদের বাড়ি কি বাঁড়ুয্যে বাড়িতে কেউ স্ত্রীকে তুই বলে না। রাগের সময়ও নয়। সোহাগের সময়ও নয়। সঙ্গে সঙ্গে নিজের অভ্যাসটাও পালটে নিয়েছে মুকুন্দ। আর আশ্চর্য দখল তার নিজের জিভের ওপর। স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবার সময় আজকাল ভুলেও একবার তুমি ছাড়া তুই আসে না তার মুখে। প্রথম প্রথম রতি তো হেসেই অস্থির।

'ও কি গো, তুমি তুমি করছ কেন? পরের বউ বলে ধরে নিলে নাকি আমাকে!'

মুকুন্দ ঈষৎ শাসনের স্বরে বলেছে, 'ছি, ওসব কি বিশ্রী কথা! পরের বউ ভাবতে যাব কেন। নিজের বউকেই ভদ্রলোকে তুমি বলে ডাকে।'

রতি বলেছে, 'তা ডাকুক গিয়ে। আমার কিন্তু তুই কথাটাই মিষ্টি লাগে ভারি। ঘরে তো আর পাঁচজন শ্বশুর-শাশুড়ী, জা-ননদ নেই? মিষ্টি করে ডাকতে অত লাজ কিসের তোমার!'

আরও একদিন রতি তাকে সাবধান করে দিয়েছে, 'দেখ, দিনের বেলায় ডাকতে হয় ডেকো, কিন্তু রাত্রেও তুমি আমাকে অমন আর তুমি তুমি করো না। তোমার মুখে তুমি শুনলে একসঙ্গে থাকার আনন্দই যেন মাটি হয়ে যায়।'

অমনিতে ভারি শান্ত আর ঠাণ্ডা মানুষ মুকুন্দ। কিন্তু কিছুতেই গোঁ ছাড়বে না নিজের। রতিই হাল ছেড়ে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত। বলুক যা বলে খুশি হয়। পৃথিবী আনন্দময় যার চিত্তে যা লয়।

স্ত্রীর কথার জবাবে মুকুন্দ বলল, 'তা আপনিই বলি আর যে-আজ্ঞাই বলি, বিড়ি কয়েক শো বেশি করে বাঁধলে কিছুতেই তোমার বোধ হয় আপত্তি নেই। আসলে ধরন-ধারনটা নিতান্ত মনিবের মতই তোমার।'

রতি মুখ টিপে একটু হাসল, বলল, 'বেশ, তাহলে হুকুমটাও শোন মনিবের। গল্প না করে কাজ কর। আজ হাটবার তা মনে আছে!'

প্রত্যেক হাটবারে রতনগঞ্জে ভুবন সা'র দোকানে গিয়ে বিড়ি জমা দেয় মুকুন্দ। নগদ পয়সা যা মেলে, হাটের খরচটা তাতেই প্রায় কুলিয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিন ধরে বিড়ি বাঁধার কাজে যে ঢিল দিচ্ছে মুকুন্দ তা রতির দৃষ্টি এড়ায় নি। বাট, সোনার চাঁদ ছেলে এসেছে ঘরে এখন কি আর অমন কুঁড়ে হলে চলে মুকুন্দর! এখন তো কেবল আর দুজনের খাওয়া-পরাই নয়, আর একজনের ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হবে যে। দুহাতে টাকা রোজগার না করলে সেই ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে কি করে?

রতি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'বলি কথা বলছ না যে! আছে তো মনে?'

মুকুন্দ এবার একটু বিরক্ত হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। আছে আছে।'

রতি ঠোঁট টিপে হাসল, 'না থেকে আর উপায় কি কর্তা! খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে ঘরের মধ্যে জলজ্যান্ত একটা বউ যখন আছে বেঁচে। আচ্ছা, আমি মরলেই তুমি শান্তি পাও, তাই না?'

মুকুন্দ আরও খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলল, 'খুব খুব। 'তাতে কি আর সন্দেহ আছে কোন?'

গলার স্বর রীতিমত ঝাঁঝাল আর চড়া হয়ে গেছে মুকুন্দের। ওরে বাব্বা! আর নয়, ঠাণ্ডা মানুষ রেগে গেলে না করতে পারে হেন কাজ নেই। রতি তাড়াতাড়ি উঠে গেল ঘরের মধ্যে, কিন্তু রান্নাঘরে যাওয়ার জন্যে খিড়কিদোরের চৌকাঠ পেরুতে না পেরুতেই পুবদিকের মাঠের ভিতর থেকে ঢুম ঢুম ঢোলের শব্দ কানে এল তার। রান্নাঘরে ঢোকা আর হল না। কৌতুহলী হয়ে ফের ফিরে এল রতি

স্বামীর কাছে। একটুও মনে রইল না যে, আজ হাটবার—কাছে গেলে বিড়ি বাঁধার ব্যাঘাত হবে মুকুন্দের।

ঘরের ভিতর দিয়ে আবার দাওয়ায় নামল রতি, স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, 'শুনছ ?'

মুকুন্দ বলল, 'কি বলছ বল না ?'

রতি হেসে বলল, 'পোড়া ছাই! আমি যা বলি তা তো রাত-দিনই শোন। সে কথা বলছি না। বলি ঢোলের শব্দ শুনতে পেলে না মাঠের দিক থেকে ?'

কোনরকম ঔৎসুক্য না দেখিয়ে মুকুন্দ বলল, 'শুনলাম তো।'

নিস্পৃহতা লক্ষ্য না করে উল্লসিত কণ্ঠে রতি বলে উঠল, 'দলবল নিয়ে গগন ঢুলীই ফিরে এল বোধ হয়। কেশবও নিশ্চয়ই আছে ওই সঙ্গে।'

মুকুন্দ বলল, 'থাকবে না যাবে কোথায়!'

কিন্তু কৌতুক কৌতূহল আর এক ধরনের উত্তেজনায় রতি ততক্ষণে রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। স্বামীর নিরুত্তাপ ধরনটাকে একটুও আমল না দিয়ে রতি বলল, 'খুব তো লম্ফঝম্ফ করে গেল, তোমাদের ভুঁইমালী বুড়ো। শেষে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাবে না তো ?'

বিড়ির গোড়ায় সুতোর গিঁট দিতে দিতে মুকুন্দ বলল, 'রক্তারক্তি না ঘোড়ার ডিম! যাও রাঁধো গিয়ে।'

আচ্ছা মানুষ মুকুন্দ। খানিক আগে রতি তাকে কাজের তাগিদ দিয়েছে বলে বুঝি এমনি করে তার শোধ নিতে হবে। মনে মনে ভারি রাগ হল রতির। যেতে যেতে বলল, 'যা বললে তাই রাঁধব। তাই খেয়েই থেকো, সারাদিন।'

মুকুন্দের স্ত্রী রতির অনুমান মিথ্যে নয়। পুব দিকের মাঠের সরু আল পথ বেয়ে গগন ঢুলীর দলই এগিয়ে আসছিল গ্রামের দিকে। ডাইনে বাঁয়ে জমিতে পাট বুনিয়েছে কিষাণরা। সবুজ কচি পাটের চারা বাতাসে নড়ছে একটু একটু। কেউ কেউ গামছা কাঁধে কাচি নিয়ে নিড়াতে বসেছে জমিতে। এপাশে ওপাশে জমি। মাঝখান দিয়ে আধ হাত চওড়া আল। কোন কোন জায়গায় আধ হাতের কম। পাশাপাশি যাওয়া যায় না। আগে পিছে হাঁটতে হয়।

গাঁয়ের কাছাকাছি এসে হঠাৎ ঢোলে বারকয়েক কাঠি দিয়ে উঠল রামলাল। দলের মধ্যে রামের বয়সই সবচেয়ে কম। বিয়ে-বাড়িতে কাঁসি বাজিয়েছে। কিন্তু পথে নেমে জোর করে কেড়ে নিয়েছে যাদবের ঢোল। বলেছে, 'বাজাব না, কাঁধে করে কেবল বয়ে নিয়ে যাব। তাতে তোমার অত আপত্তি কিসের যাদবদা!'

গগন ছিল সবচেয়ে পিছনে। রামলালের ঢোলের বাজনা শুনে সেখান থেকেই ধমক দিয়ে উঠল, 'ওকি, দুপুর বেলা ফের ঢ্যাং ঢ্যাং শুরু করলি কেন রামা? তাল জ্ঞান নেই, মান জ্ঞান নেই কাঠি দিলেই কেবল হল বুঝি ঢোলে!'

রামলাল নীচু গলায় গজগজ করতে করতে বলল, 'আচ্ছা মুশকিলেই পড়া গেছে বুড়োর জ্বালায়। তাল-মান জ্ঞান না থাকলে কাঁসি বাজিয়েছি কি করে? পথে-ঘাটে নেমেও বুঝি একটু বেতালা বাজাতে সাধ-আহ্লাদ হয় না মানুষের! চিরকাল কেবল বুঝি তালে বাজাতেই ভাল লাগে?'

যাদব আর কেশব ছিল পিছনে। রামলালের নালিশের ভঙ্গি দেখে হেসে উঠল। গগন বলল, 'কি হল রে? অত হেসে মরছিস কেন! খুব যে ফুর্তি দেখছি কেশবের।'

যাদব বলল, 'ফুর্তি হবে না কেন জেঠা? একধার থেকে লোকে যদি অমন পঞ্চমুখে সুখ্যাতি করে ফুর্তি কোন্ মানুষের না হয় শুনি! ফুর্তির চোটে পথের মধ্যে যে চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে নি কেশব তাই রক্ষা।'

যাদবের কথার ভঙ্গিতে কেশবও হাসল, বলল, 'ফেটেছি কি না ফেটেছি, না দেখেই অমন ফস করে বলে দিস না যাদব। গায়ে হাত বুলিয়ে আগে ভাল করে দেখে নে। পথের মধ্যে একেবারে ফেটে না পড়লেও বুকে পিঠে দু'চার জায়গায় ফাটল কি আর না পড়েছে!'

কিন্তু মুখে যত তামাসাই করুক সত্যি সত্যিই স্ফূর্তির জোয়ার এসেছিল কেশবের মনে। কনের মাসী পুরোনো একখানা শাড়ি বকশিশ দিয়েছিল বাদ্যকরের দলকে। ফিকে হয়ে গেলেও শাড়িখানির গোলাপী রঙটুকু একেবারে মুছে যায় নি। পথে নেমে পাগড়ির মত করে কেশব মাথায় জড়িয়ে নিয়েছিল সেই শাড়িখানা। বলেছিল, 'রোদ লাগছে যাদবদা।'

যাদব কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল, 'কেন মিছে বলছিস। রোদ তো আমাদের সবারই লাগছে। তাই বলে মাথায় তোর মত অমনি পাগড়ি বেঁধেছে কে? রোদ নয়, তোর রঙ লেগেছে কেশব, মাথায় নয় চোখে।'

কথাটা ঠিকই, রঙ কিছু কিছু চোখে-মনে লেগেছিল কেশবের। বাঁশী বাজিয়ে যে এমন সুখ, এমন আনন্দ পাওয়া যায় তা যেন সে এই প্রথম অনুভব করল। এর আগেও নিরালায় গভীর রাত্রে সে বাঁশী বাজিয়েছে, সানাই নয়, বাঁশের বাঁশী। মাধব বৈরাগী আর তার বোষ্টমী তুলসী কোনদিন কান পেতে শুনেছে, কোনদিন বা বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছে, 'আঃ, থাম্ কেশব, থাম্ হয়েছে, এবার ঘুমুতে যা।'

কেশব কোনদিন বা উঠে গেছে কোনদিন বা বাজিয়ে বাজিয়ে তাদের আরও বিরক্তি করে তুলেছে। কিন্তু এমন প্রকাশ্যে বিয়ে-বাড়িতে সানাই বাজিয়ে লোকের প্রশংসা পাওয়া তার ভাগ্যে আর হয় নি। এ আনন্দের স্বাদ আলাদা। গোপনে গোপনে নিজের মনে মনে খুশি হওয়া না, আরও পাঁচজনের মনে খুশি ছড়িয়ে দিতে দিতে নিজেরও খুশি হয়ে ওঠা।

সরকারদের মেজকর্তা গগনকে বলেছিলেন, 'তোমার জামাই ভরত আসে নি শুনে ভারি রাগ হয়েছিল। ভেবেছিলাম দলের মধ্যে অমন সানাই ধরবার আর লোক কোথায় তোমার। কিন্তু এ ছেলেটিও তো দেখলাম বেশ বাজায়। ভরতের চেয়ে নেহাৎ যে খারাপ বাজিয়েছে তা নয়। কালে কালে বোধ হয় ভরতকে ছাড়িয়ে যাবে। ধরে রেখো; যেন অন্যদলে না চলে যায়।'

গগন মৃদু হেসে বলেছিল, 'আজ্ঞে না কর্তা, অন্য কোন দলে যাবে না। কিন্তু আমার দলেও ওকে ধরে রাখতে পারব না তাই বলে। ও আমাদের জাতের লোক নয় কর্তা, ঢুলী নয় ও। ভুঁইমালী, সখ করে বাজাতে এসেছে।'

মেজকর্তা কেশবের দিকে কৌতুহলী চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'বল কি হে, ভারি আশ্চর্য তো, ভুঁইমালীর ছেলে নাকি ও! কোদাল ছেড়ে সানাই নিয়েছে কেন হাতে—এ আবার কি সখ! জাত যাবে যে। কিন্তু যাই বল বাজিয়েছে কিন্তু বেশ।'

ছোটকর্তা দেশ-গাঁয়ে থাকেন না। চাকরি করেন কলকাতায়। কালেভদ্রে আসেন বাড়িতে। গগনকে ছেলেবেলায় দু'-একবার দেখেছেন। সেই সূত্রে আলাপও করলেন গগনের সঙ্গে, বললেন, 'এই বুঝি তোমার সেই সানাইদার জামাই? বেশ বাজায় তো! সেজদির বিয়েতেও তো তোমরা সেবার এসেছিলে।'

যাদব আর রামলাল কেশবের দিকে তাকিয়ে মুখ মুচকে হাসতে লাগল। লজ্জিত হয়ে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল কেশব। গগন জিভ কেটে বলল, 'আজ্ঞে না কর্তা, আমার জামাই নয়, ওর নাম কেশব, অন্য বাড়ির লোক। ক'দিন ধরে ভারি জ্বর হয়েছে ভরতের। তাই সে আসতে পারল না।'

ইচ্ছা করেই একটু মিথ্যা কথা বলল গগন। ভুঁইমালীদের শুকচাঁদের সঙ্গে গগনের মত নামকরা ঢুলীর জামাই করাতের কাজে বেরিয়েছে বিদেশে বিভুঁয়ে একথা স্বীকার করা যায়? তাতে গগন ঢুলীর মত লোকের মান থাকে!

ছোটকর্তা অপ্রতিভ হয়ে পড়েন, কৌতুক পেয়ে একটু হাসলেন ও মুখ চেপে

তারপর বললেন, 'ও তাই বল, আমারই ভুল হয়েছে তাহলে চিনে উঠতে পারি নি। কিছু মনে করো না।'

গগন সবিনয়ে হাত জোড় করেছিল, 'আজ্ঞে না কর্তা, মনে করবার আবার কি আছে। আপনি কি গাঁয়ে থাকেন না আসেন যে মানুষ চিনবেন এখানকার!'

কেবল সরকার-বাড়ির কর্তারাই নয়, বিয়েবাড়িতে আরও যত কুটুম্ব-স্বজন এসেছিল পাড়াপড়শী যারা এসেছিল বিয়ে দেখতে তারা সবাই-ই যে কেশবের সানাই শুনে খুশি হয়েছে এ সম্বন্ধে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। বর-যাত্রীর আসরে যখন কনের মুখ দেখানো হল সেই চন্দনের দাগ লাগা হাসি হাসি মুখ কেশবও দুর থেকে লক্ষ্য করেছিল। তার সানাই নিশ্চয়ই শুনেছে এই বিয়ের কনে। মুখ ফুটে তো বলে যেতে পারে নি কেশবকে, লজ্জায় বেধেছে কিন্তু সুরটুকু নিশ্চয়ই ভাল লেগেছে তার। দেখেশুনে বেশ ভাল জামাই এনেছেন, জিনিস-পত্র গয়নাগাঁটি খুব দিয়েছেন। খুশি হবার যথেষ্টই কারণ আছে বিয়ের কনের, কিন্তু কেশব প্রাণমন দিয়ে সানাই বাজিয়েছে; বিয়ের কনের মনের সুর ফুটিয়ে তুলেছে তার বাঁশীতে। তার জন্যেও কি একটু বেশি খুশি হয় নি বিয়ের আসরের ওই রাঙা চেলীপরা মেয়েটি? পরদিন বাসি-বিয়ের পর বিকালের দিকে যখন বর-কনের বিদায় নেওয়ার পালা এল, ছল-ছল করে উঠল মা-জেঠীর চোখ, জল দেখা দিল কনের কাজল-পরা চোখে তখনও ঠিক মানানসই সুর বেজেছিল কেশবের সানাইতে। বাজাতে বাজাতে নিজের চোখেই একসময় জল এসে পড়েছিল কেশবের, তার সানাই যদি যোগ না দিত, যদি ঠিক ঠিক সুর না ধরত সেই সময়, মা-জেঠীর সঙ্গে সঙ্গে তার সানাইও যদি অমন করে কেঁদে না উঠত, তাহলে কি আশে পাশে দাঁড়ানো পাড়াপড়শী, কুটুম্ব-স্বজনের চোখ মুখ অত ভার ভার দেখাত, অতখানি দুঃখ লাগত তাদের সবারই মনে?

কেশবের ধারণা তার সানাইতে সবাই খুশি হয়েছিল, যারা মুখ ফুটে বলে গেছে কেবল তারাই নয়, যারা মুখ ফুটে বলে যেতে পারে নি তাদের আনন্দও তাদের চোখে-মুখে দেখতে পেয়েছিল কেশব। দলের যাদব আর রামলালও খুব প্রশংসা করেছিল, 'বেশ বাজনা হচ্ছে কেশব, বেশ বেশ। তোর সানাই শুনে কে বলবে তুই ঢুলী নয় জাতে!'

কেশব হেসে বলেছিল, 'দুর দুর, ঢুলী আবার একটা জাত নাকি? ঢুলী কেন হতে যাব আমি, আমরা ভুঁইমালী। তোদের চেয়ে দু'-তিনটি উঁচু ধাপের মানুষ। জানিস হাতের জল প্রায় চল হয়ে এসেছে আমাদের।'

বড়াই ত নিজে করে নি কেশব, জাতের মোড়লশ্রেণীর লোকের অনুকরণ করে তাদের ঠাট্টা করেছিল। কেশবের আবার জাতজন্মের বালাই আছে নাকি? নিতাই ঢুলীর বাড়িতে ফেন-পান্তা খেয়ে খেয়ে উদ্ধার হয়ে গেছে না, উদ্ধার করে দিয়েছে না চোদ্দপুরুষ!

তবু যখন ঢুলীদের খাবার ডাক এল, সরকারদের পুবের দাওয়ায় কলার পাতা পেতে বসতে বসতে গগন ঢুলী গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তুই কি আমাদের সঙ্গেই খাবি কেশব না একটু আগে পরে বসবি, না কি কর্তাদের বলব তোকে আলাদা জায়গায় ঠাঁই করে দিতে?'

সানাই থামলেও সানাই-এর সুর থামে নি কেশবের মনে। যাদবের ঠিক ডান পাশটিতে বসে, মেটে গ্লাসের জলে পাতা ধুয়ে নিতে নিতে কেশব জবাব দিয়েছিল, 'হ্যাঁ' কর্তাদের বলে এস গগনখুড়ো, আমাকে একেবারে বামুন-কায়েতের বৈঠকে নিয়ে বসিয়ে দিয়ে আসুক, সানাই বাজাবার বেলায় কানাই আর খাওয়ার বেলায় দুর দুর করছ!'

গগন তেমনি গম্ভীর স্বরে বলেছিল, 'দেখ বাপু, শেষকালে যেন এই নিয়ে একটা গণ্ডগোল-টোল কিছু না হয়।'

কেশব হেসে বলেছিল, 'হ্যাঁ, গণ্ডগোল কেন, একেবারে যুদ্ধ বেধে যাবে ইংরেজ-জার্মানে।'

গগনের মনের ভাবটা একটু একটু না বুঝতে পেরেছিল কেশব তা নয়। যদিও গগন এর মধ্যে দু'-চারবার বলেছে, 'বায়নাটা তোর জন্যই এবার রয়ে গেল কেশব, জাতের ভয় না করে আমার জাত-মান তুই বাঁচালি, নিজের ছেলে জামাইতেও এতখানি করে না, কিংবা তোর যে সত্যিই এতখানি সুর-মান জ্ঞান আছে তা আমি ভাবি নি কেশব, সত্যিই বেশ হচ্ছে তোর সানাই, বেশ হচ্ছে তোর সানাই, বেশ বাজাচ্ছিস!'

এসব কথাও মাঝে মাঝে তাকে গগন শুনিয়েছে, তবু কেশবের সুখ্যাতিতে প্রাণ খুলে যে গগন সায় দিতে পারছে না তা কেশব টের পেয়েছিল। বুড়োর ভাব দেখে মনে মনে কেশব না হেসে পারে নি। যে প্রশংসাটা তার জামাই ভরতের পাওয়ার কথা সেই প্রশংসা পাবে কেশব। সহ্য করতে পারবে কেন গগন? হলই বা জামাইয়ের সঙ্গে তার অবনিবনা ও মন কষাকষি, তবু জামাই তো সম্পর্কে, সিন্দুরকে তো সে সুখে রেখেছে, ভাত-কাপড় দিচ্ছে। তার পাওনাটা কেশব যদি নিতে যায় মনে মনে রাগ তো একটু হতেই পারে গগনের, তাছাড়া কেশবকে

তার জামাই বলে লোকে বার বার ভুল করায়ও বুড়ো গগন মনে মনে কম চটে নি। মনে মনে ভারি কৌতুক বোধ করেছে কেশব। এই ব্যাপারে মুখে বলেছে, এ কিন্তু ভারি অন্যায় কর্তাদের। দেশ-গাঁয়ে থাকবেন না, লোকজন চিনবেন না রামকে বলবেন শ্যাম আর শ্যামকে বলবেন যদু। গগন বলেছে, 'হুঁ ?'

'কিন্তু রামকে শ্যাম বললেই তো সে আর শ্যাম হয়ে যায় না, কি বল ঢুলী খুড়ো ?'

গগন ঢুলী বিরক্ত হয়ে বলেছে, 'আঃ, এবার থাম্ দেখি কেশব, একটু ঘুমুতে দে। গাঁজার ঘোরেই তুই থাকিস ভাল, না পেলেই বকবকানি বাড়ে।'

বিদায় বকশিশ নিয়ে দলের সঙ্গে গাঁয়ের দিকে এগুতে এগুতে বিয়েবাড়ির কথাই বার বার মনে পড়েছিল কেশবের। আর যাদব তার ভাবভঙ্গি দেখে কথা-বার্তা শুনে মাঝে মাঝে ফোড়ন কাটছিল। গগনের কাছ থেকে যতখানি প্রাণ-খোলা কৃতজ্ঞতা, আর প্রশংসা কেশব আশা করেছিল ততখানি না পেলেও আনন্দের অভাব ছিল না কেশবের মনে। এর আগে দু'কান ভরে নিজের এমন সুখ্যাতিও সে কোনদিন শোনে নি কোন উঁচু জাতের বিয়েবাড়ির আমোদ উৎসবে এমন করে মেশেও নি। সেখানকার মাছ-তরকারি, মিষ্টান্নের স্বাদই যে কেশবের জিভে লেগে রয়েছিল তাই নয় কিসের যেন ভারি মিষ্টি একটু গন্ধও তার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে এসেছিল। বাসি-বিয়ের দিন একটু বেলা হলে খই-মুড়ি দিয়ে তাদের জলখাবারের ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিল একুশ-বাইশ বছরের একটি ফর্সা সুন্দরপানা মেয়ে। কেশব পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, যে মেয়ের বিয়ে হল এটি তার বড় বোন। দেখতে বিয়ের কনের চেয়েও সুন্দরী। সিন্দুরের সরু দাগ ছিল সিঁথিতে আর ভিজে চুলের রাশে তার সমস্ত পিঠ ঢেকে গিয়েছিল। কেশবের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বিয়েবাড়ির যে গন্ধ জড়িয়ে এসেছে সে গন্ধ ঠিক যেন সেই মেয়েটির চুলের গন্ধের মত।

মাঠ ছাড়িয়ে দল নিয়ে পাড়ার মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছে গগন ঢুলী, ভুঁইমালীদের জলধর, অশ্বিনী আর নন্দ এসে পথ আটকে দাঁড়াল, 'থামো।'

কিসের একটু একটু সোরগোল আগে থেকে কানে যাচ্ছিল গগনদের, কিন্তু জলধরের রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। গগন বলল, 'ব্যাপার কি, হল কি তোমাদের ভুঁইমালী ?'

জলধর প্রায় গর্জে উঠল, 'কি হল তা আবার মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করছ ? লজ্জা করছে না বলতে !'

গগনের চেয়ে বছর কয়েকের বড়ই হবে জলধর। মাথার চুল সবই প্রায় পেকে সাদা হয়ে গেছে। গগনের মত অমন শক্ত-সমর্থ চেহারাও তার নেই। আকৃতি খুব লম্বা বলেই যেন সামনের দিকে একটু বেশি নুয়ে পড়েছে বলে মনে হয়।

ওপর আর নীচের পাটি মিলিয়ে চার-পাঁচটির বেশি দাঁত নেই সামনের দিকে, রাগের চোটে দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটু থুথুর ছিটে এল গগনের গালে। বিরক্ত হয়ে দু' পা পিছিয়ে গেল গগন, আঙুলের ডগা দিয়ে থুথুটুকু মুছে ফেলতে ফেলতে গগন বলল, 'আঃ একটু আস্তে কথা বল জলধর। থুথু ছিটছে তোমার মুখ থেকে।'

জলধর মোটেই অপ্রতিভ হল না, বলল, 'ছিটুক, তোমরা ইচ্ছে করে সমস্ত ভূঁইমালীপাড়ার মুখে থুথু ছিটিয়েছ, চুন কালি দিয়েছ আমাদের মুখে, থুথু তো ভাল, ঢুলীপাড়ার মুখ ভরে বমি করলেও তো শোধ যায় না তার, জ্বালা মেটে না, রাগ মেটে না গায়ের।'

মনে মনে সবই বুঝতে পেরেছিল গগন কিন্তু না বোঝার ভান করে ভাল মানুষের মত বলল, 'কেন করেছি কি, কি এমন মহা ক্ষেতি করেছি ভূঁইমালীদের?'

নন্দ ভূঁইমালী এগিয়ে এসে বলল, 'এর চেয়ে আবার কি ক্ষেতি করবে গগন ঢুলী? চুরি করবে, না ডাকাতি করবে, না মেয়ে বউ বের করে নিয়ে যাবে ঘর থেকে! তার চেয়ে বেশি ক্ষেতি করেছ। ভূঁইমালীর ছেলেকে দিয়ে সানাই বাজিয়েছ। জাত মেরেছ ভূঁইমালীদের। জাতকে জাতসুদ্ধ বেইজ্জত করে আবার বলছ কি ক্ষেতি করেছি?'

গোলমাল শুনে ভূঁইমালীপাড়া আর ঢুলীপাড়ার আরও দু'চারজন করে এসে জমতে লাগল মাঝখানের ঝাঁকড়া আমগাছের তলায়। কুণ্ডুদের, চৌধুরীদেরও কেউ কেউ এসে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল।

অশ্বিনী ভূঁইমালী অনুযোগ করল স্বয়ং কেশবকে, 'আচ্ছা তুই নিজেই বা কোন্ আক্কেলে গেলি কেশব? একটু লজ্জা হল না, একটু ভয় হল না ধর্মের, সমাজের! ডাকামাত্রই ঢুলীদের দলে গিয়ে মিশলি তুই, এঁটো বাঁশী বাজালি ভরত ঢুলীর মুখের। ছি ছি ছি, সমস্ত জাতটার মুখ হাসিয়ে ছাড়লি তুই কেশব। কি রকম মানুষ রে তুই, একটু মায়া হল না, জাতের জন্যে, সমাজের জন্যে!'

প্রথমটায় একটু একটু হাসি পাচ্ছিল কেশবের কিন্তু অশ্বিনীর অভিযোগের ভঙ্গিতে ঠিক যেন হাসি এল না। এ তো কেবল শাসন আর অভিযোগ অনুযোগ নয়, করুণ আবেদনের সুর বাজছে অশ্বিনীর গলায়। অশ্বিনীর হয়ে সমস্ত ভূঁইমালী

জাতটা যেন তার কাছে সখেদে নালিশ জানাচ্ছে। এমন শাস্তি, এমন লাঞ্ছনা সে কোন্ প্রাণে দিল গোটা জাতকে! একটু কি দুঃখ হল না তার, একটু কি লাগল না বুকে যে বাপ-দাদা চোদ্দপুরুষের এমন পবিত্র জাতটাকে সে কলঙ্কিত করে ফেলল! কেমন করে উঠল যেন কেশবের বুকের মধ্যে। চড়া স্বরে যে কথা বলতে যাচ্ছিল তা আর বলা হল না। অশ্বিনীর কথার জবাবে কেশব বলল, 'ঢুলী-দের দলে সানাই বাজিয়েছি কে বললে তোমাদের অশ্বিনী কাকা? আমার কি এতটুকু জ্ঞানগম্যি নেই, আক্কেল পছন্দ নেই, জাত-মানের ভয় নেই যে তা করতে যাব! আমি অমনই বেড়াতে গিয়েছিলাম। একটু ঘুরেটুরে মজা দেখে খেয়ে-দেয়ে এলাম। চণ্ডীপুর তো এমন বেশি দুর নয়। সেখানে সবাই আমাকে চেনে জানে। আমাকে সানাই বাজাতে বলবে ঢুলীদের মধ্যে কার এমন সাহস আছে শুনি? কার এমন বুকের পাটা আছে?'

মিনিট কয়েক আগেও যে সম্মানে, যে গৌরবে মন ভরে রয়েছিল কেশবের, সমস্ত ভুঁইমালী জাতের মান রাখবার জন্যে সেই কৃতিত্ব আর গৌরব একেবারে অস্বীকার করে ফেলল কেশব। কোন সঙ্কোচ নেই, কিছুমাত্র যেন দ্বিধা নেই তার মনে।

কিন্তু যাদব আর রামলাল অত সহজে ছেড়ে দিল না তাকে। জাত তুলে গাল দেওয়ায় তারা ততক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ভিড় ঠেলে যাদব কেশবের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বলল, 'খবরদার কেশব, জাত তুলে কথা বলিস নে। ঢুলীরা তোর মত অমন মিথ্যুক কেউ নয়। ভাত খেয়ে মুখ মুছে তারা তোর মত অমন কেউ বলতে পারে না যে খাই নি। সাঁচ্চা কথা বল কেশব, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে যা করেছিস সব সতি করে বল, মিথ্যে বললে ঘা হবে জিভে, আলজিভসুদ্ধ খসে পড়বে। ভরত ঢুলীর মুখের সানাই বাজাস নি তুই, ভাত খাস নি তিনবেলা আমাদের মধ্যে বসে? সাহস আর বুকের পাটা ঢুলীদের সবারই আছে। কেবল তোরই নেই। কি করে থাকবে! ঢুলীদের ভাতই কেবল খেয়েছিস কিন্তু জাত তো বদলাতে পারিস নি!'

গগন বলল, 'আঃ, থাম্ যাদব, তুই একটু থাম্ না। সত্যিই তো, কেশব কেন সানাই বাজাতে যাবে আমাদের দলে,—'

যাদব এবার রুখে উঠল গগনের ওপর, 'তুমি চুপ কর বুড়ো। তোমার মত অত প্রাণের ভয় নেই আমাদের। তোমার মত অত ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি আমাদের গায়ের রক্ত যে লোকজন দেখে ভয়ে পিছিয়ে যাব, ভয় পাব সাঁচ্চা কথা বলতে!

প্রাণের চেয়ে জাত-মানের দাম আমাদের কাছে অনেক বেশি। অত যদি ভয়ডর তোমার, বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছ বউ আছে ঘরে তার আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাক গিয়ে যাও।'

কুণ্ডুদের হরিদাস পিছনে দাঁড়িয়ে কৌতুক দেখছিল। যাদবদের কথা শুনে মন্তব্য করল, 'না হে যাদব, সে দিন কাল আর নেই। বউ তো একজন না একজন সবার ঘরে আছে। কিন্তু লুকাবার মত লম্বা আঁচল আছে ক'জনের বউয়ের। যা শাড়ি কন্‌ট্রোলের তাতে নিজের অঙ্গই সবটুকু ঢাকে না তারপর আবার স্বামীকে লুকাবে!'

হরিদাসের কথার ভঙ্গীতে পিছনের দর্শকদের অনেকেই হেসে উঠল। একটু হালকা হল আবহাওয়াটা। জলধর বলল, 'সে মেনে নিচ্ছে যাদবদের কথাই সত্যি। ভয় পেয়ে কেশবই মিথ্যে কথা বলেছে। কিন্তু সানাই যদি গিয়ে বাজিয়েই থাকে কেশব, দোষটা কার? তার না ঢুলিদের? গাঁজা খেয়ে তাড়ি খেয়ে মাথার তো কোন ঠিক নেই কেশবের। তার বয়সটাই বা এমন কি! তেইশ-চব্বিশ বছরের বেশি নিশ্চয়ই নয়। ষাট বছরের বুড়ো গগন ঢুলী তাকে লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গেল কোন্ আক্কেলে! এখন মিথ্যা কথা বলেই বুঝি ছাড়া পাবে ভেবেছে। অত কাঁচা ছেলে, কাছাখোলা মানুষ জলধর নয়। এখনও বেঁচে আছে ভুঁইমালীরা। অত সহজে তারা ছেড়ে দেবে না ঢুলীদের। একি মগের মুল্লুক যে, যার যা খুশি সে তাই করবে! একটা বিচার আচার নেই, সালিশ-দরবার নেই গাঁয়ে!'

যাদব রাজী হয়ে বলল, 'বেশ তো হোক না বিচার-আচার, বসুক না দরবার-সালিশ। তাতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু জাত তুলে গাল দিলে আমরাও চুপ করে থাকব না, অযথা দোষারোপ করলে মুখ বুজে হজম করে যাওয়ার মত ঠাণ্ডা মানুষ গগন ঢুলী হতে পারে কিন্তু সে ছাড়া আরও মানুষ আছে ঢুলীদের পাড়ায়, কথা বলবার আরও লোক আছে আমাদের।'

মাথায় পাগড়ির মত করে বাঁধা রঙীন শাড়িখানা কেশব খুলে দিল গগনের হাতে। সানাইটা যাদবের কাছে আগেই ফেরত দিয়েছিল। ভুঁইমালীর দলের পিছনে পিছনে নিঃশব্দে সে এগিয়ে যেতে লাগল।

ঢুলীপাড়ার ভিতর দিয়েই যেতে হয় ভুঁইমালীপাড়ায়, খানিকটা পথ এগুতেই দেখা হল সিন্দুরের সঙ্গে, ভরত যখন বাড়ি থাকে না তখন বাড়িটা একান্তই বাপের বাড়ি সিন্দুরের। পাড়ার সকলের সামনেই বের হয়, সকলের সঙ্গেই কথা বলে। চাল-

চলনে কোনরকম আড়ষ্টতার বালাই নেই, লাজলজ্জাটাও সমবয়সী বউ-ঝিদের চেয়ে কম।

সিন্দুর বলল, 'ব্যাপার কি বাবা। গাঁয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই এত চেঁচামেচি হচ্ছিল কিসের তোমাদের? বাবারে বাবা, নাইতে গেছি ঘাটে। ডুব দিয়ে সেরে আসতে পারি কি পারি না। জলের তল পর্যন্ত তোমাদের গলা গিয়ে পৌঁছেছে। হয়েছে কি?'

গগন ধমকের সুরে বলল, 'মেয়েমানুষ হয়ে সে-সব কথায় তোর কাজ কি সিন্দুর, যা এগুলি নিয়ে এখন ঘরে যা, শুনতে হয় পরে শুনিস সব।'

সানাই আর বকশিশ পাওয়া পুরোনো রঙীন শাড়িখানা মেয়ের হাতে ধরে দিল গগন।

কিন্তু সিন্দুরের কৌতূহল তবু থামতে চায় না। বাপের কাছ থেকে কথার জবাব না পেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল যাদবকে, 'হয়েছে কি রাঙাকাকা, কেউ তোমরা কোন কথা বলছ না যে?'

যাদবও গম্ভীর হয়ে জবাব দিল, 'এখন ঘরে যা সিন্দুর। কি হয়েছে না হয়েছে শুনিস তোর বাপের কাছে।'

সবারই এমন গম্ভীর থমথমে ভাব দেখে সিন্দুর মনে মনে ভারি কৌতুক বোধ করল। কেশব যাচ্ছিল পাশ কাটিয়ে। কিন্তু পথ আগলে সিন্দুর গিয়ে দাঁড়াল তার সামনে। তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'বলি হয়েছে কি ছোট বৈরাগী? গাঁসুদ্ধ লোক রাগে যে একেবারে গুম মেরে রয়েছে। কারও মুখে কোন কথাই নেই, বলি হল কি তোমাদের?'

মাধবদাসের আখড়ায় বেশির ভাগ সময় থাকে এবং তার গাঁজার কলকের প্রসাদ পায় বলে পাড়ার মেয়েদের অনেকেই কেশবকে আড়ালে আবডালে ছোট বৈরাগী বলে ডাকে। বোষ্টম ঠাকরুণের সঙ্গে অল্প অল্প একটু মধুর সম্পর্কও যে আছে কেশবের কথাটার মধ্যে সেই তামাসাটুকু ভরে দিতে চায়। কিন্তু সিন্দুর অত আড়াল-আবডাল মানে না। সম্বোধনটা সে সামনাসামনিই করে কেশবকে। প্রথম প্রথম কেশব ভারি চটে যেত প্রায় তেড়ে আসত মারতে, কিন্তু শুনে শুনে আজকাল কানে সয়ে গেছে কেশবের।

সিন্দুরের কথায় চমকে উঠে কেশব তার মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার চমকে উঠল কেশব, সিন্দুরও সদ্য স্নান করে কাপড় ছেড়ে এসেছে, পিঠভরে ছড়িয়ে পড়েছে তার চুলের রাশ, কেবল তাই নয়, বিয়েবাড়ির

কনের সেই ফর্সাপানা দিদির সুন্দর মুখের সঙ্গে অনেকখানি মিলও যেন রয়েছে সিন্দুরের মুখের। সবখানি নয়, সিন্দুরপরা কপাল, নাক-চোখের আদল সেই কনের দিদির মত। কিন্তু নীচেরটুকু? পাতলা ঠোঁট আর ছোট্ট থুতনি যে অবিকল সেই রাঙা চেলীপরা বিয়ের কনের জিনিস!

নিজের কৌতুকেই নিজে মগ্ন ছিল সিন্দুর। কেশবের চমকানোটা লক্ষ্য করল না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আর একবার খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বলি ভাঙোই না একটুখানি গোমর। এত হৈচৈ করছিলে কেন সবাই! হয়েছিল কি?'

বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল কেশবের। সিন্দুরের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, 'হয় নি তেমন কিছু। লোকে বলাবলি করছিল আমার নাকি জাত গেছে!'

হাসতে হাসতে পথের মধ্যে প্রায় লুটিয়ে পড়তে চাইল সিন্দুর, 'ও মা তাই নাকি! তোমার আবার যাওয়ার মত জাতজন্ম ছিল নাকি ছোট বৈরাগী? তা কেমনে গেল, কি বিত্তান্ত একটু খুলেটুলে বলেই যাও না ব্যাপারটা।'

ততক্ষণে গগন আর যাদবের দল এসেছে, গগন গিয়ে থাবা দিয়ে হাত ধরল মেয়ের, 'আর হাসিস নে সিন্দুর সব্বনাশ করিস নে আমার, ঘরে আয়।'

এমন আতঙ্কের সুর বাপের মুখে কোনদিন আর শোনে নি সিন্দুর।

চমকে উঠে গগনের মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে শান্ত বাধ্য মেয়ের মত বলল, 'চলো।'

গগনের মুখ দেখে অবাক হয়ে গেছে সিন্দুর। হঠাৎ এত ভয় পেয়েছে কেন তার বাবা। কেশবের জাত যাওয়ার সঙ্গে সিন্দুরের হেসে ওঠার সঙ্গে এমন কি সম্পর্ক আছে তার বাবার উদ্বেগ আতঙ্কের।

সাত-আট হাত লম্বা একখানা করাতের দুই প্রান্ত দু'জনে কাঁধে নিয়ে ভরত ঢুলী আর শুকচাঁদ ভুঁইমালী পরদিন দুপুর বেলায় গাঁয়ে এসে পৌঁছল। উত্তর অঞ্চলে সাড়েসাতকাঠির সিকদারদের কাঠ-থলিতে করাতের কাজে গিয়েছিল ভরত মাস-খানেক আগে। কাজ ভালই চলছিল। নদীর পাড়ের বেশ কাঠের আড়ত সিক-দারদের, মোটা মোটা সব শালকাঠের গুঁড়িতে বালির চর-পড়া নদীর ধারটা ঢেকে গেছে। দিনভর করাত চলছে পনের-বিশখানা। সিকদারদের আড়তের দু'-তিনজন কর্মচারী ফতুয়া গায়ে গোল ফিতে হাতে চটিজুতার চটপট শব্দ করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফিতে ধরে ধরে মাপজোখ করে চকখড়ির দাগ দিয়ে কাঠ ফাড়বার

জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছে করাতীদের, ঘরের খুঁটি, আঠন, বাতা, নৌকার তক্তা— ফেড়ে ফেড়ে নানারকম জিনিসই বের করেছে করাতীরা শালকাঠের গুঁড়ি থেকে। দু'সপ্তাহ যেতে না যেতেই সব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বেশ ভাল কারবার সিকদারদের। ধারেকাছে এত বড় কাঠের আড়ত আর কোন গঞ্জে-বন্দরে নেই। শুকচাঁদ অনেক দিন ধরে কাজ করছে এখানে। সেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল ভরতকে। ঘর-জামাই হয়ে এ গ্রামে আসা অবধি শুকচাঁদ ভুঁইমালীর সঙ্গে ভারি মনের মিল ছিল ভরতের। তার বুদ্ধি-পরামর্শ ছাড়া ভরত চলে না। শুকচাঁদই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে করাতের কাজে নামিয়েছে তাকে। বলেছে এমন লম্বা-চওড়া চেহারা, শালকাঠের মত এমন শক্ত মজবুত দেহ আর দেহভরা এত তাগদ থাকতে কেবল সানাই ফুঁকেই জীবন কাটাবি ভরত! অবসর সময়ে কোন কোন দিন উঠানে স্ত্রীর সঙ্গে বেতের কাজ বাঁশের কাজ নিয়ে বসেছে ভরত। ধামা বেঁধেছে, সের-টুরি বেঁধেছে, বাঁশের বেতী তুলে কুলো, চালুনি, মাছের খালুই, ফুলের সাজি তৈরি করেছে ভরত। তামাক খেতে খেতে শুকচাঁদ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হেসেছে। 'এক কাজ কর্ ভরত, বউয়ের মত তুইও শাঁখা-চুড়ি পর। চুড়ি না পরলে অমন মেয়েলী মিহি কাজে হাত খুলবে না। তোর চেয়ে সিন্দুরের হাতের কাজ ঢের ভালো।'

সিন্দুর মুখ টিপে টিপে হেসে বলেছে, 'এত রঙ্গও জানো তুমি শুকোদাদা।'

কাজ ফেলে ভরত হঠাৎ ডান হাতখানা এগিয়ে দিয়েছে শুকচাঁদের দিকে, 'পরা দেখি এ-হাতে শাঁখা-চুড়ি, বুঝব ক্ষমতা! চোখ বুজে দেখ দেখি একটু টিপে, মেয়েলী হাতের আরামটা হাতে করে একটু নিয়েই যা না শুকচাঁদ।'

অনেকক্ষণ সময় নিলেও শুকচাঁদেরই শেষ পর্যন্ত হার হয়েছে ভরতের কাছে। কিন্তু তার কথার কাছে বুদ্ধির কাছে হার মেনেছে ভরত। শুকচাঁদ তার গোঁ ছাড়ে নি। বলেছে 'অমন ষাঁড়ের মত চেহারা, জোর তো গায়ে থাকবেই, কিন্তু ঘিলুর বদলে ষাঁড়ের গোবরও রয়েছে মাথার মধ্যে। নইলে এমন তাগদ নিয়ে কেউ কি কেবল সানাই বাজায় আর বেত-ফোঁড় বাঁশ-ফোঁড়ের কাজ করে!'

শুকচাঁদের ঠাট্টা-টিটকারীতে খুব বেশি চঞ্চল হয় নি ভরত, পরিহাসের বদলে সেও পরিহাস করেছে। কিন্তু স্থির থাকতে পারল না আকালের বার যখন না খেয়ে ছেলে মরল, শুকিয়ে চর্মসার হল নিজে আর বউ, জাতব্যবসার মায়া সেদিন আর তাকে বেঁধে রাখতে পারল না, সানাই বাজিয়ে আর বেত-বাঁশের ধামা কুলো বানিয়ে যে তিরিশ দিন খাওয়া-পরা জুটবে না সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল

না তার। মরে-হেজে দুলীপাড়া তখন প্রায় সাফ হয়ে গেছে। যারা আছে তারাও বামুন, কায়েত, সাহা, কুণ্ডুদের বাড়ি কেউ চাকর খাটছে, কামলা খাটছে, নৌকা বাইছে, কুড়ুল কুপিয়ে কুপিয়ে চেলা করছে কাঠ, কেউ বা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে শহরে-গঞ্জে আর ফিরে আসে নি। শ্বশুর গগন ছাড়া সবাই জাতব্যবসা ত্যাগ করেছে, মমতা কাটিয়ে উঠেছে ভুয়ো মান সম্মানের। ভরতও গিয়ে যোগ দিল শুকচাঁদের সঙ্গে, কাঠ-থলিতে গিয়ে করাত ধরল, মিথ্যা আশ্বাস দেয় নি শুকচাঁদ। মেহনত যেমন আছে, পয়সাও তেমনি আছে এসব কাজে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে ভরত। খেয়ে-পরে ঘরে-বাইরে দুজনেরই কান্তি ফিরেছে। তামা-কাঁসা যা বাঁধা বিক্রি করতে হয়েছিল প্রায়ই ভরত উদ্ধার করে এনেছে, রূপার কানফুল আর চারগাছা করে সরু চুড়ি গড়িয়ে দিয়ে ফের হাসি ফুটিয়েছে সিন্দুরের মুখে। ভরতের ঘরে সেবারকার আকালের আর কোন চিহ্ন নেই, কেবল মরা ছেলে ফিরে আসে নি সিন্দুরের কোলে। তাই নিয়ে মাঝে মাঝে অবশ্য হা-হুতাশ করে সিন্দুর, আক্ষেপ করে বলে, 'লক্ষ্মীর যেমন ছুটি গেছে, তেমনি এসেছে কিন্তু বিচার দেখ একচোখো ভগমানের! আমার কোলের দিকে তার আর নজরই নেই।'

কিন্তু দুঃখটা বেশিক্ষণ মনে থাকে না সিন্দুরের, দুদণ্ড যেতে না যেতেই ঘরকন্না সাজসজ্জা নিয়ে ফের মেতে ওঠে।

সাড়েসাতকাঠির কাঠ-থলিতে আরও বেশ কিছুদিন কাজ করা চলত। কিন্তু পাঁচ-সাতদিন ধরে ভরত খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, কেবলই তাগিদ দিচ্ছিল শুকচাঁদকে, 'চল এবার বাড়ির দিকে, ঘুরে-টুরে ফের না হয় আসা যাবে।'

'কেন রে, পরিবারের জন্য মন কেমন করছে নাকি? আরে পরিবার তো একটি একটি আমাদের ঘরেও আছে। কিন্তু তোর মত বউপাগলা পুরুষ করাতীর দলে যদি আর দুটি থাকে! চল্, আজ আবার নিয়ে যাচ্ছি তোকে গোলাপীর কাছে। দুদণ্ডে মন ভাল করে দেবে।'

শুকচাঁদের কথায় ভরত বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়েছে, 'কি বাজে বকবক করছিস শুকচাঁদ, তোর মত অমন মেয়েমুখো মন সবারই নয়। মেয়েমানুষ ছাড়া সংসারে আর বুঝি কিছুর জন্যে মন পোড়ে না, প্রাণ কাঁদে না, দুনিয়ায় পুরুষমানুষের সাধ আহ্লাদের আর বুঝি জিনিস নেই কোন? বিয়ে-সাদির মরশুম পড়ল, এ সময় আমি না থাকায় বুড়োর একা একা কত অসুবিধা হচ্ছে ভেবে দেখ দেখি!'

দেশলাইয়ের কাঠি জেলে বিড়ি ধরাতে ধরাতে শুকচাঁদ মুখ টিপে হেসে

বলেছে, 'বাবারে বাবা, ধন্য মন তোর ভরত, বুড়োর ছুঁড়ী মেয়েটার জন্যেই সে মন কেবল কেঁদে আকুল হয় না, ছুঁড়ীর বুড়ো বাপটির জন্যেও কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে দেয়। ভয় নেই, তোর জন্যে হা-পিত্যেশ করে এতদিন বসে নেই গগন ঢুলী, সানাই ধরবার লোক নিশ্চয়ই সে এর মধ্যে আর কাউকে খুঁজে বের করেছে।'

কথাটা ভরতের বিশ্বাস হয় নি। তার মত সানাইদার ধারেকাছে আর কেউ নেই, গাঁয়ের ঢুলীদের মধ্যে যে ক'জন বেঁচে আছে তারা সানাই কেউ ধরতেই জানে না। এ তো আর খেলার মাঠের হুইসেল নয়, যে ফুঁ দিলেই বেজে উঠবে! বিদ্যা জানা চাই, তাল-মান জ্ঞান থাকা চাই সানাইদারের। ভিনগাঁয়ের ঢুলীর দল থেকে হয়ত কাউকে সেধে-ভজে নিয়ে আসতে পারে গগন, কিন্তু যেমন চড়া ধাত, আর কড়া মেজাজের মানুষ সে, আর যেমন সম্পর্ক তার অন্যান্য ঢুলীর দলের সঙ্গে তাতে এই বিয়ের মরসুমের সময় লোক যোগাড় করা তার পক্ষে যে কি শক্ত সে কথা ভরত ভাল করেই জানে। তার আশঙ্কা হল খালি বাড়ি পেয়ে সিন্দুরকে খুব হয়ত বকাবকি করছে গগন। রাগলে তো বুড়োর আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। যা মুখে আসে তাই বলে, দিনের মধ্যে পাঁচবার তুলে দিতে চায় বাড়ি থেকে; তবে ভরসা এই সিন্দুরও মুখ বুজে থাকবার মেয়ে নয়। চটালে খোঁচালে বাপ বলে ছেড়ে কথা কইবে না। বাপের বাপ থেকে শুরু করে চোদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করে ছাড়বে। কিন্তু দিনরাত তিরিশ দিন ঝগড়া-বিবাদ আর ভাল লাগে না ভরতের, ঘরজামাই হয়ে আর সে থাকবে না শ্বশুরের ভিটেয়। আম নিয়ে, জাম নিয়ে, বাঁশ নিয়ে, বেত নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া তার লেগেই আছে। এবার সে সাড়ে-সাতকাঠির গঞ্জে বাসা বেঁধে সেখানে এনে তুলবে সিন্দুরকে। সত্যি সত্যি সানাই-এর ভরসায় তো আর বারোমাস বাড়ি বসে থাকতে পারবে না! পেট তো আর ভরবে না তাতে। আর পাঁচজনের মত গাঁয়ের এবাড়ি সেবাড় চাকর-কামলা খাটতেও পারবে না। তার চেয়ে গঞ্জে-বন্দরে করাতী মিস্ত্রীর কাজ ঢের বেশি সম্মানের। আর রোজগারও তাতে ভাল। কিন্তু সিন্দুরকে রাখতে হবে সঙ্গেই। নইলে শুকচাঁদের পাল্লায় পড়ে সে রোজগারের প্রায় আধাআধি নানা বদখেয়ালে বেরিয়ে যাবে।

মাঠটি ছাড়াতেই দেখা হয়ে গেল মুকুন্দ মালীর সঙ্গে। কাঁচা সোলার আঁটি কাঁধে নিয়ে চর-কাসিমপুর থেকে ফিরছিল মুকুন্দ; ভরতকে দেখে মুখ মুচকে

হেসে বলল, 'ভাল সময়েই ঘরে ফিরেছিস ভরত আর একটা দিন দেরি করলে দরবারটায় থাকতে পারতিস না।'

ভরত বিস্মিত হয়ে বলল, 'কিসের দরবারের কথা বলছ মুকুন্দদা ?'

মুকুন্দ গোমর ভাঙতে চায় না সহজে, এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'অত তাড়া কিসের ! এসেছিস যখন, ঘরে গিয়েই সব শুনতে পারবি।'

ভরত বলল, 'তা তো শুনবই। কিন্তু দরবারটি তো আর ঘরের নয়, বাইরেরই, তুমিই বল না ব্যাপারটি কি ?'

শুকচাঁদ ট্যাঁক থেকে বিড়ি বের করে দিল মুকুন্দের হাতে, বলল, 'ধরাও দাদা। ধরাতে ধরাতে বল।'

একটু রেখে-ঢেকে চেপে-চুপে বলবার ভঙ্গি করলেও আসলে চাপল না মুকুন্দ কিছুই। ভুঁইমালীর ছেলে হয়ে কেশবের ঢুলীর দলে সানাই বাজাতে যাওয়ার কথা থেকে শুরু করে বিয়েবাড়িতে বকশিশ পাওয়া গোলাপী পাগড়ি মাথায় জড়িয়ে তার ফিরে আসা পর্যন্ত সব কাহিনীই রসে-রঙে রঞ্জিত করে মুকুন্দ বর্ণনা করল। কিসের লোভে, কার প্ররোচনায় যে এমন মতিগতি হয়েছে কেশবের সে সম্বন্ধেও ইশারা-ইঙ্গিত দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করল না মুকুন্দ। দুই পাড়ায় ব্যাপারটি নিয়ে যে খুব কানাকানি, আর গা টেপাটেপি চলছে, স্ত্রীর কাছ থেকে তা নাকি মুকুন্দ নিজেই স্বকর্ণে শুনেছে। তা লোকের আর দোষ কি ! বয়স তো আর কম হয় নি গগন ঢুলীর। চুল-দাড়ি তো প্রায় আধাআধি পেকে উঠেছে। ভুলিয়ে টুলিয়ে পরের ছেলের জাত মারতে যাওয়া গগনেরই কি সঙ্গত হয়েছে, ঢুলীর জাতের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করলে আর কি সানাইদার জুটত না কেউ, নাই যদি জুটত, তাহলে বিনা সানাইতেই না হয় বায়না রাখতে যেত গগন কিংবা একটা বিয়ের বায়না হাতছাড়া হলে সে আর না খেয়ে মরত না ! কিন্তু নিজের সামান্য স্বার্থের জন্যে কেশবের মত অমন একজন মাথাপাগলা ছেলের সর্বনাশ করা মোটেই উচিত হয় নি গগনের। তাতে কেবল অন্যের কুলেই কালি লাগে নি নিজের মুখেও চুন-কালি পড়েছে। দরবারে বিচার হবে গগন ঢুলীর। ঢুলীপাড়া আর ভুঁইমালীপাড়ার যে খোলা চটান জায়গাটি আছে মাঝখানে সন্ধ্যার পর দুই জাতের মাতব্বর-মুরুব্বিরা সেখানে বৈঠক বসাবে। কালই হয়ে যেত দরবারটা, হাটবার বলেই কেবল হতে পারে নি। ভাগ্য ভাল ভরত আর শুকচাঁদের যে তারা ঠিক সময়মতই এসে পৌঁছেছে।

শুকচাঁদ কৌতুকবোধ করে বলল, 'বটে, মাসখানেক গাঁয়ে ছিলাম না, এর মধ্যে এত কাণ্ড! বল কি মুকুন্দদা—'

শুনতে শুনতে ভরতের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে সে থামাল শুকচাঁদকে, তারপর মুকুন্দের দিকে চেয়ে ক্রুদ্ধ কর্কশ গলায় বলল, 'মিথ্যা বদনাম যদি রটাও পরের ঘরের পরিবারের নামে তোমাকে আমি আস্ত রাখব না মুকুন্দ মালী, পষ্ট বললুম তোমাকে, বামুনের গা-ই চাট আর কায়েতের পা-ই চাট, তোমার কোন বাবা এসে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

মুকুন্দ ভ্রূকুঞ্চিত করে একবার তাকাল ভরতের দিকে তারপর ফের ঠাণ্ডা মেজাজে মৃদু একটু হাসল, বলল, 'তোর দোষ নেই ভরত, বিদেশ থেকে ঘরে এসে এসব কথা শুনলে মাথা গরম সবারই হয়। গুরু-লঘু জ্ঞান থাকে না, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায় এমন অবস্থায়। নেড়ী কুকুর এসে ঘরের হাঁড়িতে মুখ দিয়েছে শুনলে কোথায় মানুষ হাঁড়ি বদলাবে, মুগুর নিয়ে ছুটবে কুকুরের পিছনে পিছনে, তা নয় তো যে দেখেছে তার চোখ টিপে ধরতে চায়, যে বলেছে তার গলা টিপতে আসে। এই রকমই হয় ভরত, দুনিয়ার নিয়মই এই!'

ভরত ডাক ছেড়ে বলল, 'নিয়ম অনিয়ম তোমার কাছে শুনতে চাই নি মুকুন্দ মালী, যা বললে তার এক বন্নও যদি মিথ্যে হয় তাহলে তোমার একদিন কি আমার একদিন। ঘরের পরিবারের জন্যে তাহলে এখনি গিয়ে সাদা থানের ব্যবস্থা করে এসো, যাও।'

এত অপমানেও মুকুন্দ কিন্তু মেজাজ নষ্ট করল না কি মুখও খারাপ করল না, সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ঠোঁটে তেমনি হাসি টেনেই বলল, 'আমার পরিবারের সাদা থানের কথা পরে ভাবিস ভরত; আগে নিজের পরিবারের রঙীন শাড়িখানা দু'চোখ ভরে একবার দেখে নে, দেখছিস কি রকম বাহার খুলেছে রঙের! কাল ঐ শাড়িতে মাথায় পাগড়ি বেঁধে ছিল কেশব, আজ তা শ্রীরাধার অঙ্গ ঢেকেছে। চেয়ে চেয়ে তুই দেখ্ ভরত, আমার ভাই আর সময় নেই এখন। অনেক কাজ আছে হাতে।'

মুকুন্দ আর দাঁড়াল না, সোলার আঁটি কাঁধে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

ভরত তাকে আর ধরতে চেষ্টা করল না। আঙুলের ডগা বাড়িয়ে মুকুন্দ যে দিকটা তাকে দেখিয়ে দিয়েছিল সেই দিকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। স্নান সেরে কলসী কাঁখে আশ-শেওড়ার ঝোপের ভিতর দিয়ে নদীর ঘাট থেকে আজও

বাড়ি ফিরছে সিন্দুর। তার পরনে ফিকে গোলাপী রঙের একখানা শাড়ি। কিন্তু ভরতের চোখে সে রঙ আগুনের হল্কার মত লাগতে লাগল। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ভরত, সিন্দুর তাকে দেখে মাথায় আঁচল টেনে দিয়ে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল। ভরত গেল পিছনে পিছনে।

শুকচাঁদ বলল, 'এই ভরত, শোন্ শোন্।'

ভরত মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল, 'খবরদার, এ সময় ইয়ারকি দিতে আসিস নে শুকচাঁদ। আমার মাথার ঠিক নেই।'

ঘরে এসে কাঁখ থেকে জলের কলসী নামিয়ে রাখল সিন্দুর। ভরত তার আগেই এসে ঢুকেছে। ঘোমটা তুলে স্বামীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সিন্দুর একটু মুখ টিপে হাসল, 'শেষটায় অমন তাড়াতাড়ি ছুটে এলে কেন বল দেখি? প্রথমে তো খুব পিছনে পিছনে পা টিপে টিপে আসা হচ্ছিল। ভয়ে মরি কে না কে, পর-পুরুষ না আপন পুরুষ! হাতই চেপে ধরে না চোখই টিপে ধরে পিছন থেকে। অমন নিরালা বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়ে পথ—'

খানিকটা আগেকার ইতিহাস ছিল এসব কথার। বছর কয়েক আগেও দিন নেই দুপুর নেই স্ত্রীকে একা পেলেই বাঁশঝোপের পথে ভরত এমনি করে তার পিছু নিত। কোনদিন বা চেপে ধরত হাত, কোনদিন বা টিপে ধরত চোখ।

সিন্দুর বলত, 'ছাড় ছাড়, লোকে দেখলে কি বলবে বল দেখি!'

ভরত বলত, 'বলবে আবার কি? এ তো আর পরের পরিবার নয়, আপন জন, আপন পরিবার। লোকের বলাবলির অত ধার ধারি কিসের, ভয়ই বা কিসের অত!'

সিন্দুর হেসে বলতো, 'তাই নাকি! তোমার ধরন-ধারন দেখে আমার কিন্তু মনে মনে ভারি সন্দ হয়, যাই বল। ঝোপে-ঝাড়ে এমন পা টিপে টিপে লোক কিন্তু পরের পরিবারেরই পিছু নেয়। নিজের পরিবারকে তো ঘরেই পাওয়া যায়। তার জন্যে আর ঝোপে-জঙ্গলে আসতে হবে কেন!'

তখন ভরতও বেশ সরল উত্তর দিত এসব কথার, বলত, 'হুঁ, আসল কথা তাহলে খুলে বল্ সিন্দুর। কেবল আপন পুরুষই নয়, দু'-চারজন পর-পুরুষও তাহলে এর আগে তোর পিছু নিয়েছে। না হলে এত কথা জানলি কি করে, কি করে টের পেলি তাদের ধরন-ধারন!'

সিন্দুর জবাব দিত, 'নিয়েছেই তো, কতবার নিয়েছে। ঘরের বাইরে এসে আপন পুরুষ যখন এমন ফষ্টিনষ্টি করে, তখন তার ধরন-ধারন কি আর আপন

পুরুষের মত থাকে? তখন পর-পুরুষ হয়েই আনন্দ।' সিন্দুরের কথার কৌশল দেখে অবাক হয়ে রয়েছে ভরত, কিন্তু মনে মনে তার কথার রস ভারি উপভোগ করেছে। কেবল মুখই সুন্দর নয় সিন্দুরের, সে মুখের কথাগুলিও ভারি মধুর, রসে ভরা।

কিন্তু সিন্দুরের আজকের কথাগুলি ভরতের মনে মোটেই এখন রস সঞ্চার করল না। ভার নামল না মুখের, হাল্কা হল না বুক। কিন্তু সিন্দুর যেন নিজের আনন্দেই নিজে বিভোর। নিজের রসিকতার জের টেনে বলতে লাগল, 'মেয়েমানুষের পিছু পিছু হাঁটা অত সোজা কাজ তো নয়! কেবল জোয়ান মরদ হলেই হয় না, এ তো কেবল গায়ের জোরের কাজ নয়, ধৈর্য থাকা চাই মনের।'

ভরত স্ত্রীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল। মুকুন্দ মালীর কথার মধ্যে সত্যিই কি কোন মাথামুণ্ডু আছে? মনের মধ্যে পাপ থাকলে কোন স্ত্রী কি স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন হেসে কথা বলতে পারে? এমন ঠাট্টা-তামাসা করতে পারে আগের মত! কিন্তু মেয়েমানুষ একবার যদি বজ্জাত হয়, সে না পারে এমন কাজ নেই! শুকচাঁদের উদাহরণগুলি মনে পড়ল ভরতের, 'ভাল জিনিস যখন খারাপ হয় তখন আর একটু-আধটু খারাপ হয় না ভরত। কড়াতে দুধ যদি একটু ধরে যায় তাহলে তা আর মুখে দেওয়া যায় না, ঘি একবার কটু হয়ে গেলে কার সাধ্য তা নাকের কাছে নেয়? মেয়েমানুষও তাই। অমনিতে বেশ ভাল, আদর করবে সোহাগ করবে, শুকনো চুল দিয়ে ভিজে পা মুছিয়ে দেবে, এমন শান্তির জায়গা আর নেই দুনিয়ায়, কিন্তু একবার যদি নষ্ট-দুষ্ট হল তো একেবারে সাংঘাতিক, হাসতে হাসতে ভাতে বিষ পর্যন্ত মিশিয়ে দিতে পারে।'

ভরত বলেছিল, 'দুর, যত সব বাজে কথা তোর।' কিন্তু সিন্দুরকে হাসতে দেখে ভরতের মন একবার নিশ্চিন্ত হতে চাইল আর একবার দ্বিগুণ করে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। এ হাসি কিসের, একি সেই আগের সহজ সরল হাসি না কি ভাতে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার আগের ছলাকলা! হঠাৎ পরনের রঙীন শাড়িখানার দিকে আর একবার চোখ পড়ল ভরতের। বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। ভরত বলল, 'সিন্দুর, এ শাড়ি তুই পেলি কোথায়?'

কথার ভঙ্গি দেখে সিন্দুরও যেন একটু চমকে উঠল, কিন্তু চমকানিটাকে তেমন আমল না দিয়ে বলল, 'পেলাম এক জায়গায়। তুমি তো আর এনে দাও নি হাতে করে! কিন্তু মানিয়েছে কিনা বল।'

ভরত অদ্ভুত একটু হাসল, 'কেশব ভুঁইমালীকে পাশে নিয়ে দাঁড়ালে বোধ হয় আরও ভাল মানাত সিন্দুর।'

সিন্দুর খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'কি যা-তা বকছ? কেশব ভুঁইমালী আবার এল কোত্থেকে এর মধ্যে!'

ভরত বলল, 'আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করছি। কোত্থেকে এল! এ শাড়ি তুই পেলি কোথায়?'

সিন্দুর তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'ছিরি দেখ কথার! কোথায় পেলি? পাব আবার কোথায়! আমার কি সতের গণ্ডা শ্বশুর আছে যে তারা এনে দেবে? দিয়েছে আমার বাবায়, পেয়েছি আমার বাবার কাছ থেকে।'

ভরত বলল, 'ঠিক তো? না কেশব এনে সাধ করে পরিয়েছে, সত্যি করে বলিস সিন্দুর! মিথ্যে বলে রেহাই পাবি না আমার কাছে। কিছুই শেষ পর্যন্ত আমার কাছে লুকানো থাকবে না।'

সিন্দুর এবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল, বলল, 'খবরদার, অমন করে চোখ রাঙায়োনা আমার ওপর! কারও চোখ রাঙানির কারও অকথা-কুকথা শুনবার ধার ধারি না, তেমন বাপের ঝি নই আমি।'

ভরত মুখ ভেংচিয়ে বলল, 'ইস্, খুব যে বাপ-সোহাগী মেয়ে হয়েছিস এই ক'দিনের মধ্যে! আচ্ছা, আমি তোর সেই বুড়ো বদমাস বাপকে ডেকেই জিজ্ঞেস করছি। সংসারে আমি কাউকে ডরাই ভেবেছিস নাকি?'

লাফ দিয়ে ভরত বেরিয়ে এল ঘর থেকে তারপর প্রায় আর এক লাফে ঢুকল গিয়ে পুবের পোতার গগনের ঘরে। জামাইকে দেখে তাড়াতাড়ি এক কপাল ঘোমটা টেনে দিল লক্ষ্মী। তারপর একখানা পিঁড়ি এনে পেতে দিল বসতে। গগন খেতে বসেছিল। ডাল দিয়ে মোছা মোছা আঁটা আঁটা করে মাখা ভাতের বড় বড় গ্রাস তুলে দিচ্ছিল মুখে। ভরতকে দেখে একটা গ্রাস তাড়াতাড়ি গিলে ফেলে বলল, 'এস বাবাজী, এস।'

ভরত ভ্রূকুঞ্চিত করে শ্বশুরের দিকে তাকাল। এমন সমাদর করে কথা বলবার ধরন গগনের নয়। বছর কয়েক আগে এ ধরনের আদর-যত্ন ছিল। ইদানীং আর নেই। অনেকদিন ধরে বনিবনাও নেই দুজনের মধ্যে। বাঁশের ভাগ, গাছের ভাগ মন কষাকষি লেগেই আছে। পারতপক্ষে ভরতও কথা বলে না শ্বশুরের সঙ্গে, গগনও তত্ত্বতালাস নেয় না। বরং গগন এখন তাকে বাড়ির ওপর থেকে তুলে দিতে পারলেই বাঁচে। দুজনের মধ্যে সম্বন্ধটা প্রায় সরিকী সম্পর্কে এসে পৌঁছেছে,

শ্বশুর-জামাইয়ের ভাব আর নেই। তাছাড়া ভরত কিছু দেরি করেই এসেছে। গগনের বিয়ের বায়নার তাতে ক্ষতি হওয়ারই কথা। তার জন্যে নিন্দা-মন্দই তো প্রাপ্য ভরতের। তা না করে গগন এত আদর-সোহাগ জানাচ্ছে কেন! নিশ্চয়ই তলে তলে কোন ব্যাপার ঘটেছে। নিশ্চয়ই গুরুতর রকমের কোন অপরাধ করে ফেলেছে গগন ঢুলী। না হলে তার গলা তো এমন নরম, এমন মিষ্টি-মধুর হওয়ার কথা নয়।

শ্বশুরের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আর একবার তাকিয়ে নিয়ে ভরত বলল, 'না বসব না, দুপুর গড়িয়ে গেছে তেল মাথায় দিয়ে নাইতে যাব এবার—'

গগন বলল, 'ঠিক ঠিক। বেলা কি আর আছে নাকি? যাও নেয়ে-ধুয়ে খেয়ে নাও।' তারপর লক্ষ্মীর দিকে ফিরে তাকাল গগন, 'নন্দন মা, তেল গামছা দাও জামাইকে।'

ভরত বাধা দিয়ে বলল, 'থাক্ থাক্। তেল গামছা আমার ঘরেই আছে। তোমার কাছে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম।'

গগন পিতলের গ্লাসটি থেকে এক ঢোক জল খেয়ে নিয় বলল, 'কি কথা?'

ভরত বলল, 'সানাই বাজাবার জন্যে কেশব ভূঁইমালীকে তুমি ডেকে নিয়ে গিয়েছিলে?'

গগন কৈফিয়তের স্বরে বলল, 'কি আর করব বল। তুমি ঠিক সময়মত এসে পৌঁছলে না, এ-গ্রাম ও-গ্রাম ঘোরাঘুরি করলাম, পেলাম না কোন সানাই-দারকে—'

ভরত রূঢ় কর্কশস্বরে বলল, 'তাই বলে আমার হাতের সানাই, আমার মুখের সানাই একটা অন্‌জাত, একটা গাঁজাখোর, বেল্লিক বদমাসের হাতে তুলে দিলে তুমি কার কথায়, কোন্ সাহসে, কার হুকুমে? আমার সানাইতে কেন সে মুখ দিল শুনি, কেন সে আমার সানাই এঁটো করল?'

গগন মুহূর্তকাল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ভরতের দিকে তারপর ক্রুদ্ধস্বরে বলল, 'কি মাথাখারাপের মত কথা বলছিস তুই। সানাই আবার এঁটো হয় নাকি? তাছাড়া সানাই যেমন নিয়েছি, তেমনি তার ভাড়া বাবদ একটা টাকাও তো তুলে দিয়েছি সিন্দুরকে। একজনের সানাই নিয়ে দরকার হলে কতজনে বাজায় তাতে দোষ আছে নাকি কিছু?'

ভরত চেঁচিয়ে বলল, 'না দোষ আবার কিসের, একজনের সানাই নিয়ে আর একজনে বাজায়, দরকার হলে একজনের পরিবারকেও আর একজনের হাতে তুলে

দেওয়া যায় ! তাতে সানাইও এঁটো হয় না, পপরিবারেরও জাত যায় না। টাকা আর শাড়ি-গয়না পেলে সবই বজায় থাকে, না ?'

ভাতের থালা ফেলে লাফিয়ে উঠল গগন ঢুলী, চেঁচিয়ে বলল, 'খবরদার, আমার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে যা খুশি তাই শুনিয়ে যাবি এত বড় আস্পর্ধা হয়েছে তোর ? খুন, একেবারে খুন করে ফেলব। মেয়ে না হয় বিধবা হয়ে থাকবে আমার !'

ভরত বলল, 'বিধবা হবে কেন, তার কেশব ভুঁইমালী থাকবে !'

গগন খানিকটা বিমূঢ় হয়ে থেকে বলল, 'এসব কথা তুই শুনলি কোথায় ! এসব বাজে কথা, মিথ্যা কথা, আসবার সঙ্গে সঙ্গেই কে রটিয়েছে তোর কাছে ? তার নাম আমি শুনতে চাই।'

ভরত বলল, 'তার আগে আমিও জানতে চাই তোমার মেয়েকে ও বাহারের শাড়ি এনে দিল কে ?'

'আমি এনে দিয়েছি হাতে করে, তাতে কি দোষ হয়েছে,—শুনি ?'

ভরত বলল, 'না, দোষ তোমাদের কিছুতেই হয় না। ওই শাড়ি আসবার সময় কেশবই মাথায় জড়িয়ে এনেছিল, সানাই বাজিয়ে ওই শাড়ি সে-ই পুরস্কার পেয়েছিল, এসব সত্যি ?'

সিন্দুর দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিছন থেকে সব শুনছিল। এতক্ষণে তার ধৈর্যচ্যুতি হল। ভরতের কথার জবাবে গগন কিছু বলবার আগেই সিন্দুর পিছন থেকে সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর স্বামীর মুখের ওপর চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'হ্যাঁ সব সত্যি ! কেশবই এই শাড়ি মাথায় জড়িয়ে এনেছে, সে-ই পুরস্কার পেয়েছে, তারপর সে-ই এসে ভালবেসে সোহাগ করে আমাকে পরিয়ে দিয়ে গেছে এই শাড়ি। তুমি যা ভেবেছ তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়, সব সত্যি, সব সত্যি, হল তো ? বল এবার কি বলবে, কর এবার কি করবে !'

রাগে মুখ-চোখ ফেটে পড়ছে সিন্দুরের। দুটো চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরুচ্ছে। নিশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে।

ভরত, গগন, লক্ষ্মী সবাই তার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইল। তারপর গগনই কথা বলল প্রথম, ধমক দিল মেয়েকে, 'হারামজাদী বড় বাড় বেড়েছে দেখি তোর, পুরুষে পুরুষে কথা হচ্ছে তুই আবার এলি কেন এর মধ্যে, কে তোকে ডেকে আনল শুনি ?'

লক্ষ্মী এগিয়ে এসে হাত ধরল সিন্দুরের, ঘোমটার ভিতর থেকে চাপা কিন্তু

শান্ত আর তিরস্কারের সুরে বলল, 'ছি ছি ছি, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল মেয়ে! এইসব কথা মুখ দিয়ে বেরোয় কারও! তুমি এস আমার সঙ্গে। আমরা এখন যাই এ ঘর থেকে।'

সিন্দুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, আমরা এখন যাই, আর এরা খুনোখুনি মারামারি করে মরুক। ভারি ভাল মানুষের মেয়ে এসেছে আমার!'

ভরত একবার স্ত্রীর দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাল, তারপর বলল, 'না, যা শুনলাম, তারপর আর খুনোখুনি, মারামারির সাধ আমার নেই।'

ধীরে ধীরে ভরত গগনের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সিন্দুর আড়চোখে একবার তাকাল স্বামীর দিকে, কোন কথা বলল না। কিন্তু গগনের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়েও ঢুকল না ভরত, উঠান ছাড়িয়ে একেবারে নেমে পড়ল পথে।

লক্ষ্মী ফিসফিস করে বলল, 'ও মা, জামাই রাগ করে চলল কোথায় এই দুপুর বেলা! মুখপুড়ী এবার গিয়ে ডাক, শীগগির গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়।'

সিন্দুর মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিল, 'দায় পড়েছে, এত যদি দরদ থাকে তুমি যাও, তুমি গিয়ে ডেকে আন।'

লক্ষ্মী এবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে যে! ভর দুপুর বেলায় একটা লোক না খেয়ে-দেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—'

গগন মুখ খিঁচিয়ে উঠল স্ত্রীকে, 'বেরিয়ে গেল তো আমি কি করব! আমি করব কি শুনি? আমি কাউকে যেতেও বলি নি, সেধে-ভজে আনতেও পারব না। মান-সম্মান সকলেরই আছে।'

এঁটো হাত-মুখ ধুয়ে গগন গিয়ে তামাক সাজতে বসল। সিন্দুর একবার তাকাল বাপের মুখের দিকে তারপর ঝাঁপ ঠেলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ভিতরটা যেমনই হোক মাধবদাসের আখড়ার বাইরের দিকটা ভারি সুন্দর আর সাজানো-গোছানো। দেখতে দিব্যি একটা কুঞ্জ বলেই মনে হয়। চারদিকটা বেড়াচিতার গাছ দিয়ে ঘেরা। বাঁশের বাখারীর দোর আছে সামনে। বেড়ার গা ঘেঁষে ভিতর দিকে রঙ-বেরঙের ফুলের চারা লাগিয়েছে মাধবদাস। শীত-গ্রীষ্ম কোন ঋতুতেই আঙিনায় ফুলের অভাব নেই। ছোট উঠান, ঘরদোর সব একেবারে ধোয়া-মোছা, ঝকঝকে তকতকে। শনের চালার নীচে দাওয়াটুকু ভারি ঠাণ্ডা। দরুণ গ্রীষ্মের দুপুরেও গা একবার এলিয়ে দিলে মিনিট কয়েক যেতে না যেতে ঘুমে চোখ ভেঙে আসে। খেয়েদেয়ে গাঁজায় একবার দম দিয়ে নিয়ে টান

টান হয়ে ঘুমচ্ছিল মাধবদাস কিন্তু তার পাশে শুয়ে কেশবের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। মাধবের সেবাদাসী রাসেশ্বরীরও দিনে ঘুমাবার অভ্যাস নেই। বৈরাগীর সংসার। ছেলেপুলে কিছু নেই। তবু যেন কাজ করে কুল পায় না রাসেশ্বরী, দু'হাত সব সময়ই তার আটকা। বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে কিন্তু চোখ-মুখ কি দেহের গড়ন দেখে তা বোঝবার জো নেই। বেশ ভরাট মুখ, ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ আর শক্ত আঁটসাঁট মজবুত গড়ন রাসেশ্বরীর। রঙটি অবশ্য কালো। কিন্তু কালো রং ছাড়া আর কোন রঙই যেন রাসেশ্বরীর মানাত না। ফিকে আর ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে লাগত। কালো রঙ কালো জলের মত রাসেশ্বরীর হৃদয় মনকে আড়াল করে রহস্যময় করে রেখেছে। পাড়ায় সুনাম নেই রাসেশ্বরীর। আড়ালে-আবডালে ইশারা-ইঙ্গিতে নানা জনে নানা কথা বলে। কিন্তু সামনাসামনি কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। ছেলে-ছোকরারা, মাধবদাসের ভক্ত শিষ্যরা বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তাড়া খায়। মাধবদাস মুখ টিপে টিপে হাসে আর কলকেতে গাঁজা টেপে।

রাইগঞ্জ থেকে কেনা নতুন পাটি আছে ঘরে তবু কতকগুলি খেজুরের পাতা নিয়ে চাটাই বুনতে বসেছিল রাসেশ্বরী। কাঁথা সেলাই আর চাটাই বোনায় তার ভারি সখ। পুরোনো কাপড়ের অভাবে কাঁথা সেলাই আর ইদানীং তেমন হয়ে ওঠে না, কিন্তু চাটাই আর ডালা চালুনী বোনায় রাসেশ্বরীর হাতের যেন বিরাম নেই।

চাটাই বুনতে বুনতে এক ফাঁকে ঘর থেকে দাওয়ায় নেমে এল রাসেশ্বরী, তারপর কেশবের মাথার কাছে এসে বলল, 'কি গো ছোট বৈরাগী, উঠি উঠি করে উঠলে না যে! আর দেরি করো না। যাও উঠে পড়ো। ভুঁইমালীদের কেউ এসে দেখলে জাতে যেটুকু টেনে তুলেছিল সেটুকু ফের ঠেলে নামাবে।'

কেশব বলল, 'নামাক, তাতে তোমার কি? তুমি তো আর হাত ধরে টেনে তুলতে যাবে না!'

রাসেশ্বরী হাসল, 'আমি হাত ধরলে কি আর কোন কালে কুলে উঠতে পারতে! একেবারে অকুল দরিয়ায় নাকানি-চুবানি খেতে। তার চেয়ে এই বেশ আছ। তবু কোন না কোন দিন ভরসা আছে কুলে ওঠবার। তাই ওঠো, উঠে রোদে রোদে বরং ঘুরে বেড়াও গিয়ে। ঘুম তোমার আজ আর আসবে না ছোট বৈরাগী।'

কেশব বলল, 'কেন, ঘুম আসবে না কিসে বুঝলে!'

রাসেশ্বরী বলল, 'চোখ দেখেই বুঝতে পারছি। সিন্দুরের ছিটায় করকর করছে চোখ-মুখ, ও চোখে ঘুম আসবে কি করে! যাও, উঠে ভাল করে ধুয়ে-মুছে এস গিয়ে, তবে যদি শান্তি পাও!'

পানের পিক ফেলে হাসতে হাসতে রাসেশ্বরী আবার গিয়ে ঘরে ঢুকল।

কেশব অবাক হয়ে ভাবল সিন্দুরের কথা তাহলে এরই মধ্যে রাসে-শ্বরীরও কানে গেছে! মেয়েদের চোখ-কান ভারি সজাগ এসব ব্যাপারে। কেশবের সেই পুরস্কার পাওয়া শাড়ি পরে নাকি ঘাটে গিয়েছিল সিন্দুর। তা নিয়ে অনেকেই গা টেপাটেপি চোখ টেপাটেপি করেছে। কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে একটা হৈচৈ হোক তা পছন্দ নয় কেশবের। মনে মনে তার আর সিন্দুরের পরস্পরের উপর একটু টান যদি থাকে তো থাক কিন্তু ভুঁইমালীপাড়ার মানও তাকে রাখতে হবে।

সেদিন অশ্বিনী ভুঁইমালী খুব সাবধান করে দিয়েছে তাকে। বলেছে, 'মনে রাখিস, ভুঁইমালীপাড়ার মান তোর হাতে। কোন অকর্ম-কুকর্ম করলে তাতে কেবল তোরই কান কাটা যাবে না, আমাদের মান-সম্মান নিয়েও টান পড়বে। বুঝেছিস? কানে গেল তো কথাটা?'

কেশব ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছে, 'হুঁ।'

অশ্বিনী মুরুব্বীর স্বরে বলেছে, 'হুঁ নয়। এখন থেকে ওসব বদচাল বেচাল ছাড়্। গাঁজা দু'-এক ছিলিম খাস খা কিন্তু ঢুলীপাড়ায় আর বৈরাগীর আখড়ায় দিনরাত অমন করে গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়াতে পারবি নে। খাটখোট কাজকর্ম কর্, আর পাঁচজনে যেভাবে থাকে, সেইভাবে থাক। মতিগতি যদি ফেরে চাঁদেরকান্দি থেকে সমাজের মেয়ে এনে তোকে বিয়ে করাব আমি, বাবুদের বলে ঘর বাঁধবার ভিটা ঠিক করে দেব।'

বিস্ময়ে-গর্বে অবাক হয়েছে কেশব, সহজে কথা বলতে পারে নি। তারও যে জাত-মান আছে, সেও যে সমাজের একজন, একথা এতদিন যেন তার হুঁশই ছিল না। গাঁয়ের ভুঁইমালীদেরই কি ছিল? ঢুলীপাড়ায়, মাধবদাসের আখড়ায় দিনরাত সে পড়ে রয়েছে, কই কেউ তো তাকে এর আগে কোনদিন ডেকেও একবার জিজ্ঞেস করে নি! সেজন্যে কেশবের নিজেরও যে বিশেষ আফসোস ছিল তা নয়, কিন্তু সেদিন গগন ঢুলীর দলের সঙ্গে সানাই বাজিয়ে হঠাৎ যেন তার জাত সম্বন্ধে সকলের খেয়াল হয়েছে। জাত হারাতে গিয়ে, একরকম হারিয়ে এসে সে জাতে ওঠবার সুবিধা পেয়েছে। অশ্বিনী আর তার ভাই নিকুঞ্জ তাকে বার বার করে

বলে দিয়েছে সে যদি ভাল হয়ে চলে কাজকর্ম, রোজগারপত্রের চেষ্টা দেখে তাহলে চাঁদেরকান্দি থেকে সমাজের চাঁদপানা মেয়ে এনে বিয়ে দেবে কেশবের সঙ্গে। কুণ্ডু-কর্তাদের ধরে পড়ে ঘর বাঁধবার ভিটা চেয়ে দেবে তার জন্যে। এতকাল যাই করুক শত হলেও ভুঁইমালীদের ছেলে তো কেশব। তাকে তারা এমন করে বয়ে যেতে, নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারে না। শুনতে শুনতে এক অপ্রকাশ্য মমতায় বাক্‌রোধ হয়ে এসেছে, কেশবের ছলছল করে উঠেছে চোখ। অশ্বিনীর মধ্যে, কার্তিকের মধ্যে তাদের বাবা মোড়ল জেঠার মধ্যে এতসব আত্মীয়-স্বজন লুকিয়ে ছিল কি করে! কেন এতকাল তাদের চোখে পড়ে নি, কেন তাদের চিনতে পারে নি কেশব?

কিন্তু কুলে টেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুঁইমালীরা তাকে সাবধান সতর্কও কম করে দেয় নি। ঢুলীদের সঙ্গে অত মাখামাখি চলবে না কেশবের। একটু বেশি ঘেঁষাঘেঁষি করতে গিয়েই ভুঁইমালীরা এখন সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে, স্পর্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে ঢুলীদের। না হলে কোথায় ঋষি ঢুলী—নোংরা চামড়া নিয়ে কারবার যাদের তারা নাকি সাহস পায় ভুঁইমালীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে, মুখোমুখী সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি করতে, মাথাপাগলা কেশবকে ভুলিয়ে নিয়ে তাকে দিয়ে সানাইদারের কাজ করিয়ে নিতে! ভুঁইমালীরা অত বেশি মেশা-মেশি ঘেঁষাঘেঁষি করেই কাঁধে চড়িয়েছে ঢুলীদের। ঢুলীরা ঢোল কাঁধে করেই খালাস। আর ভুঁইমালীরা নিজেদের বোকামীতে সেই ঢুলীদের সুদ্ধ, কাঁধে চাপিয়েছে। কুণ্ডুকর্তারা দু’-তিন দিন বাদে বিচারের বৈঠক বসাবেন বলেছেন। দেখা যাক সত্যি সত্যিই প্রতিকার তাঁরা করেন কিনা, সুবিচার করেন কিনা। না হলে ভুঁইমালীরা নিজেদের হাতেই এর বিচারের ভার নেবে। কিন্তু ততদিন কেশব যেন একটু ফাঁকে ফাঁকে থাকে। যেন ফের না জড়ায় ঢুলীদের সঙ্গে। ভুঁইমালীদের সমাজে সিন্দুরের চেয়েও ঢের সুন্দরী মেয়ে আছে।

কেশব অবাক হয়ে বলেছিল, ‘এর মধ্যে আবার সিন্দুরকে টান কেনা!’

বুড়োরা পরস্পরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসি গোপন করতে করতে বলেছিল, ‘থাক থাক, ওসব কথায় আর দরকার নেই। ছোঁড়া লজ্জা পেয়েছে। গাঁজাই টানুক আর যাই টানুক লাজলজ্জা সকলেরই আছে। তাবাপু স্বভাব-চরিত্তির ভাল কর, মতি-বুদ্ধি স্থির করে কাজকর্মে মন দাও, বিয়ের ভাবনা কি তোমার! সুন্দর মেয়ের অভাব কি, ডাগর হলে সব মেয়েকেই সুন্দরী দেখায়। পরের এঁটো পাতায় ছিটেফোঁটায় পেটও ভরে না, মনও ভরে না, তাতে লাভ কি!

আর শক্ত হলেও অন্‌জাত তো, হাতের জল ছোঁয় না ভদ্দরলোকে। ছি ছি!'

কার্তিক কেশবের সমবয়সী। তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে কেশব জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ঠেস দিয়ে মোড়ল-মাতব্বররা কি সব বলছিল কার্তিক! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কার্তিক ধূর্তের মত হেসেছিল, 'তা বুঝবি কেন। নাক টিপলে এখনও দুধ বেরোয় যে! বাবারে, ডুবে ডুবে জল খাও আর ভাবো যে কাকপক্ষীটিও জানতে পারে না। কিন্তু কাকপক্ষী না জানলে কি হবে পাড়াপড়শীর জানতে কিছুই বাকি থাকে না।' কেশবের দিকে তাকিয়ে আবার একটু মুখ টিপে হেসেছিল কার্তিক, 'তবে যাই বলি, তোর পছন্দের তারিফ করতে হয় কেশব। সিন্দুর কেবল ও-পাড়ার মধ্যে কেন, এ-পাড়ার মধ্যেও তার জুড়ি নেই। মেয়ে ঢুলীদের বটে, কিন্তু যেন পটের ওপর তুলি দিয়ে আঁকা। কি দিয়ে বশ করলি বল্ দেখি, আমরা তো একটু কাছে গেলেই একেবারে ফোঁস করে উঠত!'

বিস্ময়ে খানিকক্ষণ হতবাক্ হয়ে ছিল কেশব, তারপর প্রায় ধমকের স্বরেই বলেছিল, 'ছি, এসব তোরা পেলি কোথায়? বেচারা সিন্দুরকে নিয়ে কেন তোরা এমন মিছিমিছি টানাটানি শুরু করলি বল্ দেখি? তার কি দোষ!'

কার্তিক পরম কৌতুকে এক চোখ বন্ধ করে তাকিয়েছিল কেশবের দিকে, 'তা তো ঠিকই। তার আর কি দোষ, তারও দোষ নেই, তোমারও দোষ নেই। সব একেবারে গুণের কারবার। তুমি হলে গুণধর, আর তিনি হলেন গুণমণি, যত দোষ কেবল পাড়াপড়শীর, যত দোষ কেবল তাদের চোখ-কানের।'

এর পর কেশব আর কার্তিককে থামাতে চেষ্টা করে নি, প্রতিবাদ করতে যায় নি তার কোন কথার। কেশবের কান থেকে বিড়ি তুলে নিয়ে দেশলাই জেলে ধরিয়ে টানতে টানতে আরও কত বকবক করেছে কার্তিক, 'কে জানে এত গুণ এত রস তোমার ছোট কলকের, তাহলে আমরা কি আর জীবনভর বড় কলকে টানি আর ঘরে অরুচি হলে বুড়ী ধাড়ীর কাছে গিয়ে মুখ বদলাই?'

কেশব কোন জবাব দেয় নি। কান পেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল শুনেছে। তারপর কার্তিক যখন কামলা খাটতে গিয়েছে কেশব পা টিপে টিপে এসেছে মাধব বৈরাগীর আখড়ায়। একটু দম দিয়ে না নিতে পারলে সে দম ফেটে মরে যাবে। যত সব মিথ্যা বানানো কথা। এসব কথা কোনদিন ভাবেও নি কেশব। লোকে কলঙ্ক ছড়াচ্ছে তার নামে, তবু শুনতে নিতান্ত মন্দ লাগছে না। দাসী পাঁচী বাতাসী নয়, স্বয়ং সিন্দুরের নামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তার নাম। কলঙ্ক যদি

তাকে ছুঁয়েই থাকে এবার তার কলঙ্ক নয়, চাঁদের কলঙ্ক, এসব কথা নিশ্চয়ই কানে গেছে সিন্দুরের। এই মিথ্যা অপযশ অপবাদ শুনে সেই বা কি ভাবছে, কি চিন্তা করছে, একবার অনুমান করতে চেষ্টা করল কেশব। গাঁজা খায়, মাধবদাসের আড্ডায় পড়ে থাকে জোয়ান পুরুষ হয়েও কোন কাজকর্ম করে না বলে সিন্দূর তাকে চিরকাল ঠাট্টা-তামাসাই করে এসেছে। বলেছে অকর্মার ধাড়ি, বলেছে মাধবদাসের বোষ্টমী যখন দুর দুর করে তাড়িয়ে দেবে তখন যাবে কার বাড়ি! কিন্তু সিন্দুর যেন কেবল তামাসাই করে গেছে কেশবকে। গালমন্দ করে নি, খোঁচা দেয় নি, জ্বালা ছিল না তার জিভে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়েছে যেন সিন্দুরের ঠাট্টা তামাসা করার জন্যে কেশবের মত অমনি একজন অকর্মা বয়ে যাওয়া পুরুষের গাঁয়ে থাকা নিতান্তই দরকার। কবিৎকর্মা কত লোকই তো আছে পাড়ায় তাদের দেখে তো কৌতুকের হাসি ফোটে না সিন্দুরের মুখে, ছোট বৈরাগী বলে ডাকতে তো সাধ যায় না সিন্দুরের তাদের কাউকে দেখে, সিন্দুরের সেই সাধ মেটাবার জন্যেই যেন কেশব রয়েছে, কেশবের না থাকলে চলে নি।

কিন্তু এমন ঠাট্টা-তামাসার পাত্রের সঙ্গে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মত মানুষের সঙ্গে লোকে যখন তার নাম গিঁট দিয়ে দিয়েছে তখন মুখের ভাবখানা কেমন হয়েছে, তার মনের ভাবখানা দেখতে ভারি ইচ্ছা করতে লাগল কেশবের। সিন্দুরের মুখ কি রাগে আগুনের মত টকটক করছে না লজ্জায় নরম গোলাপী রঙের তুলি পড়েছে তার মুখে। না কি রাগও নয়, লজ্জাও নয়, ঘৃণা নয়, তাচ্ছিল্যও নয়, সেই আগেকার মতই তামাসার হাসি ফুটে রয়েছে সিন্দুরের মুখে। সেই মুখখানা দেখবার ভারি সাধ জাগতে লাগল কেশবের। কিন্তু মুখোমুখী দাঁড়াবার সাহস হল না। কি জানি কি দেখতে কি দেখবে তাছাড়া মুখ দেখলেই কি কোন মেয়ের মন দেখা যায়? বিশেষ করে সিন্দুরের মত মেয়ের। বদনাম তো রাসেশ্বরীর সঙ্গেও তার এক সময় রটেছিল। সে বদনামটি এখনও একেবারে ধুয়ে-মুছে যায় নি। কিন্তু কেবল সেই মিথ্যা বদনামের ওপর ভর করে কি এগুনো যায়, নির্ভর করবার মত যদি আর কোন হদিস-ইশারা না থাকে! রাসেশ্বরী কেবল ঠাট্টা-তামাসা করেই সেই বদনামকে উড়িয়ে দিয়েছে, কাছে ঘেঁষতে দেয় নি, ঘাটে ভিড়তে দেয় নি। ঘাটে ভিড়বার জন্যে কেশবেরও তেমন গরজ ছিল না। বয়সে আর বুদ্ধিতে তার চেয়ে অনেক বড় রাসেশ্বরী। অকুল দরিয়ার মতই। সে দরিয়ায় ঝাঁপ দিতে গিয়ে বুক কাঁপে, মুখে ঠাট্টা-তামাসা করলেও মনে মনে তাকে ভারি ভয় করে কেশব। আর ঠাট্টা-তামাসার ভিতর দিয়ে রাসেশ্বরী তাকে যে অভয় আর

আস্কারা দেয় সে আস্কারা স্নেহের। হাসতে হাসতে তার পিঠে হাত বুলোয় রাসেশ্বরী। তাতে রক্ত গরম হয় না, সমস্ত চাঞ্চল্য ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পাখির ছানার মত বিড়ালছানার মত কেশবকে আদর করে রাসেশ্বরী। মাধবদাস চেয়ে চেয়ে দেখে, ঠোঁট টিপে গাঁজা টেপে।

কিন্তু সিন্দূরের ছোঁয়ায় সমস্ত মন যেন রাঙা হয়ে উঠতে চাইছে কেশবের। ভারি ভালো লাগছে, ভারি লজ্জা করছে। বিয়ে বাড়ির সেই চেলী চন্দন-পরা কনের মুখের সঙ্গে যে অদ্ভুত মিল সেদিন কেশব লক্ষ্য করেছিল সেই মধুর সাদৃশ্য যেন তার দু'চোখের কোলে কাজলের মত লেগে রয়েছে।

'কেশব আছ নাকি ? কেশব !'

ধ্যান ভাঙল, চমক ভাঙল কেশবের। আঙিনার বাইরে থেকে কে ডাকছে তাকে নাম ধরে !

চাটাই বুনতে বুনতে রাসেশ্বরী ঘরের ভিতর থেকে বলল, 'দেখ তো এই ভর দুপুরে কে আবার জ্বালাতে এল !'

পাশে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে মাধবদাস। পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে উঠে গেল কেশব। দোরের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কে ?'

রুক্ষ কর্কশকণ্ঠে জবাব এল, 'বাইরে বেরিয়ে এসে একবার দেখই না কে ! কেবল বোষ্টমীর আঁচলের তলা থেকে উঁকিঝুঁকি মারলে কি মানুষ চেনা যায় ?'

দোর খুলে সামনে এসে দাঁড়াল কেশব, একটু অবাক হয়ে থেকে বললে, 'ও, ভরত ! তা তুমি যে এখানে ? কখন এলে ? ব্যাপার কি ?'

ভরত খপ করে হাতখানা চেপে ধরল কেশবের। ফের যেন আবার আখড়ার মধ্যে গিয়ে না ঢুকতে পারে। তারপরে কেশবের গলার অনুসরণ করে বলল, 'ব্যাপার কি ! আমিও তো তাই জানতে এলাম, আমিও তো তাই জিজ্ঞাসা করছি ব্যাপার কি ?'

কেশবের মুখটি মুহূর্তের জন্যে ফ্যাকাশে হয়ে গেল, দুরুদুরু করতে লাগল বুকের মধ্যে, ধরা পড়ে গেছে, সে ধরা পড়ে গেছে। এর মাঝখানে ভরত বলে যে কোন লোক আছে এতক্ষণ তা যেন তার খেয়ালই ছিল না। ভরতের ক্রুদ্ধ আরক্ত চোখের দিকে তাকিয়ে কেশব অস্ফুটস্বরে বলল, 'কোন্ কথা জিজ্ঞেস করছ তুমি, কোন্ ব্যাপারের কথা !'

'হারামজাদা, ন্যাকা নচ্ছার ! কোন্ ব্যাপার তুমি জানো না ?' হঠাৎ ঠাস করে একটা চড় মেরে বসল ভরত কেশবের গালে, 'একি রাসী বোষ্টমী পেয়েছ,

একি মাধব বৈরাগী পেয়েছ, যে যা-তা করে রেহাই পাবে! আমি ভরত ঢুলী আর কেউ নয়, তোমার মাথার খুলি উঠিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব।'

পাঁচ আঙুলের দাগ জলজ্বল করছে কেশবের গালে, ফ্যাকাশে মুখখানায় সমস্ত রক্ত ভিড় করে এসেছে, কেশব তবু যেন একটু হাসতে চেষ্টা করে বলল, 'তা ওড়াও, কিন্তু খুলি ওড়ালেই কি সব উড়ে যাবে মনে করেছ?'

'কি, কি বললি? আবার মস্করা করছিস এর পর! এত সাহস, জাত মেরে, ঘর নষ্ট করে আবার মস্করাও করবি তুই আমার সঙ্গে!'

অতর্কিতে এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে কেশব পড়ে গেল সামনের গাবের গুঁড়ির ওপর। রাগে, অপমানে এবার সেও উন্মত্ত হয়ে উঠল। ভরত কাছে এগিয়ে আসতে না আসতে কেশব উঠে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মত। কিন্তু লোহার মত শরীর ভরতের, লম্বায়-চওড়ায় প্রায় কেশবের দ্বিগুণ তার আকৃতি, শক্তি বোধ হয় আরও কয়েকগুণ বেশি। মুহূর্ত কাটতে না কাটতে মারের চোটে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ল কেশব, রক্ত ছুটল মাথা ফেটে। প্রায় নিমেষের মধ্যেই ঘটে গেল কাণ্ডটা।

চিৎকার করতে করতে রাসেশ্বরী ছুটে এল, ছুটে এল মাধবদাস। দুজনে মিলে জোর করে ছাড়িয়ে নিল ভরতকে। গোলমাল শুনে ঢুলীপাড়ার ভুঁইমালীপাড়ার সবাই এসে মাধবদাসের আঙিনার সামনে ভেঙে পড়ে চিৎকার আর গোলমাল শুরু করে দিল। তারপর সেই ভিড়ের মধ্যে একসময় দেখা গেল সিন্দূরকে, কোন লজ্জা নেই, আতঙ্ক আশঙ্কার আভাস নেই তার মুখে। আরও দশজন ঝি-বউয়ের সঙ্গে সিন্দূরও যেন কেবল তামাসা দেখতেই এসেছে।

দু'দলের মধ্যে রোখারুখি, গালিগালাজ চলতে লাগল খানিকক্ষণ ধরে। ভুঁইমালীরা বলল, 'বেঁধে মারো শালার ঢুলীকে। মেড়ে হাড় গুঁড়ো করে দাও।'

ঢুলীরা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু তাই বলে ভড়কাবার পাত্র নয় তারা। রুখে উঠে তারাও জবাব দিল, 'ইস্, তুলেই দেখুক না একবার ভরত ঢুলীর গায়ে কেউ হাত, কোন্ শালার ভুঁইমালীর ঘাড়ে ক'টি মাথা আছে দেখে নিই!'

ভুঁইমালীদের অশ্বিনী তেড়ে আসছিল কিন্তু মোড়ল জলধর ধমক দিয়ে বলল, 'এই থাম্। হাতাহাতি মারামারি করতে যাস নে খবরদার।'

ঢুলীদের মাতব্বর গগনও এতক্ষণে এসে পড়েছে। সেও মাঝখানে পড়ে স্বজাতের গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলে-ছোকরাগুলিকে থামিয়ে দিল।

কিন্তু মেয়েদের মুখ থামানো অত সহজ নয়। অশ্বিনীর মা গৌরমণি বলল,

'ভরত ঢুলীর আক্কেলকেও বলিহারি যাই বাছা। গায়ে জোর থাকলেই কি মানুষ মানুষকে অমন করে মারে! বেশ তো, বুঝতে চায় সমানে সমানে বুঝুক। কেশবের মত রোগাপটকা একটি ছেলে পেয়ে তুই যে হাতের সুখ উঠিয়ে ছাড়লি, কেন গাঁয়ে কি আর মানুষ ছিল না! আহা-হা, কি হালটাই না হয়েছে ছেলেটার!'

ঢুলীদের তরফ থেকে জবাব দিল রামলালের পিসী ক্ষীরোদা, 'আহা-হা, কি দরদের, কি সোহাগের কথা গো! অঙ্গ জুড়িয়ে গেল। রোগাপটকা ছোকরা তবে আর কি! ঘরের পরিবারের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবে, বিন্দাবনলীলা চালাবে আর পুরুষমানুষ তাকে কাঁধে করে নাচবে, পা ধুয়ে জল খাবে। সে রীতি-নিয়ম ভুঁইমালীদের ঘরে থাকতে পারে, ঢুলীদের ঘরে নেই।'

গগন ধমক দিয়ে বলল, 'এই ক্ষীরী, তোকে বকবক করতে কে বলেছে শুনি, কে ডেকেছে তোকে ওকালতী আমমোক্তারী করতে?'

ওকালতী আমমোক্তারী কথাগুলি তেমন বোধগম্য হল না ক্ষীরোদার কিন্তু গগনের কথার জবাবে সেও মুখ খিঁচিয়ে উঠল, 'ডাকবে আবার কে! এর আবার ডাকাডাকির কি আছে? তোমার মেয়ের কেলেঙ্কারীর কথা না জানে কে? গুমর রাখতে চাও কিসের?'

কেবল ভুঁইমালীদের ভিতরেই না, ঢুলীদের মেয়েদের মধ্যেও একটা হাসাহাসি গা টেপাটেপি শুরু হল। রামলাল জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেল তার পিসীকে।

সবাই ভাবল সিন্দুর এবার চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে। সত্য হোক মিথ্যা হোক এ কলঙ্কের কথা মুখ বুজে সে সহ্য করবে না। কেবল মুখখানাই তো আর সুন্দর নয় সিন্দুরের, মুখের ভিতরের জিভখানাও ধারালো ছুরির মত। কিন্তু সিন্দুর যেমন চুপ করেছিল তেমনি চুপ করেই রইল, দুটি রাঙা পাতলা পাতলা ঠোঁটের একটির সঙ্গে আর একটিকে কে যেন আঠা দিয়ে জুড়ে দিয়েছে।

অবাক হয়ে অনেকেই সিন্দুরের দিকে তাকাল। মাথায় আঁচল নেই সিন্দুরের। কালো কোঁকড়ানো চুলের মাঝখানকার সিঁথিতে দেখা যাচ্ছে মোটা সিঁদুরের দাগ। কপালে সুন্দর একটি গোল ফোঁটা। ঝগড়াটেই হোক আর যাই হোক পাড়ায় এতকাল স্বভাব-চরিত্রের খ্যাতি ছিল সিন্দুরের। কোনদিন তার নামে কোন কলঙ্ক ওঠে নি এর আগে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই হ্যাংলা গাঁজাখোর ভুঁইমালী ছোকরার সঙ্গেই কি মজে গেল সিন্দুর! কথাটি যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু অবিশ্বাস্যই যদি হবে, এ কলঙ্কের সে প্রতিবাদ করল না কেন!

যদি ভিতরে কিছু নাই থাকবে একেবারে বাড়ি এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ভরত ঢুলীই বা কেন বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে কেশবের ওপর ?

সিন্দুরের নীরবতায় গগন আর ভরতও কম বিস্মিত হল না। এখন হৈচৈ হুলুস্থুল বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে যখন ছুটেই আসতে পারল সিন্দুর মুখ ফুটে কি একবার সে বলতে পারল না এসব মিথ্যা, এসব কলঙ্ক আসলে তার একটুও গায়ে লাগে নি মনে লাগে নি ! খানিক আগে ভরতের কাছে সে যেমন সব স্বীকার করবার ঢঙে অস্বীকার করেছিল তেমনই না হয় করত সিন্দুর ! ভরত মনে মনে ভাবল তাতেও তার মান বাঁচত।

গাঁজা খাক আর যাই খাক মাথা দেখা গেল মাধব বৈরাগীরই সবচেয়ে ঠাণ্ডা। ঢুলী আর ভুঁইমালীদের ভিড় ঠেলে সে এগিয়ে এসে বিরক্তস্বরে বলল, 'চোট পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল মানুষটি আর তোমরা কোঁদাকুঁদি রোখারুখি নিয়েই আছ। ডাক্তার-কবরেজ ডেকে ওকে আগে সুস্থ করবে, তা তো নয় নিজেদের জেদ আর বড়াই নিয়েই অস্থির। এস দেখি শীগগির, কেউ এসে ধরো দেখি আমার সঙ্গে কেশবকে।'

এবার যেন সবাই-এর নতুন করে চোখ পড়ল কেশবের দিকে। মাথার খানিকটা জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত জমে রয়েছে। সিন্দুরের সিঁদুর লেপা সিঁথির মতই যেন দেখা যাচ্ছে অনেকটা। মাধবদাসের কথায় ভুঁইমালীদের জনকয়েক ছোকরা এগিয়ে এল। তাদের ভিতর থেকে কার্তিককেই ডেকে নিল মাধবদাস, বলল 'তুই আয়, একজনেই হবে।'

মোড়ল জলধরের হুকুমে কার্তিক যাচ্ছিল পাশের গুপীগাঁ থেকে ডাক্তার ডেকে আনতে, মাধবদাসের বোষ্টমী রাসেশ্বরী বলল, 'থাক থাক, অত দরদে আর কাজ নেই কারো। ডাক্তার কবরেজ আর দরকার নেই। কচি দূর্বা আছে আমার উঠানে, রেড়ীর তেল আছে ঘরে। রক্ত যদি বন্ধ হয় তাতেই হবে। তোমাদের কারো মাথা ঘামাতে হবে না তা নিয়ে ! অমন এক-আধটু চোটে কি হয় পুরুষমানুষের !'

মমতায়, অভিমানে, উদ্বেগে মিলে ভারি অদ্ভুত শোনাল রাসেশ্বরীর গলা। ভুঁইমালীদের কেউ কেউ মুখ টিপে হাসলও। ভারি বেহায়া মেয়েমানুষ রাসেশ্বরী, মোটেই লাজলজ্জা নেই। জলধর বলল, 'না ডাক্তার ডাকবে না, ভালোমন্দ কিছু একটা হলে বুঝি এসে তুমি দেখবে ?'

আধ কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা রাসেশ্বরীর। তার ভিতর থেকে মৃদু কিন্তু সুস্পষ্ট জবাব এল, 'দেখবই তো। এতকাল কেশবের ভালোমন্দ কে দেখেছে

শুনি? সব ভার তো রাসী বোষ্টমীর ওপরই ছিল। তখন তার মাথাও ফাটে নি, রক্তও পড়ে নি। আত্মজনেরা ভালোমন্দের ভার নিয়েছে বলেই তো আজ এই দশা তার।'

রাসেশ্বরী দোর বন্ধ করে দিল আঙিনার।

জলধর মুহূর্তকাল নির্বাক্ হয়ে থেকে ফটিকের দিকে ফিরে গর্জে উঠল, 'এই হারামজাদা, অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? চেয়ে চেয়ে রূপ দেখছিস বুঝি বোষ্টমীর? এসে আবার দেখিস। এখন যা ছুটে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় যোগেন ডাক্তারকে। দোর বন্ধ করলেই হল। ও দোর খুলতে জলা ভুঁইমালীর পুরো একটা লাথিও লাগে না!'

গগন মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই-ই বা আবার দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয় বাড়ি আয়। চলো ভরত বাড়ি চলো।'

জলধর বলল, 'জামাইকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ গগন, যাও কিন্তু এর একটা নালিশ-বিচার না করে ভুঁইমালীরা কিন্তু ছেড়ে দেবে না সে কথা মনে রেখ।'

যাদব রুখে উঠে কি জবাব দিতে যাচ্ছিল গগন তাকে বাধা দিয়ে নরম সুরে বলল, 'বেশ তাই বেশ, পাঁচজনে মিলে সালিস-দরবারে যে বিধান দেবে তা কি আমি না মেনে পারি! ভরতের মুখ ফুটে বলতে লজ্জা হতে পারে কিন্তু জামাই-এর হয়ে আমিই তোমাদের পাঁচজনের কাছে মন খুলে বলছি জলধর। ভরত ভুল বুঝেছে ভরত ভুল করেছে। আর তার ভুলের জন্য আমি মাপ চাইছি তোমাদের কাছে।'

ভুঁইমালীদের দিকে তাকিয়ে সত্যি সত্যি হাত জোড় করল গগন।

গগনের এতখানি বিনয়ে ভুঁইমালীরা সুদ্ধ অবাক হয়ে গেল। মরে-হেজে অত্যন্ত অল্প কয়েক ঘরই মাত্র এ গাঁয়ে আছে ঢুলীরা। তবু শত হলেও একটা জাতের মাতব্বর মানুষ তো গগন। সে মাথা হেঁট করলে একটা গোটা জাতের মাথা হেঁট হয়ে যায়। এ কি ব্যবহার তার, এ কি বশ্যতা! যাদব, রামলাল, ভরত সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'না না না, এ মাপ কিন্তু আমরা চাইলুম না মাতব্বর, আমরা কিছু দোষ করিনি, যে মাপ চাইব।'

ভরতও ঘাড় ফুলিয়ে বলল, 'মাপ চাইব কার ভয়ে! যা করেছি ঠিক করেছি।'

গগন ভরতের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন রাগে ফেটে পড়ল, 'তবু বলবি ঠিক করেছিস? হতভাগা গোঁয়ার কোথাকার!'

এতক্ষণ বাদে কথা বলল সিন্দুর, স্বামীর হয়ে সেই জবাব দিল বাপকে, 'বলবে

না তো কি করবে? জোয়ান-মর্দ পুরুষ না? ভুলই করুক আর যাই হোক জোয়ান পুরুষের রাগ হলে অমন দু'-একটা রোগাপটকা লোকের মাথা এক-আধ দিন ফাটে, তাতে কোন দোষ হয় না। চলো ঘরে চলো।' শেষের কথাটি সিন্দুর বলল স্বামীর দিকে তাকিয়ে। তারপর একবার রাসেশ্বরীর বন্ধ দরজার দিকে কি একটু চেয়ে দেখল। এই সময় যদি একবার বেরিয়ে আসত রাসেশ্বরী, যদি একবার শুনত তার কথাটা তাহলে যেন মনের ঝালটা মিটত সিন্দুরের, মিটত বুকের জ্বালাটা সত্যিই কোন লাজলজ্জা নেই রাসেশ্বরীর। থাকবে কেন! মার্কামারা মেয়ে-মানুষ। বদনামের তো আর কোন ভয় নেই। কিন্তু লজ্জা আর ভয়টি যদি সিন্দুরের নিজেরও আর খানিকটা কম থাকত তাহলে কি কেশবকে আর রাসেশ্বরীর আঙিনার ভিতরে নিয়ে যেতে দিত সিন্দুর, নিজের ঘরে নিয়েই তুলত, নিজেই সেবা আর পরিচর্যা করত কেশবের। লোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে ভাবত, 'মেয়েটা কি বেহায়া, মোটেই ভয়-ডর নেই, মোটেই লাজলজ্জা নেই সিন্দুরের।'

ভরত ততক্ষণে এসে স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছে! মুখের দু'-তিন জায়গায় তারও ছড়ে গেছে, তবু সে মুখের খুশি খুশি ভাবটা ঢাকা পড়ছে না : ভরত বলল, 'চল সিন্দুর ঘরে চল।'

সিন্দুর চমকে উঠে বলল, 'হ্যাঁ চলো।'

ঢুলী আর ভুঁইমালীদের ভিতরে মন কষাকষি চলছিল অনেকদিন থেকেই। এতদিন বেতের কাজ আর বাঁশের কাজ একচেটিয়া ছিল ঢুলীদের, ভুঁইমালীরা ওসব কাজে হাত দিত না। কিন্তু হাটে-বাজারে ধামা-কুলো, সাজি-টুরীর দাম বেড়ে যাওয়ায় ভুঁমালীরাও কেউ কেউ বুনতে শুরু করেছে। আর দেখা যাচ্ছে ঢুলীদের চেয়ে তাদের হাতের কাজ খারাপ তো নয়ই বরং অশ্বিনী ভুঁইমালীর বউয়ের হাতের সাজি-কুলো সরেস বলেই সুখ্যাতি পেয়েছে বাজারে। দামও এক পয়সা, দু'-পয়সা বেশি উঠেছে। যাদব ঢুলী প্রথম দু'-একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, 'আমাদের বেত আর বাঁশই যখন কেড়ে নিচ্ছ তোমরা, ঢোলটাও নাও। ঢ্যাং ঢ্যাং করে বিয়েতে, মুখেভাতে, পুজোয়-পার্বণে বাজিয়ে বেড়াবে।'

অশ্বিনী চটে উঠে বলেছিল, 'কেন রে তোদের ঢোল আমরা নিতে যাব কেন? আমরা কি ঋষি ঢুলী আমরা কি মুচি চামার!

যাদব বলেছিল, 'এতকাল ছিলে না, কিন্তু এবার আমাদের মত মুচি-চামারই হয়ে যাবে দাদা, ধামা যখন বুনতে শুরু করেছ। চামড়ার চটিজুতোয় হাত দিতে

আর কতক্ষণ! তাই করো, তোমরাও ঢোল বাজাও, জুতো তৈরী করো, আমাদের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাও তোমাদের। মিলেমিশে আমরা এক হয়ে যাই।'

অশ্বিনী তেমনি রেগে জবাব দিয়েছিল, 'ইস, সখ দেখ শুয়োরের বাচ্চার! বলে কিনা ছেলেমেয়ের বিয়ে দাও, দরকার হলে আমাদের ছেলেরা তোদের মেয়েদের ভিতর থেকে দু'চার গণ্ডা রাঁড়ই রেখে নিতে পারবে। বিয়ের দরকার হবে না।'

যাদব বলেছিল, 'রাঁড় রাখারাখি তো সেই সত্যযুগ থেকেই চলছে দাদা। আমাদের জাতের ছেলেরা তোমাদের মেয়েদের রাঁড় রাখছে আবার তোমাদের ছেলেরা পিছনে ঘুরেছে আমাদের বউ-ঝিদের। তেমন গোপন মিলমিশের কথা তো সকলেই জানে। এবার কলিযুগে রীতি-নিয়মটা বদলে যাক। জানাজানিটা আরও ভালো করে হোক ঢাকে-ঢোলে।'

কিন্তু হাসিঠাট্টার কথা নয়। অশ্বিনীর পরে কার্তিকের ভাই নরহরিও বেতের কাজ শুরু করেছে দেখা গেল। ধামা-সাজি নয় সে কোত্থেকে বুনন শিখে এসেছে বসবার মোড়ার, চেয়ারের। কাঠের জিনিসের দাম অনেক বেশি। এ অঞ্চলে পাওয়াও যায় না তেমন। ভাল ছুতোর নেই রাইগঞ্জের কাছেধারে। ফলে বাজারে মোড়া, চেয়ার-চৌকি মাঝে মাঝে বেশ বিক্রি হয়। এতকাল এসব কাজ ঢুলীদেরই বাঁধা ছিল। বিয়েতে অন্নপ্রাশনে তারা ঢাক বাজাত। আর অবসর সময়ে মেয়ে-পুরুষে মিলে করত বাঁশের কাজ বেতের কাজ; কচি পাঁঠার চামড়ায় ছেয়ে দিত ঢোল-খোল, কেউ কেউ সাধারণ আটপৌরে ধরনের চটি স্যাণ্ডেলও তৈরী করত।

চামড়ায় এখনও ভুঁইমালীরা হাত দেয় নি, কিন্তু বাঁশ আর বেত ঢুলীদের হাত থেকে তারা ছিনিয়ে নেবার জো করেছে। তাদের মোড়ল জলধরের কাছে নালিশ জানিয়ে কোন ফল হয় নি। জলধর বলেছে, 'ঝোপে বাঁশ আছে বেত আছে। হাতও দু'খানা করে আছে প্রত্যেক ঢুলীর। এমন তো নয় যে ভুঁইমালীরা তাদের হাত জোর করে চেপে রেখেছে কি বাঁশ আর বেত সব দখল করে নিয়েছে মুল্লুকের! যার যা খুশি সে তাই করে খাবে। কারও বাড়া ভাত তো কেউ আর কেড়ে খাচ্ছে না!'

কিন্তু এ তো প্রায় বাড়া ভাত কেড়ে খাওয়ারই সামিল। একজনের জাত-ব্যবসা যদি আর একজনে শুরু করে, ছেলেপুলে নিয়ে সে ভাত করে খাবে কি করে! গাঁয়ের মধ্যে কুণ্ডুরাই সবচেয়ে প্রধান। তাঁরাই জাতেও উঁচু, অবস্থায় মান-সম্মানেও

উঁচু। মামলা-মকদ্দমার পরামর্শও তাঁরাই দেন, আবার ঘরোয়া ঝগড়া-ঝাঁটি বিবাদ-বিসংবাদে মীমাংসা মিটমাটও করেন। সেই কুণ্ডুদের বড়কর্তা রসময়ের কাছেও দরবার করতে গিয়েছিল ঢুলীরা। কিন্তু কোন লাভ হয় নি। রসময়ের জমির বর্গা চাষ করে ভুঁইমালীরা। দরকার হলে জনমজুর কৃষাণ কামলা খাটে। ফলে তাদেরই কোল টেনে কথা বলেছিলেন রসময় কুণ্ডু। বলেছিলেন, 'বেশ তো ভুঁইমালীরা বেতের কাজ ধরেছে, তোরা কোদাল ধর্, কুড়ুল ধর্। কামলা কিষাণগিরি কর্। কাজকর্মের কি অভাব আছে নাকি দুনিয়ায় যে তাই নিয়ে কামড়াকামড়ি করে মরবি। কেন, তোদের ভরত ঢুলীও তো গিয়ে করাত ধরেছে শুকচাঁদ ভুঁইমালীর সঙ্গে। তার জন্য তো কেউ ওরা নালিশ-দরবার করতে আসেনি!'

মুখ চুন করে ফিরে এসেছিল যাদব আর রামলালের দল। কিন্তু মনে মনে ভুঁইমালীদের ওপর রাগটা তাদের রয়েই গিয়েছিল। ভুঁইমালীদের আখেজও নিতান্ত কম ছিল না। আকালের বছর না খেয়ে শুকিয়ে মরে দেশান্তরী হয়ে গিয়ে গাঁয়ে মাত্র পাঁচ-সাত ঘর ঢুলীই এখন পর্যন্ত টিকে আছে। বলতে গেলে ভুঁইমালীদের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে আছে ঢুলীরা। কিন্তু তবু তেজ দেখ, স্পর্ধা দেখ তাদের! এত বড় বুকের পাটা হয়েছে যে ভুঁইমালীদের নামে গেছে কুণ্ডুকর্তাদের কাছে নালিশ করতে! ব্যাপারটি মুখ বুজে সহ্য করবার মত নয়। সহ্য ভুঁইমালীরা কবে করে শুনি। সুযোগ মত তারা ঢুলীদের ঠাট্টা করেছে, টিটকারী দিয়েছে, বকুনি ধমকানিও কম দেয় নি।

কিন্তু ঢুলীদের এবারকার স্পর্ধা আর অত্যাচার সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেল। ভুঁইমালীরা ক্ষেপে উঠল এর প্রতিশোধ নিতে হবে। গগন অবশ্য ক্ষমা চেয়েছে। কিন্তু বুড়োমানুষের অমন অনুনয় মানতে রাজী নয় ভুঁইমালীরা। ভরত, আর যাদব রামলালের রোখ তো তারা স্বচক্ষে দেখেছে। স্বকর্ণে শুনেছে তাদের দেমাকের কথা, 'যা করেছি বেশ করেছি!' এর পর আর ক্ষমা করবার কি থাকে মানুষকে।

শুকচাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ভরত। একসঙ্গে দু'বছর ধরে করাত টানছে। সে বলল, 'যেতে দাও, যেতে দাও, যা হবার হয়ে গেছে! এ নিয়ে আবার একটা—'

কার্তিক বলল, 'তোমার আর কি! তোমার তো আর সমাজ সামাজিকতা নেই; স্বজাতির ওপর কোন মায়া-মমতাও নেই তোমার। তুমি তো ও কথা বলবেই। দেশ-গাঁয়ে তো আর থাক না। বছরের মধ্যে এগার মাস এ গঞ্জে ও বন্দরে করাত কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াও। বাড়িঘরে যদি থাকতে তাহলে ও কথা আর বলতে পারতে না। জাতের ওপর আপনা থেকেই একটা মায়া জন্মাত।'

শুকচাঁদ হেসে একটা বিড়ি ধরাল, 'বলল, 'দরকার নেই আমার অমন মায়ায়। এই বেশ আছি। তোমাদের জাতের মায়া মানে তো বেচারা ঘরকয়েক ঢুলীকে খুঁচিয়ে অস্থির করে তোলা। আমি ওসবের মধ্যে নেই। এতে তোমরা আমাকে একঘরেই করো আর যাই করো।'

শুকচাঁদের সঙ্গে কথা বলা বৃথা। কার্তিক জলধরের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'মোড়ল জেঠা, তোমার কি মত? ঢুলীরা যে কেশব বেচারাকে অমন করে জাতে মারল, তারপর হাতে মারল এর কি একটা পেরতিকার করবে না তোমরা! এমনি করে করে আহ্লাদে আহ্লাদে বুঝি ঘাড়ে তুলবে ওদের? আজ কেশবকে মারল, কাল মারবে অশ্বিনীকে।'

শুকচাঁদ একটু ধোঁয়া ছাড়ল বিড়ির, বলল, 'তোমার নিজের কথাটাও মনে রেখ কার্তিক। আমার তো মনে হয় অশ্বিনীর চেয়ে রাগ ওদের তোমারই ওপর বেশি।'

শুকচাঁদ চিরকালই এমনি ফাজিল-ফক্কর ধরনের মানুষ। কোন কাজের কথা তার সঙ্গে বলার জো নেই। সব তার কাছে যেন ঠাট্টা-টিটকারীর জিনিস। গোটা দুনিয়াটা যেন তার ঠাট্টাতে উড়ে যাবে! বিরক্ত হয়ে কার্তিক তার কথার কোন জবাব দিল না। জলধরকেই উদ্দেশ করে বলল, 'চুপ করে রইবে নাকি মোড়ল জেঠা?'

জলধর বলল, 'নারে বাপু, চুপ করে থাকব কেন? চুপ করে থাকব না। তাই বলে তোর মত মারধরের মধ্যেও আগে যেতে চাই না। তোদের আর কি, লোকে দোষ দিলে আমাকেই দেবে। আমাকেই নিন্দা করবে গাঁসুদ্ধ লোক। তার চেয়ে কুণ্ডুকর্তারা যখন আছেন, তাঁদের একবার বলে দেখি। কোন বিধিব্যবস্থা যদি তাঁরা না করেন তখন দেখা যাবে। আছেন যখন তাঁরা মাথার ওপর আপদে-বিপদে দেখছেন, কাজকর্ম দিয়ে অন্ন যোগাচ্ছেন; তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ না করে কিছু করা ভাল হয় না কার্তিক?'

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল বৈঠকে। এবার আর ঢুলীরা নয় দলবলে ভারি হয়েও ভুঁইমালীরাই প্রথম গিয়ে এবার নালিশ করল রসময় কুণ্ডুর কাছে।

পরদিন সন্ধ্যার পর রসময় কুণ্ডুর বৈঠকখানায় দরবার বসল ঢুলী আর ভুঁই-মালীদের। রসময় কুণ্ডু সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'খবরদার, হাট মেলাতে পারবি নে এখানে এসে। ভিড় চেঁচামেচি সহ্য করতে পারব না আমি তা আগেই বলে দিচ্ছি।'

জলধর করজোড়ে সবিনয়ে বলেছিল, 'আজ্ঞে না কর্তা, চেঁচামেচি হবে কেন, আপনার আজ্ঞা ছাড়া ভুঁইমালীদের কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করবে না দেখে নেবেন।'

রসময় বলেছিলেন, 'কথাগুলি মনে থাকে যেন। ঢুলীদেরও বলে দিস। যাদের আসা দরকার, যারা কেবল মাতব্বর গোছের লোক তারাই যেন শুধু আসে এখানে। একগাদা বাজে লোক এসে না যেন ভিড় জমায়।'

রসময় কুণ্ডু গাঁয়ের মধ্যে অন্যতম ধনী এবং মান্যগণ্য মানুষ। সাবই তাঁকে সমীহ করে চলে। রাইগঞ্জে বড় আড়ত আছে তেল, নুন, কেরোসিনের। জায়গা-জমি জোত-তালুকও করেছেন কিছু কিছু। ঢুলীরা তাঁর ভিটেবাড়ির প্রজা, ভুঁই-মালীরাও তাঁর নিতান্ত অনুগত। জমির বর্গা চষে, ডাক দিলে লাঠিহাতে পাশে এসে দাঁড়ায়, আধা-বয়সী মেয়েরা এসে বাড়ির কাজকর্ম করে দেয়, ধান ভানে, চিড়া কোটে, উঠান এবং ঘরের ভিত লেপে সুন্দর করে দেয়। কেবল রসময় কুণ্ডুর বাড়িতেই নয়, কুণ্ডুপাড়ার, বামুন-কায়েতদের পাড়ার সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরেও ঢুলীদের, ভুঁইমালীদের স্ত্রী-পুরুষেরা এসব কাজকর্ম করে। আর তাই নিয়ে ঈর্ষা করে পরস্পরকে। একজন আর একজনের বিরুদ্ধে মনিবের কান ভারি করে তোলে। পরের ঘরের মেয়েমানুষের নামে অসতীত্বের অপবাদ রটায়, পুরুষের বিরুদ্ধে বদনাম দেয় চুরি-ছেঁচড়ামির। প্রতিযোগিতা বাপ-ভাইয়ের সঙ্গেও চলে, দলাদলি হয় নিজেদের মধ্যে। তবু যেখানে জাতের কথা ওঠে, প্রশ্ন ওঠে শ্রেষ্ঠত্বের ছোটবড়ত্বের জাত হিসাবে সুযোগ পাওয়া না পাওয়ার সেখানে ঢুলীরা, ভুঁইমালীরা তাদের জাতের ভিত্তিতেই আলাদা হয়ে দাঁড়ায়।

শালুর তৈরি লাল রঙের ছোট একটি থলের মধ্যে হরিনামের মালা জপ করতে করতে রসময় কুণ্ডু এসে বসলেন চেয়ারে। দলের মাতব্বর বলে জলধর আর গগন দু'খানা জলচৌকি পেয়েছে। অন্যান্য সবাই মাদুর বিছিয়ে বসল। একই মাদুরের ওপর দুই দলের বসবার বন্দোবস্ত, তবু মাঝখানে যাতায়াতের জন্যে ফাঁক রইল একটু। দুই দল আলাদা আলাদা হয়ে বসল স্পর্শ বাঁচিয়ে। কেবল শুকচাঁদ বসল ভরতের পাশ ঘেঁষে। জলধরের ইচ্ছা ছিল না তাকে সঙ্গে আনবার। কিন্তু শুকচাঁদ জোর করে এসেছে। বলেছে, 'বাঃ, এত বড় একটি রঙ-তামাসার ব্যাপার হচ্ছে, তোমরা সবাই দেখবে আর আমি দেখতে পাব না?'

'রঙ-তামাসার ব্যাপার!' রাগে দাঁত কিড়মিড় করে উঠেছিল জলধর, 'দাঁড়াও, ব্যাপারটা চুকে যাক, তারপর তোমার রঙ তামাসা আমি বের করছি।'

কিন্তু ঘরে ঢুকেই ঢুলী-ভুঁইমালীদের বিরোধ সম্পর্কে প্রথমেই যে কথা বললেন রসময় কুণ্ডু তার সঙ্গে যেন খানিকটা মিল আছে শুকচাঁদের কথার ঢঙের। প্রারম্ভে রসময় দুই দলকেই একচোট ধমক দিয়ে বললেন, 'এই যে জলধর, এই যে গগন, সাঙ্গোপাঙ্গরা সব এসেছে তো? আবার বুঝি বাধিয়ে এনেছ আর এক দফা? আচ্ছা, খেয়ে না খেয়ে তোদের ঝগড়া বিবাদ মিটানো ছাড়া কি আর কাজকর্ম নেই মানুষের? দু দিন বাদে বাদেই একটি না একটি বিবাদ বাধাবি। তোরা কাণ্ড ঘটাবি, আর আমার যত সব জরুরী কাজ পণ্ড করবি। বয়স তো দু'জনেরই হয়েছে। এখন থেকে ঝগড়া-বিবাদটি একটু কমা, যার যার পাড়ার ছেলে-ছোকরা চ্যাংড়াদের একটু শাসনে রাখ্‌ বুঝেছিস?'

গগন নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। জলধর বলল, 'আজ্ঞে, এ তো সোজা কথা কর্তা, না বুঝবার কি আছে!' কিন্তু একটা কথা জলধর ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে সুবিচারের আশায় এখানে তারা এসেছে বলে কুণ্ডুদের বড়কর্তা তাঁর কাজকর্ম নষ্ট করবার জন্যে বকুনি দিচ্ছেন; কিন্তু জলধররা যদি এখানে না এসে নিজেরাই সালিস-দরবার করত তাহলেও কি খুশি হতেন বড়কর্তা? হতেন যে না তার প্রমাণ আগেও পেয়েছে জলধর। নিকুঞ্জ ভুঁইমালীর বিধবা স্ত্রী তারাদাসীকে বের করে দিয়ে গিয়েছিল তার প্রতিবেশী কৈলাস; জলধর নিজে নিয়েছিল সেই বিচারের ভার। তাই নিয়ে বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন রসময়; বলেছিলেন, 'খুব মাতব্বর হয়েছিস দেখছি, সালিস-দবারের বুদ্ধি মাথার মধ্যে বুঝি একেবারে গজগজ করে। নিজেরাই একেবারে হর্তাকর্তা বিধাতা!'

কোন ব্যাপারের মীমাংসার জন্যে বড়কর্তার কাছে আসলেও দোষ, না আসলেও দোষ। মনে মনে অবশ্য মোটামুটি বুঝে নিয়েছে জলধর যে, এই দুই দোষের মধ্যে না আসার দোষটাই গুরুতর। এলে মুখে যত রুষ্ট ভাবই দেখান না বড়কর্তা মনে মনে খুশি হন। আর রসময় কুণ্ডু খুশি থাকলে, সদয় থাকলে অনেক লাভ। তার জন্যে কেবল একটা কেন, দিনে একগণ্ডা বিবাদও নিজেদের মধ্যে যেন লাগিয়ে রাখা যায়।

তবু খট করে রসময়ের তিরস্কারটি ভারি কানে লাগল জলধরের; 'দু'দিন বাদে বাদেই একটা না একটা বিবাদ বাধাবি তোরা আচ্ছা ওস্তাদ হয়েছিস সব!'

ওস্তাদ হয়েছে বলেই কি তারা বিবাদ বাধায়? জবাবটা ফস করে মুখে এসে গেল জলধরের, তেমনি করজোড়েই বলল, 'আজ্ঞে বড়কর্তা, বিবাদ তো আমরা ইচ্ছা করে বাধাই নে, বিবাদ আমাদের মধ্যে লেগে যায়।'

রসময় ধমক দিয়ে উঠলেন, 'লেগে যায়? বিবাদের বুঝি হাত-পা আছে? কেউ না বাধালে বিবাদ বুঝি আপনিই এসে গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে!'

জলধর নিজেকে সংশোধন করে বলল, 'আজ্ঞে তা কেন বড়কর্তা। বিবাদ তো বাধিয়েছে এবার ঢুলীরা, সবার মূলে আছে এই গগন ঢুলী। গগনই তো আমাদের জাত মারবার জন্য করল কাণ্ডটা। কেশবকে নানান লোভ দেখিয়ে সানাই বাজিয়ে এল বিদেশে বিভূঁয়ে। একসঙ্গে বসে ভাত খেল। ভুঁইমালীদের সর্বনাশের আর বাকি রাখল কি, গগন যদি এসব কাণ্ড না করত তাহলে তো কোন গোলই বাধত না বড়কর্তা?'

গগন সেদিন সর্বসমক্ষে ক্ষমা চেয়েছে ভুঁইমালীদের কাছে। তার বিরুদ্ধে বেশি কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল না জলধরের। ইচ্ছা ছিল কেবল ঢুলীপাড়ার চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলিকেই সায়েস্তা করবার, কিন্তু রসময়ের ধমক খেয়ে মনটা এত বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল জলধরের যে গগনের বিরুদ্ধেই তার সমস্ত বিষোদ্গার বেরিয়ে এল।

গগন কি বলতে যাচ্ছিল তাকে থামিয়ে দিয়ে রুখে উঠল যাদব, 'হ্যাঁ, পাঁচ-সাত বছরের ছেলেমানুষ কিনা কেশব যে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে সঙ্গে করে? সে তো সামনেই আছে। তাকেই জিজ্ঞেস করুন না বড়কর্তা। বাপের বেটা যদি হয়, মিথ্যা কথা সে বলতে পারবে না। তাকে জিজ্ঞেস করুন কেন সে গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে, গাঁজার পয়সার টান পড়লে সে কেবল আমাদের ঢুলীদের সাথে কেন, মেথর-মুদ্দাফরাশের সাথে গিয়েও কাজে নামতে পারে!'

রসময় ফের ধমকের সুরে বললেন, 'আঃ, অত চেঁচাচ্ছিস কেন তুই তাই বলে? এ কি একটা হাট না বাজার, না ভদ্রলোকের বাড়ি! যা বলবি ধীরে-সুস্থে আস্তে আস্তে বল্। তা ছাড়া বলতে বললুম গগনকে; তুই নিলি তার মুখের কথা কেড়ে। ব্যাপার কি গগন ঢুলী, পাড়ার মোড়লগিরি কি আজকাল যাদবের হাতে ছেড়ে দিয়েছ? তুমি কি পেনসন নিয়েছ নাকি রিটায়ার করে?'

গগন শান্তস্বরে জবাব দিল, 'আজ্ঞে না কর্তা, মোড়লী ছেড়ে দেব কেন!'

রসময় বললেন, 'ছেড়ে দাও নি তো কি কেড়ে নিয়েছে যাদব?'

গগন বলল, 'আজ্ঞে না কর্তা, তাও নয়। মোড়লী আপনা-আপনিই গিয়ে ওর হাতে পড়তে চাচ্ছে না। পাড়ায় যাকে মানেগণে সেই তো মোড়ল। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, দেহও ভাল না, পাড়ার সালিস-দরবার এখন যাদবই দেখে। নিজের যোগ্য ছেলেপুলে তো নেই। ভরসা ছিল ভরতকে দিয়ে, তা ও তো করাত

নিয়েই রইল। যাদব ছাড়া আর লোক কই পাড়ায়।' শেষের দিকে গলাটা ভারি করুণ শোনাল গগনের।

যাদব জিভ কেটে বলল, 'আজ্ঞে না বড়কর্তা। মোড়লী আমি কেড়েও নিই নি, মোড়লী আমার হাতেও আসে নি। গগন জেঠার মোড়লী গগন জেঠারই থাক। আমি তা নিতে যাব কেন! আমি কেবল হক কথা বলতে এসেছি, আর হক কথা বলতে বিষ্টু ঢুলীও ডরাত না, তার ছেলে যাদব ঢুলীও ডরায় না কাউকে।'

'হুঁ', হরিনামের মালা রেখে হুঁকো ধরলেন রসময়, তারপর হঠাৎ যেন চোখ পড়ল তাঁর কেশবের ওপর। মাথায় পট্টি বেঁধে ভুঁইমালী দলের পিছনে চুপচাপ বসে ছিল কেশব। পুরোনো শাড়ির খানিকটা ছিঁড়ে দিয়ে সযত্নে কে যেন পট্টি বেঁধে দিয়েছে তার মাথায়। শাড়ির নকসা পাড়ের খানিকটা অংশ বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

রসময় একটু ভ্রূ কুঁচকে সেই দিকে এক পলক তাকিয়ে রইলেন। মনে পড়ল এই নকসী পেড়ে শাড়ি তিনি মাধবদাসের বোষ্টমী রাসেশ্বরীকে পরতে দেখেছিলেন। রসময় বললেন, 'ব্যাপার কি রে কেশব, হল কি তোর মাথায়? বৈরাগীর আখড়ায় এখনও খুব আড্ডা জমাচ্ছিস বুঝি? ঠেসে গাঁজা টানছিস বুঝি খুব? কলকে না ফেটে মাথা ফেটেছে।'

রসময়ের রসিকতায় কেউ কেউ মুখ নীচু করে হাসল কিন্তু ভুঁইমালীদের মোড়ল জলধর রীতিমত গম্ভীর মুখে বলল, 'আজ্ঞে না কর্তা, গাঁজায় মাথা ফাটলে তো কোন গোলই ছিল না, কেশবের মাথা ফাটিয়েছে গগনের জামাই ভরত। সেই বিচারের জন্যেই তো আপনার কাছে আসা, লোভ দেখিয়ে জাতও মারবে আবার মাথাও ফাটাবে, একি মগের মুল্লুক পেয়েছে নাকি ঢুলীরা যে এমন যা খুশি তাই অনাচার-বদাচার করবে? আপনি রয়েছেন না মাথার ওপর! আপনার ভিটেবাড়ির প্রজা বলে আপনি তো আর কারও কোল টেনে কথা বলবেন না বড়কর্তা, আপনি ন্যায্য সুবিচার করবেন। ঢুলীরা যেমন আপনার ভিটেবাড়ির প্রজা আমরাও তো তেমনি আপনার হাতের লাঠি, পায়ের জুতো, আমরা সুবিচার চাই আপনার কাছে।'

তারপর ঢুলী আর ভুঁইমালীদের বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়ে রসময়ের কাছে সমস্ত রহস্যই উদ্ঘাটিত হল। চেঁচামেচি করলে যাদব ভরতেরা, মৃদুস্বরে টিপ্পনী কাটল শুকচাঁদ, জলধর সমস্ত দোষ গগন আর তার দলের ঢুলীদের ঘাড়ে ফেলতে চেষ্টা করে বার বার বলতে লাগল যে, ,গেঁজেল হলেও জাতে তো ভুঁইমালী

কেশব। গগন ঢুলী কোন্ আক্কেলে তার জাত মারল, অপমান করল, মুখ হাসাল এ গাঁয়ের ভুঁইমালীদের?'

গগনকে জিজ্ঞাসা করলেন রসময়, 'কি হে গগন, তোমার কি বলবার আছে বল, বয়স তো আর কম হয় নি, মাথার চুলে বেশ পাক ধরে গেছে। একটা জাতের তুমি মোড়ল। তুমি এমন অপকর্ম করতে গেলে কার কথায়? জাত মারলে কেন ভুঁইমালীদের?'

গগন বলল, 'আজ্ঞে বড়কর্তা, জিজ্ঞেস করে দেখুন কেশবের কাছে। আমিই ওকে ডেকে নিয়েছিলাম না কেশব নিজেই যেচে সঙ্গে গিয়েছিল আমাদের, পেট টিপলে ঢুলীদের ভাত এখনও ওর মুখ থেকে বেরোয় বড়কর্তা। নতুন করে ঢুলীরা ওর আর কি জাত মারতে যাবে? আপনার তো আর কিছু অজানা নেই, আপনি জানেন, সব বোঝেন, এই অজুহাতে ভুঁইমালীরা আমাদের সঙ্গে একটা বিবাদ বাধাতে চাইছে হুজুর, জব্দ করতে চাইছে আমাদের।'

রসময় এবার ফিরে তাকালেন কেশবের দিকে, 'সত্যি করে বল্ কেন গিয়েছিলি তুই ঢুলীদের সঙ্গে? গাঁজার লোভ দেখিয়ে নিয়েছিল তোকে গগন, না আরও কিছু ব্যাপার ছিল তলে তলে? গগনের জামাই ভরত যা বলছে আরও পাঁচজনে যা বলছে—'

জলধর উৎসাহ দিয়ে বলল, 'ভয় নেই তোর কেশব, যা ঘটেছিল সব খুলে বল্ বড়কর্তাকে। দোষঘাট তো তোর একার হয় নি, এক হাতে তালি বাজে না কোনদিন। গগনের মেয়ে সিন্দুরের ব্যাপার-ট্যাপার যা জানিস সব বল্ এখানে।'

এই উৎসাহ জলধর আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা কেবল আজ নয়, ক'দিন ধরেই দিচ্ছে। অত সংকোচ কেন কেশবের! বদনাম রটেছে, মাথা ফেটেছে এখন আর সংকোচ করে লাভ কি? তার চেয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিক কেশব। জোর করে বলুক যা ঘটেছিল। জামাই-এর ওপর রাগ করে মেয়েকে তার হাতেই তুলে দিয়েছিল গগন একথা পরিষ্কার করে সবাইকে জানিয়ে দিক কেশব। জব্দ হোক ঢুলীরা চিরকালের জন্যে, মুখে কালি পড়ুক তাদের। নিজের জন্যে যেন কোনরকম চিন্তা করে না কেশব। জলধর তাকে অভয় দিয়ে বলেছে পুরুষের কোনদিন জাত যায় না, পুরুষের কলঙ্ক স্থায়ী হয় না বেশিদিন। নিজের আত্মীয়-স্বজনের ভিতর থেকে খোঁজখবর করে দেখেশুনে বেশ ভাল একটি ডাগর সুন্দরী মেয়ে তার জন্যে এনে দেবে জলধর। কেশবের ভয় কি? ন্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয়! রাসেশ্বরীর রাসলীলার যে সঙ্গী তার আবার ভয় কিসের কলঙ্কের! প্রায়শ্চিত্ত করে

তাকে জাতে তুলে নেবে ভুঁইমালীরা। পটিবাঁধা ফাটা মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কেশব রাজী হয়েছিল জলধরদের কথায়, ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল তার সম্মতি।

তাই রসময় যখন কেশবকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন, উপস্থিত সমস্ত ভুঁই-মালীদের চোখ তার মুখের ওপর এসে পড়ল। কেশব তাকাল একবার জলধরের দিকে, তারপর রসময়ের দিকে চেয়ে বলল, 'না হুজুর, কেবল গাঁজার লোভেই জাত দিতে যাই নি আমি ঢুলীদের সঙ্গে। আরও কারণ ছিল।'

সবাই উৎসুক এবং কৌতূহলী হয়ে উঠল। চাপা হাসি খেলে গেলে ভুঁই-মালীদের ঠোঁটে আর চোখের কোণে।

রসময় বললেন, 'কারণ ছিল? কি কারণ ছিল বল্ স্পষ্ট করে।' গগনের মুখের দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল কেশবের। ভারি নির্জীব আর হয়রান মনে হচ্ছে গগনকে, যেন কত পরিশ্রম করে এসেছে খানিক আগে। কেশবের মনে পড়ল যখন সত্যি সত্যিই পরিশ্রম করতে হয়েছিল গগনকে, ঢোল কাঁধে তিন ক্রোশ পথ হেঁটে গিয়ে বিয়ের বাজনা বাজিয়েছিল গগন, সেদিন কিন্তু এত হয়রান দেখা যায় নি তাকে। সেদিন উৎসাহে উল্লাসে ঢোল নিয়ে নাচতে শুরু করেছিল গগন, কেবল নিজেই নাচে নি, কাঁধ চাপড়ে, বাহবা দিয়ে কেশবের প্রাণ-মনও নাচিয়ে তুলেছিল গগন। বলেছিল, কেশবের মত সানাই এ মুল্লুকে আর কেউ বাজাতে পারে না, এমন কি গগনের জামাই ভরত ঢুলীও নয়।

রসময় আর একবার ধমক দিয়ে উঠলেন, 'এই হারামজাদা গেঁজেল, চুপ করে রইলি যে? বল্ যা বলবি, ইস লাজের তো আর সীমা নেই, লাজে একেবারে মরে যাচ্ছে দেখ না!'

কেশব বলল, 'আজ্ঞে না বড়কর্তা, লাজ নেই আমার। আপনাকে সব বলব, তার আবার লাজ কিসের।'

রসময় বললেন, 'লজ্জা যদি না থাকে তবে বলে ফেল্ বাপু আর দিক করিস নে।'

কেশব বলল, 'কেবল গাঁজার লোভে নয় বড়কর্তা। ঢুলীদের সঙ্গ নেওয়ায় আরও কারণ ছিল। বিয়ের আসরে অনেক লোকজনের মধ্যে সানাই বাজাবার ভারি লোভ ছিল বড়কর্তা। এতকাল বনে-বাদাড়ে বাঁশী বাজিয়েছি। কেউ শুনেছে কেউ শোনে নি। এবার দেখলাম গিয়ে পরখ করে। বাজাবার মত বাজাতে জানলে, বড়কর্তা সবাই শোনে।'

ভুঁইমালীরা হৈহৈ করে উঠল, 'গাঁজাখোর, বদমাস কেশব সব বানিয়ে বলছে বড়কর্তা। গগন ওকে চোখ ঠেরে দলে টেনে নিয়েছে।'

ঢুলীরা বলল, 'কখনও না, চোখ কেশবকে তোমরাই ঠারতে চেয়েছিল, পার নি। ধম্মের মুখ চেয়ে কেশব সত্যি কথা বলেছে। তোমাদের সাজানো কথায় রাজী হয় নি।'

রসময় বললেন, 'সানাই ছাড়া যদি এর ভিতর আর কিছুই নাই-ই থাকবে, ভরত ঢুলী তোর মাথা ফাটাতে গেল কেন শুনি?'

কেশব বলল, 'আজ্ঞে বড়কর্তা, সে কথা ভরত ঢুলীকেই জিজ্ঞেস করুন। দুপুর রোদে পাঁচজনের কানাঘুষায় ভরতদার মাথার ঠিক ছিল না। কি বল ভরতদা, তাই না?'

উপায়ান্তর না দেখে ভরতও তাই স্বীকার করল।

নিজের মান নিজের রাখতে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন রসময়। সময় নষ্ট এবং শান্তিভঙ্গের জন্যে ঢুলীদের জরিমানা করলেন দশ টাকা, ভুঁইমালীদেরও তাই। বলে দিলেন, এ টাকা বারোয়ারী কালীপূজোর তহবিলে জমা হবে। টাকা যেন কালই পৌঁছে দেয় সবাই।'

কুণ্ডুদের বৈঠকখানা থেকে দুই দলই মুখ কালো করে বেরিয়ে এল। শুকচাঁদ বলল, 'কেমন, তখনই বলেছিলুম না আমি, যে দরকার নেই ওসব সালিস-বিচারে? নিজেদের ঝগড়াঝাঁটি নিজেরাই মিটিয়ে ফেল। সে কথা তো কারও গায়ে লাগল না। লাগবে কেন? গরীবের কথা বাসি হওয়ার আগে তো আর মিষ্টি লাগে না! এখন বোঝা মজা। মর জরিমানা দিয়ে তবিল ভরতি করো রসময় কুণ্ডুর।'

কথাগুলি কেবল শুকচাঁদের মুখ থেকে বেরুলেও মনের কথা যে শুধু শুকচাঁদের নয়, ঢুলী আর ভুঁইমালীর দলের প্রায় প্রত্যেকেরই তা তাদের হুঁ হাঁ আর মাথা নাড়বার ধরনেই বোঝা গেল। কেবল ধরা দিল না দলপতি জলধর। শুকচাঁদের দিকে তাকিয়ে সে ধমকের স্বরে বলল, 'তুই থাম্ দেখি শুকো। মুরোদ নেই আধা পয়সার কেবল বড় বড় কথা। রসময় কুণ্ডু যেন তোদের দশ-বিশ টাকার কাঙাল যে এই টাকা আদায় না হলে ভাত জুটবে না তার! শুনলি নে বারোয়ারী কালী-পুজো হবে। জরিমানার নাম করে সেই চাঁদাই আদায় করে নিতে চাচ্ছে কায়দা করে। চাপ না দিলে, জোর-জবরদস্তি না করলে তো একটা পয়সাও ঘর থেকে বের করবি নে কেউ?'

অশ্বিনী ভুঁইমালী চটে উঠে বলল, 'কেন করব শুনি? পয়সা কি মাগনা আসে

নাকি মাতব্বর? নাকি ঘরে মাগ-ছেলে নেই কারও। ভাত-কাপড় দিতে হয় না তাদের? বারোয়ারী কালীপুজোর চাঁদা কুণ্ডুর তবিলে আমরা কেন দিতে যাব শুনি? চাঁদা করে পুজো আমরা করতে পারি নে? চাঁদাই হোক আর জরিমানাই হোক একটা পয়সাও আমরা দিতে পারব না। যে পারে সে দিক গিয়ে। মাতব্বরী রাখবার দায় আছে যার সেই গাঁট থেকে বার করুক গিয়ে টাকা।'

রাগে অবশিষ্ট কয়েকটি দাঁত কিড়মিড় করল জলধর। কিন্তু অনুগামী ছোকরাদের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে ঠাণ্ডা মেজাজেই বলতে চেষ্টা করল, 'একটু আস্তে অশ্বিনী আস্তে, রাত-বিরাতের সময়। এক পাড়ার কথা আর পাড়ায় ভেসে যায়। তাছাড়া এ সময় গাছপালারও কান খাড়া হয়ে থাকে। কোন্ কথা কার কানে যাবে তার ঠিক কি, যা বলবি একটু নীচু গলায় বল্!'

অশ্বিনী বলল, 'গলা উঁচু-নীচু তুমিই করো মাতব্বর, আমরা অত উঁচু-নীচুর ধার ধারি নে।'

শান্ত গলায় জলধর অবুঝদের বোঝাবার চেষ্টা করে বলল, 'ধারবি বাপু ধারবি। এখন না ধারিস পাঁচ-দশ বছর পরে ধারবি। আরে এককালে ওরকম গায়ে গরম রক্ত আর মুখে গরম কথা আমাদেরও ছিল। তখন আমরাও বাপ-দাদার সাথে অমন কত তর্ক বিতর্ক করেছি। এখন বুঝি ওসব গরম রক্ত আর গরম কথা পরে আপনা-আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর ঠাণ্ডা মাথা ছাড়া কোন কাজ হয় না দুনিয়ায়। আরে ঘরে মাগ-ছেলে আছে বলে, তাদের খাওয়াতে পরাতে হয় বলেই তো যত ভাবনা! মনিবের মান রেখে মনিবের মন যুগিয়ে চলতে হয় তো তাদের কথা মনে করেই। সংসার ছেড়ে নেংটি পরে বেরিয়ে গেলে কেবল একজন ওপরের মনিবকে মানলেই চলে। যতক্ষণ ঘর-সংসার আছে ততক্ষণ সব আছে। কাছারির পেয়াদা, থানার জমাদার, ভিটেবাড়ির মালিকের গোমস্তা—খাতির করে চলতে হয় সবাইকে। এই হল দুনিয়ার নিয়ম।'

কিন্তু দুনিয়ার নিয়ম সম্বন্ধে দলের ছোকরাদের তেমন কোন ঔৎসুক্য দেখা গেল না। অশ্বিনী শুকচাঁদের কাছ থেকে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে ধরাল। তারপর নিজেরা গল্প করতে করতে এগিয়ে চলল।

রাত অন্ধকার তবু আলো আনে নি সঙ্গে। অতিকষ্টে সংগ্রহ করতে হয় কেরোসিন তেল। দামও চড়া। মিছামিছি কে নষ্ট করতে যাবে সে তেল।

দুইদিকে ঘন জঙ্গল। বাঁশের ঝাড়, গাব আর খুদে জামের গাছগুলিরসঙ্গে ঘন পুরু অন্ধকার যেন একেবারে লেপ্টে রয়েছে। চোখে ভাল ঠাহর হয় না জলধরের।

একবার একটা গাছের শিকড়ের সঙ্গে, আর একবার থান ইটের সঙ্গে হোঁচট খেল জলধর। অথচ কতকালের পুরোনো চেনা পথ, ছেলেবেলা থেকে কত গভীর রাত্রে একা একা চলাফেরা করেছে এসব পথ দিয়ে। ঘোর অমাবস্যার রাত্রেও কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু আজকাল কেবল দিনকালই বদলে যায় নি, কেবল ছেলে-ছোকরাগুলিই অবাধ্য গোঁয়ারগোবিন্দ হয়ে ওঠে নি, চিরপরিচিত পথঘাটও যেন বদলে গেছে। যে-সব পথে আগেকার চিনে চোখ বুজে ছুটে চলতে পারত জলধর এখন সেই পথে পা টিপে টিপে চলেও রেহাই নেই। পায়ে পায়ে হোঁচট খেতে হয়। বুড়ো বয়সের সঙ্গে সবাই ইয়ারকি দেয়। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, কারও ওপর নির্ভর করা যায় না এতটুকু। অল্প বয়সী ছেলে-ছোকরা থেকে শুরু করে নিজের চোখ-কান, হাত-পাগুলি পর্যন্ত সুবিধা পেলেই বিরুদ্ধতা করে। যেমন মতিগতি দেখা গেল অশ্বিনীদের। জরিমানার চাঁদা আদায় করা শক্ত হবে। হয়তো মাফ করবার জন্যে রসময় কুণ্ডুরই হাতে-পায়ে ধরতে হবে গিয়ে জলধরকে। ভরসা আছে, তেমন করে ধরতে পারলে রসময় 'না' করতে পারবেন না। আরও অবশ্য এক কাজ করতে পারে জলধর। রসময়ের কাছে নালিশ করতে পারে এই-সব গোয়ারগোবিন্দ অশ্বিনী শুকচাঁদের নামে। তাহলে অবশ্য একদিনেই সায়েস্তা হয়ে ওঠে ওরা। রসময় যদি রাগ করে বর্গা জমি ছাড়িয়ে নেন অশ্বিনীর কাছ থেকে, অন্তত ছাড়িয়ে নেওয়ার ভয় দেখান তাহলেই মুখ চুন হয়ে যায় অশ্বিনীর। এসব গরম গরম বুলি বন্ধ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তা করতে চায় না জলধর। তাতে নিজেরই মান থাকে না। দলের লোক মাতব্বর বলে মানছে না, তর্ক করছে মুখে মুখে, মনিব হলেও একথা রসময়ের কাছে কি করে বলা যায়! তাতে কি মুখ থাকে না মান থাকে জলধরের? তার চেয়ে দলের দলের লোকের হয়ে জরিমানা মকুব করবার জন্যে গোপনে গিয়ে মনিবের হাতে-পায়ে ধরা অনেক ভাল, অনেক বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে জাতভাইদের জন্যে যে মায়া-মমতা আছে জলধরের সেই কথাই বুঝতে পারবে রসময়, আসলে গগনের মত সেও যে নিজের মাতব্বরী আর শক্ত হাতে ধরে রাখতে পারছে না সে কথা আরও কিছুদিন গোপন রাখা যাবে। গগন ঢুলীর বিনয় অনুনয় আর অমন ঠাণ্ডা নরম মেজাজের মানে যেন এবার পরিষ্কার বুঝতে পারল জলধর। এই নরম নোয়ানো ভাবটাই আসলে বুড়ো বয়সের বল। ছিটে কঞ্চি যেভাবে মাথা খাড়া করে থাকতে পারে, ভারি মাথাওয়ালা বড়ো বাঁশের কি আর তা সাধ্য আছে? সে মাথা নোয়াতেই হয়। তবু ছিটে কঞ্চির চাইতে তার মান বেশি, দাম বেশি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, দিনকাল

বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাত-পা'র কাজও তো বদলে যায়, যখন সড়কি-বল্লম ধরবার মত জোর থাকে না হাতের, তখন সেই হাত দিয়েই জড়িয়ে ধরতে হয় পা। আসলে কাজ আদায় করা নিয়ে কথা। তা সড়কি ধরেই হোক আর পা ধরেই হোক।

অন্ধকারে পিছনে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। জলধর ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বলল, 'কে?'

'আমি কেশব।'

'কেশব!' জলধর রাগে যেন ফেটে পড়ল, 'হারামজাদা গেঁজেল বদমাস! কোথায় ছিলি এতক্ষণ? মারের ভয়ে লুকিয়েছিলি বুঝি?'

কেশব শান্ত স্বরে বলল, 'না, মাতব্বর জেঠা!'

'না, মাতব্বর জেঠা!' জলধর ভেংচি কেটে উঠল, 'তবে এতক্ষণ কোথায় ছিলি শুনি?'

কেশব কুণ্ঠাহীন স্বরে বলল, 'একটু দম দিয়ে আসতে গিয়েছিলাম বলাইদের ওখানে।'

প্রত্যেক পাড়ায় কোথায় কোথায় দম দেওয়ার আড্ডা আছে সে খবর কেশবরা রাখে। ভুঁইমালীদের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে এসে হঠাৎ তাদের বিরোধিতা করে বসে মাথা এমন গুলিয়ে গিয়েছিল কেশবের যে গাঁজার ধোঁয়া ছাড়া মাথা ঠিক রাখতে পারছিল না কেশব। জরিমানা আর রসময় কুণ্ডুর অসদ্ব্যবহার নিয়ে যখন ঢুলী আর ভুঁইমালীরা সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল তখন সকলের অলক্ষ্যে অন্ধকারে কেশব পাশ কাটিয়ে সরে পড়েছিল।

জলধর তেমনি মুখ ভেংচে বলল, 'দম তোমাকে জন্মের মত দেওয়াবে এবার অশ্বিনী কার্তিকরা। বাঁদর পাজী বদমাস কোথাকার! চাঁদপানা মুখের লোভে গোটা ভুঁইমালী জাতটার মুখে চুনকালি দিয়ে এলি! ভেবেছিস ভুঁইমালীরা তোকে অমনি অমনি ছেড়ে দেবে? হাড় একজায়গায় মাস একজায়গায় করে ছাড়বে দেখে নিস। ঢুলীদের ভিতর থেকে তোর কোন বাবা এসে রক্ষা করে আমিও তাই দেখব!'

কেশব জলধরের ধমকানির কোন জবাব দিল না। নিঃশব্দে তার পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল। যতই ধমকাক যতই তাকে মারপিটের ভয় দেখাক জলধর—মনটা খুশি খুশি লাগছে তার। গাঁজার ধোঁয়া পড়ে সেই খুশি আরও বেড়ে গেছে। কেশবের মনে হয় একেক সময় একেক রকমের স্বাদ যেন গাঁজার। সুখের সময় একরকম

দুঃখের সময় আর একরকম। আবার সুখ-দুঃখের বাইরে মন যখন অদ্ভুত রকম ভোঁতা হয়ে থাকে তখন যেন আরেক রকম স্বাদ হয় বড় তামাকের। অদ্ভুত ক্ষমতা এ জিনিসের! দুঃখের সময় দুঃখকে ভুলিয়ে দেয়, সুখের সময় সুখকে দেয় বাড়িয়ে।

অনেক রাত্রে মাধব বৈরাগীর আখড়ায় ফিরে এসে মনের এই ধারণা ভাবনার কথা নিজের ভাষায় রাসেশ্বরীকে বলতে চেষ্টা করল কেশব, 'একেক সময় ভারি ইচ্ছা হয় ছেড়ে দি। লোকে যখন নিন্দে-মন্দ করে। কিন্তু ছাড়তে গিয়ে ছাড়তে পারি না। এমন ফুর্তি আর কোন জিনিষে নেই।'

রাসেশ্বরী গুনগুন করে উঠল, 'গাঁজা তোর পাতায় পাতায় রস। না খেলে যে প্রাণে মরি, খেলে অপযশ', তাই না? মনের মধ্যে আজ তোমার এত ফুর্তির ঢেউই বা হঠাৎ কেন উঠল ছোট বৈরাগী, বল দেখি সত্যি করে!'

এক কোণে রেড়ীর তেলের মৃদু আলো জ্বলছে লাল পোড়া মাটির দীপে। আর একপাশে পাটি বিছিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে মাধবদাস। ঢাকা দেওয়া ভাতের থালা এনে রাসেশ্বরী কেশবের সামনে ধরে দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল. 'এত ফুর্তি কিসের? সালিসে জিতল কারা, ঢুলীরা না ভুঁইমালীরা?'

কেশব ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে জবাব দিল, 'কেউ জেতে নি। সবাই ঠকে গেছে। জরিমানা হয়েছে দুই দলেরই। কেবল জিতেছি আমি।'

তারপর ভাত খেতে খেতে রসময় কুণ্ডুর সালিস-বিচারের আগা-গোড়া গল্প করে শোনাল কেশব রাসেশ্বরীকে। জলধরের ধমকানির কথাও গোপন করল না। রাসেশ্বরী বলল, 'ওরা আজই যে তোমাকে ভেঙেচুরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয় নি তাই তোমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি! দিলেই ভাল হ'ত।'

কেশব বলল, 'দিলেই ভাল হ'ত! শেষে তুমিও বললে এই কথা?'

রাসেশ্বরীর ভ্রূ নেচে উঠল, 'বলব না? আমার সতীনের পক্ষ নিয়ে কথা বলবে তুমি আর আমি বুঝি তোমাকে আদর-যত্ন করে খাওয়াব, পাখার বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়াব?'

কেশব বিস্মিত হয়ে বলল, 'তোমার সতীন আবার কে?'

রাসেশ্বরী মুখ টিপে হাসল, 'আহা হা আবার ন্যাকামি হচ্ছে! তোমার সিন্দুর গো সিন্দুর, নামটা বারে বারে কানে শুনতেও বুঝি ভাল লাগে।'

কেশব একবার তাকাল রাসেশ্বরীর দিকে, তারপর লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'কি যা-তা বলছ?'

রাসেশ্বরীও সেই আরক্ত মুখের দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল, তারপর তেমনিঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'যা-তা নয় গো যা-তা নয়! ঠিক কথাই বলছি। সিন্দুর আমার নাগরকে কেড়ে নিচ্ছে আমার কাছ থেকে। দরবারে আমাকে ঠকিয়ে তুমি জিতে এসেছ।'

কেশব কোন কথা বলল না বহুকাল ধরেই রাসেশ্বরী তার সঙ্গে এমন ঠাট্টা-পরিহাস করে আসছে। কিন্তু কিছুতেই সত্যি সত্যি ধরা দেয়নি কেশবের কাছে। বৈরাগী হলে কি হবে সংসার-আশ্রমে মাধবদাসরা উঁচু ব্রাহ্মণ-কায়স্থ জাতের মানুষ ছিল, গাঁয়ের অনেক লোকেরই তাই ধারণা। এদের চালচলন ধরন-ধারণ দেখে কেশবের সেই কথাই সত্য বলে বিশ্বাস হয়। মাধবদাসকে দেখে অবশ্য এখন আর চেনা যায় না! চাল-চলন ধরন-ধারণে অশিক্ষিত নীচুজাতের ভেকধারী বৈরাগী বলেই মনে হয় অনেক সময়। রাসেশ্বরীও কেশব এবং তার সঙ্গী সাগরেদদের সঙ্গে সমানভাবে মেশে, ঠাট্টা-তামাসা করে, নাগর আর ছোট বৈরাগী বলে পরিহাস করে কেশবের সঙ্গে। কিন্তু কেশব দু'-একবার ভুল করেই বুঝতে পেরেছে জিনিসটা পরিহাসের এক রতিও বেশি নয়। তাই যদি হ'ত তাহলে মাধবদাস এমন মুখ টিপে টিপে হাসতে পারত না। নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারত না নাক ডাকিয়ে। ওপর ওপর কোন বাদবিচার নেই রাসেশ্বরীর। ভুঁইমালীর ছেলে বলে কোনরকম হেলা অশ্রদ্ধা নেই কেশবের ওপর। ভাত রেঁধে দেয়, ভাত বেড়ে দেয়, নিজের হাতে এঁটো পরিষ্কার করে, যে-সব দিন মাধবদাসের আঙিনায় রাত কাটায় কেশব, রাসেশ্বরী নিজের হাতে বিছানা পেতে দেয়, পাখার বাতাস করে। আদর-যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি করে না। তবু যে রাসেশ্বরী উঁচু জাতের মানুষ, উঁচু রকম তার রুচি-প্রবৃত্তি একথা বুঝতে কেশবের বাকি থাকে না। নাগর তো ভাল, রাসেশ্বরীর নফর হওয়ার যোগ্যতাও কেশবের নেই, একথা সে ভাল করেই জানে। কেবল এইটুকুই সে বুঝে উঠতে পারে না, মাধবদাসকে দেখিয়ে দেখিয়ে এত রঙ্গরস তাকে নিয়ে করে কেন রাসেশ্বরী, কেন এমন মাত্রা ছাড়ানো ঠাট্টা-তামাসা করতে থাকে তার সঙ্গে।

কেশবকে নিরুত্তরে খেয়ে যেতে দেখে রাসেশ্বরী আর একবার খোঁচা দিয়ে বলল, 'কিন্তু ছোট বৈরাগী, ভেবে ভেবে এত যে আকুল হচ্ছ সিন্দুরের জন্যে জাত-কুল যে এমন করে ছেড়ে দিচ্ছ শেষ পর্যন্ত কি কোন সুবিধা হবে তোমার? গাঁয়ের

জোরে পাল্লা দিয়ে পারবে তো ভরত ঢুলীর সঙ্গে? নাকি আবার মাথাটাথা ফাটিয়ে এসে অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকবে! এবারে কিন্তু তাহলে এখানে আর জায়গা হবে না।'

কেশব বলল, 'না, গায়ের জোরে পারব না।'

রাসেশ্বরী বলল, 'তবে কিসের জোরে পারবে শুনি?'

কেশব বলল, 'পরে শুনো।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে মুখ-হাত ধুয়ে মাধবদাসের পাশে এসে বসল কেশব। কল্কেতে তামাক সাজল। বড় না, ছোটই. তারপর মাধবদাসের উদ্দেশ্যে সবিনয়ে বলল, 'আজ্ঞা করুন, গোঁসাইজী!'

ভারি পাতলা ঘুম মাধবদাসের। এক ডাকেই ঘুম ভাঙল, নাক ডাকানিও বন্ধ হল সঙ্গে সঙ্গে, মাধবদাস বলল, 'উঁহু, ধরিয়ে দে।'

কেশব বলল, 'জোর আগুন আছে গোঁসাই ঠাকুর। দু'-একটা টান দিলে আপনিই ধরে যাবে, ধরুন, নিন।'

মাধবদাস আর কোন কথা না বলে হুঁকোটা নিল হাত বাড়িয়ে।

কেশব উঠে গিয়ে বেড়ায় ঝোলানো বাঁশীটা নিয়ে এল ঘর থেকে।

রাসেশ্বরী খেতে বসেছিল। কেশবের পায়ের সাড়া পেয়ে মুখ ফিরিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'গায়ের জোরে হেরে গিয়ে ভরত ঢুলীর সঙ্গে বুঝি এই বাঁশীর জোরে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টায় আছ? কিন্তু ছোট বৈরাগী, আজকালকার রাধারা কি কেবল বাঁশীর স্বরে বাইরে আসে?'

কেশব জবাব দিল, 'বাইরে আসবার তো দরকার নেই ঠাকরুণ। বাঁশী শুনে ঘরের মধ্যে বসে বসে যদি শ্রীরাধার মন হাঁসফাঁস করে ওঠে তাই যথেষ্ট।'

পরামর্শটা শুকচাঁদই দিল ভরত ঢুলীকে 'কেলেঙ্কারী যা হবার তা তো হল। বিচার-আচারও খুব দেখলুম এদের। এবার পালা বউ নিয়ে।'

ভরত বলল, 'পালাব মানে?'

'মানে আবার কিরে শালা! নিজে না পালালে ওই কেশব ভুঁইমালীই এক-দিন তোর বউ নিয়ে পালাবে দেখে নিস।'

ভরত চোখ গরম করে বলল, 'এই শুকচাঁদ!'

শুকচাঁদ হেসে তরল স্বরে বলল, 'কিরে ভরত?' তারপর পরম বিজ্ঞের মত গম্ভীর ভঙ্গিতে উপদেশের ধরনের বলল, 'না না, গরম হবার সময় নয়। ঠাণ্ডা

মাথায় ভাল করে ভেবে দেখ্। সত্য হোক মিথ্যে হোক একটা কথা যখন রটেছে সিন্দুর আর কেশবকে নিয়ে তখন ফের ওকে এখন একা একা রেখে যাওয়া কি ভাল? তুই থাকবি সারা বছর কাঠখলিতে আর বউটিকে ফেলে যাবি এখানে তোর ওই বুড়ো শ্বশুরটির ভরসায়। যুবতী বউ নিয়ে ঘরে দোর দিলে তার কি আর কোন দিকে চোখ থাকে না কান থাকে, বল দেখি?'

ভরত খানিকক্ষণ কি চিন্তা করে বলল, 'কথা তুই ঠিকই বলেছিল। কিন্তু করি কি বল্ দেখি!'

শুকচাঁদ বলল, 'করবি আবার কি! কাজ নেই তোর আর গঞ্জের কাঠের খলিতে গিয়ে। গাঁয়েই থাক্, বউকে পাহারা দে আগের মত সানাই বাজা।'

'তাতে পেট ভরবে?'

'দেখ্ ভেবে, ভরে নাকি। না ভরে তো বউসুদ্ধ নিয়ে চল্। আজেবাজে কত ঘর পড়ে আছে সিকদার বাবুদের। চেয়েচিন্তে এক-আধাখানা কি আর জুটিয়ে দিতে পারব না তোদের বাসার জন্যে! সারা বছর হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাস, এখন থেকে বউ রেঁধে দেবে। আরে পুরুষের রান্না কি আর একটা রান্না! কোন-দিন নুনে মুখ পোড়ে, কোনদিন ঝালে বুক পোড়ে, মেয়েমানুষের হাত পড়লে ডালভাত আর বেগুন পোড়াও অমৃত হয়ে ওঠে, তা জানিস? সে ভাতে গায়ের বল বাড়ে, করাতের জোর বাড়ে।'

ভরত বলল, 'এত যদি গুণাগুণ মেয়েমানুষের রান্নার, এতকাল নিজের বউকে নিস নি কেন? নাকি সে রাঁধতে জানে না?'

শুকচাঁদ জবাব দিল, 'জানবে না কেন! কিন্তু তার চেয়েও বেশি জানে পোয়াতি হতে। দেখছিস না, কাছিমের মত কতগুলি কাচ্চা-বাচ্ছা। শহর-বন্দরে অত পুষ্যি থাকলে কি আর পোষানো যায়? তার চেয়ে তোর বউ বেশ ছোলা-হাতী, ছোলাদাঁতী আছে। খরচ কম, ঝামেলা কম। মাসে মাসে খোরাকির টাকাটা তুলে দেব তোর হাতে, বাস্ খালাস। এতকাল তো আমাকে দিয়ে রাঁধিয়ে খেলি এবার বউয়ের রান্না দিনকতক খাওয়া।'

কথাটা মিথ্যা নয়। গঞ্জে কাজকর্ম সেরে শুকচাঁদই রাঁধে বেশির ভাগ দিন। ভরত এক-আধটু যোগান দেয়—তারপর হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে বিড়ি টানে। ভাত খাবার আগে হাজার বার শুকচাঁদের গালাগাল আর দাঁত খিঁচুনি খেতে হয় তাকে, 'এই জম্মকুঁড়ে, পায়ের ওপর পা তুলে অমন করে বসে থাকলেই ভাত

নামবে নাকি? আমি কি তোর সাতপুরুষের পরিবার যে রোজ দু'বেলা তোকে রেঁধে রেঁধে খাওয়াব।'

গালাগালের চোটে যেদিন ভরত গিয়ে বসে ভাতের হাঁড়ির কাছে, ভাত-তরকারি সেদিন আর মুখে দেওয়ার মত হয় না। শুকচাঁদের বকুনি খেতে খেতেই পেট ভরে।

অথচ হাতের কাছে কত সহজ সমাধান রয়েছে। রয়েছে সিন্দুর। কিন্তু তাকে নিয়ে সাড়েসাতকাঠির গঞ্জে এসে এর আগে বাসা বাঁধবার কথা শুকচাঁদেরও মনে হয় নি, ভরতেরও নয়। শহর-বন্দরে গিয়ে বউ-ছেলে নিয়ে বাসা করে বাবু-ভূঁইয়ারা, যারা উকিল ডাক্তার মাষ্টার মোক্তার, যারা অফিস আদালতে কাজকর্ম করে। কিন্তু সাড়েসাতকাঠির বন্দরে যারা মিস্ত্রী, ঘরামী, কামলা-করাতীর কাজ করে ভরতদের মত তাদের প্রায় কারুরই বাসা নেই। সবাই নিজেরা রান্নাবান্না করে খায়, শরীর খারাপ থাকলে গিয়ে ওঠে হোটেলে। কামলা-করাতী তো ভাল, সিকদার বাবুদের বালতি কড়াই হাতা খুন্তির দোকানে যারা বেচাকেনা করে, খাতা লেখে তারাও কেউ শহরে বউ নিয়ে থাকতে পারে না। এই নিয়ে একদিন ভরতের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সিকদারদের দোকানের ভূষণ দাসের সঙ্গে। ভূষণ দাস পালা-পোরেনে লোহার চাকতি-বল্টু-পেরেক ওজন করে। সেদিন দেখা গেল ভাল করে পালা ধরতে পারে না। হাতের আঙুলে নেকড়া জড়ানো।

'আঙুলে কি হয়েছে দাস মশাই?'

'কেটে গেছে বঁটিতে মাছ কুটতে গিয়ে।'

ভরতের সঙ্গে শুরচাঁদও ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতি জানিয়ে বলেছিল, 'ইস, আহা-হা। এসব মাছ কোটা-টোটা কি আপনাদের সাজে। তা অত কষ্ট কেন করেন আপনারা? পরিবার নিয়ে এলেই তো পারেন।'

ভূষণ দাস একটু হেসেছিল, 'পরিবার! এই মাইনেয়? পোষাব কি করে করাতী?'

শুকচাঁদ বলেছিল, 'আপনারা একথা বলেন বাবু! কত দেখি রোজগার-পাতি করেন।'

'হ্যাঁ, একেবারে বস্তা বোঝাই টাকা। তোমরা কি ভাব করাতী, বল দেখি! তোমাদের চাইতে রোজগার আমাদের কম, অথচ খরচ বেশি। এখন ভাবি তোমাদের মত অমন গতর খাটাতে শেখাই ভাল ছিল।'

এতখানি প্রাণখুলে কথাবার্তা ভূষণ দাস তাদের সঙ্গে বলে না। কিন্তু সেদিন

দোকানে তেমন খদ্দেরের ভিড় ছিল না, কর্তারাও এদিক ওদিক কোথায় বেরিয়ে পড়েছিলেন, তাছাড়া আঙুল কেটে যাওয়ায় মনটাও বোধ হয় খুব নরম হয়ে পড়েছিল ভূষণ দাসের।

'বউ আনা তো ভাল, আঙুল কেটে এমন দশা হয়েছে যে বউয়ের কাছে পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারব না।' সখেদে জানিয়েছিল ভূষণ দাস।

সেদিন সন্ধ্যার পর রান্নাবান্নার আয়োজন করতে করতে ভরত আর শুকচাঁদ টাকাপয়সার অভাবে ভূষণ দাসের বউ না আনতে পারার জন্যেই দুঃখ করেছিল, নিজেদের অক্ষমতার কথা মনেও হয় নি, তা নিয়ে আলোচনাও ওঠে নি।

কিন্তু আলোচনাটা শুকচাঁদ যখন আজ তুলল, তখন মন্দ লাগল না ভরতের কাছে। বরং কেমন যেন একটু নতুন নতুনই লাগল। প্রায় অবিশ্বাস্য, অভাবিত এক আনন্দে মন ভরে উঠল ভরতের। শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে, উঠতে-বসতে তার খোঁটা শোনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে অন্য কোথাও ঘরবাড়ি করবার জন্যে মন আকুল হয়ে উঠেছিল ভরতের। কিন্তু সুবিধা মত ভিটে-মাটি পাওয়া যায় না। কম খাজনায় যে-সব ভিটা পাওয়া যায় তা যেমন জঙ্গলে, তেমনি নীচু আর খানা-খন্দে ভরা। গাছপালা কেটে, সাফ করে মাটি ফেলে উঁচু করে সে-সব জায়গায় নতুন ঘরবাড়ি করতে অনেক খরচ। তত টাকা কোথায় পাবে ভরত। কিন্তু সব মুশকিল আসান হয়ে যায় সিন্দুরকে নিয়ে শহর-বন্দরে চলে গেলে; জংলা ভিটে-মাটি সাফ করারও দরকার হয় না। কোঠাঘর, টিনের ঘর, শণের ঘর কত রকমের ঘর সেখানে তোলা আছে। যার যা পছন্দ। পছন্দ ঠিক নয়, পছন্দ তো ভরতেরও কোঠাবাড়ি। যার যা সাধ্য। ঢুকে পড়লেই হল আর মাসে মাসে কয়েকটা টাকা ভাড়া হিসাবে ফেলে দিলেই হল। কিন্তু ঘর ভাড়া দিয়ে খোরাকি দিয়ে কি কুলনো যাবে! শেষকালে কি হাবুডুবু খাবে না ভরত? বউকে মনে হবে না মাথায় দেড়মণি বস্তার মত!

শুকচাঁদ বলল, 'দুর বোকা! খাটুয়ে পুরুষের সঙ্গে মেয়েমানুষ যদি থাকে, খাটবার পর যদি আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দেয় বুকের পিঠের, নিজের হাতে পিঁড়ি পেতে ভাত-তরকারি তুলে দেয় সামনে, খাওয়ার সময় কাছে এসে বসে, শোবার সময় পা টেপে, মাথা টেপে সে মেয়েমানুষের ওজন দেড় মণ কেন আড়াই মণ হলেও হালকা সোলার মত মনে হয় পুরুষের মত পুরুষের কাছে। মানুষের

তখন খাটবার শক্তি বাড়ে, বুদ্ধি-বিবেচনা বাড়ে, রোজগারও দ্বিগুণ হয়ে যায়। ভয় পাস কেন অত, আমিও তো থাকব সঙ্গে সঙ্গে।'

তা ঠিক, ভয়ের মত ভরসাও আছে। শুকচাঁদ থাকবে সঙ্গে। যেমন ফিকিরবাজ, তেমনি করিতকর্মা লোক। হাতে ধরে ভরতকে করাত টানতে শিখিয়েছে শুকচাঁদ, নিজের হাতে দিনের পর দিন ভাত রেঁধে দিয়েছে তাকে। বিদেশে বিভূঁয়ে অভাবে অনটনে এমন বন্ধু আর হয় না।

ভরত বলল, 'বেশ, তাহলে চল যাই কালই। থাকবার মত একটু ডেরাটেরা ঠিক করি গিয়ে সেখানে। তারপর সিন্দুরকে এসে একজন নিয়ে যাব।'

শুকচাঁদ বলল, 'দুর বোকা! কত কোঠাবাড়ি যেন লোকে তুলে রেখেছে সেখানে, আর কত টাকাকড়ি যেন আছেতোর ট্যাঁকে যে যাওয়া মাত্রই বাসা ভাড়া ঠিক হয়ে যাবে! শহরে থাকবার জায়গার কত অনটন তা জানিস?'

উৎসাহ উদ্দীপনা সব যেন একেবারে চুপসে গেল ভরতের। শুকচাঁদ কি তাহলে এতক্ষন ঠাট্টা করছিল, ইয়ারকি দিচ্ছিল বন্ধুর সঙ্গে! সাড়েসাত কাঠির বন্দরে গিয়ে বাসা বাঁধবার প্রস্তাবটি তাহলে কি শুকচাঁদের পরিহাস ছাড়া কিছু নয়?

ভরত বলল, 'তবে? এতক্ষণ ধরে মিছামিছি বকবক করলি। তোর সবটাতেই ইয়ারকি।'

শুকচাঁদ মাথা নেড়ে বলল, 'না, মোটেই ইয়ারকি নয়। কাজের কথা নিয়ে কোনদিন ঠাট্টা-তামাশা করে না শুকু ভুঁইমালী। শালা-সম্বন্ধীর সঙ্গেও না, ইয়ার-বন্ধুর সঙ্গেও না। তুই এতকাল সঙ্গে সঙ্গে থেকেও আমাকে তাহলে এক ফোঁটাও চিনতে পারিস নি। ওপর থেকে শুকু ভুঁইমালীকে মানুষ যত হালকা মনে করে শুকচাঁদ ভিতরে ভিতরে তার একেবারে উল্টো। সীসার মত ভারি।'

কিন্তু ভারিক্কী ধরনেও বন্দরে গিয়ে বাসা বাঁধবার পদ্ধতি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করল শুকচাঁদ, ভরতের কাছে তাও নিতান্তই হালকা ইয়ারকির মত মনে হল। শুকচাঁদ বলল' 'বাসাটাসা ঠিক করে আনা কোন কাজের কথা নয়। একেবারে সিন্দুরকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে এই সঙ্গে। নিয়ে উঠতে হবে একেবারে সিকদারদের মেজোবাবুর সামনে,—আপনার ভরসাতেই নিয়ে এসেছি কর্তা; ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত যা করবার আপনিই করে দিন, আমরা কিছু জানি না।'

সিকদারদের মেজকর্তা বনবিহারীবাবু নিশ্চয়ই খুব বকাবকি করবেন। কিন্তু মুখ বুজে কানে তুলো দিয়ে খানিকক্ষণ কাটিয়ে দিতে পারলেই বাস্, কাজ

হাসিল। একটা না একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এ ধরনের চটপট কিছু একটা না করে ফেললে কোনদিন ভরত শহরে গিয়ে বাস করতে পারবে না। মেজোকর্তা যদি কেবল গালাগালি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন, অন্য কোন ব্যবস্থা নাই করেন ভরত আর শুকচাঁদের জন্যে, তখন নিজেদের পাখার বলে যুঝতে হবে। সাহস না লক্ষ্মী। মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকলে পুরুষের সেই সাহস আরও বাড়ে। ঘাড়ে বোঝা চাপলেই ঘাড় আরও শক্ত হয়।

ভরতকে যখন সঙ্গে নিয়েছিল শুকচাঁদ, তখনো তো ভরত কতবার এক-পা এগিয়েছে, দু'-পা পিছিয়েছে। সানাই বাজানো ছাড়া কোন কাজকর্ম জানে না ভরত, শহর-বন্দরে গিয়ে খাবে কি করে! কিন্তু জোর করে সত্যি সত্যি হাত ধরে টান দিয়েছিল বলেই না ভরত সঙ্গ ধরেছে শুকচাঁদের, করাত ধরেছে। আর তার ফলে লোকসান হয়েছে না লাভ হয়েছে সে হিসাব নিজের মনে মনে খতিয়ে দেখলেই তো পারে ভরত। পুরুষ মানুষের সাহসই লক্ষ্মী। সাহস ছাড়া কাজ হয় নাকি কোন!

ভরত ঘরে গিয়ে সিন্দুরের কাছেও পাড়ল কথাটা, যাচাই করে দেখতে চাইল শুকচাঁদের বুদ্ধিটা সত্যি সত্যিই সুবুদ্ধি কিনা, চাল নেই চুলো নেই হঠাৎ খপ করে গিয়ে বউ-ঝি নিয়ে ওঠাটা কি সমীচীন হবে! অবশ্য দু'-চার দিন কাটাবার মত থাকবার জায়গা যে না পাওয়া যাবে তা নয়। সিকদারদের গুদামের পিছনে কাঠগলির কাছাকাছি যোগেন মিস্ত্রীর বাসা আছে সেখানে গিয়েও ওঠা যাবে। কিন্তু এভাবে যাওয়াটা ঠিক হবে কি!

ঠিক আর বেঠিক কি, শহরে যাওয়ার কথা শুনে সিন্দুর একেবারে নেচে উঠল। দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরল ভরতের, 'কোন কথা শুনতে চাই না আমি, শহরে আমাকে নিয়ে যেতেই হবে। শুকদা যখন সঙ্গে থাকবে তখন আর ভাবনা কি! থাকবার জায়গা যদি শেষ পর্যন্ত নাই মেলে আমাদের এখানকার ঘরবাড়ি তো রইলই। ফের এসে উঠব এখানে। কিন্তু আমি আর কোন কথা শুনবো না, যাবই তোমার সঙ্গে। আচ্ছা, সেখানে নাকি হাওয়াগাড়ি আছে, সেখানে নাকি ছবিতে কথা বলে?'

ভরত ঘাড় নাড়ল 'হ্যাঁ' বলে। নিজের আঁচলের সঙ্গে ভরতের কোঁচার খুঁটে গিঁট দিল সিন্দুর, 'এই বেঁধে রাখলুম, দেখি এ বাঁধন কি করে খোল, দেখি কি করে ফেলে যাও আমাকে!'

অদ্ভুত এক আনন্দে সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ভরতের, খুঁটে খুঁটে এই গিঁট

সাত বছর আগে বাঁধা হয়েছিল। কেশবের সঙ্গে সিন্দুরের নামের যে গিঁট পড়ে গেছে, দু'জনের নাম জড়িয়ে যে কেলেঙ্কারীর কথা উঠেছে পাড়ায়, তাতে সন্দেহ হয়েছিল ভরতের সঙ্গে সেই সাত বছর আগের বাঁধা গিঁট বুঝি নিজের হাতে খুলে ফেলেছে সিন্দুর। এইসব নিন্দা অপবাদের মূলে বুঝি সত্যিই কিছু আছে। কিন্তু সিন্দুরের এই গলা জড়িয়ে ধরায় খুঁটে খুঁটে এই নতুন করে ফের গিঁট বাঁধায় মনে মনে ভারি আশ্বস্ত হল ভরত। না সে-সব কিছু নয়, ভরত ছাড়া আর কাউকে মনে ধরে নি সিন্দুরের, ভরত ছাড়া সত্যিই আর কারও গলা জড়িয়ে ধরে নি সিন্দুর। বুক থেকে পাথরের বোঝা যেন নেমে গেল ভরতের। তার বদলে ফুলের মত, মাখনের মত নরম সিন্দুর-বরণ মুখ ভরতের বুকে লেগে রইল। সে মুখে কেবল একটি কথা 'আমাকে নিয়ে যেতে হবে শহরে।'

শহর তো ভাল, সিন্দুরকে নিয়ে এখন কোথায় না যেতে পারে ভরত, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে যে জায়গা আছে সেখানেও।

গোপনে গোপনে উদ্যোগ আয়োজন চলতে লাগল যাত্রার। বাঁধা হতে লাগল পোঁটলা-পুঁটলি। দেখতে দেখতে পাড়াময় খবরটা ছড়িয়ে পড়ল স্বামীর সঙ্গে সিন্দুরও যাচ্ছে সাড়েসাতকাঠির বন্দরে। সেখানে তারা বাসা বেঁধে থাকবে, আর ফিরে আসবে না গাঁয়ে। কথাটা কানে গেল ঢুলীদের, ভুঁইমালীদের, কানে গেল কেশবের, রাসেশ্বরীর, লক্ষ্মীর, সবচেয়ে পরে কানে গেল সিন্দুরের বাবা গগন ঢুলীর। ঢোল ছাওয়ার জন্যে পাঁঠার চামড়া সংগ্রহ করতে গিয়েছিল সে ভিন্ন গাঁয়ে। ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে নানা জনের কাছ থেকে নানারকম স্বরে খবরটা তার কানে এসে পৌঁছল, 'আরে, তোমার জামাই-মেয়ে নাকি শহরে যাচ্ছে?'

গগন অবাক্ হয়ে বলল, 'জামাই তো শহরেই থাকে। কিন্তু মেয়ে যাবে কেন! মেয়েমানুষের সঙ্গে শহরের কি সম্পর্ক? ঘরের মেয়েছেলে শহরে গিয়ে থাকে একথা শুনেছ নাকি কোনদিন?'

ভুঁইমালীদের মোড়ল জলধর বাঁকা হাসি হেসে বলল, 'একেবারে না শুনবই বা কেন! বয়সকালের কথা কি বেমালুম ভুলে গেলে নাকি গগন ঢুলী? গঞ্জ-বন্দরের সঙ্গে যে ধরনের মেয়েমানুষের সম্পর্ক থাকে তাদের কি চেন না, তাদের সঙ্গে কি বয়সের সময় দু'চার বারও জানাশোনা হয়নি?'

'কি, কি বললে?' মাথা নাড়া দিয়ে উঠলো গগন ঢুলী, 'বুড়ো হয়ে মরতে চলেছ মোড়ল, তবু বদমাসী গেল না তোমার; তবু স্বভাব বদলাল না? আমার মেয়ে তার নিজের সোয়ামীর হাত ধরে শহর-বাজারে কেন জাহান্নমে যাক না,

সেই তার স্বর্গ। তাতে তোমাদের কি, তোমরা কেন নাক ঢুকাতে আসবে তার মধ্যে?'

জলধরের সঙ্গে ঝগড়া করে গগন নিজের বাড়িতে এসে ঢুকল, তারপর মেয়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি শুরু করে দিল, 'বলি ভরত, ও ভরত?'

ভরত ঘরের মধ্যেই ছিল, সাড়া দিল, না, স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বলল, 'যাও বুড়োর সঙ্গে তুমি কথা বল গিয়ে—আমি পারব না।'

সিন্দুর ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'কেন আমি বলতে যাব কেন, তুমি যেতে পার না? জোয়ান পুরুষ হয়ে এত ভয় বুড়ো শ্বশুরকে!'

ভরত মৃদুস্বরে বলল, 'আসলে ভয় তো আর বুড়ো শ্বশুরকে নয়। বুড়ো শ্বশুরের জোয়ান বয়সী মেয়েকেই যত ভয়-ডর, রগচটা মানুষ রাগের মাথায় কি বলতে কি বলে ফেলব, শ্বশুরের মেয়ের মুখ ভারি হয়ে যাবে, তার চেয়ে বাপে-মেয়েতে বোঝাপড়া হোক সেই ভাল।'

বিয়ের প্রথম বছরের মত খুব রসের কথা খুশির কথা বেরুচ্ছে ভরতের মুখ দিয়ে। ভারি খোশ মেজাজে আছে তার মন। সিন্দুর একবার আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে কি দেখল। তার তাকানোর ভঙ্গিতেই ভরত বুঝতে পারল যে সিন্দুরের মনও আজ খুশিতে টগবগ করছে। শহর দেখবার আব্দার পূর্ণ হয়েছে তার, এতকাল ধরে অনুরোধ উপরোধেও যে কথায় রাজী করাতে পারে নি সে ভরতকে, আজ ভরত নিজেই উপযাচক হয়ে সেই শহরে বাস করবার কথা তুলেছে, কেবল শহর এক পলকে দেখে ফিরে আসা নয়, শহরে মাসের পর মাস বাসা বেঁধে বাস করা। এই ঢুলী ভুঁইমালী পাড়ায় তো দূরের কথা, ভদ্রলোক বামুন-কায়েতের পাড়ায়ও এমন সৌভাগ্য খুব কম বউ-ঝির ভাগ্যেই ঘটেছে।

গগন আর একবার তাড়া দিল, 'কি হল তোদের ও সিন্দুর? তোদের গুজগুজ ফিসফিস তো বেশ আমার কানে আসছে আর আমার চেঁচানি বুঝি কানেই ঢুকছে না!'

সিন্দুর এবার ঘরের ঝাঁপ খুলে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'তা কি বলছ বাবা?'

গগন বলল, 'তোকে আমার কিছু বলবার নেই, যতদিন কেবল তুই নিজের মেয়ে ছিলি, বলেছি, এখন তুই পরের ঘরের বউ, ভিতরে বাইরে একেবারে পর হয়ে গেছিস, তোকে আমি কিছুই বলব না, ডাক্ সেই হতচ্ছাড়া হারামজাদাকে, আমি তার সঙ্গেই কথা বলব।'

সিন্দুর বলল, 'তাকে আবার কেন বাবা? সে আসতে পারবে না, শুয়ে পড়েছে, শরীর ভারি খারাপ, যা জিজ্ঞেস করবার আমাকেই কর।'

গগন বলল, 'খারাপ! এই একটু আগেও তো দু'জনে বেশ দিব্যি কথা বলছিলে। বেশ, খারাপ থাকে খারাপই ভাল। কিন্তু তোরা নাকি শহরে যাচ্ছিস? কেন এমন মরবার বুদ্ধি হয়েছে তোদের! সেখানে খাবি কি, থাকবি কোথায়?'

সিন্দুর শহর সম্বন্ধে খুব একটি ওয়াকিবহাল ভঙ্গিতে বলল, 'এখানে যা খাই এখানে যেমন ঘরে থাকি শহরেও এর চেয়ে ভাল ছাড়া খারাপ থাকব না। তার জন্যে তুমি ভেব না বাবা।'

গগন বলল, 'না আমি আর ভাবব কেন, আমার তো আর তোর জন্যে কোন ভাবনা-চিন্তাও নেই, মায়া-মমতাও নেই, সব নদীর জলে ধুয়ে ফেলেছি, ভাবনা-চিন্তার কথা আমি বলছি না, আমি বলছি কাজকর্মের কথা, তোরা তো শহরে যাবি কিন্তু আমি যে গোঁসাই-হাটির বায়না নিয়েছি তার কি হবে, এবারও কি কেশব গিয়ে সানাই বাজিয়ে আসবে নাকি?'

হঠাৎ বুকের ভিতর যেন ধক করে উঠল সিন্দুরের। কেশব! কেশবের কথা এ দু'দিন তার মনেই ছিল না, কেবল শহর দেখার, শহরে থাকার জল্পনা-কল্পনা নিয়েই মত্ত ছিল সিন্দুর। এবার মনে পড়ল, মনে পড়ল সে শহরে কেশব যাবে না, কেশব এই গাঁয়েই থাকবে। আধাবয়সী বোষ্টমী রাসেশ্বরী দখল করে থাকবে কেশবকে। শহরে গিয়ে কলের ছবির নড়াচড়া আর কথা বলা সিন্দুর শুনতে পাবে, কিন্তু কেশবের নিজের গলা আর শুনতে পাবে না। নাইবা পেল, কি এমন ক্ষতি হবে তাতে, একটি গাঁজাখোর ভিন জাতের ভুঁইমালীর ছেলের সঙ্গে দেখাশোনা হবে না বলে সিন্দুর কি স্বামীর সঙ্গে শহরে যাওয়া বন্ধ করবে নাকি?

গগন বলল, 'কি আমার কথার জবাব দিচ্ছিস না যে? ভরত যদি দু'-এক দিনের মধ্যে চলে যায়, আমার দলে সানাইদারী করবে কে শুনি? এত সব কাণ্ড কেলেঙ্কারীর পরও কি ফের আমি গিয়ে হাতে-পায়ে ধরব নাকি সেই কেশব ভুঁইমালীর!'

সিন্দুর হঠাৎ বলে ফেলল, 'হাতে-পায়ে ধরতে হবে না বাবা, সে নিজেই যেচে আসবে তোমার দলে সানাই বাজাতে।'

মমতায় ভারি মধুর শোনালো সিন্দুরের গলা। সেই সঙ্গে অদ্ভুত এক দাবির জোরও ফুটে উঠল।

গগন বলল, 'হ্যাঁ, যেচে আসবে! ওকে বলে গেছে। কেন, কেন সে আসবে শুনি?'

ঘরের ভিতরে কথাটা খট করে ভরতেরও কানে লেগেছে। মনের মধ্যে তারও প্রশ্ন উঠল, সত্যিই তো, কেন আসবে কেশব ঢুলীর দলে ফের সানাই বাজাতে? আর সেই সানাই নিয়ে যখন এত কাণ্ড হয়ে গেল। কানখাড়া করে রাখল ভরত, বাপের কথার কি জবাব দেয় সিন্দুর, তাই শোনবার জন্যে।

কথাটা বলে ফেলে সিন্দুর নিজেও যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি নিজের মনের ভাবটা ঢাকবার চেষ্টা করতে করতে ঠোঁটে হাসি টেনে বলল, 'কেন আবার আসবে! আসবে, সেবারও যে লোভে এসেছিল সেই লোভে। দু'ছিলিমের জায়গায় তিন ছিলিম গাঁজা কবলে দেখ ঠিক এসে সানাই ধরবে। তাছাড়া জাত তো গেছেই এবার আর ভয় কিসের!'

দুপুরের একটু আগে আগে ইয়াসিনের এক-মাল্লাই নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ল। ঘাট ঢুলীপাড়ার। কিন্তু যে কয়েক ঘর ভুঁইমালী একেবারে কাছাকাছি থাকে এ ঘাট তারাও ব্যবহার করে। মুখ ধোয়, চান করে, মেয়েরা বাসন-বাটি গা-কাপড় ধুয়ে জলের কলস কাঁখে তুলে নেয়। নৌকা যে কি জন্যে এসেছে কারও জানতে বুঝতে বাকি নেই, তবু ছেলেবুড়ো যেই ঘাটে আসে সেই একবার করে জিজ্ঞাসা করতে ছাড়ে না, 'ও মাঝি, নৌকা যাবে কোথায়? ভাড়া করল কে?'

প্রথম দু'-তিন বার ভদ্রভাবে সদুত্তরই দেয় ইয়াসিন: 'নাও যাবে সাড়েসাত-কাঠির কাঠথলিতে, কেরায়া করেছে গগন ঢুলীর জামাই ভরত ঢুলী। আজকাল বুঝি ভরত করাতী।'

কিন্তু দু'তিন বারের পর আর মেজাজ ঠিক থাকে না ইয়াসিনের, জিজ্ঞাসার জবাবে মুখ খিঁচিয়ে ওঠে, 'বাবারে বাবা, বলে বলে মুখ আমার ব্যথা হয়ে গেল। সব জিনিসের ট্যাক্স আছে আর আমার মুখের বুঝি ট্যাক্স নেই! কোথায় যাবে কি বিত্তান্ত আমি কিছু জানি নে, কিছু বলতে পারব না। অত যদি জানবার সাধ থাকে ভরত ঢুলীর বাড়ি যাও, তাকে জিজ্ঞেস কর, তার পরিবারকে জিজ্ঞেস কর।'

কথায় কথায় মুখ আর মেজাজ খারাপ হয়ে যায় বুড়ো ইয়াসিন সেখের। 'বলে শালা ঢুলীর আক্কেল দেখ! নৌকা কেরায়া করে বোধ হয় বসে আছে ঘরের মধ্যে। ফষ্টিনষ্টি করছে বোধ হয় পরিবারের সঙ্গে। আরে ফষ্টিনষ্টি তো আমার

নায় এসেও করতে পারবি। ঘরের মত ছই রয়েছে, যার যা খুশি কর্; কেউ দেখবেও না, বলতেও যাবে না। বল দেখি মশাইরা, এর পর নৌকা ছেড়ে রাত দুপুরের আগে কেউ পৌঁছতে পারে সাড়েসাতকাঠিতে? নায়ের নীচে আমার তো চাকা লাগানো নেই!'

তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে পড়বার জন্যে ভরতও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। থেকে থেকে তাড়া লাগাচ্ছিল শুকচাঁদ। খাওয়া-দাওয়া সারা হয়ে গেছে। পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধাছাঁদার তোড়জোড় চলছে। মাঝে মাঝে স্বামীর কাছে ধমক খাচ্ছে সিন্দুর। অমনিতে চালাক-চতুর হলে হবে কি, শহরে যাবার নাম শুনে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। গাঁটরির ভিতরে এটা দিচ্ছে তো ওটা দিতে ভুলে যাচ্ছে। একটা কাজ করতে একবার এগুচ্ছে তো আর একবার পেছুচ্ছে! ভরত অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'না, তোর জ্বালায় আর পারি না। নৌকায় উঠতে উঠতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। নড়তে-চড়তে ছ'মাস।'

কিন্তু ভরত না বুঝুক শুকচাঁদ বুঝেছে। কেন এত দ্বিমনা হয়েছে সিন্দুর, নড়তে-চড়তে বাঁধাছাঁদার কেন এত দেরি হচ্ছে তার। মাঝে মাঝে মুচকি হেসে তাকাচ্ছে সে সিন্দুরের দিকে। অবশ্য চোখে চোখ পড়বামাত্র সিন্দুর চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নিলেই কি শুকচাঁদের চোখ থেকে সহজে কেউ কিছু লুকোতে পারে! তার বুঝতে বাকি নেই। সিন্দুরের এক পা উঠেছে আর এক পা রয়েছে গর্তের মধ্যে। সে গর্ত খুঁড়ে রেখেছে গেঁজেল হতভাগা কেশব ভুঁইমালী। সিন্দুরের এক মন যাই যাই করছে আর এক মন লুটিয়ে পড়ে থাকতে চাইছে এ গাঁয়ের কাদা-মাটিতে। মেয়েদের হৃদয়-মনের কথা অনেক জানে শুকচাঁদ। বন্ধু ভরত তার কাছে এ ব্যাপারে একেবারে শিশু। তাকে বেশি জানিয়ে লাভ নেই, বেশি জানালে সে হজম করতে পারবে না। কেবল সুযোগ-সুবিধামত আড়ালে আবডালে সিন্দুরকে জানিয়ে রাখতে হবে যে শুকচাঁদ জানে এসব গোপন রহস্য।

স্ত্রীকে বকছে বলে তার পক্ষ নিয়ে বন্ধুকেই বরং একচোট গাল দিল শুকচাঁদ, 'থাম্, থাম্, খুব সোয়ামীপনা দেখানো হচ্ছে, না? সিন্দুর কি এর আগে কোথাও গেছে, এসব কোনদিন করেছে যে আজ চটপট সব করে দেবে? নিজের কথা মনে নেই? দু'বছর আগে নিজে কেমন ছিলি একবার ভেবে দেখ্ দেখি। ডাইনে বললে দিশেহারা হয়ে বাঁয়ে যেতি, বাঁয়ে বললে ডাইনে।'

ঘরের ভিতর যখন গোছগাছ চলছে সিন্দুরদের, সামনাসামনি পুবের পোতায় নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে গগন ঢুলী নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল মেয়ে-

জামাই-এর শহরে যাওয়ার আড়ম্বর আয়োজন। লক্ষ্মী এরই মধ্যে বার কয়েক তাকে তাগিদ দিয়ে গেছে নাইতে যেতে। গগন বিরক্তস্বরে জবাব দিয়েছে, 'ঢং করিস নে মাগী, থাম্। আমি কোনদিন এত সকাল সকাল নাইতে যাই যে আজ যাব। ছেলেপুলে তো খেয়েছে তোর যদি পেটে আগুন জ্বলতে থাকে তুই বরং খেতে বস্ গিয়ে, আমার মোটেই খিদে নেই।'

স্বামীর মেজাজ দেখে লক্ষ্মী আর কথা বাড়াতে সাহস পায় নি। ফের গিয়ে ঢুকেছে ঘরে।

কিন্তু দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে হবে কি, ফের স্ত্রীকে ডাকাডাকি শুরু করেছে গগন। আজ যেন একটি মুহূর্তও একলা থাকবার তার সাধ্য নেই। লক্ষ্মী চলে যাওয়ার একটু বাদেই ডাকাডাকি শুরু করল গগন।

'সত্যি সত্যি গিলতে বসলি নাকি ও বউ! বসবি তো বসবি। তার আগে আমার এই কলকেটায় একটু আগুন দিয়ে যা।'

লক্ষ্মী সাড়া দিল না, কিন্তু উনুন থেকে ছাই তুলে হাতায় করে কয়েক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে এসে স্বামীর সামনে দাঁড়াল। তারপর কলকেটির দিকে একটু তাকিয়ে বলল, 'আবার তামাক? এই একটু আগেই না তামাক খেলে তুমি? হয়েছে কি বল দেখি! ডিবার সব তামাক এ-বেলার মধ্যে শেষ করে ফেলবার মতলবে আছ বুঝি?' বলতে বলতে খানিকটা আগুন কলকেতে ঢেলে দিল লক্ষ্মী।

ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে অদ্ভুত কৌশলে জ্বলন্ত অঙ্গারের দুটো টুকরো আরও ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙে নিল গগন। তারপর বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দেওয়া হুঁকোটা টেনে নিয়ে তার মাথায় কলকে বসাতে বসাতে বলল, 'হুঁ'। কলকে বসিয়েই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টানতে শুরু করল না গগন, অন্যমনস্কভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে একটুখানি তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলল, 'দেখলি মেয়ে-জামাইর কাণ্ডটা? আক্কেল দেখলি ওদের?'

লক্ষ্মী শান্তস্বরে বলল, 'দেখলাম তো, কিন্তু দেখে কি করব বল।'

গগন গর্জে উঠল, 'কি করবি মানে! ওরা কি হাতীর পাঁচ পা দেখেছে, না লাটসাহেব হয়েছে শুনি যে এত হেলা-হেনস্তা আমাকে? আমি কি মরে গেছি, না অথর্ব শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছি যে একটুও কেয়ার করবে না আমাকে? এতকাল কার ভিটায় বাস করেছে শুনি! কার আম জাম, নারকেল-সুপুরী, বাঁশে-বেতে ভাগ বসিয়েছে? এর আগে সতীনের মেয়ের সঙ্গে খুব তো সখী সখী ভাব দেখেছি তোর। যা, একবার জিজ্ঞেস করে আয় দেখি।'

সিন্দুরের আচরণটা লক্ষ্মীরও ভাল লাগে নি। সিন্দুরের সঙ্গে সে তো কোন খারাপ ব্যবহার করে নি, বরং তার কথামতই চলেছে ফিরেছে, সম্পর্কে মা হয়েও সমবয়সী সখীর মত হাসি-ঠাট্টায় যোগ দিয়েছে। কিন্তু শহরে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ায় এত দেমাক বেড়েছে সিন্দুরের যে ভাল করে তাকে একবার জিজ্ঞাসা করবারও দরকার মনে করে নি। লক্ষ্মীর সঙ্গে যেন একটা কথা বলবারও সময় নেই সিন্দুরের। একবার অবশ্য ডেকেছিল পোঁটলাপুঁটলি বাঁধার কাজেই সাহায্য করতে, কিন্তু সেই ভাবটা যে নিতান্তই লোক দেখানো তা লক্ষ্মীর বুঝতে বাকি থাকে নি। খানিক আগে সিন্দুরের ঘরের কাছাকাছি গিয়ে ঘরের মধ্যে শুকচাঁদের গলা আর হাসির শব্দ শুনে লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। সিন্দুর যদি সত্যি সত্যিই কাজকর্মে লক্ষ্মীর সাহায্য চাইত তাহলে শুকচাঁদকে আর ঘরের মধ্যে বসিয়ে রাখত না, সিন্দুর তো জানে লোকটিকে লক্ষ্মী পছন্দ করে না। শুকচাঁদের তাকাবার ভঙ্গি, হাসির ভঙ্গি, কথা বলবার ধরন সবই খারাপ লাগে লক্ষ্মীর কাছে। আর খারাপ লাগে বলেই পারতপক্ষে শুকচাঁদের সামনে সে বেরোয় না, কি করে সিন্দুরেরা তার সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখেছে তা তারাই জানে। অমন লোককে ঘরের মধ্যে ডেকে বসানো তো দূরের কথা, লক্ষ্মী তাকে বাইরের দাওয়ায় পর্যন্ত বসতে দিতেও রাজী নয়।

গগন আরও একবার তাড়া দিল, 'সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন অমন করে? যা, গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয়।'

লক্ষ্মী বলল, 'দরকার থাকে তুমি জিজ্ঞেস কর গিয়ে। আমি পারব না।'

গগন স্ত্রীর অবাধ্যতায় চটে উঠে বলল, 'তা পারবি কেন! আসলে তোর যে খুব আনন্দ হয়েছে, তা কি আর বুঝতে পারছি নে আমি? সতীনের মেয়ে নেমে যাচ্ছে বাড়ির ওপর থেকে, তোর আহ্লাদের আর সীমা আছে কই!'

মিথ্যা দোষারোপে লক্ষ্মীর চোখ ছলছল করে উঠল, বলল, 'এতকাল বাদে তুমি এই কথা বললে আমাকে? সতীনের মেয়ে বলে কোনদিন সিন্দুরকে আমি কুনজরে দেখছি, না কুব্যবহার করেছি তার সাথে সত্যি করে বল দেখি? ঘরের তলায় বসে বল তো আমার গা ছুঁয়ে।'

কিন্তু ঘরের তলায় একমুহূর্তও আর বসে রইল না গগন। ধীর সুস্থভাবে তামাক খাওয়ারও তার সময় হল না। কেননা ঘরে তালাচাবি দিয়ে মোটঘাট পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে সিন্দুররা ততক্ষণে উঠানে নেমেছে। তাই দেখে গগনও দাওয়া থেকে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠানে গিয়ে পড়ল।

শুকচাঁদ হেসে উঠে বলল, 'বুড়ো বয়সে ওকি লাফালাফি শুরু করে দিলে ঢুলীর পো! হাত-পা ভেঙে যাবে যে।'

গগন রুখে দাঁড়িয়ে বলল, 'কার সাধ্য আমার হাত-পা ভাঙে একবার দেখি!'

শুকচাঁদ বলল, 'আরে আর কেউ কি আর ভাঙতে যাচ্ছে! নিজের দোষেই নিজের হাড়গোড় চুরমার করে ফেলবে তুমি।'

গগন বলল, 'নিজের দোষে! খুব একজন বুদ্ধিমানের মত বললে বটে, বাহারের বিচার করলে একখানা। জাতে ভুঁইমালী তো, ঘটে এর চেয়ে বেশি বুদ্ধি আর ধরবে কি করে! কোলে-পিঠে করে বড় করলেম মা-মরা মেয়েকে, বিয়ে-থা দিলাম। সে আজ ধেই ধেই করে সোয়ামীর সঙ্গে শহরে চলেছে। যাওয়ার আগে জিজ্ঞাসাটা পর্যন্ত করল না একবার। জামাইকে নিজের বাড়ির ওপর এনে গাঁটের কড়ি খরচ করে ঘর তুলে দিলাম, হাতে ধরে শেখালাম ঢোল-সানাই, সে একবার চেয়েও দেখল না। দোষ তো আমারই। ভুঁইমালীর ছেলে ছাড়া এমন কথা আর বলবে কে!'

একমুহূর্ত কারও মুখে কোন কথা বেরুল না। একটু বাদে ভরত শুকচাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল্ হে চাঁদ, দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করে দরকার নেই। ওসব খোঁটা অনেক শুনেছি, জবাব দিতে গেলেই তো ঝগড়া হবে। এক জায়গায় যাওয়ার মুখে কারও সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে না যাওয়াই ভাল, চল্।'

শেষের নির্দেশটা আদেশের ভঙ্গিতে স্ত্রীকেই দিল ভরত।

রঙীন ডুরেকাটা শাড়িখানা পরেছে সিন্দুর। একটু পুরোনো হলেও মানিয়েছে বেশ, হাতে ধবধব করছে রূপার চুড়ি আর সরু শাঁখা। সবুজ রঙের এক গোছা করে কাঁচের চুড়িও সেই সঙ্গে পরে নিয়েছে। স্বামী আর বাপ দুজনেই সামনে রয়েছে বলে একটু বাড়িয়ে দিতে হয়েছে ঘোমটাটা।

স্বামীর নির্দেশে একটু এগিয়ে গিয়ে নীচু হয়ে বাপের পায়ের ধুলো নিতে গেল সিন্দুর।

'খবরদার, খবরদার!' তাড়াতাড়ি দু'পা পিছিয়ে গেল গগন, 'আমার পা ছুঁসনে হারামজাদী, অমন লোকদেখানো ভক্তির দরকার নেই আমার।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটাটা খানিকটা খাটো হয়ে গেল সিন্দুরের, গলাটা চড়ে উঠল, 'কেন কি দোষ করেছি যে যাওয়ার সময় একবার পায়ের ধুলো নিতে দেবে না বাবা!'

গগন গর্জে উঠল, 'ইস, সোহাগ দেখ! বাবা বাবা, কে রে তোর বাবা,

হারামজাদীর বেটী হারামজাদী! আমার মেয়ে নাকি তুই? আমার মেয়ে হলে অন্যরকম হতিস, বুঝলি? এমন নচ্ছার বদমাস বেইমান হতিস নে।'

বলতে বলতে কি মনে করে হঠাৎ থেমে গেল গগন। তারপর জিভ কেটে দু'হাত বাড়িয়ে সিন্দুরকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে গেল। কিন্তু সিন্দুর তখন হাত কয়েক পিছনে সরে দাঁড়িয়েছে।

চেঁচামেচি শুনে আশেপাশের প্রতিবেশীরা দু'চারজন এসে পড়েছে ততক্ষণে। এসেছে যাদব, হরলাল, রামলাল, ভুঁইমালীদের অশ্বিনী এসেছে ছোট মেয়েকে কোলে করে। গগনের কথা শুনে সবার মুখেই হাসির ঝিলিক দেখা গেল।

এদের মধ্যে অশ্বিনীরই কেবল চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, সে মুচকি হেসে বলল, 'আহা-হা, হল কি তোমার খুড়ো, মাথা কি খারাপ হল তোমার? ঘরের হাঁড়ি হাটের মধ্যে কেউ ভাঙে তোমার মত, এঁ্যা!'

'এই অশ্বিনীদা, চুপ! আর একটা কথা বললে জিভ টেনে উপড়ে ফেলব তোমার। বুড়ো মানুষ, রেগেমেগে নিজের মেয়েকে শাসন করেছে, তার আবার হাঁড়ি ভাঙাভাঙি কি!' কর্কশ, বাজখাঁই আওয়াজে কে চেঁচিয়ে উঠল! অবাক হয়ে সবাই পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল গেঁজেল কেশব ভুঁইমালী। ওই তো রোগাপটকা ছিপছিপে চেহারা। তার মধ্যে এত বড় বাজের আওয়াজ লুকিয়ে ছিল কে জানতো! এর আগে কেশবকে এত জোরে কেউ কথা বলতে শোনেও নি।

ঘোমটার ভিতর থেকে সিন্দুর একবার তাকাল কেশবের দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। পাছে আর কেউ দেখে ফেলে। জোয়ান জবরদস্ত চেহারা অশ্বিনীর। গায়ে শক্তিও খুব। তার কাছে কেশব পোকা-মাকড়ের মত। কেশবের বিক্রম দেখে রাগের চেয়ে কৌতুকবোধই বেশি হল অশ্বিনীর, বলল, 'তাই নাকি কেশব? উপড়াবি নাকি আমার জিভ! দেখ্ দেখি চেষ্টা করে কত-দুর পারিস।' বলে সত্যিই অশ্বিনী খানিকটা জিভ বের করে ফেলল। তার ভঙ্গি দেখে কেউ না হেসে পারল না। হাসল না কেবল সিন্দুর, ভরত আর গগন নিজে।

কেশব বলল, 'বেশ, বেশ অশ্বিনীদা। যেটুকু বের করেছ দাঁত দিয়ে এবার কেটে ফেল। তোমার শক্তি আমার চাইতে অনেক বেশি। আমার হাতের চেয়ে ঢের বেশি তোমার দাঁতের জোর।'

এবারও হেসে উঠল যাদবেরা।

ভরত গম্ভীরস্বরে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল ঢের হয়েছে, কাজ নেই আর দাঁড়িয়ে থেকে।'

কিন্তু গগন ফের জামাই-এর সামনে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল। কিছুমাত্র লজ্জা-সংকোচ নেই গগনের। যেন খানিক আগে কিছুই ঘটেনি, কোনরকম বেফাঁস কথা বেরোয় নি তার মুখ থেকে। ভরতের পথ আটকে গগন বেপরোয়াভাবে বলল, 'ইস্, চল্ বললেই হল আর কি, আমার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে তবে পা বাড়াবি নইলে ও পা আমি আস্ত রাখব না।'

শুকচাঁদ সিন্দুরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আহা-হা, রাগে আর গরমে তোমার বাবার তো একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে দোস্তানী, তোমার ছোট মাকে ডেকে দাও, দু'চার কলসী জল এনে ঢেলে দিক মাথায়।' তারপর গগনের দিকে চেয়ে বলল, 'মোটেই ভেব না খুড়ো, তোমার পাওনা-গণ্ডা ভরত শহরে গিয়ে এক মাসের মধ্যে মনি-অর্ডার করে পাঠাবে। পাইপয়সাটিও বাকি রাখবে না, আমরা জামিন রইলাম।'

গগন বলল, 'ইস, ধরন দেখ কথার, কত বড় জামিনদার জুটেছে! চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।'

সিন্দুর শান্তস্বরে বলল, 'কিন্তু আমি যদি জামিন থাকি বাবা—'

গগন বলল, 'থাক, কিছু চাই নি তোদের কাছে।'

ঘাটের দিকে ক্রুদ্ধ গগনও তার পিছনে পিছনে ছুটে যাচ্ছিল, কিন্তু যাদব আর রামলাল তাকে জোর করে ধরে রাখল, বলল, 'আঃ মোড়ল, সত্যিই কি মাথা খারাপ হল নাকি তোমার, যাও ঘরে যাও, দুপুর গড়িয়ে গেছে! খাওয়াদাওয়া কর গিয়ে, যাও। ভেব না, সানাইয়ের জন্যে আমাদের বায়না আটকে যাবে না। সানাই আমরা যেভাবেই হোক একটা জুটিয়ে নিতে পারব।'

ভরত স্ত্রীকে বলল, 'চল্।'

সিন্দুর বলল, 'তুমি এগোও, আমি লক্ষ্মীকে একটা কথা বলে আসি।'

ভরত বিরক্তস্বরে বলল, 'এর পরও ওদের সঙ্গে কথা বলা বাকি থাকে তোমার, কথা বলার ইচ্ছা আর হয়?'

স্বামীর এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়েই বাপের ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল সিন্দুর।

উঠানের ভিড় তখন প্রায় ভেঙে গেছে। শুকচাঁদের পিছনে পিছনে প্রায় সকলেই এগিয়ে গেছে নদীর দিকে, কেবল যায় নি ভরত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর

জন্যে সে অপেক্ষা করতে লাগল। রাগে আর বিরক্তিতে থমথম করতে লাগল তার মুখ।

সিন্দুর কিন্তু খুব দেরি করল না, একটু বাদেই বেরিয়ে এল গগনের ঘর থেকে। পিছনে পিছনে লম্বা ঘোমটায় মুখ ঢেকে চলল লক্ষ্মী, পাড়াপড়শী আরও কয়েকটি ঝি-বউ সঙ্গে সঙ্গে চলল। তারা সিন্দুরকে নদীর ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবে।

মোটঘাট নিয়ে শুকচাঁদ আগেই উঠে বসেছে নৌকোয়। ভরতও গিয়ে ঢুকল। পা ধুয়ে নৌকোয় উঠবার আগে গলুইতে একবার নীচু হয়ে মাথা ছোঁয়াল সিন্দুর। জল হল দেবতা, নৌকা হল দেবতা, প্রণাম করে না নিলে অপরাধ হবে যে। তারপর খাটো ঘোমটার ফাঁকে ছলছল চোখে তাকাল একবার ঘাটের দিকে।

চেনা-জানা ছোট বড় প্রায় সবাই এসে দাঁড়িয়েছে ঘাটে। এসেছে, অশ্বিনী, কার্তিক, যাদব, রামলালেরা, শুকচাঁদের মা, বউ, এমন কি রাসী বোষ্টমীকেও দেখা যাচ্ছে মেয়েদের মধ্যে, নেই কেবল কেশব। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখল সিন্দুর। আর নেই তার বাবা। খানিক আগে রাগের মাথায় যা-তা বলে ফেলে এখন বোধ হয় সত্যিই সে অনুতপ্ত হয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে মুখ দেখাতে পারছে না লজ্জায়।

কিন্তু নৌকো ভাসতে না ভাসতেই দেখা গেল নদীর পার দিয়ে নৌকোর সঙ্গে ছুটতে ছুটতে আসছে গগন, 'ও মাঝি, ও মাঝি, নৌকো থামাও তোমার, একটু থামাও।'

ইয়াসিন চটে উঠে চিৎকার করে বলল, 'কেন, হয়েছে কি? নাও ভাসিয়েছি কি থামাবার জন্যে!'

ছইয়ের বাইরেই বসে ছিল শুকচাঁদ। ইয়াসিনকে নৌকো থামাতে বলে পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ব্যাপার কি ঢুলী খুড়ো? কিছু বলবে নাকি তুমি।'

গগন ততক্ষণে নৌকোর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, বলল, 'হ্যাঁ বাবা, একটা কথা বলবার জন্যেই এতদুর দৌড়ে এসেছি আমি। না সানাইর কথা নয়। তার ব্যবস্থা যাদব করতে পারে করবে, না পারে না করবে। সানাইর কথা নয়, সিন্দুরের কথা। সিন্দুরকে কিন্তু তোমার ভরসায়ই শহরে যেতে দিচ্ছি, আমার জামাইর ভরসায় নয়। জামাই কেবল গোঁয়ার্তুমি করতেই জানে, বুদ্ধি-বিবেচনার ধার ধারে না। ভুঁইমালীর ছেলে হলে হবে কি, তুমি অনেক বেশি বুদ্ধি রাখ। দেখ, যেন কোন বিপদ-আপদ না হয় আমার সিন্দুরের।'

শুকচাঁদ একটু হেসে বলল, 'না না, বিপদ-আপদের কি আছে?'

গগন বলল, 'আছে বাবা আছে, শহর বড় সাংঘাতিক জায়গা। ভারি ডরাই আমি শহরকে।'

শুকচাঁদ বলল, 'না না, ডরাবার কিছু নেই। কলকাতার মত শহর তো নয়, যে গাড়ি-ঘোড়ার খুব উৎপাত থাকবে। ছোটখাট বন্দর, ভয় কি!'

গগন বলল, 'তা হোক বাপু। বড় সাপও সাপ, ছোট সাপও সাপ, বিষ একটু একটু সবারই মধ্যে আছে, তোমরা খুব সাবধানে থেকো। আর বাসা-বন্দর যদি না পাও এই নৌকোতেই ফিরিয়ে নিয়ে এস আমার সিন্দুরকে।'

শুকচাঁদ বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা, তা তো আসবই। সেজন্যে ভাবনা নেই তোমার।'

ছইয়ের ভিতর থেকে সিন্দুর মুখ বাড়িয়ে তাকাল বাপের দিকে, কে বিশ্বাস করবে এই গগনই খানিক আগে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, বেজন্মা বলে গাল দিয়েছে নিজের মেয়েকে।

গগন বলল, 'খুব সাবধানে থাকিস সিন্দুর, বুঝলি।'

সিন্দুরের চোখ ঝাপসা হয়ে এল, ভিজে গলায় বলল, 'থাকব বাবা, তুমি বাড়ি যাও এবার।'

বদমেজাজী ইয়াসিন বলল, 'হ্যাঁ এবার বাড়ি যাও ঢুলীর পো। নইলে রাতের মধ্যেও সাড়েশাতকাঠিতে গিয়ে নৌকো ভিড়াতে পার না আজ।'

লগির খোঁচায় নৌকো ফের ভাসিয়ে দিল ইয়াসিন। খানিক বাদে বাঁকের আড়ালে গগনকে আর দেখা গেল না। সিন্দুর তবু ঘোমটা তুলে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে, নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে গগন ছাড়া আর কেউ কি ছুটে আসবে না? সিন্দুরকে কিছু বলবার কথা কি মনে পড়বে না আর কারও?

বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের ভিতরটা খাঁ খাঁ করে উঠল গগনের। সমস্ত বাড়িটা যেন শূন্য হয়ে গেছে। অথচ সিন্দুর ছাড়া সবাই তো আছে বাড়িতে, আছে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লক্ষ্মী, ছোট দুই মেয়ে ময়না, মলুঙ্গী। কিন্তু সিন্দুর বিহনে সব অন্ধকার।

বাপের সঙ্গে এতদিন যে সরিকীয়ানা করে এসেছে সিন্দুর, তা আর গগনের মনে পড়ল না। জামাই যে তাকে সত্যি সত্যিই গগনের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে

গেল এই দুঃখই তার মনে প্রবল হয়ে উঠল। মনে পড়ল মা-মরা মেয়েকে পাছে চোখের আড়াল করতে হয় সেই আশঙ্কায় অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইকে ঘরজামাই করে রেখেছিল গগন। তারপর বড় হয়ে মেয়ে-জামাই-এর ব্যবহারে গগনের প্রায়ই মনে হ'ত যে ওরা চোখের আড়ালে গেলেই সে বাঁচে। মেয়ে তো নয় পুরোপুরি সরিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল সিন্দুর। গাছের ফল নিয়ে, শুকনো ডালপাতা নিয়ে কত যে সে কোন্দল করেছে গগনের সঙ্গে আর লক্ষ্মীর সঙ্গে, তার ঠিক নেই। মেয়ের ওপর আক্রোশ-বিদ্বেষের অন্ত ছিল না গগনের। কিন্তু আজ সিন্দুরের ঘরের সামনে তালা ঝুলতে দেখে সেই সব হিংসা-বিদ্বেষের পরিবর্তে মন অদ্ভুত এক মমতায় ভরে উঠল। বাসাবাড়ি না ঠিক করে গোঁয়ারগোবিন্দ জামাই কোথায় মেয়েটাকে টেনে নিয়ে ওঠাবে কে জানে? না জানি কত কষ্টই হবে সিন্দুরের! এ ব্যাপারে অভিমান করে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে গগন ভারি বেকুবী করে বসেছে। এর চেয়ে ধমক দিয়ে মেয়ে-জামাইকে থামানোই তার উচিত ছিল। নৌকোর গলুই ধরে টেনে রাখলেই বা তাকে আটকাত কে!

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। গগনের দ্বিতীয় পক্ষের বড় মেয়ে ময়না এসে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, ঠিক ঠিক সন্ধ্যা হয়েছে তো? আলো জ্বালব ঘরে?'

সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যাদীপ জ্বালতে হয়। কিন্তু গগনের বাড়িখানা গাঁয়ের ভিতরের দিকে আর গাছগাছালিতে ঘেরা বলে সন্ধ্যার আগেই ঘরের মধ্যে অন্ধকার জমাট বাঁধে। দু'চোখে কিছু দেখা যায় না বলে অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে আলো জ্বালত লক্ষ্মী। কিন্তু গগনের সেটা সহ্য হ'ত না। গরীবের এত চেকনাইয়ের দরকার কি! তেলের দাম দিনের পর দিন চড়ে যাচ্ছে বাজারে। লক্ষ্মী বলত, 'ছেলেপুলে নিয়ে বাস। গরীব বলে কি সন্ধ্যার সময় দীপও জ্বালাব না ঘরে! গেরস্থের মঙ্গল অমঙ্গল বলেও তো কথা আছে একটা।'

গগন বলত, 'দীপ জ্বালবি, সন্ধ্যার সময় জ্বালবি। সন্ধ্যার দু'দণ্ড আগে চেরাগ জ্বেলে বসে থাকবার মত অবস্থা আমার নয়, আঁধার হলেই সন্ধ্যা হয় না, তার একটা ক্ষণ আছে, সময় আছে। বাইরে একটু খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখ্ কত দেরি সন্ধ্যার।'

তেলের হিসাবের বেলায় যত বাড়াবাড়ি করে গগন, মাছ-তরকারির বেলায় তেমন করে না। প্রদীপে তেল পোড়ে, রাঁধা-বাড়ায় তেলের দরকার হয়, মাথায় মাখবার জন্যেও নারকেল তেল একটু বেশিই খরচ হয় লক্ষ্মীর। আর যে কোন তেল আনতে বললেই গগনের কাছে ধমক খেতে হয়। একটু বেশি সময় ঘরে

প্রদীপ জ্বালা দেখলে গগনের সহ্য হয় না। প্রদীপে তেল পোড়ে না তো যেন বুক পোড়ে গগনের। তাই সন্ধ্যাদীপ জ্বালবার আগে মাঝে মাঝে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে লক্ষ্মী, 'ঘরে অন্ধকার হয়েছে। দীপ জ্বালবার সময় হল কিনা বলে দাও, দুচোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না।'

গগন বলত, 'তা যাবে কেন! তোর চোখের একটু বড়লোকীপনা আছে কিনা।'

লক্ষ্মী জবাব দিত, 'তা তো আছেই। মানুষ না হয়ে যদি কুকুর-বিড়াল হয়ে জন্মাতাম তাহলেই ভাল হ'ত। অন্ধকারে নিজের চোখেই জোনাকি জ্বলত, আলো আর জ্বালতে হ'ত না ঘরে।'

কিন্তু আজ ঠাট্টা-তামাসা নয় বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ময়নাকে স্বামীর কাছে আলো জ্বালবার অনুমতি নিতে পাঠিয়েছিল লক্ষ্মী। আহা, প্রাণ পুড়ছে মানুষটির মেয়ের জন্যে! ময়নার সঙ্গে কথাবার্তায় তবু একটু ভুলে থাকবে, আনমনা হয়ে থাকবে।

ফল হল বিপরীত। আলো জ্বালবার কথা জিজ্ঞাসা করতেই গগন খেঁকিয়ে উঠল, 'চোখ নেই তোদের সঙ্গে? সন্ধ্যা হয়েছে কি হয় নি নিজেরা দেখতে পাস নে?'

মুখ ভার করে মায়ের কাছে ফিরে এল ময়না, বলল, 'বকুনি খাব জান কিনা, তাই আমাকে পাঠিয়েছ। তা না হলে নিজেই যেতে। তুমি গেলে তো বেশ হেসে হেসে কথা বলে বাবা, যত ধমকানি আমার বেলায়।'

লক্ষ্মী হাসি চেপে বলল, 'হয়েছে হয়েছে, একেবারে বুড়ী ঠাকরুণ। মেয়ে তো নয়, আমার মরা-মা যেন ফিরে এসেছে।'

ধীরে-সুস্থে দীপ জ্বালল লক্ষ্মী, তারপর খুব যত্ন করে এক ছিলিম তামাক সেজে স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, 'নাও তাড়াতাড়ি আগুন নিবে যাবে।'

স্ত্রীর তোয়াজে মেজাজটা একটু নরম হল গগনের। হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিয়ে টানতে শুরু করল। একটু চুপ করে থেকে লক্ষ্মী বলল, 'মন খারাপ করে লাভ কি বল। এতকাল তো চোখের ওপরই রেখেছিলে মেয়েকে, দু'দিনের জন্যে না হয় দূরেই গেছে একটু, তাই বলে মন-মেজাজ খারাপ করতে হয় নাকি!'

গগন মুখ খিঁচিয়ে উঠল, 'মন খারাপ হয়েছে কে বললে তোকে?'

লক্ষ্মী হাসি চেপে বলল, 'পাড়ার পাঁচজনে এসে দেখে গেছে। নিজের মুখ তো আর নিজের চোখে দেখতে পাও না। মানুষের মন খারাপের কথা কি কারও

বলবার দরকার হয়—না শোনবার দরকার হয়? মানুষের মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায় তার মন কেমন আছে না আছে,—মন-মেজাজ যদি খারাপই না হবে মেয়েটাকে অমন করে বকলে কেন?'

গগন বলল, 'বকেছি বেশ করেছি। তুই বুঝি তার কৈফিয়ত নিতেই এসেছিস! ছেলেবেলাতেই বকে-ধমকে ওদের ঠিক রাখতে হয়; না হলে বড় হয়ে হাজার বকুনিতেও আর শোধরায় না। চোখের ওপর দেখলি তো সিন্দুরকে। ছেলেবেলায় কম আদর-যত্ন করেছি হারামজাদীকে। খাওয়ানোয় পরানোয় কোনটায় এতটুকু কমতি পড়তে দিই নি। এত আদর-সোহাগ ওর বড়লোক বাপও কোনদিন করতে পারত না।'

লক্ষ্মী মৃদু তিরস্কারের সুরে বলল, 'আঃ, 'ফের মুখ খারাপ করতে শুরু করলে?' কিন্তু তিরস্কারটা যে ভানমাত্র তা লক্ষ্মীর পরের কথাটুকুতেই ধরা পড়ল। স্বামীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী গলা নামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গো, লোকে তাহলে যা বলে সে-সব সত্যি?' গলা চাপা হলেও কৌতুহলটা লক্ষ্মী কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না।

গগন নিস্পৃহস্বরে বলল, 'অত ফিসফিস করছিস কেন। সব সত্যি। সিন্দুরের মা'র মতিগতি খুব যে খারাপ ছিল তা নয়, কিন্তু সঙ্গদোষে মানুষ নষ্ট। আর এ তো যে-সে মানুষের সঙ্গ নয় বড় মানুষের সঙ্গ। ভুবন চৌধুরীর মত সুন্দর আর সৌখিন পুরুষ তখন গাঁয়ে আর ছিল না। সিন্দুরের মা তুলসী তো তুলসী, ভাল ভাল কত বামুন-কায়েতের মেয়ে তার চোখ এড়াতে পারে নি, হাত এড়াতে পারে নি।'

লক্ষ্মী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সিন্দুর বুঝি সেই—। অবস্থা তুমি যখন জানতে পারলে তখন রাগ হল না তোমার?'

গগন বলল, 'হল বইকি। সে কি যে-সে রাগ? আমার খুন চেপে গেল মাথায়। ভাবলাম দুটোকেই শেষ করব। আগে পর তারপরে ঘর।'

লক্ষ্মী বলল, 'ও বাবা! দেখ দেখ, আমার গায়ের লোম কি রকম খাড়া হয়ে উঠেছে দেখ। তারপর?'

গগন মৃদু হাসল, 'গায়ের লোম খাড়া হওয়ার পরেও তোর শুনবার সাধ মিটছে না? ওই রকমই হয়। তারপর আর করে উঠতে পারি নি, তাহলে তো ফাঁসি দ্বীপান্তরই হ'ত। তুই বেঁচে যেতিস, বুড়ো সোয়ামীর ঘর আর তোকে করতে হ'ত না।'

লক্ষ্মী বলল, 'আহা-হা, ছিরি দেখ কথার! বুড়ো সোয়ামীর ঘরে যেন দুঃখে

আমি একেবারে মরে আছি। তাছাড়া তুমি ফাঁসি গেলেই কি বুড়ো সোয়ামীর কপাল আমার বদলে যেত? কপালে যখন এই লেখা আছে, তখন তোমার হাতে না পড়লেও আর এক বুড়োর হাতে গিয়ে পড়তাম। দেশে তো আর অভাব নেই বুড়োর। কিন্তু খুন কেন করতে পারলে না!'

গগন বলল, 'কি করে পারব। খুন করতে গিয়ে দেখি ভগবান আগেই তাকে খুন করে রেখেছেন। থানার দারোগার সাথে ভারি দোস্তী ছিল চৌধুরীবাবুর। মদ-মাংসের পাল্লা চলত দু'জনের মধ্যে। একবার সেই পাল্লায় চৌধুরীবাবু জিতে এল। কিন্তু এসে আর দাঁড়াতে পারল না উঠে। রক্ত ছুটল গলা দিয়ে। দোষ নাকি আগেই একটু-আধটু ছিল। বাস্, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই কাম ফতে।'

গগন হুঁকোতে গোটা-দুই টান দিয়ে বাঁশের খুঁটিতে সেটা ঠেস দিয়ে রেখে একটুখানি চুপ করে রইল।

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল লক্ষ্মীও। তারপর বলল, 'যা শত্রু পরে পরে। আপনা থেকেই শত্রু নিপাত হল দেখে মনে বুঝি ভারি ফুর্তি হল তোমার?'

গগন বলল, 'দুর! এতদিন ঘর-সংসার করলি পুরুষ মানুষের সঙ্গে, কিন্তু তার মতের নাগাল একটুও ধরতে পারিস নি বউ। ফুর্তি! কত গালাগাল দিয়েছি, কত শাপ-মন্যি করেছি চৌধুরীকে, কতবার কতরকম চেষ্টা করেছি তাকে সরিয়ে ফেলতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজে থেকেই যখন সে সরে গেল, ফুর্তি কি বলছিস তুই দুঃখে যেন বুক ফেটে যেতে লাগল আমার। আহা-হা, অমন বাঘের মত পুরুষ— এরকম অপমৃত্যু তো আমি কোনদিন চাই নি।'

ঘরের মধ্যে আলো জেলে ময়না আর মলুঙ্গী পুতুল খেলতে শুরু করেছে। তাদের কথাবার্তা আর হাসির শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে দাওয়ায়। কিন্তু সেই সামান্য টুকটাক শব্দে এই ঘন অন্ধকারের স্তব্ধতার যেন কিছুমাত্র হানি হল না, খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর লক্ষ্মী আবার কথা বলল, 'কিন্তু সিন্দুর আর তার মাকে কি করে ক্ষমা করলে? ঘেন্না ধরল না মনে?'

গগন এবারও মৃদু একটু হাসল, 'পুরুষের মনের কথা তোকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা ময়নার মা। পুরুষের ক্ষমা-ঘেন্না সব আলাদা, ওসব তুই বুঝতে পারবি নে। তুই যা পারিস তাই কর্। আর এক ছিলিম তামাক আন্ সেজে। একটু ভাল আগুন দিস দেখি। আগুন ভাল না হলে কি জুত হয় তামাক খেয়ে!'

'ঢুলী খুড়ো আছ নাকি, ঢুলী খুড়ো!'

কল্কি হাতে লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠে গেল ঘরের মধ্যে।

গগন বলল, 'হ্যাঁ, আছি। কে কেশব! কি মনে করে? অন্ধকারে কেশবকে ভাল করে দেখা না গেলেও গলার শব্দে তাকে বেশ চিনতে পারল গগন। ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও ময়নার মা, কলকেতে আগুন আনবার সময় কেরোসিনের ডিবেটাও নিয়ে আসিস। ওকি, ও কিসে বসলি কেশব, নে, এই চেটাইখানা পেতে বস্।'

একটু বাদে এক গলা ঘোমটা টেনে একহাতে কলকে আর একহাতে জলন্ত একটা কেরোসিনের ডিবে এনে মেঝেয় নামিয়ে রেখে লক্ষ্মী ফের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু বেশি দূরে গেল না, বা অন্য কোন কাজেও হাত দিল না। দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল কান পেতে।

এতক্ষণ আবছা আবছা দেখাচ্ছিল বলে গগন ঠিক ঠাহর করতে পারে নি, দীপের আলোয় এবার জিনিসটা পরিষ্কার দেখতে পেয়ে গগন চমকে উঠল, 'ওকি, ও সানাই পেলি কোথায় তুই?'

কেশব শান্তভাবে বলল, 'সেই কথা বলতেই তো এসেছি। সানাই গোপনে আমাকে দিয়ে গেছে শুকচাঁদ। বলেছে পৌঁছে দিস ঢুলী খুড়োকে, এই নাও তোমার সানাই।'

গগন বলল, 'খবরদার, মিছে কথা বলিস নে কেশব, ও সানাই আমার নয়। ও সানাই ভরতের। ও আমি হাত দিয়েও ছোঁব না।'

কেশব অবাক্ হয়ে বলল, 'কেন ঢুলী খুড়ো?'

গগন তেমনি উত্তেজিত স্বরে বলল, 'কেন? সে কথা আবার জিজ্ঞেস করছিস তুই? কেন, আমার কি কোন মান অপমান নেই! যে সানাই আমার মেয়ে-জামাই আমাকে প্রাণ থেকে দিয়ে যেতে পারল না, তা আমি লুকিয়ে-চুরিয়ে অপরের কাছ থেকে নেব কেন? বলিস কি তুই?'

গগন জোরে জোরে হুঁকোয় টান দিতে লাগল।

কেশব একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ভরতের কথা বলতে পারি নে, কিন্তু তোমার মেয়ে সিন্দুরের বোধ হয় মনোগত ইচ্ছা ছিল তোমাকে সানাই দিয়ে যাওয়ার।'

গগন বলল, 'ইচ্ছা ছিল! বলে গেছে তোকে?'

কেশব লজ্জিত হয়ে বলল, 'বাঃ, আমাকে কেন বলবে!'

'তবে কাকে বলেছে?'

কেশব বলল, 'কাউকেই বোধ হয় বলে নি। সব কথাই কি মুখ ফুটে মানুষ

বলতে পারে! মুখের ধরন-ধারণ দেখলেও তো বোঝা যায়। রাত পোহালে তোমার সানাইর দরকার হবে তা বুঝি জানে না সিন্দুর?'

দলের বায়না সম্বন্ধে হঠাৎ এবার সচেতন হয়ে উঠল গগন। সত্যিই তো। রাত পোহালে ঠিক দরকার না হলেও কাল বাদে পরশুই দরকার হবে সানাইয়ের। তার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

গগন কোন কথা না বলে চিন্তিতভাবে হুঁকো টানতে লাগল।

কেশব বলল, 'রাত হল। আমি এবার এগোই ঢুলী খুড়ো, সানাইটা তুমি রেখে দাও তাহলে।'

মেঝের ওপর সানাইটা রেখে কেশব উঠে দাঁড়াল।

একমুহূর্ত নিজের মনে কি ভাবল গগন, তারপর হুঁকোটা থামে ঠেস দিয়ে রেখে সানাইটা তুলে নিয়ে বলল, 'কেশব!'

'কি বলছ?'

গগন বলল, 'হাত পাত। এ সানাই তোর কাছেই থাক।'

কেশব বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমার কাছে!'

গগন বলল, 'হ্যাঁ তোর কাছেই, আমি সানাই রেখে কি করব? আমি তো আর বাজাতে জানি নে, তুই রাখ্।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, তুই। আসলে আমার নাম করে সানাই তোকেই দিয়ে গেছে সিন্দুর।'

কেশব লজ্জিত হয়ে বলল, 'কি বলছ তুমি! আমাকে কেন দিয়ে যাবে?'

গগন বলল, 'আমি ঠিকই বলছি কেশব ও সানাই তোর জন্যেই রেখে গেছে সে।'

কেশব আপত্তির সুরে বলল, 'হ্যাঁ, রেখে গেছে না আরও কিছু! বলে গেছে নাকি তোমাকে?'

গগন মৃদু হাসল, বলল, 'সব কথাই কি মানুষ মুখ ফুটে বলতে পারে? ধরন-ধারণ দেখেও বুঝতে হয়। সিন্দুর তো জানে রাত পোহালে আমার কেবল সানাইর নয়, সানাইদারেরও দরকার হবে', বলে সানাইটি কেশবের হাতে গুঁজে দিতে দিতে হঠাৎ ধরা গলায় বলে উঠল, 'দান করা মেয়ে তো ফিরিয়ে নিতে পারি নে কেশব, তাহলে নিতুম। কিন্তু বিদ্যার তো আর জাত নেই, ছোঁয়াছুঁয়ি বাছ-বিচার নেই। সেই বিদ্যায় সেই গুণে আমি হাতে ধরে তোকে দিচ্ছি অনাদর করিস নে। আজ থেকে আমার আসল জামাই আর ভরত ঢুলী নয়', বলতে বলতে

সানাইসুদ্ধু কেশবের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরল গগন। সিন্দুরের নরম সুন্দর হাত নয়, তার বাবার শুকনো খসখসে লোমভরা হাতের থাবা। তবু কিসের এক অপূর্ব স্পর্শে কেশবের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। যে কথা মুখ ফুটে সিন্দুর বলতে পারে নি, যে কথা মুখ ফুটে গগন বলতে পারে নি, বলতে বলতেও থেমে গেছে, সে কথা কেউ আর কিছুতেই গোপন রাখতে পারবে না। মাধবদাসের আঙিনায় বসে সানাইতে যখন সুর ধরবে কেশব, তখন মুহূর্তের মধ্যে সুরে সুরে সে কথা আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে। আজ থেকে গগনের আসল জামাই যে কে তা কি জানতে আর বাকি থাকবে কারও?

অক্ষরে অক্ষরে

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ এক ॥

সারদা প্রেসের শুভ উদ্বোধন পয়লা আষাঢ়। সেই উপলক্ষ্যে স্বত্বাধিকারী নীলকমল চট্টোপাধ্যায় তার কয়েকজন বন্ধুকে চায়ে নিমন্ত্রণ করবে।

অনেক বন্ধু অনেক রকম ভাবে এই প্রেসের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে। কেউ মূলধনের খানিক অংশ ধার দিয়েছে, লাইসেন্স সংগ্রহের তদ্বির করেছে কেউ, কেউ পরিচিত টাইপ ফাউণ্ড্রি থেকে কিছু কম হারে দিয়েছে টাইপ কিনে। কেউ মেশিনের খোঁজ দিয়েছে, কেউ মেসিনম্যানের। অল্প মাইনের পরিচিত দু'চারজন কম্পোজিটার সংগ্রহ ক'রে দিয়েছে কেউ।

সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ নীলকমল। তাছাড়া প্রেস চালাতে হলে এদের অনেককেই হয়তো সময়ে অসময়ে প্রয়োজন হবে।

প্রেস খুলবার সময় এদের না বললে চলে না। আর, সবাই যখন আসবেই তখন সামান্য একটু জলযোগের ব্যবস্থা না করলেও ভালো দেখায় না। বেশি নয়, টাকা বিশ পঁচিশ হয়তো খরচ হবে বড় জোর।

তিরিশে জ্যৈষ্ঠ রাত্রে যুক্তিগুলি নিজের বোন উর্মিলাকে শোনাচ্ছিল নীলকমল। বলতে গেলে উর্মিলা নীলকমলের ডান হাত। বাইরে যেমন সাহায্য করেছে বন্ধুরা, ঘরে তেমনি উৎসাহ দিয়েছে বোন। উর্মিলা না থাকলে এ প্রেস হয়তো খোলাই হোত না।

টাকা পয়সা খরচের ব্যাপারে উর্মিলার একটু কুণ্ঠা আছে। এই কুণ্ঠাকে নীলকমল প্রশ্রয় দেয়। নিজে একটু বেশি খরচে। উর্মিলা যদি একটু হাত টেনে না ধরে তাহলে তার পক্ষে টাল সামলানোই মুসকিল।

দাদার অনুনয়ের সুরে উর্মিলা মুখ টিপে একটু হাসল, 'বিশ পঁচিশে তুমি কিছুতেই পারবে না। যেতে যেতে প্রায় পঞ্চাশে গিয়েই দাঁড়াবে। তা যাক। টাকাটা আমি স্যাংশন করছি দাদা। সত্যিই প্রেস খোলার দিন ওঁদের বলা দরকার। তোমার জন্য যথেষ্ট করেছেন ওঁরা।'

নীলকমল বলল, 'কেবল আমার জন্য ? আর তোর জন্য বুঝি নয় ? প্রেস বুঝি

কেবল আমার? এই জন্যেই বলেছিলাম প্রিন্টার হিসাবে তোর নামটাই দিয়ে দিই।'

উর্মিলা বলল, 'আচ্ছা। নামটা দিন কয়েক পরে পালটে নিয়ো। এবার এসো দেখি একটা লিস্ট ক'রে ফেলি কাকে কাকে বলব। অনেক রাত হয়ে গেছে। ও ঘরে বউদির বোধ হয় এক ঘুম হয়ে গেল।'

নীলকমল বলল, 'তার তো সন্ধ্যা থেকেই ঘুম।'

কিন্তু রাত সত্যিই হয়েছে।

খানিক আগে সারদাবাবুর ঘর থেকে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজবার শব্দ শোনা গেছে।

মা এসে বার দুই তাগিদ দিয়ে গেছেন, 'তোরা কি শুবিনা কেউ! না সারারাত কেবল প্রেস প্রেসই করবি।'

এতক্ষণে নিভাননীও বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। সারা বাড়িতে আর কেউ জেগে নেই, সারা পাড়াটা নিস্তব্ধ।

উর্মিলা হাই তুলে বলল, 'যাও শোও গিয়ে। লিস্টটা না হয় কালই করা যাবে।'

নীলকমল বলল, 'না না আজই শেষ করা যাক, কাল কোন কালে আসে না।'

উর্মিলা মনে মনে হাসল। দাদার এই অধ্যবসায়টা নতুন। এখন ভাগ্যে টিকে থাকলে হয়।

কাগজ কলম নিয়ে নীলকমল নিজেই লিস্ট করতে বসল বন্ধুদের নামের। স্থরেন মিত্র, নৃপেন মল্লিক, নির্মল সেহানবীশ, শিশির বাঁড়ুয্যে—

উর্মিলা বলল, 'কেবল বন্ধু নয়, দু'চারজন কুটুম্বকেও কিন্তু বলতে হবে দাদা! অন্তত তাঐ মশাই আর বউদির দুই ভাই গণেশবাবু, পরেশবাবুকে।'

নীলকমল ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলল, 'তাঁদের আবার কি দরকার?'

উর্মিলা বলল, 'দরকার মানে? তাঁদেরই তো সব চেয়ে আগে বলা উচিত। তাঁরাও তো সাহায্য করেছেন।'

কি কথা মনে পড়ল নীলকমলের, গম্ভীর মুখে বলল, 'বেশ।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'ওঁদের নিচে সরিৎ মুখুয্যের নামটাও বসিয়ে দিই উর্মিলা। প্রকারান্তরে সেও তা কম সাহায্য করেনি। তার কাছ থেকে

ওরকম আঘাত না পেলে প্রেমের কথা আমরা ভাবতে পারতাম না!'

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে উর্মিলা বলল. 'দাদা।'

'কি বলছিস?'

'তুমি কি আমাকে অপমান করতে চাইছ?'

নীলকমল সস্নেহে বোনের পিঠে হাত রেখে বললে, 'পাগলী কোথাকার। আমি অপমান করতে চাই সেই শুয়োরটাকে।'

উর্মিলা মৃদুস্বরে বলল, 'তার নাম আমাদের মুখে এনে দরকার নেই দাদা।'

নীলকমল বলল, 'না, দরকার আছে। আমাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে নিজের গণ্ডির বাইরে না এসে ভেবেছে সে মান বাঁচাবে। তা আমি হতে দেব না। নিমন্ত্রণ ক'রেই তাকে আমি এখানে ডেকে আনব। তারপর আরো পঁচিশজন ভদ্রলোকের সামনে তাকে আমি অপমান করব।'

উর্মিলা অদ্ভুত একটু হাসল. 'কি ক'রে অপমান করবে শুনি? কি বলবে?'

নীলকমল এবার যেন একটু ঘাবড়ে গেল। বলল, 'বলব আবার কি? কিছু বলব না। কোন রকম আদর যত্ন করব না। সকলের সামনে তুচ্ছ করব, অবহেলা দেখাব। তাতে কি কম অপমান হবে ওর?'

উর্মিলা হাসল, 'তা বোধ হয় একটু হবে। কিন্তু ওইটুকুর জন্যে অত কাণ্ডে দরকার নেই দাদা। কোন প্রয়োজন নেই তার সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্ক রাখবার।'

নীলকমল বলল, 'কিন্তু শত্রুতার সম্পর্ক না রাখলেও থেকে যাবে। তাকে আমি জীবনে ক্ষমা করতে পারব না। 'জানিস এক সময় আমার ইনটিমেট ফ্রেণ্ড ছিল সরিৎ। আর সেই কিনা—'

উর্মিলা বলল, 'ওসব কথা থাক দাদা। সব তো চুকে গেছে, আর কেন? শুভদিনে তার নাম আর করোনা।'

নীলকমল বলল, 'উঁহু, একটা কার্টসি তো আছে। সে তার বিয়ের সময় আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিল। আমাদেরও রিটার্ণ দেওয়া দরকার।'

বলেই সত্যিই তালিকায় সরিৎ মুখোপাধ্যায়ের নামটি লিখে রাখল নীলকমল।

লিখতে লিখতে নীলকমল বলল, 'সবাইকে মুখে গিয়েই বলব। কাউকে কাউকে ফোন করলেও হবে। কিন্তু মুখুয্যে মশাইকে 'পত্র দ্বারা'ই নিমন্ত্রণ করা যাক, কি বলিস?'

উর্মিলা বলল, 'করো তোমার যা খুসি।'

নীলকমল পর পর আরো কতকগুলি নাম বসাল তালিকায়, তারপর বলল, 'এবার খরচপত্রের একটা—'

উর্মিলা বাধা দিয়ে বলল, 'খরচপত্রের এস্টিমেট কালও করা যাবে দাদা। তার সময় আছে। সেজন্য ভেব না। যাও, শোও গিয়ে এবার!'

নীলকমল বলল, 'অন্যদিন তো এমন করিসনে। আজ বুঝি খুব ঘুম পেয়েছে তোর?'

উর্মিলা বলল, 'হ্যাঁ আমার পেয়েছে, তোমারও পাওয়া উচিত। রাত কি কম হলো নাকি?'

কাগজপত্রগুলি উর্মিলার ছোট টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রেখে নীলকমল বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

উর্মিলা উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করল। ছোট কুঁজোটি থেকে জল ঢালল কাঁচের গ্লাসে, সমস্ত গ্লাসটি নিঃশেষ ক'রে, অল্প একটু জলে সেটি ধুয়ে নিয়ে চূড়োর মত রেখে দিল কুঁজোর মাথায়। তারপর শুতে চলল।

হঠাৎ টেবিলের ওপর নামের তালিকাটা চোখে পড়ল উর্মিলার।

চার ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটি কালো চিরুনিটা দিয়ে চেপে রেখে গেছে নীলকমল। নামগুলি দেখা যাচ্ছে না, সাদা পিঠটা কেবল দেখা যাচ্ছে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একটু একটু ক'রে কাগজের ভাঁজ খুলে ফেলল উর্মিলা। তারপর নীলকমলের ফাউন্টেন পেনটা তুলে নিয়ে নিমন্ত্রিতদের নামের লিস্ট থেকে সরিৎ মুখোপাধ্যায়ের নামের ওপর দিয়ে সোজা একটা দাগ টেনে গেল।

মনে মনে বলল, 'কেবল গোঁ আছে দাদার। বুদ্ধি সুদ্ধি এখনো কিছু হলো না।' সুইচ অফ্ করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল উর্মিলা। রাত অনেক হয়েছে, এবার ঘুমোন যাক।

॥ দুই ॥

কিন্তু রাত বেশি হলেই কি সব দিন ঘুম আসে? বরং বেশি রাতে মুছে দেওয়া, কেটে দেওয়া দিনগুলি বেশি ক'রে ফিরে ফিরে আসতে চায়।

কথাটা মিথ্যে নয়। এম, এ, ক্লাসে আলাপ হলেও উর্মিলার দাদার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিল সরিৎ। তারপর মাস ছয়েকের মধ্যে নীলকমলের জায়গায় নিজে এসে দাঁড়িয়েছিল।

এমন ঘটনা উর্মিলাদের বাড়িতে আগে কোনদিন হয়নি।

এর আগে নীলকমলের নতুন বন্ধু তো দূরের কথা, স্কুলের পুরোনো বন্ধুরাও বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারত না। কদাচিৎ যদি বা দু-একজন আসত, উর্মিলারা তিন বোন কেউ বেরুত না তাদের সামনে।

ভারি কড়া নিষেধ ছিল মার। তিন বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট উর্মিলা।

নীলকমল যখন কলেজে ঢুকল, কত আর বয়স হবে তখন উর্মিলার, এগারো বারোর বেশি নয়। কিন্তু তখন থেকেই দিদিদের মত তাকেও আগলে আগলে চলতেন মা। একটু লাফালাফি ছুটোছুটি করলে দিদিদের মত তাকেও গাল দিতেন ধিঙ্গি মেয়ে বলে। অথচ দিদিরা তার চেয়ে একজন ছয় আর একজন চার বছরের বড়।

কিন্তু হলে হবে কি ? বাড়ন্ত গড়ন বলে ছোড়দির সমান সমান দেখাত তাকে। তারপর বছর দুয়েকের মধ্যে লীলা আর শীলা দু'জনেরই বিয়ে হয়ে গেল।

হাজার তিনেক টাকা দেনা হলেন উর্মিলার বাবা সারদারঞ্জন। কিন্তু দুই মেয়ের বিয়ের উৎসবের অবসাদ পাঁচ বছরের আগে ঘুচল না। তারপর ফের সম্বন্ধ দেখা চলতে লাগল উর্মিলার।

লীলার বর পুলিস কোর্টের উকিল, শীলার বর এম-বি পাশ ডাক্তার। কিন্তু উর্মিলার সম্বন্ধ আরো কয়েক ধাপ নিচের সিঁড়ি থেকে আসতে লাগল।

পঞ্চাশ টাকা মাইনের স্কুল মাস্টার, চল্লিশ টাকার মার্চেন্ট অফিসের কেরানি, স্টেশনারী দোকানের দু'একজন সেল্‌স্‌ম্যানের সঙ্গেও সম্বন্ধ এল।

কিন্তু কোনটাই টিকল না। কেউ বড় বেশি পণ-যৌতুক দাবি করল, কেউ সরাসরিই জানিয়ে দিল মেয়ে পছন্দ হয় নি।

স্কুলের হাইজিনের বইতে উর্মিলা পড়েছিল—স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য। কিন্তু ছাই জানে হাইজিন লেখক। তাকে তো আর সেজেগুজে বছরে চার পাঁচবার ক'রে সৌন্দর্য-বিচারকদের কাছে দাঁড়াতে হয় না। বরং দু'তিনটা সম্বন্ধ তার স্বাস্থ্য ভালো থাকার জন্যই ফিরে গেল।

অভিভাবকেরা বললেন, 'ছেলের সঙ্গে মানাবে না।'

আইবুড়ো মেয়ের স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য নয়!

তিন বোনের মধ্যে লম্বায়-চওড়ায়, শক্তি-সামর্থ্যে সব চেয়ে স্বাস্থ্যবতী আর

পরিশ্রমী হলে কি হবে, উর্মিলার রং শ্যামলা, মুখের ডৌলটুকু মোটামুটি সুন্দর হলেও নাক চোখা নয়, চোখ বড় নয়, মণির রং কটা কটা। ঠোঁট দুটি পাতলা কিন্তু দাঁতগুলি বড় বড়। তবু হাসলে সুন্দর দেখাত যদি কালো মাড়ি একটু বেশী রকম বেরিয়ে না পড়ত।

মাথাভরা চুল আছে উর্মিলার সে চুল গোড়ালী পর্যন্ত না হলেও হাঁটু ছাড়িয়ে পড়ে। কিন্তু চুলের বাহুল্য কেবল তো মাথায় নেই, দুই বাহুতেও দেখা দিয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়াতে ইচ্ছা করত না উর্মিলার, দেখতে চাইত না নিজের কুরূপ। তবু সেই রূপহীনতার কথা নানাভাবে, নানাজনের কাছ থেকে কানে এসে ঢুকত।

আই, এ, তে একবার দিয়ে ফেল ক'রে, আর বি, এ, তে হল থেকে একবার উঠে গিয়েও চব্বিশ বছর বয়সে এম, এ, টা এক চান্সে পাশ ক'রে ফেলল নীলকমল।

পাশের পর বলল, 'ওরকম সাবেকী ধরনে বিয়ে দেওয়া যাবে না উর্মির। আমার কথা যদি শোন, আমার ওপর যদি ভার দাও তাহলে ছ'মাসের মধ্যে আমি ওর বিয়ে দেব। টাকা-কড়ির দরকার হবে না!'

নিভাননী বললেন, 'হ্যাঁ, পাশ পরীক্ষা দিয়ে ঘরে বসে আছ, ছ'মাসের মধ্যে একটা চাকরি জোটাতে পারলে না, একটা পয়সা আনতে পারলে না, আর তুমি নামাবে মেয়ে!'

নীলকমল বলল, 'আমার উপর ভার দিয়েই দেখ না।'

বলে কয়ে ভার কেউ দিল না, কিন্তু জোর ক'রেই উর্মিলার ভার গ্রহণ করল নীলকমল।

নিচের বৈঠকখানা ঘরে সমবয়সী বন্ধুদের আড্ডা বহুদিন থেকেই বসত।

খালি ঘর ঝেড়েপুছে এলেও ভরা ঘরে যাওয়ার হুকুম এর আগে উর্মিলা কোন-দিন পায়নি! কিন্তু এবার চা দেওয়ার জন্য উর্মিলার ঘন ঘন ডাক পড়তে লাগল।

বিধবা কাকীমা আর ছোট ছোট খুড়তুতো দুটি ভাই আছে উর্মিলাদের। তারা স্কুলে পড়ে, পড়ার ব্যাঘাত হবে ভেবেই যেন নীলকমল এসব ছোটখাট ফাইফর-মাসের জন্য তাদের ডাকত না।

বছর কয়েক উর্মিলাও পড়েছে স্কুলে। সেকেণ্ড ক্লাসের পর আর তাকে স্কুলে কিন্তু যেতে দেননি নিভাননী। বাড়িতে পড়ে পড়েই ম্যাট্রিকের জন্য তৈরী হচ্ছে। কিন্তু কোন বারই ঠিক সাহস পাচ্ছে না পরীক্ষা দিতে। এদিকে আঠার ছাড়িয়ে উনিশে পড়েছে বয়স।

নীলকমল মাঝে মাঝে একেক দিন ধমক দেয়, একেক দিন বোঝাতে বসে নেসফিল্ডের গ্রামার, লিখতে দেয় লুসি পোয়েমসের ব্যাখ্যা, বীজগণিতের ফরমুলা, জ্যামিতির উপপাদ্য।

তারপর আবার ঢিল পড়ে, কবিতা লেখা নিয়ে মেতে ওঠে নীলকমল, তখন আর তার কাছেও যাওয়া যায় না।

উর্মিলাও কি কাছে যেতে চায়? ইউক্লিড থেকে অনেক সরস শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, মাসিক সাপ্তাহিকের ধারাবাহিক উপন্যাস। ডেভিড কপারফিল্ডের ক্রিটি-ক্যাল কোশ্চেনের জবাব মুখস্থ করার চাইতে অনেক উপভোগ্য অজানা লেখকের রাশ রাশ ছোট গল্প। কিন্তু তার চাইতেও উপভোগ্য হয়ে উঠল নীলকমলের বন্ধু-দের আলাপ-আলোচনা।

কখনো সাহিত্য, কখনো সিনেমা, কখনো দুরূহ রাজনীতি, সমাজনীতি। সব কথা উর্মিলা বুঝতে পারত না। কিন্তু কথা কি সব বুঝবার জন্য? শুনবার জন্য, দেখবার জন্য নয়?

কেটলি থেকে চা কাপে ঢলতে ঢালতে উর্মিলা আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখত কে কি ভাবে কথা বলে। কে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কে আগাগোড়া শান্ত নরম স্বরে থেমে থেমে বলে যায়, কে তোৎলায়, কে দাঁত দিয়ে নখ খোঁটে।

সব কথা বুঝতে পারত না উর্মিলা, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারত, সে ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেরই উৎসাহ বেড়ে গেছে। সবাই বলবার জন্য ব্যাকুল, সবাই শোনবার জন্য পাগল।

প্রথম প্রথম ভারি লজ্জা করত উর্মিলার। আড়ষ্টতা কিছুতেই কাটত না, ঘরে ঢুকবার সময় পা কাঁপত, চা ঢালবার সময় হাত কাঁপত, কেউ তাকে সম্বোধন ক'রে কোন কথা বললে বুক কাঁপত দুরু দুরু ক'রে।

প্রথম কিছুদিন চা দিয়েই, কিম্বা দাদার ফরমায়েস মাফিক ওপর থেকে বইপত্র এনে দিয়েই চলে আসত উর্মিলা। দু'তিন সপ্তাহ বাদে কিছুক্ষণ করে সে থাকতেও লাগল। দাদার আদেশ, দাদার বন্ধুদের অনুরোধ!

নীলকমল বলত, 'বোস, বোস। এদের কথা শুনলে অনেক শিখতে পারবি।'

নীলকমলের বন্ধুদের কেউ হয়তো আপত্তি করত, 'দোহাই উর্মি দেবী, আমাদের মাস্টার ভাববেন না। আমরা এখানে গল্প করতে, গল্প শুনতেই এসেছি। শিখতেও আসিনি, শেখাতেও আসিনি।'

কেউ বা তার সমর্থনে আর এক লাইন জুড়ে দিত, 'সেজন্য স্কুল কলেজ আছে, বন্ধুবান্ধবের বৈঠকখানা আর যাই হোক পাঠশালা নয়, চা আর আড্ডাশালা।'

উর্মি দেবী! সম্বোধন শুনে সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত উর্মিলার।

ছোট বড় খান চার-পাঁচ চেয়ার আর লম্বা ধরনের একটা পুরানো টেবিল—একলা নিজেদের একতলার ছোট বৈঠকখানা ঘরটুকুতে যেন ঢোকেনি উর্মিলা, ঢুকেছে একখানা গোটা উপন্যাসের মধ্যে, আর সে উপন্যাসের নায়িকা সে নিজে। সখী নয় পার্শ্বচরী নয়, একেবারে নায়িকা। সরু গলির, পুরানো বাড়ির স্যাঁৎসেঁতে একখানা ঘর যেন নয়, মাসিক পত্রের গল্পে উপন্যাসে বর্ণিত কার্পেটে, সোফায়, কৌচে সাজানো এ যেন সেই বালীগঞ্জের বড়লোকের ড্রইংরুম। উর্মি, উমু থেকে একেবারে উর্মি দেবী!

ওপরের শোয়ার ঘর আর নিচের এই বৈঠকখানা। মাঝখানে গোটা কয়েক সিঁড়ির মাত্র ব্যবধান।

কিন্তু উর্মিলার মনে হোত সে যেন সম্পূর্ণ এক আলাদা রাজ্যে এসে পড়েছে। পূর্ব গোলার্ধ থেকে পশ্চিম গোলার্ধে কিংবা পৃথিবী থেকে একেবারে মঙ্গল গ্রহে।

কিন্তু দাদার বন্ধুদের অমন চমৎকার চমৎকার কথার উত্তরে ঠিক পছন্দমত জবাব যেন কিছুতেই দিয়ে উঠতে পারত না সে।

নামকরা লেখকদের গল্প উপন্যাসের নায়িকার কথাগুলি মাঝে মাঝে মুখস্থ করত, কিন্তু ঠিকমত খাটাতে পারত না। ওপর থেকে বানানো সাজানো মুখস্থ করা কথা নিচে নামতে নামতে দাদার বন্ধুদের মুখোমুখি বসতে না বসতে কোথায় হারিয়ে যেত, কিছুতেই যেন তা খুঁজে পেত না উর্মিলা।

কিন্তু এটুকু দেখতে পেত, ছিঁটে ফোঁটা যা দু-একটা কথা উর্মিলা বলতে পারে, তাতেই যেন খুশি হয়ে ওঠে দাদার বন্ধুর দল।

এটুকু বুঝতে পারত উর্মিলা, দাদার বন্ধুরা কনে দেখা পরীক্ষকের চোখ নিয়ে আসেননি, এসেছেন বন্ধুর বোন দেখা চোখ নিয়ে। সে চোখ যেটুকু দেখে

তাতেই মুগ্ধ হয়, সে কান যেটুকু শোনে তাতেই খুশি হয়ে ওঠে, যেটুকু পায় তাই অপ্রত্যাশিত বলে ভাবে।

উর্মিলা ভুলে গেল তার রূপ নেই, তার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় সামান্য। বৈঠকখানায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে অনন্যা বলে মনে হতে লাগল উর্মিলার।

কিন্তু নীলকমলের বৈঠকখানায় যারা আসে তাদের প্রায়ই কায়স্থ, বৈদ্য, সাহা, সোনার বেনে। দুজন ব্রাহ্মণ অবশ্য আছে; কিন্তু তাদের একজন বিবাহিত, আর একজন মাত্র ম্যাট্রিক পাশ, ব্যাঙ্কের পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের লেজার-কীপার।

নিভাননী শুনে বললেন, 'তা'হলে লাভ কি! তা'হলে মিছামিছি আড্ডা দিতে দিস কেন মেয়েটাকে?'

উর্মিলার বাবা সারদাবাবুও একদিন ধমকে দিলেন ছেলেকে, 'কি হচ্ছে তোমাদের, তোমরাই জানো।'

নীলকমল বলল, 'কি আবার হবে! লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় যত বাড়ে ততই ভালো। আগের চেয়ে উর্মি কত স্মার্ট হয়েছে দেখেছেন? সরিৎ মুখুয্যে পর্যন্ত সেদিন ওর প্রশংসা করছিল।'

নিভাননী বলে উঠলেন, 'মুখুয্যে! ওদের মধ্যে মুখুয্যে আবার কেউ আছে নাকি?'

নীলকমল জবাব দিল, 'আছে। ওই যে সেদিন সবচেয়ে দক্ষিণের চেয়ারটায় বসে কথা বলছিল, ওরই নাম সরিৎ মুখুয্যে। চমৎকার কবিতা লেখে!'

নিভাননী মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'তাহলেই হয়েছে! বিদ্যাবুদ্ধি, চাল-চুলো সব বুঝতে পারছি।'

নীলকমলও কবিতা লেখে। মুখ বাঁকাবার হেতু ছিল নিভাননীর।

নীলকমল প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'তাহলেই হয়েছে? মানে তুমি ভেবেছ কবিতা যারা লেখে তারাই অপদার্থ, না? কিন্তু আমার বন্ধুদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি পদার্থবান সরিৎ। 'তোমরা যে অর্থে পদার্থবান বল, সেই অর্থেই। পড়াশুনাতে ভালো। ইংরাজীতে ফার্স্ট ক্লাস।'

'নিভাননী বললেন, 'চাকরি-বাকরি কি করে?'

নীলকমল বলল, 'চাকরি একটা অবশ্য করে। ইংরাজী খবরের কাগজের অফিসে।'

নিভাননী বললেন, 'মাইনে কত পায়?'

নীলকমল হাসল, 'জিজ্ঞাসা করিনি। শ'দুয়েক টাকা পায় নিশ্চয়ই। 'কিন্তু মাইনে দিয়ে করবে কি? চাকরি তো টাকার জন্য করে না, শখের জন্য করে। চাকরির তো দরকার নেই ওর। বড়লোকের ছেলে। বড়বাজারে নিজেদের হার্ডওয়ারের বিজনেস—মানে লোহা-লক্কড়ের কারবার আছে।'

নিভাননী আর একবার নৈরাশ্যের ভঙ্গি করলেন, 'তাহলে এখানে ওর যাতায়াত না করাই ভালো। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গিয়ে তো আর লাভ নেই! হ্যাঁ, যদি আমার লীলা-শীলার বেলায় আসত তাহলেও না হয়—'

উর্মিলার দুই দিদি লীলা আর শীলা নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হলেও বড়লোকের মেয়ের মতই সুন্দরী।

আড়াল থেকে মা আর দাদার আলাপ শুনে মনে মনে আর একবার আহত হোল উর্মিলা। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ল দাদার অন্যান্য বন্ধুদের মত সরিৎবাবুও তার দিকে দু' তিনবার আড়চোখে তাকিয়েছিলেন। উর্মিলার সঙ্গে আলাপ করবার ঔৎসুক্য তাঁর চোখে দেখা গিয়েছে।

নিজে দেখতে ভালো না হলে হবে কি, কে কি দেখে, কে কি দেখতে চায়, তা তো দাদার বন্ধু-সংসর্গে এসে উর্মিলা ভালো করেই বুঝতে পেরেছে।

দাদাকে নিরালায় পেয়ে উর্মিলা তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কথাটা কি তুমি মাকে ভুলাবার জন্য বানিয়ে বললে দাদা?'

নীলকমল অবাক হয়ে বলল, 'কোন কথাটা?'

এবার একটু আরক্ত হোল উর্মিলা, আমতা আমতা ক'রে বলল, 'মানে—ওই যে—মানে তুমি তখন বললে না, সরিৎবাবু আমার প্রশংসা করেছেন। যত সব বাজে কথা!'

নীলকমল বলল, 'না রে না, বাজে কথা নয়! সরিৎ কথা কম বলে বটে, কিন্তু একটাও বাজে কথা বলে না, মুখে আর কলমে সমান ওর ধার।'

উর্মিলা বলল, 'কিন্তু আমার সম্বন্ধে কি বলছিলেন? আমার মত মেয়ের কী প্রশংসা উনি করবেন? আমার সম্বন্ধে কখনই বা কথা উঠল?'

নীলকমল বলল, 'যখন ট্রাম লাইন পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিয়ে এলাম তখন।'

কি কথোপকথন হয়েছিল তখন দুই বন্ধুর মধ্যে নীলকমল তার প্রায় বিস্তৃত বিবরণ দিল উর্মিলাকে।

সরিৎ বলেছিল, 'অনেকে কলমে ছবি আঁকতে চান, বাক্যকে চিত্রবাক্য ক'রে তোলেন। কিন্তু কলমের কাজ আর তুলির কাজ তো এক নয়।'

কলম দিয়ে ছবি আঁকতে পারে না সরিৎ, চায়ওনা। কিন্তু তুলি ধরতে একেক সময় ইচ্ছা করে ওর, ইচ্ছা করে ছবি আঁকতে।

নীলকমল হেসে জবাব দিয়েছিল, 'ব্যাঙের মত একেকটি যা অক্ষর তোমার হাতের, তাতে তুলি হাতে নিলে অতি অপূর্ব ছবিই তুমি আঁকতে! একটা লাইন সোজা ক'রে টানতে পার না' তার আবার—'

সরিৎ বলেছিল, 'কিন্তু বাঁকা ক'রে তো পারি। সেও বুঝি কম কৃতিত্বের কথা। আমি তুলি ধরলে তোমাদের নদী, পর্বত, ফুল পরীর ছবি আঁকতাম বুঝি ভেবেছ? ব্যাঙের ছবিই আকতাম। এই যে খানিক আগে গালে হাত দিয়ে একটি মেয়ে তন্ময় হয়ে বসেছিলেন, এঁকে তুলতাম তাঁর ছবি।'

উর্মিলা মুখ ভার করল, 'তোমার বন্ধু বুঝি ব্যাঙের সঙ্গে আমার তুলনা দিলেন দাদা?'

নীলকমল বলল, 'দুর পাগলী, ঠিক তুলনা দেওয়া বলে না ওকে। তা ছাড়া ব্যাঙ তো তার চোখে শুধু ব্যাঙ নয়।'

'তবে কি?'

নীলকমল সরিতের কথা উদ্ধৃত করে বলেছিল, 'রূপের আর এক বিচিত্র প্রকাশ। সরিৎ বলে, সাধারণ লোকে রূপ দেখে আর পাঁচজনের ধার করা চোখ নিয়ে। কিন্তু শিল্পীর রূপদর্শন আর এক জিনিস। কিন্তু শিল্পী রূপ দেখেনা, কুরূপ দেখেনা, বস্তু কি ব্যক্তির স্বরূপ দেখে। সব মেয়ের মধ্যে এই স্বরূপ ফোটে না। বেশির ভাগ মেয়েই আশে পাশের আর পাঁচজন মেয়ের অনুকরণ করে, একই ঢংএ কাপড় পরে, চুল বাঁধে, ক্রীমে, পাউডারে, লিপস্টিকে মেকআপ করে, আর কিছু করতে পারে না। সাধারণ পুরুষ যেমন চোখ ধার করে, সাধারণ মেয়েরা তেমনি রূপ ধার করে। দু' একজনের ব্যতিক্রম ভাগ্যে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।'

শুনতে শুনতে রোমাঞ্চ হয়েছিল উর্মিলার। দাদাকে আর একবার জিজ্ঞাসা ক'রে সরিতের কথাগুলি সে তাড়াতাড়ি একটা খাতায় টুকে নিয়েছিল। এক পিঠে জ্যামিতির সচিত্র উপপাদ্য মুখস্থ লেখা, আর এক পিঠে এই সব লেখা। ভারি শক্ত, ভারি দুর্বোধ্য কথাগুলি, কিন্তু জ্যামিতির উপপাদ্যের চাইতে কঠিন নয়। কিছু যেন বোঝা যায়, এই কথাগুলির সঙ্গে কিছু কিছু যেন মিল আছে নিজের মনের কথার।

লিখতে লিখতে উর্মিলার মনে হয়েছিল—সে এই সব কথা বুঝবার জন্যই সংসারে এসেছে, জ্যামিতির উপপাদ্য লিখতে আসেনি, মুখস্থ করতে আসেনি সংস্কৃত শব্দরূপ।

উর্মিলা নিজের অদৃষ্টকে সেদিন মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছিল। কি ভাগ্য যে পাউডারের কৌটো থেকে সেদিন পাউডার ফুরিয়ে গিয়েছিল। কি ভাগ্য যে ধোপা বাড়ি থেকে ধানী রঙের দামী শাড়িখানা সেদিন এসে পৌঁছোয়নি। তাইতো বিনা মেকআপে, সাধারণ আটপৌরে খয়েরী পেড়ে শাড়িখানা পরেই সেদিন বৈঠকখানায় নেমেছিল উর্মিলা।

শরীরটা ভাল ছিল না বলে বিনুনী করে খোঁপা বাঁধেনি, বড় এলোচুলের খোঁপা ঘাড়ের ওপর নুয়ে পড়েছিল। শরীরটা জ্বর জ্বর লাগছিল বলে ক্লান্তিতে এক সময় গালে হাত দিয়ে বসেছিল উর্মিলা। নইলে তো এমন ক'রে সরিৎবাবুর চোখে পড়ত না।

সাধারণ মেয়েদের মত সাজসজ্জা করেই নিচে নামত, আর সরিৎবাবু একবার তাকিয়েই তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতেন। জ্বর অবশ্য রোজ রোজ আসবে না, কিন্তু ইচ্ছা করলেই নিজের বেশবাসকে আটপৌরে ঘরোয়া ধরনের করে নিতে পারে উর্মিলা। নিজের রুচির বদলে, পাঁচজনের রুচির বদলে, সাজতে পারে একজনের রুচিতে।

উর্মিলা লক্ষ্য করে দেখল সরিৎবাবু নিজেও সাদা-সিধে ধরনটাই পছন্দ করেন। ছেলে বড়লোকের হলে হবে কি, চাল বড়লোকের নয়। চশমায় সোনার ফ্রেমের বদলে গাটাপারচারের ফ্রেম, গায়ে সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবী, বোতামগুলি সোনার নয়, ঝিনুকেরই। পরনে মিলের সাধারণ ধুতি, পায়ে কোনদিন স্যাণ্ডেল, কোনদিন শিরতোলা চটি, কোনদিন বা সাধারণ দামের সু।

নীলকমলের অন্য যে কোন বন্ধুর এর চেয়ে বেশি আড়ম্বর আছে সাজসজ্জায়। না, কোন আড়ম্বর নেই সরিৎবাবুর মধ্যে।

নীলকমলের আর এক বন্ধু সুরেন বৈঠকখানায় বসে অনবরত পাইপ টানে, আর এক বন্ধু পান আর নস্যের ভক্ত, আর এক বন্ধু শিশিরের মুহূর্তে মুহূর্তে চা চাই, কিন্তু সরিতের কিছুই যেন চাই না।

অবশ্য গোঁড়ামি নেই। পীড়াপীড়ি করলে খান সবই। সিগারেটও খান, চাও খান দু'এক কাপ, কেবল পান আর নস্যি পছন্দ করেন না।

তাতে উর্মিলাও ভারি খুশি। পান মেয়েরা খেয়ে ঠোঁট লাল করবে, পুরুষ খাবে কেন? আর নস্যি টানাটা দেখতে খারাপ। নাক দিয়ে নেশা করাটা বীভৎস।

সরিতের ধরন-ধারণ দেখে নিভাননীরও ভরসা হোল।

সরিতের বাপ নেই। কাকা আছেন, কিন্তু পৃথগন্নে। কারবারটাই কেবল একসঙ্গে আছে, কিন্তু মতামতে, চালচলনে, কাকার সঙ্গে মোটেই মিল নেই সরিতের।

ওর নিজের রুচি, নিজের পছন্দ, নিজের মতামতের ওপরই সব নির্ভর করে।

মা আছেন বটে কিন্তু সাবালক, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ছেলের মা তো কেবল নামমাত্র অভিভাবিকা। ছেলে কি ভাবে, কি চায়, তা তিনি কতটুকু জানেন, কতটুকু বোঝেন?

আর পুরুষ ছেলে যে কি চায়, কখন কি পছন্দ করে তা কি কেউ ঠিক ক'রে বলতে পারে?

সুন্দর কুৎসিতে কিছু যায়না, কোন বাধা হয় না ধনী দরিদ্রে। কথায় বলে, 'যার সাথে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।'

নিভাননীরা তো হাড়ি ডোম নন, কুলীন বামুন। আর উর্মিলাই বা এমন কি ফেলনা! অমন হাঁটু অবধি চুল আজকাল ক'জন মেয়ের মাথায় থাকে, অমন বাঁকান যুগল ভ্রূ ক'টি মেয়ের চোখের ওপর দেখা যায়, কটি মেয়েকে হাসলে সুন্দর দেখায় অমন!

তা ছাড়া, ঘর-গৃহস্থালীর সব কাজ জানে উর্মিলা, লেখাপড়াও ওর দিদিদের চাইতে অনেকগুণ বেশি শিখেছে, সেলাই টেলাইও মোটামুটি জানে। রেকর্ড রেডিয়ো, থেকে একবার শুনলেই ধরতে পারে গানের সুর, নকল করতে পারে সঙ্গে সঙ্গে।

তিন মেয়ের মধ্যে সব চেয়ে মিষ্টি গলা উর্মিলার, সব চেয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। রঙ কালো বলেই যে সরিতের মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র ছেলে তাকে অপছন্দ করবে, তারই বা কি মানে আছে? সরিতের একেবারে অযোগ্যই বা হবে কেন উর্মিলা?

এসব জল্পনা কল্পনা ছেলের সঙ্গে করতেন নিভাননী, করতেন স্বামীর সঙ্গে। আর আড়াল থেকে কান পেতে উর্মিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনত।

মায়ের কথায় তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি শুনত নিজের মনে। সবদিন যে আড়ালে বলতেন তা নয়, সামনেও বলতেন।

'সরিৎ সেদিন তোর কোন গানটার যেন প্রশংসা করছিল উর্মি? কি যেন 'মন যে বলে চিনি চিনি—' কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত তোমাদের গানের পদ বাপু, মনেও থাকে না। কি যেন বাকি কথাটুকু—'

বাকি কথাটুকু আর পূরণ করত না উর্মিলা, মুখ টিপে টিপে হাসত।

নিভাননী কোনদিন বলতেন, 'আচ্ছা, বালিসের ঢাকনি তো সব চেয়ে সুন্দর হয় তোর হাতে। খদ্দরের কাপড়ের একটা ফুল তোলা ঢাকনি দে না ওকে।'

উর্মিলা ধমক দিত, 'কি যে বল, ঢাকনির বুঝি ওঁর অভাব আছে। তা ছাড়া আমার ভারি দায় পড়েছে পরকে ঢাকনি বিলাতে। বলে কত কষ্ট করে করেছি নিজে।'

নিভাননী মুখ টিপে হাসতেন, কোন জবাব দিতেন না।

একদিন সত্যনারায়ণের পুজো উপলক্ষে, আর একদিন সাবিত্রী ব্রত উদ্‌যাপনে নিভাননী নিমন্ত্রণ করলেন সরিৎকে। সরিৎ দু'দিনই এল।

ঘরের ছেলের মতই ধরন-ধারণ। কাঁঠালের পিঁড়িতে খেতে দিয়েছিলেন নীলকমলকে, সরিৎ দিয়েছিলেন ফুলতোলা আসনে।

সরিৎ বলেছিলেন, 'আবার আসন কেন মাসীমা। নিজের ছেলে আর বোনের ছেলে বলে বুঝি ওই আলাদা ব্যবস্থা?'

নিভাননী বলেছিলেন, 'তা নয়। নীলু বড় নোংরা। আসনে বসে ও খেতে জানে না। ছোট ছেলেদের মতই ও এঁটো করে ফেলে।'

সরিৎ হেসেছিল, 'আমাকে নিয়ে বুঝি আর সে ভয় নেই।'

তারপর কথায় কথায় নিভাননী জানিয়ে দিয়েছিলেন, আসনখানা উর্মিলারই নিজের হাতের তৈরী।

সরিৎ জবাব দিয়েছিল, 'তা জানি মাসীমা। কেবল আসনই নয়, থালার ভাত, চার পাশের বাটিগুলির মাছ-তরকারী সবই যে উর্মিলা দেবীর নিজের হাতের তা খেলেই বোঝা যায়, বলে দেওয়ার দরকার হয় না।'

নিভাননী বোধ হয় একটু লজ্জিত হয়েই মুখ ফিরিয়েছিলেন।—'যত শান্তশিষ্টই দেখা যাক, আজকালকারই তো ছেলে, অত লজ্জা সরমের ধার বেশী ধারতে পারে না।

উর্মিলা জবাব দিয়েছিল, 'সেই জন্যই বুঝি তাদের হয়ে সেকালের মা-মাসীদের একটু বেশি লজ্জা সরমের ধার ধারতে হয়?'

নিভাননী বলেছিলেন, 'মুখপুড়ী কোথাকার। এরই মধ্যে কথাবার্তায় একেবারে সরিতের শিষ্য হয়েছিস!'

কিন্তু উর্মিলাদেবী সম্বোধনে নিভাননী সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করেছিলেন।

'ও আবার কি কথা সরিৎ। অতটুকু মেয়ে তা আবার দেবী দেবী করছ কেন। শুধু নাম ধরে ডাকলেই তো ভালো শোনায়।'

আশ্চর্য, কি ক'রে মেয়ের মনের কথা একেবারেই অক্ষরে অক্ষরে বলতে পারেন মা। শেষ ছত্রটি উর্মিলাও ওই ভাবাতেই বলত।

নীলকমলও প্রতিবাদ করেছিল,

'সত্যি সরিৎ, ওসব দেবী-টেবী ছাড়। তোমাদের মুখে দেবী দেবী শুনলেই আমার মনে হয় যাত্রা থিয়েটারের অভিনয় শুনছি।'

তারপর বাংলা ভাষায় অনাত্মীয়া মেয়েদের সম্বোধন সমস্যা নিয়ে তর্ক উঠেছিল দুই বন্ধুর মধ্যে।

সরিৎ বলেছিল বিলাতী অনেক শব্দই তো বাংলা ভাষায় এঁটে বসেছে, মিস, মিসেসেরই বা অনুবাদের কি দরকার।

এবার উর্মিলা কথা বলেছিল, 'তবে যে নিজেই দেবী দেবী করছিলেন।'

সরিৎ জবাব দিয়েছিল, 'ইলিসের মাথায় আর কচুর শাকে মুড়িঘণ্ট খেতে খেতে দেবী কথাটাই মনে আসে, মিস মুখে আসে না। সে যখন রেস্টুরেন্টে বসে চপ কাটলেট খাব, তখন বলব। আপনার কি হতে ভালো লাগে, দেবী না মিস্?'

খানিক আগে দুধের বাটি আনতে উঠে গিয়েছিলেন নিভাননী।

উর্মিলা একবার রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে জবাব দিয়েছিল, 'দেবীও নয়, মিসও নয়, যা আছি, তাই আমি থাকতে চাই।'

দাদা পাশেই বসেছিল। কিন্তু সেজন্য তেমন কোন সংকোচ বোধ করেনি উর্মিলা।

দাদা তো তখন কেবল আর দাদাই নয়! সরিতের বন্ধু, সেই সম্পর্কে উর্মিলারও।

উর্মিলা বলেছিল, 'এত জিনিসের মধ্যে কেবল কচু শাকের মুড়িঘণ্টের কথাই আপনার মনে হলো যে, গলা ধরেছে নাকি ?'

সরিৎ হেসে মাথা নেড়েছিল, 'আমি কি ঝগড়াটে মানুষ যে কচু খেয়ে গলা ধরবে। সত্যি, এমন চমৎকার ঘণ্ট আর কোন দিন খাই নি। ভারি নতুন লাগল জিনিসটা। হাজার চেষ্টা করলেও আমাদের মদন ঠাকুর এমন ঘণ্ট করতে পারবে না।'

তারপর অবশ্য কেবল উর্মিলার হাতের ঘণ্টই নয়, তার হাতের আরো অনেক জিনিসের প্রশংসা করেছিল সরিৎ। হারমোনিয়মের রীড টেপার সময় বেশ দেখায় উর্মিলার লম্বা লম্বা আঙুলগুলি, সোয়েটারে যখন আনারসের প্যাটার্ণ তোলে, তখনো ছন্দোবদ্ধভাবে উর্মিলার আঙুলগুলি নড়তে থাকে। দশটা আঙুল তো নয়, যেন কবিতার দশটি পংক্তি।

একদিন নীলকমল সরিৎকে বলল, 'তুমি একটু বুঝিয়ে বল দেখি উমুকে। মাস কয়েক মন দিয়ে পড়াশুনো ক'রে দিয়ে দিক ম্যাট্রিকটা। কেবল দিই দিই করছে, কিন্তু কিছুতেই আর দিয়ে উঠতে পারল না।'

সরিৎ বলল, 'নাইবা দিল। তাতে এমন কি ক্ষতি হবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের।'

সাহস পেয়ে উর্মিলা বলল, 'দেখুন দেখি ; ছোট ছোট মেয়েদের মত ওই সব ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ, জ্যামিতি মুখস্থ করবার বয়স আছে নাকি আমার ? মোটেই ভালো লাগে না পড়তে। যখন ওসব নিয়ে বসি, কেমন যেন ছেলেমানুষী ছেলেমানুষী লাগে। মনে হয় এম. এ, পরীক্ষা দেওয়ার বয়সে ম্যাট্রিক দিতে যাচ্ছি।'

নীলকমল ধমক দিয়েছিল, 'কি রকম ইঁচড়ে পেকে গেছে তাই দেখ! যে পরীক্ষায় আমি পঁচিশ বছর বয়সে হাজির হয়েছি উমু নাকি তা উনিশে দেবে।'

সরিৎ জবাব দিয়েছিল, 'তা দিতে পারে বই কি! উনিশ তো ভালো, আগে

আগে ন' বছর বয়সেই জ্ঞানে বুদ্ধিতে পঁচিশ বছরের পুরুষের সমান হোত মেয়েরা। আজকাল উনিশে ছাড়িয়ে যেতে না পারলেও সমানই থাকে, নিচে থাকে না। ক্লাসগুলি অবশ্য পাঠশালার নয়, সংসারশালার।'

উমুকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবেও সরিৎ মাথা নেড়েছিল।

'দেখ নীলু, সংসারে দুটো জিনিস আমার দ্বারা কোন কালেই হবে না, মাষ্টারী আর পুলিসী। তার চেয়ে চল, বরং একদিন সিনেমায় যাওয়া যাক। পড়াশুনোর চাইতে দেখাশোনায় কম শিক্ষা হয় না।'

তারপর দাদা আর তার বন্ধুর সঙ্গে উর্মিলা একদিন মেট্রোতে ছবি দেখতে গিয়েছিল। ইংরেজী বই দেখা তার সেই প্রথম। কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারেনি।

কিন্তু নীলকমল সিগারেট কিনতে বেরিয়ে গেলে সরিৎ যখন তার হাতখানা নিজের মুঠির মধ্যে চেপে ধরেছিল, তখন কিছুই তার আর বুঝতে বাকি থাকেনি।

সম্পর্কে দাদা হলেও নীলকমল একেবারে অবুঝ নয়। সিগারেট কিনে ফিরতে বেশ একটু দেরিই হয়েছিল তার।

কিন্তু তারপর কেউ আর বেশি দেরি করতে চাইলেন না। না দাদা, না বাবা, না মা। আর দেরি করবার ইচ্ছা উর্মিলার নিজেরই কি ছিল?

উর্মিলার বুঝতে বাকি ছিল না খদ্দরে মোড়া মানুষটি দেখতে শুনতে যেমন শান্ত, ভিতরে ভিতরে তেমনি তার দুরন্ততার অবধি নেই।

অপেক্ষা বোধ হয় সেও আর করতে পারে না, সেও আর করতে চায় না।

তবু সেই সিনেমা দেখার মাস দুই বাদেও সরিৎ যখন নিজে মুখ ফুটে কিছু বলল না, অথচ তিনজনে মিলে আরো একদিন সিনেমা দেখল, আর একদিন বেড়িয়ে এল শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে, তখন উর্মিলার মা বললেন, 'এবার কথাবার্তা বলতে হয়, ঠিক ক'রে ফেলতে হয় দিনক্ষণ। পাড়ার পাঁচজনে পাঁচকথা জিজ্ঞাসা করছে।'

কিন্তু কে সুরু করবে কথা?

নিভাননী স্বামীকে বললেন, 'তুমি তো কর্তা, তুমিই একবার বলে দেখ না সরিৎকে। কি মাসে ওর কাজ করবার ইচ্ছা।'

সারদাবাবু মাথা নাড়লেন, 'আমি ও সবের মধ্যে নেই। নিজেরা ঘটকালী করেছ, নিজেরাই জিজ্ঞাসাবাদ করো।'

নিভাননী ছেলেকে বললেন, 'আমারও কেমন যেন একটু লজ্জা লজ্জা করে। তোর বন্ধুকে তুই-ই জিজ্ঞেস কর না!'

নীলকমল বলল, 'আর কারো দরকার কি? উর্মি নিজে বললেই তো ভালো হয় সব চেয়ে।'

আড়ালে দাদাকে ডেকে উর্মিলা বলল, 'আমি কিন্তু কিছু বলতে টলতে পারব না দাদা।'

বোনের আনত লজ্জিত মুখের দিকে তাকিয়ে নীলকমল মুখ টিপে একটু হাসল, তারপর বলল, 'আচ্ছা, আমিই না হয় সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। খুব তো বাহাদুরী করছিলি সেদিন। অনেক বিদ্যা হয়েছে, জ্যামিতি, ব্যাকরণ পড়বার আর বয়স নেই।'

উর্মিলা বলল, 'মাফ করো দাদা। সে সব কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। তুমি যা বলবে তাই করব। শব্দরূপ মুখস্থ করতে আপত্তি করব না।'

নীলকমল বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, শব্দরূপ এবার বিডন স্ট্রীটে গিয়ে মুখস্থ করিস। এই আনন্দ খাঁ লেনের অন্ধকার বাড়িতে মুখস্থ টুকস্থ আর হবে না।'

বিডন স্ট্রীটে সরিৎদের বাড়ি। দু' তিন দিন আসেনি সরিৎ। শরীর নাকি খারাপ।

নীলকমল নিজেই গেল খোঁজ নিতে। গিয়ে দেখল, দোতলার লাইব্রেরী ঘরে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে সরিৎ আধুনিক ইংরেজী কবিতার সংকলন পড়ছে।

নীলকমল একটু অবাক হয়ে গেল, 'শরীর খারাপ শুনেছিলাম তোমার।'

সরিৎ একটু হাসল, 'একেবারে বিছানায় শুয়ে না পড়লে বুঝি খারাপ হতে পারে না।'

নীলকমল বলল, 'যাচ্ছ না কদিন ধ'রে। মা বলছিলেন তোমার কথা। উর্মিও—'

সরিৎ একটুকাল চুপ ক'রে রইল, তারপর বলল, 'একটা কথা কদিন ধ'রেই তোমাকে বলব ভাবছি নীলু।'

নীলকমল উৎসাহিত হয়ে উঠল।

বলুক, সরিৎ নিজেই বলুক। ও বললেই ভালো হয় সব চেয়ে।

সরিৎ বই বন্ধ ক'রে বলল, 'আমার কিছুকাল ওদিকে না যাওয়াই ভালো—নীলু।'

নীলকমল চমকে উঠে বলল, 'তার মানে?'

সরিৎ বলল, 'জানো তো মেয়েদের মন? আর জানো তো তোমার সব বন্ধু আর পাড়াপড়শীর মুখ? এরই মধ্যে মুখে মুখে নানা কথা ছড়াতে শুরু হয়েছে।'

নীলকমলই এ কথাগুলি বলবে ভেবেছিল। কিন্তু সরিৎ আগেই বলে ফেলল।

নীলকমল বলল, 'যাতে আর না ছড়ায় সে ব্যবস্থা তো আমরা যে কোন সময়ে করতে পারি।'

সরিৎ বলল, 'তাইতো করছি, যাতায়াত বন্ধ রাখলেই তোমার বন্ধুদের উৎসাহ কমে আসবে। ইতিমধ্যে উমুর একটা সম্বন্ধ টম্বন্ধ—'

নীলকমল বলল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ সরিৎ?'

সরিৎ ঘাড় নাড়ল, 'ঠাট্টা? এর মধ্যে ঠাট্টার কথা কি উঠল? উমুকে আমরা দুজনেই স্নেহ করি। ওর মঙ্গলামঙ্গল কারো কাছেই হাসি ঠাট্টার বস্তু নয়।'

নীলকমল এবার যেন আশ্বস্ত হোল, 'তাহলে তোমার মত আছে বিয়েতে? তুমি ওকে বিয়ে করছ?'

সরিৎ যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'আমি! 'তুমি বলছ কি নীলু। শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্ব থেকে কুটুম্বিতা! না ভাই, ওসব আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

নীলকমল রূঢ়কণ্ঠে বলল, 'সম্ভব নয়! বন্ধু হয়ে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের এমন সর্বনাশ করলে!'

সরিৎ কেস থেকে সিগারেট বের ক'রে একটা দিল বন্ধুর হাতে, আর একটা নিজে ধরাল।

তারপর বলল, 'তোমার অতখানি বিচলিত হবার কোন কারণ নেই নীলু। ইচ্ছা করলে তুমি উমুকেও সব জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পার।'

নীলকমল সে কথায় কান দিল না।

উত্তেজিত স্বরে নীলকমল বলল, 'ঠাণ্ডা মাথায় তুমি যে এমন শয়তানি করবে আমাদের সঙ্গে—'

সরিৎ একটু হাসল, 'এতদিন তোমাদের মাথাও ঠাণ্ডা ছিল! আজ কেবল

গরম হয়েছে। ফের যখন ঠাণ্ডা হবে তখন ভেবে দেখ, তোমরা যা চাইছ তা কিছুতেই সম্ভব নয়।'

নীলকমল মুখ কালো ক'রে বলল, 'আচ্ছা, কথাগুলি মনে রেখ।'

সরিৎ বলল, 'রাখব বই কি! নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলেও পুরোন সম্পর্ক তো আমাদের রইলই।'

বাড়িতে ফিরে এসে সব কথাই খুলে বলেছিল নীলকমল। কিছুই গোপন করেনি।

উর্মিলা নিজের ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করেছিল।

সারদাবাবু খবরের কাগজে মুখ ঢেকে সংক্ষেপে মন্তব্য করেছিলেন, 'যা ইচ্ছা কর তোমাদের, আমি কিছুর মধ্যে নেই। এমন যে হবে, তা আমি আগেই জানতুম।'

নিভাননী বলে উঠলেন, 'ঢং করো না। জানতেই যদি—বাধা দাওনি কেন?'

সারদাবাবু তেমনি নিরুত্তেজ গলায় জবাব দিলেন, 'বাধা দিতে গেলে কি কেউ শুনতে? আমার কোন কথাটা তোমরা শোন? টাকা জোগাবার কল ছাড়া আর কি মনে কর তোমরা আমাকে?'

নিভাননী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'ঈস, কেবল টাকা. টাকা, টাকা! কত টাকা রোজগার করছ শুনি? টাকা দিয়ে একেবারে ঢেকে রেখেছ সংসার, না?'

তারপর ছেলের দিকে ফিরে বললেন, 'খবরদার! ফের যদি তোর কোন বন্ধু এসে আমার বৈঠকখানায় আড্ডা দেয়, আর ফের যদি উর্মিলা পা বাড়ায় নিচের ঘরে, আমি—' তারপর হঠাৎ যেন কোন কথা খুঁজে পেলেন না নিভাননী, বললেন, 'আমি তোদের জ্বালায় আত্মহত্যা ক'রে মরব!'

দোর দেওয়া ছোট ঘরটুকুর মধ্যে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে উর্মিলারও আত্ম-হত্যার কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু দাদার ঠেলাঠেলিতে দোর শেষ পর্যন্ত খুলতে হ'ল উর্মিলাকে।

নীলকমল তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে অপরাধীর স্বরে বলল, 'তোর কোন দোষ নেই উমু। সব দোষ আমার। আমিই বুঝতে পারিনি, আমিই চিনতে পারিনি সরিৎকে। কিন্তু শোধ আমি এর নেবই।'

উর্মিলা কোন কথা বলল না। ভিজে বালিশের মধ্যে তেমনি চুপ ক'রে রইল।

চুপ ক'রে বেশিদিন থাকতে পারলেন না নিভাননী। মেয়েকে বলে বলে হয়রান হয়ে তিনি নিজে সরিৎকে একখানা চিঠি লিখলেন। জবাব না দেওয়ায় গোপনে গোপনে একবার সাক্ষাতের চেষ্টাও করলেন।

সরিৎ কিছুতেই আর তাঁর সামনে এলো না।

তবু নিভাননী নিশ্চেষ্ট রইলেন না। স্বামীকে গিয়ে বললেন, 'হাত পা গুটিয়ে অমন চুপচাপ বসেই থাকবে নাকি সারাদিন ?'

সারদাবাবু বললেন, 'সারাদিন আমি বুঝি বসেই থাকি ?'

নিভাননী বললেন, 'তা ছাড়া কি। ট্রাম বাসে বসে বসে যাও, আপিসে গিয়ে ফ্যানের নিচে বস, তারপর বাড়িতে ফিরে এসে একেবারে টান টান হয়ে পড়। কিন্তু মেয়ের ওপর তোমার কি কোন কর্তব্য নেই ?'

সারদাবাবু মৃদু হাসলেন, 'তোমাদের কর্তব্য বুঝি শেষ হলো এতদিনে ?'

তারপর খবরের কাগজের পাত্রপাত্রীর স্তম্ভের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, 'সব কর্তব্য তো টাকার সঙ্গে। তার একটা ব্যবস্থা না করে ছট্‌ফট্‌ ক'রে লাভ কি ? আগের দুই মেয়ের দেনাই তো এখনো সব শোধ হয়নি।'

নিভাননী বললেন, 'তোমার মুখে তো টাকার খোঁচা ছাড়া কথা নেই। পুরুষ হয়ে সংসারে যেন কেবল তুমিই টাকা রোজগার ক'রে ছেলেমেয়ে পরিবারকে খাইয়েছ, আর কেউ তা কোনদিন করেনি। বেশ, উমুর বিয়ের কথা তোমাকে আমি আর কোনদিন বলতে যাবনা। তোমার যা ইচ্ছে হয় করো।'

স্বামীর কাছ থেকে ছেলের কাছে গেলেন নিভাননী।

বললেন, 'সরিতের অপমানটা এমন চুপচাপ সহ্য করবি ? কোন প্রতিকার করবি না ?'

সরিতের বাড়ি থেকে সেদিন মেজাজ গরম ক'রে ফিরে এলেও বিষয়টা পরে নীলকমল ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেছে। অন্যান্য বন্ধুদের উস্কানি সত্ত্বেও এ নিয়ে হৈ চৈ করাটা যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, তা বুঝতে বাকী ছিল না নীলকমলের।

আপাতত সরিতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখাই ভালো। পরে নিজে সবল হয়ে সুযোগ সুবিধামত শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে তোলা যাবে।

এখন এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে, নিজেদের ঘরের কথা, নিজের

বোনের দুর্বলতার কথাটাই বেশি ছড়িয়ে পড়বে। সরিতের তেতলা বাড়ির ঘরের দিকে তাকিয়ে থুথু ছিটাতে গেলে তা নিজেদেরই গায়ে এসে লাগবে।

নিভাননী বললেন—'তুই আর আমাকে জালাসনে নীলু। বিয়ে দেব আমরা। তাতে ওর আবার একটা মতামত কিসের? ছেলে কানাখোঁড়া, অকাট মূর্খ কিছু একটা না হয়, মোটামুটি ভদ্রলোকের ছেলের মত হয় দেখতে শুনতে, সংসার চালাবার মত চাকরি বাকরি যাহোক কিছু করে, তা'হলেই হলো। আর বেশি বাছাবাছিতে কাজ নেই আমার, আর উঁচু নজরে দরকার নেই, ঢের শিক্ষা হয়ে গেছে।'

নীলকমল বলল, 'তা তো হলো। কিন্তু টাকা? যেমন তেমন ক'রে বিয়ে দিতে গেলেও তো অন্তত হাজার দুই আড়াইর কমে হবে না বিয়ে।'

নিভাননী বললেন, 'নাই বা হলো, তোর মত এম, এ, পাশ একজন ছেলের পক্ষে আড়াই হাজার টাকা যোগাড় করা খুব কঠিন নাকি? কম ক'রে হোলেও হাজার খানেক টাকা পণ তো তুইও যে-কোন মেয়েকে বিয়ে করলেই পাস।'

নীলকমল বলল, 'আমি বিয়ে করব। তুমি বল কি, মা?'

নিভাননী বললেন, 'করবিই তো। না করলে বোনের বিয়ে দিবি কি ক'রে? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, যেমন করেই হোক তিন মাসের মধ্যে উমুর বিয়ে আমি দেবই। সরিৎকে দেখাব, সে ছাড়াও ছেলে আছে বাংলাদেশে। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা আমি তোর ভরসাতেই করেছি নীলু। কেবল মেয়েই তো নয়, ছেলেও তো পেটে ধরেছি আমি, না কি ধরিনি?'

নিভাননী দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন ছেলের। চোখ দুটো তাঁর ছল ছল করে উঠল।

এমন প্রস্তাব নিভাননী আরও দু একবার দিয়েছেন। কিন্তু এমন ভাষায় নয়, এমন ভঙ্গিতে নয়, এমন উপলক্ষ্যে নয়।

নীলকমলের হৃদয় দুলে উঠল, ভাবাবেগে আর্দ্র হলো গলা।

নীলকমল বলল, 'তুমি ভেবনা মা। তোমার প্রতিজ্ঞা আমারও প্রতিজ্ঞা।'

নীলকমলের কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে বাড়ির কারোরই কোন উচ্চ ধারণা নেই। শুধু তার বাবা মা'ই নয়, কাকীমা, খুড়তুতো ভাই দুটি, নিজের বোনেরা সবাই নীলকমলকে অকর্মণ্য বলে জানে। স্কুল কলেজে ভালো পাশ করতে পারে নি নীলকমল। থেমে থেমে পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোন রকমে বেরুতে পেরেছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। চাকরিতে ঢোকা নিয়ে আবার সেই গোলমাল।

ঠিক ঢোকা নিয়ে নয়, ঢুকতে বেশি কষ্ট হয় না। লম্বায়, চওড়ায়, ফর্সা রঙে, মুখের গড়নে, নাক চোখের তীক্ষ্ণতায়, চেহারাটা বেশ সুন্দর নীলকমলের, কথাবার্তাও বেশ চটপট বলতে পারে।

ইণ্টারভিউর চৌকাঠটা বেশ সসম্মানেই পার হয়ে যায় নীলকমল। কিন্তু ভিতরে গিয়ে মন বসে না। কাজকর্ম ভাল লাগে না।

দিন কয়েক যেতে না যেতেই নীলকমল পালাই পালাই করতে থাকে। আর শেষ পর্যন্ত পালায়ও।

কোন কোন অফিস নিজে ছাড়ে, কোন কোন মালিকপক্ষ ছাড়িয়ে দেন।

কিন্তু নীলকমলের তাতে কোন ক্ষোভ নেই। একগাদা টেবিল চেয়ার আর একপাল মুখশুকনো লোকের ঘর থেকে যে সে বেরিয়ে আসতে পেরেছে তাই যেন তার পরম সৌভাগ্য। বেরোতে না পারলে চার দিকের দেওয়ালগুলি যেন তাকে পিষে মারত।

কিন্তু নীলকমলের বাবা মা ব্যাপারটাকে ঠিক সে চোখে দেখতে পারেন না। তাঁরা ছেলেকে গালাগাল দেন, নিজেদের অদৃষ্টকে দোষারোপ করেন।

নিভাননী বলেন, 'উনি চোখ বুজলে কি দশা হবে সংসারের তা ভাবলে আমার বুক কাঁপে।'

তা শুনে সারদারঞ্জন মন্তব্য করেন, 'চোখ খোলা থাকতেই যে দশা দেখছি, তাতে চোখ যত তাড়াতাড়ি বুজি ততই ভালো।'

ফলে চেষ্টা চরিত্র ক'রে আবার কোন অফিসে ঢুকে পড়তে হয় নীলকমলকে। তারপর ঢুকে আবার বেরুবার জন্য হাঁস-ফাঁস করতে থাকে। বাড়ির লোকজনেরও সে কথা বুঝতে বাকি থাকে না।

সবাই জানে নীলকমলের চাকরি হওয়া আর চাকরি যাওয়ার মধ্যে সামান্যই পার্থক্য।

এরকম অবস্থায় বিয়ের কথা মোটেই চিন্তা করেনি নীলকমল।

বিয়ে সে কোনদিন করবে না এইটাই মনে মনে ভেবে রেখেছিল, মুখেও তাই বলত।

কিন্তু নিভাননী যখন তার হাত চেপে ধরলেন, বললেন তার মুখের দিকে তাকিয়েই তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন তখন কথাটা যেন নতুন লাগল

নীলকমলের কানে। তাহলে কিছু না কিছুর জন্য সেও নির্ভরযোগ্য। কোন না কোন কাজ তাহলে সেও করতে পারে।

বিয়ে কথাটার মানেই যেন আমূল বদলে গেল। বিয়ে মানে শুধু টুকটুকে মুখ একটি বউ ঘরে নিয়ে আসা নয়, বিয়ে মানে মায়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সহায়তা করা, বন্ধুর কৃতঘ্নতার প্রতিকারে উদ্যোগী হওয়া। বিয়ে মানে যে সমাজ তাদের বিড়ম্বিত করেছে, সেই সমাজের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া, মাছের তেলে মাছ ভাজা। বিয়ের এতগুলি অর্থ আবিষ্কার ক'রে মনে মনে ভারি উৎফুল্ল হয়ে উঠল নীলকমল।

যে রঙীন মধুর লজ্জা সংকোচের পাতলা আবরণে জড়ানো ছিল বিয়ে কথাটা, যার জন্য নীলকমলের নিজেরই কুণ্ঠার শেষ ছিল না, সে আবরণ ছিঁড়ে ফেলতে পেরে নীলকমল উল্লসিত হোল।

ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি উর্মিলার কাছে সব খুলে বলল নীলকমল।

বয়সে, শিক্ষাদীক্ষায়, বিদ্যাবুদ্ধিতে উর্মিলা অনেক ছোট হলেও হঠাৎ নীলকমলের মনে হোল, ব্যর্থ প্রেমে, দুঃখে, বঞ্চনায় উর্মিলার গুরুত্ব যেন অনেক বেড়ে গেছে। উর্মিলা যেন আর শুধু ছোট বোন নয়; বন্ধু হারিয়ে বোনের মধ্যে বন্ধুকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করল নীলকমল।

অবশ্য খানিকটা বন্ধুত্ব গোড়া থেকেই ছিল।

দেখতে সুন্দরী নয় বলে উর্মিলার বিয়ে হয় না, আর ভিতরে যোগ্যতা নেই বলে নীলকমলের চাকরি থাকে না। পরিবারের সকলের কাছে, পড়াপড়শী স্বজন বন্ধুদের কাছে, দুই ভাই বোনের মর্যাদার বিশেষ তারতম্য ছিল না। কোণঠাসা ছিল দুজনেই। সেই কোণের মিল থেকে মনের মিল।

উর্মিলা দাদার ফ্লাস্ক চায়ে ভরে রাখে, হিসাব রাখে লণ্ড্রীতে দেওয়া জামা-কাপড়ের, বিছানা ঝাড়ে, ঘর গুছোয় র‍্যাক গুছোয়, টেবিল গুছোয়।

আর নীলকমল বোনকে নভেল নাটক পড়তে দেয়, সিনেমায় যায় সঙ্গে নিয়ে, সঙ্গে ক'রে দোকানে নিয়ে কোন বার পকেটের অবস্থা আর পছন্দে মিলিয়ে উর্মিলার জন্য একখানা শাড়ি কেনে, কোনদিন বা কিছু টয়লেট। গোঁড়া পরিবারের গণ্ডি ভেঙে আধুনিকতার আলো দেখতে দেয় বোনকে, আলাপ পরিচয় করিয়ে দেয় নিজের ঘনিষ্ঠ দু'চারজন বন্ধুর সঙ্গে। দু'জন পরস্পরের পরিপূরক। তারপর সম্বিৎ

যখন বঞ্চনা করল, সে লাঞ্ছনা, সে অপমান আঘাত করল দুজনেরই মনে। আরো কাছাকাছি, আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল দুই ভাই বোন।

দাদার মতলব শুনে উর্মিলা বলল, 'তোমাদের প্রতিজ্ঞার মত মনে মনে আমারও একটা প্রতিজ্ঞা কিন্তু আছে দাদা।'

নীলকমল বলল, 'কি প্রতিজ্ঞা।'

উর্মিলা বলল, 'বিয়ে কোন দিন করব না।'

নীলকমল বলল, 'নিশ্চয়ই করবি।'

'নিশ্চয়ই করব? তোমরা কি জোর ক'রে আমার বিয়ে দেবে নাকি?'

নীলকমল জবাব দিল, 'আমরা জোর ক'রে দেব না, তুই জোর ক'রে করবি। নইলে লোকে ভাববে একটা হতভাগা প্রবঞ্চকের ধ্যান করছিস তুই। বিয়ে তুই করলিনে একথা লোকে ভাববে না, মনে করবে কলঙ্কের জন্য বিয়ে তোর হোলো না, বিয়ে আমরা তোর দিতে পারলাম না। দূরে বসে মজা দেখবে সরিৎ, ফ্ল্যাটার্ড হবে। তা আমরা তাকে হতে দেব না। মজা দেখতে দেব না কাউকে, পারি তো মজা দেখাব।'

দাদার সঙ্গে ঠিক যে একমত হোল উর্মিলা, তা নয়। কিন্তু কথাগুলি বেশ উপভোগ করল।

চোখের জলে ভিজে গোটা দুনিয়া যেন স্যাঁৎসেতে হয়ে গিয়েছিল, সেখানে হঠাৎ কড়া রোদ উঠেছে। সে রোদের তাপ আছে, দাহ আছে।

দাহ আছে তবু জল বৃষ্টির চেয়ে অনেক ভালো। অনেকদিন পরে জিভে যেন নতুন ক'রে নুন-ঝালের স্বাদ লাগল উর্মিলার। ঝাঁজটা উপভোগ্য লাগল।

উর্মিলা বলল, 'বেশ, আমার বিয়ের কথা পরে। তার আগে তোমার বিয়ে দেখি।'

নীলকমল হাসল, 'আমার বিয়েটা অধিবাস, আসলে তোর বিয়েটাই বিয়ে। সে বিয়ে কেবল দেখবি না, দেখাবিও।'

উর্মিলা বলল, 'কাকে?'

নীলকমল জবাব দিল, 'সরিৎকে। নিমন্ত্রণের চিঠি দিয়ে। সেই জন্যই তো বিয়ে।'

উর্মিলা হাসল, 'বেশ। তোমার বিয়ের চিঠি দিয়েই শুরু হোক। চিঠির খসড়াটা কিন্তু আমি করব দাদা।'

নীলকমল বলল, 'করিস, কেবল খসড়া কেন, প্রেসে গিয়ে নিজের হাতে ইচ্ছা হয় তো কম্পোজ ক'রে মেসিনে ছেপেও দিতে পারিস।'

দাদার কথার ভঙ্গিতে উর্মিলা আর একবার হাসল। 'পরের প্রেসে গিয়ে আর দরকার কি? বিয়ের চিঠি ছাপাবার জন্য তার চেয়ে নিজেই ছোটখাট একটা প্রেস ক'রে দাও দাদা।'

নীলকমলও হাসল, 'দরকার হলে তাও করব।'

তারপর সত্যি সত্যিই নীলকমল প্রচার করল বন্ধুবান্ধবের কাছে, বক্স নম্বর দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিল,—সুদর্শন, এম, এ, পাশ উপার্জনক্ষম চাটুয্যে ছেলের জন্য পাত্রী চাই। যৌতুক চাই না, কিন্তু নগদ চাই পাঁচ হাজার!

বিজ্ঞপ্তিটা আরো বিশদ হোল বন্ধুদের কাছে, 'কেবল নগদ! অলঙ্কার নয় আসবাব নয়, ঘড়ি নয়, পেন নয়, শুধু টাকা চাই। মেয়ের রূপ চাইনে, কুল চাইনে, বয়স চাইনে। মেয়ে কালো হোক, কুৎসিত হোক, কানা হোক, খোঁড়া হোক কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু টাকায় সব ক্ষতিপূরণ ক'রে দিতে হবে।'

বন্ধুরা অবাক হয়ে গেল। কেউ কেউ বলল, 'ব্যাপার কি! যুদ্ধের বাজারে তুমিও কি ব্যবসায়ে নামলে নাকি নীলকমল?'

নীলকমল বলল, 'ব্যবসাই বটে। কিন্তু কেবল বিয়ের ব্যবসা।'

কাগজের অফিস থেকে মোটা মোটা এনভেলপ আসতে লাগল নীলকমলের নামে। পাত্রীর রূপগুণের, বিদ্যাবুদ্ধির বর্ণনা, চেহারার প্রতিকৃতি। অভিভাবকেরা আলাপ সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত, পত্রালাপের প্রত্যাশী।

নীলকমল বোনকে বলল, 'তুই আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী। যা করবি কর।'

উর্মিলা বলল, 'আমি কিন্তু বেছে বেছে কাণা-খোঁড়ার সঙ্গেই তোমার বিয়ে দেব দাদা।'

নীলকমল বলল, 'কাণা খোঁড়াই তো চাই। কাণা খোঁড়া না হলে কাণা খোঁড়া বানিয়ে নেব।'

কিন্তু ফটো বেছে বেছে উর্মিলা যাকে পছন্দ করল, সে কাণাও নয়, খোঁড়াও

নয়। চোখ দুটি পদ্মপলাশের মত না হলেও বেশ বড় বড়, কালো, কালো। দল-বল নিয়ে উর্মিলা তার চলনও দেখে এল।

ভবানীপুরের শাঁখারীটোলা লেনের নিরঞ্জন বাঁড়ুয্যের মেয়ে মণিমালা। নিরঞ্জনবাবু ও-অঞ্চলের বিশিষ্ট ডাক্তার। অবস্থা ভালো। মণিমালাও দেখতে সুন্দরী, ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলেজে ঢুকেছে। কিন্তু পছন্দমত সম্বন্ধ পেলে নিরঞ্জনবাবু মেয়ের বিয়েই দিয়ে দেবেন, পড়াবেন না।

নীলকমলের চেহারা দেখে আর কথাবার্তা শুনে পছন্দই হোল নিরঞ্জন বাবুর। চালাক চতুর আছে ছেলেটি। টাটা এয়ারক্রাফটে পৌনে দুশো পাচ্ছে কিন্তু গ্রেড সাত শ'র। উন্নতির আশা আছে ভবিষ্যতে। বাড়ি-টাড়ি অবশ্য নেই, ভাড়াটে বাড়িতেই থাকে। কিন্তু অত দেখলে চলবে না। ভাগ্যে থাকে তো বাড়ি মেয়ের পরেও হতে পারবে। মেয়ে তো এই একটি নয়, আরো তিনটি আছে মণিমালার পরে।

নীলকমলের পাঁচ হাজারের দাবি অবশ্য টিকল না। নগদ নামল এক হাজার এক-এ। কিন্তু শাড়ি গয়নায়, আসবাবপত্রে, সেতার, হারমোনিয়ম, সেলাইর কলে নীলকমলের ঘড়ি, পেনে নিরঞ্জন বাবুর ব্যয় পাঁচ হাজার ডিঙিয়ে গেল।

নীলকমল আপত্তি করেছিল, সে এসব চায় না। কিন্তু উর্মিলা জোর করে বলল, 'আমরা চাই।' সারদাবাবুও নিভাননী ও মেয়ের সঙ্গে সুর মেলালেন। শুধু টাকা দিয়ে কি হবে? ভদ্রবংশের, উঁচু ঘরের বেশ সুন্দরী, শিক্ষিতা ঘর আলো করা একটি বউ আসুক বাড়িতে। বহুকাল বাদে একটু খুশির হাওয়া লাগুক, আনন্দ-উৎসবের সুর শোনা যাক। উমুর বিয়ের জন্ম ভাবনা কি? হাজার খানেক নগদ তো মিলছেই। আর হাজারদেড়েক মেয়ের জন্য গোপনে গোপনে সঞ্চয় করেছেন সারদাবাবু। মনের আনন্দে তথ্যটা তিনি স্ত্রী, পুত্র আর মেয়ের কাছে এবার প্রকাশ করলেন। লাইফ ইনসিওরেন্সের তহবিল থেকেও সাত-আট শ' টাকা ধার না নেওয়া যাবে তা নয়!

বাবার যেন নতুন রূপ দেখল উর্মিলা আর নীলকমল। বিয়ের বাজারে ছেলের মূল্য চড়ে যাওয়ায় মনের উৎসাহে ঔদাসীন্য, নিস্পৃহতা, অসহযোগের খোলস ছেড়ে হঠাৎ যেন সংসারের মাঝখানে নেমে এসেছেন সারদাবাবু! যোগাযোগের জন্ম হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সকলের দিকে।

বিয়ের পর নীলকমল বলল, 'এবার তোর একটা ব্যবস্থা করতে হয় উর্মি।'

মণিমালাও সেই সঙ্গে সুর মেলাল, 'নিশ্চয়ই। ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে যখন খাঁচায় পুরলে, তোমাকেও আর স্বাধীনভাবে চরে বেড়াতে দিচ্ছি ভেব না।'

উর্মিলা বলল, 'এই বুঝি কৃতজ্ঞতা বউদি। জানো, কনে বাছাই করবার ভার ছিল আমার ওপর। ভবানীপুরের মণিমালাকে না এনে শ্যামবাজারের সুষমা, কালীঘাটের কেতকীকে পছন্দ করে বসলে কে ঠেকাত?'

মণিমালা জবাব দিল, 'কেউ না। কিন্তু পছন্দ যে তুমি ছাড়া আরো কেউ কেউ করতে জানে সেইটাই দেখাতে চাই। এবারকার নির্বাচনের ভার আর তোমার ওপর নেই, সরে সরে আমার ওপর এসেছে। কোন আপত্তি আর শুনছি না।'

উর্মিলা বলল, 'আপত্তি আর কি! ছেলে কাণা হোক, খোঁড়া হোক, কিছুতেই আপত্তি নেই। কিন্তু পণ চাই—পাঁচ হাজার।'

মুচকি হেসে নীলকমলের কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করল উর্মিলা, সস্ত্রীক নীলকমলও হাসল।

মণিমালা বলল, 'ওরে বাবা! তোমাকে পণ দিয়ে নেবে নাকি লোকে?'

উর্মিলা বলল, 'নিশ্চয়ই নেবে, আমি বীর্যশুল্কা। আর পুরুষের পৌরুষ আজকাল টাকায়। পাঁচহাজারের একপয়সা কমেও বিয়ে করব না। এই মোর পণ।'

নীলকমল উঠে গেলে মণিমালা বলল, 'পণের দিকে অত ঝোঁক কেন ঠাকুরঝি? আমরা মেয়েছেলে, মন পেলেই খুশি।'

উর্মিলা বলল, 'মন পাই কোথায়!'

মণিমালা বলল, 'পাবে, পাবে। বাবারে বাবা, দুটো দিন সবুর করো। মণে মণে মন সাপ্লাই করব তোমাকে।'

উর্মিলা বলল, 'দুটো দিন কেন, অনন্তকাল সবুর করতে রাজী আছি। তোমরা অস্থির হয়ো না।'

সবচেয়ে বেশি অস্থির হলেন নিভাননী, ছেলেকে ডেকে বললেন, 'বউভাতের নেমন্তন্ন খাওয়াতে হাজার টাকার শ' চারেক তো অমনিতেই খরচ হয়ে গেছে, আরো যদি দেরি করিস ও-টাকার এক পয়সাও আর ঘরে থাকবে না।'

নীলকমল বলল, 'না মা, আর দেরি করব না।' তারপর স্ত্রীকে বলল, 'অমন

হাত পা ছেড়ে বসে থাকলে হবে না। খোঁজখবর দাও দেখি পাত্রের। অনেক সময় মেয়েদের মারফৎই সবচেয়ে ভালো হয় ঘটকালী। মনে ক'রে দেখ দেখি তোমার জেঠতুতো-খুড়তুতো, মাসতুতো-পিসতুতো ভাইদের মধ্যে অবিবাহিত যোগ্য পাত্র কেউ আছে কি না!'

মণিমালা হেসে মাথা নাড়ল, 'না, জ্যাঠা-খুড়ো, মেসো পিসে আমার কেউ নেই। মামাতো ভাই দুটি আছে। যিনি বড় তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে, আর যার বিয়ে হয়নি ঠাকুরঝির চাইতে সে বছর পাঁচ-ছয়েকের ছোট হবে। কিন্তু মনুদার একটা খোঁজ নিয়ে দেখলে হয়।'

নীলকমল বলল, 'মনুদা কে?'

মণিমালা বলল, 'মনতোষ গঙ্গোপাধ্যায়। বি, এ, পাশ ক'রে চাকরি করছেন কর্পোরেশনে। ভালো চাকরি। বাড়ির অবস্থা-টবস্থাও বেশ ভালো। কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ পণ, বিয়ে করবেন না। তাঁকে রাজী করাতে হলে ধরতে হবে হাতকাটা কাকাবাবুকে! সবই তাঁর হাতে।'

নীলকমল বলল, 'তাঁকেও তো চিনতে পারলাম না!'

মণিমালা বলল, 'মনুদার মামা, সোমনাথ চক্রবর্তী। বাবার বন্ধু। সেই বিপ্লবী যুগের মানুষ। পুলিসের সঙ্গে লড়াই ক'রে একখানা হাত রেখে আসেন। তারপর একখানা হাতেও কীর্তিকাণ্ড কম করেন নি!'

নীলকমল বলল, 'সে কথা পরে শুনব। আগে চিঠিপত্র লিখে যোগাযোগ করো তাঁর সঙ্গে। কাজ যারা করে তারা হাত না থাকলেও করে, যারা করে না তারা হাত থাকলেও করে না—দু'হাত গুটিয়ে বসে থাকে!'

মণিমালা মৃদু হেসে বলল, 'যেমন তুমি।'

সোমনাথবাবুকে চিঠি লিখল মণিমালা। জবাবে তিনি নীলকমল আর মণিমালাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। অনেকদিন দেখাশোনা নেই মণির সঙ্গে। ঘটনাক্রমে তার বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তাই বলে কি তার বরকেও একবার দেখতে পাবেন না?

বেরুবার সময় মণিমালা বলল, 'দিগ্বিজয়ে যাচ্ছি ঠাকুরঝি। দেখি কাউকে ধ'রে নিয়ে আসতে পারি নাকি!'

ঊর্মিলা বলল, 'দোহাই তোমার, তা আনতে যেয়ো না। তার দরকার নেই।'

নীলকমল ধমকের সুরে বলল, 'দরকার আছে কি না-আছে তা আমরা বুঝব। নিজের হাতে নিমন্ত্রণের সেই চিঠি ছেপে দেওয়ার কথা কি ভুলে গেলি?'

উর্মিলা চুপ ক'রে রইল।

সরিৎ তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে বেশিদিন হয় নি। মাত্র মাস ছয়েক আগেকার ঘটনা। কিন্তু ইতিমধ্যে বাড়ির সবাই সে কথা ভুলে যেতে বসেছে। যা দুঃখকর, যা অপ্রিয় তা লোকে কতক্ষণই বা মনে রাখতে চায়? মণিমালা ভারি ফুর্তিবাজ, আমুদে মেয়ে। হাসিঠাট্টায়, গানে, গল্পে, বাড়ির সবাইকে অন্যমনস্ক রেখেছে। সেই আঘাত অপমানের কথা কেউ প্রায় তোলেই না আজকাল। তুলে লাভই বা কি?

কিছুকাল আগে একবার খবর এসেছিল সরিৎও বিয়ে করেছে। ভালোবেসে বিয়ে। বালীগঞ্জবাসী কোন এক এ্যাডভোকেটের মেয়ে। জাতে কায়স্থ। অসবর্ণ বিয়েতে এ্যাডভোকেট নাকি মত দেন নি। কিন্তু আইন-আদালতের সম্মতি পাওয়া গেছে। নীলকমলের আর এক বন্ধু সুরেন গল্প করেছিল, চমৎকার নাকি দেখতে সরিতের স্ত্রী। নাম পর্ণা, গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। টানা টানা নাক-চোখ। কেবল দেখতেই সুন্দরী নয়, বিদুষী বলেও শোনা গেছে। বি, এ, পাশ করেছে বছর ছয়েক আগে। এম, এ, টাও বোধ হয় এবার দিয়ে ফেলবে। এ সংবাদে বাড়ির সবাই আরো একবার চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বিশেষত নীলকমল। বলেছিল, 'এর শোধ নিতেই হবে।' কিন্তু কি ক'রে শোধ নেওয়া যায়, তার পরিকল্পনা করতে করতে শোধ নেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। তারপর মণিমালা এসে সব প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছে। উর্মিলাও যেন আর মনে রাখতে চায় না, মন থেকে মুছে ফেলতেই চায়।

কেবল সাজতেই যে ভালোবাসে মণিমালা তাই নয়, সাজাতেও জানে। বিকালের প্রসাধনপর্বে উর্মিলাকেও যোগ দিতে হয় বউদির সঙ্গে। না গেলে মণিমালা তাকে টানাটানি ক'রে নিয়ে যায়। বলে, 'মাথার অত চুল কি জট

পাকাবার জন্য রেখেছ ঠাকুরঝি ? তার চেয়ে একেবারে ন্যাড়া ক'রে ফেল ভাই। বাসা বাঁধবার জন্য মাথাটাকে যে উকুনদের ভাড়া দিয়ে রাখবে তা হবে না। ভেবেছ তোমার মাথার উকুন আমার মাথায় আসবে আর সারা রাত কুট কুট ক'রে কামড়াবে। জেনে শুনে তা হতে দিতে পারিনে।'

চুল বাঁধা হয়ে গেলে স্নো পাউডার মাখা আর আলতা পরার পালা।

উর্মিলা আপত্তি করে, 'ওসব থাক বউদি। ওসব আমার জন্য নয়। ওসব আমাকে মানায় না।'

মণিমালা মুখ ভার ক'রে জবাব দেয়, 'তাহলে আমাকেও মানায় না। পড়ে থাক সব।'

কোন দিন বলে, 'আচ্ছা মানায় কি না-মানায় একবার দেখই না আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। এমন মেয়ে নেই যে তেল-সিন্দুরে সুন্দর হয় না।'

কথাটা যে নিতান্ত মিথ্যা নয়, তা মণিমালাকে দেখেই উর্মিলা বুঝতে পারে।

বিয়ের পর মণিমালার রূপ যেন আরো খুলেছে। হাসিতে খুসিতে সত্যিই ভারি চমৎকার দেখায় তাকে।

মণিমালা বলে, 'তুমি যদি অমন মুখ ভার ক'রে রাখ ঠাকুরঝি, নিজেকে যেন কেমন অপরাধী অপরাধী লাগে।'

উর্মিলা বুঝতে পারে, কথাটা উল্টো ক'রে বলতে চায় মণিমালা। এমন আনন্দের সংসারে মুখ ভার ক'রে যে দুঃখের ভার বয়ে বেড়ায় অপরাধটা তারই।

উর্মিলা কিছুদিন জোর ক'রেই মণিমালার হাসিঠাট্টায়, গান-বাজনায় যোগ দিতে চেষ্টা করে, তারপর আর চেষ্টা করার দরকার হয় না। ইচ্ছা ক'রেই যোগ দেয়।

মণিমালা বলে, 'এই তো সুবুদ্ধি হয়েছে মেয়ের। এবার বিয়ে হলে বুদ্ধি আরো পাকবে।'

উর্মিলা হাসে, 'তুমি বোধ হয় বিয়ের আগেই পেকেছিলে বউদি।'

মণিমালা অস্বীকার করে না। বলে, 'তা পেকেছিলাম বইকি। পেকে বোঁটার সঙ্গে আলগা ভাবে লেগে ছিলাম আর কেবল তাকাচ্ছিলাম নিচের দিকে. কার হাতে খসে পড়ব, কার হাতে খসে পড়ব।'

তারপর মণিমালা একেবারে গলা জড়িয়ে ধরে উর্মিলার, 'তুমিও এবারে খসে

পড় ভাই। অমন বোঁটা আঁকড়ে শুকিয়ে যেয়ো না। গাছের তলায় মানুষ তো ভাই একজন নয়, হাজার জন। তাদের হাজার জোড়া হাত। হাত পা ছেড়ে দাও, কারো না কারো হাতে পড়বেই। পড়েই সুখ, ডাল ধ'রে ঝুলে থেকে সুখ নেই।'

স্বামী পেয়ে খুবই যে খুশি হয়েছে মণিমালা, তাতে সন্দেহ নেই। তার মনের আনন্দ যেন একটু একটু ক'রে উর্মিলার মনেও সঞ্চারিত হতে থাকে।

উর্মিলা বলে, 'যে-কোন একজনের হাতে পড়লেই হোল বুঝি? এমন সুন্দর একখানা হাতে পড়েছ কিনা, তাই আনন্দ আর ধরেনা মনের।'

মণিমালা জবাব দেয়, 'আহাহা, কি ভাই-গরবী বোনই না একখানা হয়েছ! তোমার দাদার মত সুপুরুষ যেন নেই জগতে। শোন তবে বলি—ভাগ্যগুণে হাতখানা যে সুন্দরই মিলে গেছে তা অস্বীকার করিনে। কিন্তু একটু কম সুন্দর হলেও যে আপশোষে একেবারে মরে যেতাম তা ভেব না। দূর থেকে দেখলেই ভালো মন্দ! একেবারে কাছে, একেবারে হাতের মধ্যে সব হাতই সুন্দর। হাতের কালো-ধলায়, সরু-মোটায় কিছু আসে যায় না ঠাকুরঝি; হাতের আদর নিয়ে কথা। তাই পেলেই হোল।'

উর্মিলা হেসে বলে, 'যার-তার হাতে আমাকে গছিয়ে দেবে বলেই বুঝি তোমার এসব যুক্তি বউদি?'

মণিমালাও হাসে। 'তা ছাড়া কি! যত সস্তায় পারি। হাতেই যে দিতে হবে তারই বা কি মানে আছে? হাত থাকে তো ভালো, না হলে একেবারে কাঁধে উঠিয়ে দেব, সে আরো ভালো।'

তাই নীলকমল আর মণিমালা যখন সম্বন্ধ খুঁজতে বেরুল, তখন উর্মিলা ঠিক জোর করে বাধা দিতে পারল না। এই উপলক্ষে দু'জনে আর একবার একসঙ্গে বেরুচ্ছে, বেরোক। দু'জনকে একসঙ্গে চলতে দেখলে ভালোই লাগে।

নীলকমল ফিরে এল অন্য খবর নিয়ে, 'সোমনাথবাবুর বাড়িতে একটা জিনিস দেখে এলাম উর্মি। একেবারে আস্ত নয়, একটু ভাঙাচোরাই। কিন্তু পাওয়া যায় খুব সস্তায়।'

ঊর্মিলা মণিমালার দিকে ফিরে মৃদুস্বরে বলল, 'আমার জন্যে তো সস্তা জিনিস খুঁজতেই বেরিয়েছিলে তোমরা।'

কিন্তু ঊর্মিলার ঠাট্টার কোন জবাব দিল না মণিমালা, মুখ ভার ক'রে বলল, 'তোমার দাদার কাণ্ড কাহিনী তার নিজের মুখ থেকেই শোন ভাই। আমি কিচ্ছু জানিনে। এমন খামখেয়ালী মানুষ আমি আর দুটি দেখিনি দুনিয়ায়।'

ঊর্মিলা হেসে বলল, 'সে কথা তো অনেকদিন শুনেছি। এবার ব্যাপারটা কি শুনি!'

মণিমালা বলল, 'দায় পড়েছে। যিনি শোনাবার তিনিই শোনাবেন। তোমরাই বলো শোন। আমি কাপড়-টাপড় বদলাই গিয়ে।'

মণিমালা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আর ঊর্মিলার ঘরে বসে আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্তটাই বলে গেল নীলকমল। সোমনাথবাবুর ভাগ্নে কিছুতেই বিয়ে করবে না। তাকে রাজী করান সম্ভব নয়। তবে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের আরো অনেক ছেলে আছে তাঁর জানাশোনা। তাদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে আলাপ পরিচয় যোগাযোগ করবেন। বিয়ের জন্য ভাবনা কি? বিয়েটাতো আজকাল আর মধ্যবিত্ত ঘরে আসল সমস্যা নয়, কন্যাদায়ের কথা ভাববার অবসর কই মানুষের, অন্নচিন্তাই চমৎকারা। যারা বিয়ে দেবে তাদেরও, যারা বিয়ে করবে তাদের আরো বেশি। কোন ভরসায় বিয়ে করবে ছেলেরা? কেবল সোমনাথবাবুর ভাগ্নে নয়, আরো অনেকেই যে বিয়ের কথায় ঘাড় নাড়ে তাতে দোষ দেওয়া যায় না তাদের। ঘাড় শক্ত না হলে মাথায় বোঝা নেবে কি ক'রে? আর আমাদের দেশের ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েছেলে এখন পর্যন্ত বোঝা ছাড়া কি? পাল্কীর চলন দেশ থেকে প্রায় উঠে গেছে, কিন্তু তাই বলে আরোহিণীরা তো আর সঙ্গে সঙ্গে নামতে পারে নি। এখনও চলেছে কাঁধ বদলাবার পালা। বাপ-ভাইয়ের কাঁধ থেকে স্বামী-পুত্রের কাঁধে।

নিজে বিয়ে করেননি সোমনাথবাবু। নীলকমলের সাহসকে তিনি ধন্যবাদ দিলেন। একটু বিদ্রূপ ক'রে বললেন, দুঃসাহস। খানিকটা সিনিক হবারই কথা। জীবনে কোন কিছু ক'রে সার্থক হতে পারেন নি। জেল থেকে বেরিয়ে এসে রাজনীতির সঙ্গেও প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বার বার দল অদলবদল করেছেন, শেষ পর্যন্ত কোন দলের সঙ্গেই মত মেলেনি। রাজনীতি থেকে

অর্থনীতি। তাতেও অনেক কিছু করে দেখেছেন সোমনাথবাবু। সার্থকতার পরিমাণ বাড়েনি। জন কয়েক বন্ধু মিলে একটা কটন মিলের পরিকল্পনা করেছিলেন, তা হয় নি। খুলেছিলেন একটা প্রেস, পাবলিকেশন রাইট নিয়ে বইপত্র বেরও করেছিলেন দু'-একখানা, তাও ভেঙেচুরে গেছে।

নীলকমল বলল, 'কিন্তু গেলেও কিছু কিছু জিনিস এখনো ওঁর বাড়িতে রয়েছে দেখলাম উর্মি। একটা ট্রেড্‌ল্‌ মেসিন আছে। টাইপ কেসটেসও কিছু কিছু আছে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায়। একেবারে আমার মতই অসহায় আগোছাল মানুষ। কিন্তু ভুল বললুম। আমি আগোছাল হলেও ওঁর মত অসহায় নই। আমার সহায় আছিস তুই, গুছিয়ে দেওয়ার জন্য তুই রয়েছিস।'

উর্মিলা বলল, 'এই সঙ্গে বউদিরও নাম করো দাদা। মাথায় একটু খাটো হলেও কানে মোটেই খাটো নয়। কোত্থেকে শুনে টুনে ফেলবে।'

নীলকমল বলল, 'ঠাট্টার কথা নয়। আমি জিজ্ঞেস করলুম, জিনিসগুলি এ ভাবে রেখেছেন কেন? ফের প্রেস চালাবার ইচ্ছে আছে নাকি?

সোমনাথবাবু ঘাড় নাড়লেন, 'চালাই যদি অন্য কিছু চালাব। ফেল করা ক্লাসে দ্বিতীয়বার পড়িনি, ফেল করা কাজে দ্বিতীয়বার হাত দেওয়ার অভ্যাস নেই আমার। অধ্যবসায় নেই বলেই তো কিছু হলো না।'

নীলকমল তখন একটু ইতস্তত ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিল, জিনিসগুলি সোমনাথ-বাবুর বেচে দেওয়ার ইচ্ছা আছে কিনা। নীলকমলের দু'-একজন বন্ধু আছে যারা কিনবার জন্য উৎসুক। ভারি উৎসাহ তাদের প্রেস সম্বন্ধে।

সোমনাথবাবু হেসে বলেছিলেন, 'সেই দু'একজনের একজনকে তো চোখের সামনে দেখছি। এক কালে বনেদী ঘরের ছেলে ছিলুম বাবাজী। জিনিস কিনেছি, জিনিস বেচিনি। এমন কত জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে। সমস্ত জীবনটাই তাই। এখন ভাবি কিছু কিছু কাউকে বিলিয়ে দিলেও হোত। কেন, প্রেস করার সত্যিই কি ইচ্ছা আছে তোমার?'

নীলকমল ঘাড় নেড়েছিল, 'তা আছে।'

শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে গুরুজন সোমনাথবাবু। বেচাকেনার প্রশ্ন তাঁর সঙ্গে ওঠে না। প্রণামী বাবদ কত দিলে চলতে পারে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল নীলকমল।

সোমনাথবাবু বলেছিলেন, 'প্রণামী মানে তো একজোড়া খদ্দরের ধুতি। তার বেশি মণিমা'র কাছ থেকে আমি কি কিছু নিতে পারি?'

নীলকমল বলেছিল, 'কিন্তু মণিমা'র কাছ থেকে তো নয়, আপনি নেবেন আমার কাছ থেকে।'

সোমনাথবাবু বলেছিলেন, 'তোমার কাছে দশ হাজারের এক পয়সা কমেও ছাড়বনা।'

জিনিস পত্র যা আছে নতুন কিনতে গেলে হাজার সাতেক টাকার কম হবে না।

কিন্তু সোমনাথবাবুর ভাব-ভঙ্গিতে বোঝা গেল, হাজার পাঁচেকেই সোমনাথ-বাবু ছাড়তে পারেন জিনিসগুলি। সবই যে একসঙ্গে দিতে হবে তার কোন মানে নেই। দু'তিন কিস্তিতে দিলেই চলবে। অবশ্য আরো হাজার পাঁচেক টাকা খাটাতে হবে সেই সঙ্গে। কিন্তু এত বন্ধু-বান্ধব রয়েছে, কিছু কিছু ধার কি কারো কারো কাছে মিলবে না?

প্রেসের মোহ নীলকমলের কেবল আজকের নয়, প্রায় স্কুলের আমল থেকে। হাতে লেখা ম্যাগাজিন বের করেছিল একবার। টাকার অভাবে ছাপা হয়নি। নীলকমল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, 'নিজেদের যদি প্রেস থাকত!' তারপর কলেজী আমলেও বহু কবিতা নানা সাময়িক পত্রিকা থেকে ফেরত এসেছে নীলকমলের। অনেকদিন ক্ষোভ করেছে নীলকমল, 'যত সব বাজে জিনিস ছেপে পাতা ভরবে, অথচ ভালো জিনিস চোখে দেখবে না। থাকত যদি নিজেদের একটা কাগজ।'

কাগজ অবশ্য কিছু দিন একবার ক'রেছিল নীলকমলরা। কিন্তু মাস পাঁচ-ছয়েকের বেশি টেঁকেনি। প্রেসের দেনা সেদিন পর্যন্তও সাত টাকা দশ আনা বাকী ছিল। এসব কথা উর্মিলার অজানা নেই।

একটু চুপ ক'রে থেকে উর্মিলা বলল, 'বেশ তো দাদা, সুবিধা মত পাওয়া গেলে জিনিসটা নিয়েই নাও না!'

নীলকমল বলল, 'নিতে যে একেবারে না পারি তা নয়! কিন্তু তোর—'

উর্মিলা হাসল, 'আমার জন্যই তো। নিজেদের প্রেসে বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি সব চেয়ে ভালো ক'রে ছাপতে পারব দাদা।'

নীলকমল বলল, 'কথাটা মিথ্যা বলিসনি উর্মি। প্রেসের ব্যবসা এই যুদ্ধের

বাজারে খুব ভালো চলছে। হয়তো দেনা মেটাতে বছর খানেক বছর দুই মাত্র লাগবে।'

উর্মিলা বলল, 'তা লাগুক, প্রেস কিন্তু করতেই হবে দাদা।'

সারদাবাবু বললেন, 'তোদের কি মাথা খারাপ? টাকা নেই, কড়ি নেই, ব্যবসা! শেষে কি সর্বস্বান্ত হবি?

নিভাননী বললেন, 'উমুর বিয়ে তা'হলে কোন দিনই দিবি না তোরা? এই মতলব তোদের?'

নীলকমল বলল, 'মতলবটা তোমার কাছে খুলেই বলি মা। উমুর বিয়ে দেওয়ার গরজ আমার সব চেয়ে বেশি। কিন্তু এমন নমো নমো ক'রে দেওয়ার ইচ্ছা নেই। এতদিনই গেছে আর দুটো বছর তুমি সবুর কর মা।'

মণিমালা বলল, 'তোমার দাদাকে একমাত্র তুমিই থামাতে পার ঠাকুরঝি।'

উর্মিলা হাসল, 'হ্যাঁ দাদাকে থামাই, আর তোমরা হাজার দেড়-দুই টাকা মাত্র খরচ ক'রে যার-তার হাতে আমাকে তুলে দাও। ওই টাকায় যে কালো-কুচ্ছিৎ বর হবে, তার চাইতে কালিমাখা প্রেস ঢের সুন্দর হবে দেখতে।'

কেউ বাধা দিয়ে আটকে রাখতে পারল না নীলকমলকে। কয়েকটা মাস সে ভূতের মত খাটতে লাগল। কোন্ বন্ধুকে ধ'রে কি ভাবে কত টাকা ধার নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, সে সম্বন্ধে মাথা খাটাল। ব্যাঙ্কার বন্ধু স্নেহাংশুকে ধ'রে স্ত্রীর কিছু গয়না বন্ধক রেখে ব্যবস্থা করল হাজার কয়েক টাকার ওভারড্রাফটের। কোথায় কোন্ বন্ধুর ভগ্নীপতির টাইপ ফাউণ্ড্রী আছে, একটু চেষ্টা করলে বাজারের চাইতে একটু কম দরে মিলতে পারে ভালো টাইপ, কোথায় কালি, কোথায় কাগজ, সরকারী কর্মচারীর কোন্ আত্মীয়কে ধরলে লাইসেন্স মিলতে পারে সহজে, তার জন্য কেবল চরকী বাজীর মত ঘুরতে লাগল নীলকমল।

অবাক হয়ে গেলেন সারদাবাবু আর নিভাননী। ছেলের যে এত নিষ্ঠা, এত কর্মশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল ভিতরে, তা যেন কোন দিন তাঁরা ভাবতেও পারেন নি। হবেনা কেন? দেখতে-শুনতে, বলতে-কইতে তো কারো চেয়ে ফেলনা নয় নীলকমল! এতদিন কিছু করেনি বলেই হয়নি, কেবল ঘুমিয়েছে, আড্ডা দিয়েছে,

নভেল পড়েছে, পদ্য মিলিয়েছে। আর কিছু করবে কি ক'রে? এবার নতুন রসের সন্ধান পেয়েছে নীলকমল, মনের আনন্দ খুঁজে পেয়েছে মনের মত কাজের মধ্যে।

রোদের মধ্যে ছুটোছুটি ক'রে হয়রান হয়ে আসে নীলকমল। উর্মিলা আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দেয় কপালের, মণিমালা পাশে দাঁড়িয়ে পাখার বাতাস করে।

উর্মিলা বলে, 'দাদা এতদিন অকেজো ছিল, বিয়ে করার পর হঠাৎ কাজের মানুষ হয়ে উঠেছে। দাদার সমস্ত inspiration-এর তুমিই মূল বউদি।'

মণিমালা ঘাড় নাড়ে, 'কথাটা একেবারে মিথ্যা কিনা তাই অমন শুনিয়ে সব বলতে পারছ। মূল যে কে তা সবাই জানে। কেন, আমি কি দেখতে শিকড়-বাকড়ের মত? আমি বড়জোর পাতা, বড়জোর ফুল। মূল হচ্ছ তুমি।'

প্রেসের জন্য আলাদা বাড়ি নেওয়া হয় নি। বাড়ি দুর্লভ। তা ছাড়া অত ভাড়া যোগাবে কে? নিচের তলায় ছোট ছোট গোটা তিনেক কুঠুরীর মত আছে। একটায় নীলকমলের বন্ধুদের আড্ডাখানা, আর একটাতে খুড়তুতো দুটি ভাই নীরু, হীরু পড়াশুনো করে, আর একখানায় রাজ্যের জঞ্জাল হয়ে রয়েছে। এক সময় গান বাজনার সখ ছিল সারদাবাবুর। সেই ছাউনিহীন বাঁয়া তবলার খোল, ভাঙা একটা ইজি চেয়ার, মাছ ধরবার ছিপ, ভাঙা একটা রঙীন কাঁচের লণ্ঠন—কেন যে ফেলে দেওয়া হয়নি তা কেউ জানে না। এই তিনটে কুঠুরীই এবারে কাজে লাগবে।

ছক কেটে কেটে তৈরী হোল নক্সা। বৈঠকখানায় অফিস বসবে, আর দুটো ঘরে মেসিন আর টাইপ কেস। সিঁড়ির নীচে যে ছোট জায়গাটুকু আছে সেখানেও একটা বাল্‌ব ফিট ক'রে দিলে একজন কম্পোজিটার দিব্যি কম্পোজ করতে পারবে বসে বসে।

নীলকমল আর উর্মিলা দুজনে মিলে ঘরগুলি সাফ করতে সুরু করল।

নিভাননী একবার বললেন, 'বাঁয়া তবলা জোড়া একেবারে ফেলে দিসনে যেন, ওঁর সখের জিনিস ছিল তখনকার।'

নিভাননী আর একবার এসে দাঁড়ালেন দোরের সামনে, 'ও নীলু, ও উর্মি,

তোরা কি হাত পা কেটে মরবি নাকি! আমাকে বললেই পারতিস, আমি দিতুম সাফ করে। ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো পায়ে বিঁধে বসুক তারপর ঘটাও আর এক কাণ্ড।'

নীলকমল বলল, 'বিঁধুক মা বিঁধুক। তাতে কিছু হবে না। অমন অস্থির হয়ো না তুমি।'

নিভাননী বললেন, 'না, অস্থির হব কিসের! কাঁচের টুকরোর যে কি জ্বালা তা যেন আমার জানতে বাকি আছে। ওই এক টুকরো কাঁচে উনি তিনমাস শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন সেবার।'

রিক্সায়, লরীতে, মালপত্র এসে হাজির হ'তে লাগল। বোঝাই হোল তিন ঘর। গম গম করতে লাগল বাড়ি। উদ্যোগ পর্বের উল্লাস উত্তেজনা মাসকয়েক আগের বিয়ে বাড়িকেও হার মানাল।

এবার নাম। কি নাম হবে প্রেসের?

নীলকমল বলল, 'প্রেসের নামের আগে তোর নামটাই বসিয়ে দিই উর্মি! বেশ লাগবে শুনতে।'

উর্মিলা ঠোঁট টিপে হাসল, 'কার নামটা যে মনে মনে বসাবার ইচ্ছা তা আমার জানা আছে। মণিমালা প্রেস, দু বছর বাদে এণ্ড পাবলিকেশন। কানে কি খুব খারাপ শোনাচ্ছে দাদা?'

মণিমালা বলল, 'অত ঠাট্টা কেন? আমার নামটা না হয় সেকেলেই।'

নামকরণ নিয়ে প্রথম প্রথম অবশ্য ঠাট্টাই চলল। কিন্তু সপ্তাহখানেক ধ'রে গুরুতর ধরনের বৈঠক বসিয়েও পছন্দসই নাম বের করা গেল না। নীলকমলের প্রস্তাব নাকচ করে উর্মিলা। উর্মিলার প্রস্তাব নাকচ করে মণিমালা। মণিমালার প্রস্তাব নীলকমল আর উর্মিলা দুজনে মিলে বাতিল ক'রে দেয়। ইংরেজী, বাংলা, কোন শব্দই পছন্দ হয় না কারো। ভালো ভালো শব্দ সংগ্রহ করার জন্য র‍্যাক থেকে নামলো চলন্তিকা, নামানো হোল অক্সফোর্ড ডিকসনারী বের করা হোল রবীন্দ্রনাথের খান পঁচিশ ত্রিশ কবিতার বই। কিন্তু কোন একটি শব্দের শ্রুতিমাধুর্য সম্বন্ধে তিন জন একমত হতে পারল না। দেবদেবী, নদীপর্বত, দেশনেতা কোন

নামই, কারো নামই, ঠিক যেন ষোল আনা পছন্দ হয় না। একজনের পছন্দ হয় তো দুজন খুঁৎ খুঁৎ করে। দুইজনের মত মেলে তো আর একজনের খুঁৎখুঁতি যায় না। আর সেই খুঁৎখুঁতি শেষ পর্যন্ত আরো দুজনের মনের মধ্যে সংক্রামিত হয়।

হাল ছেড়ে দিয়ে নীলকমল বলল, 'অত কথায় কাজ নেই। মায়ের নামেই রাখব প্রেসের নাম। 'নিভাননী প্রেস'। বাস্। আর কোন কথা আমি শুনতে চাই না। দু' কানে দুই আঙুল দিল নীলকমল, 'কোন আপত্তি শুনব না। ভালো হোক, মন্দ হোক this is settled.'

আপত্তি করলেন নিভাননী নিজে। তাঁর নামে প্রেসের নাম হতে যাচ্ছে শুনে ছেলে মেয়ে দুজনকে তিনি ডেকে বললেন, 'ছি ছি ছি! তোদের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? আমার নাম নিয়ে তোরা হৈ চৈ করছিস আর একজনের কথা মনে পড়ল না বুঝি তোদের? বাড়ির কারো নাম যদি দিসই ওঁর নাম দিবি।'

বাবা সম্বন্ধে মার বিরূপতার কথাই জানত নীলকমল আর উর্মিলা। সব সময় দু'জনের মধ্যে খিটিমিটি লেগে আছে। এক সময়ও ভালো মুখে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন না নিভাননী। লাঞ্ছনা গঞ্জনা লেগেই আছে মুখে। সারদাবাবু বেশি কথা বলেন না। কিন্তু দু'একটি যা টিপ্পনী কাটেন তা মর্মভেদী। স্বামী স্ত্রীতে প্রায়ই বনিবনাও হয় না। বড় বড় ছেলে মেয়েদের সামনে নিভাননী গালাগাল দেন স্বামীকে, কোন রাত্রে ঝগড়া করে স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে মেয়ের কাছে এসে শোন। কিন্তু প্রেসের নাম রাখবার বেলায় নিজের নামের বদলে স্বামীর নাম রাখবারই উপদেশ দিলেন তিনি।

কেবল উপদেশ নয়, অনুরোধও, 'ওঁর নামই রাখ, সেই ভালো হবে। রঞ্জন বাদ দিলে ওনামের মানে তো সরস্বতী, তাই না?'

উর্মিলা হেসে বলল, 'ঈস নামের মানেটা পর্যন্ত মুখস্থ ক'রে রেখেছ দেখি। মানেও জান।'

নিভাননীও হাসলেন, 'জানবনা কেন। শুনেছি এন্ট্রান্স্ পর্যন্ত ভালো ছেলেই ছিলেন ক্লাসে। ফার্ষ্ট না হলেও সেকেণ্ড থার্ড হতেন নাকি প্রায়ই।'

নীলকমল বলল, 'মানে প্রায় সরস্বতীর বরপুত্র। একেবারে বড় না হলেও মেজো সেজো।'

সারদাবাবুর অনুমতি নেওয়ার কেউ অপেক্ষা করল না। তবু কথাটা কানে গেল তাঁর।

ছেলে মেয়েকে ডেকে সারদাবাবু বললেন, 'ব্যাপার কি? মরবার আগেই চিতায় মঠ দিচ্ছিস বুঝি?'

ঊর্মিলা মুখ ভার করে বলল, 'কি যে বল বাবা।'

নীলকমল কোন জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে এল মার কাছে, বলল, 'গালাগাল ধমকানিটা কিন্তু মুখের মা, ভিতরে ভিতরে কিন্তু বেশ ইচ্ছে।'

নিভাননী মৃদু হেসে বললে, 'আঃ থাম বাপু!'

নীলকমল বলল, 'থামব কি!' আফিসের খাতায় সংক্ষেপে এস, চ্যাটার্জী সই ছাড়া তো নাম গন্ধ নেই কোথাও। আর রীতিমত সাইনবোর্ডে, ছাপার অক্ষরে প্যাডে, হ্যাণ্ডবিলে সব জায়গায়, দিনে অন্তত পাঁচ সাত শ' বার মুখ থেকে মুখে, ফিরবে নামটা। তা সহ্য হবে কেন?'

ঊর্মিলা হেসে বলল, 'সত্যি দাদা, তোমার মত এমন কৃতী পুত্র আর হয় না। এর চেয়ে বাপের নাম আর লোকে কি ক'রে রাখে!'

নিভাননীও একটু হাসলেন, বললেন, 'উনি আমাকে কি বলছিলেন জানিস। বলছিলেন আমার নাকি খুব অসুবিধা হবে।'

নীলকমল বলল, 'কেন, অসুবিধা কিসের?'

ঊর্মিলা দাদাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এল, 'অসুবিধা কিসের আমার কাছে শোন। কোন বুদ্ধিশুদ্ধি তো নেই। অসুবিধা লোকের সামনে প্রেসের নামটা মা মুখ ফুটে বলবেন কি ক'রে? ভাসুর হলে না হয় বড়দা-টড়দা অন্য একটা নাম বলে চালাতেন। কিন্তু এ যে বড় সাংঘাতিক নাম। উচ্চারণও করতে পারবেন না, আবার—'

নীলকমলও হাসল, 'তাই তো, তাহ'লে পাবলিসিটির একটি মুখপত্র তো আমাদের হারাতে হচ্ছে!'

সারদাবাবুর অমত সত্ত্বেও 'সারদা প্রেস'ই বহাল রয়েছে শেষ পর্যন্ত। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে ছোট ছোট দু'চারটে কাগজে। মাস মাইনের নয়, ফুরণ ক'রে জন তিনেক কম্পোজিটার নেওয়া হয়েছে। নেওয়া হয়েছে মেশিনম্যান। চেক বই হ্যাণ্ডবিলের কিছু কিছু অর্ডার পত্র যোগাড় ক'রে দিয়েছে বন্ধুরা। কাজ শুরু

হবে পয়লা আষাঢ় থেকে। পঞ্জিকা দেখে শুভক্ষণ ঠিক ক'রে দিয়েছেন সারদাবাবু। এই উপলক্ষ্যে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতে চায় নীলকমল—করুক! কিন্তু সরিৎকে কেন? সে কি বন্ধু? সে কি শত্রু হবারও উপযুক্ত? নিমন্ত্রিতদের মধ্যে দেখলে সরিৎকে লোকে কি ভাববে, কি বলবে। মাঝে মাঝে ছেলেমানুষের মত ব্যবহার করে উর্মিলার দাদা। কেন এই নাম ফের উচ্চারণ করতে গেল নীলকমল? কেন লিখতে গেল খাতায়? উর্মিলা বেশ করেছে। নিবের আঁচড়ে কেটে দিয়েছে নামটা।

সেই দাগসুদ্ধ কাটা নামটা অন্ধকারে আর একবার চোখের সামনে ভেসে উঠল উর্মিলার। বুকের ভিতরে কোন একটা জায়গায় যেন টন টন ক'রে উঠল। সেখানেও বড় একটা দাগ আছে। নিবের নয়, ছুরির।

॥ তিন ॥

'সারদা প্রেসে'র উদ্বোধন হবে ষোলই মাঘ। চৌদ্দই মাঘ সন্ধ্যার পর প্রেসের প্রায় জন পঁচিশেক অংশীদার নিমু গোস্বামী লেনে হেমন্ত ভট্টাচার্যের বাসায় এসে জমায়েৎ হয়েছিল। জন পাঁচ সাত এসে তখনো পৌঁছতে পারেনি। হয়তো ওভারটাইম খাটছে যার যার অফিসে। অংশীদারদের বেশির ভাগই কম্পোজিটার, প্রুফরীডার, মেসিনম্যানের দল। প্রেসটি গড়ে তুলবার জন্য পঞ্চাশ একশ ক'রে প্রায় সকলেই সাধ্যমত দিয়েছে। যারা এখনো দিয়ে উঠতে পারেনি, তারা পরে দেবে। বিনা মজুরীতে ফাঁকে ফাঁকে এসে গায়ে খেটে দিয়ে যাবে কেউ কেউ। দেয় টাকাটা সেই মজুরী থেকে শোধ যাবে। ষ্ট্রাইকের ফলে অন্যান্য প্রেস থেকে বিতাড়িত বেকার জন কয়েক কম্পোজিটারই আগে চাকরি পাবে এখানে। অবশ্য মাত্র চার পাঁচজনেরই ব্যবস্থা করা যাবে প্রথমে। এত চেষ্টা সত্ত্বেও খুব বেশি লোককে এখানে জড়ো করা যায় নি, সংস্থান হয়নি বেশি মূলধনের।

অনেক খুঁজে পেতে, বহু ধরা-পড়া তদ্বির সুপারিশের পর মণ্ডল ষ্ট্রীটে ছোট ছোট খান তিনেক ঘর পাওয়া গেছে প্রেস খুলবার জন্য। দলপতি হেমন্ত ভট্টাচার্যের একজন দূরসম্পর্কের আত্মীয় আছেন রেণ্ট কন্‌ট্রোলের উকিল। বিনা

সেলামীতে প'চাত্তর টাকা ভাড়ায় তিনিই জোগাড় ক'রে দিয়েছেন ঘরগুলি। মাস ছয়েকের আগাম অবশ্য দিতে হয়েছে। ঘর তো নয় ছোট ছোট খুপরি। আগে দেহ ব্যবসায়িনীরা থাকত এসব অঞ্চলে। এখন অবশ্য তারা নেই। গৃহস্থরাই এসে বাস করছে তাদের বদলে। তবু লোকের সন্দেহ যায় না! বলে কেউ কেউ এখনো আধা-গৃহস্থ। রাত্রে আশে পাশে মাতালদের হৈ হল্লা এখনো চলতে থাকে। ঠিক প্রেস খুলবার মত জায়গা এটা নয়। কিন্তু অন্য কোথাও ঘর মেলেনি বলে নিরুপায় হয়েই নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ভালো জায়গায় বাড়ি নেওয়ার মত টাকাই বা কই? প্রেস যদি চলে, যদি দিন ফিরে যায়, তাহলে বাড়িও বদলানো যাবে। আপাতত একটা ট্রেড্‌ল মেসিনেই শুরু হবে কাজ। অনেক চড়া বাজার। প্রায় সব জিনিসই নতুন কিনতে হয়েছে। এইটুকু উদ্যোগ আয়োজনেই হাজার দশেক টাকা খরচ হয়েছে ইতিমধ্যে। এত টাকা হেমন্তর পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রায় অভাবিত উপায়ে পেয়ে গেছে। বলা যেতে পারে বিয়ের পণ।

খ্যাতনামা শ্রমিক নেতা সুদর্শন সরকার প্রেসটি উদ্বোধন করবেন। জন কয়েক বন্ধুও আসবেন তাঁর সঙ্গে। সবাই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করবেন। কারো কারো বক্তৃতা যে অতিদীর্ঘ হবেনা তা অবশ্য হলফ ক'রে বলা যায় না। সুদর্শনবাবু নিজেই একটু দীর্ঘ বক্তৃতার পক্ষপাতী।

একতলা ঘরের মেঝেয় ঢালা মাদুর বিছিয়ে কার্যকরী সমিতির অধিবেশন চলছিল। যারা কার্যকরী সমিতিতে নেই অথচ কাছাকাছি আছে তারাও এসে জড়ো হয়েছিল মাদুরের পিছনে। লোভটা কেবল প্রেস সংক্রান্ত আলাপ আলোচনার জন্যই নয়। এক কাপ করে চা-ও মেলে এখানে, মেয়েলী হাতের মিঠে চা! বারো আনি সভ্যের সেই চায়ের লোভটাই বেশি। বেশির ভাগ সভ্যের কাছে ব্যাপারটা এখন পর্যন্ত যাত্রা থিয়েটারের মত। তবে গ্রামগঞ্জের স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত যাত্রা নয়, যেখানে পুরুষেরা মেয়ে সেজে অভিনয় করে। কলকাতার থিয়েটারই। সংখ্যায় একটি হলেও স্ত্রী-ভূমিকাটি দাড়ি গোঁফ কামান ছদ্মবেশী একজন পুরুষের নয়। আসল স্ত্রীলোকেরই। তবে ঢংটা যে বেশ একটু পুরুষালী পুরুষালী তা সবাই স্বীকার করে।

দলনেতা হেমন্তবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে ঠিক যেন তাদের ঘরের স্ত্রীর মিল নেই। রসকসহীন আলোচনা তাদের স্ত্রীরা করে না। মাথায় আঁচলের নামমাত্র খুঁট দিয়ে এমন অনাত্মীয় এক ঘর লোকের সামনে বেরও হয় না তারা। কিন্তু আকর্ষণ তো সেই অমিলের জন্যই। তবু মিল যে একেবারেই না আছে তা নয়। হাতে ক'রে যখন চায়ের কাপ এগিয়ে দেয় তখন বেশ একটু মিল দেখা যায়। শাঁখাপরা আর একখানি হাতের কথা মনে পড়ে।

অবশ্য সকলের স্ত্রীর হাতই ঠিক এই রকম নয়। অনেকের হাতে কেবল শাঁখাই আছে, সোনার চুড়ি নেই। অনেকের হাতে কেবল নোয়া, আর একগাছি ক'রে কাঁচের চুড়ি। অনেকের হাত কেবলই হাত, চায়ের বাটিওয়ালা হাত নয়। বাসন মেজে মেজে ক্ষয়ে যাওয়া লঙ্কা হলুদের ছোপ লাগা আঙুলে রাত্রে শোবার সময় অনেকের বউ কেবল একটা পান, কি পকেট থেকে আনা একটি বিড়িই খাওয়ার পরে শোওয়ার আগে স্বামীর মুখের কাছে এগিয়ে দিতে পারে। রোজ নিজের হাতে চা করে খাওয়ানোর সৌভাগ্যে অনেকের স্ত্রীর কদাচিৎ হয়। চা চাও তো গলির মোড়ের দোকানে যাও। চার পয়সা ক'রে মাটির এক একটি খুরি।

এত সব অমিল সত্ত্বেও নিজেদের স্ত্রীর হাতের সঙ্গে হেমন্তবাবুর স্ত্রীর হাতের মিল খুঁজে পায় দলের লোক। মিল পায় হাসিতে, মিল পায় কথায়। ভাষায় মেলে না, কিন্তু ভঙ্গিতে মেলে। দেখতে সুন্দরী না হলেও হাসিটুকু বেশ মিষ্টি' গলার স্বরটুকু ভারি নরম। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের কম নয়। কিন্তু দেহের স্বাস্থ্যে বাঁধুনীতে বেশ কম বলে মনে হয়।

উদ্বোধন দিবসের কার্যসূচী সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিল, উদ্বোধন সঙ্গীতের কোন ব্যবস্থা হবে কিনা, অধিবেশনের স্থান কি প্রেসের ঘরেই হবে, না পার্কে, সভাপতিত্বের জন্য ইউনিয়নের ভুবনবাবুকে যদি না পাওয়া যায়, তবে কি প্রেস কর্মচারীদের সভাপতি গোলক বাবুকেই করা হবে, এই সব নিয়ে বিতর্ক চলছিল।

পিছন থেকে মেসিনম্যান ইয়াসীন হঠাৎ বলে উঠল, 'এ কথা কয়েন, ও কথা কয়েন, খাওয়া-দাওয়ার কথাডা কয়েন না দেখি কেউ! সেডা বাদ দেবেন নাকি?'

হেমন্ত মৃদু হেসে স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'বুড়ো চাচার কথা শোন। খাওয়া ছাড়া আর কোন কথা নেই মুখে।'

বাইরে থেকে যাঁরা আসবেন তাঁদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু নিজেদের জন্য কোন বন্দোবস্ত হয়নি। এখন পর্যন্ত আয়ের নামে দেখা নেই, গোড়াতেই খরচ বাড়িয়ে লাভ কি। এই ছিল কার্যকরী সমিতির মত।

কিন্তু ইয়াসীনের প্রস্তাবটা এবার আলোচিত হবার মর্যাদা পেল! সত্যি, যাঁরা বক্তৃতা দিতে আসবেন তাঁরাই কেবল খেয়ে যাবেন আর যারা কষ্ট ক'রে বসে বসে শুনবে তারা কোঁচার খুঁটে শুকনো মুখ মুছবার ভান করবে, এমন হ'তে পারেনা। শুভদিনে মিষ্টিমুখটা সবারই চাই।

হেমন্ত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্মিতহাস্যে বলল, 'দেখছ তো উর্মিলা, সবাইর মুখ চুলবুল করছে এখানে। মিষ্টিমুখের ব্যবস্থাটা মঞ্জুরই হয়ে যাক ওই দিন।'

উর্মিলা ঘাড় নেড়ে বলল, 'বেশ।'

সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল সমস্ত ঘরটা।

খাতা পেনসিল নিয়ে সুরেশ তক্ষুণি বসে গেল ফর্দ করতে। হেমন্তর হাতে অভ্যাগতদের নামের লিস্ট। খানিক বাদে ভঙ্গ হোল সভা। দু'চারটে নাম যদি বাদ পড়ে থাকে হেমন্ত যেন বসিয়ে নেয়।

হেমন্ত বলল, 'আত্মীয়-স্বজনদের বললে হয় না?'

উর্মিলা বলল, 'বেশ তো, বলনা।'

হেমন্ত বলল, 'আমার আত্মীয়-স্বজন তো তেমন কেউ নেই। তোমার দাদাও তো হাসপাতালে। তবে তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর বন্ধু সরিৎবাবুকে বললে হয়।'

উর্মিলা কোন কথা বলল না।

হেমন্ত আবার বলল, 'দিই ওঁকে একখানা কার্ড পাঠিয়ে। খবরটা জানানো মন্দ কি!'

উর্মিলা স্বামীর মুখের দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে বলল 'বেশ তো।'

হেমন্ত টানা টানা অক্ষরে লিখল, 'শ্রীযুত সরিৎ মুখোপাধ্যায়।'

তারপর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে মাপ কর মিলু, আমি কেটে দিচ্ছি এ নাম।'

উর্মিলা মৃদু হাসল, 'থাকনা, কাটবার কি হয়েছে!'

হেমন্ত অনুতাপের সুরে বলল, 'এসব ব্যাপারে আমরা পুরুষেরা সত্যিই ভারি ইতর, ভারি ছোট। তুমি কিছু মনে করলে না তো, সত্যি বল, কিছু মনে করোনি।'

উর্মিলা এবারো একটু হাসল, বলল, 'না। কি আবার মনে করব!'

হেমন্ত বলল, 'তাহলে নামটা কেটে দিই, কেমন? ভুলটা সংশোধন করি।'

উর্মিলা বলল, 'অমন একটু আধটু ভুল থাকা ভালো প্রুফ রীডারের জন্য। নইলে তার তো কোন কাজই থাকে না।'

হেমন্ত বলল, 'কিন্তু নামটা ?'

উর্মিলা বলল, 'থাকনা, দরকার হলে আমিও কেটে দিতে পারব।'

শোয়ার সময় স্যুইচ অফ্ করবার আগে তালিকার দিকে আর একবার চোখ পড়ল উর্মিলার। হেমন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। তালিকা আর কলমটা রয়েছে টেবিলের ওপর। নামটা কেটে দিলেই হয়। কিন্তু থাক না। ছ' বছর আগে এ নাম একবার কেটে দিয়েছিল বলে, আজও যে কাটতে হবে তার কি মানে আছে? নিবের ডগায় নাম কাটবার আর দরকার নেই ; গভীর ক্ষত না রাখতে পারলেও ছুরির আঁচড় কিছু তো রেখে আসতে পেরেছে এই নামী লোকের মনে। যদি নাই রাখতে পেরে থাকে তাতেও ক্ষোভ নেই। ও সব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় কই উর্মিলার ?

স্যুইচ অফ্ ক'রে উর্মিলা ঘুমন্ত স্বামীর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল ?

আশ্চর্য একরকমের ঘটনা একেক জনের জীবনে একবারের বেশি যখন ঘটে তখন জিনিসটা এমন অদ্ভুত হয় যে কাউকে বলা যায় না, ভয় হয় পাছে বানিয়ে বলা গল্প বলে মনে করল কেউ ! কিন্তু গল্পই বুঝি কেবল বানানো হয়, জীবন বুঝি আর বানানো হয় না ? নিজের হাতে আর পাঁচজনের হাতে হাতে সেই বানানো জীবন বানানো গল্পের চেয়ে বুঝি কম অদ্ভুত ? কিন্তু ঠিক এক রকম ঘটনাই কি বলা যায় ? ছ' বছর আগের সেই সারদা প্রেসের উদ্বোধনের নিমন্ত্রণের তালিকা আর এই তালিকা কি এক ? অনেক তফাৎ। একটি নামে কেবল মিল আছে— সরিৎ মুখোপাধ্যায় ! কিন্তু এ মিল কেবল অক্ষরের মিল, মনের মিল নেই।

॥ চার ॥

তালিকা থেকে সরিতের নামটা আজ কাটা না কাটা সমান কথা। কার্ড পাঠালেও সরিৎ কি আসবে ? না, আসবার তার সাহস হবে ? ছ'বছর আগেই হয় নি, আজ তো আরো হবে না। সেদিন উর্মিলা নামটা কেটে দিলেও নীলকমল সে কাটাকুটি মেনে নেয়নি। চিঠি পাঠিয়েছিল সরিতের নামে। বলেছিল, 'দেখা যাক

কতখানি বুকের পাটা। আসুক না একবার! শুধু এসে আমাদের আরো দশজন স্বজন বন্ধুর পাশাপাশি বসুক্। শুধু একবার চোখাচোখি হোক। দেখব কতখানি সাহস ওর।'

সাহস সেদিন হয়নি সরিতের। কিংবা 'সারদা প্রেসে'র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কোন প্রয়োজনই বোধ করেনি সে। অন্যান্য বন্ধুরা চা জলযোগে আপ্যায়িত হয়ে, শুভেচ্ছা জানিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর নীলকমল বলেছিল, দেখলি তো, ভিলেন নয়, ভীরু! চিঠি পেয়ে কি করে তাই দেখবার জন্যই ওকে চিঠি দিয়েছিলাম। সরিতের ধারণা আমার দ্বারা কোনদিন কিছু হবে না! হোল কি না হোল, দুজনে মিলে আমরা কিছু গড়ে তুলতে পেরেছি কিনা একবার এলেই দেখতে পারত।'

উর্মিলা মনে মনে হেসেছিল। বন্ধুকে নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্যটা নীলকমলের যে তাই, নিজের কৃতিত্ব দেখান, সেটা বুঝতে বাকী ছিল না উর্মিলার।

যত অন্যায়, যত অপরাধই করে থাকুক সরিৎ, নীলকমল যে একটা কিছু করবার মত করেছে তা এসে প্রত্যক্ষ করে যাক। অন্য পাঁচজন বন্ধুর মত মন খুলে প্রশংসা না করতে পারুক, তারিফ করুক মনে মনে।

সরিতের বাবা বেঁচে থাকতে ম্যাগাজিন ছাপবার চেষ্টা সরিৎও করেছে, কিন্তু পেরে ওঠেনি। সেদিক থেকে ভারি শক্ত লোক ছিলেন জনার্দন মুখুয্যে। ছেলের খামখেয়ালিকে মোটেই প্রশ্রয় দেন নি। সরিতের চেয়ে অনেক গরীব হয়েও তার আগে যে নিজে প্রেস করতে পেরেছে নীলকমল এ কি কম গৌরবের কথা? আর সে গৌরব কি সম্পূর্ণ হয় যদি সরিৎ নিজের চোখে এসে না দেখে?

দাদার মনের ভাব বুঝে উর্মিলা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'দেখবার মত জিনিস আগে গড়ে তোল দাদা, তারপর তা দেখবার লোকের অভাব হবে না। সারা সহরের লোক নিমন্ত্রণ ক'রে এনে দেখাব।'

নীলকমল বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা; করতে পারি কি না পারি দেখ চেয়ে চেয়ে।'

কিন্তু কেবল চেয়ে দেখে হবে কি, দিন কয়েকের মধ্যেই হাতে কলমে কাজে লেগে গেল উর্মিলা। কলমের কাজ নীলকমলই করে। চিঠিপত্র লেখে, প্রিণ্ট অর্ডার দেয়। উর্মিলা শিখতে লাগল হাতের কাজ। স্বরু করল কম্পোজিটারী থেকে। হরিবাবু নামে নিকেলের চশমা চোখে মাঝবয়সী একজন কম্পোজিটারকে নেওয়া হয়েছিল বিশেষজ্ঞ হিসাবে। তিনিই সব দেখাশোনা করতেন।

উর্মিলা তাঁকে গিয়ে ধরল, 'হরিবাবু, আমাকে কাজ শিখিয়ে দিতে হবে।'

হরিবাবু কপালে চোখ তুললেন, কিছুক্ষণ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন উর্মিলার দিকে, তারপর বললেন, 'সে কি মা, আপনি এসব শিখে কি করবেন?'

'কেন কাজ করব? সাহায্য করব আপনাদের।'

কি বুঝলেন হরিবাবু তিনিই জানেন। দীর্ঘনিশ্বাস চাপলেন যেন একটু।

তারপর সহানুভূতির স্বরে বললেন, 'বেশ তো মা, শিখতে চান শিখবেন। কোন কাজই তো খারাপ নয়, এ-ও বিদ্যা। বিদ্যা যত জানা যায় ততই ভালো। বড়বাবু ছোটবাবু যদি আপত্তি না করেন—'

উর্মিলা বলল, 'না, ওঁরা কোন আপত্তি করবেন না।'

কিন্তু সব চেয়ে আগে, সব চেয়ে জোরাল আপত্তি করলেন নিভাননী। মেয়েকে ধমকে দিয়ে বললেন, 'ফের তুই নিচে নামতে স্বরু করেছিস? প্রেসে তোর কি কাজ?'

উর্মিলা বলল, 'প্রেসেই তো আমি কাজ শিখছি মা।'

নিভাননী অবাক হয়ে বললেন, 'কাজ শিখছিস! কি কাজ শিখছিস তুই অতগুলি ব্যাটাছেলের মধ্যে, জানা নেই, শোনা নেই—'

উর্মিলা বলল, 'সেই তো ভালো মা। ওরা কেউ দাদার জানাশোনা বন্ধু নয়! আর ব্যাটাছেলে হলে কি হবে সব ওরা আমাদের কর্মচারী। চাকর বাকরের মত। ব্যাটাছেলে তো ধোপাও, ব্যাটাছেলে তো মেথরও, তাতে কি হয়?'

নিভাননী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে, শাসনের স্বরে বললেন, 'উর্মি! কালে কালে তোরা হলি কি, বল দেখি? লঘু গুরু জ্ঞান নেই? গ্রাহ্য নেই মা বাপ বলে?'

ছেলেবেলার মত মার কোলের কাছে এগিয়ে এল উর্মিলা, কাঁধের সঙ্গে মুখ

মিশিয়ে বলল, 'আমাকে মাপ কর মা কিন্তু কাজ শিখতে মানা কোরো না। খালি খালি কি ভালো লাগে?'

নিভাননী মেয়ের পিঠে নিঃশব্দে হাত বুলাতে লাগলেন, হঠাৎ কোনো কথা বলতে পরলেন না।

উর্মিলা বলল, 'আমাকে হুকুম দাও মা। আগের মত বৈঠকখানায় তো যাচ্ছি না, প্রেসে যাচ্ছি। তোমার কোন ভয় নেই। আর কোন ভুল হবে না আমার, আর কোন দোষ করব না।'

নিভাননী আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, 'দোষ তো তোর নয় উর্মি, দোষ আমার নিজের। দোষ আমার কপালের। সে দোষ শোধরাতে নীলু আজ পর্যন্ত দিল না আমাকে। দেখি আর একবার ওকে বলে। এমন হাত পা ছেড়ে বসে থাকলে কি কোন কালে কিছু হবে?'

আগরপাড়ায় নাকি ভালো একটি ছেলে আছে, নতুন ক'রে ছেলের খোঁজ স্বরু করলেন নিভাননী। আর উর্মিলা হরিবাবুর কাছে টাইপ চিনতে আরম্ভ করল, শিখতে লাগল প্রুফ দেখা।

সিঁড়ির নিচে সেই ছোট খোপটুকুর মধ্যে টুল পেতে উর্মিলা বসল ডান ধারে বাঁ ধারে সামনে টাইপ কেস নিয়ে। তারপর মাস দুই পরেই নীলকমলকে গিয়ে বলল, 'দাদা, মাইনে ঠিক ক'রে দাও আমার। হরিবাবুকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ একজন পুরো কম্পোজিটারের কাজ তোমার চালিয়ে দিচ্ছি কিনা।'

নীলকমল হেসে বলল, 'মাইনে নিবি না, ম্যানেজারি নিবি, দেখ চিন্তা করে।'

মণিমালা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিঁদুরের ফোঁটা স্বগোল ক'রে তুলছিল গৌরবর্ণ কপালে। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আহাহা! ম্যানেজারীর যেন কিছু বাকি আছে। কেবল ম্যানেজারী কেন, গোটা প্রেসটাই তো একরকম দখল ক'রে বসেছ তুমি।'

কথাটা মিথ্যা বলেনি মণিমালা। সে কেবল নীলকমলের গৃহিণী, কেবল অবকাশরঙ্গিনী। কিন্তু স্বামীর সব কাজের কথা উর্মিলার সঙ্গে। প্রেসের সব খুঁটি-নাটি ব্যাপার, দৈনন্দিন কাজ কর্মের স্ববিধা অস্ববিধা আর ভবিষ্যতের জল্পনা কল্পনা নিয়ে রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত প্রায় রোজ ভাইবোনে আলাপ আলোচনা চলে।

মণিমালা কিছুক্ষণ বসে বসে শোনে কিন্তু কোন কথা বলবার ফাঁক পায় না। তারপর এক সময় উঠে পড়ে।

ঊর্মিলা বলে, 'চললে নাকি বউদি ?'

মণিমালা বলে, 'চলব না কি করব! আমাকে বাদ দিয়েই তো তোমাদের প্রেস।'

প্রেসের কাজকর্ম সম্বন্ধে ঊর্মিলার সঙ্গে মণিমালাও একদিন কৌতূহল প্রকাশ করেছিল। কিন্তু নিভাননী মোটেই উৎসাহ দেননি, নিষেধই করেছেন। বলেছেন, 'না মা। উর্মি যাচ্ছে যাক। তুমি বউ মানুষ, ও সবের মধ্যে তোমার গিয়ে কাজ নেই, লোকে নিন্দা করবে। তা ছাড়া সবাই প্রেস নিয়ে মাতলে ঘর গৃহস্থালী দেখবে কে ?'

ঊর্মিলাও নিজস্ব ভঙ্গিতে মার কথায় সায় দেয়, 'সত্যি বউদি দরকার কি তোমার প্রেসঘরে গিয়ে ? কালিঝুলি লাগবে।'

মণিমালা বলে, 'তোমার বুঝি লাগবার ভয় নেই ?'

ঊর্মিলা মাথা নাড়ে, 'না বউদি, নেই। আমার গায়ের রঙ আর প্রেসের কালির রঙ এক কিনা, লাগলে বোঝা যাবে না! কিন্তু তোমার কথা আলাদা। অমন কাঁচা সোনার বর্ণে দু'এক ফোঁটা কালি যদি লেগে বসে, বাজার থেকে সাবান কিনতে কিনতে প্রেস নীলামে উঠবে দাদার!'

মণিমালা বলে, 'দরকার নেই ভাই তোমাদের প্রেস নীলামে তুলে। আমার তেল সাবান আলতা মাথায় থাকুক, তোমাদের প্রেস তোমাদের থাকলেই বাঁচি।'

যুদ্ধের বাজারে কাজ যে ভাবে এগুতে লাগল তাতে মণিমালার তেল সাবান আলতা সরবরাহে কোন ত্রুটি ঘটল না। দাখিলা, চেক, হ্যাণ্ডবিল, প্যাম্ফলেটের অর্ডার ভালোই আসতে লাগল। গোটাকয়েক অফিস, ফার্ম, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাজ জোগাড় ক'রে দিল বন্ধুর দল। বাঁধা খদ্দের হয়ে রইল তারা। তিনজন কম্পোজিটার ফুরনে কাজ করত। তাদের মাস মাইনের বেঁধে রাখা হোল। অফিসের দুশো টাকা বাঁধা মাইনের চাকরি ছেড়ে চেয়ার টেবিল, টাইপরাইটার, ফোনে ফ্যানে ভালো ক'রে অফিস সাজিয়ে বসল নীলকমল।

সারদাবাবুর শরীর ভালো না। গ্যাসট্রিক আলসারে ভুগছেন অনেকদিন

ধ'রে। ছেলেকে ওপরের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'ফের যে চাকরি ছাড়লি, খাবি কি? প্রেসের কাগজ কালি খেয়ে কি পেট ভরবে?'

চিরদিন চাকরি করে এসেছেন সারদাবাবু। চাকরি ছাড়লে যে অন্নজল ছাড়তে হয় সে সম্বন্ধে তাঁর কোন সংশয় ছিল না।

কিন্তু নীলকমল বাপকে ভরসা দিয়ে বলল, 'আপনার ভয় নেই বাবা। কি খেয়ে পেট ভরে, কি খেয়ে পেট ভরে না তা আমার জানবার বয়স হয়েছে। ফলটল যা আপনার খেতে ইচ্ছে হয় বলবেন, আনিয়ে দেব।'

সারদাবাবু মাথা নাড়লেন, 'কিছু না, কিছু না। তোমার হাতের কোন ফলে কাজ নেই আমার। যদি দিতেই হয়, একেবারে বিষফলই দিয়ো।'

কথাবার্তার সময় উর্মিলা বসে ছিল বাবার ঘরে। বাইরে এসে নীলকমলকে ধমক দিয়ে বলল, 'ছিঃ বাবার সঙ্গে অমন ক'রে কথা বল কেন দাদা। এক ফোঁটা মায়া মমতাও কি নেই তোমার মনে?'

ছেলের ওপর সারদাবাবুর অভিমানও কম ছিল না। সেই অভিমান থেকেই এই সব রূঢ় কথা বেরিয়ে আসত। নীলকমল কেবল প্রেসের নামের সঙ্গে বাবার নাম জড়িয়ে রেখেছিল, আর কিছুতে জড়াতে দেয় নি। ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। উর্মিলার সঙ্গে আলোচনা করেছে, তবু জিজ্ঞেস করেনি সারদাবাবুর মতামত।

উর্মিলা কিছু বললে জবাব দিয়েছে, 'দেখ, ও সব লোক-দেখান ভদ্রতা আমার আসে না। সারাজীবন চাকরি ছাড়া কিছু করলেন না, ব্যবসার উনি কি বোঝেন যে বলবেন?'

উর্মিলা প্রতিবাদ করেছে, 'কিছু না বুঝলেও তোমার চেয়ে ঢের বেশি বোঝেন। অন্তত বয়সের একটা অভিজ্ঞতা তো আছে।'

নীলকমল জবাব দিয়েছে, 'না, নেই। বয়সের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই অভিজ্ঞ-তার। চোখ কান বুজে থাকলেও মানুষের বয়স বাড়ে, চুল দাড়ি পাকে। কিন্তু তাই বলে বুদ্ধিও যে পাকবে তা তোকে কে বলল?'

উর্মিলাও টিপ্পনী কাটতে ছাড়ে না, 'কে আবার বলবে। রাজ্যসুদ্ধ লোক কেবল তোমার বুদ্ধির কথাই বলাবলি করে দাদা।'

বাবার জন্য ভারি দুঃখ হয় উর্মিলার। লজ্জা হয় নীলকমলের ব্যবহারের জন্য। কেন ওঁর মুখের ওপর অমন রূঢ় কথা বলে নীলকমল? কেন অমন ক'রে ওঁকে

আঘাত দেয়? অথচ উর্মিলার ওপর তো নীলকমলের মমতা কম নেই? বাবার ওপরই বা এমন নির্মম কেন?

প্রেসের কাজকর্মের ফাঁকে সারদাবাবুর কাছে গিয়ে বসে উর্মিলা। চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল বুলোয়। খোঁজ খবর দেয় প্রেসের, দাদার দোষ ঢাকতে চেষ্টা করে। বাবার সঙ্গে কথা বলে উর্মিলা এটুকু বুঝে নিয়েছে, মুখে যত রাগা-রাগিই করুন, যত কঠোরতাই দেখান, ভিতরে ভিতরে ছেলের ওপর মমতাও তাঁর কম নেই। নীলকমলও হয়তো সে কথা জানে। তাই এত বিরোধিতার সাহস পায়। ছেলের বিরুদ্ধে নিজে অনেক কথা বললেও অন্য কারো মুখ থেকে সে সব কথার প্রতিবাদ শুনতেই ভালোবাসেন সারদাবাবু, ভালোবাসেন ছেলের প্রশংসার কথা শুনতে।

বাবার পাকাচুল তুলতে তুলতে উর্মিলা সেদিন সেই কথাই শোনাচ্ছিল 'সত্যি, দাদা যে এমন কাজের লোক হয়ে উঠবে, তা আমরা ভাবতেই পারিনি বাবা। সকলেই ভেবেছিল অন্যান্য অফিসে যেমন করেছে, গোড়ায় ক'দিন একটু হৈ চৈ ক'রেই দাদা আবার পিছিয়ে আসবে। কিন্তু তা নয়, ঠিক আগের মতই সমানে চালিয়ে যাচ্ছে।'

সারদাবাবু বললেন, 'হুঁ, এ বলে ওকে দেখ, ও বলে একে দেখ। তোরা তো একজনের ঢাক আর একজনে বাজাবার তালেই আছিস। বুঝলুম তো সবই, কিন্তু তোর কি গতি হবে? তুই কি এই ভাবেই থাকবি নাকি চিরকাল?'

উর্মিলা চুপ ক'রে রইল। কিছুদিন বাদে বাদে এ প্রশ্নটা বাড়ির কারো না কারো মনে হঠাৎ জেগে ওঠে, কিন্তু প্রশ্নের সেই তীব্রতাটা যেন অনেকখানি মন্দীভূত হয়ে গেছে। নতুন কোন জবাব যেন আর দেওয়ার নেই। সবাই জানে এভাবে চলতে পারে না। উর্মিলার ওপর ঠিক যেন সুবিচার হচ্ছে না। অথচ সুবিচারের জন্য উঠে পড়ে লাগবার উদ্যমটা যেন কারো ভিতরেই আর নেই। চেষ্টা ক'রে তো যথেষ্ট দেখা গেল, এবার দেখা যাক বিনা চেষ্টায় কি হয়।

নিভাননী বলেন, 'জন্ম মৃত্যু বিয়ে, বিধাতাকে নিয়ে। মানুষের হাতে কিছু নেই।'

উর্মিলার বিয়ের কথাটা যখনই নীলকমলকে কেউ মনে করিয়ে দেয়, কিংবা কোন কোন মুহূর্তে নিজেরই মনে পড়ে যায় তার, নীলকমল তাকে আরো বেশি ক'রে প্রেসের কাজের মধ্যে টানে, কর্তৃত্বের অংশ দেয়।

উর্মিলা মাঝে মাঝে হাসে, 'ক্ষতিপূরণ করছ বুঝি দাদা।'

নীলকমল বলে, 'তা একটু একটু করতে চেষ্টা করছি বই কি। তোকে জোর ক'রে কারো ঘাড়ে তো আর ফেলে দিতে পারিনে।'

উর্মিলা বলে, 'তাই প্রেসটাই বুঝি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছ।'

প্রেসের ব্যাপারে উর্মিলা যে ক্রমেই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, তা উর্মিলা নিজেও জানে, বাড়ির অন্যান্য সবাইও টের পেয়েছে। কেবল কম্পোজ করা নয়, প্রুফ, প্রিণ্ট-অর্ডার, মেক-আপ, লে-আউট সম্বন্ধে মোটামুটি বেশ একটা জ্ঞান হয়েছে উর্মিলার। বরং এসব ব্যাপারে তার পরামর্শ, তার রুচিই বাইরের খদ্দের-দের পছন্দ হয় বেশি। সরকারী এবং অন্যান্য অফিসে যে সব চিঠি পত্র লিখতে হয় তার খসড়া নীলকমলই করে, টাইপ করে উর্মিলা। ডাক খোলে ডাক পাঠায় উর্মিলা। একটু একটু ক'রে নীলকমলের কাজ তার হাতে এসেই পৌঁছতে থাকে।

নীলকমল একেক দিন বলে, 'আমাকে যে এমন ভাবে খোঁড়া ক'রে তুললি, শেষে উপায় হবে কি? তোকে ছাড়া যে এক পাও চলতে পারব না। তোকে ছাড়া যে প্রেস চলবে না। তুই গেলে—'

উর্মিলা বলে, 'আমি যেন যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছি। এক পাও আমি নড়ছিনা এখান থেকে, তোমরা তাড়িয়ে দিলেও না।'

তাড়িয়ে দিতে যে চায় না নীলকমল, ধ'রে রাখতেই চায়, সে কথা তার ভাব-ভঙ্গি দেখে বুঝতে বাকী থাকে না উর্মিলার। সবাই জানে প্রেসের সঙ্গে প্রায় অচ্ছেদ্যভাবে উর্মিলা জড়িয়ে গেছে। আর জড়িয়ে গেছে দেখে সবাই যেন খানিকটা নিশ্চিন্তও হয়। যেন অবলম্বনটা উর্মিলাকে বাড়ির সবাই মিলেই জুটিয়ে দিয়েছে। এ বয়সে একটা কিছুকে অবলম্বন ক'রে, গভীরভাবে মেতে থাকা বরং ভালো। তাতে চিত্ত স্থির থাকে। চঞ্চল হওয়ার মত সময় থাকে না।

প্রেসের অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে মেলামেশা নিয়ে প্রথমে যে একটু আপত্তি উঠেছিল, তা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেল। মেসিন-ম্যানে, কম্পোজিটারে জড়িয়ে যে পাঁচ-জন কর্মচারী আছে, তার মধ্যে তিনজনই মাঝবয়সী, আর দুজন ছোকরা। কুড়ির নীচে বয়স। ছোট বড় সবাই ঊর্মিলাকে দিদিমণি বলে ডাকে। কড়া মনিবের মত মান্য করে, বেশি ভয় করে নীলকমলের চাইতে। তবু মাঝে মাঝে বিয়ের কথা ওঠে ঊর্মিলার। উঠবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা অস্বস্তির ভাব দেখা যায়। কেমন একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব হয় সারদাবাবু আর নিভাননীর মুখের। ঊর্মিলা কথাটাকে আর এগুতে দেয় না, বলে, সেজেগুজে পাত্রপক্ষের কাছে পরীক্ষার্থিনী হয়ে দাঁড়াবার বয়সও নেই।

এসব কথা কানে গেলে নিভাননী আবার চটে যান, 'না বয়স নেই। কুলীন বামুনের ঘরে তোর মত মেয়ের অভাব আছে নাকি ? যত সব ঢং।'

সারদাবাবুও সেই কথা তুলেছিলেন। যখনই ঊর্মিলা নিরালায় বাবার কাছে এসে বসে, পায়ে হাত বুলায়, কোনদিন বা শিয়রের কাছে বসে আঙুল চালায় চুলের মধ্যে, তখনই মেয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেন হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠেন তিনি।

'তোর কোন গতি বোধ হয় আর ক'রে যেতে পারলাম না।'

ঊর্মিলা বলল, 'কি যে বলেন বাবা। কিছুদিন থেকেই আপনার কেবল যাই যাই সুরু হয়েছে। কে যেতে দেবে আপনাকে ? যাবেন কোথায় ?'

সারদাবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'যেতে সবাই দেবে। কিন্তু যাব যে কোথায় তা কি ক'রে বলব।'

তের চৌদ্দ বছরের একটি ছোকরাকে রাখা হয়েছে বেয়ারা হিসাবে। নাম গন্ধর্ব। চেহারাটা অবশ্য গন্ধর্বোচিত নয়। মুখভরা বসন্তের দাগ। নাকটা চেপ্টা। ঠোঁটের এক জায়গায় কাটা। কিন্তু কাজকর্মে ভারি চটপটে। একতলা থেকে দোতলায় তার অবাধ গতিবিধি। প্রেসের কাজও করে, বাড়ির সকলের ফুট ফরমায়েসও খাটে।

গন্ধর্ব এসে দোরের কাছে দাঁড়াল, 'দিদিমণি।'

ঊর্মিলা মুখ বাড়িয়ে বলল, 'কি বলছিস।'

'দাদাবাবু ডাকছেন আপনাকে।'

উর্মিলা বিরক্ত হয়ে বলল, 'এইতো এলাম নিচে থেকে, বলগে আমি এখন যেতে পারব না। বাবার সঙ্গে কথা বলছি।'

কিন্তু সারদাবাবুই তুলে দিলেন মেয়েকে। বললেন, 'না বাপু, আর কোন দরকার নেই আমার কথার। তুমি যাও তোমাদের প্রেসে। দেখ গিয়ে আবার কি ফ্যাসাদ বেধেছে।'

মুখ মুচকে হাসল উর্মিলা। ভাবখানা—অমন নিস্পৃহ হলে কি হবে? সব দিকে লক্ষ্য আছে বাবার, মমতা আছে সব জিনিসের ওপর।

ফ্যাসাদ কিছু কিছু সুরু হয়েছিল। হেড কম্পোজিটার হরিবাবু দিন কয়েক আগে কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য প্রেসে চলে গেছেন। তাঁর জায়গায় উপযুক্ত লোক এখনো নেওয়া হয়নি। ফলে কাজকর্মের ভারি অসুবিধা হচ্ছে প্রেসে।

উর্মিলা অফিস ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, দোরের কাছে থমকে দাঁড়াল। ছাব্বিশ সাতাশ বছরের অপরিচিত একজন ভদ্রলোক নীলকমলের সামনের চেয়ারে বসে কথা বলছেন।

নীলকমল উর্মিলাকে ইতস্তত করতে দেখে বলল, 'ওকি, আয় এখানে। শিশিরকে বলেছিলাম লোকের কথা, সে-ই এঁকে পাঠিয়েছে। প্রেসের কাজকর্ম সম্বন্ধে আমার চেয়ে তোর অভিজ্ঞতাই তো বেশি। সেইজন্যই তোকে ডাকলাম, আলাপ আলোচনা ক'রে দেখ এঁর সঙ্গে। হেমন্তবাবু, এর কথাই বলছিলাম আপনাকে, আমার বোন। বলতে গেলে প্রেসের সর্বেসর্বা।'

হেমন্ত কপালে হাত তুলে নমস্কার করল। শ্যামবর্ণ, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায় চেহারা, মুখ ভ'রে ছোট ছোট বসন্তের দাগ না থাকলে মুখখানাকে সুন্দরই বলা চলত। কেবল বসন্তের দাগই নয়, জীবনের অনেকগুলি বছর যে কৃচ্ছ্র তার মধ্যে কেটেছে তারও চিহ্ন আছে মুখে। গায়ে আধময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবী। বেশে বাসে বিত্তহীন ঘরের ছেলে বলে বেশ বোঝা যায়।

উর্মিলা প্রতিনমস্কার ক'রে দাদার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আর কি আলাপ করব? প্রেসের সব রকম কাজ জানা লোকই তো একজন দরকার আমাদের। উনি যখন এসেছেন, মনে হয় প্রেসের কাজে ওঁর অভিজ্ঞতা আছে।'

নীলকমল মৃদু হেসে বোনকে বলল, 'এই বুঝি তোর ইন্টারভিউ নেওয়া? ওঁর

অভিজ্ঞতা আছে কি না আছে ওঁকে সরাসরি জিজ্ঞেস ক'রে দেখবি। সেইজন্যই তো ডেকেছি তোকে।'

অস্থানে অসময়ে দাদার এই পরিহাসপ্রিয়তা দেখে বিরক্ত হোল উর্মিলা। দিন কয়েক আগে একবার অবশ্য সে বলেছিল দাদাকে, 'ইণ্টারভিউ জীবন ভরে কেবল দিলামই দাদা, নিলাম না। লোকজন যখন নাও, তখন দু'একবার আমাকে ইণ্টারভিউর চান্স দিয়ো তো।'

সেই চান্স নীলকমল এবার দিয়েছে উর্মিলাকে। দাদা যে সত্যি সত্যিই তাকে এমন অপ্রস্তুত আর বিব্রত করবে তা উর্মিলা ভাবতে পারেনি।

কোন যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে দাদার! একজন বাইরের লোকের সামনে, কর্মচারী হয়ে যে আসছে তাদের প্রেসে তার সামনে এ ধরণের হালকা কথাবার্তা কি ভালো?

ভাইবোনের ঘরোয়া রসিকতায় হেমন্ত কিন্তু যোগ দিল না। নীলকমলের দিকে চেয়ে বলল, 'তা হলে আপনাদের মতামতটা—'

নীলকমল বলল, 'বসুন', তারপর বোনের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলল, 'উর্মি, তাহলে তোমার মতামতটা—'

উর্মিলা এবার সরাসরি তাকাল হেমন্তর দিকে, বলল, 'প্রেসের কাজকর্ম জানেন শুনলুম। কতদিন আছেন এ লাইনে?'

হেমন্তর চোখেও এবার যেন একটু বিস্ময় আর কৌতুহল ফুটে উঠল, সত্যিই তার ইণ্টারভিউ নিচ্ছে নাকি মেয়েটি?

হেমন্ত বলল, 'বছর চারেক হোল।'

উর্মিলা বলল, 'কোন্ কোন্ প্রেসে কাজ করেছেন?'

হেমন্ত বলল, 'বরিশালের দু'তিনটে প্রেসে ছিলাম।'

উর্মিলা বলল, 'ও, মফঃস্বলে ছিলেন। তা সে সব প্রেসের চাকরি ছেড়ে এলেন কেন?'

হেমন্ত বলল, 'নানা অসুবিধার জন্যই ছেড়ে আসতে হোল।'

উর্মিলা গম্ভীরভাবে বলল, 'এখানে আমাদের একজন অভিজ্ঞ লোকের দরকার। চার্জে থাকতে হবে প্রেসের। দরকার মত বাইরেও বেরুতে হবে। পারেন সে সব? রাস্তাঘাট সব চেনা আছে?'

জিজ্ঞেস করতে করতে রীতিমত আত্মপ্রসাদ বোধ করল উর্মিলা। দাদা দেখুক ইণ্টারভিউ নিতে সে পারে কিনা।

পাত্রপক্ষের কাছে কতবার কত রকম প্রশ্নই শুনতে হয়েছে। কেউ চেয়েছে রবিঠাকুরের কবিতা শুনতে, কেউ বা রান্নার, কেউ ঘর গৃহস্থালীর। অসংখ্য রকম প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে উর্মিলাকে। এতদিন পরে প্রশ্ন করবার অধিকার যখন নিজের হাতে এসেছে তখন উর্মিলা তার শোধ তুলে ছাড়বে।

কিন্তু হেমন্ত সব রকম প্রশ্নের সুযোগ তাকে এই মুহূর্তে দিল না।

উর্মিলার প্রশ্নের জবাবে মৃদু হেসে বলল, 'এতদিন মফঃস্বলে থাকলেও কলকাতার রাস্তাঘাট আমি মোটামুটি চিনি। তাতে কোন অসুবিধা হবে না। কাজকর্মের অভিজ্ঞতা কাজ দেখলেই তো বুঝতে পারবেন। সব কথা আমার নীলকমল বাবুর সঙ্গে হয়েছে।'

হেমন্ত নীলকমলের দিকে তাকাল, 'তাহলে—'

নীলকমল বলল, 'বলেছি তো, কাজকর্ম পছন্দ হলে আমরা টাকা পঞ্চাশেক আপাতত দিতে পারব। ইনফ্যাণ্ট প্রেস। এর বেশি খরচ করা এখন আর সম্ভব নয়। তারপর যদি উন্নতি হয় তখন আপনাদের সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই বিবেচনা করা হবে। খেটে খুটে চেষ্টা করে দেখুন জিনিসটাকে আগে দাঁড় করান যায় কিনা।'

হেমন্ত বলল, 'আজ্ঞে সে চেষ্টা তো করবই।'

নীলকমল বলল, 'তাহলে কাল থেকেই লেগে যান। আমাদের আরো অনেক লোক ছিল হাতে। কিন্তু শিশিরের নাম ক'রে এসেছেন আপনি। আপনাকে নিতে পারলেই আমরা খুসি হই। শিশির আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

হেমন্ত উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানাল, 'তাহলে কাল থেকে—'

নীলকমল জবাব দিল, 'হ্যাঁ, কাল থেকেই লেগে যান। লোক শর্ট আছে আমাদের।'

হেমন্ত উঠে গেলে নীলকমল উর্মিলাকে বলল, 'ইণ্টারভিউ নেওয়ার সাধ ছিল, হোল তো এবার? কিন্তু ইণ্টারভিউ যারা দিতে জানে না, তারা নিতেও জানে না। প্রেসের খুঁটিনাটি ভালো ক'রে জিজ্ঞেস করলেই পারতি। অমন ঘাবড়ে গেলি কেন বল দেখি।'

উর্মিলা বলল, 'বাঃ, ঘাবড়ালাম আবার কোথায়? লোকটি বেশ একটু চটেছে বলে মনে হোল, তাই না দাদা?'

নীলকমল বলল, 'চটবেই তো। এত বিষয় থাকতে তুই কাউকে বাঙাল

মনে করলে সে চটবে না? অবশ্য হেমন্তকে কাল বলে দিতে হবে যে আমরাও বাঙাল। পুরোপুরি এক পুরুষের সহুরেও নয়।'

উর্মিলা বলল, 'তা বলতে চাও বলো। রাস্তাঘাট তো দূরের কথা রান্নাবান্না জানে কিনা তাও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল আমার।'

নীলকমল বলল, 'গলায় পৈতা দেখেছিস বুঝি? বড় স্পর্ধা তো তোর।'

উর্মিলা বলল, 'স্পর্ধা আমার নয় দাদা, স্পর্ধা এই লোকটির। কি ভাবে আমাকে এড়িয়ে গেল দেখলে তো। টের তো পায় নি, আসল ম্যানেজারটি কে?'

নীলকমল হাসল, 'দোহাই উমি। বেশি টের পাইয়ে দরকার নেই। উপযুক্ত লোক পাওয়া শক্ত।'

উর্মিলা বলল, 'তোমার এই লোকটি কতখানি উপযুক্ত হবে তা অবশ্য বলতে পারিনে, কিন্তু শক্ত যে হবে তা বেশ বোঝা গেল। যেমন চেহারায়, তেমনি কথাবার্তায়, বেশ একটু চোয়াড়ে চোয়াড়ে ভাব, তাই না?'

নীলকমল বলল, 'কাজের লোক একটু চোয়াড়েই হয়।'

উর্মিলা বলল, 'তা যেমন হয়, তেমনি যারা কাজ করায় তাদের আরো চোয়াড়ে হওয়া দরকার দাদা। ম্যানেজারীটা আমারই নিতে হোল দেখছি, তোমার মত নরম মনিব পেলে সবাই সুবিধা নিতে চাইবে।'

নীলকমল হাসল, 'তুই যে রাতারাতি একেবারে ঝানু ক্যাপিটালিস্ট হয়ে গেলি। আজ-কালকার দিনকাল তো দেখছিস। মুখের মিষ্টি দিয়ে কাজ করাতে হয় লোককে, কড়া কথায় কোন লাভ হয় না'

পরদিন থেকে কাজে লেগে গেল হেমন্ত। মফঃস্বল প্রেসের অভিজ্ঞতা হলেও যেটুকু আছে সেটুকু যে হেমন্তের পাকা অভিজ্ঞতা সে কথা সবাই স্বীকার করল। কেবল খাটতেই নয়, খাটাতেও জানে হেমন্ত। সে যতক্ষণ থাকে কোন কম্পোজিটার চুপচাপ বসে থেকে কাজে ফাঁকি দিতে পারে না। তাদের মধ্যে যথা-যোগ্য কাজ ভাগ ক'রে দেয় হেমন্ত। দুখানা মাসিক পত্রিকার এবং খান তিন চার বইয়েরও কাজ এসেছে প্রেসে। সে সব কাজে পেজের মেক-আপ, লে-আউটে আগে-কার হরিবাবুর চাইতে হেমন্তর দক্ষতা এবং সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় বেশি। নীলকমল বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল, এতদিনে সত্যিই একজন যোগ্য লোক পাওয়া গেছে। কিন্তু লোক যোগ্য হলেও ততখানি প্রসন্ন হতে পারল না উর্মিলা। হরিবাবু যখন ছিলেন, উর্মিলা যা পরামর্শ দিত তাই হোত। এমনকি অন্যান্য কম্পোজিটাররা হরিবাবুর চাইতে উর্মিলার মতামত মেনে চলত বেশি। ভুল হলেও মানত। কারণ

পছন্দটা উর্মিলার পছন্দ। কিন্তু হেমন্ত আসায় অন্যরকম হতে লাগল। নীলকমলও এসব খুঁটিনাটি ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভর করলহেমন্তর ওপর। নিজের রুচি, নিজের পছন্দ প্রত্যেকটি বিষয়ে খাটাতে লাগল হেমন্ত। উর্মিলার নির্দেশ আর আমল দেয় না কেউ।

উর্মিলা একদিন অভিযোগও করল দাদার কাছে, বলল, 'যা বলেছিলাম দাদা, তোমার এই হেমন্তবাবু কিন্তু সত্যিই একটু বেয়াড়া বেয়াড়া।'

নীলকমল বলল, 'তা হোক, কাজকর্ম ভালো করলেই হোল। খুঁটিনাটি ব্যাপারে ওদের একটু স্বাধীনতা দিস। হাতের কাজ তো! বার বার যদি হাত টেনে ধরিস—এটা কোরো না, ওটা কোরো না, তাহলে ওদের হাত চলবে না। নিজেদের মর্জি-মাফিক ওদের খানিকটা চলতে দিতে হয়, না হলে ক্ষতি হয় কাজ-কর্মের। আমাদের দেখতে হবে ব্যবসার সুবিধা অসুবিধা।'

কিন্তু উপদেশটা ঠিক যেন মনঃপূত হয় না উর্মিলার। ব্যবসার সুবিধা অসু-বিধাই কি সবটুকু? নিজের পছন্দ নেই? নিজের পছন্দমত জিনিস নিজের হাতে করবার, নিজের চোখে দেখবার আনন্দ নেই আলাদা? তার নিজের ঘরের এক দেওয়ালের একখানা ফটো আর এক দেয়ালে মা যদি টাঙিয়ে রাখে, উর্মিলার মন খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকে। তার র‍্যাকের একখানা বই যদি দাদা তুলে নিয়ে যেমন তেমন ক'রে বিছানার ওপর রাখে, মনে মনে ভারি রাগ হয় উর্মিলার। ব্লাউসের হাতার প্যাটার্ণ যদি বউদি উর্মিলার পছন্দমত না ক'রে তার নিজের পছন্দমত করে, সে ব্লাউস গায়ে দিয়েও কেমন যেন খালি-গা খালি-গা মনে হয় উর্মিলার। আর এত বড় গোটা একটা প্রেস, তার কাজকর্ম একজন বাইরের লোকের পছন্দমত চলবে? ব্যবসার খাতিরেও একথাটা মেনে নেওয়া শক্ত হয় উর্মিলার পক্ষে।

আরো একটা ব্যাপার দেখা গেল। শুধু নিজের পছন্দ খাটিয়েই হেমন্ত সন্তুষ্ট রইল না। উর্মিলার কাজকর্ম, পছন্দ অপছন্দের ওপরও মতামত আর মন্তব্য করতে সুরু করল।

অফিস ঘরে বসে উর্মিলা সেদিন একটা জরুরী চিঠি টাইপ করছে। হেমন্ত একটা গ্যালি প্রুফ হাতে নিয়ে এসে উপস্থিত হোল, 'এ প্রুফ আপনি দেখেছেন?'

উর্মিলা চোখ তুলে বলল, 'হ্যাঁ, কি হয়েছে প্রুফের ?'

হেমন্ত মৃদু হাসল, 'হয়নি কিছু। তবে আইনগুলি যেমন চলতি আছে, সেভাবে হলে খুব ভালো হয়। ভুল ধরতে সুবিধা হয় কম্পোজিটারদের। সমস্ত শব্দটা কেটে দেবেন না। যেমন ধরুন এই 'হৃদয়' শব্দটা। তারপর দেখুন এই 'নির্মম'। রেফটা পড়েনি। রেফটা বুঝিয়ে দিতে হলে—'

উর্মিলা বলল, 'থাক থাক, আপনাকে আর বোঝাতে হবে না। হরিবাবুর সময় আমি তো ওই রকমই দেখতাম। তিনি তো বলেন নি কিছু !'

হেমন্ত বলল, 'বলতে বোধ হয় তিনি সঙ্কোচ বোধ করেছেন। তা ছাড়া ভেবেছেন, এই সব জিনিস তো আপনার শিখবার কথা নয়, দয়া ক'রে যতটুকু শিখেছেন ততটুকুই ভালো।'

উর্মিলা বলল, 'হুঁ, আর আপনি কি ভাবেন ?'

হেমন্ত বলল, 'আমি বলি শিখলেনই যখন, একটু ভালো করেই শিখুন। সব বিদ্যাই তো বিদ্যা।'

উর্মিলা বলল, 'আচ্ছা, আপনি এখন যান।'

কিন্তু হেমন্তের কথাটা উর্মিলা ঠিক অগ্রাহ্য করতে পারল না।

হেমন্তর প্রুফ দেখার পদ্ধতিটা আরো সুবিধাজনক সে কথা মনে মনে স্বীকার করল উর্মিলা। তাছাড়া মনে হলো কর্মচারী বলে লোকটি সব সময় মাথা নিচু ক'রে বিনয় না দেখালেও খুব উদ্ধতও তো ওকে বলা যায় না। সম্পূর্ণ রূঢ়ভাষীও তো নয়! বরং যখন বলল, 'শিখলেনই যখন, একটু ভালো ক'রেই শিখুন।' কথাটার মধ্যে তখন যেন বেশ একটু মমত্ব, বেশ একটু মাধুর্যের সুরই ধরা পড়ল উর্মিলার কানে। হরিবাবুও সস্নেহে তাকে সব শেখাতে চেয়েছেন, কিন্তু হেমন্ত তাকে যেন আরো ভালো ক'রে শেখাতে চায়। তা চায় চাক। শিখতে উর্মিলার আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে হেমন্ত যেন ভুলে না যায়, উর্মিলা তার মনিব, ছাত্রী নয়!

আর একদিন; 'নব পত্রিকা' নামে একটি মাসিকপত্র ছাপা হয় উর্মিলাদের প্রেস থেকে। মেয়েদের কথা বিভাগে উর্মিলা নিজেই সেই সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেছে। বিষয় 'স্বদেশী আন্দোলনে নারী'। প্রবন্ধ রচনায় অবশ্য অনেক সাহায্য করেছে নীলকমল। জায়গায় জায়গায় নতুন ক'রে প্যারাগ্রাফ্ লিখে দিয়েছে।

উর্মিলা একটু খুঁৎখুঁৎ করলেও তেমন আপত্তি করেনি। কারণ দাদার লেখাটা ভালোই হয়েছে তার চেয়ে! কিন্তু মেক-আপের সময় উর্মিলা যে রকম বলে দিয়েছিল, হেমন্ত একেবারে তা আমূল পালটে দিল। কয়েকজন নেত্রীর ব্লক যাবে প্রবন্ধটায়। তাদের স্থান অদল বদল ক'রে দিল হেমন্ত।

মেক-আপ প্রুফটা দেখে উর্মিলা নিজে ছুটে গেল হেমন্তর কাছে। কৈফিয়ৎ তলবের স্বরে বলল, 'আপনি কার কথামত এমন করেছেন?'

হেমন্ত বলল, 'কারো কথামত করিনি। মনে হলো লে-আউটটা এইরকম হোলেই ভালো হবে। অবশ্য আপনি যে ভাবে করেছিলেন সেটাও রেখে দিয়েছি। এই দেখুন। যেটা আপনার পছন্দ হয়, সেটাতেই প্রিন্ট অর্ডার দিন।'

দুটো জিনিসই তুলনা ক'রে দেখল উর্মিলা। মনে মনে স্বীকার করল হেমন্তর করা পেজের মেক-আপটাই ভালো হয়েছে। ঠিক ঠিক জায়গায় বসেছে ব্লকগুলি।

একবার উর্মিলা ভাবল নিজের হুকুমই বহাল রাখে, নিজের নির্দেশ দেওয়া মেক-আপটাই চালিয়ে দেয়, কিন্তু কেমন যেন বাধো-বাধো লাগল। দেখতে যখন হেমন্তরটাই ভালো দেখাচ্ছে, ওইটাই থাক। দাদার সংশোধনটা যেমন খুঁৎখুঁৎ সত্ত্বেও মেনে নিয়েছিল, হেমন্তর সংশোধনও তেমনি ক'রে মেনে দিতে ইচ্ছা করল।

মুখে অবশ্য হেমন্তর কৃতিত্ব উর্মিলা তেমন স্পষ্ট স্বীকার করল না, বলল, 'দিন তাহলে আপনারটাই। খেটে খুটে যখন করেছেন। কিন্তু দেখবেন যেন খারাপ না দেখায়।'

হেমন্ত বলল, 'খারাপ দেখালে কি আর দিতাম? ইচ্ছা ক'রে নষ্ট করতাম আপনার জিনিস?'

'আপনার জিনিস!' কথা দুটির মধ্যে কেমন যেন একটু আপন-আপন সুর আছে বলে মনে হলো উর্মিলার। কাজকর্ম হেমন্ত ভালোই বোঝে, সেটা স্বীকার করে নিতে ঠিক যেন আগের মত কষ্ট হলো না।

জ্বরের জন্য দু'তিন দিন ধ'রে কামাই হচ্ছে হেমন্তর। উর্মিলা তার জায়গায় নির্দেশ উপদেশ দিতে লাগল নিম্নতম কম্পোজিটারদের। উর্মিলা দেখল তারা ঠিক আগের মত খুঁৎখুঁৎ করছে না; কেননা নির্দেশটা উর্মিলার মুখ থেকে বেরুলেও নির্দেশের ধরণটা অবিকল হেমন্তর মত। জন দুই কমতি আছে কম্পোজিটার। খানিকটা ম্যাটার নিয়ে নিজেই কম্পোজ করতে বসল উর্মিলা। কম্পোজিং সম্বন্ধেও

কম্পোজিটারদের কিছু নতুন রকমের উপদেশ নির্দেশ দিয়ে গেছে হেমন্ত। সে সব নির্দেশ অনুসরণ করলে কাজ আগের চাইতে তাড়াতাড়ি এবং ভালো রকমের হয় কিনা একটু পরীক্ষা ক'রে দেখবার সাধ গেল উর্মিলার।

নিজের জন্য আলাদা টাইপ কেস, আলাদা বসবার জায়গা রাখাই আছে। অন্য কোন কম্পোজিটারের সেখানে যাওয়ার হুকুম নেই। আর কোথাও সীট না পেলে নীলকমলের আদেশ নিয়ে কেবল হেমন্তই সেখানে কদাচিৎ দু'একদিন গিয়ে বসে।

সেদিন উর্মিলা গিয়ে বসল হেমন্তর পদ্ধতি পরীক্ষা করবার জন্য। কাজ সুরু ক'রেই খুসিতে মুখ ভরে উঠল উর্মিলার। হেমন্ত মিথ্যা বলেনি। তার নির্দিষ্ট ধরণে কাজ করলে সত্যিই বেশ সুবিধা হয় কাজে।

মিনিট পনেরর মধ্যে একটা পেজ প্রায় কম্পোজ ক'রে এনেছে উর্মিলা। গন্ধর্ব এসে খবর দিল, 'দিদিমণি, এক বাবু খুঁজছেন দাদাবাবুকে।'

উর্মিলা বলল, 'দাদাকে? তিনি তো পেপার কণ্টোল অফিসে গেছেন। কি নাম, কি দরকার?'

বলতে বলতে উর্মিলা নিজেই উঠে এল।

বাইরের কেউ এলে নীলকমল না থাকলে ইদানীং হেমন্তই গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু ওদের দুজনের কেউ যখন নেই, উর্মিলা নিজেই উঠে গেল তাড়াতাড়ি। নানা জরুরী কাজে বাইরের পার্টি সব আসে। গন্ধর্ব কি বলতে কি বলে ফেলবে তার ঠিক কি? কিন্তু প্রেসঘর থেকে বেরুতেই উর্মিলা একেবারে থমকে দাঁড়াল। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সরিৎ!

মুহূর্তকাল সরিৎও নির্বাক পলকহীন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বলল, 'আমি নীলকমলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

উর্মিলা একটুকাল চুপ ক'রে রইল, তারপর বলল, 'দাদা বেরিয়ে গেছেন।'

সরিৎ বলল, 'হ্যাঁ, তাও শুনলুম তোমাদের বেয়ারার কাছে।'

উর্মিলা একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে, 'তা শুনেও দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? আর দাদার সঙ্গে দেখা করবারই বা কি দরকার তোমার?' কিন্তু জিজ্ঞেস করল না। কি হবে অত কথা বলে? কোন কথা বলবার প্রয়োজনই কি আর আছে?

সরিৎ বলল, 'নীলকমলের সঙ্গে দেখা হোল না। তাকে ব'লো তার সেই

নিমন্ত্রণের চিঠি পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি তখন আমাদের ফার্মেরই একটা জরুরী কাজে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার সময় পাইনি। তারপর ভাবলাম খালি হাতে এসেই বা লাভ কি! বইটা বেরুলেই আসব। নীলকমলের প্রেসের মুখ দেখব আমার কবিতার বই দিয়ে। কাল সেই বইটা বেরিয়েছে। তাকে দিয়ো।' কালো রঙের একখানা চটি বই উর্মিলার দিকে বাড়িয়ে ধরল সরিৎ।

কিন্তু উর্মিলা সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়াল না, বলল, 'বইটায় দাদার কোন দরকার আছে কিনা তাতো জানিনে। তাঁর বিনা অনুমতিতে কি ক'রে নিই?'

সরিতের অকুণ্ঠ আচরণে মনে মনে বিস্মিত হোল উর্মিলা। অবাক হয়ে ভাবল—মানুষ কতখানি নির্লজ্জ হলে অত কাণ্ডের পরও ফের এমন ক'রে বই উপহার দিতে আসতে পারে। না কি, সে সব দিন দেড় বছর পিছনে পড়েছে বলেই সকলের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে ভেবেছে সরিৎ? তার সমস্ত অপরাধ চাপা পড়ে গেছে দেড় বছর সময়ের নিচে? আঠার মাস গা ঢাকা দিয়ে থেকে সরিৎ কি ভেবেছে সমস্ত কিছু ঢাকা পড়ে গেছে?

উর্মিলার দিকে আর এক মুহূর্ত অপলকে তাকিয়ে থেকে সরিৎ বলল, 'আচ্ছা বই দিতে আমি তাহলে বরং আর একদিনই আসব। কিন্তু তোমার হাতে ওসব কি উর্মিলা? ডান দিকের ভ্রূর ওপরেই বা কিসের দাগ? ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছে তো?'

এবার উর্মিলার খেয়াল হোল। তাড়াতাড়িতে হাত না ধুয়েই বেরিয়ে এসেছে। একটু অপ্রতিভ হয়ে উর্মিলা বলল, 'কম্পোজ করছিলাম। বোধ হয়, প্রেসের কালিই লেগে থাকবে।'

সরিৎ বলল, 'ও! প্রেসের কালি, তাই বল। কি বললে, কম্পোজ করছিলে? নিজের হাতে কম্পোজও করতে জানো নাকি তুমি?'

উর্মিলা বলল, 'জানি।'

দু' একজন কম্পোজিটার উঁকি মারছিল প্রেসঘর থেকে।

উর্মিলা বলল, 'আপনার যদি আরো কিছু বলবার থাকে অফিসের ভিতরে আসুন।'

শেষের কয়েক মাস দাদার এই বিশিষ্ট বন্ধুটি আর 'আপনি' ছিল না উর্মিলার

কাছে, 'তুমি'তে নেমে আপনতর হয়েছিল। কিন্তু সে অতীতের ঘটনা। আজ ইচ্ছা ক'রেই ফের 'আপনি' সুরু করল ঊর্মিলা। সরিৎ তা লক্ষ্য ক'রেও কোনও কথা বলল না। ঊর্মিলার পিছনে পিছনে এসে তার সামনের চেয়ারে বসল।

আধা পরিচিত, অনেক লোককে সামনে নিয়ে বসেছে ঊর্মিলা। প্রেসের ব্যবস্থা সংক্রান্ত কথাবার্তা বলছে। আজ সরিৎও তাদেরই একজন। ঘরে এসে সামনের চেয়ারে বসলেও সে সম্পূর্ণ বাইরের লোক। তার সামনে বসতেও আর কোন ভয় নেই ঊর্মিলার।

একটু চুপ ক'রে থেকে ঊর্মিলা বলল, 'হ্যাঁ, বলুন কি বলছিলেন। কম্পোজ করতে আমি জানি। আর কিছু বলবার আছে আপনার?'

সরিৎ বলল, 'না। আর যা বলবার আছে তা মুখের কথায় বলা যায় না, কবিতায় বলা যায়। কোন কোন জায়গায় প্রেসের কালি যে অপরূপ প্রসাধনের বস্তু হয়ে ওঠে তা আজ এই প্রথম দেখলাম।'

ঊর্মিলা বলল, 'এবার আরো একটা জিনিস আপনাকে দেখান দরকার।' বলে খোলা দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল ঊর্মিলা।

একবার যেন ফ্যাকাসে দেখাল সরিতের মুখ, তারপর আরক্ত হয়ে উঠল।

'আচ্ছা।' বলে সরিৎ এবার উঠে দাঁড়াল, 'নীলকমলকে বোলো আমি এসেছিলাম।'

ঘর থেকে নেমে ছোট্ট উঠান পেরিয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সরিৎ। কিন্তু ঊর্মিলার যেন আর উত্থানশক্তি নেই। চেয়ারের সঙ্গে কে যেন তাকে পেরেক দিয়ে গেঁথে রেখে গেছে। মিনিট কয়েক বাদে ঊর্মিলার খেয়াল হোল কালো রঙের বইটা টেবিলের ওপরই পড়ে রয়েছে। সরিৎ সেটা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় নি। ঊর্মিলা একবার ভাবল বইটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর একবার তার মনে হোল, না ছোঁয়াই ভালো। তৃতীয় বার কৌতুহলই জয়ী হোল।

বইটা তুলে নিয়ে ঊর্মিলা ওপরের নামটা পড়ল, 'কলস্বর।' কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ আর কয়েকটি গদ্য কবিতার সমষ্টি', বেশীর ভাগই পুরোন রচনা। দাদার টেবিলের চিঠির প্যাডে, হলদে রঙের হ্যাণ্ডবিলের পিঠে হাতের মুঠির ভিতরে গুঁজে দেওয়া টুকরো কাগজে এসব কবিতার অনেকগুলিই ঊর্মিলা দেখেছে। কিন্তু তখন এগুলির যা মানে ছিল, আজ আর তা নেই। ছাপার অক্ষরে একেবারে আলাদা হয়ে গেছে চেহারা। তবু মাঝে মাঝে দু' একটি পংক্তি চোখে পড়ল ঊর্মিলার। এক জায়গায় আছে:

'মানে কিছু না হয় না হোক
ছড়ানো থাকুক শুধু দু' চারিটি শ্লোক
মুখে মুখে, কানে কানে, দূরের চিঠিতে,
কিছু বা উদ্ধৃতি তার
গোপন গানের খাতাটিতে।'

উর্মিলার মনে পড়ল তার গানের খাতার জন্য সত্যিই গুটি কয়েক গান একবার রচনা ক'রে দিয়েছিল সরিৎ। কিন্তু সেই একই গান আরো কতজনের খাতায় সে লিখে দিয়ে এসেছে তার ঠিক কি? হয়তো সে গানগুলি এখন পর্ণার খাতাতেও লেখা রয়েছে। একই গান নানা জনের কানের কাছে গুন গুণ করাই এদের পেশা।

কিন্তু উর্মিলার দাদাকে বই উপহার দিতে সরিৎ কেন এল এতদিন পরে? বইটা কি লক্ষ্য না উপলক্ষ্য? এই অজুহাতে একবার কেমন আছে উর্মিলারা তাই দেখবার কৌতূহল হয়েছে সরিতের? বইটা ফেলে দেওয়াই উচিত ছিল কিন্তু টেবিলের এক ধারে সেখানা সরিয়ে রাখল উর্মিলা।

প্রেসঘরে ঢুকল না উর্মিলা, নিজের ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল, দেখল সত্যিই খানিকটা কালির দাগ লেগে আছে ভ্রূর একটু ওপরে। আঁচলের কোণ দিয়ে ঘসে তুলল সেই কালি।

নিভাননী এসে দাঁড়ালেন পিছনে, 'উর্মি কার সঙ্গে কথা বলছিলি! সরিতের গলা বলে মনে হোল যেন।'

উর্মিলা বলল, 'হ্যাঁ, সেই এসেছিল।'

নিভাননী বললেন, 'সেই এসেছিল! এত দুঃসাহস তার! আর তুই কিনা তার সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বললি! লজ্জা হোল না, ঘৃণা হলো না? আমি হলে তো থুথু ছিটিয়ে দিতুম।'

উর্মিলা বলল, 'আমিও থুথুই ছিটিয়েছি মা।'

নীলকমলও ফিরে এসে টেবিলের ওপর দেখল সরিতের কবিতার বই, বলল, 'এ কি?'

উর্মিলা বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছ।'

নীলকমল বলল, 'তা পাচ্ছি। কিন্তু কি ক'রে এল বুঝতে পাচ্ছিনা।'

উর্মিলা বলল, 'বোঝা এমন কি আর কঠিন! তোমার বন্ধু তোমার জন্য উপহার রেখে গেছে।'

নীলকমল বলল, 'তুই রাখলি কেন?'

উর্মিলা বলল, 'আমি কেন রাখতে যাব। প্রেস খোলার সময় তুমি নিমন্ত্রণের চিঠি দিয়েছিলে, এ তারই লৌকিকতা।'

নীলকমল গম্ভীরমুখে বইটা একবার নেড়ে দেখল, তারপর হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝের ওপর।

উর্মিলা মৃদু একটু হাসল, কোন কথা বলল না, বইটা তুলতে চেষ্টা করল না।

পরদিন সেই বই এসে তুলল হেমন্ত, 'আহাহা, বইটা এমন ক'রে নষ্ট হচ্ছে কেন। বাঃ। চমৎকার গেট-আপ তো! দেখেছেন কি সুন্দর ছাপা আর বাঁধাই?'

উর্মিলা একটু হাসল, 'দেখেছি।' গেট-আপ আর ছাপা বাঁধাই ছাড়া বইয়ের আর কিছু বুঝি আপনার চোখে পড়ে না? কতদূর অবধি পড়াশুনো করেছিলেন?'

হেমন্ত জবাব দিল, 'বেশি দূর নয়।'

উর্মিলা বলল, 'তবু শুনি।'

হেমন্ত বলল, 'কি করবেন শুনে? সেকেণ্ড ক্লাস অবধি উঠেছিলাম।'

উর্মিলা বলল, 'ও। তবে তো অনেক দূর উঠেছিলেন। লজ্জার কি আছে? আমার বিদ্যাও ওই পর্যন্তই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ঢের শিখেছি। যা পেশা তাতে দুজনেরই অক্ষর পরিচয় পর্যন্তই তো যথেষ্ট ছিল। কি বলেন?'

কথার মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠতার সুর ফুটে উঠেছে টের পেয়ে উর্মিলা নিজেই কেমন যেন বেশ লজ্জিত হয়ে পড়ল। তার মুখের দিকে হেমন্ত যে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে ছিল উর্মিলা তাও লক্ষ্য করল সেই সঙ্গে।

উর্মিলা তাড়াতাড়ি সচেতন হয়ে বলল, 'আচ্ছা, কাজে যান আপনি। ওকি, বইটা নিয়ে চললেন নাকি?'

হেমন্ত ফিরে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

উর্মিলা বলল, 'কিন্তু না বলেই নিচ্ছিলেন যে।'

হেমন্ত বলল, 'ও! আমি ভেবেছিলাম এ বইতে আপনাদের আর দরকার নেই।'

উর্মিলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, 'কি ক'রে বুঝলেন?'

হেমন্ত মৃদু হাসল, 'মাটিতেই পড়ে ছিল তো। বইটা কি নেব, না রেখে যাব?'

উর্মিলা একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'না, এখন থাক। দরকার হয় তো পরে নেবেন।'

হেমন্ত ঘাড় নেড়ে বলল, 'আচ্ছা।'

হেমন্ত প্রেস ঘরে গিয়ে ঢুকলে উর্মিলার মনে হোল বইটা ওকে দিলেও হোত। কবিতাগুলির কিইবা বুঝত হেমন্ত। আর বুঝলেই বা ক্ষতি ছিল কি!

কিন্তু আশ্চর্য, অমন করে অপমানিত হওয়ার পরেও সরিৎ আরো একদিন এসে উপস্থিত হোল। এবার আর নতুন কোন কবিতার বই নিয়ে নয়, খান কত বইয়ের অর্ডার নিয়ে। সরিতের কোন্ এক বন্ধু আছে পাবলিশার। তার প্রেস নেই, বাইরের প্রেস থেকে বই ছাপায়। নীলকমল কি কিছু কিছু বই ছাপাবার ভার নিতে পারে? যা বাজার দর তার চাইতে বরং দু'চার টাকা বেশিই দিতে পারে সরিতের বন্ধু। দরকারটা তার জরুরী।

অফিস ঘরে উর্মিলা বসে কি একটা চিঠি টাইপ করছিল, সরিতের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিজের কাজে মন দিল, কোন কথা বলল না।

নীলকমল ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, বইয়ের কাজ আমাদের প্রেসে আপাতত হবে না।'

হেমন্ত কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, 'হবে না কেন নীলকমলবাবু, খুব হবে। আমি ভার নিলুম কাজ তুলে দেওয়ার।'

সরিৎ এবার কৌতুহলী হয়ে তাকাল হেমন্তর দিকে, তারপর নীলকমলের দিকে ফিরে চেয়ে বলল, 'এটি আবার কে?'

'আমাদের হেড কম্পোজিটার।'

সরিৎ একটু হাসল, 'ও, আপনারা পারবেন কাজ তুলে দিতে?'

হেমন্ত বলল, 'তা পারব বই কি!'

সরিৎ বলল, 'তাহলে ভেবে দেখ নীলকমল। কম্পোজিটাররা পারে। এখন

তোমরা পার কি পার না। ইচ্ছা করলে এখনো আমাকে জানাতে পারো, পরেও পারো খবর দিতে।'

নীলকমল বলল, 'আচ্ছা, সে কথা তোমাকে পরেই জানাব সরিৎ।'

এবার কৌতূহলী হয়ে উঠল হেমন্ত, বলল, 'আপনার নামই কি সরিৎ মুখোপাধ্যায়?'

সরিৎ বলল, 'হ্যাঁ, আমারই নাম। কেন বলুন তো?'

হেমন্ত বলল, 'আপনার একখানা কবিতার বই দেখছিলাম সেদিন।'

সরিৎ বলল, 'তাই নাকি? কেমন লাগল বলুন তো!'

এতক্ষণে মনে হোল সরিতের—নীলকমলরা তার বইটার কথা এখন পর্যন্ত উল্লেখ করে নি।

হেমন্ত বলল, 'বেশ হয়েছে। কোন্ প্রেসে দিয়েছিলেন বলুন তো। চমৎকার ছেপেছে।'

'ও!' কৌতুকে উছলে উঠল সরিতের চোখ, 'আপনাদের প্রেসে বই দিলে পারতেন অমন ছাপতে?'

হেমন্ত বলল, 'চেষ্টা ক'রে দেখতে পারতাম।'

খানিক বাদে উঠে গেল সরিৎ। যাওয়ার আগে আর একবার তাকিয়ে গেল ঊর্মিলার দিকে। নিবিষ্ট মনে সে টাইপ করে যাচ্ছে।

নীলকমল এবার ধমক দিল হেমন্তকে, 'আপনাকে আগুবাড়িয়ে কথা বলতে কে বলেছিল?'

হেমন্ত বলল, 'কেউ বলেনি। ফুরনে কাজ করে কম্পোজিটাররা। কদিন ধ'রে তো তেমন কাজ নেই। কাজ হাতে না পেলে ওরা পয়সা পাবে কি করে?"

ঊর্মিলা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'হেমন্তবাবু ঠিকই বলেছেন দাদা। আমাদের ব্যবসা নিয়ে কথা। বইয়ের কাজ নিলে যদি লাভ থাকে মনে করো তাহলে নিতে তো কোন ক্ষতি নেই। সে কাজ সরিৎবাবুর মারফৎই আসুক আর অন্য কারো মারফৎই আসুক, একই কথা।'

নীলকমল বলল, 'আচ্ছা, হেমন্তবাবু, আপনি এবার যেতে পারেন।'

তারপর ঊর্মিলার দিকে চেয়ে বলল, 'আমি তোর কথাই ভাবছিলাম ঊর্মি। তোর যদি কোন অমত না থাকে, আমারও কোন আপত্তি নেই।'

ঊর্মিলা মনে মনে হাসল।

দাদার যে আপত্তি নেই তা সে বুঝতে পেরেছিল। নীলকমলের দ্বিধাগ্রস্ত

ভাবটা তার চোখ এড়ায়নি। যে জন্যই হোক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগটা আবার সে ফিরিয়ে আনতে চায়। চক্ষুলজ্জাটা কেবল উর্মিলার জন্য।

কিন্তু সরিতের উদ্দেশ্য ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারলনা উর্মিলা। সরিত কেন আবার যাতায়াত স্বরু করল? এ কি কেবল বন্ধুপ্রীতি? হারান বন্ধুকে ফিরে পাওয়ার ইচ্ছা না অন্য কিছু। সরিতের চোখে যে আগ্রহ, যে ঔৎসুক্য, যে মুগ্ধতা ফুটে উঠেছে তার হেতুটা কি? তার সুশ্রী, বিদুষী স্ত্রী আছে ঘরে। উর্মিলার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার তার কোন কারণই নেই। তবে কি সরিৎ যা বলেছে তাই সত্য? প্রেস আর প্রেসের কালিই সরিতের মনে নতুন মোহের সৃষ্টি করেছে?

'তুমি কম্পোজ করতেও পার?' সরিৎ সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল উর্মিলাকে।

সে প্রশ্নের মধ্যে কৌতুহল নয়, কৌতুক নয়, সপ্রশংস বিস্ময়ও ফুটে উঠেছিল। নীলকমলের অনেক বন্ধু এর আগে উর্মিলার কৃতিত্বের প্রশংসা করেছে। বলেছে, প্রেস যে হোল, প্রেসের যে উন্নতি হচ্ছে তা কেবল উর্মিলারই যোগ্যতায়।

কিন্তু সরিতের প্রশংসায় মনটা অন্যরকম ভাবে খুসি হয়ে উঠল। হওয়া উচিত নয়, ঘৃণা হওয়াই উচিত, তবু ঘৃণার সেই তীব্রতা মনের মধ্যে যেন আনতে পারলনা উর্মিলা। মুগ্ধতার পরিমাণটুকু এবার উর্মিলা লক্ষ্য ক'রে দেখবে। পুরুষের মুগ্ধদৃষ্টিকে তো আর ততখানি ভয় নেই তার। সময়মত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পুরুষের সেই মোহকে কি ক'রে দগ্ধ করতে হয় উর্মিলা তা জানে।

কিন্তু আপত্তি করলেন সারদাবাবু। ছেলে মেয়ে দুজনকে ডেকে ফের আর একবার ধমকে দিলেন, 'জাত মান বুঝি আর তোরা রাখবিনে। ফের সেই সরিৎ আমার বাড়িতে পা দেয় কোন্ সাহসে? ওর সঙ্গে কোন সংস্রব যদি রাখিস, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। এ বাড়ি থেকে প্রেসও তুলে নিয়ে যেতে হবে।'

সন্তান হবার উপলক্ষ্যে দীর্ঘদিনের জন্য বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় নীলকমলের স্ত্রী মণিমালাও বলল, 'সত্যি ভাই ঠাকুরঝি, এসব ভালো দেখায় না। তোমরা দুই ভাইবোনে মিলে স্বরু করলে কি? ব্যবসায় নেমেছ বলে নিজেদের মান-সম্ভ্রমও বিসর্জন দিয়েছ নাকি?'

উর্মিলা বলল, 'বউদি, তুমিও যে একেবারে ঠানদি সেজে উপদেশ দিতে স্বরু করলে। ব্যাপারখানা কি?'

মণিমালা বলল, 'ঠানদি হব কেন ঠাকুরঝি। বউদি হয়েও বুঝতে চেষ্টা করি কিন্তু বুঝেও তো কিছু করবার জো নেই। তোমাকে মন বাঁধতেই হবে।'

নিভাননী আর একবার বিয়ের কথা তুললেন। কিন্তু কথাটা বেশী দূর এগুতে পারল না। সারদাবাবু হঠাৎ মারা গেলেন। আর সেই শোকসন্তাপ কিছুটা হ্রাস হতে না হতে ধরা পড়ল নীলকমলের টি, বি, হয়েছে। কিছুদিন থেকেই তার অবসাদের ভাবটা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সবাই ভেবেছিল এটা নীলকমলের স্বাভাবিক উৎসাহহীনতা। প্রেসের নেশাটা হয়তো তার কাছে পুরোন হয়ে এসেছে। কিন্তু মানসিক অবসাদের মূল কারণ আবিষ্কার ক'রে সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

নিভাননী বললেন, 'ওই প্রেসই সর্বনাশের মূল। প্রেসের জন্য খেটে খেটেই এই দশা হয়েছে ওর। ভালো চাওতো এখনও ওই প্রেস বিক্রি ক'রে দাও।'

কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার আগে নীলকমল উর্মিলাকে বলে গেল, 'খবরদার, প্রেসের যেন কোন ক্ষতি না হয় উর্মি। প্রেসের ভার আমি তোর ওপরই দিয়ে গেলাম।'

উর্মিলা বলল 'কতদুরে যেন যাচ্ছ যে ভার-টার সব দিয়ে গেলে। যাদবপুরে বসে সব জানতে পারবে। রোজকার খবর তোমাকে রোজ পাঠাব। প্রেসের জন্য একটুও ভেব না। আমি থাকতে ওর কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।'

এই দুঃসময়ে এসে সরিৎও দাঁড়াল পাশে, বলল, 'ভয় কি নীলু, আমি আছি।'

হাসপাতালে ভর্তি হবার সময় যথেষ্ট সাহায্য করল সরিৎ। নিভাননী তার আগেকার অপরাধ প্রায় ভুলে যেতে বসলেন। ভুল মানুষের হয়। সে ভুল মানুষ আবার শোধরায়ও। তার সব দোষ, সব সময় মনে রাখা চলে, না মনে রেখে পারা যায়? কত প্রয়োজন জীবনে, কতরকম কত দাবী। সে দাবীর কাছে অনেক কিছু ছাড়তে হয়, অনেক কিছু ভুলতে হয়। আপোষ করতে হয় জীবনের সঙ্গে, পোষ মানতে হয়।

নিয়োগপত্র কেউ সরিৎকে দিল না। তবু অলিখিত ভাবে সরিৎই পদ পেল ম্যানেজারের। ওরা দু'তিন পুরুষের ব্যবসায়ী। ব্যবসাবুদ্ধি নীলকমলের চাইতে সরিতের অনেক বেশী। পাকা খাতায় কেবল ছন্দ মিলাতেই জানে না, হিসাব মিলাতেও জানে। কেবল বুদ্ধিই খাটাল না সরিৎ, নিজের কিছু মূলধনও খাটাতে দিল ধার হিসাবে। যুদ্ধের বাজারের অনুকূল হওয়ায় ফেঁপে উঠল প্রেস।

আনন্দ খাঁ লেনের ছোট্ট গলিতে আর তাকে ধরে রাখা যায় না। কাজের এত চাপ যে ট্রেড্‌ল্‌ মেসিনে আর কুলোয় না। হাজার পঁচিশেক টাকা খরচ ক'রে কেনা হোল ফ্ল্যাট মেসিন। বি, কে, পাল এভেনিয়ুর গোটা একটা দোতলা বাড়ি নেওয়া হোল ভাড়া। সরিতের পরিকল্পনা হোল কেবল প্রেস নয়, দৈনিক কাগজও বের করা হবে সেখান থেকে। আপাতত মাসিক ও সাপ্তাহিকের আয়োজন চলতে লাগল।

হাসপাতাল থেকে প্রায় সব বিষয়েই নীলকমলের অনুমোদন পাওয়া গেল। আপত্তির কারণ কিছু ছিল না। মূলধন সমান না হলেও অংশ বন্ধুকে অর্ধেকই লিখে দিয়েছে সরিৎ। বন্ধুকৃত্যে ত্রুটি হয় নি।

কিন্তু পাড়া ভরে, সমস্ত বন্ধু মহলে ততদিনে গুঞ্জরণ উঠেছে।

নীলকমল কেবল অর্ধাংশ পায়নি সারদা প্রেসের, ভিতরে ভিতরে অর্ধাঙ্গিনীও হয়ে উঠেছে ঊর্মিলা। এবার প্রকাশ্যভাবে হলেই হয়। ঢাক ঢোল পিটিয়ে গিয়ে উঠলেই হয় সরিতের বিডন ষ্ট্রীটের বাড়িতে। যাদবপুর হাসপাতালে দুজনকে এক সঙ্গে যেতে দেখা গেছে নীলকমলের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য। কোনদিন ট্রামে বাসে, কোনদিন ট্যাকসীতে, কোনদিন বা সরিতের নিজের মোটরে। অবশ্য নিভাননী সঙ্গে রয়েছেন তাদের। কিন্তু অন্যান্য বন্ধুরা গুজব তুলেছে, তিনি সবদিন সঙ্গে থাকেন নি। তাছাড়া থাকলেই বা কি? মোটরের রাস্তা তো কেবল যাদব-পুর হাসপাতালের দিকেই নেই, আরো নানা দিকেই রয়েছে। প্রেসের কাজ-কর্মেরও অন্ত নেই। সে কাজকর্মের অনেক সুরাহা হয় একসঙ্গে বেরুলে। আটকে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন নিভাননী। ঊর্মিলা নিজেও কি চেষ্টা করেনি নিজেকে আটকাতে? কিন্তু বাঁধ এক মুহূর্তে গড়েছে, আর এক মুহূর্তে ভেঙেছে।

তারপর একদিন সরিতের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ঊর্মিলা বলল, 'কি উপায় হবে আমার?'

সরিৎ বলল, 'উপায়ের জন্য ভাবছ কেন ? পর্ণার জন্যই তো ভাবনা। ডাই-ভোর্স তো ওর নিজেরই চাওয়া উচিত। যদি নাই চায় তাতেই বা কি ! কলকাতা সহরে বাড়ি তো কেবল আমার বিডন ষ্ট্রীটেই নেই। অন্য জায়গায়ও আছে। সেখানে গিয়ে উঠব।'

উর্মিলা অদ্ভুত একটু হাসল, 'তোমার বাগান বাড়ি ?

সরিৎ বলল, 'না' বাগান বাড়ি নয়। বাগান আলাদা, বাড়ি আলাদা। ইচ্ছা করলে নতুন প্রেসবাড়িটাতেই তো আমরা থাকতে পারি।'

উর্মিলা বলল, 'তা পারি। কিন্তু তার আগে—'

সরিৎ একটু হাসল, 'ও, তার আগে ! কিন্তু তারও আগে আরো একটা জিনিস করবার আছে উমু। পর্ণাকে ডাইভোর্স চাইতে বাধ্য করতে হবে। না হলে বিয়েটা ঠিক আইনমতে সিদ্ধ হবে না।' অবশ্য আইন ছাড়া তুমি যদি কেবল অনুষ্ঠান চাও তাতেও রাজী আছি আমি। পুরোহিত আর শাঁখা সিঁদুরের আয়োজন যে কোন একদিন করলেই তো হয়।'

উর্মিলা বলল, 'ও সব কথা তুমি অমন ক'রে বলতে পারছ ?'

সরিৎ বলল, 'পর্ণা বলাচ্ছে আমাকে। আমি ওকে বলে বলে হয়রান হয়ে গেলাম। কিন্তু কিছুতেই ও ডাইভোর্সে রাজী নয়। অথচ ওর কোন অসুবিধা নেই। সুন্দরী, শিক্ষিতা বড়লোকের মেয়ে। ওদের সমাজে যে এসব দু' একটা না হচ্ছে তাও নয়। ওর অনুরাগীর দল এখনো যথেষ্ট। সন্তানাদি হয়নি, কোন অসুবিধা হওয়ারই কথা ওর নয়।'

উর্মিলা মুখে হাত চাপা দিল সরিতের, 'অমন ক'রে বল না। ভুলে যেয়োনা আমিও তারই মত মেয়ে।'

সরিৎ একটু হাসল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, ভুলব না।'

বিডন ষ্ট্রীটে পড়ল গাড়ি। উর্মিলা বলল, 'ওকি, ওদিকে যাচ্ছ কোথায় ?'

সরিৎ বলল, 'ভাবছি পর্ণার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি। বলে ক'য়ে আমি তো পারলাম না, তুমি যদি পারো।'

উর্মিলা বলল, 'না না না।'

সরিৎ হাসল 'ভয় পাচ্ছ ?' ভয়ের কিছুই নেই। শিক্ষিতা সুন্দরী হলে হবে কি, ভারী খেয়ালী মেয়ে। দেখনা এত কাণ্ডের পরও গলা জড়িয়ে রয়েছে।

তেতলা বাড়িটার সামনে গাড়ি থামাল সরিৎ, হেসে বলল, 'সত্যিই যদি ভয় হয় তোমার, তোমাকে আর নামতে বলিনে। এর আগে তুমিই মাঝে মাঝে দেখতে চেয়েছ।'

তা চেয়েছে উর্মিলা। অনেকদিন তার কৌতুহল হয়েছে পর্ণাকে দেখবার জন্য। অনেক সুন্দরী, অনেক বিদুষী সে। উর্মিলা তার সম্বন্ধে বহু শুনেছে বহুজনের কাছে। সরিতের কাছেও শুনেছে। কিন্তু উর্মিলার অনুরোধ সত্ত্বেও সরিৎ তাকে কোনদিন পর্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেয় নি। বলেছে—পর্ণা ভারি লাজুক মেয়ে। ঘর থেকে বেরোয় না, কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতেও চায় না। উর্মিলা নিজেও যে একেবারে নিঃসংকোচ ছিল তা নয়! শত হলেও যার স্বামীকে সে ছিনিয়ে নিয়েছে তার সামনে কি করে সে উপস্থিত হয়? কিন্তু সরিতের বিদ্রূপ উর্মিলাকে উত্তেজিত করে তুলল। ভয়? ভয় সে কেন করতে যাবে পর্ণাকে? হোক সুন্দরী, হোক শিক্ষিতা, কিন্তু বিজয়িনী তো আজ উর্মিলাই। লজ্জা, সংকোচ, মান, মর্যাদা, সমস্ত কিছুর বিনিময়ে উর্মিলা জয়ী হয়েছে। অন্যায়, অবিচার? উর্মিলার ওপরই কি অন্যায় অবিচার কম করেছে কেউ? তার কাছ থেকে পর্ণাই তো আগে ছিনিয়ে নিয়েছে সরিৎকে। নিজের হৃতধন উদ্ধার ছাড়া আর বেশি কি করছে উর্মিলা? না, তার আর ভয় নেই, সংকোচ নেই, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরাজিত শত্রুকে সে আজ প্রত্যক্ষ করবে। জবাব দেবে সরিতের বিদ্রূপের।

নিজেদের শোবার ঘরেই উর্মিলাকে নিয়ে গেল সরিৎ। পর্ণা পিঠের ওপর চুল ছড়িয়ে জানলার কাছে একখণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী খুলে বসেছিল।

সরিৎ তাকে ডেকে বলল, 'এই যে পর্ণা, এরই কথা বলছিলাম তোমাকে, ইনিই উর্মিলা। আমার—' একটু থেমে সরিৎ বলল, 'আমার বিজনেসের পার্টনার।'

মাথায় আঁচল টেনে দিল পর্ণা।

উর্মিলার মনে হোল একবার যেন সাদা রক্তহীন হয়ে গেল পর্ণার মুখ, আর তার পরমুহূর্তে শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখে এসে জমাট বাঁধল।

কিন্তু তৃতীয় মুহূর্তে বেশ স্বাভাবিকভাবে হাত তুলে উর্মিলাকে নমস্কার জানাল পর্ণা। ঠোঁটের ওপর ক্ষীণ হাসির রেখা টেনে বলল, 'বসুন। আপনার কথা, আপনাদের প্রেসের কথা অনেক শুনেছি।'

উর্মিলার বুকে কি যেন একটা কাঁটার মত বিঁধল, দু'চোখে মুহূর্তের জন্য যেন

ঝলক লাগল আগুনের। মেয়েদের রূপের সঙ্গে আগুনের শিখার তুলনা দেওয়া হয়। সে শিখা কি সত্যিই সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে পর্ণা? তারই মত একটি মেয়ে। ছিপছিপে, গৌরাঙ্গী। কিন্তু সুন্দরী মেয়ে তো আরো অনেক দেখেছে উর্মিলা, কাউকে দেখে এমন ক'রে তো জ্বালা ধরেনি বুকে।

পর্ণা আর একবার বলল, 'বসুন।'

নিজেকে আশ্বাস দিল উর্মিলা, বসবে বইকি। বুকের জ্বালার এবার তার বাধা কি নিবৃত্তি ঘটাবে? পর্ণা যদি দীপের শিখা মাত্র হয়, সে নিজে আগ্নেয়গিরি। হোক অপরিচ্ছন্ন অগ্নিকুণ্ড। কিন্তু আহুতি তো পেয়েছে সরিৎকে। জয় তো হয়েছে তারই।

উর্মিলা প্রতিনমস্কার জানিয়ে বলল, 'না, আজ আর বসব না, কাজ রয়েছে।'

পর্ণা বলল, 'কাজে বাধা অবশ্য দিতে চাই না। কিন্তু এসেই চলে যাবেন? একটু বসবেন না? একটু চা টা—'

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল উর্মিলা, বলল, 'না আজ থাক, বরং আর একদিন—'

পর্ণা একটু হাসল, 'আর একদিন? আচ্ছা।'

মোটরে ক'রে উর্মিলাকে পৌঁছে দিয়ে গেল সরিৎ। বলল, 'কেমন লাগল?'

উর্মিলা বলল, 'কি জবাব তুমি আশা কর?'

পরদিন যখন ফের দেখা হল সরিতের সঙ্গে, উর্মিলা জিজ্ঞাসা করল, 'কি খবর?'

'কি খবর তুমি আশা কর?'

একটু যেন গম্ভীর, একটু যেন থমথমে দেখাচ্ছে সরিতের মুখ।

শঙ্কিত স্বরে উর্মিলা বলল, 'কি হয়েছে?'

সরিৎ একটু হাসল, 'ভয়ের কিছু নেই। যা আমরা চাইছিলুম তাই হয়েছে, এতদিনে সুমতি হয়েছে পর্ণার। ডাইভোর্সে রাজী হয়েছে সে। তোমার যাওয়ার ফল একেবারে হাতে হাতে পাওয়া গেল।'

উর্মিলা বলল, 'পর্ণা হঠাৎ রাজী হোল কেন?'

সরিৎ একটু হাসল, 'রাজী হওয়ার খবরটা তোমার কাছে প্রীতিকর হলেও তার রাজী হওয়ার কারণটা তোমার কাছে তেমন সুখকর হবে না উর্মি।'

উর্মিলা বলল, 'তবু শুনি।'

সরিৎ বলল, 'সৌজন্য নয়, মহানুভবতা নয়, কেবল ঘৃণা। তোমার আমার ঘনিষ্ঠতার কথা পর্ণা তো অনেকদিন থেকেই জানে। তা নিয়ে পর্ণা দুঃখ করেছে, অভিমান করেছে, আমাকে তিরস্কারও করেছে বহুদিন। তবু ছেড়ে যায় নি, গভীর রাত্রে আমার পাশে এসে না শুয়ে পারেনি, পারেনি গলা জড়িয়ে না ধরে। কিন্তু কাল—'

সরিৎ একটু থামল।

উর্মিলা বলল, 'কিন্তু কাল ?'

সরিৎ বলল, 'কিন্তু কাল পর্ণা ভিন্ন বিছানায় গিয়ে শুয়েছে। বললুম, অভিমান নাকি ?'

পর্ণা বলল, 'না, আর কোন অভিমান নেই, আর কোন দুঃখ নেই আমার। এবার বোধ হয় আমরা আলাদা হতে পারি।'

বললুম, 'কেন ?'

পর্ণা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'উর্মিলা যদি তোমাকে কোনদিন ছেড়েও যায় তবু তোমাকে ছুঁতে আমার গা ঘিনঘিন করবে। তোমার প্রবৃত্তিটা দেখলাম এবার। আশ্চর্য, পৃথিবীতে কি আর মেয়ে ছিল না ?'

পর্ণার ঘৃণা যেন জিভের সঙ্গে জড়িয়ে এনেছে সরিৎ।

উর্মিলা বলল, 'তুমি কি বললে ?'

সরিৎ বলল, 'কি যে বলব ভেবে পেলাম না। কি বললে ভালো হোত বলো দেখি।'

বি, কে, পাল এভিনিয়ুতে পড়েছে মোটর।

উর্মিলা বলল, 'এখানে গাড়ি থামাও। একবার প্রেসে ঘুরে আসি।'

সরিৎ বলল, 'সে কি ! এই সন্ধ্যার সময় প্রেসে গিয়ে করবে কি ?'

উর্মিলা হাসল, 'দেখে আসি কি রকম কাজকর্ম চলছে। তাছাড়া কপালে খানিকটা প্রেসের কালি মেখে আসতে পারি কিনা তাও দেখি চেষ্টা ক'রে। ভুল হয়েছিল, স্নো, পাউডারের বদলে একটু কালি যদি মেখে যেতাম তাহলে বোধ হয় দ্বিতীয়বার মুগ্ধ হওয়ার কারণ মনে পড়ত। জবাব দিতে পারতে পর্ণার কথার।'

প্রেসে গিয়ে উর্মিলা খবর পাঠাল, সরিৎ যেন মোটর নিয়ে চলে যায়, তার বাড়ি ফিরতে দেরি হবে।

হেমন্ত বলল, 'এখানে তো আর কোন মেয়েছেলে নেই। আমরা পাঁচ ছ'জন কম্পোজিটার রয়েছি। রাত্রে ওভারটাইম খাটব। এখানে আপনি কোথায় থাকবেন।'

উর্মিলা বল, 'এখানেই, আমিও ওভারটাইম খাটতে চাই।'

হেমন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে উর্মিলাব দিকে একবার তাকাল, 'কিন্তু কম্পোজিং কি মনে আছে আপনার?'

উর্মিলা বলল, 'নিশ্চয়ই আছে। আমি যা শিখি তা কখনো ভুলি না।'

হেমন্ত বলল, 'তাই নাকি? আমরা ভেবেছিলাম আপনি শেখেন আর ভোলেন।'

উর্মিলা হেমন্তর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। একদিন তো কেবল অক্ষর পরিচয়ের বিদ্যাই ছিল হেমন্তর। সে বিদ্যা এমন করে বেড়ে গেল কবে? সাহস এমন বেড়ে গেল কি ক'রে?

উর্মিলা বলল, 'সে জন্য ভাববেন না। কেবল কম্পোজিংই তো নয়, প্রুফরীডিংও জানা আছে। নিজের ভুল নিজে শুধরে নিতে পারব। একটা প্রুফের বদলে না হয় দুটো প্রুফ উঠবে। দিন তো একটা কম্পোজিটারের সীট।'

হেমন্ত বলল, 'তার চেয়ে আপনি বরং বাড়ি যান।'

উর্মিলা বলল, 'না। বরং আমি যা বলছি, তাই আপনি শুনুন।'

নিভাননী প্রথমে লোক পাঠালেন, তারপর ব্যস্ত হয়ে রিকসায় ক'রে নিজে এলেন প্রেসে।

বললেন, 'তোর কি মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে উমি? জাতজন্ম কিছু আর রাখবিনে? এই এক পাল পুরুষের মধ্যে—ছি ছি ছি! হেমন্ত, জোর ক'রে তুমি মেয়েটাকে তুলে দাও দেখি গাড়িতে।'

উর্মিলা একটু হাসল, 'খবরদার হেমন্ত বাবু, গায়ে হাত দেবেন না, এমন চমৎকার জর্জেটটায় কালি লেগে যাবে।'

হেমন্ত বলল, 'পাগলামী করবেন না, আপনি যান মার সঙ্গে। প্রেসে কাজ

করতে চান দিনের বেলা করবেন। আপনি যা ভুলে গেছেন তা আমার শিখিয়ে দিতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

নিভাননী বললেন, 'আর প্রেস প্রেস ক'রো না বাপু! আর প্রেস নয়, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে। কেলেঙ্কারীতে আর কান পাতবার জো নেই। আমি বলে রাখলুম, কাল ভোরে উঠে যার মুখ দেখব তার সঙ্গেই বিয়ে দেব মেয়ের।'

হেমন্ত আর উর্মিলার চোখাচোখি হোল মুহূর্তের জন্য। একটু বুঝি ইতস্তত করল উর্মিলা। খানিক দূরে ঘরের মধ্যে কম্পোজিটাররা কাজ করছে, কিন্তু কান পেতে সকলেই শুনছে সব কথা। মা আর কিছুই বলতে বাকি রাখেন নি। চোখ নামিয়ে নিয়ে ফের হেমন্তর দিকে চোখ তুলল উর্মিলা, সেই বসন্তের দাগভরা মুখ, কিন্তু আর কোন দাগ নেই। দৃঢ়, ঋজু চেহারা।

হেমন্ত কি দেখল সেই জানে, সস্নেহে বলল, 'যান, ঘরে যান।'

উর্মিলা আর ইতস্তত করল না। সমস্ত লজ্জা, সমস্ত সংকোচ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'যাচ্ছি। কিন্তু কাল খুব ভোরে উঠে মা যেন আপনার মুখই দেখেন হেমন্তবাবু। আবার কোন অনজাতের হাতে পড়ব তার দরকার কি?'

হেমন্ত নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল।

হাত ধরে নিভাননী রিক্সায় টেনে তুললেন মেয়েকে।

ছোটগল্প

অসমতল

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মিত্র

কল্যাণীয়েষু

একটা ক'রে বালতি প্রত্যেকের হাতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের কাছ থেকে আবদার-মিশ্রিত ফরমায়েস এল, 'আর দেরি কেন চন্দরদা, আরম্ভ হোক।'

মানে গল্প আরম্ভ হোক। চন্দ্র চাটুয্যের মুখ না চললে কারো হাত চলে না। এ-কথা সকলেই জানে।

মোমে আর ক্যানভাসে তৈরী নীল রঙের ছোট ছোট বালতি। সৈনিকদের ব্যবহার্য। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে আঙ্গিক গড়নটা ঠিক নক্সা মাফিক হয়েছে কি না মিলিয়ে দেখতে হয়; তলার চার দিকটা টিপে টিপে পরীক্ষা করতে হয় কোথাও ছেঁড়া ফুটো আছে নাকি. সব জায়গায় সেলাই পড়েছে কিনা যথাযথ। কনট্রাক্টররা যাতে বাজে মাল না চালিয়ে যায়—তাই সরকারী তরফ থেকে আমরা পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছি।

যুদ্ধের কাজে না লাগে এমন জিনিস নেই। সৈনিকদের পায়ের জুতো গায়ের গেঞ্জি, মাথার বালিশ, শোয়ার বিছানা থেকে আরম্ভ ক'রে কত রকম আবরণ আভরণেরই যে যাচাই-বাছাই হয় এই ডিপোতে তার সব নামও জানি নে, জানবার কথাও নয়। একেক রকম জিনিসের জন্য একেক দল পরীক্ষক, একেক দল শ্রমিক আর পরিচালক হিসাবে বিভিন্ন পদের সামরিক উপাধিধারী একেক জন শ্বেতাঙ্গ।

চন্দ্র চাটুয্যের কাছে গল্প মানেই অবশ্য আদিরসের গল্প। চাটুয্যে বলেন, 'আরে রস মানেই আদিরস। ও শুধু আদি নয়, অন্তও।'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মানেটা কি হলো চন্দরদা।'

'কেন লজ্জা দিচ্ছ ভায়া। মানেটা তো আমার চেহারাতেই আছে।'

তাঁর স্বীকারোক্তিতে আমরাই লজ্জিত হলাম। আদিরসের কিছু কিছু অন্তিম আভাস চাটুয্যের চেহারায় অনুমান ক'রে আমরা নিজেরাই একদা কানাকানি করেছিলাম—লোকটি ডাক্তারী পরীক্ষায় পার হলো কি করে? আলোচনার কিছু কিছু চাটুয্যের কানে গিয়ে থাকবে।

কিন্তু সন্দেহজনক চেহারা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে চাটুয্যের প্রতিপত্তি

নিঃসন্দেহেই বেড়ে যেতে লাগল। দিনে একেক জনের হাজার ক'রে বালতি পাশ করার হুকুম। কিন্তু চাটুয্যে বাকেট প্রায় ছুঁয়েও দেখেন না। কেবল যখন সাহেবদের আসতে দেখেন, তখন একেকটা বালতি হাতে তুলে নেন। চাটুয্যের ভাগের কাজ ভাগাভাগি ক'রে বিনা আপত্তিতে আর সবাই ক'রে দেয়। চাটুয্যের কেবল রস যোগাবার ভার। গাঁজা, গুলি, চরস, ফুটুস্ কত রকমের নেশা আছে সংসারে। দেশভেদে তার নানা রকম নাম, উপভোগের নানা রকম প্রকরণ। বর্মী নেশা, ফরাসী নেশা, চীনে নেশা, যা চাটুয্যে সব চেখে দেখেছেন - সেই সব নেশার গল্প আমাদের প্রমত্ত ক'রে তোলে। আমাদের অতুলের স্বভাবটা কিছু নাস্তিক গোছের। সে একদিন শ্লেষ ক'রে বলেছিল, 'ওসব দেশেও কি পদধুলি দিয়ে এসেছেন না কি চাটুয্যেদা ?'

চাটুয্যে ভয়ানক চটে গিয়েছিলেন 'দরকার কি বাবা, কলির গুপ্তবৃন্দাবন এই কলকাতাই যথেষ্ট। চাই কেবল ট্যাকের নীচে পয়সা আর কপালের নীচে একজোড়া চোখ। এখানেই সব পাবে।'

আলোচনাটা একটু রুচি-সম্মত করবার জন্য আমি প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হয় নি। চাটুয্যের রসস্রোতে সব কিছু ভেসে গিয়েছিল।

স্বরুচি প্রসঙ্গে চাটুয্যে আমাকে একদিন আপোষে বলেছিলেন, 'প্রভুপাদ, তোমার তিলক চন্দন আর জপের মালা এখানে বার ক'রে কাজ নেই, তাহলে কোম্পানীর কাজ পড়ে থাকবে, সৈন্যরা বালতি পাবে না। আর দু দিন যেতে না যেতে আমরা দলকে দল অকেজো ব'লে বাতিল হয়ে যাব। এই কড়া রোদে আট দশ ঘণ্টা বসে বসে যারা বালতি টিপবে তাদের মনটা যদি একটু রসস্থ করতে চাও ত হাঁড়ি হাঁড়ি তাড়ি আমদানী কর, তুলসী পাতায় ক'রে গঙ্গাজলের ছিটা দিতে যেয়ো না। কই এত তো সর্দারি করো আমাদের মাথার ওপর দিয়ে একটা সামিয়ানা টাঙিয়ে দাও দেখি সাহেবকে বলে।'

প্রথমটা আমাদের পরীক্ষার কাজ ঘরের ভেতরেই চলত। আমরা পরীক্ষকেরা-বসবার জন্য পেয়েছিলাম সরু বেঞ্চ আর বালতি রাখবার জন্য লম্বা টেবিল। কিন্তু লরীর পর লরী বালতিতে সমস্ত ডিপো যখন ভরে উঠবার জো হলো, অর্ডার এলো একেকজনকে হাজার ক'রে বালতি পাশ করতে হবে, তখন একদিন খোদ বড় সাহেব এসে আমাদের সেই সব সাহেবী আসবাব বাতিল ক'রে দিলেন। না হ'লে আশানুরূপ কাজ এগুবে না।

ঘর থেকে আমরা প্রাঙ্গণে নেমে এলাম। বসবার কোন নির্দিষ্ট আসন রইল না। কেউবা একটু খবরের কাগজ, কেউবা সাহেবকে লুকিয়ে বাতিল-করা পাঁচ সাতটা বালতিই ঢেকে ঢুকে চেপে বসে। মাথার ওপরে রৌদ্রোদ্ভাসিত নীলাকাশ আর সামনে নীলাভ বালতি-সমুদ্র। চাটুয্যের খোঁচা খেয়ে সেক্‌সন্‌-ইনচার্জ ডসনের কাছে সেদিন দরবার করতে গিয়েছিলাম। তিনি তখন এক কন্‌ট্রাক্টরের সঙ্গে গোপন পরামর্শে ব্যস্ত, বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হয়েছে কি?'

সবিনয়ে বললাম, 'হতচ্ছাড়া রোদ বড় বেশি জোরে উঠেছে, চামড়ায় আর সহ্য হচ্ছে না।'

ডসন একটু হেসে বললেন, 'সত্যি নাকি? নিজেদের দেশের রোদ নিজেরা সহ্য করতে পার না আর সাত সমুদ্দুর তের নদী ডিঙিয়ে আমরা বিদেশীরা কি ক'রে পারছি? আসলে তোমাদের মত আরামপ্রিয় জাত আর দুটি নেই। আমার গা'টা একটু টিপে দেখে বললেন, 'ইস্‌, ঠিক একেবারে মেয়েমানুষের মত নরম। এর চেয়ে তোমাদের গোটা জাতটা যদি পুরোপুরি মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মাত, যুদ্ধে অনেক বেশি কাজে আসত!' সাহেব হেসে উঠলেন। তারপর সস্নেহে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'যাও যাও—কাজ করো গিয়ে। রোদ আড়াল করবার ব্যবস্থা শিগ্‌গিরই হচ্ছে।'

সে ব্যবস্থা অবশ্য এখনও হয় নি।

গল্পের ফরমায়েস পেয়ে চাটুয্যে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসের গল্প শুনবে?'

শিবু দলের মধ্যে সব চেয়ে বয়সে ছোট। বছর পনের ষোলর বেশী বয়স হবে না। কিন্তু চাটুয্যের সাংচর্যে ইতিমধ্যেই বেশ পেকে উঠেছে। সে ব'লে উঠল, 'আজ আর কোন নেশার গল্প নয়। রোজ রোজ গুলি আর চরস ভালো লাগে না। আজ প্রেমের গল্প বলুন।'

চাটুয্যে তার দিকে এক চোখ বুজে মুচকি হেসে বললেন, 'মাইরি! প্রেমের গল্প মানে তো সেই মেয়ে মানুষের গল্প? সেও তো এক নেশারে দাদা, গুলি-চরসের চেয়েও পাজী নেশা। ও নেশার সব চেয়ে বড় অসুবিধা, ওতে আনুষঙ্গিক লাগে। সাদা চোখে আর সাদা মুখে ও নেশায় আমেজ লাগে না।' ব'লে চাটুয্যে সকলের আগে শিবুর কাছেই আজ প্রথমে হাত পাতলেন, 'কই দে দেখি।'

শিবু লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, 'কি দোব।'

চাটুয্যে তার দিকে তাকিয়ে অসংকোচে বললেন, 'দেখ, অমন সুন্দরীপনা করিস নে। কি করতে কি ক'রে বসি ঠিক কি। কি আবার দিবি, বিড়ি।'

ঠিক এই সময়ে বড় সাহেব ক্যাপ্টেন উইলসন্ এসে উপস্থিত হলেন, আর সঙ্গে ডসন। অনেকক্ষণ আগে থাকতেই অলক্ষ্যে তাঁরা যে চাটুয্যেকে লক্ষ্য করছিলেন—তা কেউ দেখিনি। সামনে এসে ক্যাপ্টেন গর্জে উঠলেন 'ইউ ব্ল্যাডি ওল্ড চ্যাপ্, সকাল থেকে কেবল গল্পই করছে, গল্পই করছে। সেক্‌সনের কাজ এগুবে কি ক'রে ?' ডসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কি প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোও, এ সব দিকে লক্ষ্য করো না ? উচিত শিক্ষা দিতে পার না এই বুড়ো বাঁদরটাকে ?'

সাহেব চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে উচিত শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি নিজেই ক'রে গেলেন। চাটুয্যের একদিনের রোজ ফাইন হয়ে গেল। চাটুয্যে কাঁদো কাঁদো ভাবে ক্যাপ্টেনের পা জড়িয়ে ধরতে চাইলেন, 'একেবারে ম'রে যাব—একেবারে ম'রে যাব স্যার।'

সাহেব ততক্ষণ অনেক দূরে চলে গেছেন।

আমরা সবাই বললুম, 'আপনার কোন চিন্তা নেই চাটুয্যেদা, এ ফাইন আমরা সবাই চাঁদা ক'রে দেব।'

চাটুয্যে বললেন, 'ও সব ছেঁদো কথায় আমি ভুলিনে। এই ফাইন রদ কর। আর বুড়ো ব্রাহ্মণকে ম্লেচ্ছের বাচ্চা সকাল বেলায় যে অপমানটা ক'রে গেল তার শোধ তোল। তবেই বুঝবো তোমরা আমাকে ভালোবাস। মান অপমান ব'লে সত্যিই কোন জ্ঞান আছে তোমাদের।'

বললুম, 'সহেবের বাক্য যে বেদ বাক্য—ওর কি আর নড়চড় হবার জো আছে।'

চাটুয্যে সবাইর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শোন, শোন, আমাদের বিদ্যার জাহাজ, বুদ্ধির সাগর, নেতাজীর কথা শোন একবার! ইনি কেবল চরিত্তির বাঁচাতেই জানেন, মান প্রাণ বাঁচাবার ধার ধারেন না।'

সবাই আমাকে গোল হয়ে ঘিরে ধরল। এর বিহিত করবার জন্য আমি ছাড়া আর লোক নেই। মনে মনে একটু গর্ববোধ না করে পারলুম না। দলের মধ্যে চাটুয্যের আসন এতদিনে টলেছে।

বললুম, 'বিহিত করবার চেষ্টা আমি করতে পারি—সবাই যদি শক্ত হয়ে আমার পাশে দাঁড়াও।'

সকলে সমস্বরে বলল, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

চাটুয্যে অতিশয়োক্তিতে ওস্তাদ। আমার হাত জড়িয়ে ধ'রে বললেন, 'পাশে

নয়, পাশে নয়—আমরা তোমার পায়ের নীচে পড়ে থাকব, যদি এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে পার। নিতে পার কি, নিতেই হবে তোমাকে।'

রমেশ বলল, 'অন্যায়ের প্রতিকার এই সব ছোট খাটো ব্যাপার নিয়েই শুরু হয়।'

বিপিন সায় দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই। কচু গাছ কাটতে কাটতেই লোকে ডাকাত হয়ে ওঠে।'

বললুম, 'খুব কিন্তু শক্ত হ'তে হবে প্রত্যেককে। দরকার হলে চাকরির মায়া পর্যন্ত ছাড়তে হবে।'

চাটুয্যে বললেন, 'থুঃ থুঃ. এ চাকরির মুখে আমি পেচ্ছাপ করি।'

সবাই বলল যে, এই অতি ক্ষণস্থায়ী চাকরি প্রত্যেকের কাছেই অত্যন্ত তুচ্ছ বস্তু।

ডসনকে গিয়ে ধরলাম, 'চাটুয্যের ফাইন মাপ করতে হবে।'

ক্যাপ্টেনের ধমক খেয়ে ডসনের মেজাজ আরও চ'ড়ে গেছে। ডসন মুখ খিঁচিয়ে উত্তর দিলেন, 'গোলমাল কোর না। কাজ কর গিয়ে। আর ফের যদি বিরক্ত করতে আসো তোমাকে সুদ্ধ ফাইন করবো। তলে তলে তুমিও শয়তান কম নও।'

বললাম, 'সে তো বটেই। কিন্তু ফাইন তুলে না দিলে সেকশনের কাজ আজ বন্ধ থাকবে।'

ডসন দাঁতে দাঁত চেপে বল্‌লেন, 'বটে!'

আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললুম, 'হ্যাঁ।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ডসন এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন, 'আচ্ছা ভট্টাচারিয়া, ব্লাডি বুড়োটা তোমাকে কিসের লোভ দেখিয়েছে বলো দেখি? ঘরে ওর বুড়ী স্ত্রী ছাড়া আর কে আছে?'

বললুম, 'সতের বছরের অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়েও আছে, জানো না বুঝি?'

তারপর সেকসনে ফিরে গেলুম।

কাজ চলছে না শুনে ক্যাপ্টেন সাহেব স্বয়ং আবার দেখা দিলেন।

বললেন, 'সারবন্দী হয়ে দাঁড়াও। ব্যাপারটা আমি সব শুনতে চাই।'

যখন চরমতম অবজ্ঞাই আমরা করতে প্রস্তুত হয়েছি, তখন কৌতুকচ্ছলেও এ সব ছোট খাটো আদেশ মানবার অভিনয় করা যায়। এতক্ষণ গোল হয়ে যারা জোট পাকাচ্ছিল, সবাই আমার ইঙ্গিতে একই সরল রেখায় সমান্তরাল ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়াল। প্রথমে আমি, তারপর চাটুয্যে এবং পাশাপাশি আমাদের সেক্‌সনের আরও জন পঁচিশেক এগজামিনার।

সাহেব প্রথমে আমার সম্মুখেই এসে দাঁড়ালেন। পাইপটা ঠোঁটের এক কোণে সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'কি চাও তুমি?'

আমি বললুম, 'আমি নয়—আমরা।'

'বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই। তুমি কি চাও তাই বল। কাজ করছ না কেন? এর ক্ষতিপূরণ কে দেবে?'

বললুম, 'আমাদের সম্মানিত চাটুয্যে মশাইকে অন্যায়ভাবে গালাগালি এবং ফাইন করা হয়েছে। আর তার প্রতিবাদেই কাজ বন্ধ আছে।'

সাহেব বললেন, 'কিছুই অন্যায় হয় নি। তুমি কাজ করবে কি না তাই বল?'

'ফাইন এবং গালাগাল প্রত্যাহার না করলে কাজ করা অসম্ভব।'

সাহেব বললেন, 'বেশ। তোমাকে ডিস্‌চার্জ করলুম। ডসন, একে একটা গেট-পাশ লিখে এখনি ডিপোর বার ক'রে দাও।'

তারপর চাটুয্যের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বুড়ো বদমাস, এ সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে?'

চাটুয্যে বললেন, 'আজ্ঞে আজ্ঞে—'

'আজ্ঞে আজ্ঞে নয় কাজ করবে কি করবে না।'

চাটুয্যে বললেন, 'আজ্ঞে করব।'

'তা হ'লে বাকেট তুলে নাও হাতে।'

চাটুয্যে বাকেট তুলে টিপতে আরম্ভ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাই তাঁর অনুসরণ করল।

ক্যাপ্টেন প্রসন্ন হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ—এইতো গুড বয়ের কাজ। কিন্তু যতক্ষণ সময় নষ্ট ক'রেছ ছুটির পর ততক্ষণ থেকে এই কাজ সেরে দিয়ে যেতে হবে। সে জন্য কোন ওভার-টাইমের ব্যবস্থা হবে না--আগেই বলে রাখছি।'

ডসন তাড়া দিয়ে বললেন, 'এসো ভট্টাচারিয়া, ওদের কাজ করতে দাও।'

ডসনের পিছনে আসতে আসতে চাটুয্যের গলা শুনতে পেলাম, 'আরে বা'বা,

ওটা স্থানমাহাত্ম্য। প্রথমে দাঁড়ালে ভট্টচায্ যা বলেছে—আমিও ঠিক তাই বলতুম, আর ভটচায্ যদি আমার জায়গায় দাঁড়াত তা'হলে তার ফলাফল দেখে ভটচায্ও ঠিক তোমাদের মতই একটা ক'রে বাকেট হাতে তুলে নিত। নেতাগিরি জিনিসটাই আসলে এই। নেতা কেউ নিজের ক্ষমতায় হয় না, অবস্থা গতিকে ধ'রে বেঁধে একেকজনকে নেতা আমরা বানিয়ে বসি। সেটা তার কপাল জোরও বটে, গ্রহবৈগুণ্যও বটে।'

ভক্তদের মধ্যে দু'একজন বলল, 'ঠিক বলেছেন চাটুয্যেদা! অবিকল তাই।'

আর সকলে চুপ ক'রে রইল।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভসনের বুঝি অনুকম্পা হলো। বললেন, 'ঘাবড়িয়োনা ভট্টাচারিয়া—আমি সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি। তোমাকে আমি সত্যি ভালোবেসে ফেলেছি। তুমি ভারী ভালো মানুষ!'

আমি শক্ত হয়ে বললুম, 'ওসব বাজে কথা রাখো। গেট-পাশটা আমাকে দিয়ে দাও, আমি যাই।'

ভসন বললেন, 'অত নিষ্ঠুর হচ্ছ কেন ডার্লিং? একটু দাঁড়াও—আমি এক্ষুণি সব ঠিক ক'রে দেব।'

ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, 'পাগলামি কোরো না ভসন।' ভসন যেতে যেতে বললেন, 'পাগলামি তুমি নিজে করছ ভট্টাচারিয়া। বাড়ীতে তোমার অনেক ডিপেনডেণ্ট আছে, তুমি নিজেই তো সেদিন বলছিলে।'

তা আছে। আগের দিন লেট হয়েছিলাম ব'লে আজ রাত সাড়ে-তিনটায় চুপিচুপি উঠে জ্বর গায়ে উনুনে আঁচ দিতে বসেছিল সুমিতা। আমার নিষেধ শোনে নি। খোকাটার এমন স্বভাব হয়েছে—এক মুহূর্তও মার কোল ছাড়া থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে উঠে গিয়েছিল সুমিতার পিছনে পিছনে। রোজ ওর কান্নায় আমার ঘুম ভাঙে। মন্দ হয় নি, বেশ একটা এ্যালার্মওয়ালা ঘড়ির কাজ চলে। উঠে বাইরে যাওয়ার সময় একবার সুমিতার মুখের দিকে চোখ পড়েছিল। জ্বরে আর আগুনের আঁচে মুখখানা আরক্ত।

'দেখছ কি' সুমিতা জিজ্ঞাসা ক'রেছিল।

'কিছু না। আজও আবার জ্বর এলো নাকি?'

সুমিতা অদ্ভুত একটু হেসেছিল, 'আসুক না! জ্বর এলে আমাকে নাকি আরো সুন্দর দেখায়?'

বেরুবার মুখে একবার একটু ইতস্তত ক'রে বলেছিল, 'পয়সায় যদি কুলোয়

একটা বেদানা আনবে। তারপর একটু হেসে বলেছিল, 'সুন্দরের দর্শনী লাগে।'

তখন ফিরে এসে বলল, 'ঠিক ক'রে এসেছি। আজ কয়েক ঘণ্টার জন্য সস্পেণ্ড। ওটুকু কেবল ক্যাপ্টেনের সম্মান রক্ষার জন্য। শত হ'লেও ক্যাপ্টেন তো? কাল সকাল থেকে আবার কাজে লেগে যেও।'

একটু ইতস্তত করলাম। চাটুয্যের কথাকেই সত্য হ'তে দিলাম তাহ'লে? পরের মুহূর্তে ভাবলাম, ক্ষতি কি? ওদের মত লোকের কাছে আবার চক্ষুলজ্জা? বরং ওদের ব্যবহারের জবাব চাকরি নিয়ে ওদের ওপর সর্দারি ক'রেই দিতে হবে। সুমিতার জন্য একটা বেদানা, আর খোকনের জন্য কিছু লজেন্স নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

সন্ধ্যার পর কড়া নাড়ার শব্দে দোর খুলে এসে দাঁড়ালাম। চাটুয্যে, রমেশ, অতুল এবং আরও জন বারো। বললাম, 'কি ব্যাপার?'

চাটুয্যে, এগিয়ে বললেন, 'তোমার স্ত্রী কেমন আছেন ভটচায্, তাঁর অসুখের কথা শুনেছিলাম।'

বললাম, 'ভালোই আছেন!'

রমেশ পকেট থেকে একটা বেদানা বার করল। প্রসঙ্গক্রমে বেদানার কথাটা তাকে বলেছিলাম এবং জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোথায় সস্তায় পাওয়া যায়।

চাটুয্যে বললেন, 'তুমি আমাদের মুখ রেখেছ ভটচায। সবারই প্রাণের কথা বলেছ, উপযুক্ত কাজ করেছ তুমি। চাকরি! থুঃ থুঃ, ও আবার একটা চাকরি! তোমার মত বিদ্বান সচ্চরিত্র ছেলের আবার চাকরির ভাবনা? সার্টিফিকেটখানা একবার মেলে ধরলে অমন হাজারটা আপিস এসে তোমাকে লুফে নেবে না?'

একটু শুষ্ক হেসে বললাম, 'তার দরকার হবে না। সাহেবকে অনুরোধ ক'রে ঐ আপিসেই আবার কাজ পেয়েছি চাটুয্যে মশাই। ভাবনা নেই, কালই গিয়ে আবার আপনার গল্প শুনতে পারব।'

চাটুয্যে বললেন, 'যাঃ, ঠাট্টা করছ! তুমি আবার তাই পার নাকি?'

বললাম, 'ঠাট্টা নয় সত্যি, আপনারা পারলেন—আমি কেন পারব না?'

চাটুয্যে সে কথার কোন জবাব না দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি? আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।'

নীরস এবং নির্মম কণ্ঠে বললাম, 'না হ'লে আর উপায় কি।'

চাটুয্যে এক মুহূর্ত চুপ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'না উপায় আর কি। চল হে রমেশ চল, রাত হলো।'

চাটুয্যের পিছনে সদলবলে সবাই আবার হাঁটা শুরু করল।

ওরা কি সত্যিই আমার কাছে অন্য কিছু আশা করেছিল? সত্যিই দেখতে এসেছিল, ওরা যা পারেনি আমি তাই পেরেছি? উইলসন আর ডসনের চেয়েও কি আমি ওদের বেশী নিরাশ আর বেশী অপমান করলুম?

চোর

ঘরে ঢুকে গা থেকে চাদরটা খুলে অমূল্য বিছানার ওপর রাখল, তারপর পকেট থেকে সরু লম্বা সাইজের একটা সাবানের বাক্স আর এক কৌটো স্নো বার ক'রে স্ত্রীর সামনে ধ'রে বলল, 'নাও, তুলে রাখো।'

রেণু হাতখানা বাড়িয়েই তাড়াতাড়ি আবার সরিয়ে নিল, যেন সাপের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল সে। তারপর সরাসরি স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আজ আবার এ-সব এনেছ যে!'

অমূল্য একবার যেন চোখ ফিরিয়ে নিল, কিন্তু পর-মুহূর্তেই তীব্র দৃষ্টিতে রেণুর দিকে চেয়ে ক্রোধ এবং ব্যঙ্গ-মিশ্রিত অদ্ভুত হাস্যে বলল, 'এনেছি বাজারে বিক্রি করবার জন্যে।'

সঙ্গে সঙ্গেই সুর বদলে হঠাৎ যেন ধমকে উঠল অমূল্য, 'বলি, জিনিসগুলি হাত থেকে নিতে পারবে কি না?'

রেণু আস্তে আস্তে বলল, 'হাতে করে তুমি যদি আনতে পেরে থাক, আমি নিতে পারব না কেন?'

এর পর জিনিসগুলি তুলে নিয়ে রেণু জল-চৌকিটার ওপর রেখে দিল।

অমূল্য বলল, 'শেষ পর্যন্ত না নিয়ে যখন পারবেই না জানো, তখন আগে থাকতে ভদ্রভাবে নিলেই হয়। অত চেঁচামেচি অত সতীপনা কিসের জন্যে? আর একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম বলে কি রোজই তাই করব না কি। এগুলি আমার নিজের পয়সায় কেনা।'

রেণু স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসল, 'দেখ আর যাই কর, আমার কাছে মিথ্যা কথা বলো না।'

অমূল্য আবার জলে উঠল, 'না খড়দ'র মা-গোঁসাই এসেছ কি না তুমি, তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলব না!'

এবার সত্যিই হাসি পেল রেণুর, 'খড়দ'র মা-গোঁসাই ছাড়া আর কারো কাছে বুঝি সত্যি কথা বলা যায় না?'

অমূল্য এক মুহূর্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল। হাসলে ভারী সুন্দর

দেখায় ওকে, কেবল এই গোঁড়ামিটুকু যদি না থাকত, এই অতিরিক্ত শুচিবায়ু।

বেণু একবার চোখ নামিয়ে নিল, তারপর আবার অমূল্যের দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'দেখ, তোমার ভালোর জন্যই বলি, না হ লে আমার আর কি, একদিন যদি হাতে হাতে ধরা প'ড়ে যাও তখন দশা হবে কি, তখন মান থাকবে কোথায় ?'

অমূল্য অটুট আত্মপ্রত্যয়ে বলল, 'ক্ষেপেছ ! তেমন কাঁচা হাত আমার নয়।'

হাত কাঁচা নয়, এই নিয়ে বড়াই করতে লজ্জাও হয় না অমূল্যর, সেই লজ্জায় বেণুর নিজের মরে যেতে ইচ্ছা করে। হাত কাঁচা নয় তা ঠিক। কোন যেন দ্বিধা নেই অমূল্যর ! বিয়ের ক দিন পরে তারা ট্রামে যাচ্ছিল ইডেন গার্ডেন দেখতে। এক বেঞ্চে পাশাপাশি বসে বেণুর সঙ্গে গল্প করছিল অমূল্য। কন্‌ডাক্টর এলো টিকিট চাইতে। সঙ্গে সঙ্গে গল্পে অমূল্যর মনোযোগ আরও বেড়ে গেল।

কন্‌ডাক্টর তবু জিজ্ঞেস করল, 'বাবু টিকিট ?'

অমূল্য একবার মাথা নেড়ে বেণুর সঙ্গে গল্পই করতে লাগল। বেণু স্পষ্ট দেখল কন্‌ডাক্টরটা একটু মুচকী হেসে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। অমূল্য অনর্গল কথা বলতে লাগল কিন্তু লজ্জায় বেণুর সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। ছি ছি, কি মনে করল কন্‌ডাকটরটা ! মাত্র দু' আনার তো ব্যাপার।

কন্‌ডাক্টর একটু দূরে স'রে গেলে বেণু চুপে চুপে স্বামীকে জিজ্ঞেস ক'রেছিল, টিকিট করলে না যে।'

অমূল্য হেসে বলেছিল, 'ওঃ, তুমি বুঝি আবার তা লক্ষ্য ক রেছ। টিকিটই যদি করব তো ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছি কেন !'

বেণু অবাক্ হয়ে বলেছিল, 'ওমা, ফার্স্ট ক্লাসে ছাড়া আবার ভদ্রলোক মেয়ে-ছেলে নিয়ে ওঠে না কি। তাই ব'লে টিকিট করবে না ?'

অমূল্য সগর্বে বলেছিল, 'একা যখন উঠি তখনই ডবলুটিতে চলি, আর আজ তো তুমি সঙ্গে আছ। বিয়ে করায় বড্ড খরচ। দু'-চার পয়সাও যদি এ ভাবে পুষিয়ে না নেওয়া যায় তা হ'লে কি ক'রে চলে বল।'

বেণু ভেবেছিল, অমূল্য বুঝি পরিহাস করছে। কিন্তু ফেরার পথেও অমূল্য যখন কন্‌ডাক্টরকে দেখে গম্ভীর মুখে একবার মাথা কাত ক'রে বেণুর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল, তখন বেণুর বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করছে। রক্ষা যে, সেই আগের কন্‌ডাক্টর নয়। এবার সে তা হ'লে অমূল্যর কাছ থেকে টিকিটের পয়সা আদায় ক'রে ছাড়ত। ছি ছি ছি ! এক-গাড়ী লোকের সামনে কি ক'রে তাদের মান থাকত, কি ক'রে মুখ দেখাত তারা।

গাড়ী থেকে নেমে রেণু বলেছিল, 'ছি, এ-সব আমি মোটেই পছন্দ করিনে।'

অমূল্য বলেছিল, 'কি সব ?'

'এই টিকিট না কেটে ট্রামে বাসে চলা, ছি।'

অমূল্য হেসেছিল, 'ও, গম্ভীরভাবে তুমি বুঝি সেই কথাই ভাবছ। আচ্ছা শুচিবায়ুগ্রস্ত মেয়ে তো হে তুমি। বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে ভোগাবে। হিষ্টীযা টিষ্টীয়া নেই তো আবার ?'

'কেন ? তার মানে ?'

'তার মানে এ সব মেয়েদের তাও থাকে।'

রেণু বলেছিল, 'ছি, সমান্য দু' আনা পয়সার জন্য—'

অমূল্য বাধা দিয়ে জবাব দিয়েছিল, 'দু' আনা নয়, দু' আনা দু' আনা, চার আনা, দিব্যি এক প্যাকেট সিগরেট হবে।'

'চাইলে না কেন, সিগারেটের পযসা আমি তোমাকে দিতাম।'

এর ক'দিন পরে অমল্য দামী একখানা চিরুণী নিয়ে এসে উপস্থিত। 'দেখতো, কেমন চিরুণীখানা !'

রেণু সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে চিরুণীখানা নিয়ে বলল, 'বাঃ, চমৎকার তো! কত দাম ?'

অমূল্য বলল, 'আড়াই টাকা।'

রেণুর মুখ ম্লান হয়ে গেল, 'ছি, এত দাম দিয়ে কেন আনতে গেলে বলো দেখি, চিরুণীর তো আমার অভাব নেই, এই সে দিন বৌভাতেই তো তিনখানা চিরুণী পেয়েছি। যা-ই বলো, এ সব বাজে বাবুগিরি আমার মোটেই পছন্দ হয় না, যে দিন-কাল তাতে এ ভাবে পযসা নষ্ট করবার কোন মানে হয় ?'

অমূল্য আত্মপ্রসাদে হেসে বলল, 'পাগল হয়েছ! গাঁটের পয়সা ব্যয় ক'রে বাবুগিরি করতে যাব, অত পয়সা পাল ব্রাদার্স দেয় না।'

রেণু বলল, ও, কোম্পানী বুঝি নিজেদের লোক ব'লে খুব সস্তায় দিয়েছে!'

অমূল্য হেসে বলল, 'কেবল সস্তায় নয় হে, একেবারে বিনাম ল্যে। জানে কি না, আনকোরা নতুন বৌ এসেছে ঘরে।'

রেণু সলজ্জে বলল, 'যাও, কি যে বল। মুখের তোমার কোন আগল নেই। সত্যি, আড়াই টাকার জিনিস কত দামে পেলে বল না, আমার বৌদির জন্য একখানা আনাব।'

অমূল্য অকস্মাৎ চটে উঠল, 'হয়েছে। আর ন্যাকামী কোরো না, মেয়েদের

গ্যাকামী কখনো কখনো ভালো লাগে, তাই ব'লে কি সব সময়েই সহ্য হয়?'

'তার মানে?'

'তার মানে পয়সা লাগেনি, হাত সাফাইতে এসেছে। তা তোমার জন্যে পারি ব'লে তোমার বৌদির জন্যেও পারতে হবে এমন কি কথা আছে?'

কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে রেণু বলেছিল, 'ও চিরুণীতে আমার কাজ নেই। ওটা তুমি কালই ফেরৎ দিয়ে এসো, ছি।'

'অমনি রাগ হয়ে গেল বুঝি! আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার বৌদির জন্যেও একখানা হবে। হাজার হ'লেও শালাজ তো!'

কিন্তু বহুক্ষণের মধ্যে রেণু আর কথা বলেনি।

আজও রেণু চুপ ক'রে রইল। কোন ভদ্রলোকের ছেলে যে এ-সব করতে পারে, তা যেন ধারণায় আনা যায় না। গরীব তো তার বাপ-ভাইও। কিন্তু পরম শত্রুও কি কোনদিন বলতে পারবে যে, পরের কোন জিনিস লুকিয়ে আনা তো দূরের কথা, হাত দিয়ে ছুঁয়ে পর্যন্ত তারা দেখেছে?

নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে কান্না পায় রেণুর। শেষ পর্যন্ত এমন লোকের হাতেই পড়তে হলো তাকে। আর শুধু হাতে পড়া নয়, আজীবন এই লোকটির সঙ্গেই তাকে বাস করতে হবে, হাসতে হবে, আদর-সোহাগ করতে হবে। তারপর ছেলে হবে, মেয়ে হবে, কিন্তু কিছুতেই অমূল্যর প্রবৃত্তি আর বদলাবে না। কেন না, এ সব অভ্যাস মানুষের যায় না, বয়স হোলেও না, পয়সা হোলেও না,—রেণু অনেক শুনেছে, অনেক দেখেছে। তারপর সব একাকার হয়ে যাবে; কেউ জানবে না রেণু অন্য প্রকৃতির মেয়ে, এ সব সে সহ্য করতেই পারে না। কেউ কি এ কথা বিশ্বাস করবে? সবাই জানবে অমূল্য যেমন ছিঁচকে চোর, রেণু তেমনি চোরের বউ।

অন্ধকারে স্বামীর ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনের মধ্যে ঘৃণায় রেণুর যেন সর্বাঙ্গ কুঞ্চিত হয়ে এলো। এমন একটি লোক তাকে জড়িয়ে ধরেছে যার মন ছোট, প্রবৃত্তি ছোট, পরের দোকান থেকে জিনিস চুরি ক'রে আনতে যার কোন লজ্জা-ঘৃণার বালাই নেই।

অমূল্যর চুম্বনের প্রত্যুত্তরে রেণু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'আমার একটা কথা শুনবে?'

'কি ?'

রেণু বলল, 'ও-ভাবে জিনিসপত্র আর এনো না। সত্যি বলছি, ও-সব আমার কিচ্ছু দরকার নেই, আমি আর কিচ্ছু চাইনে, কেবল তুমি ভালো হও, ভদ্র হও। দশ জনে যদি তোমাকে ভদ্রলোক ব'লে জানে, তাহ'লেই আমার তৃপ্তি।'

এবার স্তব্ধ হবার পালা অমূল্যর। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে সে পাশ ফিরলো। এই নীতি-শিক্ষার দক্ষিণা রেণুকে পুরোপুরি ভাবে না দিয়ে তার শান্তি নেই।

রেণু বলল, 'ও কি, রাগ করলে না কি ? তোমার ভালোর জন্যই বলছি।'

অমূল্য জবাব দিল, 'আমিও ভালোর জন্যই বলছি। চুপ করে ঘুমোও।'

পরদিন ভোরে উঠে অমূল্য স্ত্রীকে কাছে ডাকল, 'এই শোন।'

রেণু কাছে এসে বলল, 'কি।'

অমূল্য ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'ওপরের বিনোদ বাবুদের ঘরে কাল নতুন কতকগুলি কাঁসার বাটি এসেছে, না ?'

রেণু অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাতে তোমার কি।'

'বিনোদ বাবুদের বৌয়ের সঙ্গে তো তোমার খুব ভাব। ও-ঘরে তো তোমার অবাধ গতিবিধি।'

'হ্যাঁ, মাসীমা ভারি ভালোবাসেন আমাকে। আর তাঁর ছোট ছেলে তো আমার হাতে ছাড়া খেতেই চায় না।'

অমূল্য তেমনি ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'তবে তো আরও সুবিধে। দুধ খাওয়ানো হয়ে গেলে কাপড়ের তলায় ক'রে বাটিটা অনায়াসে তুলে আনতে পারবে।'

রাগে এবং দুঃখে মুখ দিয়ে রেণুর কিছুক্ষণ কথা সরলো না। একটু পরে সে বলল, 'কি যা তা বলছ, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার ?'

অমূল্য অম্লান মুখে বলল, 'মোটেই না, কাঁসার আজকাল সের কত ক'রে জানো ? দু'-তিনটে বাটি যদি সরাতে পারো তাহ'লে দু'দিন বক্সে বসে দু'জনে বেশ থিয়েটার দেখে আসতে পারব।' অমূল্য হাসল।

রেণু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'যেমন মানুষ, তেমন তার ঠাট্টা। ও-সব ঠাট্টা আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না।'

অমূল্য বলল, 'ঠাট্টা নয় সত্যিই বলছিলাম।'

দুপুরবেলায় মাসীমার কোলের ছেলেকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে অকারণে রেণুর

হাত কাঁপতে লাগল। কি সাংঘাতিক মানুষ অমূল্য, কি বিশ্রী ঠাট্টাই সে করতে পারে!

কয়েক দিন পরে। বেলা সাড়ে সাতটা বাজে। কিন্তু বিছানা থেকে অমূল্যর ওঠার নাম নেই, অন্য দিনে চা-টা খেয়ে এর মধ্যে অমূল্য রওনা হয়ে পড়ে। দোকানে আটটা থেকে তার ডিউটি।

রেণু কাছে এসে অমূল্য মুখের ওপর থেকে লেপটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'কি মশাই, খুব যে ঘুমনো হচ্ছে? বেলা হয় না আজ?'

অমূল্য অদ্ভুত একটু হাসল 'আজ আর বেলা হবে না।'

স্বামীর হাসি আর কথার ভঙ্গিতে কেমন যেন বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল রেণুর; বলল, 'কেন, দোকান আজ বন্ধ না কি? কি উপলক্ষে বল দেখি?'

অমূল্য চটে উঠে বলল, 'ন্যাকা! 'কি উপলক্ষে! উপলক্ষ আবার কি, উপলক্ষ আমার শ্রাদ্ধ।'

বলতে বলতে অমূল্য আবার পাশ ফিরতে চেষ্টা করল।

রেণু এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এমন যে হবে আমি আগেই জানতুম।'

অমূল্যর আর পাশ ফেরা হলো না, 'কি, কি বললে?'

রেণু বলল, 'বলবার আর আছে কি, তবু ভাগ্য যে, পুলিসে দেয়নি। অমনিই ছেড়ে দিয়েছে।'

অমূল্য বলল, উঃ কি আপশোষের কথা! কিন্তু এর চেয়ে বোধ হয় পুলিসের হাতে যাওয়াই ভালো ছিল। আমি জেল খাটতুম আর তুমি তত দিন সাধুসঙ্গ ক'রে একটু মুখ বদলে নিতে পারতে!'

কিছুক্ষণ বাদে মনে মনে কি মতলব ঠিক ক'রে অমূল্য উঠে পড়ল। হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখে রেণু দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ দিয়ে বসে আছে।

অমূল্য কাছে এসে বলল, 'বা, অমন ক'রে বসে রয়েছ যে! হলো কি তোমার?'

কিন্তু রেণুর কাছ থেকে কোন সাড়া এল না।

অমূল্য বলল, 'বা, মুখই তুলবে না বলে ঠিক ক'রেছ না কি? কিন্তু মুখ দেখাতে লজ্জা তো আমার হবার কথা, তোমার কি?'

রেণু হঠাৎ মাথা তুলে বলল, 'তোমার প্রাণে কি মায়া-মমতা বলতে কিছু নেই একেবারে? তুমি কি পাষাণ?'

অমূল্য পাষাণ নয়। নীরবে আস্তে আস্তে রেণুর চুলের ওপর হাত বুলাতে লাগল।

মিনিট খানেক পরে রেণু মুখ তুলে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কি এমন অপরাধ ক'রেছিলে যে ওরা তোমাকে ছাড়িয়ে দিল?'

কৈফিয়ৎটা অমূল্যর কাছে নয়, অমূল্যর মনিবদের কাছেই যেন দাবী করছে রেণু। অমূল্য একটু অবাক্ হয়ে গেল। বলল, 'অপরাধ আবার কি। বুড়ো ক্যাসিয়ার বেটা পিছনে লেগেছিল। অপরাধ তার স্ত্রীর জন্য কেন এক কৌটো পাউডার হাত-সাফাই ক'রে নিয়ে দিতে পারিনি। ম্যানেজারকে গিয়ে লাগিয়েছে আমার বিরুদ্ধে।'

রেণু আজ স্বামীর কথার প্রতি বর্ণ বিশ্বাস ক'রে বলল, 'হুঁ, সাধু যে পৃথিবীতে সকলেই তা জানা আছে।'

দিন কয়েক খুব চাকরি খুঁজল অমূল্য। কিন্তু হয় হয় ক'রে কোনটাই ঠিক হয়ে উঠল না। রেণু ভরসা দিয়ে বলে, 'অত ভাব কেন, চাকরির কি অভাব আছে না কি আজকালকার দিনে? হবেই এক দিন।'

কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেহ চাল বাড়ন্ত হয়ে পড়ল। শুধু চাল নয়, তেল, নুন, ডাল বলতে কিছুই নেই।

অমূল্য মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল, 'এক কাজ করা যায়; কিন্তু তুমি কিছু মনে করবে না তো?'

'না, মনে আবার কি করব?'

'স্নো আর সাবানের বাক্সগুলি দাও। জানা লোক আছে। উচিত দামেই দিয়ে দিতে পারব।'

রেণুর মুখখানা হঠাৎ যেন কালো হয়ে উঠল। তারপর বলল 'আচ্ছা নাও। কিন্তু এ ভাবেই তো আর দিন চলবে না!'

অমুল্য বলল, 'সে তো নিশ্চয়ই। অন্য ব্যবস্থাও করতে হবে।'

দু'-তিন দিন পরে দেখা গেল, অমুল্য কোত্থেকে একটা দামী ফাউন্টেন পেন নিয়ে এসেছে।

রেণু একবার পেন-টার দিকে তাকাল, আর একবার স্বামীর দিকে তাকাল। অম ল্য প্রতি মুহূর্তেই আশংকা করতে লাগল এই বুঝি রেণু তীব্র কণ্ঠে তিরস্কার ক'রে উঠবে। কিন্তু আশ্চর্য, রেণু ও সম্বন্ধে কোন কথাই বলল না। যেন কোন নতুন কিছু ঘটেনি, তেমনি সহজ নিশ্চিন্তভাবে ঘর ঝাঁট দিতে লাগল।

মাঝখানে একবার স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'নারকেল তেল কিন্তু একেবারে নেই।'

অমূল্য বলল, 'আচ্ছা।'

সন্ধ্যার দিকে পেনটা আর দেখা গেল না। তার বদলে চাল, ডাল, তেল, কয়লায় ঘর ভ'রে গেল। সুগন্ধি নারিকেল তেল এল এক শিশি।

রেণু এবারও কোন কথা না ব'লে জিনিসগুলি গুছিয়ে তুলছে, অমূল্য বলল, 'দাঁড়াও, আর একটা জিনিস আছে তোমার জন্য।'

রেণু বলল, 'কি।'

অমূল্য পকেট থেকে একটা ওটিন স্নো বের ক'রে রেণুর হাতে দিয়ে বলল, 'পাল ব্রাদার্স থেকে একেবারে নগদ পয়সা দিয়ে কেনা। বুড়ো বিষ্টুবাবুর নাকের সামনে পাঁচ টাকার নোটখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, চেঞ্জ প্লিজ। একটু তাড়া আছে বাইরে।'

রেণু হেসে বলল, 'এতও জানো তুমি, আর এতও তোমার মনে থাকে!' রাত্রির অন্ধকারে স্বামীর রোমশ বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে রেণু আস্তে আস্তে বলল, 'যাই বলো, আমার কিন্তু গা কাঁপছে এখনো। এত সাহস কি ভালো?'

রেণুর খোঁপার ওপর সাদরে আস্তে একটু চাপ দিয়ে অমূল্য বলল, 'সাহস ভালো নয়? সাহস না থাকলে এত দিন উপোস ক'রে মরা ছাড়া গতি ছিল না কি? তোমার মত ভীরু হলেই হয়েছিল আর কি। আস্তো একটি অকর্মার ধাড়ী। তোমার মত অমন সুবিধা-সুযোগ যদি আমার থাকত!'

অভিমানে কথা ফুটল না রেণুর, ঠোঁট ফুলে উঠতে লাগল বার বার। এর জবাব রেণু স্বামীকে একদিন না একদিন না দিয়ে ছাড়বে না।

দু'-তিন দিন বাদে। সুযোগ তো এসেছে, কিন্তু রেণুর হাত কাঁপে আর বুকের মধ্যে টিপ টিপ করতে থাকে। দেওয়ালের এক কোণে পেরেকে বিনোদ বাবুর হাত-ঘড়িটা ঝুলানো রয়েছে। এমন প্রায়ই থাকে। ভারী ভুলো মন বিনোদ বাবুর। যে দিন আপিসের বেলা বেশী হয়ে যায়, সে দিন আর কোন কাণ্ডজ্ঞান না। কোন দিন বা ঘড়ি ফেলে যান, কোন দিন মণিব্যাগ।

খটের ওপর লেপ মুড়ি দিয়ে মাসীমা অচেতনভাবে ঘুমাচ্ছেন। তাঁর কোলের ছেলেকে দুধ খাইয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল রেণু। নিস্তব্ধ ঘর, ঘড়ির শব্দ এখান থেকেই যেন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, অতটুকু হাতঘড়িতে কি এত শব্দ হয়? না, এ তার নিজেরই হৃৎপিণ্ডের শব্দ! একবার

রেণু চেষ্টা করল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু অসম্ভব। এখান থেকে তার নড়বার সাধ্য নেই, পা আটকে গেছে মাটিতে। আর ওই হাতঘড়িটার ছোট ছোট কাঁটা দু'টি তার দু'চোখের তারাকে বিদ্ধ ক'রে রেখেছে।

কিন্তু যদি ধরা পড়ে, যদি খোঁজ পড়ে ঘড়ির। তার রেণু কি জানে? এই ছ' মাস ধ'রে বিনোদ বাবুদের ঘরে সে আসে যায়, গল্প করে একগাছা কুটো পর্যন্ত নড়চড় হয়েছে কেউ বলতে পারবে?

রেণু যখন কোন রকমে নিজের ঘরে এসে পৌঁছল, তখন অদ্ভুত উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বুক কাঁপছে, নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। এমন আনন্দের স্বাদ অভূতপূর্ব। আর একবার ছোট্ট ঘড়িটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ ক'রে দেখল রেণু। পুরুষের প্রথম স্পর্শও কি এত তীব্র, এমন রোমাঞ্চকর?

সন্ধ্যার পর অমূল্য ম্লান মুখে ঘরে ফিরে এলো। আজ আর কোন দিকে সুবিধা হয়নি। হঠাৎ রেণুর দিকে চেয়ে অমূল্য অবাক্ হয়ে গেল।

'কি ব্যাপার, আজ যে একটু বিশেষ সাজের ঘটা দেখছি।'

দরজায় খিল দিয়ে এসে রেণু স্বামীর সঙ্গে প্রায় মিলে গিয়ে স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে বলল, 'অত হিংসা কেন, সাজ তোমারও আজ মন্দ হবে না। যদিও কেবল এই রাত্রিটুকুর জন্য। কিন্তু একটা রাত্রিই কি কম?'

অমূল্য ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'কি বলছ, একটু পরিষ্কার ক'রে বল, হেঁয়ালি ভালো লাগে না সব সময়!'

রেণু বলল, 'সবুর, সবুর, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। তোমাদের সব কিছুতেই তাড়াহুড়ো, একটুও ধৈর্য সয় না প্রাণে, না?'

খাওয়া দাওয়ার পরে আলো না নিবিয়েই স্বামীর পাশে এসে শুয়ে পড়ল রেণু।

অমূল্য অবাক্ হয়ে বলল, 'আলোটা কি সারা রাত জ্বালাই থাকবে না কি আজ?'

রেণু মুচকি হেসে বলল, 'থাকলই বা ক্ষতি আছে না কি তাতে? না গো না, সারা রাত জ্বালা থাকবে না, একটু পরেই নিববে। দেখি, দেখি, বাঁ হাতখানা বার কর দেখি।'

'বাঁ হাত দিয়ে আবার কি করবে।'

'অল্প একটু দরকার আছে।'

ব্লাউজের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে ব্যাণ্ডশুদ্ধ ছোট ঘড়িটুকু বের ক'রে রেণু স্বামীর মনিবন্ধে বেঁধে দিয়ে বলল, 'দেখি তো, কেমন মানাচ্ছে?'

অমূল্য মুহূর্তকাল অবাক হয়ে থেকে শুষ্ক কণ্ঠে বলল, 'কি সর্বনাশ, এ তুমি কোথায় পেলে ?'

রেণু গভীর রহস্যলোক থেকে যেন মৃদু একটু হাসল, বলল, 'তা নিয়ে তোমার দরকার কি, মানাচ্ছে কি না তাই বলো।'

তারপর হঠাৎ উঠে গিয়ে লাইটটা অফ ক'রে এসে রেণু স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরল। আজ তার কোন কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই, দীনতা নেই। আজ সে পৃথিবী জয় ক'রে ফিরেছে।

'কি গো, কথা বলছ না যে! বলো না, ঠিক মানিয়েছে কি না ?'

মানাবারই তো কথা। আজ রেণু তার যথার্থ সহধর্মিণী। এত দিন ধ'রে এই তো অমূল্য প্রত্যাশা ক'রে এসেছে। আজ তাব উল্লসিত হয়ে উঠবার দিন। কিন্তু স্ত্রীর কোমল বাহুবেষ্টনের মধ্যে অমূল্য যেন কাঠ হয়ে রইল। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্য যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যে চির-পরিচিত দু'খানি হাত তার কণ্ঠ জড়িয়ে রয়েছে তা কোন সুন্দরী তরুণীর কঙ্কণ-ক্বণিত মৃণালভুজ নয়, তাও আজ শ্রীহীন, কলঙ্কিত।

মাসখানেক যাবৎ গৌরাঙ্গ বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। বাড়ীর মধ্যে ঢুকে নিজের ঘরে যাওয়ার আগে চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে চোখ বুলিয়ে নেয়। রাণুকে যদি কোথাও দেখতে পায়, মুখ মুচকে হাসে কিংবা শিস দিতে থাকে আস্তে আস্তে। নিজের বারান্দায় পায়চারি ক'রতে ক'রতে গুন্‌গুন্ ক'রে গায়, 'চোখে চোখে রাখি হায়রে'। রাণু তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। কলের কাছে তাকে বাসন মাজতে কি জল নিতে আসতে দেখলে গৌরাঙ্গ অমনি ঘর থেকে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ায়, তারপর সেখান থেকে আর নড়তে চায় না।

রাণুর বাবা অনাদি দাঁত কিড়মিড় ক'রে বলে, 'ওকে মেরে যদি হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে না দিই তো কায়েতের বাচ্চা নই আমি।'

রাণুর মা সরমা বলে, 'মারামারির দরকার নেই, এ বাড়ী তুমি ছেড়ে দাও। বাড়ীওয়ালাকে গিয়ে বল, হয় ওরা এখান থেকে উঠুক্ না হয় আমরা।'

গৌরাঙ্গের মা সৌদামিনীর কাছেও নালিশ যায়, 'ছেলেকে ব'লে দিয়ো দিদি, এটা ভদ্রলোকের বাড়ী হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে তো সেও। একি স্বভাব চরিত্র! আমরা হ'লে তো লজ্জায় ম'রে যেতাম।'

মনে মনে সৌদামিনীও যে লজ্জিত না হয় তা নয়, কিন্তু স্বীকার করলে ওরা আরো পেয়ে বসবে। সৌদামিনী জবাব দেয়, 'কি জানি, লজ্জায় মরে যাওয়ার মত তো কিছু দেখি না রাণুর মা। পুরুষ ছেলে সারাদিন খেটে-খুটে এসে হাত-পা ছড়িয়ে একটু আয়েস করবে, নিজের ঘরে বসে গলা খুলে গান গাইবে, তাতে যদি কারো মহাভারত অশুদ্ধ হয়, আমরা নাচার।'

মাঝখানে মাত্র কয়েক হাত উঠানের ব্যবধান। উত্তরের ঘর দু'খানা রাণুদের আর দক্ষিণের দু'খানা ঘর নিয়ে থাকে গৌরাঙ্গ আর তার মা। একখানা ঘরেই গৌরাঙ্গদের চলত, কিন্তু বাড়ীওয়ালা কিছুতেই শুধু একখানা ভাড়া দিতে চায়নি। আর একখানা আবার কে নেবে?

রাণুকে তার মা-বাবা সাবধান ক'রে দিয়েছে, পারতপক্ষে সে যেন গৌরাঙ্গের সামনে কক্ষণো না বেরোয়। রাণুকে অবশ্য একথা বলে দেওয়া বাহুল্য। সে নিজে

থেকেই সাবধান হয়ে চলে। গৌরাঙ্গের কাণ্ড দেখে তার কখনো বা হয় রাগ কখনো বা পায় হাসি। অনুরাগ মুহূর্তের জন্যেও আসে না। আসবার কথাও নয়, কেবল রঙটাই যা গৌরাঙ্গের ফরসা, কিন্তু এই বয়সেই চোয়াল ভেঙেছে, চোখ দুটো কোটরগত, বিড়ি খেয়ে খেয়ে ঠোঁটের রঙ হয়েছে ঘন-কৃষ্ণ। দশ আনি ছ' আনি চুলের ছাঁট, ঠোঁটের ওপর গোঁফ রাখা সূক্ষ্ম রেখায়। এর পর একটা ছাই রঙের স্যুট প'রে বেরোয় কাজে। যা চমৎকার দেখা যায় স্যুট পরলে ঐ-চেহারায়। শুধু বাইরের নয়, লোকটির মনের চেহারাও যে অমনি তা তার হাব-ভাবে আদব-কায়দায় রাণুর কাছে গোপন থাকে না। গৌরাঙ্গের প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গি, প্রতিটি পদক্ষেপ রাণুর দৃষ্টিকে পীড়া দেয়, রুচিকে ক্লিষ্ট ক'রে তোলে। আজই না হয় অবস্থা এমন হয়েছে। কিন্তু কমলাপুরের বনেদী চৌধুরী বংশের তো মেয়ে। এক ঘর জ্ঞাতি এখনো জমিদারি করছে গাঁয়ে।

শুধু এক বাড়ীতে থাকে তাই নয়; একই জায়গায়, একই ইন্স্পেকশন ডিপোতে কাজ করে অনাদি আর গৌরাঙ্গ, একই টুলস্ সেক্শনে। সৈন্যদের ব্যবহার্য নানা রকম জিনিসপত্রের বাছাই হয় ডিপোর মধ্যে। আটটা থেকে চারটে, তা'ছাড়া ঘণ্টা দুই ক'রে প্রায়ই ওভারটাইম খাটতে হয়।

সেদিন বাইরে থেকেই শিস দিতে দিতে ঢুকল গৌরাঙ্গ। আর অনাদি বিষণ্ণ মুখে ঘরে গিয়ে তক্তপোষে টান হয়ে পড়ল। রাণু কাছে এসে বলল, 'কি হয়েছে বাবা?'

অনাদি বলল, 'গৌরাঙ্গের ইন্ক্রিমেণ্ট হয়েছে।'

রাণু চুপ ক'রে রইল। তার মানে শুধু গৌরাঙ্গেরই হয়েছে।

'আর শুধু ইন্ক্রিমেণ্টই নয়, আমাদের সেক্সনের হেড একজামিনার ক'রে দেওয়া হল তাকে, তার আণ্ডারে কাজ করতে হবে!'

'আর আপনার?'

'না, আমার হয়নি। কি ক'রে হবে, আমি তো আর স্যুট পরে অফিসে যাইনে, সাহেব দেখলে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াইনে, অনবরত ভুল ইংরেজী আওড়াইনে তাদের সঙ্গে? তা না হলে আর কাজের লোক হলাম কিসে? শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। সারা সেক্সনটার মধ্যে গৌরাঙ্গই নাকি সব চেয়ে কাজের লোক। সাহেব আদর ক'রে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেলেন, তাঁর মেম-সাহেব এসেছিলেন বেড়াতে, তিনিও হেসে গালে টোকা দিয়ে গেলেন গৌরাঙ্গের। হ্যাণ্ড্‌শেক্ ক'রে বললেন, 'কন্‌গ্রাচুলেশন।'

রাণু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, দরকার নেই আপনার ওখানে চাকরি ক'রে। ওরকম চাকরি আরো কত জুটবে।'

কিন্তু আরো কিছুদিন পরে একদিন রাত্রে মা বাবার মৃদু আলাপ শুনে রাণু অবাক হয়ে গেল।

অনাদি বলছে, 'ওকে খুসি না রাখলে ইনক্রিমেণ্ট কোন কালেই হবে না। ওই তো প্রথম রেকমেণ্ড করবে। তা ছাড়া সাহেববা সত্যিই ওকে খাতির করে। শিগ্গিরই বোধ হয় ও সুপারিন্টেনডেণ্ট হয়ে যাবে। অমন দেখলে কি হবে স্বয়ং অফিসার ইন্‌চার্জের সঙ্গে ওর দহরম মহরম। ওকে ব'লে প্রমথকেও ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে অফিসে। বছর চৌদ্দ বয়স হল তো প্রমথর, এবারও ফেল করল ফোর্থ ক্লাসে। পড়া শুনো যা হবার হয়েছে। প্রথমে না হয় লেবারার হিসাবেই ঢুকুক, মাস অন্তে তি'রিশটা টাকা, আরো এ্যালাউন্স আছে। মেয়ের বয়সও তো কম হয়নি একেবারে, বছর আঠোরো হল, না?'

সরমা বলল, 'বৈশাখে উনিশে পড়েছে। কিন্তু গৌরাঙ্গের স্বভাবচরিত্রটা একটু কেমন ঠেকে না কি?'

অনাদি বলল, 'পুরুষের আবার স্বভাব-চরিত্র। বিয়ে করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে দেখে নিয়ো। তা ছাড়া ওই রকমই চাই আজকাল, বুঝলে? ফাজিল-ফক্কর না হ'তে পারলে এ যুগে ভাত নেই। আর ভাব-সাব দেখে বুঝতে পারো না, দুজনের মধ্যে বেশ একটা ভালোবাসাও হয়েছে। আজকালকার এই তো নিয়ম, ভালোবাসার পরে হয় বিয়ে।'

প্রতিবাদ নিষ্ফল। এমন সুযোগ আর মিলবে না। গৌরাঙ্গের কোন দাবী দাওয়া নেই, কোন খরচ পত্রের মধ্যে যেতে হবে না। শুধু শাখা সিঁদুর দিয়ে মেয়ে কেউ পার করতে পারে আজকাল? তাও এমন চাকুরে জোয়ান বয়সের ছেলে। এমন নয় যে বুড়ো দোজবরে বর।

কিছুনা কিছুনা ক'রেও শ'দুয়েক টাকা খরচ হয়ে গেল অনাদির। যাক্, এ-দুশো টাকা উঠে আসতে দেরী হবে না যদি কৃপা হয় গৌরাঙ্গের।

বাসর ঘরে গৌরাঙ্গ বলল, 'বাপরে কি শুচিবাই ছিল তোমার বাপ মার। একটু হাসলে দোষ, একটু তাকালে দোষ'। তারপর হাত ধ'রে রাণুকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'এখন আর কিছুতে দোষ নেই, কি বল, আছে না কি?'

রাণু আড়ষ্টভাবে বলল, 'না।'

'তা জানি, তবে অমন লুকিয়ে লুকিয়ে থাক্‌তে যে? ইশারা ইঙ্গিত কিছুই

যেন বুঝতে পারতে না? কচি খুকি আর কি, কিন্তু সত্যিই আমাকে তুমি ভালোবাসো তো?'

মুহূর্তের জন্য মনটা রাণুর দুলে উঠল। এখানে আর কারো সঙ্গে গৌরাঙ্গের প্রভেদ নেই।

কয়েকদিনের মধ্যেই গা ঘিন-ঘিন ভাবটা আরো কমে যেতে লাগল। তা ছাড়া জোর ক'রেই সেটা সে কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করল। গৌরাঙ্গকেই সে ভালো-বাসবে। যতটা সত্যি সত্যি ভালো না লাগল, তার চেয়ে দেখাতে লাগল রাণু অনেক বেশী, এই দেখানটা গৌরাঙ্গকে শুধু নয়, নিজের মা বাপকেও। এমনি ক'রেই অনাদির ওপর সে যেন শোধ তুলবে।

অনাদিকে দেখিয়ে দেখিয়ে গৌরাঙ্গের হাতে রাণু পান তুলে দেয়, অনাদির সামনেই গৌরাঙ্গের সঙ্গে সে কথা বলে, এতে গৌরাঙ্গের নিজেরই যেন কেমন লজ্জা করে আজকাল।

ক'দিনে সত্যিই পরিবর্তন হয়েছে গৌরাঙ্গের। যখন-তখন শিস্ দেওয়ার, গান গাওয়ার আর প্রয়োজন হয় না, সন্ধানী আবিল দৃষ্টিতে রাণুকে খুঁজবার আর দরকার নেই এখন। রাণু আজ গৌরাঙ্গের নিজেরই ঘরে, যে কোন সময় ডাকলে তাকে পাওয়া যাবে, যে-কোন মুহূর্তে তাকে টেনে নিলেই হল বুকের ওপর। উদ্দাম লোলুপতা গৌরাঙ্গের স্বভাবতই শান্ত হয়ে আসে।

অনাদি স্ত্রীকে বলে, 'দেখেছ, আর তুমি বলেছিলে, রাণুর মত শান্ত গম্ভীর স্বভাবের মেয়ে গৌরাঙ্গকে কি ভালোবাসতে পারবে? এখন কি দেখা যাচ্ছে?'

সরমা মুখ টিপে হাসে, 'ভালই তো, তাতে তোমার দুঃখের কি আছে? মেয়ে জামাই সুখী হয়, ভালোবাসে পরস্পরকে, সেইতো আনন্দের কথা। ওমা, রাণু নাকি, তুই ওখানে কি করছিলি?'

আনন্দে সরমারও বেশ আঘাত লাগল, যখন শোনা গেল, রাণুরা সামনের মাসের প্রথমেই উঠে যাচ্ছে এ বাসা থেকে, আর যাওয়ার আগ্রহটা নাকি রাণুরই বেশী। কি নিষ্ঠুর স্বার্থপর মেয়েটা। এতকাল খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করল যে মা-বাপ, বিয়ে হ'তে না হ'তেই তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক সে চুকিয়ে দিতে চাচ্ছে। তাদের চোখের সামনে থাকাও তার সহ্য হয় না।

গৌরাঙ্গ একটু অবাক হ'ল বটে কিন্তু প্রস্তাবটা রাণুর কাছ থেকে আসায় সে খুসিও হ'ল মনে মনে। তবু মুখে বলল, 'কিন্তু একটু কেমন কেমন দেখাবে না? এই সেদিন বিয়ে হ'ল আর আজই যদি আমরা উঠে যাই এখানে থেকে?'

রাণু হেসে বলল, 'বাঃ, সেইতো নিয়ম। বিয়ের পরে মানুষ শ্বশুর বাড়ী যায় গাড়ীতে, জাহাজে, দেশ-দেশান্তর পার হয়ে। আর কি কপাল দেখ আমার, শ্বশুর বাড়ী আর বাপের বাড়ী একই বাড়ীর মধ্যে।'

গৌরাঙ্গ বলে, 'সেইতো ভালো। বিদায়-বিরহ নেই, কান্না-কাটি নেই, কারো সঙ্গেই ছাড়া-ছাড়ি হ'ল না। সবাইকেই পাচ্ছ একসঙ্গে।'

'কই আর পাচ্ছি? ভালো ক'রে খুসি মত কথা বলবার জো নেই তোমার সঙ্গে, পাছে ওদের চোখে পড়ে। আবার ওঘরে গিয়ে দু'দণ্ড যে কথা বলব, কি কাজ-কর্ম ক'রে দেব মার, তার ভরসাও পাই না, পাছে তোমাদের চোখে লাগে।'

গৌরাঙ্গের মুখে একটু ছায়া পড়তেই রাণু মধুর ভঙ্গিতে বলল, 'তা ছাড়া সত্যিই আমার ভারী লজ্জা করে, সবাই ভাবে, কি বেহায়া মেয়েটা!'

গৌরাঙ্গ বলে, 'তুমি যত বেশি বেহায়া হবে, তত আমার ভালো লাগবে। মাঝে মাঝে এমন গম্ভীর হয়ে ওঠো যে আমার এক-এক সময় ভয় হয়, তুমি হয়তো সুখী হওনি।'

রাণু হাসে, 'তাই নাকি? বিয়ের পর তোমার ভয়ও হয় নাকি আজকাল। আগে তো কোন ভয়ের লক্ষণ দেখতাম না। পারো তো জোর ক'রে ও ঘর থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসো, এমনি ছিল ভাব। কিন্তু এরই মধ্যে তুমি রীতিমত ভীতু আর শান্ত মানুষটি হয়ে উঠছ। আর আমি ঠিক উল্টো। তোমার স্বভাব আমি পাচ্ছি আর আমার স্বভাব তুমি। শুধু মালা বদল নয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বভাব বদলও হয় নাকি বিয়ের পর?'

গৌরাঙ্গ বলল, 'আমার কিন্তু বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না। ভালোই লাগছে শ্বশুর শাশুড়ীকে। কিন্তু সব চেয়ে বিশ্রী লাগে যখন ওরা তোমাকে টগরী বলে ডাকেন।'

রাণু হাসল, 'আর তোমার মা যখন তোমাকে গোরো বলেন, তখন বুঝি শুনতে খুব ভালো লাগে আমার?'

সিমলা স্ট্রীটে নতুন লাল দোতলা বাড়ীটায় পাশাপাশি দু'খানা ঘর নিল গৌরাঙ্গ। ভাড়া পঁচিশ টাকা। আগের বাড়ীতে ছিল বারো।

সৌদামিনী শুনে শিউরে উঠল, 'বুঝে-শুনে খরচ করিস গোরো, টাকা হাতে এসেছে বলেই কি এমন ক'রে নষ্ট ক'রতে হয়? তাছাড়া বিয়ে থা ক'রেছিস, ছেলে পুলে হবে, ক্রমেই খরচ বাড়বে, এখন কি আর অমন বে-হিসাবী হবার বয়স আছে?'

গৌরাঙ্গ হাসে, 'আচ্ছা আচ্ছা, সে তোমার ভাবতে হবে না, হিসাব আমার ঠিক আছে।'

কিন্তু গৌরাঙ্গকে যেন নেশায় পেয়ে বসেছে। মাইনের চেয়ে উপরির দিকে নজর তার বেশী, আর সেই টাকায় পছন্দমত ক'রে ঘর সাজায়, সাজায় রাণুকে। মাসে খান দুই ক'রে নতুন্ শাড়ী আসে রাণুর, এম বি সরকারে গহনার অর্ডার যায়। খাট, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, আলনায় প্রায় দুটো ঘরই গৌরাঙ্গ ভ'রে ফেলেছে। সমস্ত পুরানো বাজারটাকে সে যেন তুলে নিয়ে এসেছে ঘরে। দেয়ালে দেয়ালে দেশ-বিদেশের অভিনেত্রীদের বিভিন্ন ভঙ্গির প্রতিকৃতি। সবগুলো রাণুর চোখে ভালো লাগে না। বলে, 'ও-গুলি আবার আনলে কেন ? মাগো, কি বিশ্রী, কি অসভ্য সব ঢঙ, লজ্জাও করে না ?'

গৌরাঙ্গ বলে, 'কেন, হিংসা হয় নাকি তোমার ? সতীন বলে মনে হয় নাকি ?'

গৌরাঙ্গের বুকে মাথা রেখে রাণু বলে, 'ঈস, আমার সতীন হ'তে পারে এমন যোগ্যতা আছে নাকি ওর একটারও ?'

রবিবার হয় থিয়েটার না হয় সিনেমা। কোন কোন দিন অবশ্য ট্রামের অলডে কেটে সমস্ত কলকাতাটা গৌরাঙ্গ আর রাণু চষে বেড়ায়।

গৌরাঙ্গের চেষ্টায় রাণুর ভাই প্রমথর চাকরি হয়ে গেছে তাদের ডিপোতে। খবরটা দিয়ে গৌরাঙ্গ বলে, 'কি খাওয়াবে বলো।' গৌরাঙ্গ অর্থপূর্ণভাবে হাসে। রাণুও হাসে, 'এত লোকের এত চাকরি দিচ্ছ, আমাকে দাওনা একটা জুটিয়ে।'

গৌরাঙ্গ বলে, 'রাণীরও বুঝি মাঝে মাঝে চাকরাণী হবার সাধ যায় ? এত বড় চাকর দিনরাত যার ফুট ফরমাস খাটে পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী ছাড়া আর কোন্ পদ তাকে দিতে পারি বলো ?'

সম্রাজ্ঞী ছাড়া কি, শাশুড়ী কেবল নাম মাত্র। ঘরের সমস্ত কর্তৃত্ব গৌরাঙ্গ তার হাতে তুলে দিয়েছে। কারো সংসারে এখন আর বোঝা হয়ে নেই রাণু। এখানে তাকে না হলেই বরং গৌরাঙ্গের এক মুহূর্ত চলে না। তার সামান্য একটু মাথা ধরলে গৌরাঙ্গের মনে উৎসাহ থাকে না। কোনদিন একখানা ময়লা শাড়ী তাকে পরতে দেখলে সমস্ত পৃথিবীর রঙ গৌরাঙ্গের কাছে বিবর্ণ হয়ে যায়। তার স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য গৌরাঙ্গের সমস্ত কর্ম প্রেরণার মূল উৎস।

শুধু মাইনের কটা টাকায় যে এমন রাজার হালে কেউ থাকতে পারে না তা রাণু বোঝে। প্রথম প্রথম তার মনে কেমন একটু খচ্ খচ্ করত চিন্তাটা। কিন্তু গৌরাঙ্গ তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে এতে কোন দোষ নেই। কোন গরীব অনাথের

সর্বনাশ তো আর করছে না গৌরাঙ্গ। একদিকে বড় বড় কোম্পানী যারা যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে আর একদিকে সরকার। দু'একশ টাকা মারলে কোন পক্ষকেই পথের ভিখিরী করা হবে না। যুদ্ধ জয় ক'রতে হলে কি আর খরচের দিকে অত কড়া নজর রাখলে চলে ?

সেদিন লাইটহাউসে একটা ইংরেজী বই দেখতে গেল গৌরাঙ্গ আর রাণু। যদিও ইংরেজী কেউ ভালো ক রে বুঝতে পারে না, কিন্তু বোঝাটাই তো আর সব সময় আসল কথা নয়। অমন হাউস, অমন দামী সিটে সাহেব-মেমের পাশাপাশি বসে ছবি দেখার মধ্যে অপূর্ব উন্মাদনা আছে।

কি যোগাযোগ। পাশেই বসেছে মিঃ গোয়েন, গৌরাঙ্গদের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট। রাণুর দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে এক চোখ বুজে গোয়েন বলল, 'হালো, সেহানবীশ, এমন খাসা জিনিস জোটালে কোত্থেকে হে !'

গৌরাঙ্গ মিত্র ইংরাজী বাংলায় জবাব দেয়, চুপ চুপ, মাই ওয়াইফ, মাই ওয়াইফ।'

গোয়েন বলে, 'বটে ! বেশ, বেশ, আলাপ করিয়ে দাও না।'

গৌরাঙ্গ জবাব দেয়, 'ভোর সার। একেবারেই ডাম্ব ক্রিচার। কথা বলতে পারে না, নাহলে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব তাতে বাধা কি ?'

গোয়েন হাসে, 'সত্যি ? কিন্তু বোবাদের কি ক'রে কথা বলাতে হয় আমি জানি ?'

গোয়েন জাতে ইহুদি। দু'তিন পুরুষ আছে কলকাতায়। বাঙালীদের সঙ্গে কাজ ক'রে দু'চার পদ বাংলাও বেশ বলতে পারে। দারুণ চৌকস লোক। ডাইনে বাঁয়ে ঠিক রাখে। রেস, ওয়াইন, ওম্যান। আর জমার ঘরে জাল, জুয়াচুরি, ঘুষ। প্রয়োজন হ'লে ঘুষ চালাবার জোরও আছে কাজতে। গৌরাঙ্গের এক ধাপ ওপরে তার পদ। কিন্তু তার সঙ্গে সহকর্মীর মতই ব্যবহার করে। বখরার আধা-আধি না হলেও চার ছ'আনি অংশ গৌরাঙ্গকে সে দেয়। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে গোয়েনের অতখানি কার্পণ্য নেই। আমোদ প্রমোদের খরচ গোয়েন সম্পূর্ণ নিজেই জোগায়। নিজের মুখের পানপাত্র গৌরাঙ্গের সামনে সে তুলে ধরে। আর শুধু পানপাত্রের মধ্যেই তার উদারতা সীমাবদ্ধ থাকে না। গোয়েন বলে এসব জিনিস একা একা উপভোগ করবার নয়। সঙ্গী না থাকলে এদের পুরোপুরি রঙ্ খোলে না।

গোয়েন আরও কয়েকবার ফাঁকে ফাঁকে রাণুর দিকে তাকায়। রাণু চোখ ফিরিয়ে নেয়। ওরকম ক'রে তাকায় কেন হতভাগা? ওর চোখের দৃষ্টি ঠিক আগেকার গৌরাঙ্গের মত। রাণুর বুকের ভিতরটা কেমন যেন কেঁপে ওঠে। গৌরাঙ্গের সঙ্গে সাহেব ইংরেজীতে আলাপ করে। কথা বলবার সময় মাঝে মাঝে কি একটা উগ্র গন্ধ আসে। কি বিশ্রী গন্ধ। নিশ্চয়ই মদ খেয়ে এসেছে।

'আমাকে বোবা বললে কেন? ডাম্ব মানে যে বোবা তা আমি জানি।' রাণু স্বামীকে বাড়ী এসে বলে।

গৌরাঙ্গ গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয়, 'কিন্তু গোয়েন মানে যে সয়তান তা জানো না।'

গৌরাঙ্গ অবশ্য ভালো করেই জানে। কিন্তু জানলেই কি আর সব সময় মানতে পারা যায়, না মানবার কথা মনে থাকে? তাছাড়া মানেও কি আর কথার বদলায় না যখন সয়তান আধা-আধি বখরা দিতে চায় ভালো মানুষকে? গ্রাউণ্ড সীট সাপ্লায়ার্স মিটার এণ্ড মজুমদার কোম্পানীর সঙ্গে পাকাপাকি বোঝাপড়া ক'রে গোয়েন তাকে তাদের আড্ডায় টেনে নিয়ে যায়।

গৌরাঙ্গ বলে, 'না না ভাই ওদিকে আর নয়, আমার ওয়াইফ্ অপেক্ষা করছে।'

গোয়েন হাসে, 'আরে সে তো করবেই। কিন্তু sacrificeটা আমার মনে রেখো, তুমি বড় অকৃতজ্ঞ।'

'পাগল, তোমার কাছে চিরকাল আমি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।'

'সত্যি?'

কিন্তু শুধু মানুষের কৃতজ্ঞতার ওপর ভরসা করবার মত লোক গোয়েন নয়। নির্দিষ্ট দিনে ডিপোতে সে উপস্থিত থাকে না। কিন্তু গৌরাঙ্গের জন্য তার ফাঁদ তৈরীই থাকে।

তারপর গৌরাঙ্গকে একদিন খুব অস্থিরভাবে বাড়ী ফিরতে দেখা যায়।

রাণু বলে, 'হয়েছে কি, অমন করছ কেন?'

গৌরাঙ্গ বলে, 'না, অমন করব কেন? তোমার আর কি, পায়ের ওপর পা তুলে বসে খাবে। আর কিছুদিন কেবল ঘানি ঘুরিয়ে আসতে হবে আমাকে।'

রাণু বিবর্ণ মুখে বলে. 'কি যা তা বলছ, ঘানি ঘুরাতে হবে কেন?'

শুধু আজই নয় কদিন যাবৎই গৌরাঙ্গ এমন অন্যমনস্ক। প্রায়ই চমকে ওঠে, আর ঘুমের ঘোরে বলে 'ঘানি—ঘানি।'

অনেকক্ষণ বসে বসে গৌরাঙ্গও ভাবে। ঘানি তাকে ঘুরাতে হয় না যদি গোয়েনের কথায় সে রাজী হয়ে যায়। মাত্র একদিনের জন্য যদি সেও দেয় আধা-আধি বখরা, সত্যি ঘানি তাকে কেন ঘুরাতে হবে? কি এসে যাবে? কেইবা জানবে? আর এই বিপদ থেকে আপাতত যদি রক্ষা পাওয়া যায়, গোয়েনকে সেও পরে দেখে নিতে পারবে। তাইতো, মিছামিছি ঘানি ঘুরাতে যাবে সে কোন্ দুঃখে।

রাণু আবার জিজ্ঞাসা করে, 'কি হয়েছে বল না?'

গৌরাঙ্গ হাসে, 'কিছু না, আমি তোমাকে এমনি ঠাট্টা করছিলাম।'

'তাই বল, আমার তো বাপু বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছিল।'

'পাগল! ভালো কথা, সেদিনের সেই গোয়েন সাহেবকে মনে আছে? সেই যে সুন্দরপানা সাহেব? একসঙ্গে বসে আমরা সিনেমা দেখলাম সেদিন?'

'হ্যাঁ, তাই কি?'

গৌরাঙ্গ একটু ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'সে কাল সন্ধ্যায় আসবে আমাদের এখানে চা খেতে।'

রাণু বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমাদের এখানে। বল কি! লোকটা না সয়তান, তুমি সে দিন ব'লেছিলে?'

গৌরাঙ্গ বলল, 'ঠাট্টা ক'রেছিলাম। আসলে আমার খুব বন্ধুলোক, আসবে চা টা খাবে, একটু গল্পগুজব করবে, চলে যাবে। চমৎকার আলাপী, দারুণ ফুর্তিবাজ। দোষের মধ্যে একটু ফাজিল। কিন্তু অমন ফাজিল ফক্কর না হতে পারলে আজ-কালকার দিনে চলে না, বুঝলে?'

অনাদির কণ্ঠই শুধু নয়, তার মুখের আদলও যেন দেখা যাচ্ছে গৌরাঙ্গের মুখে। রাণু এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে স্বামীর দিকে, তারপর অদ্ভুত বিবর্ণ হেসে বলে, 'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

খবর দিল এসে ওপাড়ার সেখেদের বাড়ির হামিদ। কাদেরের সঙ্গে সেও কলকাতায় গিয়েছিল ছাতা সারার কাজে। কাজকর্ম তেমন সুবিধা না হওয়ায় হামিদ কিছুদিন পরেই ফিরে এসেছে। কিন্তু কাদের আর ফেরেনি, সে যুদ্ধের কাজ নিয়ে চলে গেছে। হামিদ অনেক অনুরোধ উপরোধ করেছিল যাতে এসব কাজে সে না যায়। কিন্তু কাদেরের গোঁ সকলেরই জানা আছে। সে কি কারো কথা শোনার পাত্র! কোথায় কি রকমের কাজ কত মাইনে এসব বৃত্তান্ত কিছুই হামিদ জানে না। না বললে সে জানবে কি ক'রে? সে তো আর মানুষের মনের কথা গুণে বার করতে পারে না। কাদের কেবল বলেছে 'ভাইকে গিয়ে বলিস, সে যুদ্ধে চলে গিয়েছে। সে খুব খুসি হবে শুনলে।'

কাদেরের বড় ভাই ইব্রাহিম হুঁকা টানতে টানতে গম্ভীরভাবে সব বিবরণ শুনছিল। শেষের কথাটা শুনে হঠাৎ এবার হেসে বলল, 'তাহ'লে তাই বল্ হামিদ। তোর দোস্ত আমাকে ভয় দেখিয়ে বাহাদুরি নেওয়ার জন্যই কথাগুলি বলেছে। কলকাতাতেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থেকে ব'লে পাঠিয়েছে সে যুদ্ধে গেছে। সেপাই বানাবার আর লোক পায়নি সরকার!'

এই ব্যাখ্যায় সকলের মুখেই একটু তৃপ্তির আভাস দেখা দিল। কাদেরের মা সামনে কাঠের মত দাঁড়িয়ে ছিল, এতক্ষণ তার মুখ দিয়ে আর বাঙ্-নিষ্পত্তি হয়নি। এবার সেও একটু হাসল, 'বাপরে বাপ, তুই আমার প্রাণ চমকে দিয়েছিলি হামিদ। এমন সর্বনেশে তামাসাও মানুষ করে? আর আমি কি তোর ঠাট্টা তামাসার পাত্র? এবার বল দেখি, কবে আসছে সে। আর খরচ কিছু পাঠিয়েছে তো তোর সঙ্গে?'

কাদেরের বউ লালবানুও বেড়ার আড়ালে উৎকর্ণ হয়ে আছে। শেষের কথাগুলির জবাব জানবার আগ্রহ তারও কম নয়।

হামিদ বুক পকেট থেকে ছোট একটি চামড়ার মণিব্যাগ বার করল, তারপর তার ভিতর থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে কাদেরের মার হাতে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এই নাও খরচ। কিন্তু মোটা খাকীর পোষাক পরে পল্টনের দলের

সঙ্গে কাদেরকে চলে যেতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বিশ্বাস কর আর না কর সে তোমাদের খুসি। ভালো কথা, তার পরনের জামা কাপড়ও সে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। পুঁটলিটা আনতে ভুলে গেছি।'

ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে তারপর হামিদ বলল, 'ভাইসাব বিকালের দিকে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে আপনিই না হয় নিয়ে আসবেন জিনিষগুলো। কাদের বলেচে এ সবে আমার আব কাজ নেই হামিদ ; ওগুলি মা আর তোর ভাবীসাবকে দিস, কাঁথা টাথা সেলাই করবে। আমার আর কিছু অভাব নেই, খোরাক-পোষাক, শোয়ার বিছানা পর্যন্ত সরকারের খরচে।'

কাদেরের মা এবার হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল এবং বড়ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোদের জন্যই এমন হল, তোর আর তোর বউয়ের জ্বালা যন্ত্রণায় টিকতে না পেরেই বাছা আমার মরতে গেছে।'

দুঃখ কারোরই কম হয় নি। কিন্তু এমন অযথা অপবাদও মানুষের শরীরে সয় না। ইব্রাহিম থামে হুঁকোটা ঠেস দিয়ে বেখে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিল, 'তোমার ছেলে কি আমাদের খেত পরত যে আমরা তাকে জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে দেশ ছাড়া করতে যাব। ভারি স্বার্থ আমাদেব তাতে। গিয়ে যদি সে থাকেই আর কারো জ্বালায় নয় তোমার ঐ সাধের ছোট বউয়ের দাপটেই বেরিয়েছে। একসন্ধ্যা এক-মুঠো ভাত কম পড়লে যে ঘরের মাটি খুঁড়ে তোলে তার জন্য গেছে। মিথ্যা পরের ঘাড়ে দোষ চাপালে হবে কি? আসল গোড়া ঘর তো তোমার ঘরের মধ্যেই। সে তুমি দেখতে পাবে কেন? আজকাল ছোট বউ আর তার বাপ মেছের খাঁই হল তোমার মস্ত কুটুম্ব। ওর ঝাড়সুদ্ধ বদমাস্। ওদের কি আর আমার চিনতে বাকি আছে?'

মার একচোখোমি ইদানীং ইব্রাহিমের সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছিল। কাদেরের মত অমন আহ্লাদের কথাবার্তা মার সঙ্গে সে বলে না বটে, কিন্তু ভাগের ভাগ বছরে ছ'মাস মাকে সেওতো খেতে দেয়। কিন্তু এমন একচোখোমি মার যে তার ঘরেও যখন খায় তখনো ফুরসুৎ পেলে কাজকর্ম ক'রে গিয়ে কাদেরের ঘরে। তার ভাত বেড়ে দেয়, ছেঁড়া লুঙ্গি সেলাই করতে বসে। যত্ন ক'রে চুল বেঁধে দেয় ছোট বউয়ের। এদিকে এতগুলি ছেলে মেয়ে নিয়ে তার বউ মরল কি বাঁচল সে খোঁজে তার দরকার নেই। যেন কাদেরই তার একমাত্র ছেলে, আর সব জলে ভেসে এসেছে!

ঘরের ভিতর থেকে লালবানুও মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, 'নিজের মার

নামে যার যা খুসি বলুক, কিন্তু তার বাপের বিরুদ্ধে কেউ যেন টুঁ শব্দ না করে। মেছের সর্দারের নামে এখনো বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এ সব কথা তার কানে উঠলে রক্ষা থাকবে না।' ইব্রাহিমও জবাব দিল, অমন হাজার মেছের সর্দারকে সে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে।

সুতরাং সম্বন্ধটা পূর্ববৎ রেষারেষির ভিতর দিয়েই চলতে লাগল। কাদের বাড়ি নেই বলে বাড়ীর একগাছা কুটোও ইব্রাহিম বেশী নেবে তার জো নেই। দুই শাশুড়ী-বউ অনুক্ষণ সবদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। আর ইব্রাহিমের মনে হয় ছোট বউ লালবানু যেন কাদেরের চেয়েও এক কাঠি বাড়া। ভাই বলে যদি বা এক আধটু মায়া মমতা ছিল কাদেরের মনে লালবানুর তাও নেই। ইব্রাহিম আর তার বউ আর ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া-ঝাঁটি করেই তার আনন্দ।

ইতিমধ্যে মেছের সর্দার এসে মেয়েকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

'জামাই যখন চলেই গেছে তখন আর তোর এখানে থেকে কষ্ট পাওয়ার দরকার কি, আর যাই হোক আমার ওখানে ভাত কাপড়ের তো তোর আর অভাব হবে না?'

কিন্তু লালবানু কিছুতেই যায়নি। গেলে নাকি শাশুড়ীর চোখে ধুলো দিয়ে সব তার ভাসুর লুটে পুটে নেবে। একগাছ কুটোও আর লালবানুদের অবশিষ্ট থাকবে না।

এ সব কথা কানে যাওয়ায় ইব্রাহিম বলে মেছের সর্দারেরই তো ঝাড়। ওর প্রবৃত্তি এমন ছোট হবে না তো হবে কার। আসলে লোকে যে ওদের স্বপক্ষে কথা বলে সে ওর মুখ দেখে। কিন্তু তারা তো জানে না যে, ও একেবারে পাকা ধেনো লঙ্কা। দেখতে বেশ ছোট-খাট আর খাপসুরৎ কিন্তু ভিতরে একেবারে বিষ।

কিন্তু ধেনো লঙ্কার ঝালও যেন ঝিমিয়ে এল। দু'মাস হ'ল কাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েছে এর মধ্যে না এল কোন খরচপত্র, না একখানা চিঠি। কি হ'ল কাদেরের। এদিকে ঘটী বাটি যা ছিল সব কাজী বাড়িতে বাঁধা পড়েছে। আর বাঁধা দেওয়ারও কিছু নেই। গরুর দুধ রোজ দিয়ে যা দু'চার আনা পাওয়া যেত তাও বন্ধ হবার জো হয়েছে। গরুর মুখে খড়কুটো পড়লে তো দুধ হবে! ইব্রাহিম ইতিমধ্যে একবার প্রস্তাব করে, না খাইয়ে খাইয়ে গরুটাকে তো ওরা মেরে ফেলল। এর চেয়ে ইব্রাহিমকে তারা গরুটা দিয়ে দিলেই পারে। সে এগার টাকা পর্যন্ত দিতে পারে। ঐ হাড় বের করা মরা গরু এর চেয়ে বেশী দামে আর কে কিনবে?

লালবানু বলে, 'না কেনে না কিনুক, বিলিয়ে দেব মানুষকে, তবু ওদের দেব না।'

খাওয়ার কষ্টের চেয়ে আর বড় কিছু নেই। কাদেরের মাও এখন একাজে ওকাজে বড়ছেলে ইব্রাহিমের ঘরে যায়, কাজকর্ম ক'রে দিয়ে দু' একবার খেয়েও আসে। তার ইচ্ছা লালবানু এবার বাপের বাড়ি চলে যাক। আর কেন।

মুখ ফুটে বউকে সেদিন বলেই বসল ইব্রাহিমের মা, 'এখানে থেকে কেন মিছা-মিছি শুকিয়ে মরছিস বউ, তার চেয়ে তুই চলে যা সেখানে, সর্দার যখন এত ক'রে বলছে। তোর কষ্ট আমি আর চোখে দেখতে পারি না।'

লালবানু তীক্ষ্ণ হেসে জবাব দিয়েছে, 'বেশ তো মাস কয়েক বড় ছেলের ঘরে গিয়েই এখন থাক না, তাহ'লে আর এসব দেখতে হবে না। লুকিয়ে লুকিয়ে তো যাচ্ছই, এবার বিছানা-পাটি নিয়ে বলে কয়েই যাও। তাছাড়া পালা তো এখন ওদেরই, মেয়েমানুষ হয়ে আমি কি তোমাকে সারা বছর ধ'রে পুষব ?'

শাশুড়ী বিস্ময়ে এবং বেদনায় নির্বাক হয়ে রয়েছে।

মেছেব আবার একদিন এসে মেয়েকে বলল, 'আমার এমন সাধ্য নেই যে সংসার থেকে কিছু তুলে এনে আলাদা ক'রে তোকে দিই, কিন্তু তুই যদি ওখানে যাস পাঁচজনের সঙ্গে তোরও চলে যাবে।'

লালবানু বলল, 'তোমার অবস্থা তো আমি জানি বাজান। দেখি আরো দু'চার দিন।'

কিন্তু দু'চার দিনের জায়গায় দু সপ্তাহ গড়িয়ে গেল তবু কাদেরের কোন খবর এলো না। নিশ্চয়ই আর সে বেঁচে নেই।

ইব্রাহিমের বড় মেয়ে ফতেমা এসে বলল, 'চাচী মাটীতে উপুড় হয়ে কাঁদছে বাজান, দেখে এলাম।'

ইব্রাহিমের মনও চঞ্চল হয়ে উঠল, কিন্তু মুখে মেয়েকে ধমক দিয়ে বলল, 'যা এখান থেকে। কাঁদলে করব কি।'

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে ইব্রাহিম আর একবার দক্ষিণ পাড়ায় ডাক ঘরের দিকে চলল।

এতদিন পরে লালবানুর নামে খামে চিঠি এসেছে। বাড়ী আসা পর্যন্ত আর সবুর সয়নি ইব্রাহিমের। ডাক ঘর থেকে বেরিয়েই চিঠির মোড়ক ছিঁড়ে ফেলে সাহাদের একটি ছেলেকে দিয়ে সে চিঠি ইব্রাহিম পড়িয়ে শুনেছে। তার মত কাদের ও নিরক্ষর। নিজে সে নিশ্চয়ই লিখতে পারেনি। কোন বাবু ভুঁইয়াকে

ধরে-টরে লিখিয়ে থাকবে। সব বইয়ের ভাষা, আর কেবল ভালোবাসার কথা। আর কিছু না বুঝতে পারলেও এটুকু ইব্রাহিম বেশ বুঝতে পেরেছে। ইব্রাহিমের নামগন্ধও সে চিঠির মধ্যে নেই। শেষে আছে কুড়ি টাকা স্ত্রীর নামে কাদের মণি-অর্ডার ক'রে পাঠিয়েছে। দু'এক দিনের মধ্যেই সে টাকা লালবানু নিশ্চয়ই পাবে। না পেয়ে থাকলে যেন জানায়, সরকার থেকে তার সমুচিত ব্যবস্থা হবে।

ইব্রাহিমের মুখে চিঠির সারাংশ শুনে তার মা কিংবা লালবানু কারো তৃপ্তি হ'ল না। লালবানু তো চটেই লাল। তার নামের চিঠি কেন অন্যে খুলে পড়বে। থানায় যদি সে একথা জানায় তবে ইচ্ছা করলে জেলে দিতে পারে সে ইব্রাহিমকে। মেছের সর্দারের মেয়ে হয়ে মামলা মোকদ্দমার সমস্ত কানুন তার কণ্ঠস্থ।

কাদেরের মা আর না থাকতে পেরে বলল, 'দে দেখি বউ চিঠিখানা, আমি একবার ভুঁইয়াদের গোবিন্দকে দিয়ে পড়িয়ে শুনি!'

লালবানু বলল, 'কথা শোন, আমার সোয়ামীর লেখা চিঠি আমি এখন হাটে বাজারে পাঠাই পড়বার জন্য। একি তোমার কাছে লিখেছে যে দশজনকে তা পড়ান যাবে?' তারপর গলা নামিয়ে লালবানু আস্তে আস্তে বলল, 'তার চেয়ে ছোট ভুঁইয়াকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো না। চিঠিটা এখানে বসে পড়লে আমিও শুনব, তুমিও শুনবে।'

খানকয়েক বাড়ি উত্তরে বোসেদের ছোট ছেলে গোবিন্দ আছে বাড়িতে। চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ দেখাতে হলে লোকে তার কাছেই যায়। গোবিন্দেরও এ সময় বাড়ি থাকবার কথা নয়, কলকাতায় সে কলেজে পড়ে। হঠাৎ একদিন গলা দিয়ে খানিকটা রক্ত পড়ায় তার অন্যান্য ভাইয়েরা ওষুধপত্র দিয়ে ডাক্তারের পরামর্শে তাকে দেশেই পাঠিয়ে দিয়েছে। বাড়িতে থাকেন গোবিন্দর মা, বাবা আর ছোট পিসী। বাবা মাইল তিনেক দূরে এক গঞ্জে জমিদারের সেরেস্তায় কাজ করেন। সকালে বেরোন, ফেরেন রাত্রে। বইপত্র নিয়ে গোবিন্দ একা একা দিন কাটায়।

কাদেরের মার অনুরোধে তাকে আসতে হল লালবানুর চিঠি পড়ে দিতে। গোবিন্দ অবশ্য আপত্তি করেছিল, 'তোমার বউয়ের কাছে লেখা আমি কি ক'রে পড়ব কাদেরের মা?'

'তাতে দোষ কি বাপজান? না হলে কাকে দিয়ে পড়াব? আপনি আর আপত্তি করবেন না ছোটকর্তা। এই তিন মাস পরে কাদেরের চিঠি এসেছে। বউটা তো একেবারে পাগল হবার জো হয়েছিল।'

বাড়িতে কাদেরের অংশের ভিতর-বার অবশ্য প্রায় একই। একখানা মাত্র ঘর। শনের ছাউনি, চারিদিকে পাকাটির বেড়া। সামনে একটু বারান্দার মত আছে। সেখানে তাকে নিয়ে এসে কাদেরের মা বলল, 'ছোট জলচৌকিখানা আমার হাতে দে তো বউ, কর্তাকে বসতে দি।'

গোবিন্দ বলল, 'না না, জলচৌকির আর দরকার নেই, এমনিতেই হবে।' কিন্তু ততক্ষণে জলচৌকি আর চিঠি দুইই এসে পৌচেছে।

চৌকিখানা পেতে দিতে দিতে কাদেরের মা বলল, 'এখানা আমার কাদের নিজে তৈরী ক'রেছে ছোটকর্তা। শয়তানের সব বিদ্যে জানা। বলেছিল, 'মা, এর ওপর বসে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বাবুদের মত দিব্যি আরাম ক'রে তামুক টানব।' কাদেরের মায়ের চক্ষে জল এল। তারপর চোখ মুছে সে বলল, 'ভালো কথা, আপনাকে তামুক এনে দেবে ছোটকর্তা? আমার বড় ছেলের ঘরে তামুক আছে, যা দেখি লালবানু বলগে কর্তা এসেছেন।'

গোবিন্দ ক্ষেপে বলল, 'না না, তামাক আমি মোটেই খাইনে কাদেরের মা। ছেলের জন্য অত চিন্তিতই বা হচ্ছ কেন তুমি? যুদ্ধের চাকরিতে কাদের কি একাই গেছে?'

চিঠিখানা নেড়ে গোবিন্দ আরক্ত মুখে বলল, 'কিন্তু এ চিঠি তো তোমাকে শুনানো শক্ত কাদেরের মা। এ তার বউয়ের কাছে লেখা চিঠি। কাকে দিয়ে যেন লিখিয়েছে। ভারী ফাজলেমি করেছে চিঠির মধ্যে।'

কাদেরের মা একটু তৃপ্তির হাসি হেসে বলল, 'তাতে দোষ নেই বাপজান। এই তো ফাজলেমির বয়স। তা আমি না হয় একটু সরে দাঁড়াচ্ছি। তুমি চিঠিখানা পড়ে দাও।' বলে কাদেরের মা বারান্দা থেকে নেমে ঘরের কোণায় গিয়ে অলক্ষ্যে দাঁড়ায়। অগত্যা কিছু বাদ-সাদ দিয়ে এবং যেখানে যেখানে ভাষা কিছু নির্লজ্জ এবং অশোভন হয়ে পড়েছে সে সব জায়গায় শোভন রুচিসম্মত কথা বসিয়ে গোবিন্দ লালবানুকে তার স্বামীর চিঠি পড়ে শোনায়।

কাদের লিখেছে এমন না বলে কয়ে হঠাৎ যে কাদের লালবানুদের ছেড়ে চলে এসেছে তার জন্য লালবানু কি তাকে ক্ষমা করবে? আসা অবধি এই চিন্তা ছাড়া তার মনে আর কিছু স্থান পায়নি! কেমন আছে লালবানু, একা একা কি করে কাটছে তার দিন। বিদেশে বিভুঁয়ে এত কষ্ট সে যে সহ্য করছে সে কেবল লালবানুর কথা ভেবেই—তার যাতে খাওয়া পরার কোন কষ্ট না হয় সেই জন্যই। লালবানু যেন তার জন্য খুব চিন্তা না করে। কাদের নিয়মিত টাকা পাঠাবে। এই

উপলক্ষে কত দেশ বিদেশ যে তার দেখা হয়ে গেল তার ঠিকানা নেই। কত কথা, কত গল্প যে বলবার আছে লালবানুকে, চিঠিতে তো সব লিখবার জায়গা নেই তাই সেগুলি মুখোমুখী ব'সে পাশাপাশি শুয়ে বলবার জন্য মুলতুবি রইল। রাতের পর রাত কিন্তু ভোর হয়ে যাবে, তখন যেন লালবানু না বলে তার ঘুম পাচ্ছে।

কাদের এমন ভাষায়, এমন ভঙ্গিতে কোনদিন তার সঙ্গে প্রেমালাপ করেনি। তবু সুর তো এক, মাধুর্য তো তেমনি। কথাগুলির সব যে লালবানু বুঝতে পারে তা নয়, বরং বেশির ভাগই তার কাছে দুর্বোধ্য লাগল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমনও তার ইচ্ছা হ'তে লাগল যে চাকরী থেকে এসে কাদের যদি এমনভাবে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তো বেশ হয়, সব না বোঝা গেলেও ভারী সুন্দর আর মিষ্টি কিন্তু কথাগুলো!

মাসে নিয়মিত কুড়ি টাকা ক'রে পাঠায় কাদের আর আসে তার খান চারেক ক'রে চিঠি। লিখতে তার ডাক খরচ লাগে না, সে লিখেছে তার কাছে চিঠি লিখতে হলেও কারো পয়সা লাগবে না। শুধু খামের ওপরে 'অন্ এ্যাকটিভ সার্ভিস' লিখে দিলেই হবে। সপ্তাহে একখানা করে চিঠি আসে লালবানুর নামে। আর তা পড়বার জন্য গোবিন্দের ডাক পড়ে। প্রত্যেক চিঠিতেই প্রায় এক কথা থাকে, তবু লালবানুর মনে হয় প্রত্যেকখানাই নতুন। আর কথাগুলির মাধুর্যের শেষ নেই। লালবানুর নিজেরও লোভ হয় অমন করে চিঠি লিখতে, অমন ক'রে কথা বলতে। চিঠির ভাষায় যে কথা বলা যায় তা শুনেছে সে গোবিন্দের মুখে। চিঠিপড়া শেষ হয়ে গেলে যখন লালবানুর শাশুড়ীর সঙ্গে গোবিন্দ অন্যান্য দু'একটা কথা বলে লালবানু লক্ষ্য করেছে তাও ঠিক অমনি মিষ্টি।

ঝগড়া কলহে লালবানুর যেন তেমন আর প্রবৃত্তি হয় না। চিঠির ভাষা আর গোবিন্দের কথাবার্তার তুলনায় নিজের কথাগুলি নিজের কানেই ভারী খারাপ লাগে লালবানুর। আর এই কথাগুলি আরো অশ্রাব্য হয় যখন লালবানু রাগ ক'রে জা আর ভাসুরের সঙ্গে গালমন্দ করতে থাকে। যখন ঝগড়া করে তখন অবশ্য টের পায় না, কিন্তু পরে যখন এই ঝগড়ার কথা মনে পড়ে তখন লালবানুর ভারী লজ্জা করতে থাকে।

একদিন তো গোবিন্দের সামনেই পড়ে গেল। গাছের জামরুলের পরিমাণ তার অংশে কম পড়েছে বলে জা'র সঙ্গে তার তুমুল ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। এমন সময় কাদেরের নতুন চিঠি হাতে গোবিন্দ এসে উপস্থিত।

গোবিন্দ হেসে বলেছিল, 'বাপরে। এযে খুনোখুনি বেঁধে গেছে। মুখে মুখে

আর কেন, বউদের বল কাদেরের মা, এবার সড়কি কাতরা বার করুক ঘর থেকে—তবে তো কাজিয়া জমবে।'

লালবানু জামরুল ফেলে লজ্জায় তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকতে পারলে বাঁচে।

বারান্দায় উঠে জলচৌকিতে বসবার পর কাদেরের মা কিছু জামরুল এনে গোবিন্দের সামনে দিয়ে বলেছিল, 'খান ছোটকর্তা। তাজা ফল এইমাত্র গাছ থেকে পাড়া।'

গোবিন্দ হেসে বলেছিল, 'তাতো বুঝলুম, কিন্তু কার ভাগ থেকে নিয়ে এলে বল দেখি ; তোমাদের ছোট বিবির ভাগের নয় তো ?'

ঘরের ভিতর থেকে লালবানুও হাসি চেপে মৃদুস্বরে বলেছিল, 'কেন, ছোট বিবির ভাগের হলে কি ছোটকর্তা খাবেন না ?'

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলেছিল, 'উহুঁ, জাত যাবে।'

তারপর সেই জলচৌকিতে বসে নিতান্ত ছেলেমানুষের মত এক একটা করে জামরুল খেতে খেতে সেদিন গোবিন্দ যেন এক অপূর্ব আনন্দের স্বাদ পেয়েছিল। তাদেরই বর্গাদার নিরক্ষর অতি দরিদ্র একটি মুসলমান পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে মন যে এমন মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে তা কি কোন দিন সে কল্পনায়ও আনতে পেরেছে ?

সামনে রান্নাঘরের চালার এক কোণায় মোরগবলি গাছটায় ফুল ধরেছে। ফুলগুলি ঠিক মোরগের ঝুঁটির মত দেখতে। তারই খানিকটা পশ্চিমে পানাভরা ছোট মত একটু ডোবায় কযেকটা হাঁস গিযে নেমেছে। এ যেন নতুন আর এক জগৎ তার চোখের সামনে খুলে গেছে, কাছাকাছি, এত ঘনিষ্ঠভাবে পঁচিশ বছর ধ'রে বাস ক'রে এসেও যার পরিচয় এতদিন তার অজ্ঞাত-ই রয়ে গিয়েছিল।

মাঝখানে দিন দশেকের মধে আর কোন চিঠিপত্র পাওয়া গেল না। তারপর এগার দিনের দিন কাদের স্বযং এসে উপস্থিত, সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য ছুটির খবরটা আগে জানায় নি। বেড়ার ফাঁক দিয়ে লালবানু দেখল, খাকী পোষাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে কাদেরকে। ঠিক একেবারে থানার জমাদার সাহেবের মত। চেহারাও আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। এ যেন আর এক কাদের। সেই ভিতরকার মানুষ, যে মিষ্টি মিষ্টি চিঠি লেখে আর গোবিন্দের মতই

অমন সুন্দর ক'রে কথা বলে—সে ভাষায় সঙ্গে লালবানুর ভাষার মিল হয় না, তা লালবানু সবটা বুঝতেও পারে না তবু তা মধুর আর রহস্যময়।

কিন্তু লালবানুর অনুমান যে সবখানি সত্য নয় পনের মিনিট যেতে না যেতেই তা ধরা পড়তে লাগল। খাকীর স্যুট ছেড়ে কাদের ততক্ষণে দামী একখানা নীল রঙের লুঙি পরেছে, গায়ে খুব মিহি একটা গেঞ্জি। ঘরের মধ্যে ঢুকে দীর্ঘ ঘোমটায় লালবানুকে এককোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ সেই ঘোমটা ফাঁক ক'রে ধরে চোখ তেরছা ক'রে কাদের হেসে বলল, 'ইস্, বিবি যে একেবারে হিন্দুদের কলা বউ হয়ে গেছে।'

তারপর এক লাফে উঠানে নেমে এসে ইব্রাহিমকে বলল, 'কি খবর ভাই সাব! এতদিন পরে দেশে এলাম তোমাদের, কিছু তামাক টামাক দিয়ে ভদ্রতাও তো করতে হয়!'

ইব্রাহিম অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'এই আনছি তামাক।'

'হ্যাঁ যাও তামাক টামাক আনো। তারপরে, মুরগীগুলি বুঝি সব বিক্রি করে দিয়েছ? ঘর বলতে একটাও রাখনি।'

ট্যাঁক থেকে এক টাকার দু'খানা নোট বার করে দিয়ে ব'লল 'যাও বাজার থেকে কিনে আনো গিয়ে' যত দামে পাও নিয়ে আসা চাই-ই। উঃ কতকাল ধরে কুমড়ো দিয়ে মুরগীর ছালোন খাইনি। ভারী ভালো রাঁধে আমাদের লালবিবি। বাজার ক'রে নিয়ে এসো। লালবিবি রাঁধবে, সব খাবে আজ আমাদের ঘরে।'

ইব্রাহিম বলল, 'আচ্ছা'।

কিছু টাকা হাতে পেয়ে ফুর্তির আর অন্ত নেই কাদেরের। সে যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। বাড়ির এখানে যাচ্ছে, ওখানে যাচ্ছে আর কেবলই কথা বলছে। মনে আনন্দ হ'লে সে এমনিই করে বটে। এই বছর খানেকে তার স্বভাবের তেমন কিছুই পরিবর্তন হয়নি। এ লালবানুর সেই চির পরিচিত স্বামী।

কিন্তু কুমড়ো দিয়ে মুরগীর ছালোন রাঁধতে ব'সে লালবানুর মনে সেই আগেকার আনন্দ কোথায়? অকারণে জাকে ধমকায়, শাশুড়ীকে মুখ ঝামটা মারে। কে যেন তাকে এক স্বপ্নময়, রহস্যময় পৃথিবী থেকে আবার সেই পুরাতন পাকাটির বেড়া দেওয়া জীর্ণ ঘরের মধ্যে এনে ঢুকিয়েছে। কিন্তু সেখানে কি তাকে আর মানায়?

মাথায় ময়লা কাপড়ের বড় একটা গাঁট। পিছনের পথ দিয়ে বাড়িতে ঢুকে তবু পা টিপে টিপেই ধনঞ্জয় ধুপী এগুতে লাগল। হঠাৎ সামনে গিয়ে মালতীকে একবারে অবাক ক'রে দেবে, ভয় পেয়ে চিৎকার ক'রে উঠবে মালতী, শেষে দেখতে পেয়ে গাল দিয়ে বলবে, 'বুড়ো বয়সে এত রস ?'

ওর মুখের বুড়ো কথাটিও মিষ্টি' বুড়ো বলবার ভঙ্গিটি ভারী অপূর্ব। কিন্তু রান্না ঘরের পিছনে এসে অবাক হয়ে গেল ধনঞ্জয় নিজে। ঘরের ভিতর থেকে খিল খিল হাসির শব্দ আসছে ; তবে কি আগেই ধনঞ্জয়কে দেখে ফেলল মালতী ? ঘরের ভিতরে মিটমিট করে একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বলছে। সেই আলোতে অবশ্য বাইরের ধনঞ্জয়কে চোখে পড়বার মালতীর কথা নয়। কিন্তু বলা তো যায়না। ওর নতুন চোখ। ধনঞ্জয়ের মত চোখের দ্যুতি তো আর ওর ধ'রে যায় নি।

লুকিয়ে লুকিয়ে এমন ঘরের পিছনে এসে দাঁড়াবার একটা সরস কৈফিয়ৎ ধনঞ্জয় মনে মনে ঠিক ক'রে নিচ্ছে। হঠাৎ ঘরের ভিতরে আর একজনের গলার শব্দে সে চমকে উঠল।

'হাসোই আর যাই কর, তোমার ও পিঠে পায়েস আমি যদি ছুঁয়েও দেখি তো তোমার কুকুরের নামে আমার নাম রেখো।'

তবু কালো পাথরের বড় বাটি মাণিকের মু'খর সামনে নিয়ে এগিয়ে ধরল মালতী। মাণিক মুখ ফিরিয়ে নিল। মালতী ফিক ক'রে এবার একটু হাসল, 'তাই নাকি ? কুকুরের নামে নাম রাখব তোমার ? আচ্ছা। কিন্তু কুকুর তো আর আমি পুষি না। ভারী মুস্কিলেই পড়া গেল দেখছি।' মালতী অপূর্ব ভঙ্গিতে ভ্রূ কুঁচকালো। 'নাম রাখবার জন্য আবার কার কুকুর ধার করতে যাব বলতো ? আর পারিনে। ভালোবাসবার জন্য আর একজনকে ধার করলাম আবার তার নাম রাখবার জন্য আর একজনের কুকুর ধার ক'রতে ছুটব বুঝি ?' মালতী আবার হেসে উঠল। আর সে হাসির ভঙ্গিতে ঘরের ভিতরে এবং বাইরের দুটি পুরুষের বুকের রক্ত তোলপাড় করতে লাগল।

মালতী বলল, 'আচ্ছা বেশ, খেয়ে তোমার কোন দরকার নেই। আমি সব

খাচ্ছি। তুমি ওখানে গাল ফুরিয়ে বসে থাকবে আর তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমি একটু একটু ক'রে খাব।' বলে মালতী বাটি থেকে একটু মিষ্টান্ন তুলে মুখে দিল।

মাণিক হেসে বলল, 'আমি আর কেড়ে নিতেই জানিনে ?'

'জানো নাকি ?'

'দেখ জানি কিনা।' মাণিক আরো এগিয়ে এলো।

ধনঞ্জয় নিজেকে যেন আর স্থির রাখতে পারে না' কিন্তু জোর করে সে পা চেপে রাখল মাটিতে। ধৈর্য ধরে সবটা আগে দেখতে হবে। কতখানি গড়ায়।

বাটি হাতে মালতী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর মাণিকের চোখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'অত সোজা নয়।'

'আচ্ছা কঠিন কি সোজা একবার দেখাই যাক না।' মাণিক উঠে দাঁড়িয়ে বাটিটা ধরতে হাত বাড়াতেই বাটিশুদ্ধ হাতখানা মালতী যথাসাধ্য উঁচু ক'রে ধরল। মাণিক এত কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে যে মালতীর কোমল বুকের স্পর্শ লাগছে তার গায়ে। মিষ্টান্নের বাটি মালতীর হাতেই রইল। সেদিকে একটুও হাত না বাড়িয়ে মাণিক মালতীকে সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তার সেই মিষ্টান্ন খাওয়া ঠোঁটে পর পর কয়েকটি চুম্বন ক'রে বসল।

মুহূর্তকাল স্তম্ভিত থেকে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল মালতী।

'দেখ দেখ করে কি, শত হলেও গুরুজন তো আমি তোমার।'

মাণিকের বাহুবন্ধের ভিতর থেকে মালতী নিজেকে আস্তে আস্তে একটু ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু মাণিক তাকে আরো জোরে বুকে চেপে বলল, 'সেই জন্যই তো প্রসাদ নিচ্ছি।'

'প্রসাদ তোমাকে নেওয়াচ্ছি হারামজাদা।' পিছন থেকে বজ্র গর্জন শোনা গেল ধনঞ্জয়ের। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে কোত্থেকে একটা বাঁশের কঞ্চি কুড়িয়ে এনেছে ধনঞ্জয়। সপাসপ্ তারই কয়েক ঘা লাগাল মাণিকের পিঠে, হাতে-পায়ে সর্বাঙ্গে।

'হারামজাদা তলে তলে তোমার এই কীর্তি।'

কঞ্চির ঘা ঠেকাতে ঠেকাতে মাণিক কোনরকমে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে দিল ছুট। কয়েক পা পিছনে পিছনে গেল ধনঞ্জয়। কিন্তু মাণিককে আর দেখা গেল না। 'যা এবার কুত্তার মত পালা। কিন্তু কত কাল থাকবি পালিয়ে। সামনে একদিন না একদিন পড়তেই হবে।'

ধনঞ্জয় এবার লাফ দিয়ে উঠল ঘরে। মালতী বাধা দিতে না দিতে চুলের মুঠি ধরে তাকে মাটি থেকে আধ হাত খানেক উঁচু ক'রে ফেলল, আর এক হাতে সর্বাঙ্গে মারতে লাগল কঞ্চির বাড়ি।

ধনঞ্জয়েরই ভাগ্নে মাণিক। বাপ মা নেই, কিন্তু তাই বলে ধনঞ্জয়ের সাথেও কোন সম্পর্ক নেই তার। ক'বছর যাবৎ আছে গিয়ে কুঞ্জ বৈরাগীর আখড়ায়। মাস কয়েক হ'ল কুঞ্জ আর তার বোষ্টমী দু'জনেই মরেছে, তবু মাণক একা একা সেই আখড়া আগলে আছে। যত সব বদমাসের সঙ্গে তার আড্ডা। এই উনিশ কুড়ি বছর বয়সেই গাঁজা ভাঙ খেয়ে খেয়ে সে পয়লা নম্বরের নেশাখোর হয়ে উঠেছে। বদমাসিতেও তার জোড়া নেই। এতকাল ধনঞ্জয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না কিন্তু বউ ম'রে যাওয়ার পর আবার যেই ধনঞ্জয় বিয়ে ক'রেছে সেদিন থেকেই এ বাড়ীতে আনাগোনার আর অন্ত নেই মাণিকের। মালতীরও যেন টানটা ওর ওপরই বেশী। এই ছ'মাস ধরে প্রতিদিন মালতীকে সে বুঝিয়েছে এসব ভালো নয়। হোলোই বা ভাগ্নে তবু তার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা ধনঞ্জয় পছন্দ করে না। মাণিককেই কি কম শাসিয়েছে ধনঞ্জয়। একথা পর্যন্ত ব'লেছে যে এ বাড়ীতে এলে তার পা আর আস্তো থাকবে না। ফলে ধনঞ্জয় যখন বাড়ী থাকে তখন আর মাণিক এ মুখো হয় না।

সেইদিন থেকে মনে কোন শান্তি নেই ধনঞ্জয়ের। কিন্তু মালতীর এক আগের মতই স্বচ্ছন্দ ব্যবহার। রাঁধে বাড়ে, ঘর সংসারের কাজ করে, আর বোঝায় বোঝায় ধনঞ্জয়ের আনা ময়লা কাপড়ের রাশ কাচে। মালতী না থাকলে ব্যবসাই অচল হ'ত ধনঞ্জয়ের।

ধনঞ্জয় ব'লে, 'এত কষ্ট ক রে তোর দরকার কি, এর চেয়ে মাণিকের সাথে গিয়ে কণ্ঠি বদল কর। দিব্যি ভিখ মেগে আর পীরিত ক'রে দিন কাটবে।'

মালতী রুখে দাঁড়ায়, 'ছিঃ ছিঃ সোয়ামী হয়ে এসব কথা তুমি বলছ আমাকে? শুনলেও পাপ।' মালতী কানে আঙুল দেওয়ার ভঙ্গি করে।

ধনঞ্জয় কঠিনভাবে হাসে, 'শুনলেও পাপ তা বটে, তবু যদি নিজের চোখে আমি সব না দেখতাম।'

মালতী কাছে এসে ধনঞ্জয়ের দাড়ি নেড়ে দেয়, 'হয়েছে হয়েছে, চোখের বড়াই আর নাইবা করলে। বুড়ো মানুষের চোখ তা আবার নিজের আর পরের।'

কাপড় ফেরৎ দিতে যাবে ধনঞ্জয়। কিন্তু স্কাই ব্লু রঙের একখানা শাড়ির আর কিছুতে মিল হয় না। শাড়িখানা আড়তদার শম্ভু পোদ্দারের মেজছেলের বউয়ের। যেমন সৌখীন মেজবাবু তেমান তার বউ।

ধনঞ্জয় বললে, 'ও শাড়িখানা ফেরং দে। না হ লে ভারী চটে যাবেন মেজবাবু। তুই বরং এই লাল পেড়ে শাড়িখানা পর দু'চারদিন। ধুয়ে পরের যাত্রায় ফেরৎ দেব।'

মালতী যেন আকাশ থেকে পড়ে, 'কথা শোন, আমি আবার কোন্ শাড়িখানা রাখলাম তোমার।'

তারপর পরনের ময়লা শাড়িখানা দেখিয়ে বলে, 'এখানার কথা বলছ? এখানা তো তুমিই কিনে দিয়েছিলে সেবার।'

ধমক দিয়ে উঠে ধনঞ্জয়, 'আর ন্যাকাম করতে হবে না মাগী। ব'সে ব'সে তোর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবার সময় নেই আমার। আমি বাড়ি থেকে বেরুলে মাণিক আসবে, তার সঙ্গে এসব করিস। ভালো চাস তো শিগগির নিয়ে আয় শাড়িখানা।'

'আনতেই হবে?'

ধনঞ্জয় কঠিন ভঙ্গিতে বলে, 'হ্যাঁ।'

মালতী নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে চলে যায় তারপর দু'তিন মিনিট পরে ধনঞ্জয়ের সামনে এসে দাঁড়ায় 'এই নাও।'

ধনঞ্জয় অবাক হয়ে তাকায়, মেজবাবুর বউয়ের সেই দামী শাড়িই মালতী পরে এসেছে। সুগৌর অঙ্গে ভারী মানিয়েছে কিন্তু মালতীকে। কে বলবে যে মালতীও বড়লোকের ঘরের বউ নয়। একমুহূর্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নরম হয়ে ধনঞ্জয় বলে, 'কিন্তু কি করলি বল দেখি। আমি গিয়ে কি বলব গিন্নিমাকে।'

মালতী অম্লান বদনে বলে, 'গিন্নিমাকে কিছু বলে কাজ নেই। মেজবাবুকে একধারে ডেকে নিয়ে চুপে চুপে বলবে আপনার বউয়ের শাড়িখানা সখ ক'রে মালতী পরেছে দু'দিনের জন্য। দেখুন গিয়ে মানিয়েছে কিনা।'

বলে খিল খিল ক'রে মালতী আবার হেসে উঠেছে। আর নীরবে মাথার কাপড়ের গাঁটটা তুলে নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়াবার আগে আর একবার

পিছন ফিরে মালতীর মুখের দিকে তাকিয়েছে ধনঞ্জয়। লজ্জা সরমের বালাই কিছু-মাত্র যদি মালতীর থাকে। কিন্তু হাসলে এমন চমৎকার দেখায় ওকে।

সন্ধ্যার পর ফিরে এসে ধনঞ্জয় জিজ্ঞেস করে, 'তাকে যে দেখছিনে? মায়ের ভয়ে আজ বুঝি আগে ভাগেই সরে পড়েছে।'

মালতী বিস্ময়ের ভঙ্গিতে জবাব দেয়, 'ওমা, কে আবার সরে পড়বে?'

'মাণিক আসেনি আজ?'

'কথা শোন, তারপর থেকে সে কি আর এ মুখো হয়েছে নাকি?' বিছানায় শুয়ে শুয়ে ধনঞ্জয় বলে, 'কিন্তু এমন সুন্দর ফুলের গন্ধ কোত্থেকে আসছে বল্ দেখি।'

মালতী মুখ টিপে হাসে, 'আমার মুখ থেকে।'

ধনঞ্জয় অবাক হয়ে বলে, 'মুখ থেকে?'

মালতী বলে, 'হ্যাঁ, ফুলের মত মুখ থেকে ফুলের গন্ধ বেরুবে না বেরুবে কি আলকাতরার গন্ধ? ফুল তোমার বাড়ীর দু'চার মাইলের মধ্যে আছে নাকি যে ফুলের গন্ধ আসবে?'

মালতী ধনঞ্জয়কে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার বুকের সাদা লোমগুলির মধ্যে মুখ গোঁজে। তবু একটা হাত আস্তে আস্তে কৌশলে ছাড়িয়ে নিয়ে মালতীর সযত্ন রচিত খোঁপার ওপর বুলায় ধনঞ্জয়। খোঁপার চারপাশে ঘুরিয়ে বড় বড় গন্ধরাজ গোঁজা। অন্ধকারেই সেই ফুলগুলির ওপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ধনঞ্জয় তাদের আকার পরিমাপ করে। এতবড় গন্ধরাজ কেবল এক মাণিকের আঙিনাতেই আছে। হাতের তালু পুড়ে যেতে থাকে ধনঞ্জয়ের তবু হাতখানা সে তুলে নেয় না। মালতীর নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে সর্বাঙ্গ ধনঞ্জয়ের ঘিন ঘিন করতে থাকে তবু নিজেকে সে ছাড়িয়ে নেয় না। একটু পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'এর চেয়ে তুই ওর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেই তো পারিস।' কিন্তু ধনঞ্জয়ের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে মালতী যে ঘুমিয়ে পড়েছে আর তার উঠবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

কাজকর্মে আর উৎসাহ নেই ধনঞ্জয়ের, সমস্ত জীবনটা যেন বিস্বাদ হয়ে গেছে। এর চেয়ে ওরা যদি চলে যেত তাও সহ্য হ'ত ধনঞ্জয়ের। কিন্তু প্রতিদিন যে মালতী আর মাণিক তাকে বঞ্চনা ক'রে চলেছে এ ক্ষোভ তার কিছুতেই যাবে না। ব্যর্থ আক্রোশে মাণিককে সে খুঁজে খুঁজে ফেরে কিন্তু তার নাগাল পায় না। মালতী

আছে হাতের কাছেই। প্রতিমুহূর্তে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করবার ইচ্ছা হয় তাকে কিন্তু তার কাছে গেলেই সমস্ত সংকল্প গুলিয়ে যায় ধনঞ্জয়ের। মালতীর ভালো-বাসার অভিনয়, ছল করা চুম্বন, আলিঙ্গন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধনঞ্জয়কে গ্রহণ করতে হয়। মারতে গিয়ে অন্তরে অন্তরে নিজেই সে মার খেতে থাকে।

নিজের এই গোপন দুঃখ নিয়ে ধনঞ্জয় যেন একটা আলাদা জগতে ঢুকে পড়েছে। চারপাশে লোকজন চলে ফেরে, হাট বাজার করে, তাদের সুখ দুঃখের কথা বলে কিন্তু এসব ধনঞ্জয় খানিকটা শোনে তারপর অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়তে থাকে। লোকে বলাবলি করে বুড়োর ভীমরতি ধরেছে, এবার পট ক'রে একদিন পটল তুলবে।

এভাবে কতদিন যেত বলা যায় না কিন্তু বাইরের জগতের ধাক্কায় ধনঞ্জয়ের স্বতন্ত্র জগতও চূর্ণ হয়ে গেল। মালতী আর ধনঞ্জয়ের ছোট্ট সংসারেও দুর্ভিক্ষ স্পর্শ ক'রেছে।

মালতী বলল, 'চাল কিন্তু ঘরে একেবারেই নেই।'

ধনঞ্জয় তাকিয়ে দেখল শুধু ঘরে নয়, হাটে বাজারে কোথাও চাল পাওয়া যায় না। ধান চালের দর ক্রমেই বেড়ে চলছিল কিন্তু ধনঞ্জয় বিশেষ ভাবেনি। যা আছে তাতে দু'জন লোকের কোন না কোন রকমে চলেই যাবে। কিন্তু দেশের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে দু'জনেরও আর চলে না। বিঘে দুই চাকরাণ জমি আছে ধনঞ্জয়ের, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তা একেবারেই অজন্মা গেছে। কুড়িয়ে বাঁচিয়ে দু'চার মুঠো শস্য বাড়িতে তুলেছিল, তাতে তিন মাসও যায়নি। ধনঞ্জয় চিন্তিত হয়ে পড়ল। সারারাত্রি ভেবে কি একটা মতলব মনে মনে ঠিক ক'রে ধনঞ্জয় কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে, ভোরে উঠে ঘরের অবস্থা দেখে চক্ষু তার স্থির হয়ে গেল। মালতী তখনো অঘোরে ঘুমাচ্ছে কিন্তু স্ত্রী আর চারখানা বেড়া ছাড়া ধনঞ্জয়ের ঘর একেবারে শূন্য। পশ্চিম দিকের ভিতে দুতিন হাত মুখে মস্ত এক সিঁদ। বুঝতে আর বাকি রইল না এই পথেই সব অদৃশ্য হয়েছে।

সোরগোল ক'রে মালতীকে ডেকে তুলল ধনঞ্জয়, বলল, 'খুব তো মজা ক'রে ঘুমাচ্ছিস, রাত্রে কোন নাগরকে ঘর খুলে দিয়েছিলি বল। সবই যদি বিলিয়ে দিতে পারলি'তো তার সঙ্গে নিজেও বেরিয়ে গেলি না কেন।'

চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে চারদিকে চেয়ে মালতীও হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় তক্তপোষের তলা থেকে নিজের ঝাঁপিটা বার করতে গিয়ে দেখে তাও গেছে। এবার হাউ মাউ ক'রে মালতীও কেঁদে উঠল

কিন্তু ধনঞ্জয় নিদয়ভাবে ধমক দিয়ে বলল, 'থাম মাগী, ওসব মায়া কান্নায় আমি ভুলিনে। এ সেই মাণিকের কাজ, তোকে আর তোর নাগরকে একসঙ্গে যদি আমি জেলে না পুরি আমার নাম ধনঞ্জয় ধুপী নয়।

দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে এ অঞ্চলের অবস্থা একেবারে অচল হয়ে পড়ল। মাসখানেক আগে যে সব বাড়ীতে একবেলা হাঁড়ি চড়েছে কদিন ধরে সে সব বাড়ীতে শাপলা আর কচু সিদ্ধ চলছে। পঞ্চাশ ষাট টাকা দরেও চাল মিলছে না কোথাও। দু'তিনটে পাড়ায় ইতিমধ্যেই কলেরা আরম্ভ হয়েছে। এ পাড়ায় সবচেয়ে আগে ধরল ধনঞ্জয়কে। বার-কয়েক ভেদবমি হওয়ার পর শুয়ে শুয়ে নিজেই নিজের নাড়ী টেপা আরম্ভ করল ধনঞ্জয়, আর কতক্ষণ জীবন আছে নাড়ীর গতি দেখে সে নির্ণয় করবে।

তারপর তিন দিন কচুসিদ্ধ চালাবার পর মালতীও আজ মরিয়া হয়ে বেরিয়েছিল, মাথার ওপর চলছে শ্রাবণের অশ্রান্ত বৃষ্টি, সেদিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। ভিক্ষে ক'রেই হোক চুরি ক'রেই হোক আজ একমুঠো ভাত সে সংগ্রহ করবেই।

দুর্বল দেহে অনেকক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকবার পর হঠাৎ রান্নাঘরের দিক থেকে গোলমালের শব্দে জেগে উঠে খানিকক্ষণ কান খাড়া ক'রে রইল ধনঞ্জয়। উল্টো বাতাসে এখান থেকে কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু গলা যে মালতী আর মাণিকের তাতে কোন সন্দেহ নেই। হারামজাদা কুত্তা আবার এসেছিস। আমি না মরতে মরতেই এসে হাজির হয়েছিস সব দখল করবার জন্য।

কিন্তু মরা হাড়েও যে ধনঞ্জয়ের কি রকম ভেল্কি খেলে মরবার আগে আজ তা সে ভালো ক'রে বুঝিয়ে ছাড়বে মাণিককে। টলতে টলতে নোংরা কাপড় চোপড়েই ধনঞ্জয় উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াবামাত্রই বিছানার ওপর মাথা পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি থামে ঠেস দেওয়া বাঁশের লাঠিখানা তুলে তার ওপর খানিকক্ষণ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিল ধনঞ্জয়। এই লাঠির এক ঘায়ে ওদের দুজনকে শেষ ক'রে তবে সে মরবে।

লাঠির ভর ক'রে গুটি গুটি পা ফেলে অতি কষ্টে রান্নাঘরের কানাচে এসে দাঁড়াল ধনঞ্জয়। শেষ তো ওদের করবেই তবু ব্যাপারখানা একটু দেখে নেওয়া যাক।

যা ভেবেছে তাই, সেই মাণিকই। সেদিনের মত আজও ওদের মধ্যে মধুর কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে। ধনঞ্জয় লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

মালতীর হাতে পাথরের সেই কালো বাটিটা। কেবলই এ হাত থেকে ও হাতে সেটাকে নিয়ে রাখছে। মাণিকের হাত এড়াবার জন্য একবার বাটি সুদ্ধ হাতখানা মাথার ওপর উঁচু ক'রে ধরছে আর একবার পিছনে সরাচ্ছে মালতী। কখন আঁচলখানা মাটিতে পড়ে গেছে মালতীর। কিন্তু সেদিকে মাণিকের লক্ষ্য নেই। সে কেবল মালতীর হাতের বাটির দিকে লুব্ধ হাত বাড়াচ্ছে। খানিক পরে পরিশ্রান্তভাবে মাণিক বলল, 'এক মুঠো ভাত দিবি তাই প্রাণ ধ'রে দিতে পারিসনে এই তোর ভালোবাসা। আজ চার পাঁচ দিন ধ'রে ভাতের মুখ দেখিনে।'

মালতী বলল, 'ইস্ কি সাধের নাগররে আমার। এক মুঠো কুড়িয়ে আনবার শক্তি নেই, মেয়েমানুষের খিদের গ্রাসে ভাগ বসাতে এসেছেন। বের হ' দূর হ' এখান থেকে।'

মাণিকের দিকে ভালো ক'রে তাকাল ধনঞ্জয়। কংকালসার, কাঠির মত চেহারা চিঁ চিঁ ক'রে কি বলে স্পষ্ট বোঝা যায় না। তার চেয়ে মালতীর গলার জোর যেন বেশী। হঠাৎ এক ঝটকায় মালতীর হাত থেকে কি ক'রে বাটিটা ছিনিয়ে নিল মাণিক। কিন্তু মালতীও ছাড়বার পাত্রী নয়। 'নিল নিল, সব নিল' ব'লে শুধু সে তারস্বরে আর্তনাদই ক'রে উঠল না প্রাণপণ শক্তিতে মাণিককে জাপটে ধ'রে তার হাতে চার পাঁচটি দাঁতও বসিয়ে দিল। দুঃসহ যন্ত্রণায় বাটিটা মাণিকের হাত থেকে খসে পড়ল মাটিতে আর সাদা যুঁই ফুলের মত ভাতগুলি সমস্ত মেঝেময় ছিটকে ছড়িয়ে গেল। ধনঞ্জয়ের জিভেও জল এসে পড়ল ভাতগুলি দেখে।

বেশ হয়েছে। ধনঞ্জয়ের আর প্রয়োজন নেই, নিজেদের হাতেই নিজেরা চরম শাস্তি পাচ্ছে ওরা। মেঝেতে ছড়ানো ভাতগুলি যার যার নিজের দিকে টেনে আনবার চেষ্টায় ওদের মধ্যে তুমুল হাতাহাতি শুরু হয়েছে। কিন্তু লাঠিতে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে এই মজার দৃশ্য দেখতে দেখতে শুধু জিভে নয় দুটো চোখেও জল এসে পড়ল ধনঞ্জয়ের। তারপর দু' গাল বেয়ে সেই জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মুকুন্দ বহুক্ষণ ধরেই ওদের অনুসরণ করছিল। বলতে গেলে শিয়ালদ'র সেই একেবারে সাউথ ষ্টেশন থেকেই সে ওদের পিছু নিয়েছে। পাঁচ ছয় জন আধবয়সী নিম্নশ্রেণীর মেয়েমানুষ আর তাদের সঙ্গে সতের আঠার বছরের ওই মেয়েটি। ওর গায়ের রং সঙ্গিনীদের মত কালো হ'লেও চোখ নাক এত টানাটানা আর মুখের ডৌলটি এমন সুশ্রী যে, মুকুন্দের মনে হ'ল বহুকাল সে এমন সুন্দরী মেয়ে দেখেনি। ভাবলে অবাক হ'তে হয় যে, এই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এমন একটি সুশ্রী মেয়ে কোত্থেকে এসে জুটল।

গেট দিয়ে যখন ওরা বেরোয় তখনই ওদের চোখ-মুখের সতর্ক শংকিত ভঙ্গি দেখে মুকুন্দ বুঝতে পেরেছে যে সে যাদের খুঁজছে তারা এই। কিন্তু সেদিন এমনি একটি মেয়েমানুষের হাতে নাকাল হ'তে হয়েছিল বলে কেবল সন্দেহ মাত্রেই আজ আর বেশী দুর অগ্রসর হ'তে ভরসা হয়নি। আজ হাতে হাতে ধরতে হবে।

সার্কুলার রোড পার হয়ে ক্রমশ দলটি তিন চার ভাগে ভাগ হয়ে গেল। কতক ঢুকল ডিক্সন লেনে, কতক সার্পেন্টাইন লেনে, আর সেই অল্পবয়সী মেয়েটি আধাবয়সী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে চলতে লাগল সোজা উত্তর দিকে, মুকুন্দ আর সবাইকে ছেড়ে দিয়ে ওদেরই পিছু নিল। গোয়েন্দা যে পিছনে লেগেছে তা পদ্মমণিও বুঝতে পেরেছে। কিন্তু মুখপোড়া এমন পিছনে পিছনে ঘুরছে কেন? সামনে এসে বলুক না কি চায়, তারপর সিকিটা আধুলিটা নিয়ে নিষ্কৃতি দিক্। তা তো নয়, হতভাগা কেবল দুর থেকে তাদের দিকে চোখ রাখছে আর শহরময় পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সোহাগী এক সময় পদ্মমণির একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্-ফিস্ ক'রে বলল, 'লোকটা কিছুতেই যে পিছু ছাড়ছে না মাসী' আমার ভারী ভয় করছে।'

পদ্মমণি ধমকের সুরে বলল 'দেখ, অমন আহ্লাদে আহ্লাদে কথা আমার সয়

না। ভয়ই যদি করে তো এসেছিস্ কেন? আমি তো তখনই বলেছিলাম ভয় বিপদ যথেষ্ট আছে। কিন্তু তখন তো বাধা মানলি না, এখন বোঝ মজা। পা চালিয়ে আয় আমার সঙ্গে। ওর চোখে ধুলো দিয়ে গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে। কতক্ষণ আর ঘুরবে পিছনে পিছনে। ওর মুরদ বোঝা গেছে।'

সোহাগী পদ্মমণির গায়ের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে বলল, 'তোর কিন্তু ভারী সাহস মাসী।'

পদ্মমণি সস্নেহে হাসল, 'দু'চার দিন ঘোর আমার সঙ্গে, সাহস তোরও হবে।'

পদ্মমণি জেনেছে, সাহস ক্রমশ এই ভাবেই মানুষের হয়। বছর খানেক বছর দেড়েক আগে পদ্মও ওই সোহাগীর মতই ভীত ছিল। শহরের কথা শুনতে থর থর ক'রে বুক কাঁপত। স্বামী, শাশুড়ী আর ছেলের সঙ্গে সেই আকালের বছর প্রথম যখন আসে এই শহরে, কি ভয়ই না পদ্মমণির ছিল। যতবার গাড়ী ঘোড়া চলত মনে হোত এই বুঝি তাকে চাপা দয়ে চলে যাবে। পাশ দিয়ে লোকে তার দিকে যতবার তাকাতে তাকাতে চলে যেত ততবার অস্বস্তি আর লজ্জায় তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠত। মুখ তুলে কারো দিকে চেয়ে ভিক্ষা পর্যন্ত চাইতে পারত না। এই নিয়ে স্বামীর আর শাশুড়ীর কত গাল মন্দ সহ্য করতে হয়েছে তাকে। শেষটায় হাত পেতে চাইতে যখন শিখল তার আগে ছেলেও গেছে, স্বামীও গেছে। শাশুড়ী মরল তার কয়েকদিন পরে।

তারপর পদ্মমণির আরও নানা রকমের ভয় ভাঙল, লজ্জা ভাঙল, ভাবল এ মুখ দেখাবে কি ক'রে। শেষ পর্যন্ত দেখল কিছুতেই কিছু হয় না, সব সয়ে যায়। কে কাকে মুখ তুলে খোঁটা দিতে আসবে! প্রত্যেকের মুখেই তো কালি। সবাই জানে সবারই হাঁড়ির খবর।

পদ্মমণি ভেবেছিল সবই যখন গেল, তখন আর সংসারে কোন দরকারও নেই, কোন আশাও নেই বাসনাও নেই। কোনদিন এক সন্ধ্যা জোটে তো রাঁধবে, না জোটে তো উপোস করবে।

কিন্তু মাস কয়েক পরে একদিন পাড়ার কুমুদিনী বলল, 'বউ, যারা গেছে তারা তো গেছেই। কেঁদে কেটে তো তাদের আর ফিরে পাবিনে কিন্তু টাকা যদি রোজগার করতে চাস্ তো আমি করিয়ে দিতে পারি।'

পদ্মমণি বলল, 'থুঃ থুঃ ঝাঁটা মারি অমন টাকার মুখে।'

কুমুদিনী তার দিকে চেয়ে হাসল, 'আরে দূর, তুই যা ভেবেছিস তা নয়। পাড়া সম্পর্কে তুই আমার ছোট ভাইয়ের বউ তোকে কি অমন কথা বলতে পারি ? তা নয়, পয়সা রোজগারের আরো পথ আছে। শহরে গিয়ে গোপনে চাল বিক্রি করতে পারবি আমার সঙ্গে ?'

পদ্মমণি অবাক হয়ে বলল, 'চাল ! চাল কোথায় পাব ?'

কুমুদিনী বলল, 'ফিকির ফন্দি তোকে আমি সব বলে দেব। শুরুতে কেবল গোটা কয়েক টাকা দরকার।'

ফিকির ফন্দি শিখে নিতে পদ্মমণির দেরি লাগেনি। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে তাদের মতই গেরস্থ ঘরের বউ-ঝিদের কাছ থেকে সস্তায় ভাল চাল কিনে শহরের বউ-ঝিদের কাছে গিয়ে বিক্রি ক'রে আসতে হয়। কোন কোন সময় দ্বিগুণ তিনগুণ লাভ থাকে। যাতায়াতে রেলভাড়া লাগে আনা ছয়েক, সতর্কভাবে মা কালীগঙ্গার নাম নিয়ে গেটটা পার হতে পারলেই হয়। বাস, তারপরে আর ভয় নেই। কেবল মাঝে মাঝে এই গোয়েন্দাদের উৎপাত সহ্য করতে হয়। কাউকে কাউকে সিকিটা দু'আনিটা ফেলে দিলেই চলে। কারো বা লোভ আরো বেশী। তাদের হাতে ধরা পড়লে একেক দিন তিন দিনের লাভ পর্যন্ত রেখে যেতে হয়।

কিন্তু এই বছর খানেকের মধ্যে সময় কি অদ্ভুতভাবেই না বদলেছে। ভিক্ষা চাইতে গেলে শহরের যে সব বাড়ী থেকে দুর দুর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে সে সব বাড়ীতে, কর্তাগিন্নির কাছে পদ্মমণির এখন কত আদর। বাড়ীর মধ্যে ডেকে নিয়ে 'এসো বাছা, ব'সো বাছা' বলে কত যত্ন।

কেউ কেউ নালিস ক'রে বলেন, 'কোত্থেকে এক পোড়া-কপালে কনট্রোল এসেছে। চালের মধ্যে কেবল পাথরের কুচি। বলো তো বাছা ওই চাল কি মানুষের গলা দিয়ে গলে ? তোমরা আছ, তাই রক্ষা। কিন্তু মা, অমন পাঁচ দশ সেরে আমার সংসারে কি হবে ? মাসে তিন চার মণের দরকার যে !'

কেউ কেউ দরাদরি করে, আবার ভয়ও দেখায়, 'জানো বে-আইনি ভাবে চাল বেচতে এসেছ। যে কোন মুহূর্তে পুলিসে ধরিয়ে দিতে পারি।'

মনে মনে পদ্মমণির রাগও হয়, ভয়ও হয় ; কিন্তু মুখে সে সব কিছু প্রকাশ না ক'রে শান্ত হেসে বলে, 'বাবারা আমার সঙ্গে তামাসা করছেন। দু'আনা কম দিতে চান দেবেন। থানা পুলিসের কথা আসে কিসে। গিন্নিমার সাথে আমার জানা শোনা কি আর দু'চার দিনের ?'

সেই যে পদ্মমণি যায় আর দু'মাসের মধ্যে সে বাড়ীমুখো হয় না। খবরের পরে-

গিন্নির কাছে থেকে গোপনে আগামী টাকা নিয়ে তবে আবার সে বাড়ীতে চাল যোগান আরম্ভ করে।

বিক্রিবাটার হিসাব ক'রে পদ্মমণির দিন বেশ কাটছিল। সে দিন সোহাগীর স্বামী এসে তাকে রেখে গেল। বলল, 'করাতের কাজে যাচ্ছি মাসী, বউটা একা একা বাড়িতে পড়ে থাকবে, একজনে এক কথা বললে তোমারও তো বাজবে। তিন কুলে তো তার কেউ নেই। বেশি দিন বিদেশে থাকব না। যত দিন থাকি খরচ পাঠাব মাসে মাসে।'

পদ্মমণি বলল. 'কথা শোনো জামাইয়ের। খরচের জন্য কি এসে যাচ্ছে। কিন্তু আমি তো শোক তাপের মানুষ, চাল নেই চুলো নেই। পাগলের মত যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই. এই সোমত্ত মেয়ের ভার আমি কি ক'রে নিই বাবা।'

অনন্ত বলল, 'তোমার কাছে থাকলেই আমি নিশ্চিন্ত থাকব মাসী।' কিন্তু সেই থেকে মেয়ে বায়না ধরেছে, শহর দেখতে যাবে। কিছুতেই মোটে বুঝ মানে না; অলক্ষী মেয়ে!

পদ্মমণি ধমক দিয়ে বলেছিল, 'আমি কি বেড়াতে যাচ্ছি না কি শহরে? সঙ্ দেখতে যাচ্ছি যে তুই যাবি আমার সঙ্গে?'

সোহাগী বলেছিল. 'যে জন্যই যাও চোখ দুটো তো আর বাড়ীতে রেখে যাচ্ছ না। ফাঁকতালে ফাঁকতালে সবই দেখে নিতে পারছ। ফাঁকি দিচ্ছ কেবল আমাকে।'

পদ্মমণি রাগ ক'রে বলেছিল, 'তা হ'লে চল। তখনই জানে মেয়ে একটা বিপদ বাধাবে।'

খানিকক্ষণ এ-গলি ও-গলি ঘোরার পর সোহাগীই আবার পিছন থেকে পদ্মমণির আঁচল ধরে টান দিল।

পদ্মমণি বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি বলছিস্ বল্।'

সোহগী পদ্মমণির আঁচলের গিঁট খুলে একটা পান বার করে অর্ধেকটা পদ্মমণিকে দিল আর অর্ধেকটা নিজে চিবুতে চিবুতে বলল 'নে পান খা। তারপর ঐ রোয়াকের ওপর ব'সে একটু জিরিয়ে নে দেখি, উঃ বাবা হাঁটতে হাঁটতে পা একেবারে পাথরের মত ভার হয়ে গেছে। ভূতটা তো অনেকক্ষণ ছেড়েছে, তবু তোর দৌড় থামে না। আমি কেবল তোর কাণ্ড দেখছিলাম মাসী। আর এই সাহসের বড়াই করে মরিস্ তুই।'

পদ্মমণি ভালো ক'রে একবার পিছনের দিকে এবং চারপাশে তাকিয়ে দেখল।

সেই চশমাওয়ালা লোকটার আর কোথাও কোন চিহ্ন নেই। তৃপ্তির নিশ্বাস ছেড়ে পদ্ম মৃদু হেসে বলল, 'সাহস আমার ঠিকই আছে। ভয় কেবল তোকে নিয়ে পোড়ারমুখী।'

কিন্তু রোয়াকে উঠে বসে জিরিয়ে নিতে পদ্ম এখন রাজী হ'ল না। আরামের সময় এখন নয়। কাজ সেরে গাড়ীতে উঠে বসে তারপর বিশ্রামের কথা। বউবাজার ষ্ট্রীট পাড়ি দিয়ে পদ্ম সোজা পুরানো বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এ বাজার পদ্মের চেনা। এইখানে তার একাধিক খদ্দের আছে। কিন্তু পদ্ম খুঁজছে সেই খাট টেবিলের দোকানের টাকপড়া বাবুকে। তিনি সে দিন অনেক ক'রে বলে দিয়েছিলেন।

পাশাপাশি তিন চারটে গলি। কিন্তু সবগুলি খাট টেবিলের দোকানই দেখতে এক রকম। এতবার এসেছে পদ্ম, তবু যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল।

কিন্তু খানিক পরে হঠাৎ পরিচিত একটি মধুর স্বর তার কানে এলো, 'এই যে গো! ভুলে গেছ নাকি?'

চোখ তুলে চেয়ে দেখে সেই টাকপড়া বাবু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছেন। পদ্মর সঙ্গে চোখাচোখি হ'তে তিনি আবার একটু হাসলেন, 'কি গো, কি খবর। আমি ভাবলুম বুঝি ভুলেই গেলে।'

পদ্ম এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে বলল, 'না বাবু, ভোলার কি আর জো আছে।'

'না না ভুললে চলবে কেন। তারপর, হবে তো?'

পদ্ম ঘাড় নাড়ল।

দোকানের মালিক মধুর কণ্ঠে বললেন, 'তা হলে আর দেরি কেন, ভিতরে এসো। ওটি আবার কে পিছনে।'

'ও আমার বোন-ঝি।'

'বোন ঝি? তা বেশ বেশ! এখন থেকেই বিদ্যাভ্যাস করাচ্ছ বুঝি? এসো গো বাছা এসো।'

দোকানের মালিক তাদের একেবারে ভিতরে নিয়ে গেলেন। সোহাগী সমস্ত ভুলে একটা গ্লাসওয়ালা আলমারীর দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে লাগল।

হঠাৎ কার রূঢ় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সোহাগী চমকে উঠে দোরের দিকে তাকাল। সেই লোকটি। সেই চশমা, নাকের নিচে সেই সরু এক চিলতে গোঁফ, সেই লোক।

আপাদমস্তক সোহাগীর থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। ভুত তাহলে ছাড়েনি, এতক্ষণ কেবল আড়ালে আড়ালে ছিল।

শুধু সোহাগীই নয়, ভিতরে ভিতরে পদ্মমণি আর দোকানের মালিক হেরম্ববাবুরও কাঁপুনি ধরেছে।

তবু হেরম্ববাবু একটু কেসে এবং ঠোঁটের ওপর একটু হাসি টেনে এনে বললেন, 'আসুন স্যার। কোন ফার্ণিচার চাই নাকি আপনার?'

মুকুন্দ বলল, কি চাই, সে আপনি ভালোই বুঝতে পারছেন। কিন্তু এতো ভালো কথা নয়, আপনারা ভদ্রলোক হয়ে যদি এসব ব্ল্যাক মার্কেটিংএর প্রশ্রয় দেন—'

হেরম্ববাবু বললেন, 'না না না, কি যে বলেন স্যার।'

মুকুন্দ আঙুল দিয়ে ছোট বড় চালের পুঁটলিগুলি দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বটে! কি যে বলি! এ সব কি? জানেন সবাইকে সুদ্ধ আমি পুলিসে হ্যাণ্ডওভার করতে পারি?'

হেরম্ববাবু বললেন, 'তা তো পারেনই স্যার, হেঃ হেঃ হেঃ।' তারপর পালিস-ওয়ালার দিকে তাকিয়ে বললেন' 'মদন, কি দেখছ তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কোন আক্কেল বুদ্ধি যদি থাকে। যাও, বাবুর জন্য সামনের মোড়ের দোকান থেকে মিঠে পান নিয়ে এসো—'

মুকুন্দ বাধা দিয়ে বলল, 'পান আমি খাইনে।'

'ও! পান ইনি খান না, দরকার নেই পানে। ভালো দেখে সিগারেট নিয়ে এসো এক প্যাকেট।'

মুকুন্দ আবার বাধা দিল, 'কেন ব্যস্ত হচ্ছেন, সিগারেটে আমার দরকার নেই।'

'খান না স্যার?'

মুকুন্দ চড়া মেজাজে বলল, 'উঁহু, বলছি যে না। তবু—'

হেরম্ববাবু বললেন, 'তাহ'লে যাক তুমি বরং এক কাপ চা-ই নিয়ে এসো মদন, দেখে শুনে আনবে। কাপটা যেন গরম জল ধুয়ে নেয় আগে।'

মুকুন্দ অপাঙ্গে একবার সোহাগীর দিকে তাকাল। আর একবার আলমারীর গ্লাসে প্রতিফলিত তার প্রতিবিম্বের দিকে। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে ফোঁটা, দুই ঠোঁট পানের রসে লাল টুক-টুক করছে। কি চমৎকার ওর মুখের ডৌলটি, মুকুন্দ যেন পলক ফেলতে ভুলে গেল। সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মুকুন্দ আবার ধমকে উঠল, 'মাগী কি কম শয়তান! সারাটা দিন আমাকে পিছনে

পিছনে ঘুরিয়ে মেরেচ, এখন! এখন কোথায় যাবে? কি আশ্চর্য! এই আধ মণ চাল কি ক'রে কাপড়ের তলায় ক'রে লুকিয়ে আনতে পারল তাই ভাবি। আরও আছে নাকি বার কর্!'

পদ্মমণি বলল, 'না বাবু আর নেই!'

মুকুন্দ বলল, 'না, নেই। খোঁচা দিলে আরো কোন্ না আধ মন খানেক বের হবে?'

হেরম্ববাবু বললেন, 'না স্যার, আর বোধ হয় নেই।'

মুকুন্দ বললে, 'আপনি থামুন। সবাইকে চেনা গেছে, চোরের সাক্ষী গাঁট কাটা।'

তারপর সোহাগীর দিকে তাকিয়ে মুকুন্দ হঠাৎ ধম্‌কে উঠল, 'হুঁ, কোমরের নীচে তোর আছে ক' মণ?'

সোহাগী কি জবাব দিতে গেল কিন্তু মুখ দিয়ে তার কথা বেরুল না। পানের রসে লাল দুই ঠোঁট থর থর ক'রে কেবল কেঁপে উঠল। মুকুন্দ ক্ষুণ্ণ মনে ভাবল, এমন একটি মেয়েকে রাগ ধমক ছাড়া আর কোন ভালো কথা বলা যাচ্ছে না, এমনই ভাগ্য। পদ্মর দিকে তাকিয়ে মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করল্ 'কে হয় তোর ও?'

পদ্ম কিছু বলবার আগে সোহাগী বলল, 'আমার মাসী হয় বাবু।' পদ্ম ভ্রূকুটি করল।

মুকুন্দ হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করল, 'ও কিছু আনেনি, সত্য বলছিস?'

'হ্যাঁ বাবু, এই দোকানের বাবুকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখুন।'

হেরম্ববাবু বললেন, 'সত্যিই স্যার ওকে কিছু আনতে দেখিনি। এই যে আপনার চা-সিগারেট এসে গেছে।'

মুকুন্দ বল্‌ল, 'চা আপনি খান। যে সে দোকানের চা আমি খাইনে।'

হেরম্ববাবু এবার সিগারেটের বাক্সটা এগিয়ে দিলেন, ভিতরে পাঁচ টাকার একখানি নোট। মুকুন্দ একবার দেখল কি দেখল না, নোটখানা পকেটে পুরে একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর হেরম্ববাবুর দিকে তাকিয়ে পিঠ চাপড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'প্রশ্রয় দেবেন না। আপনারা প্রশ্রয় দিয়ে দিয়েই তো ওদের বাড়িয়ে তুলেছেন।'

তারপর পদ্মমণি আর সোহাগীর দিকে তাকিয়ে মুকুন্দ বলল, 'এসব পোঁটলা-পুঁটলি তুলে নে। থানায় যেতে হবে আমার সঙ্গে।'

পদ্মমণি কাতর দৃষ্টিতে একবার হেরম্ববাবুর দিকে তাকাল তারপর মুকুন্দকে বলল, 'এ বারের মত ছেড়ে দিন বাবু।'

হেরম্ব প্রতিধ্বনি ক'রে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার ছেড়েই দিন। গরীব মানুষ পেটের দায়ে এ সব ধরেছে আর কি।'

মুকুন্দ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কর্তব্য বড় কঠোর মশাই।'

হেরম্ববাবু বললেন, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই, তবে ছেড়ে দিলেও পারতেন। গরীব মানুষ।'

'ছেড়েই তো দেবই। তবে তার আগে সামান্য একটু দরকার আছে থানায়। সেটুকু সেরেই ছেড়ে দেব।'

দোকানের বাইরে এসে পদ্মমণি আর একবার কাতর অনুনয়ে বলল, 'কিছু জরিমানা নিয়ে আমাদের ছেড়ে দিন বাবু।'

মুকুন্দ ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ। অত সহজ মনে করেছিস্ বুঝি? সোজা থানায় যেতে হবে।'

দু5'র জন মজা দেখবার জন্য পিছন পিছন যাচ্ছিল' মুকুন্দের কুটিল ভ্রূকুটি দেখে তারা নিবৃত্তি হয়ে স'রে দাঁড়াল। অন্ধকারে এ গলি ও গলি দিয়ে ঘুরে ঘুরে মুকুন্দ হঠাৎ এক সময় পদ্মমণিকে বলল, 'আচ্ছা তুই যা।'

'আর ও?'

'ওর দেরি হবে। থানায় গিয়ে জবানবন্দী নিতে হবে ওর।'

'ছেড়ে দিন না বাবু ওর তো কোন দোষ নেই।'

'দোষ আছে কি না আমি বুঝব, তুই যা।'

পদ্মমণি এক মুহূর্ত কি ভাবল তারপর মনে মনে হেসে বলল, 'আচ্ছা।'

সোহাগীর অস্ফুট কাতরোক্তি শোনা গেল, 'আমাকে ফেলে যাসনে মাসী।'

'আঃ অমন ক'রে চেঁচাচ্ছিস কেন ছুঁড়ী। তোকে কি যমের মুখে ফেলে যাচ্ছি না কি, ভয় কি, থানা পুলিস তো আর কিছু হচ্ছে না। এ তো ভালোই।'

মনে হ'ল পদ্মমণি বুঝি চলেই গেল। কিন্তু একটু পরে পিছনে আবার তার পায়ের শব্দ শুনে মুকুন্দ রুখে দাঁড়িয়ে বলল, 'আবার তুই আস্‌ছিস পিছনে পিছনে? বল্‌লুম না তোকে চলে যেতে?'

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে পদ্মমণি ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'বাবুর বাসা কি খুব কাছেই না কি?'

মুকুন্দ অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'বাসা! বাসার কথা তোকে কে বললে?'

আবছা অন্ধকারে পদ্মমণি একটু হাসল, 'ও কথা কেউ কি বাবু আর মুখ ফুটে বলে, ও আমরা এমনিতেই বুঝে নি। কোন লজ্জা করবেন না বাবু। মেয়ে কি ওতে মরবে না পচে যাবে? চোখের ওপর কত দেখলুম। কেবল একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন। সারা দিন তো গেল। রাত ন'টার গাড়ী আমাদের ধরতেই হবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। দস্তরীটা—।'

বলে পদ্মমণি হঠাৎ মুকুন্দর সামনে হাত বাড়িয়ে দিল।

মুকুন্দ বল, 'কি?'

পদ্মমণি একটু লজ্জিত হবার ভঙ্গিতে বলল. 'বাবু যেন কি. দস্তরী তো আগামই পেয়ে থাকি আমরা। আমি ওর আপন মাসী কি না—একমাত্র গার্জিয়ান।'

'মাসী।' হঠাৎ যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল মুকুন্দ, 'তুমি ওর আপন মাসী? সত্যি বলছ?'

আওয়াজের তীক্ষ্ণতা বুঝি পদ্মমণির বুকের ভিতরে গিয়ে বিঁধবে। একটু দম নিয়ে পদ্মমণি বলল, 'মিথ্যে কেন বলতে যাব বাবু, আপন মাসীই তো। তাতে কি হয়েছে' কেবল ওরই তো মাসী নয়, সম্পর্কে এখন আপনারও তো মাস্-শাশুড়ী!'

নিজের রসিকতায় পদ্মমণি নিজেই ফিক্ ক'রে একটু হাসল।

পদ্মমণির এই সানন্দ সহায়তায় উৎফুল্ল হওয়া দূরে থাক কিছুক্ষণ মুকুন্দ যেন স্তম্ভিত হয়ে রইল। তার নিজের পাপ, নিজের দুর্বলতা যেন এর কাছে তুচ্ছাতি-তুচ্ছ হয়ে গেছে।

পদ্মমনি আবার বলল, 'বাবু রাত বেশি হয়ে যাবে যে।'

মুকুন্দ পকেট থেকে পাঁচ টাকার সেই নোটটা পদ্মমণির হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুঃসহ ঘৃণায় চীৎকার ক'রে উঠল, যা পালা, পালা শিগগির।' তারপর নিজেই এক ফাঁকে সরু গলির ভিতর দিয়ে দ্রুতপায়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

স্পর্শ

খানিকটা রাস্তা প্রায় দৌড়ে গিয়ে বিমল চলন্ত ট্রামের হ্যাণ্ডেলটা ধরে এক মুহূর্ত ঝুলে রইল তারপর ঠেলেঠুলে গিয়ে উঠল ফুট বোর্ডের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে নানারকম আপত্তি এবং মন্তব্য শুরু হয়েছে, 'চাকরির জন্য কি প্রাণ খোয়াবেন নাকি মশাই। এতই যদি তাড়া পাঁচ মিনিট আগেই বেরুলে হয় বাড়ী থেকে?'

'কোথায় দাঁড়িয়েছেন দেখুন দেখি? জুতো দিয়ে দুটো পা একেবারে থেঁতলে দিয়েছেন। রক্ত-মাংসের শরীর মশাই, লোহার নয়। আপনার পা দুটোর ওপর যদি অমনি উঠে দাঁড়াই তা হ'লেই মজাটা টের পান।'

'ঠুলি তো দেখি দিব্যি এই বয়সেই এক জোড়া পরেছেন। তাতেও কুলোচ্ছে না বুঝি? আর এক জোড়া পরুন না ওর ওপর।।'

বিমল সবিনয়ে জবাব দিল, 'আজ্ঞে পয়সায় কুলোয় না, ঠুলির দাম কি রকম চড়েছে তা তো জানেন না!'

'ইস্ আবার রসিকতা হচ্ছে, ভেবেছেন ফকরেমি ক'রেই সব উড়িয়ে দেবেন। যত সব বে-আক্কেল বদমাস—'

ফুট বোর্ডের ওপর বিভিন্ন-বয়সী পনের বিশজন সহধর্মী অফিস-যাত্রীর সহিংস এবং সক্রিয় সম্ভাবণের ফলে বিমল প্রায় বিনা চেষ্টায় হঠাৎ এক সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে ঢুকে গিয়ে আনন্দিত হ'ল। এ একরকম মন্দ নয়। শাপে বর। কিন্তু এখানেও স্বস্তি নেই। কেবলই চাপ লাগছে চারদিক থেকে। দুঃসহ গরমে দম আটকে আসছে। মানুষের অতি সান্নিধ্য কি এমন অস্বস্তিকর, তার গায়ের গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে কি এমন পীড়িত ক'রে তোলে!

তবু পরস্পরকে অবলম্বন ক'রেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। দু'পা পেতে দাঁড়াবার মত স্থান নেই একটু, টাল সামলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে যে কিছু একটা ধরবে তারও জো নেই! বিমল ভারসাম্য রাখবার জন্য বারকয়েক সম্মুখবর্তী সহ-যাত্রীর কাঁধে হাত রাখল। ভদ্রলোক প্রত্যেকবার ভ্রূ কুঁচকে এবং চোখ বিস্ফারিত ক'রে ফিরে তাকালেন কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

বসবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারাও যে খুব শান্তিতে আছে তা নয়, আড়াল থেকে ছারপোকার কামড় আর প্রকাশ্যে দণ্ডায়মান সহযাত্রীদের ঈর্ষা-কুটিল দৃষ্টি সর্বাঙ্গ বিদ্ধ করছে।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সামনের মহিলা-আসনটির উপর বিমলের চোখ পড়ল। বেঞ্চটির অর্ধাংশে জনতিনেক কেরাণী অত্যন্ত সংকুচিতভাবে ঘেঁষা-ঘেঁষি ক'রে বসেছে আর বাকি অর্ধেকে স্থূলাঙ্গী মাঝবয়সী একটি পানওয়ালী রাণীর মত উপবেশন করেছে। মাঝখানে একটি নাতিবৃহৎ পুঁটলী আব্রু এবং আভিজাত্য রক্ষা করছে। বিমল একবার সেই পুঁটলিটার দিকে তাকাল, তারপর হাত বাড়িয়ে সেটাকে তুলে নিয়ে ঠেলে দিলে বেঞ্চের তলায় এবং পরক্ষণে শূন্য-স্থানে ধপ করে বসে পড়ল।

মানদা সবিস্ময়ে এক মুহূর্ত বিমলের দিকে তাকিয়ে রইল—তারপর তারস্বরে বলল, 'দেখ, দেখ একবার কীর্তিখানা। একেবারে কোলের ওপর এসে বসল। বলি, চোখের মাথা কি খেয়েছ! পুরুষ লোক মেয়েলোক চিনতে পারো না?'

কৌতুকে বিদ্রূপে শাণিত বিমলের দুটি চোখ মানদার মুখের ওপর গিয়ে পড়ল। বছর চল্লিশেক বয়স হবে মানদার। মেদে মাংসে বিশাল দেহে কোথাও লাবণ্যের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। মুখে দীর্ঘকালের বিচিত্র অভিজ্ঞতা রেখায়িত হয়ে রয়েছে। কিন্তু প্রসাধনের অভ্যাসটি যায়নি, পুরুষের মন ভোলাবার ব্যর্থ, হাস্যকর চেষ্টাটি এখনো আছে। অল্পবয়সী মেয়েদের মতই কপালে বড় একটি কালো রঙের টিপ, ঠোঁট দুটি পানের রসে টুক টুক করছে। নিজের এবং পণ্যের যৌথ বিজ্ঞাপন। বিমল তীক্ষ্ণ একটু হাসল, 'চিনতে পারা কঠিন।'

ক্রোধে এবং অপমানে মুহূর্তের জন্য মানদার মুখখানা কালো হয়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই চোখে মুখে অত্যন্ত অম্লান একটা ভঙ্গি এনে বলল, 'মরণ! কথা শোন মিনসের!'

ততক্ষণে সহযাত্রীদের ভিতর থেকে জনকয়েক হো হো করে হেসে উঠেছে।

ব্যাপারটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এতক্ষণ যারা রাজনীতি, অফিস-নীতি এবং বস্ত্রসমস্যার আলোচনায় মত্ত ছিল তাদের প্রত্যেকেই সকৌতুকে বিমল আর মানদার দিকে তাকাল।

প্রৌঢ় বয়স্ক একজন রসিক ভদ্রলোক বললেন, 'ঘাবড়াবেন না মশাই, চালিয়ে যান। ওদের গালিগালাজে আয়ু বাড়ে। বরং ওদের আদর সোহাগটাই মারাত্মক, তাতেই আয়ু ক্ষয়।'

পাশ থেকে আর একজন জবাব দিলেন, 'কেবল আয়ু ? বিনোদ বুঝি এতদিনে পয়সার শোকটা সাম্‌লে নিয়েছে ?'

বিনোদবাবু কটমট ক'রে তার দিকে তাকালেন, 'ছি কি ইতরামো হচ্ছে গণেশ ?'

ইতিমধ্যে সমালোচকের দল দু' ভাগে বিভক্ত হয় পড়েছে। বেশির ভাগই বিমলের প্রতিকূলে। যে ধরণের স্ত্রীলোকই হোক না, সকলেরই মান মর্যাদা আছে। আছে। ভদ্রলোকের কাছে থেকে শিষ্টাচারের দাবী ওরাও করতে পারে। মানদার অনুমতি না নিয়ে কেন বিমল তার পাশে বসতে গেল ? অন্যায় বিমলেরই হয়েছে। মানদার কোন দোষ নেই।

মানদা স্ফুর্তি পেয়ে বলল, 'আপনারাই বলুন। এ তো মেয়েদের বসবার জায়গা, কেবল মেয়েরাই বসবে। কিন্তু তিন তিন জন পুরুষ লোককে আমি তো বসতে দিয়েছি। কোন আপত্তি তো করিনি। ইচ্ছা করলে সবাইকেই তো তুলে দিয়ে আমি দাঁড় করিয়ে রাখতে পারতাম !'

যে তিনজন ভদ্রলোক মানদার বেঞ্চে বসে তার পক্ষ সমর্থন করছিলেন, তারা একটু নড়ে চড়ে বসলেন। একজন বল.লন, 'তাই নাকি ? তোমার তো তা হ'লে অগাধ ক্ষমতা !'

মানদা বলল, 'কোম্পানীর আইনই তো বাবু তাই, মেয়েদের সীটে পুরুষরা বসতে পারবে না !'

পিছন থেকে আর একজন কে জবাব দিল, 'এত আইনের জ্ঞান নিয়ে পান বিক্রি করছ কেন বাছা, হাইকোর্টে যাও।'

আর একজন মুচকি হেসে বলল, 'রক্ষা ও আইনটা কেবল দিনের জন্য। রাত্রে ওটা তুলে না নিলে তোমাদের কি উপায় হোতো ভাবি।'

পাশের বেঞ্চ থেকে ছোকরা মত একজন এর জবাব দিল, 'কেবল ওদের কেন, উপায় আপনাদেরও থাকত না।'

মানদা বলে যেতে লাগল, 'তা সত্ত্বেও আমি সবাইকেই বসতে দি। ভাবি অফিসের সময় কত কষ্ট ক'রে যাচ্ছে মানুষে। আরও দু'তিনজন লোক যদি একটু বসে যেতে পারে, আমি কেন বাধা দিতে যাই। কিন্তু তাই বলে বলা নেই, কওয়া নেই পুঁটলিটা ফেলে দিয়ে লোকটি আমার গায়ের ওপর এসে বসবে ? এ কি ব্যাপার ?'

পূর্বোক্ত যুবক কেরাণীটি বলল, 'ঠিক বলছে। অমন ক'রে বসা আপনার উচিত হয় নি, ওটা যখন লেডীজ সীট।'

বিমল বলল, 'কিন্তু লেডী কেউ নেই এখানে।'

লেডী কথাটির অর্থ মানদা আন্দাজে কি ক'রে বুঝে নিয়ে বলল, 'না নেই। ভদ্রলোক যেন কেবল ওরাই। ফর্সা একটা জামা পরলেই যদি ভদ্রলোক হোত। কনৃডাকটারকে বললে এখনই ঘাড় ধরে তুলে দেবে।'

যুক্তিতর্কে অবশ্য বিমল হারে। কিন্তু হার স্বীকার করলে সম্মানের আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। যুক্তির জোরে হারলে গলার জোর যারা প্রয়োগ করতে না জানল ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

বিমল মানদার দিকে চেয়ে চোখ গরম ক'রে বলল, 'খবরদার! মুখ সামলে কথা বলো।'

মানদা বলল, 'ঈস্! তেজ দেখ মিনসের। মারবে নাকি? গায়ে হাত দিয়ে দেখনা একবার!'

পিছনের সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'তাহলে তো তুমি একেবারে জল হয়ে যাবে গো। মেয়েমানুষের গায়ে হাত কি লোকে আর মারবার জন্য দেয়।'

পার্শ্ববর্তী গণেশ বললেন, 'বিনোদ, ইঙ্গিতটা পরের মেয়েমানুষ সম্বন্ধে যতখানি খাঁটি, ঘরের মেয়েমানুষ সম্বন্ধে বোধ হয় তত নয়, বিশেষত দু' এক পেগ টেনে যদি ফেরা যায়।'

বিনোদ আর একবার কটমট ক'রে তাকালেন।

দণ্ডায়মান আর একটি প্রৌঢ় এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। তিনি অসহিষ্ণু-ভাবে এবার বিমলকে ধমকের স্বরে বললেন, 'আপনিও তো মশাই কম বে-আকেল নাছোড়বান্দা নয়! এত লোক উঠল নামল আপনি ও জায়গাটা ছেড়ে কোথাও একটু নড়তে পারলেন না?'

মানদা বলল, 'তা নড়বে কেন? এখানে হ'ল মধু।'

অনেকেই হো হো ক'রে হেসে উঠল। বিমল অপমানটা হজম করে নিয়ে ঠিক তেমনি অশ্লীল ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'মাইরি! মধুর এখনো বাকি আছে নাকি কিছু? তাহ'লে আর এই ভিড়ের মধ্যে পানের পুঁটলি বয়ে বেড়াচ্ছ কেন?'

বিনোদবাবু বলে উঠলেন, 'সাবাস, সাবাস!'

মানদার মুখখানা আর একবার কালো হয়ে গেল। আঘাতটা যেন এবার বড় বেশি লেগেছে। এই বয়সে কালোশশী, কনকতারাও বেশ ক'রে খাচ্ছে। একজন

হয়েছে বাড়ীওয়ালা, আর একজনের এখনো নতুন নতুন নাগর জুটছে। কেবল মানদাকেই পানের পুঁটলি হাতে রোজ কেরাণীদের মত দশটা পাঁচটা এই ভিড় ঠেলে যেতে হচ্ছে অফিস কোয়ার্টারে। দু'চার পয়সার ক্রেতার আশায় বসে থাকতে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রথম ভেবেছিল আগে যা ক'রেছে তার চেয়ে কাজটা ভালোই, তার চেয়ে তো সম্মানের। কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে তাতে সন্দেহ হয় মানদার, যখন রাস্তায় খোট্টা পুলিস পাহারাওয়ালা বিনা পয়সায় এসে ইয়ার্কি দিতে থাকে, দুপয়সার পানের সঙ্গে সঙ্গে খয়েরী রঙের আঙুলের মাথাগুলি সুদ্ধ যখন চেপে ধরে।

কিন্তু কেবল ব্যবসা আর আর্থিক দীনতাকেই নয়— বিমলের তীক্ষ্ণ শ্লেষ মানদার আরও একটি বড় গোপন এবং নরম জায়গায় আঘাত করেছে। সে তার নারীত্বকে, বিগত অস্তমিত যৌবনকে। বিমলের চোখের ভঙ্গি, কথার ভঙ্গি যেন সমস্ত পুরুষের প্রতিনিধিত্ব বহন করছে! আর কোন আশা নেই জীবনে, কোন আনন্দ নেই। তার দিকে তাকিয়ে পুরুষের দু'চোখে আর মুগ্ধতা নামে না—কটু ব্যঙ্গ, কুশ্রী শ্লেষ ফুটে ওঠে। কারো কাছে কোন দাম নেই মানদার, কোন কদর নেই। তাকে দেখে লোকের কেবল হাসি আসে, ভালোবাসা আসে না। সেই জন্যই বিমল তাকে এমন নির্বিচারে অপমান করতে পারল, তুচ্ছ করতে পারল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বিমলের চোখ একবারও পলক ফেলতে ভুলে গেল না, কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট মুহূর্তের জন্যও কেঁপে উঠল না থর থর ক'রে। বিমলকে প্রৌঢ় আর একবার ধমক দিলেন 'ছি ছি ছি, একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে কি আরম্ভ ক'রেছেন? লজ্জা করে না আপনার?'

লজ্জা! মানদাকে নির্বাক ক'রে দিয়ে বিমল তখন বিজয় গৌরব অনুভব করছে। শত্রুর একমাত্র পরিচয় সে শত্রু। তার জাতি নেই, গোত্র নেই। ক্ষুদে পিঁপড়ে যখন কামড়ায় তখন কি তার ক্ষুদ্রত্বকে অনুকম্পা ক'রে শান্ত থাকতে পারি, বুড়ো আঙুলের ডগায় তাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে পিষে না মারা পর্যন্ত কি শান্তি আসে প্রাণে?

ছোকরা কনডাকটর এতক্ষণে অন্যান্য লোকের কাছে টিকিট কাটছিল আর মুচকি মুচকি হাসছিল, এবার বিমল আর মানদার কাছে এসে টিকিট চাইল।

বিমল নিজের টিকিটটা কেটে নিল। কনডাকটর মানদার কাছে হাত পাততেই হঠাৎ সে একটু অদ্ভুত হেসে বলল, 'আঃ মরণ! আমি দেব কেন গো। টিকি-

টের দাম বাবুর কাছ থেকে চেয়ে নাও।' ব'লে আঙুল দিয়ে বিমলকে দেখিয়ে দিল।

সকলে অট্টহাসি ক'রে উঠল। বিনোদবাবু পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সাবাস সাবাস।'

এবার বিমলের নির্বাক হবার পালা।

কাস্টম্স্ হাউসের সামনের স্টপেজটায় ট্রাম এসে থামতেই জন পঁচিশেক এক-সঙ্গে ঠেলাঠেলি ক'রে শশব্যস্তে দোরের দিকে এগিয়ে এল। বিমল আর পান সুপারির পুঁটলি হাতে মানদাও এগিয়ে এল সেই ভিড়ের মধ্যে। তাদেরও এখানেই নামতে হবে।

ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি, কে আগে নামবে, কে পরে। জন কয়েকের ধাক্কায় ট্রাম থেকে রাস্তায় পা ফেলতে না ফেলতেই বিমল টলে গিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দেখে মানদা তখনও উঠতে পারেনি। ট্রাম ততক্ষণে সবেগে চলতে শুরু ক'রেছে। বিমল সেইদিকে তাকিয়ে ট্রামের ড্রাই-ভারের উদ্দেশ্যে গর্জে উঠল, 'শালা শুয়ারকা বাচ্চা, জেনানা দেখতা নেহি!'

মানদা উঠে দাঁড়িয়ে বিমলকেই সব চেয়ে কাছে দেখে তাকে সাক্ষী মেনে বলল, 'দেখলেন, কাণ্ডটা। লোক নামল কি নামল না দেখা নেই, গাড়ী চালিয়ে দিলেই হ'ল। যত সব মাতাল বদমাস এসে জুটেছে—'

সিগারেটের কৌটা এবং সুপারীগুলি ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছিল। মানদার সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতে বিমলও তার কিছু কিছু কুড়িয়ে দিল।

মানদা সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল, 'আহা হা, আপনি আবার কষ্ট করছেন কেন বাবু।'

বিমল বলল, 'তাতে কি, তোমার লাগে নি তো খুব।'

মানদা তার দিকে একবার চেয়ে সলজ্জে চোখ নামিয়ে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'না কিন্তু আপনার হাতটা তো ভারি ছ'ড়ে গেছে।'

সিগারেটের কৌটোটা একটু দূরে গড়িয়ে পড়েছিল। বিমল সেটাকে তুলে নিয়ে মানদার পুঁটলির ভিতর রেখে দিতে দিতে বলল, 'ও কিছু না, একটা মলম টলম লাগিয়ে দিলেই হবে'খন।

কথার ভঙ্গিতে মানদার মনে হ'ল যেন মলমটা বাহুল্য, বিমলের ক্ষতের জ্বালা অমনিতেই মিটতে শুরু ক'রেছে।

আবরণ

পাটের ক্ষেত নিড়িয়ে দুপুর রোদে বাড়ি ফিরে এসে বংশী দেখল ঘরের ঝাঁপ ভিতর থেকে বন্ধ। বিরক্ত হয়ে ঈষৎ কর্কশ স্বরে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বংশী ধমক দিয়ে উঠল, 'দিন দুপুরে দোর এঁটে ঘরের মধ্যে করছিস কি শুনি ? দোর খুলে দে।'

কিন্তু ভিতর থেকে কোন জবাব এলো না।

বংশীর গলা আরও চড়ে গেল, 'গেরাহ্যিই হচ্ছে না, বলি খুলবি দোর না বন্ধ ক'রেই থাকবি ?'

এবার চাঁপা স্বামীর চেয়েও উচ্চতর গ্রামে চেঁচিয়ে উঠল, 'না বন্ধ ক'রে থাকব কেন! নেংটা হয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে লোককে দেখাব সোয়ামীর আমার কেরামতি কতখানি। ভাত কাপড়ের কেউ নয় কেবল পীরিতের গোঁসাই।'

বংশী জ্বলে উঠে বলল, 'দিন নেই রাত নেই, চব্বিশ ঘণ্টা কেবল ভাত কাপড়ের খোঁটা। ভাত কাপড় আমি দিই না তো তোর কোন বাপে এসে দেয়রে হারামজাদী। খুলে দে দরজা। নইলে লাথি মেরে ভেঙে ঘরে ঢুকব বলে দিচ্ছি।' ব'লে বংশী সত্যিই একটা ধাক্কা দিল ঝাঁপে।

চাঁপা এবার শংকিত কাতর কণ্ঠে বলল, ,এক্ষুনি এসো না কিন্তু, পায়ে পড়ি তোমার—আমি বড় বেসামাল হয়ে আছি।'

'ও', বংশী একটু মৃচকি হাসল। তারপর চাঁপা সত্যিই কতখানি বেসামাল হয়েছে দেখবার জন্য আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বেড়ার ফাঁকে চোখ রাখল। এই গরমের মধ্যে সেই ছেঁড়া ময়লা কাঁথাটা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে চাঁপা কতকগুলি টুকরো টুকরো ছেঁড়া নেকড়া জোড়া দিচ্ছে।

বংশী জিজ্ঞাসা করল, 'শাড়ীখানা একেবারেই গেছে নাকি ?'

চাঁপা চমকে উঠে পিছনে তাকিয়েই বেড়ার ফাঁকে বংশীর দুটো কৌতুহলী চোখ দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি দুই হাত সেই ফাঁক চেপে ধ'রে বলল, 'ছি ছি ছি, আবার এখানে এসে দাঁড়িয়েছ। সরো সরো শিগগির, আমি কি গলায় দড়ি দিয়ে মরব তোমার জন্যে ?'

বংশী সরে এসে বলল, 'আমি তো আর পর পুরুষ নই—সোয়ামী। আমার কাছে অত লজ্জা কিসের তোর?'

চাঁপা ঝংকার দিয়ে উঠল, 'আহাহা, কি সাধের সোয়ামী আমার। এই এক বছরের মধ্যে একখানা কাপড় দিতে পারল না জুটিয়ে তার আবার সোয়ামী, বলতে লজ্জা করে না?'

কাপড় চাঁপার নেই অনেকদিন ধরেই। কিন্তু বংশী কি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে? সে কি কম চেষ্টা করেছে হাটে গঞ্জে একখানা কাপড়ের জন্যে? কিন্তু কোথাও নেই কাপড়। সব দোকানদারের মুখেই এক কথা। নেই, নেই। ওবার যেমন চাল ছিল না, এবার তেমনি একগাছি সুতোও কোথাও জুটছে না। বংশীর নিজের জন্য ভাবনা নেই। কাপড়ে তার দরকার করে না। সেই সস্তার বাজারেই বছরে একখানার বেশি তার কাপড় লাগে নি। এখন তো চব্বিশ ঘণ্টা গামছা পরেই কাটে। কেবল হাটে বাজারে বের হবার সময় ন্যাকড়া-ট্যাকড়া যা হোক কিছু একটু জড়িয়ে নিলেই হয়। কিন্তু অমন সোমত্ত বউয়ের দেহ কি গামছায় ঢাকে? আর সেই গামছাই কি ছাই আছে দেশে! এক হাতি সওয়া হাতি গামছার দাম পাঁচ সিকে দেড় টাকা। বংশী স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল, 'কিন্তু এমন নেংটা হয়ে পড়লি কি করে? সকালেও তো কি একটা প'রে ছিলি।'

চাঁপা বলল, 'হুঁ—বেনারসী প'রে ছিলাম। শাড়ী গয়নায় গা তো আমার ভ'রে রেখেছ কি-না। জল ভ'রে কলসীটা কেবল কাঁখে তুলতে গেছি, কাপড়খানা একেবারে রঙ্গে রঙ্গে খসে গেল। বাড়ি আর আসতে পারি না এমনি দশা। গয়লাদের বিনোদ ছিল ঘাটে। আমার ইচ্ছা করতে লাগল গলায় দড়ি দি।'

বংশী ধমক দিয়ে বলল, 'অমন দড়ি দড়ি করিস নে। মুখের এক লব্জ হয়ে গেছে কেবল দড়ি আর দড়ি। শেষ পর্যন্ত দড়িতেই টানবে।'

বংশীর মনে পড়ল, ঝুমুর কান্দির গোকুল মণ্ডলের মেয়ে সত্যিই নাকি গলায় দড়ি দিয়েছে, কালকের হাটে সব বলাবলি করছিল।

নদী থেকে একটা ডুব দিয়ে এসে বংশী বলল, 'ভাতটাতদিবি—না ঘরে খিল দিয়েই থাকবি সারা দিন?'

চাঁপা সানুনয়ে বলল, 'সব আছে রান্না ঘরে। নিজেই এবেলা নিয়ে থুয়ে খাও।'

'কেন, তুই আসতে পারবি নে?'

'অবুঝের মত কথা বলছ কেন? দেখছ না দশা। কি ক'রে বেরোই?'

বংশী রাগ ক'রে উঠল, 'ঢং দেখ মাগীর। একেবারে লজ্জাবতী লতা। কাঁথা জড়িয়েই আয় না, না হয় আমি চোখ বুজে থাকব, চাইব না তোর দিকে। রঙ্গ করিসনে এখন। খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে পেট। নিজে তো এক গাদা পান্তা সেঁদিয়ে বসে আছিস্।'

চাঁপাও সক্রোধে বলল, 'আছি তো আছি। পারব না আমি বেরুতে। কেন, এক বেলা বেড়ে খেতে পারো না? হাতে কি কুট হয়েছে?'

বংশী বলল, 'তেজ দেখ মাগীর। আচ্ছা আসি খেয়ে। দেখব'খন তেজ তোর ভাঙা যায় কি-না।'

ঘরে গিয়ে দেখে ভাত বাড়াই আছে। সব গুছিয়ে টুছিয়ে ঠিক ক'রে রেখে গেছে চাঁপা। কলমী শাক চচ্চড়ি আর তার পাশে খানিকটা কাসুন্দি আর একটি কাঁচা-লঙ্কা সযত্নে রেখে দিয়েছে। দেখে মনটা যেন প্রসন্ন হ'ল বংশীর, তবু বউটা খাওয়ার সময় কাছে বসে না থাকলে কেমন যেন খালি খালি লাগে।

খেয়ে এসে তামাক সেজে বহুক্ষণ ধ'রে দাওয়ায় বসে বসে নিবিষ্ট মনে বংশী হুঁকা টানল, তারপর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল, 'কি সারা দিন রাত কি আজ বাইরেই ফেলে রাখবি না কি।'

কিন্তু চাঁপার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ভারী রাগ বউটার, মনে মনে ভারী অভিমান। হুঁকো টানতে টানতে তারপর হঠাৎ এক দুষ্টু বুদ্ধি খেলল বংশীর মাথায়। দাওয়ার বেড়ায় গোঁজা কাঁচিখানা আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে ঝাঁপের এক পাশের দড়ি দিল কেটে। তারপর ঝাঁপটা সামান্য একটু টেনে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। কিন্তু স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তেই পা আর এগুলো না বংশীর। একেবারে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহ—মাদুরের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে চাঁপা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। মোটা আর ময়লা কাঁথাটা লুটোচ্ছে পায়ের কাছে। গরমে বেশীক্ষণ বোধ হয় আর গায়ে রাখতে পারেনি। ঘুমের ঘোরে লাথি মেরে ঠেলে ফেলেছে। পাশে ছেঁড়া টুকরো টুকরো নেকড়াগুলো ইতস্তত ছড়ানো। সেলাই ক'রে সুবিধা হচ্ছে না দেখে গায়ের রাগে চাঁপা নিজেই বোধ হয় সেগুলি আবার টেনে ছিঁড়েছে। পলকের জন্য সেই নিরাবরণ নারী দেহের দিকে তাকিয়ে বংশী চোখ ফিরিয়ে নিল।

এর জন্য কি কম লোভ ছিল বংশীর। এককে রাত্রে কি কম খোসামোদ করেছে বউকে? আজ আর কোন বাধা নেই। কিন্তু আজ দুটো চোখ ভালো ক'রে বংশী মেলতে পারল না। ছি ছি ছি।

তাড়াতাড়ি সেই মোটা কাঁথাটা স্ত্রীর দেহের ওপর বংশী তুলে দিতে গেল।

একটু নাড়াতেই চমকে জেগে উঠল চাঁপা, তারপর স্বামীর দিকে এক দুর্বোধ্য অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আবার ঢাকতে যাচ্ছ কেন, নাও ওটাও খুলে নাও।'

বংশী তার দিকে তাকিয়েই বলল, 'টাকা নিতে এসেছিলুম। শহর থেকে নিয়ে আসছি কাপড়।'

বাঁশের চোঙার ভিতর থেকে খান চার পাঁচ এক টাকার নোট বের ক'রে নিয়ে বংশী দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু কি দেখল বংশী? বাড়ি ছাড়িয়ে অনেক দূরে সে এসে পড়েছে। কিন্তু চাঁপার সেই দেহ কিছুতেই যেন চোখের সামনে থেকে সরে যেতে চাইছে না। ছি ছি ছি।

যে ভাবেই পারুক চুরি করে হোক, ডাকাতি ক'রে হোক, কাপড় একখানা আজ এনে দিতেই হবে বউকে, নইলে গোকুল মণ্ডলের মেয়ের মত চাঁপাও হয়তো কখন গলায় দড়ি দিয়ে বসবে। যে লজ্জা চাঁপার আর দিনে দুপুরে যে কাণ্ড আজ ক'রে বসল বংশী।

কাঠ ফাটা রোদে মাইল আড়াই রাস্তা পাড়ি দিয়ে বংশী গুপীগঞ্জে এসে পৌঁছল। গত হাটবারেও শহরের সব দোকানে বংশী একখানা কাপড়ের জন্য প্রায় মাথা কোটাকুটি করেছে। রাগ ক'রে ভেবেছে আর আসব না, কিন্তু না এসে উপায় কি! কাপড় আজ জোটাতেই হবে।

পাড়া-গাঁ-ঘেঁসা ছোট গঞ্জ। হাটবার ছাড়া দুপুরের পরে আর কোন ভিড় থাকে না। সকালে বাজার মেলে দুপুরের আগেই একটু একটু ক'রে ভাঙতে শুরু করে। গরমের দুপুরে ঘুমোবার উপায় নেই, নকুল সা'র মুদী দোকানের সামনে যে অল্প একটু ছায়া পড়েছে সেখানে মাদুর পেতে গঞ্জের দোকানীরা খোলা গায়ে তাস খেলতে জড় হয়েছে। একজন খেলুড়ের কাঁধের ওপর তিন চার জন ক'রে দর্শক এবং পরামর্শদাতা এসে ঝুঁকে পড়েছে। চলতে চলতে বংশী সেখানে এসে থেমে দাঁড়াল। কাপড়ের দোকানের মালিক সুবল মল্লিকও আছে এই দলে।

বংশী তার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলল, 'মল্লিক মশাই ও মল্লিক মশাই, একবার আসবেন একটু এদিকে?'

সুবল বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে তাকিয়ে বংশীকে দেখে আরও অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলল, 'কি বলছিস?'

'আজ্ঞে একবার দোকানে যদি একটু আসতেন।'

'দোকানে! দোকানে এসে করব কি? এই পরশুদিন না ব'লে দিলুম তোকে,

কোনরকম কাপড়ই নেই, ভেবেছিস রাতারাতি গাড়ীতে গাড়ীতে কাপড় এসে হাজির হয়েছে, না?'

বংশী বলল, 'আজ্ঞে আট হাত হোক ন'হাত হোক কোনরকম একখানা শাড়ী যদি দিতেন—'

সুবল বাধা দিয়ে বলল, 'আমি গড়িয়ে দেবো, না? কাপড় কিনতে হয় গরমেণ্টের কাছে যা, থানায় যা, জজ-ম্যাজিস্টেটের কাছে যা। বেচা কেনা ব্যবসা বাণিজ্য দোকানদারদের হাত থেকে উঠে গেছে—বুঝলি?'

বংশী বলল, 'আজ্ঞে ঘরের মেয়েছেলের দিকে যে আর চাওয়া যায় না, কত্তা।'

কে একজন রসিকতা ক'রে বলল, 'তাহ'লে বাইরের মেয়েছেলের দিকে তাকাবি।'

বংশী তার দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুবলকে জিজ্ঞেস করল, 'কাপড় আসেনি তা'হলে?'

সুবল বিরক্ত হয়ে বলল 'না, না, কতবার বলব।'

বাকি দু' তিনটে কাপড়ের দোকান ছিল অন্য গলিতে, বংশী সেগুলিতেও একে একে চেষ্টা ক'রে দেখল। কিন্তু কোন মহাজনের ঘরেই কাপড় নেই। কাপড় চাইতে গেলে সবাই ধমকে উঠে, মারতে আসে। কত ভদ্রলোকের বউঝিরা আছে নেংটা হয়ে, তার চেয়ে ওর বউয়ের লজ্জা হ'ল বেশি।

ঘুরে ঘুরে দিন কেটে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। শেষ পর্যন্ত আজও কোন সুবিধা হ'ল না কাপড়ের। কোন্ মুখে দাঁড়াবে গিয়ে বউয়ের কাছে। চাঁপার কথা মনে হতেই বংশীর সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল। হাঁটতে হাঁটতে বংশী আবার গঞ্জের একেবারে উত্তর প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। এখানে দোকান পাট বেশি নেই। কেবল একটা বিড়ির দোকান, আর একটা সোডালেমনেডের। পিছনে ঘনবদ্ধ কলাগাছের সারি। তার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষীণ কয়েকটি আলোর রশ্মি এসে পড়েছে রাস্তায়। সেদিকে চেয়ে বংশী হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। শহরের পতিতা পল্লী।

ঠিক সেই সময় সুখদাও এল বিড়ি কিনতে। উদ্দেশ্য কেবল বিড়ি কেনাই নয়। নিজেকে বিজ্ঞাপিত করাও। কাল থেকে ঘরে কোন খদ্দের আসে নি। হঠাৎ দেশসুদ্ধ লোক যেন সচ্চরিত্র হয়ে গেছে।

সুখদা যতক্ষণ ধ'রে বিড়ি কিনল, বিড়িওয়ালার সঙ্গে হেসে হেসে রসিকতা করল, বংশী অপলকে তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কমলা রঙের

শাড়ীখানি ভারি চমৎকার মানিয়েছে। সুখদাও তার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে সামনের কলা বাগানের দিকে এগিয়ে গেল।

বংশী খানিকক্ষণ ইতস্তত করল। তারপর দ্রুত পায়ে সুখদার পিছনে পিছনে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। আরও দু-তিনটি মেয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের অতিক্রম ক রে সুখদা বংশীকে একেবারে নিজের ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল, তারপর একটু মিষ্টি হেসে বলল, 'অতক্ষণ ধ'বে কি ভাবছিলে বল দেখি ? যাবো কি যাবো না—নয় ? না এসে কি আর জো আছে !'

তারপর অদ্ভুতভাবে হাসে মেয়েটি।

বংশী বলল. 'জো নেই ?'

'বাবারে বাবা—আবার তর্ক করে। বাইরে কেন, ঘরের ভিতবে এসে যত খুসি তর্ক করো না। কতক্ষণ বসবে ?'

'বেশীক্ষণ নয়।'

'বাব্‌বা ! ও বেলায় দেখি জ্ঞানের নাড়ী খুব টনটনে। তা' যতক্ষণই হোক দু'টাকার কমে কিন্তু পারব না, দেখছ না জিনিসপত্রের কি দর। এসো।'

বংশী পিছনে পিছনে গিয়ে ঘরে ঢুকল। মেঝেতে পাতা বিছানা। সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সুখদা বলল, 'বোস, অমন আড়ষ্ট হয়ে রইলে কেন গো, হাত পা ছড়িয়ে আরাম ক'রে বোসো না।'

বংশী বলল, 'এই তো বসেছি।'

তারপর বংশী ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। টিনের ছোট একটি খুপরী—পাখির খাঁচার মত ঘর। আসবাবপত্রের মধ্যে খানকয়েক বাসন কোসন, পান খাওয়ার সরঞ্জাম, দেয়ালে টাঙানো ছোট মত একখানা আয়না, আর দড়িতে ঝুলানো একখানা জীর্ণ গামছা।

সুখদা তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে হাসল, 'ধন দৌলত দেখছ বুঝি ঘরের। কিছু নেই—ওবারের দুর্ভিক্ষে সব বেচে খেতে হয়েছে। তারপর হ'ল অসুখ'…হঠাৎ সুখদা থেমে গেল, তারপর বলল, 'দেরি করবে না-কি বেশি ? তাহলে কিন্তু আরো বেশি লাগবে।'

বংশী অদ্ভুত একটু হাসল, 'তা হলে আর দেরি করে লাভকি।' সুখদা হাত পেতে বলল, 'তবে—'

বংশী ট্যাঁক থেকে দু'খানা এক টাকার নোট সুখদার হাতে ফেলে দিল।

সুখদা উঠে পড়ল। দড়ি থেকে গামছাটা পেড়ে নিয়ে শাড়ীখানা বদলে সযত্নে

দড়িতে আবার টাঙিয়ে রাখল, তারপর বিছানায় এসে বসল—বলল, 'ওমা, ওদিকে যাচ্ছ কেন?'

বংশী ততক্ষণ এক লাফে উঠে দড়ি থেকে শাড়ীটা পেড়ে বগলে পুরেছে।

সুখদা সেদিকে চেয়ে সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওমা কোথায় যাব গো! এই জন্যই ঘরে এসেছ না কি তুমি।' বংশীকে বিনা বাক্যে দোরের দিকে এগুতে দেখে সুখদা তাকে গিয়ে একেবারে জাপটে ধরল, তারপর খনখনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ও পদ্ম ও বিন্দি—'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বংশী মুখ চেপে ধরল সুখদার, এবং হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে টান দিয়ে তার পরনের গামছা খুলে নিয়ে শক্ত ক'রে মুখ বেঁধে ফেলল। সুখদা হাত দিয়ে সেই বাঁধন খুলবার চেষ্টা করছে দেখে একহাতে তার দুটো হাত জোর ক'রে ধ'রে আর এক হাতে বেড়ায় টাঙানো দড়িটা ছিঁড়ে নিয়ে কষে দু'হাত বেঁধে ফেলল সুখদার। ধস্তা ধস্তিতে সুখদা ততক্ষণে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে গেছে। এতক্ষণে বংশী নিশ্চিন্ত। শাড়ীটা বগলদাবা ক'রে মৃদু হাস্যে একবার সুখদার দিকে তাকাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। চোখের সামনে সেই উলঙ্গ অনাবৃত নারী-দেহ। হঠাৎ এই রকম আর একটা অসহায় দেহ মনে পড়ে গেল। কিন্তু এ যে আরো দুঃসহ আরো কুশ্রী আরো কদর্য। শাড়ী পরবার ধরণে যাকে আঠার উনিশ বছরের যুবতী বলে মনে হয়েছিল, অনাবৃত দেহে তার শিথিল চর্ম প্রৌঢ়ত্ব বেরিয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয় সর্বাঙ্গে চাকা চাকা ক্ষতচিহ্ন, বুকের উপর বিকৃত, বিস্তীর্ণ দুটি মাংসপিণ্ডের মাথায় বড় বড় দু'খানা ঘা থক্ থক করছে।

মুহূর্তকাল আড়ষ্ট কুঞ্চিত দেহে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বংশী। তারপর হঠাৎ দুই চোখ বুজে সেই কমলা রঙের শাড়ীখানা ছুঁড়ে দিল সুখদার কুৎসিত দেহটার ওপরে।

ততক্ষণে পদ্ম আর বৃন্দারা রুদ্ধ দ্বারের কাছে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে আর পিছনে পিছনে এসে পৌঁচেছে থানার নরহরি কনেস্টবল।

সত্যাসত্য

রবিবারের সকাল। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মিশনের বড় হল ঘরটায় পাড়ার গণ্যমান্য ভদ্রলোকের ভিড় বেড়ে চলেছে। রায়বাহাদুর হৃদয়বিকাশ' হিন্দুরক্ষা সমিতির সহ-সম্পাদক জগৎ চৌধুরী, বালিগঞ্জ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিভুতি দত্ত-গুপ্ত, পাড়াব হাইস্কুলেব হেড মাষ্টার হীরেন সোম, একে একে সবাই এসে পৌঁচেছেন। প্রত্যেকেই মিশনের শুভাকাঙ্খী এবং পৃষ্ঠপোষক। কেউ কেউ পরিচালক সমিতির সদস্যও আছেন। সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে প্রত্যেকেরই নানা বৈষয়িক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ থাকে না। রবিবারের এই সময়টাতে তবু খানিকটা অবকাশ মেলে। একটু অসাংসারিক, একটু অবৈষয়িক পরিবেশে মনকে মেলে ধরে তবু খানিকক্ষণ হাঁপ ছাড়া যায়।

চা, সিগারেট, খবরের কাগজ এবং আধা-আধ্যাত্মিক আলোচনায় বৈঠক বেশ জমে উঠেছে। অধ্যক্ষ স্বামী অখিলাত্মানন্দ প্রত্যেককেই স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন; পারিবারিক কুশল সম্বন্ধে ঔৎসুক্য এবং কারো অসুখ-বিসুখের খবর শুনলে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, বিষয়বস্তুভেদে আলোচনার যে দু'তিনটি ধারা চলেছে তার সব-কটির সঙ্গেই নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখছেন, আবার গেরুয়াধারী যে তরুণ টাইপিষ্ট ব্রহ্মচারীটি অফিসের কয়েকখানি জরুরী চিঠিপত্র টাইপ করেছে ফাঁকে ফাঁকে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়ে আসছেন।

কিশোরবয়সী আর একজন নবীন ব্রহ্মচারী এসে ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকল এবং স্বামীজীর সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে জানাল একটি মেয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে।

স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়ে? কি চায়?'

'আমাদের অবলাশ্রমের নাম শুনে এসেছে। আশ্রয় চায়।'

মহিলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক স্বামী প্রকাশানন্দই এসব ব্যাপারের বিধিব্যবস্থা করেন। কিন্তু একটা জরুরী কাজে কাল তিনি শিলং রওনা হয়ে গেছেন। তাঁর স্থানে অফিসিয়েট করার মত সন্ন্যাসী কিংবা ব্রহ্মচারীদের মধ্যে

প্রবীন বিচক্ষণ কেউ বর্তমানে উপস্থিত নেই। স্বামীজী মুহূর্তকাল কি একটু ভেবে বললেন, 'আচ্ছা উপাসনা ঘরের পাশের ঘরটিতে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসতে বলো। একটু পরেই আমি যাচ্ছি।'

ঘাড় নেড়ে সশ্রদ্ধ সম্মতি জানিয়ে ব্রহ্মচারীটি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। কিন্তু চৌকাট পেরোতে না পেরোতেই তার বিস্মিত কণ্ঠ শোনা গেল, 'এই যে, আপনি এখানেই চলে এলেন যে! স্বামীজী আপনাকে ও-ঘরে অপেক্ষা করতে বলছেন, চলুন।' কাতর নারীকণ্ঠে উত্তর এলো, 'অনেকক্ষণ ধরেই যে অপেক্ষা করছি বাবা।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'স্বামীজী ইচ্ছা করলে এ ঘরে ওঁকে আসতে বলতে পারেন। আমাদের সবারই তো চুল এখানে পাকা।'

বিভূতিবাবু বললেন, 'কারো বা দু'আনি, কারো বা দশ আনি এই পার্থক্য।'

স্বামীজী ব্রহ্মচারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, এখানেই নিয়ে এস।'

বয়স বছর তেইশ চব্বিশ হবে। পাড়াগাঁয়ের নিম্নশ্রেণীর মেয়ে বলে প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে যে শারীরিক গড়নকে নিতান্তই ভোঁতা মনে হোত, অমার্জিত রুচি এবং অশিক্ষার পুরু প্রলেপে যে মুখশ্রী চোখেই পড়ত না, কিংবা পড়লেও চোখকে পীড়িতই করত, শীর্ণ এবং রুক্ষ হয়ে হঠাৎ যেন তাতে অদ্ভুত একটু তীক্ষ্নতা এসেছে। ক্লিষ্ট রোগজীর্ণ মুখে এই সামান্য লাবণ্যটুকু নিতান্ত অপ্রত্যাশিত বলেই চোখকে যেন তা একটু অকস্মাৎ বেশিমাত্রায় আকর্ষণ করে।

মেয়েটি একা নয়। ভাঁজকরা ময়লা কাপড়ে জড়ানো একটি শিশুও আছে কোলে। আকৃতি দেখে মনে হয়, বয়স এখনো মাস পোরেনি। পরনে আধ-ময়লা খাটো একখানা শাড়ি। সবুজ লতাপাতার পাড়। কিন্তু এই পাড়টুকু ছাড়া আর কোথাও কোন সধবার লক্ষণ নেই। সমস্ত অঙ্গ নিরাভরণ। সিঁথিতে কি কপালে সিঁদুরের কিছুমাত্র চিহ্ন চোখে পড়ে না। শাড়ির লতানো পাড়টিকে হয় তো সেইজন্যই একটু বিসদৃশ বলে ঠেকে। শাড়ির আঁচল কপাল পর্যন্ত নামেনি। বোধ হয় নামবে না বলে সে চেষ্টাও আর করা হয় নি।

ঘরে ঢুকে মেয়েটি মেঝের উপরই বসতে যাচ্ছিল। স্বামীজী পাশের সরু টুলটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'আহা-হা মাটিতে কেন, ওর ওপরে বসো।'

টুলের এক কোণে গিয়ে মেয়েটি আড়ষ্টভাবে বসলে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোত্থেকে তুমি আসছ মা?'

মেয়েটি বলল, 'ভুবনবাবুর বাড়ি থেকে।'

'ভুবনবাবু কে? তাঁর বাড়িই বা কোথায়?'

'আমি তাঁর ওখানেই ছিলাম।'

স্বামীজী বললেন, 'তাতো বুঝতে পারছি। কিন্তু তিনি থাকেন কোথায়?'

'এই কলকাতাতেই থাকেন বাবা।'

জগৎবাবু অসহিষ্ণুভাবে বললেন, 'আহা কথা কেন বাড়াচ্ছ? কোন রাস্তায় কত নম্বর তাই আমরা জিজ্ঞেস করছি।'

মেয়েটি বলল, 'তা তো জানিনে বাবা।'

জগৎবাবু মেয়েটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'রাস্তার নামও জানো না, নম্বরও জানো না? কতদিন কলকাতায় আছ সত্য ক'রে বল দেখি।'

মেয়েটি মুখ নীচু ক'রে বোধ হয় মনে মনে হিসাব করল তারপর বলল, 'সাত আট মাস।'

জগৎবাবু একটু হাসলেন, 'সাত আট মাস ধ'রে কলকাতায় আছ অথচ যেখানে থাকতে তার ঠিকানা জানো না, একথা কি সত্য ব'লে আমাদের বিশ্বাস করতে বলো। ভুল করেছ। সময়টা আর একটু কম ক'রে বললে ভালো করতে।'

এ কথার জবাব না দিয়ে মেয়েটি মুখ নীচু ক'রে চুপ করেই রইল।

রায় বাহাদুর প্রসঙ্গান্তরে গেলেন. 'আচ্ছা মা, তোমার কোলে ওটি কি? ছেলে, না মেয়ে?'

'ছেলে, বাবা।'

'বেশ, বেশ, দীর্ঘায়ু হোক, স্বাস্থ্যবান হোক, পণ্ডিত হোক, যশস্বী হোক।'

জগৎ চৌধুরী মৃদু হেসে বললেন, 'আর রায়বাহাদুরিটা বাদ পড়ল কেন। ওটা বুঝি পরের ছেলের জন্য কামনা করতে মন সরে না?'

জগৎবাবু রায় বাহাদুরের সমবয়সী এবং বিশিষ্ট বন্ধু। রায় বাহাদুর তীক্ষ্ণ একটু হাসলেন, 'রামঃ, রামঃ, সরকারী খেতাবে আজকাল কি কোন বাহাদুরি আছে ভাই, ও কেবল দশজনের দুয়ো কুড়োবার জন্য। তার চেয়ে জাতকের জন্য জাতির নেতৃত্বপদ কামনা করি। আশীর্ব্বাদের কিছুটাও যদি ফলে, অন্তত উপ বা সহটুকু যদি সঙ্গে থাকে, তাহলেই যথেষ্ট। সভায় সমিতিতে মালা আর হাততালির অভাব হবে না।'

হাস্যের সঙ্গে একটু ভিন্নার্থবোধক উপসর্গের যোগ হচ্ছে দেখে বিভূতিবাবু তাড়াতাড়ি পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে গেলেন, 'ছেলেটি তো তোমার ভারী সুন্দরই হয়েছে দেখতে, আচ্ছা, ওর বাপ কোথায় বাছা?'

মেয়েটি একবার সকলের দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নিচু করল, তারপর মৃদু-কণ্ঠে বলল, 'গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে।'

সকলেই সমস্বরে আপশোষ জানালেন, 'ঈস্‌স্‌, আহাহা।'

একটু পরে জগৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দিন হ'ল? কবে ঘটল এই দুর্ঘটনা?'

'সেও মাস সাতেক হ'ল বাবা। ও তখন তিন মাসের পেটে।'

সকলেই পরস্পরের দিকে তাকালেন।

জগৎবাবু মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'দেখলেন, এবার আর হিসাবে ভুল হয়নি।'

স্বামীজী বললেন, 'আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কেউ এসেছে? কে তোমাকে রেখে গেল ওখানে?

'ভুবনবাবুর মুহুরী।'

'মুহুরী? কই তিনি?'

'চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন? কেন, এতদুর পর্যন্ত সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে পারলেন, আর এইটুকু তাঁর সবুর সইলো না? আমাদের সঙ্গে দেখা না ক'রেই গেলেন? জেনে গেলেন না তোমাকে আমরা রাখি কি না রাখি।'

রায় বাহাদুর বললেন, 'Perhaps that devil himself is the culprit.'

মেয়েটি বলল. 'মুহুরীবাবু বললেন, ওখানে গেলেই তুমি থাকতে পাবে। আমার অনেক কাজ আছে। আমি এখন যাই, আর এসব ব্যাপারে মিশনওয়ালারা নাকি অনেক অকথা কুকথা সব জিজ্ঞাসা করে। বুড়ো ব্রাহ্মণ মানুষ। সে সব আমার কানে সইবেই না।'

আবার সকলে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসলেন। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, সেই ভুবনবাবুর কোন চিঠি আছে তোমার কাছে?'

'না বাবা, চিঠিপত্র তো কিছু নেই।'

'হুঁ, আচ্ছা এতদিন তুমি সেখানে থাকতে পারলে, আর হঠাৎ আজই বা তোমাকে তাঁরা এই আশ্রম দেখিয়ে দিলেন কেন? সেখানেই তো থাকতে পারতে।'

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল, 'গিন্নীমা অবশ্য অনেকদিন আগে থাকতেই চলে যেতে বলছিলেন। শেষে ও যখন হ'ল তখন কিছুতেই আর রাখলেন না। বললেন, আমার অবিয়েত সোমত্ত সব ছেলে। পাড়ার শত্তুররা

এরই মধ্যে কত কি বলাবলি আরম্ভ করেছে। তোমাকে আর আমি রাখতে পারিনে বাছা। তুমি এক আশ্রম-টাশ্রমে গিয়ে থাক।'

জগৎবাবু একটু বিশেষ অর্থবাচক দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকালেন। তারপর একটু মৃদু হেসে আবার সেই মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার গিন্নীমার পাড়ার শত্তুররা যা বলাবলি করত সেটা সত্যি কি মিথ্যা তাই জানতে চাইছি।'

মেয়েটি কোনো জবাব দেবার আগে হঠাৎ হেডমাষ্টার হীরেনবাবু অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন, 'আপনার জ্ঞানের পিপাসা অসাধারণ জগৎবাবু। কিন্তু ব্যাপারটা কি মেয়েটিকে দিয়ে একেবারে স্বীকার না করিয়ে নিলেই নয়। না এই মুখরোচক আলোচনা কিছুতেই ছাড়তে পারছেন না?'

জগৎবাবু ক্রুদ্ধভাবে একবার হেডমাস্টারের দিকে তাকালেন, কিন্তু পরক্ষণেই মুখে অদ্ভুত একটু হাসি টেনে বললেন, 'মাস্টারমশাই, পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপার যদি মাস্টারীর মত অমন সহজ হোত তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না। মুখরোচক আলোচনাটা ছাড়তে পারছি না তা ঠিকই। কারণ সত্য ঘটনা যথাযথ আমাদের জানা দরকার। এ নিয়ে পুলিশের হাঙ্গামা আছে। তাছাড়া কে প্রকৃত দোষী তা জেনে সম্ভব হয় এই প্রতিষ্ঠান থেকে তার প্রতিবিধানও আমরা ক'রে থাকি। আপনাদের মত Puritan হয়ে অন্যায় দুষ্কৃতি দেখে চোখ বুজে থাকি না। শুচিতা রাখতে চাই বলেই শুচিবায়ুতা আমাদের ছাড়তে হয়।'

হীরেনবাবু হাসলেন, 'লোকে বলে মাস্টারেরা নাকি স্কুল ঘরের বাইরেও তাদের মাস্টারীর অভ্যাস ছাড়তে পারে না। সমস্ত পৃথিবীটাকে তারা তাদের পাঠশালা মনে করে। মাস্টারদের তরফ থেকে এ দোষ আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আমার মনে হয়, দোষটা কেবল আমাদের মাস্টারদেরই নয়। অভ্যাসটা সকলেরই আছে। অভিনেতাদের কাছে গোটা জগৎটাই রঙ্গমঞ্চ, আর নেতাদের কাছে বক্তৃতামঞ্চ—এইটুকু যা তফাৎ। সম্পূর্ণ সত্য যখন না জানলে আপনার চলছে না তখন মেয়েটিকে আড়ালে নিয়ে ও সব কথা খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করুন। এই হাটের মধ্যে একটি মেয়েকে এ ধরনের প্রশ্ন করা আপনার শুচিতায় না বাধতে পারে, কিন্তু ভদ্রতায় বাধা উচিত ছিল। স্বামীজী, তার চেয়ে আলাদা নিরিবিলি একটা ঘর দেখিয়ে দিন না জগৎবাবুকে।'

রায় বাহাদুর হেসে উঠলেন, 'এতক্ষণে একটা hit দিয়েছে মাস্টার।'

জগৎবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'হীরেনবাবু, আপনার কুশ্রী এবং অশ্লীল ইঙ্গিতে

আমি অত্যন্ত আপত্তি করছি। এতক্ষণ ধ'রে আপনিই না শুচিতা আর ভদ্রতার বড়াই করছিলেন!'

হীরেনবাবু বললেন, 'কোন কুশ্রী ইঙ্গিত করবার সত্যিই কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল না।'

স্বামীজী বিব্রতভাবে বললেন, 'আঃ কি আরম্ভ করলেন হীরেনবাবু। দয়া ক'রে চুপ করুন। কেন নিজেদের মধ্যে মিছামিছি—বরং আসুন, উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে একটা ইতিকর্তব্যতা ঠিক করা যাক।'

জগৎবাবু বললেন, 'আমি আর ওর মধ্যে নেই মশাই। বিষয়টা যখন আপনারই জুরিস্‌ডিকসনে তখন কি করবেন না করবেন আপনি নিজেই ঠিক করুন। তবে প্রকৃত তথ্য আমাদের জানা দরকার এইটুকু কেবল আমার কথা।'

স্বামীজী বললেন, 'সে তো নিশ্চয়ই।'

তারপর তিনি বিস্মিত এবং বিমূঢ় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সস্নেহে অত্যন্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলা আরম্ভ করলেন, 'শোনো মা, একবার যখন এখানে এসে পড়েছ তোমার আর কোন ভয় নেই, কোনো চিন্তা ভাবনা আর তোমাকে করতে হবে না। ব্যবস্থা সাধ্যমত আমরা করবই। প্রাণ থাকতে কোন অমঙ্গল তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। সব রকমের ব্যবস্থাই এখানে আছে। এখানে মেয়েদের আমরা লেখাপড়া শেখাই—অবশ্য যে যতটুকু গ্রহণ করতে পারে—তারপর আছে হাতের কাজ। যাতে তোমরা নিজেরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পার, ভবিষ্যতে দাসীবৃত্তি কিংবা আর কোন জঘন্য উপায়ের আশ্রয় কিছুতেই যাতে তোমাদের আর না গ্রহণ করতে হয়, সেজন্য আলাদা একটা বাড়ি নিয়ে তাঁত বসিয়েছি সেখানে। ইচ্ছা করলে সেসব কাজ শিখতে পারবে। শীঘ্রই আর একটা কারখানা খোলা হবে যাতে ছোটখাট চামড়ার কাজও শেখাবার ব্যবস্থা করব। তারপর আবার যারা গৃহাশ্রমে ফিরে যেতে চায় তাদের জন্য সে ব্যবস্থাও আছে। দেখে শুনে এসব মেয়েদের ফের আমরা বিয়ে দিয়ে দি। কিন্তু এই আশ্রমে ঢুকবার আগে তোমাকে যে সমস্ত সত্য কথা অকপটে আমাদের কাছে খুলে বলতে হবে মা।'

মেয়েটি বলল, 'খুলে তো আমি সবই বললাম।'

স্বামীজী পূর্ববৎ স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'না মা, সব হয়তো ঠিক বলোনি। বলা যে সহজ নয় তা মানি। কিন্তু কেন বলতে পারবে না? অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমরা কিছু খুলে বলতে পারোনি বলেই তো তোমাদের এই দশা। সংসারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলতে হবে, দোষ তোমাদের নয়, দোষ দুর্বৃত্তদের, দোষ সেই

ভীরু কাপুরুষদের। এখানে তোমার মত অনেকেই আছে মা। যতদূর আমি জেনেছি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের নিজেদের কিছুমাত্র দোষ নেই। কেউ বা অভাবের তাড়নায় নিতান্ত পেটের দায়ে এভাবে স্খলিত হয়েছে, কাউকে বা নিজেরই কোন নিকট আত্মীয় নানা লোভ দেখিয়ে টেনে এনে এই সর্বনাশের পথে নিঃসহায়ভাবে ফেলে গেছে। সব তুমি খুলে বলো, কোন ভয় নেই তোমার, কোন লজ্জার কারণ নেই, সমস্ত লজ্জা আর গ্লানি সেই সুযোগান্বেষী, সুবিধাবাদী পাষণ্ড পুরুষের, তোমার কিসের লজ্জা মা। আচ্ছা, এখানে যদি সংকোচ বোধ কর, তুমি বরং ঐ ঘরে চলো, সেখানে সব কাহিনী খুলে বলবে, দেখি কোন বিধান আমরা করতে পারি কিনা। এসো মা, আমার সঙ্গে বরং ওঘরে চলো—'

মেয়েটি মুখ তুলে একবার সকলের দিকে তাকাল তারপর স্বামীজীর দিকে চেয়ে বলল, 'অন্য ঘরের দরকার নেই, আমি এখানেই সব বলতে পারব।'

স্বামীজী বললেন, 'কিন্তু ও ঘরে গেলেই তো ভালো হয়, এক্ষেত্রে মেয়েদের একটু লজ্জা তো খুবই স্বাভাবিক।'

মেয়েটি শান্তভাবে বলল, 'না আমার কোন লজ্জা করবে না আপনারা যা ভেবেছেন তাই ঠিক। এ ছেলে আমার স্বামীর নয়।'

এই অপ্রত্যাশিত স্বীকারোক্তিতে সকলেই যেন চমকে উঠলেন।

জগৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে কার?'

'তা জানি না' মেয়েটির কণ্ঠে যেন একটু জেদের আভাস।

জগৎবাবু হাসলেন, 'এই তো, আবার মিথ্যা বলতে শুরু করলে! তুমি জানো না সে কি ক'রে সম্ভব? কথায় বলে মনের অগোচরে পাপ নেই আর মায়ের অগোচরে—'

হীরেনবাবু তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই জগৎবাবু তাড়াতাড়ি থেমে গেলেন।

মেয়েটি যেন তৎক্ষণাৎ তার কথার ভুল বুঝতে পারল! একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'অগোচরে থাকবে না কেন, এতো আর একজন দুজন নয়, যে খেয়াল থাকবে।'

জগৎবাবু অর্থব্যঞ্জক ভঙ্গিতে বললেন, 'ও তাই বলো। ক'জন ছিল, কে কে তারা।'

মেয়েটি আর একবার মুখ তুলল। তারপর বেশ সহজ অকুণ্ঠভাবে বলল, 'বাবুর ছেলেরা ছিলেন তিন ভাই—'

জগৎবাবু বলে উঠলেন, 'Good God ! All of them ! আর,—এরপরও আবার কেউ ছিল নাকি ?'

মেয়েটি একবার বুঝি একটু ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'হাঁ, সেই বুড়ো মুহুরীবাবুও।'

রায় বাহাদুর বললেন, 'Just see !'

জগৎবাবু বললেন, 'আশ্চর্য, আর তুমি সকলের অত্যাচারই মুখ বুজে সহ্য ক'রে গেলে, কোথাও সরে আসতে পারলে না ?'

মেয়েটি জগৎবাবুর দিকে সোজাসুজি তাকাল, তারপর বলল, 'স'রেই তো আপনাদের কাছে এলাম বাবু।'

হঠাৎ কথাটা কেমন যেন একটু অশ্লীল ব'লে মনে হ'ল জগৎবাবুর কাছে। কিন্তু তখনই প্রতিবাদ করার মত কোন জবাবও যেন তিনি খুঁজে পেলেন না। এমন কি একটা ধমক পর্যন্ত তার মুখে জোগাল না। তার পরিবর্তে স্বামীজীর দিকে চেয়ে বললেন, 'শুনলেন তো সব। এবার নামধামগুলি জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নিন। তারপর যা ব্যবস্থা হয় করুন। ইতিহাস যা শুনলুম, তাতে তো খুব অসহায় ব'লে মনে হয় না। কিছুদিনের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন, সেই জন্যই বোধ হয় এখানে আসা। চলুন রায় বাহাদুর, বেলা অনেক হ'ল।'

সকলেই উঠে পড়লেন। স্বামীজী তাঁদের পিছনে পিছনে আশ্রমের সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন।

তারপর ফিরে এসে ঘরে ঢুকে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। মেয়েটি শিশু-সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মাঝে মাঝে দু'এক ফোঁটা জল শিশুটির গায়ের ওপর ঝরে পড়ছে।

স্বামীজী একটু যেন চমকে উঠে বললেন, 'কি হ'ল তোমার ছেলের ? অসুখ ছিল নাকি ওর ?'

মেয়েটি জলেভরা দুটি চোখে অসহায়ভাবে স্বামীজীর দিকে তাকাল, 'না বাবা, অসুখ নয়, পরের ওপর রাগ ক'রে আমি যে ওকে অপমান করলাম।'

স্বামীজী বিস্মিত হয়ে বললেন, 'অপমান করলে কি ক'রে ?'

'হাঁ, বাবা। গায়ের রাগে মিথ্যা বানিয়ে বানিয়ে আমি যে ছেলের মান খোয়ালুম, স্বামীর মান খোয়ালুম! আমার যে নরকেও স্থান হবে না বাবা।'

স্বামীজী একটু যেন চমকে উঠলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'না মা, অপমান কেবল তুমি তাদেরই করোনি।'

শ্রীপতির সংসার ত্যাগের কারণ সম্বন্ধে দু'জনের মতভেদটাই প্রথম বছর কয়েক শাশুড়ী বউয়ের ঝগড়ার প্রধান স্থান দখল ক'রেছিল। অন্য কোন তুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে কথান্তর আরম্ভ হলেও কলহটা তুমুল হয়ে উঠত সেই পুরাতন এবং অপরিবর্তনীয় মতানৈক্যে।

হেমাঙ্গিনী বলতেন, 'তোর জন্যই তো এমন হ'ল, দিনরাত কেবল খাই খাই, দাও দাও করেই তো বাছাকে তুই ভিটেছাড়া করলি, না হ'লে এমন ভরা সংসার এমন কচি কচি ছেলে মেয়ে ফেলে কেউ বিবাগী হয়ে পথে বেরোয়? এই কি তার বিবাগী হওয়ার বয়স?'

পুত্রবধূ সরমা জবাব দিত, 'ঘর যে সে কার জন্য ছেড়েছে সে কথা দেশসুদ্ধ লোক জানে, রাতদিন তো কেবল এই মন্ত্র দিয়েছো বউয়ের এটা ভালো না ওটা খারাপ, খাওয়ার জিনিস দেখলে জিভ দিয়ে জল পড়ে, পরপুরুষ দেখলে চোখের পলক পড়ে না। সতীন হয়েও যা মানুষের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারে না, শাশুড়ী হয়ে তুমি তাই করেছ। ঘেন্নায় মরে যাই। এখন মন্ত্র জপ না কানে, মনের সাধে ঘর কর না ছেলে নিয়ে! আমি যদি তাকে ঘরছাড়া ক'রে থাকি, বেশ করেছি উচিত করেছি।'

হেমাঙ্গিনী প্রতিবাদ ক'রে বলতেন, 'এ সব কথা আমি বলেছি? তোর নিজের মনে আছে পাপ, আর বদনাম দিচ্ছিস আমার নামে, হে ভগবান, হে আকাশের চন্দ্র সূর্য তোমরাই সাক্ষী।'

সরমা এর পর হঠাৎ একটু হাসত, 'থাক, থাক, তাদের চেয়েও বড় সাক্ষী আছে আমার দুটো কান, তবু যদি নিজের কানে না শুনতাম।'

হেমাঙ্গিনী এক মুহূর্ত অবাক হয়ে পুত্রবধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। ঝগড়ার মাঝখানে কণ্ঠকে নীচু পর্দায় নামিয়ে এমন মধুর করে একটু হাসবার অপূর্ব কৌশল শুধু যে তিনিই জানেন না তাই নয়, সরমা ছাড়া আর কাউকে এমন কৌশল অবলম্বন করতে তিনি দেখেনও নি। কিন্তু না দেখলে হবে কি, এটুকু তাঁর বুঝতে বাকি থাকত না যে এই এককফোঁটা হাসির কাছে তাঁর সমস্ত ঝাঁঝালো কটুবাক্যই নিতান্ত জোলো এবং হাস্যকর হয়ে গেছে।

কিন্তু দু'একটি বছর ঘুরে আসতে না আসতেই ঝগড়ার বিষয়টা বদলাতে শুরু করল। শ্রীপতির কথা প্রায় ওঠেই না। সরমা আজকাল বলে, 'লজ্জা করা উচিত। আমার বাবা হাত তুলে দু'মুঠো দেয় তবে এক সন্ধ্যা জোটে। এর পরও জোট বেঁধে ঝগড়া করতে আসতে আমি তো পারতুম না। একবার ভেবে দেখতুম এতখানি গলার জোর কার ভাতের জোরে।'

কথাগুলি হেমাঙ্গিনীর বুকে গিয়ে বাজে। একমুহূর্ত তিনি যেন কথা খুঁজে পান না। তারপর আবার শুরু করেন, 'থাক বড়লোক বাবার বড়াই আর করিসনে, মাস অন্তে পাঠায় তো দশটি টাকা, তাতে তো আর তোর ছেলে মেয়েরই কুলোয় না, তা আবার অন্যে খাবে। কত বড় অন্তর কত বড় বিবেচনা তোর বাপের। ও গল্প পাড়ায় গিয়ে করিস, আমার কাছে করতে আসিস না। আমি আমার স্বামী শ্বশুরের ভিটায় থাকি। তাঁরা যা রেখে গেছেন তাতেই আমার চলে। তোর বাপের খরচ তুই-ই খাস আর কেউ তা বাঁ পাওেও ছোঁয় না।'

স্বামী-শ্বশুরের সম্পত্তি হিসাবে বিঘা তিন চারেক ধানী জমি, বাড়ীর লাগা একটা বাঁশঝাড় এদের আছে। ধান যা পাওয়া যায় তাতে মাত্র বছরের মাস দুই অড়াই যায়, আর বাঁশঝাড়ের বাঁশ বিক্রি করেও সামান্য কিছু হয়। না হ'লে কেবল সরমার বাবা হীরালাল বোসের প্রেরিত দশটি টাকায় চারটি ছেলেমেয়ে এবং দুটি স্ত্রীলোকের চলবার কথা নয়। সরমাও তা বোঝে। সত্যি বলতে কি সচ্ছল পিতা তার সম্বন্ধে যে এমন অবিবেচক এবং কৃপণ হবেন তা সে ধারণায় আনতে পারে নি। পাছে সে আরও টাকা দাবী করে কিংবা ছেলেমেয়ে নিয়ে দু-চার মাস বাপের বাড়িতে আসবার ইচ্ছা জানায় সেই ভয়েই যে তার বাবা এই বছর কয়েকের মধ্যে একবার এসে খোঁজটি পর্যন্ত করেন নি তা সে জানে। এর জন্যে বাপকেও সে ক্ষমা করে না। বাপের বাড়ীর সম্পর্কে অন্য যে দু'একজন আত্মীয়স্বজন আছে. তাদের সঙ্গে কদাচিৎ দেখা সাক্ষাৎ কি চিঠিপত্রের বিনিময় হলে বাপের হৃদয়হীনতা সে নির্মমভাবেই সকলের কাছে প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু হেমাঙ্গিনীকে খোঁটা দেওয়ার সময় এই টাকাই হাজার টাকার কাজে আসে। আর এই সব কথা প্রায়ই তোলে খাওয়ার সময়। সংসারের সমস্ত কাজকর্ম সেরে সরমার ছেলেমেয়েদের নাইয়ে খাইয়ে দিয়ে বেলা দুটো আড়াইটেয় হেমাঙ্গিনী যখন হবিষ্য করতে বসবেন; সরমা যেন সেই সময়টার দিকে তাক করে থাকে। এমন দিন খুব কমই যায় যেদিন ভাতের পাথরে হেমাঙ্গিনীর চোখের জল পড়ে না।

সরমার নির্বিকারভাবে নিজের এই নির্মমতা উপভোগ করে। তার কথার

ঝাজে হেমাঙ্গিনীর মত মানুষেরও যে চোখ দিয়ে জল বেরোয় এ যেন সরমার এক পরম কৃতিত্ব। যে ক্রুর ভাগ্য তার সঙ্গে নিষ্ঠুর খেলা খেলেছে তার প্রতিনিধি যেন সমস্ত একমাত্র হেমাঙ্গিনী। সমস্ত অন্যায় সমস্ত অবিচারের প্রতিশোধ হেমাঙ্গিনীকে নির্যাতনের দ্বারাই যেন নিবৃত্ত হবে। আর যদি কোন দোষ তাঁর না-ও থাকে, এই তো যথেষ্ট যে শ্রীপতিরই মা হেমাঙ্গিনী, যে শ্রীপতি চারটি শিশুসন্তান আর নিঃসহায় যুবতী স্ত্রীকে এমন ক'রে ফেলে রেখে বেরিয়ে যেতে পারে! কী এমন পাপ করেছে সরমা যে তার জীবন এমন ক'রে ব্যর্থ হয়ে গেল? এ প্রশ্নের জবাব যে-ভাবেই হোক শ্রীপতির মা হেমাঙ্গিনীর কাছ থেকেই সরমা আদায় করে ছাড়বে। কেন না শ্রীপতিকে জিজ্ঞেস ক'রে এর কোন উত্তর মেলে নি। সম্পর্কিত এক দেবরকে সঙ্গে ক'রে শ্রীপতির আশ্রম পর্যন্ত সরমা ধাওয়া ক'রেছিল। স্বামীর সহস্র বাধা সত্ত্বেও তাঁর পায়ের উপর মুখ রেখে সরমা জিজ্ঞেস ক'রেছিল, 'সত্যি ক'রে আমার গা ছুঁয়ে বল, কি দোষে তুমি ঘর ছাড়লে? কী দোষ দেখলে তুমি আমার?'

মাথা মুড়ে, কষায় বস্ত্র পরে শ্রীপতি তার কিছুদিন আগে সন্ন্যাস নিয়েছে। সন্ন্যাসজীবনোচিত শান্ত কণ্ঠে এবং স্মিতহাস্যে সে জবাব দিয়েছিল, 'তোমার তো কোন দোষ নেই সরমা?'

'তবে মা যে বলেন আমার স্বভাবচরিত্রে তোমার সন্দেহ এসেছিল। বল, তোমাকে ছাড়া এমন কোন পুরুষের সঙ্গে—'

শ্রীপতি জবাব দিয়েছিল, 'ছিঃ, মার ধারণা অত্যন্ত ভুল।'

সরমা কিছুটা আশান্বিত হয়ে বলেছিল, 'তবে? টাকা-পয়সা জিনিষপত্রের জন্য তোমাকে মাঝে মাঝে বিরক্ত করেছি বলেই কি—কিন্তু সে তো তোমার ছেলে-মেয়েদের জন্য, তোমার সংসারের জন্য। আচ্ছা, তুমি ফিরে চল। আমি আর কোন কিছু যদি তোমার কাছে চাই। তুমি শুধু ফিরে চল।'

শ্রীপতি তেমনি স্মিতহাস্যে বলেছিল, 'এ তোমার অত্যন্ত ছেলে-মানুষের মত কথা হ'ল সরমা। সংসারী মানুষ তো ওসব চাইবেই। তুমি নিশ্চিন্ত থেক, আমি যে সংসার ত্যাগ করেছি সে তোমার কোন দোষে নয়। কোন সাংসারিক কারণেও নয়।'

'তবে কেন তুমি এমন ক'রে চলে এলে?'

'সে কথা বুঝবার সময় তোমার এখনো আসেনি সরমা।'

দুঃসহ ক্রোধে সরমার সমস্ত গা জ্বলে গেছে, 'বেশ তো, আমার সেই বুঝতে পারার সময় পর্যন্তই না হয় তুমি অপেক্ষা করতে।'

'তুমি ধৈর্য হারাচ্ছ সরমা, ফিরে যাও। সংসারে কার জন্য কে অপেক্ষা করতে পারে।'

কিন্তু কারো না কারো জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া সমাজ আর ধর্ম কি শিখিয়েছে সরমাকে? ফিরে এসে সরমা শাশুড়ীর সঙ্গে আর এক চোট ঝগড়া করেছিল। তার আর কোন অস্ত্র নেই, শুধু জিহ্বা, আর কোন শত্রু নেই, শুধু হেমাঙ্গিনী।

কিন্তু মনে হাজার রাগ থাকলেও চব্বিশ ঘণ্টা আর মানুষ ঝগড়া ক'রে কাটাতে পারে না। বরং পরম শত্রু নিয়েও মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একত্র বসবাস করতে হ'লে জীবনযাত্রার প্রয়োজনে তার সঙ্গেও শত্রুতা ছাড়া আর এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, হেমাঙ্গিনী আর সরমার মধ্যেও তেমন একটা সম্পর্কের সূচনা দেখা যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে দেশে খাদ্যাভাব ঘটল। অভাব যত বাড়তে লাগল, দুজনার মধ্য ঝগড়াও তত প্রচণ্ড হয়ে উঠল। ঝাড়ের বাঁশ এবং এবং ভিটা ঘাটার গাছপালা বিক্রির টাকার সঙ্গে বাপের দেওয়া দশটাকা ভাতা যোগ ক'রেও যখন ছেলেমেয়েগুলির সামনে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল, তখন সরমার দৃষ্টি গেল হেমাঙ্গিনীর ওপর, কী প্রয়োজন আছে এই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির বেঁচে থাকবার? সরমার ছেলেমেয়েদের মুখের গ্রাসে ভাগ বসানো ছাড়া সংসারে বেঁচে থেকে সে আর কোন্ কাজটা করছে? আর যদি বাঁচবার এত সাধই থাকে, অন্য কোথাও গিয়ে বাঁচুক না? হেমাঙ্গিনীর ভগ্নীপতি আছে, বোনপো আছে. সেখানে গিয়ে কাটিয়ে আসুক না দু'মাস?

সরমা একথা পরামর্শচ্ছলে হেমাঙ্গিনীকে দিন দুয়েক বলেওছে। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর কোন পা বাড়াবার লক্ষণ দেখা যায়নি। আরও একদিন প্রস্তাবটা তুলতেই হেমাঙ্গিনী ঝাঁজিয়ে উঠলেন, 'আমি যে তোর দু'চক্ষে কাঁটা তাতো অনেক দিন থেকেই জানি। একবেলা যে এক মুঠো হবিষ্যি করি তাও তোর প্রাণে সয় না। কেন যাব অন্য কোথাও? আমি কি তোর খাই না পরি?'

সরমা কিছু বলবার আগে জবাব দিয়েছে কণা. সরমার বছর দশেকের মেয়ে, 'শোন মা. ঠাকুরমার কথা শোন, বলে একমুঠো হবিষ্যি করি। রোজ টুরি মেপে মেপে তুমি যে আধসের ক'রে চাল নাও, তাও যেন আমরা আর দেখি না?'

সরমা মুখ টিপে হেসেছে, 'তুই চুপ কর কণি।'

'হ্যাঁ মা, সত্যি। আমি রোজ দেখি।'

হেমাঙ্গিনী কিছুক্ষণ বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে রয়েছেন, তারপর জবাব দিয়েছেন 'তা তো দেখবিই। সাপের পেটে সাপ ছাড়া আর কি হবে। কথাটা মেয়েকে শিখিয়ে না দিয়ে নিজে বললেই হ'ত।' কণার কথায় সরমা মনে মনে যে একটু লজ্জিত না হয়েছিল তা নয়, কিন্তু হেমাঙ্গিনীর মিথ্যা অপবাদে সেই লজ্জা ক্রোধে রূপান্তরিত হ'তে সময় লাগেনি, 'শিখিয়ে দিয়েছি ? বেশ! হাজারবার শেখাবো। তোমার সহ্য হয় থাকো না হয় চলে যাও। ছেলেমেয়েদের কিছু শেখাতে হয় না। ওরা যা দেখে তাই বলে।'

সে-দিনই রাত্রে আবার এই খাওয়া নিয়ে ঝগড়া বাধল। শোয়ার আগে হাঁড়ি কুড়ি ঝেড়ে কোত্থেকে একমুঠো খই সংগ্রহ ক'রে নিয়ে তাই দিয়ে জল খেতে বসেছেন হেমাঙ্গিনী। সরমা দেখে বলল, 'তবে যে বিকালে বললেন, খই ফুরিয়ে গেছে। খাব খাব বলে ছেলেটা অত কাঁদল, একটা কিছু তার হাতে দিতে পারলাম না। দিলেই হত একমুঠো খই তাকে।'

হেমাঙ্গিনী খইসুদ্ধ বাটিটা ঘরের একধার থেকে আর একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, 'খা, খা, প্রাণের সাধ মিটিয়ে খা।'

ক্ষোভে দুঃখে হেমাঙ্গিনীর ঘুম এলো না। কেবলি মনে হ'তে লাগল—আর কেন। কিসের মায়ায় তিনি এখানে পড়ে আছেন ? তাঁর ছেলে সংসার ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও তো সমস্ত বন্ধন খসে পড়েছে। তিনি না বুঝে এই সব নাতি-নাতনীদের আপন মনে ক'রে মিথ্যা মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে রয়েছেন। অথচ কেউ এরা তাঁর নয়। এই মুহূর্তে সংসারে কারো জন্যই কিছুমাত্র আকর্ষণ হেমাঙ্গিনী অনুভব করলেন না। বরং তাঁর আশংকা হ'তে লাগল এখানে নিজের বাড়ী-ঘরেই তাঁকে উপোস ক'রে মরতে হবে। যেমন সরমা তেমনি তার ছেলেমেয়ের দল! সাপের পেটে আর কতকগুলি সাপ এসে জন্মেছে।

ভোরে উঠে তিনি পাড়ায় বেরুবেন। সরকারদের বড় গিন্নী তাঁরই সমবয়সী। একই বছরে বউ হ'য়ে গ্রামে তাঁরা ঢুকেছিলেন। এ পাড়ায় তাঁকে হেমাঙ্গিনী এক-মাত্র ব্যথার ব্যথী মনে করেন। আর সবাইকেই তিনি চেনেন। সাক্ষাতে বন্দনা অসাক্ষাতে নিন্দা করতে তাদের জুড়ি নেই।

হেমাঙ্গিনী কেঁদে বললেন, 'আজ দু'দিন ধ'রে আমার সমানে উপবাস যাচ্ছে বিশুর মা! শত্রুরা আমাকে না খাইয়ে খাইয়ে মারবে।'

কলকাতা থেকে বিশু দিন কয়েক আগে ছুটি নিয়ে এসেছিল বাড়ী। সমস্ত শুনে সে বলল, 'আমার কথা শুনবেন খুড়ী মা! তাহলে তো একটা ব্যবস্থা হ'তে পারে।'

হেমাঙ্গিনী বললেন, 'শুনব বাবা শুনব। তুই যা আমাকে করতে বলিস তাই করব।'

বিশু একটু ভেবে বলল, 'তাহ'লে আর দেরি নয়। চলুন আপনি আমার সঙ্গে কলকাতায়। সেখানে খিদিরপুর অঞ্চলে আমি যাঁদের কাজ করি তাঁরা এক অনাথ-আশ্রমে খুলেছেন। মা-বাপ হারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সেখানে খেতে পরতে দেওয়া হয়। তাদের তত্ত্বধানের জন্য একজন খুব ভদ্রঘরের বয়স্কা স্ত্রীলোক ওঁরা খুঁজছিলেন। আপনাকে সেখানে আমি ঠিক ক'রে দেব। খোরাক পোষাক বাদে মাইনেও পাবেন পনের বিশ টাকা। আপনার কোন ইতস্তত করবার কিছু নেই, বেশ সম্মানের কাজ, তাছাড়া আমি তো আছি।'

হেমাঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ বললেন, 'তাই নিয়ে চল্ বাবা, এই শত্রুপুরীতে আর নয়।'

তবু যাওয়ার সময় চোখ দিয়ে জল বেরুল হেমাঙ্গিনীর। স্বামী-শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে এই যে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তাকে বেরুতে হ'ল, এর মধ্যে পরাজয়ের অবমাননার কথা তিনি ভুলতে পারলেন না। পুত্রবধুর সঙ্গে তিনি পেরে উঠলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁকেও সে বাড়ির বের করে ছাড়ল। যাওয়ায় সময় তিনি সরমাকে বলে গেলেন, 'এবার মিটেছে তো মনের সাধ? আমার ছেলেকে ভিটা ছাড়া ক'রেছিস আজ আমাকেও করলি। এবার মনের সুখে থাক্ একেশ্বর হয়ে। যা খুসী তাই করতে পারবি, কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু আকাশে এখনো চন্দ্র সূর্য ওঠে তার'ই সাক্ষী থাকবে। যে আশায় আমাকে তাড়ালি সে আশায় যেন ছাই পড়ে; ছাই পড়ে, ছাই পড়ে।'

আজ গাড়ী ধরবার জন্য নৌকায় করে যেতে যেতে হেমাঙ্গিনীর মনে হ'তে লাগল সমস্ত পৃথিবী যেন শূন্য হ'য়ে গেছে। কোন আনন্দ নেই, স্বাদ নেই জীবনে।

মাসখানেকের মধ্যে দুর্ভিক্ষ চরম রূপ গ্রহণ করল। চালের মণ ষাট টাকা সত্তর টাকা; তাও সর্বত্র পাওয়া যায় না। ঘরে সোনা রূপা সামান্য যা অবশিষ্ট ছিল তা বিক্রী ক'রে কাল পর্যন্ত চলেছে। থালা ঘটি বাটি কিছু বলতে আর নেই ঘরে। তবু সরমা ভোরে উঠে মাটীর হাঁড়ি কুড়িগুলি নেড়ে চেড়ে দেখছে, মনের ভুলে কোথাও যদি কিছু রেখে থাকে।

এই সময় পোষ্ট অফিসের পিওন এসে হাঁকল 'সরমাবালা দত্তের মণিঅর্ডার আছে।' ছেলেমেয়েগুলি কলস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'মা, মা, এসো শিগগির টাকা

এসেছে।' পড়ি কি মরি ক'রে মই বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এল সরমা। 'বাবা টাকা পাঠিয়েছে বুঝি?'

না, সরমার বাবা নয়, টাকা পাঠিয়েছেন হেমাঙ্গিনী। কুড়ি টাকা মণি অর্ডার ক'রেছেন। টাকাটা সই ক'রে রেখে তাড়াতাড়ি কুপনখানা নিয়ে পড়তে বসল সরমা।

দেশের অবস্থার কথা সব হেমাঙ্গিনী শুনেছেন। অনাথ আশ্রমের একটি ছেলে রোজ তাঁকে খবরের কাগজ প'ড়ে শোনায়। তার মুখ ঠিক সরমার বড় ছেলে খোকনের মত। সরমা আর তার ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে চোখে ঘুম হয় না হেমাঙ্গিনীর। মাইনে পেয়েই সমস্ত টাকাটা তাদের জন্য তিনি পাঠিয়ে দিলেন। হেমাঙ্গিনীর জন্য ভাবনা নেই। তাঁর ওখানে কোন খরচই লাগে না। তিনি বিশুকে ব'লে আর কয়েক দিনের মধ্যেই আর কিছু টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। সরমা যেন ছেলেপুলে নিয়ে সাবধানে থাকে। কোন চিন্তা ভাবনা যেন না করে সরমা। হেমাঙ্গিনী বেঁচে থাকতে সরমার ভয় কিসের?

হেমাঙ্গিনীর এমন স্নেহ আর সহৃদয়তা সরমার অপ্রত্যাশিত। এই টাকা কয়টী না পেলে ছেলেপুলে নিয়ে উপোস করা ছাড়া আজ আর সরমার সত্যিই গতি ছিল না। সমস্ত রাত আর সকাল ভাবনায় কাটাবার পর এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করল সরমা। তারপর নিরুদ্বেগ স্বস্তির মধ্যে শাশুড়ির লেখা কুপনটা আর একবার পড়ল। পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা লাইনে সরমার চোখ থেকে গেল, হেমাঙ্গিনী বেঁচে থাকতে সরমার ভয় কিসের, বুড়ী শাশুড়ী বিদেশে গিয়ে মাত্র কুড়ি টাকার মাইনের চাক্‌রির জোরে ঠিক পুরুষ মানুষের মত, সরমার স্বামী শ্রীপতির মতই তাকে আজ ভরসা দিচ্ছেন হেমাঙ্গিনী বেঁচে থাকতে সরমার ভয় কিসের? এর আগে শাশুড়ীর অনেক সহজ সরল প্রশ্নের বেশ কড়া কড়া বাঁকা বাঁকা জবাব দিয়েছে সরমা কিন্তু আজকের প্রশ্ন তাকে একেবারে নিরুত্তর ক'রে ছেড়েছে, এর চেয়ে চলে আসুন হেমাঙ্গিনী বাড়ী থাকুন তার নাতি-নাতনী নিয়ে। নির্বিবাদে সব তিনি ভোগ করুন, সরমা আর কিছু চায় না কেবল সেই অনাথ আশ্রমের চাকরিটি চায়? কি মাসে এমনি ক'রে হেমাঙ্গিনীর নামে সে টাকা পাঠাবে আর একটি মাত্র লাইন লিখবে কুপনে, সরমা বেঁচে থাকতে হেমাঙ্গিনীর ভয় কিসের।

সন্ধ্যার অন্ধকারে জৈনুদ্দিন শহরের গলিতে গলিতে সুন্দর মুখ অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল। আনারসের চালান নিয়ে ভিন্ন জেলা থেকে যে যুবক মহাজনটি খালের ঘাটে এসে নৌকা ভিড়িয়েছে তার ভিতরে ভিতরে রস যে টলমল করছে এ কথা মাত্র ঘণ্টাখানেকের আলাপেই টের পেয়েছে জৈনুদ্দিন। যুবক কাঞ্চন মিঞা এ ভরসাও দিয়েছে যে টাকা-পয়সার জন্য জৈনুদ্দিন যেন না ঘাবড়ায়। হেসে বলেছে, 'সাহেব, কৃপণ লোক কি আর আনারস খেতে পারে? অনেক ফেলে ছড়িয়ে তবে না রস?'

সুতরাং রস সংগ্রহের ব্যাপারে জৈনুদ্দিন কিছু বিশেষ মনোযোগই দিয়েছে আজ। বেশ উৎসাহই লাগছে। টাকা-পয়সার কথা ছেড়ে দিলেও পরকে এ রসের কেবল জোগান দেওয়াতেও কম সুখ নেই।

গলিতে ঢুকতেই থানার এক সেপাইয়ের সঙ্গে দেখা। সেপাই মুচকি হেসে বলল, 'কি মিঞা খবর কি? অমন করে কি খুঁজে বেড়াচ্ছ, কোন জহরৎ-টহরৎ হারাল নাকি?'

জৈনুদ্দিন বলল, 'আজ্ঞে বলেছেন ভালো, হেঃ হেঃ হেঃ! জহরৎই খুঁজছি বটে।' সেপাই হাসল, 'কিন্তু জহরৎ পেলেই বা তোমার কি লাভ? দেবে তো অন্যকে। তুমি মিঞা কেবল নারকেলের ছোবড়া ছাড়িয়েই গেলে, ভিতরটা আর ভেঙে দেখলে না। যাই হোক জহরৎ টহরৎ কিছু পেয়ে গেলে গরীবকে ভুলো না।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'আজ্ঞে তাই কি পারি? আপনাদের মেহেরবানীতেই তো আছি।'

জৈনুদ্দিনের মনে পড়ল আগে এই সব থানার লোকদের কি রকম ভয়টাই না সে করত। দুর দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে তার বুক কাঁপত, কারো সঙ্গে রঙ্গ-পরিহাস করা তো দুরের কথা। কিন্তু এই বছর দেড়েকের অভিজ্ঞতার এদের সঙ্গে ভাব রাখার কৌশলটা সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। কোন ভয় আর তার নেই। জেলা শহরের গণ্যমান্য অনেক লোকের সঙ্গে তার গোপন আলাপ, এমন কি

দোস্তী পর্যন্ত হয়েছে। সেই সব দিনের কথা জৈমুদ্দিন প্রায় ভুলেই গেছে যখন ছত্রিশ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে এই জেলা শহরের লঙ্গরখানার সামনে এসে তিন দিন মড়ার মত পড়েছিল। মাছের বাজারে এক ভদ্রলোকের পকেট কাটতে গিয়ে পাঁজরের একখানা হাড় যে প্রায় ভেঙ্গে যাওয়ার উদ্যোগ হয়েছিল সে কথাটাও জৈমুদ্দিন তেমন করে মনে রাখতে পারেনি। কদাচিৎ এক আধ সময় ব্যথাটা হয়ত একটু একটু এখনও লাগে কিন্তু আর পাঁচ জনের মত সেই ইতিহাসটা জৈমুদ্দিনেরও আর সব সময় মনে পড়ে না।

জহরৎরা এর আগে শহরের কেবল কয়েকটা জায়গাতেই বাসা বেঁধে থাকত। কিন্তু কিছু কালের মধ্যে তারা প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও গোপনে, কোথায় আধা-আধি, কোথাও পুরোপুরি। দেখতে দেখতে দেখতে শহরের এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় এসে পড়ল, পছন্দ মত মুখ আর মেলে না। কাঞ্চন মিঞার প্রমোদের সামগ্রী তো নয় যেন নিজের জন্যই কনে খুঁজে বেড়াচ্ছে জৈমুদ্দিন। এত খুঁৎ-খুঁৎ!—এক সময় তার নিজেরই হাসি পেল।

রাস্তার দুপাশের প্রত্যেকটি মুখের ওপর তীক্ষ্ণ চোখ ফেলতে ফেলতে হঠাৎ একখানি মুখে জৈমুদ্দিনের দৃষ্টি একেবারে নিবদ্ধ হয়ে রইল। পলক যেন আর পড়তে চায় না। এ মুখ অত্যধিক সুন্দর নয়, কিন্তু অতিমাত্রায় পরিচিত।
জৈমুদ্দিনকে চিনতে পেরে ফতেমারও হৃৎস্পন্দন যেন মুহূর্তকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সপ্রতিভভাবে ফতেমা বেশ শক্ত হ'য়ে দাঁড়াল, যেন জৈমুদ্দিনকে লক্ষ্যই করেনি।

জৈমুদ্দিন একবার ভাবল চলে যায়। কিন্তু চিনে যখন ফেলেছেই পালিয়ে কি লাভ? তাছাড়া ফতেমার সঙ্গে কথা বলবার একটা দুর্দম ইচ্ছা জৈমুদ্দিনকে ভিতরে ভিতরে অস্থির করে তুলল। কিন্তু জৈমুদ্দিন এগিয়ে যেতেই ফতেমা মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করল।

জৈমুদ্দিন পিছন থেকে ডেকে বলল, 'শোন।'

ফতেমা ফিরে তাকাল, কঠিন স্বরে বলল, 'কি?'

জৈমুদ্দিন বলল, 'এখানে এলে কবে? তুমি না শেষে বুড়া অবদুল খাঁর সঙ্গে নিকা বসেছিলে?'

ফতেমা তীক্ষ্ণ একটু হাসল, 'নিকা তো একসময় তোমার সঙ্গেও বসেছিলাম মিঞা।'

জৈনুদ্দিন একটু কাল চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'ভিতরে চল কথা আছে।'

ফতেমা রুক্ষ স্বরে বলল, 'না।'

'না কেন ? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? ঘরে ঢুকে তোমাব জিনিষপত্র লুটে নিয়ে পালাব, না ?'

ফতেমা বলল, 'আর যাওয়ার সময় গলা টিপেও রেখে যেতে পার। তোমার অসাধ্য কাজ নেই।'

জৈনুদ্দিন ক্রূর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বটে! কিন্তু তোমার সাধ্যটাও তো বিবি কম দেখছি না।'

ফতেমা আবার ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল, জৈনুদ্দিন ব্যঙ্গ ক'রে বলল, 'আহা হা বিবি গোসা ক'রে নিজের ক্ষতি করছ কেন, তার চেয়ে আমিই যাচ্ছি', বলে জৈনুদ্দিন সত্যই সরে গেল।

পাশের মেয়েটি বলল, 'ও ফতি, খদ্দেরকে ঝগড়া করে তাড়ালি কেন ?'

ফতেমা বলল, 'তাড়াব না ? ও যে এককালে আমার সোয়ামী ছিল রে!'

'তাই না কি ? তা হলে তো আরো জমতো ভালো।'

ফতেমা অদ্ভুত একটু হাসল, 'হাঁ তাতো জমতই।'

জমাবার চেষ্টা আরম্ভ ক'রেছিল জৈনুদ্দিন আজ নয়, আরো বছর সাতেক আগে। তার দাদা মৈনুদ্দিন ফতেমাকে বিয়ে ক'রে আনার সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর জৈনুদ্দিনের চোখ পড়েছিল। মেটে কলসী কাঁখে ঘাট থেকে যখন ফতেমা জল নিয়ে ফিরত সেই চোখ তাকে অনুসরণ করতে করতে আসত। ঢেঁকিতে যখন ধান ভানত ফতেমা, বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে সেই চোখ তার চঞ্চল ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে থাকত। কেবল নীরব দৃষ্টিতেই নয়, আড়ালে আবডালে পেয়ে ফতেমার কাছে ভাষা দিয়েও জৈনুদ্দিন নিজের সেই দৃষ্টির ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে।

'ভাবী সাব, আমার চোখে ভারী সুন্দর লাগে তোমাকে।'

ফতেমা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, 'খবরটা তোমার মিঞা ভাইকে একবার দিয়ে দেখব।'

'ভাবী সাব, তোমার ভিতরটা কি কাঠ ?'

'তোমার মিঞা ভাইকে জিজ্ঞেস কোরো।'

কিন্তু মিঞা ভাইর দোহাই বেশীদিন চলল না। পাঁচ বছরের মাথায় নিমু-নিয়ায় মৈনুদ্দিনের মৃত্যু হ'ল। মাসখানেক যেতে না যেতেই ফতেমার বাপ ইব্রাহিম কারিগর নিকা দেওয়ার জন্য সম্বন্ধ দেখছে, জৈনুদ্দিন গিয়ে বলল, 'ভাবী-সাব, মিঞা ভাই তো ফাঁকি দিয়েই গেল। খোদার ইচ্ছার ওপর তো মানুষের আর জোর থাকে না! জোর জুলুম মানুষের আপন জনের ওপরই চলে।'

কথার ভাব বুঝতে পেরে ফতেমা আরক্ত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর বলল, 'নিকা করবার আমার আর কোথাও ইচ্ছা নেই রাঙা মিঞা। কিন্তু তুমি যদি ভরসা দাও এই বাড়ীতেই আমি থাকতে পারি।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'তোমার বাড়ী তোমার ঘর, এ ছেড়ে তুমি যাবে কোথায়। কিন্তু পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলতে পারে। এই জন্যেই দু'দশ টাকা ব্যয় ক'রে কেবল মোল্লা মুন্সীদের মুখটা বন্ধ ক'রে রাখা!'

ফতেমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ভাবল। কেবল ঠাট্টা ইয়ার্কি নয়। সাময়িক ইচ্ছা-পূরণ নয়। জৈনুদ্দিন সঙ্গতভাবে নিজে যেচে তাকে বিয়ে করতে চাইছে।

এই অনুরাগকে সন্দেহ করা যায় না, এই ভালোবাসার ওপর সারাজীবন নির্ভর ক'রে থাকতে সাধ যায়। এমন আপনজন ক'জন মেলে সংসারে?

ফতেমা বলল, 'কিন্তু তোমার নিজেরও তো পরিবার আছে, ছেলে-মেয়ে হয়েছে রাঙা মিঞা।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'থাকলেই বা। আমার বাজানের কয় বিবি ছিল জানো? চার জন। পুরোপুরি একহালি। শেষ রাতে উঠে আমার চার মা তাঁতখোলায় গিয়ে তানা করতে আরম্ভ করত। খটখট শব্দে আমার ঘুম যেত ভেঙে। বাজান হুঁকো টানতে টানতে বিবিজানদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতেন। আজকালও এক এক রাত্রে খোয়াবের মধ্যে সেই তানা করবার শব্দ শুনে বিছানার ওপর উঠে বসি। তুমি যদি মেহেরবানী কর বকুবিবি, তেমোদের নিয়ে আমি আগের মত সেই রকম ক'রে তাঁত খুলব। মেহের কারিগরের ছেলে আমি, আমার কি বাড়ী বাড়ী গিয়ে এমন জন-মজুরী পোষায়?'

ফতেমা জৈনুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'কিন্তু ভারী যে সরম করে মিঞা!'

জৈনুদ্দিন হেসে ফিস ফিস করে বলল, 'বিবিজান তুমি তো জানো না এই সরমের সময় তোমাকে আরো বেশী খাপসুরৎ ঠেকে।'

জৈমুদ্দিন যেন মত্ত হ'য়ে উঠল। নিত্য নতুন তার আদর জানাবার কায়দা, এত কায়দা মৈমুদ্দিনের কোন দিন মাথায় আসত না। নিত্য নতুন নামে ডাকে জৈমুদ্দিন, নিত্য নতুন ভাষায় ভালোবাসা জানায়। এত কথা কোন দিন মুখচোরা মৈমুদ্দিনের মুখে আসত না।

পাশের ঘরে সাকিনা ছেলে নিয়ে ছট্‌ফট্‌ করত। ফতেমাই শেষে দয়া ক'রে বলত, 'হয়েছে, হয়েছে, এবার ছোট বিবির ঘরে যাও দেখি একটু।'

কিন্তু বছর খানেক যেতে না যেতেই স্রোতের মুখ গেল ঘুরে। এক ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে জৈমুদ্দিন সর্বসান্ত হ'ল। ভিটে মাটি পড়ল বন্ধক। যুদ্ধের দরুণ গৃহস্থালীর খরচা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। তাঁত আর খোলা হ'ল না, তার বদলে দুই বউকে দুই ঢেঁকি পেতে দিল জৈমুদ্দিন। ফি হাটে ধান কিনে আনে, দুই বউকে পাল্লা দিয়ে চাল ভেনে দিতে হয়। সেই চাল বিক্রির পয়সায় চলে সংসার। ক্রমে দেখা গেল এদিক থেকে বরুবিবি কেবল পটের বিবি কোন কাজের নয়। তার সময়ও লাগে বেশি, কাঁড়া চালের ক্ষুদও বেশি থাকে। সাকিনা তার চেয়ে অনেক শক্ত অনেক খাটুয়ে। ফলে সাকিনার ওপরই দরদটা গিয়ে পড়ে জৈমুদ্দিনের। তার জন্য মাজন আসে, তার ছেলের জন্য আখ আর বাতাসা। দুধেল গাইকে খোল জাব বেশী করে খাওয়াতে হয়। ফতেমা ছট্‌ফট্‌ করে কিন্তু সাকিনা কিছুমাত্র ভাগ দেয় না। স্বামীর ভাগ দিয়েছে আবার আরো ?

তারপর এলো সেই দেশ-জোড়া দুর্ভিক্ষ। হাটে বাজারে ধার মিলে না, ফতেমা আর সাকিনা দুজনেই বেকার। তবু সাকিনা আর তার ছেলে-মেয়ের ওপরই টান বেশি জৈমুদ্দিনের। শত হলেও সাকিনা তার বিয়ে করা বৌ, বজলু নিজের ছেলে।

বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না। চেয়ে চিন্তে যেখান থেকে যা পায় সব সাকিনা আর তার ছেলেকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়ায় জৈমুদ্দিন। শুকিয়ে শুকিয়ে ফতেমা অস্থি-সার হয়, নড়ে বসবার শক্তি থাকে না ; তবু জৈমুদ্দিনের ভ্রূক্ষেপ নেই।

এর পর ফতেমা আর সরম রাখতে পারে না। বলে, 'একি তোমার ব্যবহার মিঞা ? পায়ে ধরে চৌদ্দবার ক'রে সিধে নিকা করেছিলে মনে নেই ?'

জৈমুদ্দিন জবাব দেয়, 'না নেই। কিন্তু এখন পায়ে ধরেই বলছি রেহাই দে রেহাই দে আমাকে, মিঞা ভাইকে খেয়েছিস, আমাকে আর খাসনে। গাঁয়ে আরো তো মুসলমান আছে তার ঘরে যা।'

দিনকয়েক উপবাসের পর ফতেমা সোজা চলে এল বুড়ো আবদুল খাঁর বাড়ি। জৈনুদ্দিন কোন বাধা তো দিলই না। বরং খুসি হ'ল।

আবদুল খাঁ তার দিকে বার কয়েক তাকিয়ে বলল, 'নিকা তো তোমাকে করবই বিবি। গণ্ডা কয়েক ছেলে মেয়ে শুদ্ধ দু'জন বিবিকে যখন এই বাজারে পুষতে পারছি, তোমাকেও পারব। কিন্তু তার আগে চল একবার শহর থেকে ঘুরে আসি। খাসি আর মুরগীর চালান নিয়ে যেতে হবে একা একা যেতে ভালো লাগছে না।'

আবদুল খাঁর চালানের নৌকায় উঠে বসবার সময় ফতেমার কানে গেল কলেরায় বজলু আর সাকিনা দু'জনেই শেষ হ'য়ে গেছে।

ফতেমা সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়েই প্রার্থনা করল, 'হে খোদাতাল্লা, জৈনুদ্দিনও যেন আজ রাতে গোরে যায়।'

খানিক ঘোরাঘুরির পর জৈনুদ্দিন আবার এসে উপস্থিত হ'ল। ফতেমা অবাক হয়ে বলল, 'তোমার কি কোন সরম নেই মিঞা?

জৈনুদ্দিন বলল, 'সরমের কথা যাক। তোমার সাথে একটা কাজের কথা বলতে এসেছি বড়বিবি।'

'কাজের কথা? আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ তোমার সঙ্গেই। লাভ তোমারই! আমার আর কি।'

জৈনুদ্দিন নাছোড়বান্দা। অগত্যা তাকে একটু আড়ালে এনে ফতেমা তার প্রস্তাবটা শুনল এবং শুনে প্রথমটা থ' খেয়ে গেল। সে ভেবেছিল কাকুতি মিনতি ক'রে জৈনুদ্দিন নিজেই আসতে চাইবে। কিন্তু অন্যের জন্য যে সুপারিশ করবে জৈনুদ্দিন তা সে ধারণাই করতে পারে নি। ভিতরে ভিতরে এমন পিশাচ হয়েছে জৈনু মিঞা এমন পাকাপোক্ত শয়তান? কিন্তু সেই যদি পারে ফতেমাই বা কেন পারবে না, বিশেষত লোকটিকে যখন শাঁসালো বলেই শোনা যাচ্ছে। লাভ ছেড়ে দিয়ে ফল কি?

কাঞ্চন মিঞা দু'তিন দিন যাতায়াত করে। তারপর আসে থানার নুরুদ্দিন সাহেব, তারপর কাছারির কল্যাণ গাঙ্গুলি।

না, পিশাচ হলেও জৈনুদ্দিন একেবারে ডাহা চালবাজ নয়। তার আনা লোক-গুলির সত্যি পয়সা আছে আর তারা পয়সা ব্যয় করতেও জানে।

ইতিমধ্যে বেশ একটু নতুন ধরনের অন্তরঙ্গতা জন্মেছে জৈনুদ্দিন আর ফতেমার মধ্যে। মাঝে মাঝে ডিমটা, মাছটা আনাজটা হাতে ক'রে আনে জৈনদ্দিন। ফতেমা গরমের দিনে সরবৎ করে দেয়, ঠাণ্ডার দিনে চা খাওয়ায়। চায়ে চুমুক দিতে দিতে জৈনুদ্দিন বলে, 'গাঙ্গুলি ছোঁড়াটা কিন্তু কেমন যেন একটু বোকা বোকা নয়?'

ফতেমা হেসে ওঠে, 'ছাই জানো তুমি। আসলে বজ্জাতের ধাড়ী। এখানে এসে অনেকেই অমন ন্যাকা ন্যাকা ভাব করে। কিন্তু একটু টিপে দেখলেই আমরা সব টের পাই।'

জৈনদ্দিন হেসে মাথা নাড়ে, 'তা ঠিক, তোমাদের ফাঁকি দেওয়ার জো নেই।'

ফতেমা আবার বলে, 'তোমাদের নুরুদ্দিন কিন্তু ভারি ধার্মিক। বলে ফতেমা আমার একজন গুরুজনের নাম। আমি বলি তাতে কি, আমার আরো হাল্কা হাল্কা দু'তিনটে নাম আছে আতরজান, দিলজান যা খুসি বলে ডাকতে পার।' বলে ফতেমা মুখ টিপে হেসে জৈনুদ্দিনের দিকে তাকায়। যখন নিত্য নতুন নামে ডাকার বাতিক ছিল জৈনুদ্দিনের এ-সব সেই তখনকার নাম। জৈনুদ্দিন এবার গম্ভীর ভাবে বলে, 'আচ্ছা এখন উঠি বরু বিবি, বেশি সময় নিয়ে তোমার ক্ষতি ক'রে লাভ কি।'

ফতেমা বলে, 'এত তাড়াতাড়ি কেন। গোসা হল নাকি মিঞার।'

জৈনুদ্দিন হেসে ওঠে, 'ক্ষেপেছ। গোসা হ'লে দু'জনেরই ক্ষতি।'

ফতেমার বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে ওঠে। কেবল ক্ষতির ভয়েই কি জৈনুদ্দিন কোন গোসা করে না, অভিমান করে না, হিংসা করে না? ক্ষতির ভয় কি মানুষকে এমন পাথর ক'রে ফেলে?

দিনকয়েক আগে ফতেমা সেদিন ঠাট্টা ক'রে বলেছিল, 'যা'ই বল, আজকাল তুমি কিন্তু একেবারে পয়গম্বর হ'য়ে গেছ মিঞা। তাবিচ কবচ নিয়েছ না কি হাসেম ফকিরের কাছে?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে জৈনুদ্দিন বলেছিল, 'ময়রায় কি আর সন্দেশ খায় বিবি?'

ফতেমা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিয়েছিল, 'তা ঠিক, সন্দেশ-বেচা পয়সা খেলে তো জাত যায় না।'

জৈনুদ্দিন এমন পাথর হ'ল কি ক'রে। তার চোখে রঙ নেই, হাসিতে রঙ নেই —পরিহাস ওপর ওপর যতই করুক জৈনুদ্দিন কোন দিন তাকে ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখে না,

অথচ সবাই বলে ফতেমা আগের চেয়ে অনেক সুন্দরী হয়েছে। কল্যাণ বলে, তেমন করে সেজেগুজে বেরুলে তাকে না কি ঠিক কলেজে পড়া মেয়েদের মত দেখায়। কিন্তু জৈনুদ্দিন তাকে ছোঁয় না। জৈনুদ্দিন তাকে ঘৃণা করে। এতখানি ঘৃণা করবার অধিকার কোথায় পেল সে, জৈনদ্দিন কি তার চেয়ে কম পাপী? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নিজের অন্তরকেই ফতেমা জর্জর করে তোলে, ক্ষুব্ধ হৃদয় কিছুতেই শান্ত হ'তে চায় না।

সেদিন আবার আর একজন শাঁসালো লোকের সন্ধান আনল জৈনদ্দিন। বলল, 'ভালো ক'রে সেজেগুজে থেকো বরু বিবি। লোকটি কিন্তু ভারী সৌখীন।'

ফতেমা ম্লান মুখে বলল, 'কিন্তু আমার যে ভারী মাথা ধরেছে। জ্বরই যেন এসে পড়ে পড়ে।'

জৈনুদ্দিন ব্যস্ত হ'য়ে বলল, 'তাই না কি? তবে আজ থাক্, চুপচাপ শুয়ে থাক বিছানায়।'

কথার মধ্যে পুরানো আন্তরিকতার স্থর যেন আবার ফিরে এসেছে।

ফতেমা বলল, 'কিন্তু তুমি তো কথা দিয়ে এসেছ, কথার খেলাপ করলে ক্ষতি হবে না? তার চেয়ে নিয়েই এসো।'

জৈনুদ্দিন ধমক দিয়ে বলল 'যা বলচি তাই কর। শুয়ে থাকো চুপ-চাপ। পয়সার লোভ বড় বেশি তোমাদের।'

ফতেমা মনে মনে খুশী হ'ল, কিন্তু খোঁচা দিতে ছাড়ল না।

'আর তোমাদেরই বুঝি কম?'

জৈনুদ্দিন বলল, 'তর্ক না ক'রে একটু শুয়ে থাক দেখি, মাথা কি দু'দিকেই ধরেছে খুব বেশী?'

ফতেমা শুয়ে পড়ে বলল, 'খুব। যেন ছিঁড়ে পড়ে যেতে চাইছে।'

'তা হ'লে এক কাজ কর। জলপটি দিয়ে রাখো মাথায়।'

ফতেমা কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইল। জলপটির স্মৃতি তাকে আরেক যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

সেদিনও দারুণ মাথা ধরেছিল ফতেমার। ছট্‌ফট্‌ করছিল যন্ত্রণায়। হাট থেকে এসে শুনতে পেয়ে হাত ধোয়া নেই, জৈনুদ্দিন নিজে এসে তাড়াতাড়ি ভিজে নেকড়ার পটি বেঁধে দিল ফতেমার কপালে, তার পর শিয়রে বসে শুরু করল পাখা দিয়ে বাতাস করতে। সাকিনা ঠাট্টার ছলে অনেক বাঁকা বাঁকা কড়া কড়া কথা

শুনিয়ে দিল। বলল, 'জলজ্যান্ত এমন লম্বা চওড়া পুরুষ মানুষটাকে ভেড়া ক'রে ফেললে কি ক'রে বরুবিবি, ধন্য তোমার যাদুর মহিমা।'

সেই যাদু এমন ক'রে ভেঙে গেল কি ক'রে? কেবল কি ফতেমাই তা ভেঙেছে?

জৈনুদ্দিন বলল, 'কি, শুয়েই আছ যে। যা বলছি তাই কর, নেকড়া ভিজিয়ে জলপটি দাও', ব'লে জৈনুদ্দিন আবার বিড়ি টানতে লাগল।

ফতেমা হঠাৎ একেবারে চেঁচিয়ে উঠল, 'হয়েছে হয়েছে। অত সোহাগে আর দরকার নেই আমার। ভাবী দরদ দেখাতে এসেছ। দরদ যে কিসেব জন্য তো কি বুঝি না? ভয় নেই মাথা-ধরায়, মরে যাব না, কালই উঠতে পারব। কালই আনতে পারবে তোমার লোক।'

জৈনুদ্দিন অবাক হযে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। তারপর ধীরে ঘব থেকে বেরিয়ে যায়।

এত রাত্রেও শহর ভবে বেশ লোক-জন চলাচল করছে। ক্রমেই বসাত বাড়ছে। দোকানে দোকানে চলছে বেচা কেনা। জনকয়েক অল্পবয়সী মেয়ে-পুরুষ সেজেগুজে গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে চ'লছে। তাদের হাসির শব্দ অনেকক্ষণ ধরে কানে লেগে রইল জৈনুদ্দিনের। চুলের আর শাড়ির গন্ধ বাতাসে ভেসে রইল বহুক্ষণ ধরে। সামনের বটগাছের তলাতেই ছিল লঙ্গরখানা। আর তার সম্মুখেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল জৈনুদ্দিন, ফৈজু আর কেষ্ট মণ্ডল। ফৈজু আর কেষ্ট আর ওঠে না। কিন্তু কে আর মনে রেখেছে তাদের কথা। ফৈজুর বিবি নাকি আবার নিকা বসেছে। তার ছেলে-মেয়েও হয়েছে এর মধ্যে। গাঁয়ের পালাবার লোকজন ফিরে গিয়েছে। ধান চাল আবার পাওয়া যাচ্ছে। দৈনিক মজুরির হার নাকি গাঁয়েও অনেক বেড়ে গিয়েছে। দেড় টাকার কমে কেউ আর জন খাটে না। শহরে বসে বসেই সব খবর জৈনুদ্দিন পায়। সব খবরই তার কাছে এসে পৌঁছায়।

পরদিন বিকালের দিকে জৈনুদ্দিন আবার গেল ফতেমার কাছে। ফতেমা তখন সাজসজ্জা কেবল শুরু করেছে।

জৈনুদ্দিন বলল, 'গোসা ভেঙেছে বিবি সাহেব?'

ফতেমা বলল, 'না ভাঙলে তো দু'জনেরই ক্ষতি।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'তা ঠিক, কিন্তু সাজ-গোজটা আজ একটু ভালো রকম হয় যেন। লোকটি কিন্তু ভারী সৌখীন। কোন খুঁত থাকে না যেন কোথাও।'

ফতেমা হেসে বলল, 'আচ্ছা, সে আর তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না।'

জৈনুদ্দিন পকেট থেকে একটা শিশি বার করল আর বোঁটাওয়ালা দুটো লাল গোলাপ।

ফতেমা অবাক হ'য়ে বলল, 'ও আবার কি।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'গোলাপ দু'টো খোঁপায় গুঁজে নিয়ো। বেশ চমৎকার মানাবে। আর গন্ধটা একটু ছিটিয়ে নিও কাপড়-চোপড়ে। বেশ খোসবয় আছে। লোকটি ভারী সৌখীন কি না।'

ফতেমা হেসে বলল, 'আচ্ছা গো আচ্ছা। আজ একেবারে ডানাকাটা পরী হয়ে থাকব। কিছু ভেব না।'

জৈনুদ্দিন আবার ফিরে গেল।

খানিক বাদে গোল হয়ে চাঁদ উঠল আকাশে। কিছুক্ষণ জৈনুদ্দিন শহরের এ-পথে ও-পথে ঘুরে বেড়াল। এক বাড়ি থেকে চমৎকার রান্নার গন্ধ বেরুচ্ছে, শোনা যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের কোলাহল, একটা জানালার ধারে স্বামী-স্ত্রীতে ফিস্ ফিস্ করে কি আলাপ করছে। তাদের দিকে চোখ পড়তেই জৈনদ্দিন চোখ ফিরিয়ে নিল।

সন্ধ্যার খানিক পরেই জৈনুদ্দিনকে ফিরে আসতে দেখে ফতেমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও মা, এত সকাল সকাল যে? এই না বলেছিলে রাত হবে? কই, তোমার সেই সৌখীন লোক কোথায়?'

জৈনুদ্দিন মুহূর্ত কাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে ফতেমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার নির্দেশ মত ফতেমা আজ ভারী সুন্দর করে সেজেছে। খোঁপায় গুঁজেছে তারই দেওয়া গোলাপ, শাড়িতে ছিটিয়েছে তারই আনা সুগন্ধি। আজকের বেশে ভারী অপরূপ মানিয়েছে ফতেমাকে। মনে পড়ল না এ সজ্জা কার জন্য।

জৈনুদ্দিন বলল, 'সে আছে একটু আড়ালে। কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে দু'-একটা কথা বলে নি চল।'

ফতেমা দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে অবাক হয়ে দেখল তার পাতা বিছানার এক কোণে জৈনুদ্দিন বসে পড়েছে। সাধারণত এ ভাবে জৈনুদ্দিন বসে না।

ফতেমা বলল, 'কি কথা?'

জৈনুদ্দিন বলল, 'শোনই।'

ফতেমা আরও একটু কাছে সরে এসে বসল।

জৈনুদ্দিন ব্যাগ খুলে নতুন একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে ফতেমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে হাতখানা নিজের মুঠির ভিতর চেপে ধরে বলল, 'সে যদি আজ নাই আসে, তোমার কি খুব মন পোড়বে বরুবিবি?'

সঙ্গে সঙ্গে ফতেমাকে জৈনুদ্দিন নিজের দিকে আরও একটু আকর্ষণ করল। ফতেমা একবার জৈনুদ্দিনের দিকে তাকালো, তারপর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মৃদু হেসে নোটখানা ফের জৈনুদ্দিনের পকেটেই গুঁজে দিল।

জৈনুদ্দিন একটু ক্ষুব্ধ হ'য়ে বলল, 'কম হ'ল না কি? আরো চাই তোমার?'

ফতেমা অপূর্ব মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাই না? খরচ কত তার খেয়াল আছে মিঞার? এত কাণ্ডের পর মোল্লা-মুনসীদের মুখ কি আর দু'-পাঁচ টাকায় বন্ধ হবে ভেবেছ?'

ফেরিওয়ালা

'চাই ছিটের কাপড়, সস্তায় সায়া, সেমিজ, ব্লাউসের কাপড়…'

সদর রাস্তা থেকে ফেরিওয়ালা সহরতলীর সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। দুই দিকে সারে সারে বাড়ি। ছাদে, রেলিঙে নানা রঙের শাড়ি শুকাচ্ছে, স্তব্ধ দুপুর। পুরুষেরা কাজে বেরিয়েছে। মেয়েরা রান্নাঘরের কাজ মিটিয়ে কোলের ছেলেকে ঘুম পাড়াবার সুযোগে নিজেরাও ঘুমিয়ে নিচ্ছে একটু। মিষ্টি মোলায়েম স্বরে ঘুম-ভাঙানো ডাক দিতে দিতে ফেরিওয়ালা এগিয়ে চলল, 'চাই সস্তায়….'

ডান দিকের পুরোন জীর্ণ পাটকেলে রঙের একতলা বাড়িখানার একটা জানলা খুলে গেল, 'এই ফেরিওয়ালা, শোন। কি দিচ্ছ সস্তায়?'

বাড়িটা ছাড়িয়ে এসেছিল ফেরিওয়ালা, ফিরে গিয়ে খোলা জানালার সামনে দাঁড়ায়—'ছিটের কাপড়—সায়া সেমিজ ব্লাউসের…'

'আরে প্রফুল্লদা না?'

প্রফুল্লও কিছুক্ষণ থেমে রইল, তার পর বলল, 'মল্লিকা তুমি! তোমরা এদিকে থাকো না কি? কত দিন আছ এখানে?'

মল্লিকা জবাব দিল, 'অনেক দিন। এই ফাল্গুনে দু'বছর হোল। কিন্তু তোমাকে তো এর আগে—। কিন্তু তোমার দোকানের কি হোল। তোমার দোকান ছিল না বউবাজারের ওদিকে? তা গেল কোথায়?'

প্রফুল্ল ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। অদ্ভুত একটু হেসে প্রফুল্ল জবাব দিল, 'যাবে আবার কোথায়। দেখতেই তো পাচ্ছ, কাঁধে উঠেছে।'

কথাটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেলে মল্লিকাও হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়েছিল, এবার মুখ টিপে হেসে বলল, 'উঠেছে বেশ হয়েছে। না হলে কি আর দেখা হোত। এসো, ভিতরে এসো।'

প্রফুল্ল বলল, 'ভিতরে গিয়ে কি হবে?'

মল্লিকা বলল, 'আর লজ্জা করতে হবে না, এসো। ভিতরে এসে জিনিষ বেচা-কেনা হবে। যা আছে ভিতরে। এসো ভয় নেই।'

মল্লিকা আবার একটু ঠোঁট টিপে হাসল। প্রফুল্ল একটু হেসে তাকিয়ে রইল সেই চাপা পাতলা ঠোঁটের দিকে। আশ্চর্য, হাসলে এখনো ভারি সুন্দর দেখায় মল্লিকাকে। কালো-পেড়ে একখানা আধ-ময়লা শাড়ি মল্লিকার পরনে। কাঁধের কাছে একটু ছিঁড়েও গেছে। ব্লাউসটা আরো পুরনো। হাতে লাল রঙের দু'গাছি প্লাষ্টিকের বালা। গায়ের আর কোথাও গয়না নেই। গলা কান সব খালি। প্রফুল্লের বুঝতে বাকী রইল না আগেকার সেই সামান্য সচ্ছলতাটুকুও আর নেই মল্লিকাদের। ওরা আরো অভাবে পড়েছে। কিন্তু আর একটি অভাব প্রফুল্লের কাছে ভারি সম্ভাব-ব্যঞ্জক বলে মনে হোল। সঁীথিতে এখনো সিঁদুর ওঠেনি মল্লিকার। ঘন চুলের মাঝখানে সরু রেখাটুকু এখনো সাদা। মাল্লকা আজও কুমারী।

'দাঁড়িয়েই থাকবে তা হ'লে ?' অভিমানে আরও মিষ্টি শোনাল মল্লিকার গলা। ঠিক পনের-ষোল বছর বয়সে তখন যেমন শোনাত। তার পর আরও সাত বছর কেটেছে। সেই ভরাট মুখ আর নেই মল্লিকার। গাল দু'টোয় একটু ভাঙন ধরেছে। আগের চেয়ে আরো এক-পোঁচ ময়লা হয়েছে রঙ। কিন্তু গলার আওয়াজ-টুকু যেন ঠিক তেমনি মিঠে আছে বলে মনে হোল প্রফুল্লর।

অন্যান্য জায়গায় থেকে এমন ভিতরে যাওয়ার আমন্ত্রণ এলে তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে প্রফুল্ল, কিন্তু আজ যেন সঙ্কোচ কাটতে চায় না। ছিটের কাপড়, সাদা লংক্লথ, গোলাপী, আর চাঁপা ফুলের রঙের পপলিনের থান ক'খানা যেন পাথরের মত ভারি মনে হোল প্রফুল্লর। এই বেশে কি ভিতরে যাওয়া যায় ?

ছোট মামীর জেঠতুতো ভাইয়ের মেয়ে। সেদিক থেকে কটুম্বিতা দুর সম্পর্কের। কিন্তু সাত-আট বছর আগে সবটুকু দুরত্বই প্রায় ঘুচবার জো হয়েছিল। নিঃসন্তান বিধবা পিসীর বাড়িতে মাঝে-মাঝে মল্লিকা বেড়াতে আসত। কখনো কখনো থাকতও দু'-এক মাস। আর মল্লিকা এসেছে খবর পেয়েই প্রফুল্ল ছুটত মামা বাড়ীতে। পাশাপাশি গ্রাম। ছুটেই যাওয়া যেত। কিন্তু বাড়ীর কাছাকাছি এসে শান্ত শিষ্ট গম্ভীর মুখে হাজির হোত প্রফুল্ল। পায়ের ধুলো নিত ছোট মামীর। ক্ষেত-খামার সংক্রান্ত বৈষয়িক কথা-বার্তা বলত তাঁর সঙ্গে, যেন সেই জন্যই এসেছে। মল্লিকা বলে তাঁর কোন ভাইঝিকে যেন প্রফুল্ল চেনে না, তার সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্যও যেন নেই। ছোট মামী সবই বুঝতেন। কিন্তু বুঝে বুঝতে চাইতেন না, ভারি কড়া ছিলেন এ সব বিষয়ে। তাঁর চোখের পাহারা এড়িয়ে মল্লিকার সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগ প্রফুল্ল কমই পেত। তবু রাধাগঞ্জের মনোহারী দোকানের এক

বাক্স সাবান, চিরুনী, স্নো-পাউডারের কৌটো মাঝে মাঝে মল্লিকার হাতে গিয়ে পৌঁছত। কখনো বা শুধু ছোট-ছোট চিঠির টুকরো আর মামা-বাড়ি থেকে ফেরার পথে প্রফুল্লের সার্টের স্থুল পকেট থেকে বেরুত ফুল-তোলা রুমাল কি বালিসের ঢাকনি।

মামীমা বাইরে যত কড়াই হন, ভিতরে ভিতরে মনটা একটু নরমই ছিল তাঁর। আকারে-ইঙ্গিতে প্রফুল্লের কথাটা পেড়েও ছিলেন জেঠতুতো ভাইয়ের কাছে। কিন্তু মল্লিকার মা-বাবা মাথা পাতেননি। মল্লিকার আরো দুই আইবুড়ো দিদি ছিল তখন। তা ছাড়া তাঁদের নজরও উঁচু ছিল। থার্ড ক্লাশ পর্যন্ত পড়া মফঃস্বল শহরের পঁচিশ টাকা মাইনের মনোহারী দোকানের কর্মচারী প্রফুল্ল কর তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষার অনেক নিচে পড়ে ছিল।

কিন্তু সেদিন আর নেই। তার পর সাত বছর কেটেছে। অনেকগুলি দিন হয় সাত বছরে। ততক্ষণে মল্লিকার মা স্নেহলতাও এসে দাঁড়িয়েছেন জানলায়, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস মল্লী?'

মল্লিকা জানালার পাশ থেকে সরে যেতে যেতে বলল, 'চাঁদ কান্দার সোনা পিসীমার ভাগ্নে। ডিঙামানিকের প্রফুল্ল—প্রফুল্লদা। লজ্জায় আসতে পারছে না ভিতরে।'

স্নেহলতা লক্ষ্য করে বললেন, 'ও মা, তাই তো, সেই প্রফুল্লই তো, তা লজ্জা কিসের! এসো, এসো, পুরুষ ছেলের আবার লজ্জা কিসের বাবা! যা তো মল্লিকা, সদরটা খুলে দিয়ে আয়। ও-পাশ দিয়ে ঘুরে এসো প্রফুল্ল।'

মল্লিকার মাকেও মামা-বাড়ীতে দেখেছে প্রফুল্ল। সেই মোটা-মোটা চেহারা এখন হাড়-সার হয়েছে। মল্লিকার মা'রও শাঁখা-সিঁদুর ছাড়া আর কোন ভূষণ নেই। পরনে পুরুষের পুরনো চুল পেড়ে ধুতি।

সঙ্কোচটা অনেকখানি কমে গেল প্রফুল্লর। ঘুরে এসে দাঁড়াল সদর দরজার কাছে। দোর ততক্ষণ খুলে গেছে। মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে মল্লিকা।

মুহূর্তকাল চুপ-চাপ কাটল। মল্লিকাও এবার কাছ থেকে আরো ভালো করে দেখে নিল প্রফুল্লকে। গায়ে টুইলের সাদা সার্ট, পরনে ফর্সা কোচানো ধুতি, পায়ে ষ্ট্রাইপের স্যাণ্ডাল। বেশে-বাসে এখনো বেশ সৌখীনতা আছে প্রফুল্লর। সাতাশ—আঠাশ বছরের যুবকের স্বাস্থ্য। ঝড়-ঝাপটার পরেও বেশ শক্ত আছে। রঙটা যেন আরো ফর্সা হয়েছে। ব্যাক-ব্রাস করা ঘন কালো চুলগুলি আগের

চেয়ে আরো সুন্দর হয়েছে। কেবল কাঁধে কাপড়ের থানগুলি বে-মানান। তা ওগুলি নামিয়ে রাখতে কতক্ষণ।

মল্লিকা বলল, 'এসো।'

প্রফুল্ল বলল, 'তোমার বাবা বুঝি অফিসে বেরিয়েছেন?'

মল্লিকা একটু থামল, তারপর বলল, 'বেরিয়েছেন, কিন্তু অফিসে নয়।'

'তবে কোথায়?'

'তুমি বুঝি কিছু জান না? জানবেই বা কি করে। পিসীমা মারা যাওয়ার পরে তো আর কোন খোঁজ খবর নেই। কি সব গোলমালে বাবার সেই অফিসের চাকরি গেছে। অনেক দিন বসে ছিলেন। বছর তিনেক হোল গাড়িতে গাড়িতে হোড় কোম্পানীর দাঁতের মাজন আর বাতের মালিসের ক্যানভাস করেন।'

নিজেদের পরিবারের এতগুলি কথা ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ বলে ফেলে মল্লিকা যেন অপ্রস্তুত হোল। তারপর প্রফুল্লকে একটু খোঁচা দিয়ে বলল, 'কিন্তু এতদিন পরে দেখা? মা-বাবার খোঁজ খবর নেওয়া ছাড়া আর বুঝি তোমার কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই?'

প্রফুল্ল একটু হাসল, 'আছে বই কি, আরো কিছু জিজ্ঞেস করবার আছে বলেই তো ওসব কথা আগে কয়ে নিচ্ছি। জান তো আমাদের ফেরিওয়ালাদের স্বভাব। কাঁচা বয়সের ঝি-বউদের নিয়ে কারবার, তাই আগে থেকেই আট-ঘাট সব জেনে রাখতে হয়। কোথায় বাবা-মা, কোথায় শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামী—'

মল্লিকার মুখের দিকে চেয়ে প্রফুল্ল আবার একটু হাসল। নিজের ব্যবসা নিয়ে এর আগে এমন সুরে, এমন ভঙ্গিতে প্রফুল্ল কোন দিন পরিহাস করতে পারেনি। কাঁধের কাপড়ের থানগুলির ভার যেন আর নেই। পপলিন, মলমলের রঙ যেন কেবল থানেরই নয়, প্রফুল্লর সমস্ত মনে—সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। সে রঙের ছোপ লেগেছে মল্লিকার মুখে।

আরক্ত মুখে একটু কাল চুপ করে থেকে ফের মুখ খুলল মল্লিকা। কৃত্রিম সংশয়ে অভিমানে কুঁচকালো যুগল ভ্রূ, বলল, 'তাই বল।' এত কাজ থকতে বেছে-বেছে তাই বুঝি এই চাকরি নিয়েছ? এই স্বভাব হয়েছে বুঝি আজ-কাল?'

প্রফুল্ল বলল, 'কি করি বল। অভাবে—'

ঘরের ভিতর থেকেই ডাক ছাড়লেন স্নেহলতা, 'ও মল্লী, প্রফুল্ল কি ফিরে গেল

না কি ? রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা তোদের ? আয়, ভিতরে আয়, ঘরে আয়।'

মল্লিকা হেসে বলল, 'এসো, ঘরে এসো, তারপর বউ কেমন আছে ?'

জিজ্ঞেস করতে বুকটা একটু দুলে উঠল, গলাটাও যেন একটু কাঁপল মল্লিকার। প্রফুল্ল হেসে উঠল, 'কেবল বউ ? ছেলে-পুলে নাতি-নাতনীর কথা জিজ্ঞেস করলে না ?'

মল্লিকার বুকের পাথর যেন নেমে গেল, তবু একটু সংশয়ের স্বরে বলল, 'সত্যি, এখনো বিয়ে করোনি তুমি ?'

প্রফুল্ল বলল, 'ক্ষেপেছ। ফেরিওয়ালাকে মেয়ে দেয় না কি কেউ ?'

মল্লিকা একটু চুপ করে থেকে গলা নামিয়ে বলল, 'দেয় কি না দেয়, দেখা যাবে। এবার এসো, আর দেরী করো না।'

প্রফুল্ল লক্ষ্য করল আগেকার মত লজ্জা-সঙ্কোচ আর নেই মল্লিকার। অনেক প্রগল্‌ভা হয়েছে। অনেক বদলে গেছে। তাতে কি হয়েছে ? প্রফুল্লও কি বদলায়নি ?

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। আর এক ঘর মাত্র ভাড়াটে থাকে এ বাড়িতে। নতুন স্বামী-স্ত্রী। মাত্র বছর খানেক বিয়ে হয়েছে। অফিস কামাই করে অরুণবাবু ম্যাটিনী শো'তে সিনেমা দেখতে বেরিয়েছেন বউকে নিয়ে। যেতে যেতে তালা-বন্ধ দু'খানা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দু'-এক কথায় অরুণবাবু আর তার বউয়ের কাহিনী প্রফুল্লকে শুনিয়ে দিল মল্লিকা, তার পর ছোট্ট প্যাসেজটুকু পার হয়ে নিজেদের ঘরে এসে ঢুকল।

মাঝারি ধরণের একখানা ঘর। আধখানা বাজে কাঠের এক জোড়া তক্তপোষে জোড়া। নিচে বাক্স প্যাঁটরা হাঁড়ি-কুঁড়ি গৃহস্থালীর নানা রকম দরকারী আধা দরকারী জিনিষ।

স্নেহলতা সস্নেহে আমন্ত্রণ জানালেন, 'এসো প্রফুল্ল, এসো। 'আহা, জুতো নিয়েই এসো, তাতে দোষ হবে না।'

প্রফুল্ল এসে তক্তপোষে বসল, নামিয়ে রাখল কাঁধের কাপড়গুলি।

স্নেহলতা বললেন, 'ভালো হয়ে বসো বাবা ! ঈস, কি রকম ঘেমে গেছে দেখ। দাঁড়িয়ে রইলি কেন মল্লিকা, পাখাটা নিয়ে আয়, একটু বাতাস কর।'

তালের পাখাখানা নিয়ে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে লাগল মল্লিকা।

স্নেহলতা বললেন, 'একটু দোকান-টোকানের মত দিয়ে বসলে হয় না ? অবশ্য কিছুতেই কিছু দোষ নেই আজ-কাল। কত জনে কত কি করে খাচ্ছে। চুরি-বাটপাড়ি না করলেই হোল, কিন্তু রোদে-রোদে এমন করে ঘুরে বেড়াতে কষ্ট তো হয়।'

প্রফুল্ল বলল, 'হ্যাঁ। এবার একটু দোকানের মতই দেব ভেবেছি। উল্টাডিঙির ওদিকে একখানা ঘরেরও খোঁজ পেয়েছি। কথাবার্তাও সব এক রকম ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে। এবার একটা ভালো দিন-টিন দেখে—'

'তা তো বটেই। শুভ কাজ কি অদিনে অক্ষণে হয় বাবা ? ভালো দিন-টিন নিশ্চয়ই দেখে নিও।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে আর একটু ইতস্তত করে ভয়ে ভয়ে স্নেহলতা বললেন, 'বিয়ে-টিয়ে করেছ না কি ?'

প্রফুল্ল লজ্জিত ভঙ্গিতে হেসে মাথা নাড়ল, 'করলে তো শুনতেই পেতেন।' তারপর ফের মুখ তুলে বলল, 'ওসব কথা ভাববার সময় কই মাসীমা। ভুগে ভুগে দাদা মারা গেলেন। বউদি, তিনটি ভাইপো-ভাইঝি, কাউকেই তো ফেলবার জো নেই। অথচ এ বাজারে—'

'তোমার বাবা আছেন না প্রফুল্ল ?'

'আছেন। কিন্তু সে না থাকারই সামিল। চলতে-ফিরতে পারেন না। ভালো করে চোখে দেখতে পান না। সবই আমাকে দেখতে হয়।'

স্নেহলতা বললেন, 'তুমিই উপযুক্ত ছেলের কাজ করছ বাবা। আর আমি সব শত্রু ধরেছিলাম পেটে। ছেলে একবার খোঁজ খবরও নেয় না বউ নিয়ে আলাদা হয়ে রয়েছে। নইলে আমার কিসের দুঃখ বল। ছেলেই যদি ছেলের মত হোত তা'হলে কি বুড়ো বয়সে ওঁকে অত কষ্ট করতে হয়, না আমার মল্লিকা—'

আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন স্নেহলতা, মল্লিকা তাড়াতাড়ি প্রফুল্লর মনোযোগ আকর্ষণ করে বলল, 'এই কাঁঠালী চাঁপা রঙের কাপড়টার গজ কত করে ?' 'প্রফুল্লদা' কথাটা আর উচ্চারণ করল না মল্লিকা।

প্রফুল্ল বলল, 'কত করে তা জেনে কি হবে ? তোমার ক'গজ দরকার তাই বল।'

মল্লিকা বলল, 'বাঃ, দর-দাম না করে জিনিস কিনব কেন ? যদি ঠকিয়ে দাও।'

স্নেহলতা কৃত্রিম ধমকের সুরে বললেন, 'চুপ কর মুখপুড়ী। তুমি ওর কথায় কান দিয়ো না প্রফুল্ল।'

মল্লিকা মা'র কথায় কান না দিয়ে বলল, 'আর এই আশমানী রঙের পপলিনটা?' দু'হাতে রঙীন কাপড়গুলি ঘাঁটতে লাগল মল্লিকা। মন যেন রঙের সমুদ্রে ডুব-সাঁতার কেটে চলেছে।

স্নেহলতা বললেন, 'যত সব আদেখলেপণা! ও সব রেখে প্রফুল্লকে একটু চা-টা করে দিবি তো দে।'

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'না না, এত গরমে চা আমি খাই নে। চা'র দরকার নেই।'

কিসের যে দরকার তা জানে মল্লিকা। কাপড়ের থানগুলি সরিয়ে রেখে মল্লিকা উঠে গিয়ে তাকে থেকে কাচের গ্লাসটা পেড়ে নিল। চা খাওয়ার জন্য সামান্য একটু চিনি আছে কৌটোয়। উপুড় করে ঢালল গ্লাসের মধ্যে। তারপর মিনিট কয়েকের মধ্যেই একগ্লাস সরবৎ এনে প্রফুল্লর সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রফুল্ল বলল, 'আবার এ সব কেন।'

কিন্তু সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে নিল গ্লাসটা। নেওয়ার সময় আঙুলে আঙুলে ছোঁয়া লাগল। ফিরিয়ে নেওয়ার সময়ও তেমনি।

তারপর প্রফুল্ল বলল, 'পছন্দমত যে কোন কাপড় থেকে দু'গজ কাপড় তুমি রাখ মল্লিকা।'

স্নেহলতা বাধা দিলেন, 'না না, কাপড়ে দরকার নেই প্রফুল্ল। ব্লাউসের অভাব আছে না কি বাক্সে। যত আদেখলেপণা।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ভগবান যদি মুখ তুলে চান, যদি নিতে দেন তখন নেব প্রফুল্ল, এখন থাক।' গজ নয়, গজপতির দিকে দৃষ্টি স্নেহলতার। বললেন, 'কবে আসবে?'

প্রফুল্ল বলল, 'আসব এক দিন।'

'এক দিন নয়। এই রবিবারে এসো। দুপুরে এখানে খাওয়া-দাওয়া করবে। মল্লিকার বাবাকেও থাকতে বলব। দেখা-সাক্ষাৎ, কথা বার্তা হবে তাঁর সঙ্গে।'

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়ল। কাপড়ের থানগুলি ফের তুলল ঘাড়ে। আবার যেন ভারি ভারি লাগল জিনিসগুলি।

স্নেহলতা মেয়েকে বললেন, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস প্রণাম কর।'

দু'জনেই ভারি কুণ্ঠিত। স্নেহলতা তো জানেন না, অত ঘটা করে প্রণামের রেওয়াজ নেই আজ-কাল।

তবু একটু মজা করবার জন্য নীচু হয়ে প্রফুল্লর পায়ের ধুলো নিল মল্লিকা। তার পর মাথা তুলতেই প্রফুল্লর বুল-পকেটে মাথা ঠুকে গেল। আর খবর-কাগজে মোড়া একটা পুলিন্দা পকেট থেকে ছিটকে এসে মেঝেয় পড়ল।

মল্লিকা অবাক হয়ে বলল, 'এটা কি?'

প্রফুল্ল একটু যেন চমকে উঠল, তার পর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ও কিছু নয়, একটা শাড়ী।'

'শাড়ি? কার শাড়ি? আবার কুঞ্চিত হোল মল্লিকার ভ্রূ। অবশ্য পরের মুহূর্তেই প্রফুল্লর হাসিতে তার অমূলক আশঙ্কা দূর হোল।

প্রফুল্ল বলল, 'খদ্দেরের শাড়ি। বিক্রির জিনিস। যে নেবে তার।'

মল্লিকা বলল, 'দেখি, দেখি, কি রকম জিনিস। খুলব?'

প্রফুল্ল বলল, 'আমি খুলে দেখাচ্ছি।'

তারপর সযত্নে কাগজের মোড়ক খুলল প্রফুল্ল। একটা ভাঁজ খুলে মল্লিকার সামনে ধরে রেখে বলল, 'দেখ।'

দেখবে কি, মল্লিকা অপলকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। গাঢ় লাল, আগুনের রঙের শাড়ি। ছুঁতে সাহস হয় না। রুদ্ধশ্বাসে মল্লিকা বলল, 'কি কাপড় এটা, কত দাম?'

প্রফুল্ল বলল, 'বিষ্ণুপুরী সিল্ক। বাজারে পঁচাত্তরের এক পয়সা কমেও কেউ দেবে না। আমি পঁয়ষট্টিতে দিতে পারি।'

পঁয়ষট্টি! সে যে কতগুলি টাকা! অত টাকার শাড়ি পরবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না মল্লিকা। কিন্তু শাড়িখানা যে স্বপ্নের চেয়েও চমৎকার, সিল্কের কাপড়ের কেবল নামই শুনেছে মল্লিকা, ছুঁয়ে দেখেনি, পরে দেখেনি। কি রকম অনুভূতি হয়! কোন আনন্দের সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া চলে!

প্রফুল্ল বলল, 'একেবারে আনকোরা নতুন'। নতুন তো বটেই, কাগজে আঁটা দোকানের নাম লেখা রয়েছে ইংরেজীতে। মল্লিকা লক্ষ্য করে দেখেছে।

প্রফুল্ল আবার দু'-একটা ভাঁজ খুলে দেখাল, যত খোলে তত যেন চোখ ঝলসে যায়, আগুন লাগে রক্তে।

প্রফুল্ল আবার বলল, 'ঘর থেকে পা বাড়ালেই পঁচাত্তর, তার ওপর সেল-ট্যাকস্। একটি পয়সা কমে কেউ এ জিনিস দিতে পারে না। আমি পঁয়ষট্টিতে—'

হঠাৎ যেন চমক ভাঙল প্রফুল্লর। এ সব সে কার কাছে কি বলছে! মল্লিকার

মত অনেক মেয়ে, অনেক বউ প্রফুল্লের শাড়ির মহার্ঘতার কথা জেনেছে বলে মল্লিকাকেও কি তাই জানতে হবে ?

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি শাড়িখানা ভাঁজ করে কগজে জড়িয়ে নিল। তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বলল, 'যাই আজ। মহাজনের মাল কি না। না হলে পঁয়ষট্টি হোক, পঁচাত্তর হোক, কিছুতেই পিছ-পা হতাম না।'

মল্লিকাও সহজে পিছ-পা হবে না। প্রফুল্লর পিছনে পিছনে গিয়ে নীচু-গলায় বলল, 'সদরের কাছে একটু দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি আসছি।'

লুব্ধ এক জোড়া চোখ মল্লিকার দেখতে পেয়েছে প্রফুল্ল। কেবল মল্লিকার নয়, নাম-না-জানা গৃহস্থ-ঘরের আরো কত বউ-ঝি, কিশোরী-প্রৌঢ়ার চোখও এমনি চক্‌-চক্‌ করে প্রফুল্লর বিষ্ণুপুরী সিল্কের রঙে। তারপর পঁয়ষট্টি টাকার কথা শুনে মল্লিকার মত অনেকেই চুপসে যায়। আরা কিছু কমে হয় না ? কত কম ? এই ত্রিশ-চল্লিশ টাকার মধ্যে ?

প্রফুল্ল হেসে ওঠে। কখনো বা রাগ করে চলে যায়। যেন মহা অপমানিত হয়েছে। কিন্তু রাগ করে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। একটু বাদে ফের এসে দাঁড়ায়। মধুর কণ্ঠে ডাকে, 'কই দিদিমণি, আসুন! যেতে-যেতেও যেতে পারলাম না। আপনারা যদি অমন অবুঝের মত কথা বলেন, একটু বুঝে-শুঝে বলুন। যাতে আপনিও গলে না যান, আর এই গরীবও না মারা যায়। পঞ্চাশটা টাকা ফেলে দিন।'

প্রফুল্ল ফিরে আসায় দিদিমণি কি বউদি রাণীর মুখখানাও বেশ খুশী-খুশী দেখা যায়, 'আরো পাঁচ টাকা কমাও! পয়তাল্লিশ টাকায় দিয়ে যাও। তোমাকে সত্যি বলছি এর বেশি আর আমার কাছে নেই। দিয়ে যাও শাড়িখানা, দোহাই তোমার।'

প্রফুল্লর মন গলে যায়, বলে, 'অনেক লোকসান হোল, কিন্তু আপনি যখন বলছেন অত করে, যা পারেন তাই দিন।'

বউ-ঝিরা ভয়ে ভয়ে আঁচলের গিঁট খুলে জানালা দিয়ে পাঁচ টাকা দশ টাকার নোটগুলি গলিয়ে দেয় প্রফুল্লের হাতে। প্রফুল্ল খবরের কাগজে জড়ানো নেই বিষ্ণুপুরের সিল্কের বাণ্ডিলটা তুলে দেয় করপল্লবে। তার পর মধুর হেসে জোড় হাতে নমস্কার করে, 'গাল দেবেন না। মন্দ বলবেন না যেন।'

তারপর দ্রুত-পায়ে জানলার কাছ থেকে সরে যায়। মোড়ের পানওয়ালা,

বিড়িওয়ালাকে দু'টো টাকা বখরা ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে চলন্ত বাস-ট্রামের হ্যাণ্ডেল ধরে।

বিষ্ণুপুরী সিল্কের শাড়িখানা কেবল মহাজনের মাল নয়, প্রফুল্লর ব্যবসার মূলধন। এ জিনিস কি করে হাতছাড়া করবে প্রফুল্ল। যদি করতে পারত, তাহ'লে মল্লিকার চেয়ে বেশী যোগ্য, বেশী সুন্দর হাত আর কার ছিল।

দু'-তিন মিনিটের মধ্যেই মল্লিকা ফিরে এল। প্রফুল্লর প্রায় বুকের কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'শোন। মা'র কাছে ছিল দশ টাকা। আর আমি লুকিয়ে লুকিয়ে পনের টাকা জমিয়েছিলাম। এই নাও। আমার কাছে আর কিছু নেই।'

প্রফুল্ল ভারি দুঃখিতভাবে বলল, 'কিন্তু মল্লী, ও শাড়ীর দাম যে অনেক বেশী।'

আসল দামের চেয়েও যদি বেশি দামী না হতো জিনিসটা যদি দিয়ে দেওয়া যেত, যদি ছেড়ে দেওয়া যেত!

মল্লিকা মুখ-ভার করে বলল, 'ঘর থেকে টাকা যখন বের করেছি, তখন এ টাকা আর ফিরিয়ে নেব না। কাল তুমি আমার জন্য পঁচিশ টাকার যোগ্যই আর একখানা শাড়ি নিয়ে এসো। মা'র কাছে আমার মুখ থাকবে।' বলে নোট আর কাঁচা টাকাগুলি প্রফুল্লর সার্টের ঝুল-পকেটে গলিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে চলে গেল মল্লিকা।

প্রফুল্ল একবার ডেকে বলল, 'শান, শোন।'

মল্লিকা শুনল না।

খোলা দরজা দিয়ে গলিতে নেমে পড়ল প্রফুল্ল। চিন্তিত মনে এগুতে লাগল বড় রাস্তার দিকে। শাড়িটা মল্লিকাকে দিয়ে আসতে পারলেই ভালো হোত। অবশ্য দামী শাড়ি, প্রফুল্লর ব্যবসার জিনিস। কিন্তু মল্লিকা কি আরো দামী নয়? আরো দামী নয় দু'জনের সংসার, মধুর গৃহস্থালী? ব্যবসা? এ ব্যবসা ছাড়া কি ব্যবসা নেই?

মোড়ের পানওয়ালার কাছে আসতেই, পানওয়ালা মৃদু হেসে বলল, 'কই বাবু, আসুন, পান নিয়ে যান আপনার।' তার পর এদিক্ ওদিক তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে কেবল পানই নয়, প্রফুল্লর পকেটের বাণ্ডিলের মত আর একটি সমান আকারের সমান ওজনের বাণ্ডিল প্রফুল্লর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এই নিন আপনার জিনিস। এবার পানের দামটা—'

প্রফুল্ল কি ভেবে একটি টাকা তুলে দিল পানওয়ালার হাতে।

পানওয়ালা চেঞ্জ না দিয়ে তেমনি হাতের তালু প্রসারিত করে রইল, 'তারপর কালো কালো দাঁত বার করে হেসে বলল, 'ছিঃ দোস্ত! অত কমে কি হয়?'

ম্লান মুখে প্রফুল্ল বলল, 'আজ কিছু হয়নি জনার্দ্দন।'

জনার্দ্দন বলল, 'আজ না হয়েছে কাল হবে। পুলিশ আজও এসে ঘুরে গেছে, সেলামী নিয়ে গেছে। এর কমে আমি কিছুতেই পারব না।'

হাতের পাঁচ আঙুল মেলে ধরল জনার্দ্দন।

ক্ষুণ্ণ মনে মল্লিকার টাকা থেকে পাঁচটা টাকা জনার্দ্দনকে দিয়ে দিল প্রফুল্ল। তার পর পুলিন্দাটি হাতে করে ফের সরে এল দোকানের কাছ থেকে। আর নয়, আর এ সব নয়। মল্লিকার জিনিস মল্লিকাকেই আজ সে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। এ ব্যবসার এখানেই শেষ হয়ে যাক। মল্লিকা শাড়ি পরুক। আর তার সেই শাড়িপরা রূপ দেখে চোখ ভরুক, মন ভরুক প্রফুল্লর।

বড় রাস্তা থেকে ফের গলিতে ঢুকল প্রফুল্ল, তারপর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'মল্লিকা, একবার শোন।'

গলার সাড়া পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকা এসে জানালায় দাঁড়াল, 'ব্যাপার কি?'

'তোমার শাড়ি নাও তুমি।'

কাগজে মোড়া বাণ্ডিলটা শিকের ভিতর দিয়ে গলিয়ে দিল প্রফুল্ল, 'তোমার জিনিস তুমি নাও।' ভারি অন্যমনস্ক প্রফুল্ল। মুখে বলছে কিন্তু মনে তার হাজার দ্বন্দ্ব, হাজার ওঠা-পড়া, হাজার রাজ্যের ভাবনা।

মল্লিকা বলল, 'না না, সে কি? কাল এনে দেবে, সেই তা কথা ছিল।'

'না না কাল নয়, আজই নাও। কাল হয় তো আর পারব না। অদ্ভুত আবেগ প্রফুল্লর গলায়।

'ভিতরে আসবে না?'

প্রফুল্ল বলল, 'আজ নয়, আরেক দিন আসব। তাড়াতাড়ি নাও, কেউ দেখে ফেলবে।'

সত্যিই একটি লোক যেন দূর থেকে লক্ষ্য করছিল প্রফুল্লকে। লোকটির মুখ যেন চেনা-চেনা। মল্লিকার হাতে কোন রকমে বাণ্ডিলটা গুঁজে দিয়ে প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি জানলার কাছ থেকে সরে এল। তার পর গলির আর এক মুখ দিয়ে বেরিয়ে চলন্ত বাসে উঠে পড়ল।

গোটা কয়েক স্টপেজ ছাড়াবার পর হঠাৎ খেয়াল হোল প্রফুল্লর। তাই তো, কোন বাণ্ডিলটা দিয়ে এসেছে মল্লিকাকে? তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিল।

পকেটের বাণ্ডিল পকেটেই আছে। হাতটায় যেন আগুনের ছোঁয়া লাগল। বাস না থামতেই তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল রাস্তায়।

'কি ব্যাপার, কিছু খোয়া গেছে নাকি?' এক সহযাত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, খোয়া গেছে, সব খোয়া গেছে প্রফুল্লর।

তবু মনের সংশয় ভাঙবার জন্ত বাণ্ডিলের ওপরের কাগজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল প্রফুল্ল। কোন ভুল নেই। সেই আনকোরা নতুন আগুনের রঙের বিষ্ণুপুরী সিল্ক। প্রফুল্লর ভবিষ্যতের সমস্ত রঙ যে আগুনে ঝলসে গেছে, পুড়ে গেছে ছাই হ'য়ে!

গোটা কয়েক ফিরতি বাস পেল পঁয়ত্রিশ নম্বরের। প্রফুল্ল প্রতিবার ভাবল উঠে পড়ে। কিন্তু আর উঠে লাভ কি! আর কি উঠবার জো আছে?

এতক্ষণে মল্লিকা মোড়কটা নিশ্চয়ই খুলে ফেলেছে। তারপর বাগবাজার শ্যামবাজার বউবাজারের আরো অনেক তন্বী সুন্দরী বউ-ঝি, কুমারী কিশোরীদের মত মল্লিকাও হতভম্ব, নিষ্পলক চোখে মোড়কের ভিতরের জিনিষটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। প্রফুল্লর অপূর্ব ম্যাজিকের বলে মল্লিকার হাতের সেই বিষ্ণুপুরী সিল্কও এক গজ পাটের চটে এতক্ষণে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে।

হলদে বাড়ি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

বোধ

বাড়ি থেকে বের হবার আগে অনুরূপ সগুনির্মিত জলচৌকিখানা একাই দু'হাতে উঁচু ক'রে নিয়ে এসে ছোট ভাই স্বরূপের সামনে ফেলে দিয়ে বলল, 'নে বাতার চার পাশ ঘুরিয়ে লতাপাতা ফুলটুল যা পারিস ক'রে দিস। আমি যাচ্ছি হাটখোলা, আরো কিছু কাঠ নিয়ে আসতে হবে সরকারদের আড়ৎ থেকে। ওসব কুঁড়ে কাজ করবার সময় নেই আমার। শালার সাউর সখ দেখ; কালী প্রতিমার চৌকি হবে তা আবার ফ্রেমের ওপর কক্কা না হলে চলবে না। বেশি খাটিসনে' পয়সা কিন্তু বেশি দেবে না।'

স্বরূপ হেসে বলল, 'আচ্ছা সেজন্য ভেবো না দাদা।'

বাড়ি থেকে নেমে অনুরূপ হাটের পথ ধরে। যতটা দেখা যায় অনুরূপের দ্রুত গমনভঙ্গির দিকে স্বরূপ অপলকে চেয়ে থাকে, চলমান মানুষকে কি সুন্দর দেখায়। ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে স্বরূপের। জীবনে আর কোনোদিন সে চলতে পারবে না। বহুকাল পরে আজ ক'দিন যাবৎ ক্ষোভটা আবার নতুন ক'রে জাগছে স্বরূপের। এতদিন সে যেন একথা ভুলেই ছিল। নিজের পায়ের অভাব বহুকাল তার মনে ছিল না। দাদা বৌদির অনুতপ্ত লজ্জা স্নেহ কৃতজ্ঞতা তার সমস্ত ক্ষোভকে ভুলিয়ে রেখেছিল। দাদার ব্যবহারে নিজের দুঃখের কথা মনে করতেও লজ্জা হোতো স্বরূপের। তার শোক আর অনুশোচনার সান্ত্বনা স্বরূপকেই দিতে হোতো। এত ভেঙ্গে পড়েছিল অনুরূপ। কিন্তু দিনের পর দিন সময় বদলায়, আর বদলায় মানুষের মন। কিন্তু সময় কি সত্যই বদলায়—না মানুষের পরিবর্তনে সময় বদলালো বলে মনে হয়। আগের মত তেমনই তো দিনের পর রাত রাতের পর দিন আসছে, ঋতুর আবর্তন ঘটছে ঠিক একই নিয়মে। সামনের কৃষ্ণকলি গাছটা তেমনি বছরে একবার ফুলে ভেঙ্গে পড়ছে, ঝরে ঝরে শূন্য হয়ে যাচ্ছে গাছ; কিন্তু আবার বছর ঘুরে আসছে সেই ফুল ফোটার পালা। না সময় ঠিক এক রকমই বোধ হয় থাকে। বদলায় কেবল মানুষ—মনে আর ব্যবহারে।

কম দিন কি হোলো? সাত সাতটা বছর ঠিক একই ছোট কামরায় বন্দীভাবে কেটে গেল স্বরূপের। আরো কত সাত বছর জীবনের বাকি কে জানে। সেই দুর্ভাগ্যের দিনটা স্বরূপের স্পষ্ট মনে পড়ে। এতদিনে একটা কথাও সে বিস্মৃত হয়নি। অনুরূপের বড় ছেলে ধলুর অত্যন্ত জ্বর। তিন বছরের শিশু দুঃসহ উত্তাপে ছটফট করছে। আর পিপাসা। পৃথিবীর সমস্ত জল শুষে না দিলে তৃষ্ণার যেন আর নিবৃত্তি হবে না। কিন্তু ডাক্তার বলে গেছেন জল নয়, যদি দিতেই হয়, কচি ডাবের জল ফোঁটা ফোঁটা ক'রে দেওয়া যেতে পারে। গাছ তো আছে একটা নিজেদের, বেশ বড় গাছ, নারকেলও অনেক। কিন্তু নারকেল গাছে উঠবার তেমন অভ্যাস নেই। স্বরূপ ইতস্তত করছে দেখে অনুরূপ ধমক দিয়ে বলল, 'ছেলে যায় তৃষ্ণায় মরে আর তুই গড়িমসি করছিস। নিয়ে আয় না ডাবটা পেড়ে।' ধমক খেয়ে লজ্জিতভাবে স্বরূপ গিয়ে গাছে উঠেছিল। ওঠার সময় কোনো অসুবিধাই তো হয়নি, নামার সময়ই যত বিপত্তি। তাও বেশির ভাগই তো নেমে এসেছিল। ওখান থেকে পড়ে গেলে হয় তো তেমন কিছু হোতো না যদি ভাঙ্গা শিশি বোতলের বাক্সটা ওখানে না থাকত। বাক্সটা ঘর পরিষ্কার করার সময় অনুরূপ ওখানটায় ঠেলে রেখেছিল। আর সরিয়ে নেওয়া হয়নি। তারপর একটু একটু ক'রে কাটতে কাটতে জেলা শহরের সিভিল সার্জেন তার দুটো পায়েরই হাঁটু পর্যন্ত বাদ দিয়ে দিলেন। মাঝখানে একবার কলকাতায় অনুরূপ তাকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন আর সময় সেই। সেখানকার ডাক্তাররা বলেছিলেন, প্রথমেই নিয়ে এলে অন্যরকম হোতো। ধলু বেঁচে উঠেছে। আশ্চর্য তারপর থেকে তার আর কোনো কঠিন অসুখ হয়নি। আর স্বরূপও তো জীবনে মরে যায়নি। নিচের দিকটা না থাকলেও শরীরের বাকি যেটুকু আছে সেটুকু তো সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান! ফাঁড়াটা কারো জীবনের ওপর নিয়ে যায়নি। কেবল পায়ের ওপর দিয়ে গেছে! এর চেয়ে বড় দুর্ঘটনা তো ঘটতে পারত। একথা অনুরূপকে একদিন বলতে শুনেছে স্বরূপ। এমন কথা আগেকার দিনে অবশ্য অনুরূপ বলত না। কিন্তু মানুষ যে একই কথা চিরদিন বলবে তার কি মানে আছে? একেক সময় যদি তার একেক কথা মনে আসে তা সে বলবে বই কি।

জলচৌকিটা টেনে নিয়ে উড্‌পেনসিল দিয়ে তার পায়া আর বাতার ওপর লতাপাতার নক্সা আঁকতে লাগল স্বরূপ। পরে এগুলিকে বাটালি দিয়ে কেটে কেটে তুলতে হবে।

ভাঁড়ার থেকে কিছু ডাল নিতে এসে বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢুকবার সময় মল্লিকা

একটু থেমে দাঁড়াল। স্বরূপের কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেসে বলল, 'ও, লতা পাতার ছবি। আমি ভাবলুম বুঝি বসে বসে কারো মুখ আঁকছ। কি মনোযোগ বাপরে বাপ! একজন মানুষ এসে গায়ের ওপর পড়লেও হুঁস হয় না।' স্বরূপ বলল, 'হুঁস হলেই যে গায়ের ওপর থেকে মানুষটি আবার সরে যাবে। তার চেয়ে বেহুঁস থাকাই ভালো। যেয়ো না, কেবল লতাপাতাই নয়। মুখও একখানা আঁকছি।'

মল্লিকা বলল, 'কার মুখ।'

'সে কথা মুখে বলা যায় না।'

'আহা হা, এই ভাঙাচোরা হতকুচ্ছিৎ মুখ আঁকতে মানুষের বয়ে গেছে।'

মল্লিকা হাসল।

হাসলে এখনও ভারি সুন্দর দেখায় মল্লিকাকে। অবশ্য সেই প্রথম যৌবনের রূপ আর নেই। গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে হওয়ার পর মল্লিকার শরীর অনেক ভেঙে গেছে। মেজাজও হয়েছে খিটখিটে। তবু তার সামান্য এক আধটু হাসি-ঠাট্টার সূত্র ধরে স্বরূপের মন সেই উচ্ছল অতীতের দিনগুলিতে ফিরে যেতে চায়। কাল যেন বদলায়নি। যেন ঠিক তেমনি আগের মতই আছে মল্লিকা। স্বরূপ যেন জোর ক'রে পরিবর্তনকে ঠেকিয়ে রাখবে। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয় মল্লিকা, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার ভালোও লাগে। স্বরূপের ব্যবহারে কোথায় যেন একটু মোহ আছে। একটু পরে মল্লিকা বলে, 'যাই রান্না চড়িয়ে দিয়ে এসেছি ছোট্ট ছেলেটা কি রকম চেঁচাচ্ছে শোন, এমন অশান্তই হয়েছে ছেলেটা, তুমি কিন্তু বেশ আছ ঠাকুরপো, এসব কোনো ঝামেলা নেই।'

'তা ঠিক।' নিচু হয়ে স্বরূপ আবার নক্সার কাজে মনদিল।

কিন্তু ছেলেটি সত্যিই ভারি চেঁচাচ্ছে, বছর খানেক মাত্র বয়স, কিন্তু সমস্ত বাড়িটা যেন ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলবে এত আক্রোশ ওর, গলায় এত তীক্ষ্ণতা।

স্বরূপ একটু বিরক্তির সুরে চেঁচিয়ে বলে, 'এই মিনি টেঁন্টু কাঁদছে কেন রে এত? শান্ত করতে পারিস না? নিয়ে যা ওখান থেকে কোলে ক'রে'। মিনি অনুরূপের বড় মেয়ে, বছর পাঁচেক বয়স। সে কোথায় খেলতে বেরিয়েছে। সে এল না, তার বদলে ছেলেকে স্তন দিতে দিতে মল্লিকা নিজেই এল, 'ভারি যে চটে গেছ ঠাকুরপো।' স্বরূপ বলল, 'তোমার ছেলের জ্বালায় কি স্থির থাকবার জো আছে। ক্রমেই এক এক ডিগ্রী ওপরে উঠছে এক একজন। এটি হবে সব চেয়ে সেরা দেখে নিয়ো।'

বেশ অপ্রসন্ন হোলো মল্লিকা, জোর ক'রে একটু হেসে বলল, 'কি করব ভাই, মেরে তো আর ফেলতে পারি না।'

মনে মনে হাসল স্বরূপ। ছেলেমেয়ের বিরুদ্ধে সামান্য কিছু বললেই মল্লিকা চটে যায়। ওদের কিছু বলা মানে মল্লিকাকেই আঘাত করা। অপমান করা। ছেলেমেয়ের সঙ্গে এত একাত্ম হয়ে গেছে মল্লিকা। তাকে যদি ভালোবাসতে হয়, শুধু তার দোষত্রুটিগুলিকেই নয়, তার সন্তানদের দোষ ত্রুটি শুদ্ধ ভালবাসতে হবে।

স্বরূপ জবাব দিল, 'না, মেরে ফেলবার দরকার হয় না, শান্ত করতে পারলেই হয়।'

মল্লিকার মুখ কঠিন হয়ে গেছে, বলল 'শান্ত না হলে শান্ত করে কি ক'রে? বেশ, দিয়ে যাচ্ছি তোমার কাছে শান্ত কর দেখি তুমি।'

স্বরূপ সত্রাসে বলল, 'না বৌদি মাপ কর, আমার এখানে দিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। কাজ আছে আমার।'

মল্লিকা আরো ক্ষুদ্ধ হোলো, 'কাজ আর মানুষেরও আছে। ভয় নাই ঠাকুরপো তোমার এখানে সত্যিই দিয়ে যাবো না। আমার ছেলে-মেয়েদের যে তুমি দেখতে পার না তা অত স্পষ্ট ক'রে না বললেও মানুষ বুঝতে পারে। কি করব ভাই তোমাকে সংসারী করবার চেষ্টা কি আমরা কম করেছি। কিন্তু মেয়ে দিতে কেউ রাজী হোলো না, তাছাড়া তুমি নিজেও তো একেবারে ধনুর্ভাঙ্গা পণ ক'রে বসলে আমি বিয়ে করব না।' স্বরূপ বলল, 'পণ না করলেই বুঝি দু'পা কাটা ছেলের কাছে কেউ মেয়ে দিত? তাছাড়া তখন ভেবেছিলাম বিয়ে করলেই তোমার সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ হবে। কিন্তু না বিয়ে করলেও যে ঝগড়া বাঁধতে পারে তা তো ভাবিনি।'

মল্লিকা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'নাও তুমি তো আছ কেবল তোমার রসের কথা নিয়ে। খেয়ে না খেয়ে আর তো কোনো কাজ নেই দিনরাত।' বলে মুখ ঘুরিয়ে মল্লিকা চলে গেল।

বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অনুরূপ করেছিল একথা ঠিক। কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া স্বরূপের নিজেরও অমত ছিল। নিজেই চলতে পারে না তারপর আবার একটা বোঝা। ব্যর্থ হয়ে অনুরূপ হতাশ ম্লান মুখে বলেছিল, 'আমার জন্যেই তোর যত দুর্দশা। কিন্তু বিয়ে তোকে আমি দেবই। মেয়ে কি আর জুটাবেতে

মিলবে না? টাকা হলে বাঘের চোখ মেলে, আর তো মেয়ে। পদ্মার পারটা দেখা হয়নি। ওদিকে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে। কিন্তু আমার সংসারও তো আমার একার নয়, তোরও। সব ভার—আমার স্ত্রী-পুত্র সব তোকে আমি সঁপে দিলুম। সব তোর। সংসারের কর্তাও তুই।'

একথা শুধু মুখেই নয়, কাজেও দেখাতে অনুরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করত। তার সংসারের সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে সে স্বরূপের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করত। তার পরামর্শ গ্রহণও করত। হিসাবপত্র জমাখরচের খাতা তার কাছে এনে ফেলে রাখত। স্বরূপ যদি বলত, 'অত আমাকে দেখাচ্ছ কেন দাদা, আমি তো আর তেমন রোজগার করিনে!' অনুরূপ বিস্মিত হয়ে বলত, 'রোজগার করিসনে মানে, আমার চেয়ে ঢের বেশি রোজগার করিস। শুধু ছুটাছুটি করি বলেই কি আমি বেশ রোজগার করি ভাবিস। আমার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা তোর, অনেক বেশি বুদ্ধি। তাছাড়া সূক্ষ্ম হাতের কাজে কেউ তোর জোড়া নেই।'

কারুকার্য সত্যিই বেশ ভালো করে স্বরূপ, খাট আলমারিগুলির অলংকরণ ছাড়াও মাঝে মাঝে কাঠের উপর নানা রকম মুর্তি স্বরূপ বাটালি দিয়ে কুঁদে কুঁদে তুলেছে। নিজের চলবার শক্তি নেই বলে যেন বিশ্বের গতিশীলতাকে সে কাঠের ওপর রূপায়িত ক'রে তুলতে চায়। এ অঞ্চলে এমন কারিগর সত্যিই আর নেই।

শুধু সাংসারিক বিষয়েই নয়, অনুরূপ নিজের স্ত্রীকেও বেশির ভাগ সময় স্বরূপের পরিচর্যায় নিযুক্ত করেছে। বলেছে, 'আহা, আমাকে তোমার দেখতে হবে না। আমার হাত পা আছে, নিজেরটা আমি নিজেই ক'রে নিতে পারি। ওকে তুমি একটু দেখ। ওকে একটু ফুর্তিতেই রাখতে চেষ্টা কর। আমোদ প্রমোদের আমার অভাব কি, কত খেলাধুলো বন্ধুবান্ধব আমার, কিন্তু ওর তো এখন আর সেসব কিছু নাই। ওকে যাতে তুমি খুশিতে রাখতে পার, আনন্দে রাখতে পার, তাই কর। বড় আদরের ভাই আমার। এমন ভাই কারো হয় না।' আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় মনে হয়েছে স্বরূপকে এর চেয়ে বেশি কিছু দিতে পারলে যেন অনুরূপ খুশি হোতো।

কিন্তু অনুরূপের এই দান গ্রহণ ক'রে স্বরূপের তেমন তৃপ্তি ছিল না। সে আবার মল্লিকাকে তার দাদার কাছে পাঠিয়ে দিত। বলত, 'যাও আর বেশি ভদ্রতা করতে হবে না। মন যে কোথায় পড়ে আছে তাতো জানি।'

মল্লিকা হেসে বলত, 'মন কি একটা আগ্‌লা ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটুলি যে,

কোথাও ফেলে আসব। মন আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। গল্প করতে তোমারই বোধ হয় মন যাচ্ছে না।' স্বরূপ গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছ, 'ঠিক বলেছ, আমি একটু অন্যমনস্কই আছি। একটা মূর্তির কথা ভাবছি। আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।'

মল্লিকা ক্ষুণ্ণ হয়ে যেতে যেতে বলেছে, 'সারাদিন তো তোমার ঐ এক ভাবনা, কি যে তোমার ভাব কিছু বুঝতে পারিনে।'

তারপর মল্লিকা যখন স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করেছে তখন হঠাৎ স্বরূপ ডেকে বলেছে, 'বউদি শুনে যাও তো, জল নিয়ে এস আসবার সময় এক গ্লাস।'

শুনে অনুরূপ হেসে চুপে চুপে বলেছে, 'জলটা তো ছল, শুনে আসাটাই বড় কথা। এবার বুঝি মান ভঞ্জনের পালা। দেখে শুনে বরের চেয়ে দেবর হতেই লোভ যাচ্ছে কিন্তু।'

মল্লিকা বলেছে, 'বেশ আমার কি, যাব না আমি।'

'না না ছি, বললাম বলেই নাকি?'

মল্লিকা অবশ্য কৌতুক ক'রে জল না নিয়েই উপস্থিত হয়েছে, 'কি আবার ডাকছ কেন?'

'জলের জন্য বললাম যে? জল আনলে না কেন?'

'সত্যিই খুব তৃষ্ণা পেয়েছে?'

'হ্যাঁ,' কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গল্প ক'রে গেছে মল্লিকা।

কিন্তু সে সব দিন আর নেই। মল্লিকার অনেক কর্তব্য বেড়েছে। অনেক দায়িত্ব। অলক্ষ্যে—জীবনের সংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। কেবল স্বরূপ রয়ে গেছে একই জায়গায়। সে পঙ্গু, সে নড়তে পারেনি। কেবল তার জীবনেই কোন অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ল না। এখন তার মাঝে মাঝে মনে হয়, ভূভারত খুঁজে অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, বধির যেমনই হোক একটি মেয়েও কি পাওয়া গেল না স্বরূপের জন্য? আর কিছু সে না হোক শুধু একটি মেয়ে? মনে হয় অনুরূপ আর মল্লিকা ইচ্ছে ক'রে তাকে ঠকিয়েছে। কেবল সোহাগ আদর ক'রে ভুলিয়ে রেখেছে, পাছে স্বরূপের সন্তান এসে সম্পত্তির অংশীদার হয়। স্ত্রীপুত্র নিয়ে সম্পূর্ণ আপন একটি সংসারের জন্য স্বরূপের মন হাহাকার করে ওঠে।

বেলা দুপুরের সময় হাটখোলা থেকে নৌকাভরা কাঠ নিয়ে অনুরূপ ফিরে এল। কী কাঠফাটা রোদ। অনুরূপ এসেই জিজ্ঞাসা করল, 'হয়ে গেছে কাজটা?'

স্বরূপ বলল, 'না খানিকটা বাকী আছে, হয়ে যাবে'খন।'

অনুরূপ রেগে গিয়ে বলল, 'হয়ে যাবে'খন ? এতক্ষণ কি করেছিস বসে বসে। কাজ নেই কর্ম নেই, কেবল গল্প আব গল্প ?'

স্বরূপও চটে গেল, 'কাজ না ক'রে কি মাগনা খাই তোমার সংসারে ? নিজের কাছেই নিজেকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ দেখি। কাজ আমি করি, না, করি না ? খুব খাটিয়ে নিয়েছ, আর কেন ? এত আমি করব কার জন্যে ? কে আছে আমার সংসারে ?'

অনুরূপ কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চুপ ক'রে গেল।

মল্লিকা এদিকে এসেছিল, অনুরূপ বাধা দিয়ে বলল, 'না দরকার নেই তোমার ওদিকে যাওয়ার. এত ক'রেও যখন ওর মন পাওয়া গেল না, সংসারে নাকি ওর কেউ নেই, তখন তোমাকে আর যেতে দেব না আমি।'

মল্লিকা হেসে বলল, 'এতকাল যেতে দিয়ে এখন তোমার আপত্তি হোলো এই বুড়ো বয়সে ?'

স্বরূপের কাছে গিয়ে মল্লিকা বলল, 'কি ভাই ঠাকুরপো, খুব যে ঝগড়া করা হচ্ছে। ঝগড়া করবার পালা আমার সঙ্গে তোমার দাদার সঙ্গে তো নয়।'

স্বরূপ একবার মুহূর্তের জন্য মল্লিকার দিকে তাকাল, তার চোখে আর ঠোঁটের কোণে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ যেন ঝলসে উঠল ! মল্লিকা কি ভেবেছে এমনি ছদ্ম সোহাগে আজীবন তাকে ভুলিয়ে রাখবে ? নিজেদের গোপন উদ্দেশ্য চিরকাল তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে ? মল্লিকা কি ভুলে গেছে সে চার সন্তানের মা ? কোনো কথা না বলে স্বরূপ আবার তার কাজে মন দিল।

স্বরূপের চোখে কি ছিল কি জানি, মল্লিকার বুকে গিয়ে তা যেন তীরের মত বিঁধল। আরো কত দিনই তো স্বরূপ এমন রাগ ক'রে তার সঙ্গে কথা বলেনি, কিন্তু এমন ব্যথা তো কোনোদিন পায়নি মল্লিকা। অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে মল্লিকা ফিরে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর মনটা একটু শান্ত হলে অনুরূপের মনে হোলো সত্যিই বড় স্বার্থপরের মত কাজ হয়েছে। সংসার নিয়ে, নানা বিষয়-আশয় নিয়ে এতদিন সে এমন মত্ত হয়ে ছিল যে, স্বরূপের দিকে তেমন ক'রে তাকাবার কথা ইদানীং তার মনেই হয়নি। মল্লিকার ওপর তার সমস্ত পরিচর্যার ভার দিয়ে স্বরূপের বিয়ের কথা প্রায় ভুলেই বসেছিল। অনুরূপ, অবশ্য চেষ্টা সে কম করেনি আগে, কিন্তু আরো চেষ্টা দরকার। টাকার দিকে অনুরূপ তাকাবে না, যেমন করেই হোক বিয়ে

সে দেবেই স্বরূপের। তাছাড়া স্বরূপ ইচ্ছা ক'রে না করলে তো কোনো কাজ তাকে আর করতে বলবে না অনুরূপ।

বিকালে সে নিজেই কাঠের ওপর সূক্ষ্ম কারুকার্য করতে বসল। কিন্তু মনে যত অটুট সংকল্পই থাক, হাত আর চলে না। এসব কাজ করতে ধৈর্য থাকে না অনুরূপের। এত দিনের অনভ্যস্ততায় সমস্ত চারুশিল্প যেন ভুলতে বসেছে অনুরূপ। কাজ কিছুতেই এগুলো না। বিরক্তি আর হতাশায় বারবার তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে লাগল। ইদানীং এসব কাজে বড় একটা হাতই দেয়নি অনুরূপ। বড়বড় শাল গাছের গুঁড়ি এসেছে বন্দর থেকে। কাঠের কারবার ক'রে পয়সা করবার দিকেই তার ঝোঁক ছিল। বিষয়-আশয়, ক্ষমতা প্রতিপত্তি এই ছিল তার লক্ষ্য। কখন অলক্ষ্যে শিল্পীর দক্ষতা তার হাত থেকে খসে পড়ে গেছে সে টেরও পায়নি। মনের মধ্যে হঠাৎ যেন কেমন ক'রে উঠল অনুরূপের। শুধু স্বরূপই যে পঙ্গু তা নয়, শিল্পের দিকে নিজেকেও সে পঙ্গু ক'রে তুলেছে। এতদিন স্বরূপকে সে নিজেরই এক অংশ মনে করত। তার গৌরব, তার খ্যাতিতে নিজেকেই গর্বিত বোধ করত। আজ স্বরূপ যখন দূরে সরে যাচ্ছে, তখন অনুরূপের মনে হোল তার খ্যাতি আর গৌরব নিয়েই সে যাচ্ছে—অনুরূপের জন্য তার কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট রেখে যাবে না—অথচ সৌন্দর্যসৃষ্টির সম্পূর্ণ সুযোগ অনুরূপই তাকে দিয়েছে। সংসারের সমস্ত চিন্তা ভাবনা সমস্ত কাঠিন্য থেকে তাকে সে সন্তর্পণে দূরে সরিয়ে রেখেছে, না হলে এত কি বড় হতে পারত স্বরূপ। কিন্তু নেপথ্যে এই আত্মোৎসর্গের জন্য কোনো দামই থাকবে না অনুরূপের। সমস্ত কীর্তি, সমস্ত গৌরব কেবল স্বরূপেরই রয়ে যাবে।

স্নানের পর মাথা আঁচড়াবার সময় হঠাৎ বহুদিন পরে নিজের চেহারার দিকে চোখ পড়তে মল্লিকা চমকে উঠল। এত খারাপ হয়ে গেছে তার চেহারা, ভেঙে-চুরে এই ক'বছরে সে এমন জীর্ণ হয়ে গেছে, তা তো সে ধারণাও করতে পারেনি। ক্ষোভে আর লজ্জায় নিজের দিকে সে যেন নিজেই চাইতে পারল না। বহু সংকোচে সে স্বরূপকে খাবার পরিবেশন ক'রে এল। গোপনে একবার তাকিয়ে দেখল স্বরূপ ঠিক সেইভাবে আর তার দিকে চেয়ে নেই। অন্যমনে কি ভাবছে। তার চোখ থেকে মোহ খসে পড়ে গেছে আর মল্লিকার দেহ থেকে সৌন্দর্য আর যৌবন। মল্লিকার মনে হোলো স্বরূপের মোহই যেন এতদিন সেই সৌন্দর্যকে

বাঁচিয়ে রেখেছিল। নীরবে পরিবেশন ক'রে মল্লিকা চলে এল। কোনো কথা বলতে চেষ্টা করল না, স্বরূপও কোনো কথা বলল না।

কোলের ছেলেটা কাঁদতে লাগল; কিন্তু মল্লিকার আজ আর তাকে ধরতে ইচ্ছা করল না, কেমন যেন উদাস হয়ে গেছে মন।

রাত্রে গুহদের বাড়িতে ছেলেরা সখের থিয়েটার করবে। মেয়েদের বসবার জন্য আলাদা বন্দোবস্ত হয়েছে। পাড়ার মেয়েদের বিশেষ ক'রে নিমন্ত্রণ করেছে তারা, তাছাড়া অনুরূপের অবস্থা একটু ভালো হওয়ার পর ইদানীং খুব খাতির আর সম্মান করছে গুহরা।

মল্লিকা বলল, 'ছেলেপুলেরাই যাক আমি আবার কি দেখব ওর।'

অনুরূপ জবাব দিল, 'সে ভালো দেখায় না, যখন বলে গেছে এত ক'রে। খোকার অন্নপ্রাশনে ও বাড়ির মেয়েছেলেও এসেছিল, মনে নেই তোমার?'

মল্লিকা সাধারণ একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শাড়ী পরল। অনুরূপ দেখে বলল, 'ও কি, না না ভালো একটা দামী শাড়ী পরে যাও।' মনে মনে স্বামীর এই ব্যাপারে এই মনোযোগে মল্লিকা খুশিই হোলো, মুখে বলল, 'কিন্তু এদিকে যে বুড়ো হয়ে গেলাম, বয়স তো হয়েছে, এখন কি আর ও সব ফ্যাসান মানায়?'

অনুরূপ বলল, 'ফ্যাসান অবশ্য আমিও পছন্দ করি না। তবু ভালো একটা দামী শাড়ী পরেই যাও। না হলে লোকে ভাববে বাড়িতে দালান দিলে হবে কি, অনুরূপ তেমনই কৃপণ আর ছোটলোকই রয়ে গেছে।'

মাত্র এই? মল্লিকার আর একদিনের কথা মনে পড়ল। কি কথায় কথায় মল্লিকা বলে ফেলেছিল, 'আর এখন তো বুড়ো হয়েই গেলাম, বয়স কম হোলো না কি?'

শুনে স্বরূপের কি রাগ, 'আমার সামনে মুখেও এন না ও সব কথা।'

মল্লিকা হেসে বলেছিল, 'মুখে না আনলে কি কথাটা মিথ্যে হয়ে যাবে? আমার বয়স তুমি জোর করেই কমিয়ে রাখবে নাকি ভেবেছ?'

স্বরূপ জবাব দিয়েছিল, 'হ্যাঁ জোর জোর করেই তো রাখব।'

শাড়ীটা অবশ্য কি ভেবে মল্লিকা বদলিয়েই পরল, তারপর বলল, 'আর দেরি করো না, ঠাকুরপোর একটা বিয়ে দাও—খুব সুন্দরী মেয়ে যেন হয়, টাকার জন্য ভেবো না; এতদিন দেরি করাই ভারি অন্যায় হয়ে গেছে।'

অনুরূপ ভেবে অবাক হলো, হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে এ কথা বলল কেন মল্লিকা।

স্বরূপ নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কি একটা নূতন মূর্তি খোদাই করেছে যেন। আজকাল অনেক কম কথা বলে স্বরূপ। মল্লিকাকে ডাকাডাকিও তেমন করেনা। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া আর বিশেষ কোন কথাবার্তাও হয় না। মল্লিকার মাঝে মাঝে আসতে ভারি ইচ্ছা হয়, কিন্তু কোথায় যেন বাঁধে, কোথায় যেন একটু অভিমান আর সংকোচ লেগে থাকে। স্বরূপের মনের ভাব অবশ্য বদলায়নি। সে যেন এদের চাতুরী সব ধরে ফেলেছে ; কেমন একটা ঘৃণাই তার মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। গভীর মনোযোগে মূর্তি খোদাইর কাজ করতে থাকে স্বরূপ। ভিন্ন জেলার এক জমিদার বাড়ি থেকে বায়না দিয়ে পাঠিয়েছে। কাজ সুন্দর হলে টাকাও যেমন পাওয়া যাবে, যশও তেমন দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়বে। নিপুণ অভ্যস্ত হাত স্বরূপের তেমনই চলতে থাকে। কিন্তু মূর্তির মধ্যে তেমন লালিত্য আর সৌন্দর্য যেন আসতে চায় না। বিরক্ত হয়ে বার বার নতুন ক'রে স্বরূপ কাজ আরম্ভ করে।

অনুরূপ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, এই দু'তিনটা মাস গেলে বিয়ে সে যেমন হোক অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে দিয়ে দেবে স্বরূপের। একটা সম্বন্ধ প্রায় ঠিক হয়েই আছে; কিন্তু সমস্ত সংসারে যেন আর রস নেই। জায়গায় বসে বসে স্বরূপ যেমন হাঁক ছাড়ত তেমন আর করে না। তার হাসিতে উল্লাসে সমস্ত বাড়ি যেমন চঞ্চল হয়ে উঠত, তেমন আর হয় না। কিন্তু মল্লিকা যেমন গৃহকর্ম করত, সন্তান পালন করত, তেমনি ক'রে যায়। কাঠের কারবার অনুরূপের তেমন চলতে থাকে। কিন্তু সংসারটাও যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একেক সময় এই বিষয়-আশয়, কারবার-পত্র ভারি দুর্বহ মনে হয় অনুরূপের। বেশ আছে স্বরূপ, নিজের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে বেশ আছে সে, আর ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি ক'রে অনর্থক নিজেকে ক্ষয় ক'রে ফেলেছে অনুরূপ। বিয়ে ক'রে ছেলেপুলে নিয়ে অকালে বুড়ো হতে চলেচে। বুড়ো হতে চলেছে মল্লিকা। কিন্তু স্বরূপ নিজেকে ধরে রেখেছে, একটুও অপচয় হতে দেয়নি। যৌবনকে বেঁধে রেখেছে। সমস্ত ভবিষ্যৎ তার সামনে। আর অনুরূপ কেবল অতীতের বস্তু! এতকাল যে যৌবনের সৌন্দর্যকে সে আকণ্ঠ পান করেছে তা অনুরূপের মনে পড়ল না, ভবিষ্যৎকে সে যে আর স্বরূপের মত উপভোগ করতে পারবে না, এই ক্ষোভই তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখল।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন স্বরূপের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুরূপ চমকে উঠল, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো লালচে। অনুরূপ ধমক দিয়ে বলল, 'খুব রাত জেগেছিস বুঝি ?'

স্বরূপ, বলল 'না।'

'না তো শরীর দিনের পর দিন অমন খারাপ হচ্ছে কেন ? কি এত কাজ। কি এমন তোর দুর্গোৎসব পড়েছে শুনি।'

স্বরূপ অল্প একটু হাসল, 'ও কিছু না, তুমি ভেবোনা দাদা।'

স্বরূপ তো বলল ভেবোনা, কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই পড়ল জ্বরে। অনুরূপ বলল, 'কিরণ ডাক্তারকে 'কল' দিই কেমন ?'

স্বরূপ বলল, 'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন।'

কিন্তু ব্যস্ত শেষ পর্যন্ত হতেই হলো। কিরণ ডাক্তার বলে গেল, জ্বরটা ভাল নয়। কয়েকদিন বাদে বলল, ডবল নিউমোনিয়া। শহর থেকে পর পর দু'জন ডাক্তারকে দেখাল অনুরূপ, কিন্তু কারো ভাবভঙ্গিতেই ভরসা পেল না। সদর থেকে আরো বড় ডাক্তার আনতে যাবে স্বরূপ তাকে ইসারায় থামিয়ে ফিস ফিস ক'রে বলল, 'যাবে যাও, বারণ তো তুমি শুনবে না। কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা তুমি আমার কাছে থাক।'

অনুরূপ ফের ধমক দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু উপস্থিত সবাই সেই পরামর্শই দিল। মরবার আগে স্বরূপ বড় ভাইকে তার একটা ইচ্ছা জানিয়ে গেল। তার শেষ অসম্পূর্ণ মূর্তিটা যেন সম্পূর্ণ করে অনুরূপ। অনুরূপ চোখের জলের ভিতর দিয়ে বলল, 'আচ্ছা, কিন্তু তোর হাতের কাজে বাটালি ধরতে কি আমি পারব।'

স্বরূপ বলল, 'তুমি আমার চেয়ে অনেক ভালো পারবে।'

শোকাচ্ছন্ন কয়েকটি দিন কাটল। অনুরূপের কোন কাজে মন নেই, খেয়াল নেই কোন দিকে। একদিন মল্লিকাই মনে করিয়ে দিল, 'ঠাকুরপো কি একটা মূর্তির কথা না বলেছিল শেষ সময় ?'

অনুরূপ বলল, 'ঠিক ঠিক, তার শেষ ইচ্ছা তো রাখতে হবে। কোথায় সেই মূর্তি যদি তাই নিয়ে একটু অন্যমনস্ক থাকা যায়, স্বরূপের কাজ নিয়ে ভুলে থাকতে হবে অনুরূপকে।

পাটের মোটা একটা চট দিয়ে ঢাকা মূর্তিটা স্বরূপের ঘরেরই এক কোণে পড়ে ছিল। বড় ছেলের সাহায্যে ধরাধরি ক'রে মূর্তিটাকে আরো একটু সামনের দিকে এগিয়ে আনল অনুরূপ। চটটা সরিয়ে ফেলল। তবু এ'কদিনেই বেশ ধুলো জমেছে। মাকড়সা মাথার ওপর দিয়ে বুনে গেছে জাল।

অনুরূপ মল্লিকাকে ডেকে বলল, 'পরিষ্কার শুকনো একখানা ন্যাকড়া নিয়ে এসো তো।'

আলমারির মাথার ওপর থেকে ছেঁড়া কাপড়ের বোচকাটা পেড়ে ন্যাকড়া বের করতে একটু দেরি হল মল্লিকার। তারপর সেখানা হাতে ক'রে এসে বলল, 'এই নাও, কি মূর্তি কেটেছে ঠাকুরপো।'

অনুরূপ রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'দেখ চিনতে পার কিনা।'

চেনা কঠিন নয়। মল্লিকারই আবক্ষ প্রতিকৃতি। এখনকার ভাঙ্গাচোরা ক্ষয়ে যাওয়া মল্লিকার নয়। দশ বৎসর আগের যৌবনোচ্ছলা সপ্তদশী মল্লিকা আবার এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

মূর্তিটাকে একবার দেখেই মল্লিকা সলজ্জে তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছিল, অনুরূপ হাত বাড়িয়ে তার শীর্ণ হাতখানা চেপে ধরল, 'যেয়ো না দাঁড়াও'। 'মল্লিকা সভয়ে বলল, 'কি বলছ ?'

অনুরূপ অদ্ভুত একটু হাসল, 'দাঁড়াও এখানে—বাকিটা তো আমাকেই শেষ করতে হবে।'

কচুরির গাটনায় সমস্ত নদীটা ঢাকা পড়ে আছে। জানালা দিয়ে যতটা দেখা যায় কেবল সবুজ পাতাওয়ালা বড় বড় কচুরি। দেখতেই ভয় করে। নিজেদের ঘাট দিয়ে যখন ছোট ছোট কচুরিগুলিকে ভেসে যেতে দেখত, ছেলেবেলায় ভারি আনন্দ হোতো সুপ্রিয়ার। সাঁতার দিয়ে অনেকগুলো ফুলসুদ্ধ একেকটা কচুরির ঝোপকে সুপ্রিয়া তুলে নিয়ে আসত। কচুরির গাছকে ছোট ফুল গাছের মতই সুন্দর মনে হোতো সুপ্রিয়ার। তখন কে ভেবেছিল তার রূপ এমন বীভৎস হতে পারে। তিন দিন ধরে গাটনা পড়ে আছে নদীতে। পারাপার সব বন্ধ প্রায়। অতি কষ্টে দু'একখানা ডিঙি নৌকো দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টা বসে এপার ওপার হচ্ছে। ভিড় বাঁচিয়ে এপারে যে দু'চারজন মাষ্টার আর কেরানী সখ ক'রে এসে বাসা বেঁধেছে, খেয়াপারের এই ব্যবস্থাই তাদের সম্বল। আর কি অদ্ভুতই যে এখানকার পারাপারের ব্যবস্থা! একটা ব্রীজ ক'রে নিলেই তো হয়। কিন্তু জমিদার নাকি তা হতে দেয় না। তার চেয়ে বছর বছর খেয়াঘাট ইজারা দিয়ে জমিদারের অনেক লাভ। আর এখানকার লোকগুলিই বা কি কুঁড়ে। জমিদারের উপদ্রবই শুধু নয়, কচুরির অত্যাচারও সহ্য করে। কচুরিগুলিকে তারা ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে না? অথচ পারাপার তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন। আর কি অদ্ভুত এই রূপগঞ্জ শহরের গড়ন। দু'দিকে দু'টুকরো হয়ে রয়েছে। আচ্ছা, নদীই একে ভেঙেছে না এমন টুকরো টুকরো ভাবেই এদের জন্ম? বোধ হয় তাই হবে। এ শহরের কোনো প্লান নেই। যার যে পারে খুশি ঘর তুলেছে, দোকান পেতেছে বাজার মিলিয়েছে। শহর? রূপগঞ্জ আবার শহর। একটা আদালত, স্কুল আর বাজার থাকলেই যদি তা শহর হোতো। কিন্তু রূপগঞ্জ নামটা ভারি সুন্দর। নাম আর রঙের জন্য সুপ্রিয়া যে কোনো জিনিসকে সহ্য করতে পারে। না, দৃশ্যটা নিতান্ত মন্দ নয় এখানকার। ওপারের সারি সারি গুদাম ঘরগুলির টিনের চালার ওপর জ্যোৎস্না এসে পড়ে রূপোর মত দেখাচ্ছে। আর তাদের এপারের খণ্ডটিকে মনে হচ্ছে ছোট্ট একটি দ্বীপের মত।

সুপ্রিয়া টের পাচ্ছে তার এলো ক'রে জড়ানো খোঁপার ওপর নীলাম্বর এসে আলগোছে তার আঙুলের ডগাগুলো রেখেছে। আদরের এই ভঙ্গিটুকু নীলাম্বরের পুরানো।

'রাত তো অনেক হয়েছে। শুতে যাওনি কেন ?'

সুপ্রিয়া প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেল, বলল, 'শেষ হোলো তোমার লেখা ?'

'হাঁ, হয়েছে মোটামুটি।' নীলাম্বরের স্বর একটু উচ্ছল, একটু বা উল্লসিত, 'বাঃ চমৎকার জ্যোৎস্না তো বাইরে। শুতে যেতে আমার ইচ্ছে করছে না। একটা গান করবে ? আচ্ছা এখানে বসেই গুনগুন করোনা একটু।' মানে গুনগুন করতে যদি পারত নীলাম্বরই করত।

সুপ্রিয়া বলল, 'ভালো হয়েছে বুঝি লেখাটা ?' নিস্পৃহ উৎসাহহীন সুপ্রিয়ার স্বর, শুধু তাই নয়, অতি অনাবশ্যক একটা খোঁচা।

সন্ধ্যা বেলার কথাটা এতক্ষণে নীলাম্বরের মনে পড়েছে। একটু গম্ভীরভাবে বলল, 'কি ক'রে বুঝলে ?'

সুপ্রিয়া তীক্ষ্ণ একটু হাসলে 'আমাকে গান গাইতে বলছ যে। তোমার কলম দিয়ে যখন ভালো লেখা ঝরবে আমার গলা দিয়ে তখন সুর ঝরবে না কেন। তোমার মন যখন গুনগুন করছে আমার মনেরও তখন গুনগুন করাই তো উচিত।'

নীলাম্বর দাঁতে দাঁত চাপল, তারপর বলল, 'কিন্তু ঔচিত্য বড় কঠিন, বড় নীরস কিনা তাই ওদিক আমরা বড় ঘেঁষতে চাই না। আমার মন যখন গুনগুন করে তোমার তখন হুল ফোটাবার দিকে মন যায়। দুজনে মিলে আমরা একটি মৌমাছি।' নীলাম্বরের স্যাণ্ডালের শব্দ ওঘর পর্যন্ত গিয়ে মিলিয়ে গেল।

ওপারের নদীর ধারের একটা চালা ঘর থেকে ঠন্‌ঠন্ শব্দ এতক্ষণ শোনা যাচ্ছিল। বোধ হয় ঝালাইকারদের ঘর হবে। অনেক রাত অবধি ওরা কাজ করে। সে শব্দ এখন বন্ধ হয়েছে। হয়ত এতক্ষণে তারা শুয়ে পড়ল। কি দোষ ছিল সুপ্রিয়ার ? রবিবার। অফিস ছিল না। সারাদিন নীলাম্বর কেবল লিখছিল আর ছিঁড়ছিল। সুপ্রিয়া সংসারী কাজকর্ম করল, একটা মাসিকের পাতা উল্টাল, বীরেনবাবুদের বাসায় গিয়ে গল্প ক'রে এল কিছুক্ষণ, সারল দৈনন্দিন সান্ধ্য প্রসাধন, তখনও নীলাম্বর কেবল লিখছে আর কাটছে। সুপ্রিয়া গিয়ে কাছে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল, 'এই, যাও এখন ঘুরে এস একটু নদীপার দিয়ে, এত যদি কাটছ তবে লিখছ কি, সব সময়ে কি লেখা যায় ?'

নীলাম্বর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল, তার সমস্ত মুখে পশুর হিংস্রতা, ঠিক সুপ্রিয়ার গলার ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ ক'রে বলেছিল, 'এই যাও বীরেনবাবুর বাসা থেকে একটু ঘুরে এস না, সব সময়েই কি এখানে আসতে হয় ?'

সুপ্রিয়া নীরবে বেরিয়ে এসেছিল।

লেখক হলেই কি অভদ্র হতে হবে, স্বামী হলেই কি ইতর হতে হবে ? আর এমন শুধু আজই যে প্রথম তা নয়, এমন প্রায় প্রত্যেক দিন। সুপ্রিয়ার যেন আলাদা কোনো জীবন নেই, অস্তিত্ব নেই, নেই তার নিজের ভালোলাগা না-লাগা। সে শুধু নীলাম্বরের মনের বিভিন্ন অবস্থার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। নীলাম্বর অন্তত তাই চায়। যখন ভালোলাগে নীলাম্বরের, ভালো কোনো আইডিয়া আসে মাথায়, তখন নীলাম্বরের উচ্ছ্বাসের বন্যায় তাকে ভেসে যেতে হবে, হাসতে হবে গান গাইতে হবে। আর নীলাম্বর যখন লিখতে পারবে না যখন লেখা কাগজ টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে থাকবে, তখন সুপ্রিয়া কেন দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্তাক্ত হতে থাকবে না, আত্মহত্যা ক'রে মরবে না কেন ?

প্রথম প্রথম হেসেছিল সুপ্রিয়া, পাগলামি ভেবে প্রশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু এতো পাগলামি নয়, কলম নিয়ে বসলেই পাগল সাজবার কারো অধিকার থাকে না। নীলাম্বরের এ পাগলামি নয়, হীন স্বার্থপরতা। নীলাম্বর চেনে শুধু নিজেকে, নিজেকেই সে একমাত্র ভালোবাসে।

নীলাম্বর ফিরে এল তার লিখবার ঘরে। নতুন লেখাটা নিয়ে প্রথম দিক থেকে চেষ্টা করল একটু পড়তে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও যেমন ভালো লেগেছিল তেমন আর লাগল না। নীলাম্বর জানত এমনই হবে, এমনই হয়। কাল আরো খারাপ লাগবে, পরশু আরো। নীলাম্বর টেবিলের এক ধারে ঠেলে রাখল লেখাটা। তার সারাদিনের পরিশ্রমের ফল।

কি ঝগড়াটে মেয়েই হয়েছে সুপ্রিয়া। এই সাত আট বছর পরেও সেই গেঁয়ো স্বভাব তার রয়েই গেছে; বদলেছে কেবল তার বাইরেটা। নীলাম্বরের সাহচর্য শুধু কি তার বাইরের ঔজ্জ্বল্যই বাড়িয়েছে ? অন্তরকে সমৃদ্ধ করেনি ? সুপ্রিয়া শিখেছে সাজসজ্জা; আর সূক্ষ্ম শিল্পের মতই কথার সে অনুশীলন করেছে—ঠিক তার প্রসাধনের মত। এর চেয়ে তার সেই গেঁয়ো ভাষায় ঝগড়াও যেন ভালো

ছিল। এমন তীক্ষ্ণ বাঁকা ফলকের মত শ্লেষ সে কোথায় শিখল, কোথায় পেল এমন ব্যঙ্গের বিষাক্ত ভঙ্গি।

একি নীলাম্বরের নিজেরই শিক্ষা? তার কথা থেকে, তার লেখা থেকেই কি এসব সংগ্রহ করেছে সুপ্রিয়া? তার লেখার মতই কি সে ব্যর্থ নিষ্ফল, ভাবহীন, প্রাণহীন, শুধু ভঙ্গিসর্বস্ব ভাষা? নীলাম্বর তার আত্মপীড়নে ফিরে এসেছে! একি সুপ্রিয়ার দোষ নয়, সুপ্রিয়াই নয়, নীলাম্বরেরই বিকৃত প্রতিধ্বনি? সবাই ভাবে, সুপ্রিয়াও ভাবে, নীলাম্বর দাম্ভিক স্বার্থপর, সে শুধু নিজেকে ভালোবাসে। কিন্তু ঠিক নিজেকে নয়, নীলাম্বর ভালোবাসে নিজেকে টুকরো টুকরো করতে।

আরও কিছুক্ষণ পরে সুপ্রিয়া এসে দাঁড়াল, 'রাত আর বেশি নেই, চল শোবে।'

বেশ একটু বেলাতেই নীলাম্বরের ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে দেখল সুপ্রিয়া কখন উঠে গেছে। নীলাম্বর আবার চোখ বুজল, কিন্তু বেশিক্ষণ এভাবে চোখ বুজে থাকা যায় না, জানালা দিয়ে রোদ এসে গায়ে পড়েছে। হাত বাড়িয়ে জানালার একটা পাট ঠেলে দিতে যাচ্ছে, সুপ্রিয়া এসে ঘরে ঢুকল। স্নান সেরে চা ক'রে এনেছে রান্নাঘর থেকে, আর একটা প্লেটে কতকগুলি সাদা ফুল। মুচকি হেসে বলল, 'কবিরা ফুল ভালবাসে।' নীলাম্বর চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'ফুল খেতে ভাল-বাসে না তা বলে।'

'জানো না, অনেক ফুলই খাওয়া যায়, এমন কি তোমাদের এই কচুরি ফুলেরও বড়া মন্দ লাগে না। কোনো জিনিসই অকেজো নয় একেবারে। দেখেছ কচুরির গাটনা অনেক পাতলা হয়ে গেছে, আজ ওপারে বেড়াতে যাবে। ক'দিন ধ'রে শ্যামলবাবু আর বীরেনবাবুর বউয়ের মুখ দেখেই কাটল।'

নীলাম্বর বলল, 'কেন শ্যামলবাবু আর বীরেনবাবুর বউয়ের মুখ মন্দ কি?'

কপট ঈর্ষার ভঙ্গিতে সুপ্রিয়া বলল, 'হুঁ তাতো বলবেই। পরের বউয়ের মুখ কেউ মন্দ দেখে না, বিশেষ ক'রে সাহিত্যিকরা।'

নীলাম্বর বলল, 'দেখ, পরের বউয়ের মুখের দিকে চাওয়া যদি এক আধটু অভ্যাস করতাম, তা হলে তোমার কাছে এমন সুলভ হতাম না, একটু মান থাকত।'

হলদে বাড়ি

'খবরদার অমন কাজও কোরো না, তা হলে আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না।'

মুখ দেখানটা দরকার। এই সামাজিক চেতনা সুপ্রিয়ার প্রথম থেকে। তখনকার একদিনের কথা নীলাম্বরের মনে পড়ছে। নীলাম্বর একটা কবিতা লিখেছিল। তার ভাবটা ছিল, তোমার চুল খুলে দাও, সেই চুলের আড়ালে ঢেকে রাখব আমার মুখ, লুকিয়ে রাখব নিজেকে সমস্ত পৃথিবী থেকে।

সুপ্রিয়া হেসে উঠেছিল, 'ও বাবা অত চুল পাব কোথায়। আর তা হলে কি লোকের কাছে মুখ দেখাবার জো থাকবে, বদনাম রটবে দুজনেরই।' কাকে মুখ দেখাতে চায় সুপ্রিয়া ? শুধু নীলাম্বরকে বুঝি নয়। সুপ্রিয়ার ঘোমটার আড়ালে শুধু কি দেখবার আর দেখাবার লুব্ধতা ?

কিন্তু নীলাম্বর তো তা চায় না, সে দেখাতে চায় না নিজেকে, সারাজীবন সে কেবল পালিয়ে বেড়াচ্ছে, মানুষের কাছ থেকে কেবল লুকোতে চেয়েছে, পৃথিবীকে সে ভয় করে, ভয় করে মানুষের দৃষ্টিকে। আর সমস্ত পৃথিবীময় কেবল অসংখ্য মানুষ যারা কিলবিল করছে পোকার মত, মশকের মত দুঃসহ গুঞ্জন তুলছে।

আট ন'ঘণ্টা অফিসের ক্লান্তি। সারাদিন কাগজপত্রের ফাইল সামনে ক'রে ঝুঁকে থাকতে হলো নীলাম্বরকে। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে মুক্তি। কিন্তু বাসায় ফিরে এসে নীলাম্বর দেখল সুপ্রিয়া এখনও ফেরেনি। ক'দিন পরে সে ছাড়া পেয়েছে। মনের সাধ মিটিয়ে গল্প করবে, গল্প করতে পারলে মেয়েরা আর কিছু চায় না। চাকর শম্ভু বসে বসে বিড়ি টানছিল, নীলাম্বরকে দেখে তাড়াতাড়ি বিড়িটা আঙুলের আড়াল ক'রে বলল, 'আপনার খাবার ঢেকে রেখে গেছেন মা।'

নীলাম্বর বলল, 'কৃতার্থ করেছেন।'

তবু খবর যেটুকু আছে শম্ভু জানাবেই, 'বীরেনবাবুর বাসার মেয়েদের সঙ্গে থানার বড়বাবুর বাসায় গেছেন বেড়াতে, ফিরতে একটু দেরি হলে—'

নীলাম্বর বলল, 'আমাকে রান্না চড়াতে বলে গেছেন বুঝি।'

শম্ভু বলল, 'না বাবু।'

'আচ্ছা তুই যা।'

একটু পরে শ্যামলবাবু এলেন তাঁর বাসা থেকে। নীলাম্বর বলল, 'কি খবর ?'

'চায়ের নেমতন্ন ক'রে পাঠিয়েছে আমার স্ত্রী। এত কাছে আছেন অথচ আলাপ নেই। আপনিও যেমন লাজুক, সেও তেমনি, কিন্তু আপনাকে সে চেনে, আপনার লেখা খুব পড়েছে, খুব নাকি ভালো লাগে তার।'

'তাই নাকি? তবে তো আমারই তাঁকে চা খাইয়ে দেওয়া দরকার।'

শ্যামলবাবু বললেন, 'কি যে বলেন, আমার অবশ্য গল্পটল্প ততো ভালো লাগে না। পরে একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'মানে শুধু আপনার বলে নয়—'

নীলাম্বর সপ্রতিভভাবে বলল, 'তাতে কি? গল্প তো শুধু ছেলেমানুষ আর মেয়েমানুষের জন্যই।'

সুপ্রিয়া এল সন্ধ্যার পর, বলল, 'কথায় কথায় একটু দেরি হয়ে গেল। রাগ করনি তো?'

নীলাম্বর একটু তাকাল সুপ্রিয়ার দিকে। দেরি হওয়ার জন্য কিছু মাত্র অনুশোচনা নেই। এই ছদ্ম সৌজন্য কেন। সমস্ত মুখ সুপ্রিয়ার আনন্দে ঝলমল করছে। সে যেন সম্পূর্ণ নতুন জীবন লাভ করেছে। ক'দিন সে শুকিয়ে ছিল, আজ এই সন্ধ্যায় সে নতুন ক'রে ফুটে উঠেছে, নিজের সৌরভে নিজেই সে আমোদিত। নীলাম্বরকে তার না হলেও চলে। বরং নীলাম্বরের কাছেই সে নিষ্প্রাণ, শুষ্ক দুঃসহ।

নীলাম্বর বলল, 'না রাগ করব কেন?'

নীলাম্বর লক্ষ্য করল সুপ্রিয়া কেবলই হাসি চাপবার চেষ্টা করছে।

'কি ব্যাপার হাসছ কেন?'

'না অমনিই। হেমাঙ্গবাবুর ক্যারিকেচার মনে পড়ছে।'

'হেমাঙ্গবাবু আবার কে?'

'পারুলের দাদা। ভারি চমৎকার লোক। দিল্লীতে পাঁচশ টাকা মাইনে পান। এখানে ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন বোনকে দেখতে, অবশ্য বোনকে দেখতে শুধু নয়, রমলা এসেছে খবর পেয়েছেন কিনা।'

'রমলা আবার কে এল?'

'পারুলের কি রকম ননদ, বিয়ে পাশ করেছে এবার। বেশ সুন্দরী মেয়ে, ওই যে সুশান্ত সেন, উপন্যাস লিখে যিনি খুব নাম করেছেন তাঁরই বোন।' পৃথিবীর সমস্ত ভিড়কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে সুপ্রিয়া। সুশান্ত সেনকে ছেড়ে সুপ্রিয়া নিজেই আবার হেমাঙ্গবাবুতে এসে পড়ল, 'বেশ সুপুরুষ হেমাঙ্গবাবু আর এত আমুদে লোক, গল্প করতে পারেন। সব রকমের গুণ আছে ভদ্রলোকের, গান-বাজনার চর্চাও আরম্ভ করেছেন দিল্লীতে। দু-একবার অনুরোধ করতে গানও শোনালেন একখানা।'

নীলাম্বর বলল, 'থামলে কেন, হেমাঙ্গবাবুর গুণবত্তার বর্ণনা শেষ হয়ে গেল এরই মধ্যে?'

সুপ্রিয়া হঠাৎ যেন থমকে গেল। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল নীলাম্বরের মুখের দিকে, বলল, 'ও আমারই ভুল।' পরমুহূর্তে চোখ এগড়ে বলল, 'দেখলাম আমারই ভুল হয়েছে। তাইতো আমার তো এসব দেখবার কথা নয়। দেখলাম হেমাঙ্গ নামে একটা ছোঁড়া একখানা পা তার খোঁড়া, পাঁচ টাকা মাইনের কোথায় চাকর খাটে আর রমলা নামে টাক পড়া এক বুড়ী। খুব ঝগড়া হচ্ছে তাদের মধ্যে, দাম্পত্য কলহ।'

নীলাম্বরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল সুপ্রিয়ার চোখের উপর। তারা সব জানে, পরস্পরকে তাদের আর চিনতে বাকি নেই। কতদিন তারা নিজেকে নিঃসঙ্কোচে অনাবৃত করেছে পরস্পরের কাছে। তাই কি পরস্পরের খুঁত তারা এমন নিখুঁত ভাবে চিনেছে, তাই কি আভরণ ভেদ ক'রে তাদের দৃষ্টি শুধু ক্ষতস্থানে গিয়েই বিদ্ধ হয়? দুই ধারাল তরবারির মত তাদের মিল কি শুধু আঘাতে আঘাতে?

নিঃশব্দে সুপ্রিয়া বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সমস্ত অন্তর তার বেদনায় ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। সারাজীবন কি এমনি করেই কাটবে? পৃথিবীর কোনো সার্থকতার কথা, কোনো ঐশ্বর্যের কথা ভুলেও নীলাম্বরকে শোনান যাবে না, নীলাম্বর তাতে ব্যথা পায়, তার অসার্থকতাকে তা ব্যঙ্গ করে। নীলাম্বর একদিন বলেছিল, 'তুমি আমার সমস্ত পৃথিবী, আমি লুকিয়ে থাকতে চাই তোমার মধ্যে।' কিন্তু লুকাবার জন্যে তো পৃথিবীর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু গহ্বরের। সংকীর্ণ কুৎসিত গহ্বর নিঃশ্বাসে যা বিষাক্ত হয়ে উঠে। পৃথিবীর ঐশ্বর্য সুপ্রিয়ার মধ্যে নেই, কিন্তু তার উপভোগের আনন্দও কি নীলাম্বরের সহ্য হবে না? সে কি শুধু খুঁড়ে খুঁড়ে গহ্বর তৈরী করবে? নীলাম্বরের সমস্ত সাহিত্যচর্চাও কি তাই? সেও শুধু তার নিজেকে ঢাকবার নিজেকে লুকাবার গুহা মাত্র। এইজন্যই কি সেখানেও সে স্বস্তি পাচ্ছে না; কেবল নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে? নদী পরিষ্কার হয়ে গেছে আজ। স্বচ্ছ স্ফটিকের মত জল। নীচে তারাভরা আর এক আকাশ স্পন্দিত হচ্ছে। ওপরের দিকে চাইতে সুপ্রিয়ার ইচ্ছা করছে না, আকাশের এই ছায়া যেন আরো সুন্দর।

ওপার থেকে জয়ঢাক আর কাড়ার কর্ণভেদী আওয়াজ ভেসে আসছে। আর হল্লার শব্দ! কোত্থেকে এক সার্কাসের দল এসেছে, ছোট্ট শহর তাতেই তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। আশেপাশের গ্রাম থেকে কেবলই ভেঙ্গে পড়ছে জনতা। আনন্দ কত সহজ কত সুলভ, যেখানে সেখানে ছড়ান রয়েছে শুধু কুড়িয়ে নিলেই

হয়। কাল ওদের স্পেশাল শো। থানার স্টাফ সব যাবে। হেমাঙ্গ আর রমলা তাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ ক'রে রেখেছিল।

হেমাঙ্গ আর রমলা। কি সুন্দর, কি চমৎকার তাদের জীবন। সমস্ত পৃথিবী যেন শুধু তাদের জন্যই। কাউকে তারা বাদ দিতে চায় না, কিছুই ছাড়তে চায় না, সমস্ত কিছু যেন তাদেরই অলংকার—তাদেরই অহংকার। একঘর লোকের মধ্যেই হেমাঙ্গ আর রমলা যেন পরস্পরকে বেশি উপভোগ করছিল। ভিড় তারা ভালবাসে, ভিড় থেকে নয়, ভিড়ের মধ্যেই তারা লুকাতে চায়। হেমাঙ্গ আর রমলা। বেশি কথা তাদের দরকার হয় না। শুধু আভাস ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

আর আজকাল বেশি কথা নীলাম্বর সুপ্রিয়ারও প্রয়োজন হয় না। শুধু আভাস আর ইঙ্গিত তাদেরও যথেষ্ট।

সহসা সমস্ত মন সুপ্রিয়ার বেদনায় অভিভূত হয়ে গেল। রাগ নয়, নীলাম্বরের ওপর করুণ সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠল মন। অনুকম্পা হতে লাগল। আঘাত নয় আর, কলহের শেষ হোক। ঈর্ষার দহন থেকে সে তাকে স্নিগ্ধ শ্যামল পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ে আসবে, শিল্পসৃষ্টির মধ্যেও নিজের পঙ্গুতাকেই যদি নীলাম্বর শুধু প্রত্যক্ষ করতে থাকে, সেখানেও শুধু যদি ঈর্ষা আর প্রতিযোগিতা তাকে দগ্ধ করতে থাকে, সেই গুহা নীলাম্বর ছেড়ে আসুক। জীবনের আরো অনেক দিক আছে, জীবন আরো বড়, আরো বিচিত্র। সুপ্রিয়া নীলাম্বরের পৃথিবী হতে চায় না, এই বিপুল পৃথিবীর মাঝখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নীলাম্বরের সঙ্গেই সমস্ত পৃথিবীকে সে উপভোগ করতে চায়।

কিন্তু লিখবার ঘরের ঠিক সামনে এসে সুপ্রিয়া থমকে দাঁড়াল। সমস্ত ঘর ভরে অস্থিরভাবে পায়চারী করছে নীলাম্বর। তার চোখে সন্ধ্যাবেলার সেই হিংস্রতা, এ ঘরের জানালা দিয়েও সেই তারায় ভরা আকাশ দেখা যাচ্ছে। পূব দিকে গোল হয়ে এতক্ষণে চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে। আয়নার মত নদীর স্থির স্বচ্ছ জল টল টল করছে। জ্যোৎস্নার অজস্র প্লাবনে ছোট্ট শহর নিজেকে মেলে ধরেছে। কিন্তু নীলাম্বরের চোখে বিস্ময় নেই, মুগ্ধতা নেই, সে আজো লিখছে। সহসা কালকের রচনাটাকে নীলাম্বর নির্মমভাবে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলল। তৃপ্ত নেই সন্তুষ্টি নেই কিছুতে। কয়েকখানা সাদা পাতা টেনে আবার সে লিখতে আরম্ভ করেছে। অমন সুন্দর আর এক পৃথিবী সৃষ্টি না করা পর্যন্ত সে থামবে না।

সুপ্রিয়া দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে রইল।

একটু একটু ক'রে ভুবনবাবুর সেবা আর পরিচর্যার ভার সুব্রতের হাতে এসে পড়ল। দুর্ঘটনাকে কেউ তখনো স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। ভুবনবাবুর বৃদ্ধা মা শুধু কাঁদছেন, হিমানী লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন, কিছু করতে বললে বলছেন, 'আমাকে কিছু বোলো না সুব্রত। আমি সব করতে পারব, কিন্তু ওঁর ওরকম অসহায় দৃষ্টি সহ্য করতে পারব না।'

সুব্রত সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'কিন্তু আপনাকেই তো সহ্য করতে হবে মামীমা।' এর চেয়ে বেশি যে সুব্রত কি বলতে পারে তা সে ভেবে পায় না।

অমূল্য আরো বেশি নার্ভাস এবং সব বিষয়েই অপটু। বিশেষ ক'রে এই দুর্ঘটনায় সে এত বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে তাকে প্রকৃতিস্থ করতেই আর একজনের প্রয়োজন। চিকিৎসকের অসাবধানতার জন্যই হোক বা যেমন করেই হোক কথাটা প্রকাশ হয়ে গেছে, ভুবনবাবু দক্ষিণ অঙ্গ যে তুলতে পারছেন না—এটা পক্ষাঘাতের লক্ষণ। জীবনে এটা আর নিরাময় নাও হতে পারে।

শুশ্রূষা পরিচর্যায় আবাল্য সুব্রতের অভ্যাস আছে। সুনিপুণ তৎপরতায় এ সব সে করতে পারে, কিন্তু প্রবোধ সান্ত্বনা দিতে হলে সে বড় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বিশেষতঃ এদের নিজেরই যখন আশ্বস্ত হওয়া উচিত। চিকিৎসা সবে আরম্ভ হলো। অর্থব্যয়ের সাধ্যও এঁদের আছে। কিছুদিন ভুবনবাবু শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে সংসার অচল হবে তাও নয়। বলতে গেলে কলেজ তো তাঁর নিজের হাতেই গড়া। কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনাই ভুবনবাবুর সম্বন্ধে করবেন।

কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের রূঢ় মনোভাবে সুব্রত লজ্জিত বোধ করে। হৃদয়ের কোমলবৃত্তি বোধ হয় কিছু তার নেই। মায়ের স্নেহ, স্ত্রীর ব্যাকুলতা অনুভব করবার শক্তি তার নেই বলেই সে তাদের এমন বিপদের দিনে এত চুলচেরা হিসাব করতে পারছে। ফলে, এই অবিচারের শাস্তিস্বরূপ সুব্রত রোগীর সমস্ত দায়িত্ব নিজের ওপর তুলে নিল। কয়েকদিন পরে ভুবনবাবুর মা প্রবোধ মানলেন, হিমানীকেও সমস্ত সহ্য ক'রে অত্যাবশ্যক গৃহকর্মে মন দিতে হলো। কিন্তু পরিচর্যার ভার রইল সুব্রতের নিজের হাতেই। হিমানী কি অমূল্য যে মাঝে মাঝে শুশ্রূষা না করতে আসেন তা নয়, কিন্তু ভুবনবাবুর কিছু মনঃপূত হয় না। এ সব

কাজে কোনো ত্রুটি সুব্রতও সহ্য করতে পারে না, হোক তা অপটুতাজনিত। রোগীর অসুবিধা অস্বাচ্ছন্দ্য তাতে তো আর কমে না। রোগী নিজেই অসহায়, আর কারো অসহায়তা সহ্য করবার শক্তি তার নেই।

সকলেই দেখা করতে আসেন। কলেজের সহকর্মীরা ছাড়াও ভুবনবাবুর বন্ধু-বান্ধব প্রচুর। পাণ্ডিত্য তাঁকে আত্মকেন্দ্রিক করেনি ; বরং বেশি মাত্রায় তিনি সামাজিক। সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ। এত বই আর এত মানুষের সঙ্গে এক জীবনে এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় কি ক'রে উঠতে পারলেন তাই আশ্চর্য্য। তাঁর দাক্ষিণ্যে যাঁরা কৃতজ্ঞ তাঁদের ভিড়ও কম হয় না। বিশেষ ক'রে ছাত্রছাত্রীর দল। কতজনে তাঁর বাড়িতে থেকেই মানুষ হয়েছে, বই দিয়ে, অর্থ দিয়ে, বিনা বেতনে কি অর্ধ-বেতনে পড়বার সুযোগ দিয়ে কতজনকে তিনি কত ভাবে সাহায্য করেছেন। সবাই দেখা করতে চায়, কৃতজ্ঞতা সহানুভূতি জানাতে চায়। ভুবনবাবু ভিতরে ভিতরে ক্লান্তি বোধ করেন। কিন্তু তা প্রকাশ হতে দেন না। সবার সঙ্গেই হেসে দু'একটা কথা বলেন। উল্টে এদেরই ভরসা দেন। এরা এত ভয় পাচ্ছে কেন। কি আর এমন তাঁর হয়েছে। দু'দিনেই তিনি সেরে উঠবেন। আবার ক্লাসে আর খেলার মাঠে তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেবেন। তাঁর জন্যে কোনো দুশ্চিন্তা যদি তারা করে তা হলেই বরং তিনি বেশি অস্বস্তি বোধ করবেন।

কিন্তু তাঁর ভয় আর আশঙ্কা, তাঁর অসহায়তা সুব্রতের কাছে গোপন থাকে না। গোপন করতে তিনি চানও না, সমস্ত দুর্বলতা প্রকাশ ক'রে তিনি সুব্রতের ওপর নির্ভর করতে চান। বলেন, 'আজকাল দুর্বল হতেই ভাল লাগে সুব্রত। এতদিন সকলের নির্ভরযোগ্য হতে পেরে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি আজ দেখছি কারো ওপর নির্ভর করবার আরামও কম নয়। আমি খুব স্বার্থপরের মত কথা বলছি বুঝি সুব্রত ?'

সুব্রতের কাছে ভুননবাবু আদর্শস্থানীয়। তাঁকে সামনে রেখে সুব্রত নিজের জীবন গঠন ক'রে চলেছে। তাঁর জীবনের ইতিহাস জয়ের ইতিহাস, সার্থকতার গৌরবে উজ্জ্বল। নিজের জীবনকে তিনি নিজের হাতে গঠন করেছেন। দৃঢ় অধ্যবসায়ে সমস্ত প্রতিকূলতা তিনি অতিক্রম করেছেন। কোনো মোহ কোনো বিভ্রম তাঁকে নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আজ অসুস্থ হলেও তাঁর এই মানসিক বৈকল্যে সুব্রত ক্ষুব্ধ না হয়ে পারে না। তবু এ নিতান্তই

আকস্মিক পীড়ার জন্য, এ বিহ্বলতা যে নিতান্তই সাময়িক তাও সুব্রত মনে মনে জানে।

ভিড় শুভাকাঙ্ক্ষী ও কৃতজ্ঞদের হলেও তা চিকিৎসকদের পরামর্শে অবিলম্বে ভেঙে দিতে হোলো। তাতে রোগীর বিশ্রামের ব্যাঘাত হওয়ার আরো বেশি আশঙ্কা। এখন ভিড় রইল শুধু চিকিৎসকের। শহরের বড় বড় ডাক্তারদের জড়ো করা হোলো। কিন্তু কেউ তেমন ভরসা দিতে পারলেন না।

একদিন সকালে সুব্রত কি একটা কবিরাজী মালিস লাগাচ্ছে ভুবনবাবুর পায়ে, আস্তে আস্তে বাড়ির দরজার কড়া নড়তে লাগল। ঠাকুর চাকর কে কোথায় কাজে ব্যস্ত, অমূল্যও হয়তো কোথাও বেরিয়ে গিয়ে থাকবে। বাধ্য হয়ে সুব্রতকেই নেমে আসতে হলো নিচে। দোর খোলাই ছিল। সিঁড়ির গোড়াতে এসে অবন্তীকে দেখা গেল। সুব্রতকে দেখে সেও কড়া নাড়া বন্ধ ক'রে হাসিমুখে অপেক্ষা করছে।

সুব্রতই আগে কথা বলল, 'আপনি!'

সুব্রতের তৈলাক্ত দু'হাতে কটু মালিসের গন্ধ। সেদিকে একটু তাকিয়ে অবন্তী বলল, 'হ্যাঁ, আপনি কি বিস্মিত হচ্ছেন?'

সুব্রত অপ্রতিভভাবে বললে, 'না না, আপনারা এখানে ছিলেন না শুনেছিলাম।'

অবন্তী হেসে বল্‌লে, 'ঠিকই শুনেছিলেন। কালই আমরা শিলং থেকে এসে পৌঁছেচি। এসে শুনলাম ওঁর খুব অসুখ। কি ব্যাপার বলুন তো। চলুন দেখেই আসি।' একটু ইতস্ততঃ ক'রে অবন্তী বলল।

অবন্তী যেন অনুগ্রহ করছে। সুব্রত ভাবল বলে, 'থাক না, দেখাসাক্ষাৎ করা এখন ডাক্তারদের নিষেধ আছে।' কিন্তু বলতে হোলো, 'আচ্ছা চলুন।'

লঘু পায়ে অবন্তী তর্‌তর্‌ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল—যেন কোনো রোগীকে সে দেখতে যাচ্ছে না, মজা দেখতে যাচ্ছে।

ভুবনবাবু ইজিচেয়ারের ওপর দু'পা টান ক'রে রয়েছেন, সুব্রত যেমন ভাবে রেখে গিয়েছিল। শুধু যে বইখানা বন্ধ ক'রে তিনি কোলের ওপর রেখে দিয়েছিলেন, সেখানা আবার খুলে নিয়েছেন। সুতরাং ঘরে ঢুকতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

সুব্রত আড়াল ছেড়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের সঙ্গে পড়েন।'

ভুবনবাবু হেসে বললেন, 'চিনেছি, ইউনিভার্সিটিতে তো প্রায়ই দেখা হয়।' ইউনিভার্সিটিতে তাঁর দুটো ক্লাস আছে সপ্তাহে।

অবন্তী বলল, 'হ্যাঁ, নামটা আছে ওখানে?'

'শুধু নামই বা থাকবে কেন?' চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে ভুবনবাবু বললেন, 'বোসো। তোমার নাম অবশ্য অন্যত্রও শুনেছি।'

মুহূর্তের জন্য অবন্তীর চোখে একটু শঙ্কার ছায়া পড়ল। কিন্তু পরমুহূর্তেই অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে তরলকণ্ঠে বলল, 'দুর্নাম নিশ্চয়ই।'

সুব্রত একটু বিস্মিত হোলো, ভুবনবাবুও। ক্লাসে তিনি অত্যন্ত রাশভারী লোক। তাঁর কঠোরতা সকলেই জানে। কেউ কোনোরকম চাপল্য প্রকাশ করতে সাহসী হয় না তাঁর সামনে। কিন্তু মেয়েটির এই স্পর্ধায় ভুবনবাবু তেমন ক্ষুণ্ণ হলেন না, বরং আজ একটু প্রশ্রয় দিতেই যেন ভালো লাগলো। মৃদু হেসে বললেন, 'কি জানি, দুর্নাম কি সুনাম ভুলে গেছি।'

অবন্তী বলল, 'বাঁচলুম। ভুলে যাবার এমন মহৎ অভ্যাস খুব কম লোকেরই থাকে, না সুব্রতবাবু?'

ভুবনবাবু বললেন, 'কিন্তু তোমার নাম তো এখনো বললে না।'

'বলে কি লাভ, কোনো নামই যখন আপনার মনে থাকে না।'

এমন লঘু তারল্য ভুবনবাবু যেন আর কোনদিন উপভোগ করেননি, মনে হোলো তাঁর জরা আর জড়তা যেন অর্ধেক কমে গেছে।

বললেন, 'ও সেজন্য ভেবো না, মনে করিয়ে দেওয়ার লোক এখানে থাকবে।' বলে সুব্রতের দিকে একবার তাকালেন ভুবনবাবু। সুব্রতের সমস্ত মুখ তখন আরক্ত হয়ে উঠেছে। অবন্তীও সেদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। সুব্রতের এই মেয়েলী লজ্জা বেশ উপভোগ্য মনে হোলো তার কাছে। একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'সে ভয় করবেন না, এখানে ভুলে যাওয়াটাই সংক্রামক দেখছি, নইলে সুব্রতবাবু আমার নাম জানতেন বলেই তো ধারণা ছিল।'

আরো কিছুক্ষণ একথা ওকথার পর অবন্তী উঠে দাঁড়াল। বলে গেল এর পরের দিন সে বই নিয়ে আসবে। ছুটিতে মোটেই পড়াশুনো করেনি। এখন আরম্ভ না করলে পাশই করতে পারবে না। অবশ্য ভুবনবাবু আর সুব্রতবাবু যদি সাহায্য করেন তবে আর কোনো ভাবনা নেই।

ভুবনবাবু লক্ষ্য করলেন তাঁর রোগশয্যার পাশে এই প্রথম একজন এল, যে

একবারও তাঁর অসুখের কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিল না, তিনি যেন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ এমনভাবেই আলাপ ক'রে গেল। এতে যেন তিনি একটু আনন্দই বোধ করলেন। বললেন, 'মেয়েটি একটু প্রগলভা বটে, কিন্তু কী সাহস।'

সুব্রত তাঁর পায়ে আবার তেল মালিশ করতে আরম্ভ করেছিল, সংক্ষেপে জবাব দিল, 'দুঃসাহস।'

ভুবনবাবু হেসে বললেন,' তুমি একটি দুর্মুখ।'

তারপর থেকে অবন্তী মাঝে মাঝে আসে, বই খাতা নিয়ে আসে বলে' তাদের বাড়ির সবাই ভাবে পড়তেই আসে, কিন্তু এবাড়ির সবাই জানে সে পড়তে আসে না, আসে গল্প করতে। কোনদিন কারো রোগশয্যার ছায়াও সে মাড়ায়নি, কোনো আত্মীয়বন্ধুদেরও না। সেবা-শুশ্রূষা সে কোনোদিন করতে জানে না, জীবনের এই দিকটাকে সে কোনোদিন বুঝতে পারেনি, বুঝতে চেষ্টাও করেনি। প্রথমত সুব্রতের হাবভাব তার কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে। মাথা মুড়ে শিখা রাখলেই যেন ওকে মানাত। যেন একখানা মূর্তিমান কঠোপনিষৎ। তারপর তার এই মেয়েলি সেবা। এতেও সুব্রতের ওপর প্রথমত তার বীতস্পৃহা এসেছে। সে শুনেছে সুব্রতকে ভুবনবাবুই মানুষ ক'রে তুলেছেন। নিজের বাড়িতে রেখে পড়া-শুনোর সম্পূর্ণ সুযোগ তিনিই ক'রে দিয়েছেন। না হলে সুব্রতকে হয়তো নিরক্ষর হয়ে থাকতে হোতো। সম্পর্কে সুব্রত ভুবনবাবুর দূরসম্পর্কের এক ভাগিনেয়, কিন্তু এখন এমন নিকটতম আত্মীয় পরস্পরের আর কেউ নেই। তবু এই পরিচর্যার প্রণালীটা কিছুতেই অবন্তীর মনঃপূত হয়নি। পুরুষের কৃতজ্ঞতা এমন হবে কেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যেও পৌরুষ থাকবে। সে নিজে কেন এমন কপালে হাত বুলিয়ে দেবে, পা মালিশ করবে। অগাধ অর্থ উপার্জন করুক না সুব্রত, রেখে দিক চার পাঁচটা নার্স। আরো প্রচুর অর্থ ব্যয় করুক চিকিৎসার জন্য।

তবুও অবন্তীর সুব্রতকে কেন যেন ভালো লাগে। সুব্রতর মধ্যে কি যেন এক আকর্ষণের জিনিস আছে। অবন্তী মনে মনে জানে তা কী। সে সুব্রতের সৌন্দর্য। ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অবন্তীর মনে হয়—সুব্রতকে সবই মানায়। যে সুন্দর, তার সংস্পর্শে যাই আসুক তাই তার অলংকার হয়ে ওঠে। ভুবনবাবুর পায়ে মালিশ করাটাও এখন ওর পক্ষে অশোভন মনে হয় না। সে যখন সংযমের কথা বলে, আধুনিক রীতিনীতির নিন্দা করতে থাকে—তখনো অবন্তীর তেমন

ক্ষোভ হয় না। ও যাই বলুক—অদ্ভুত ওর কথা বলার ভঙ্গি। আর দেহের সৌন্দর্য তো শোনার জিনিস নয়, তা দেখবার, স্পর্শ করবার।

স্পর্শ সে করেছে সুব্রতকে—এ সম্বন্ধে অবন্তীর দৃঢ় বিশ্বাস আছে মনে। সুব্রতকে চমৎকার না লেগে পারে না। ও যাই হোক, যত পুরোনো আর পুরাণের কথাই বলুক না– ও নতুন ও সম্পূর্ণ নতুন। জীবন সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই ওর নেই। সামান্য কথায়, সামান্য ইঙ্গিতে, সামান্য স্পর্শে ও আরক্ত হয়ে ওঠে। ওর সংস্পর্শে এলে অবন্তীর মনে হয়, তারো যেন এই আরম্ভ। সমস্ত অভিজ্ঞতা যেন তার স্মৃতি থেকে ধুয়ে গেছে। একথা অবশ্য অবন্তীর আরো অনেকবার মনে হয়েছে। চমৎকার এই ভালোবাসা. ভোরের সূর্যের মত সুন্দর আর নতুন, পুনরাবৃত্তিতে যার কোনো ক্লান্তি নেই।

সুব্রত সুন্দর। তাই তো যথেষ্ট। মতের সঙ্গে নাই বা মিলল। কি হবে মত আর মন দিয়ে যতক্ষণ চোখ আছে। সৌন্দর্যবিদের মূল্যেই মূল্যবান মত, অপর তত্ত্বের মাপ কাঠি দিয়ে একে মাপা যায় না। কিন্তু সুব্রত কেন এত প্রচ্ছন্ন রাখে নিজেকে ? ও কেন কথা বলে না ? নাই বা বলল কথা ! কথা তো অবন্তী অনেক শুনেছে, অনেক বলেছে। আজ মনে হয়, ভাষার চেয়ে আভাস অনেক ভালো। অনেক সুন্দর প্রকাশের চেয়ে অপ্রকাশ। প্রকাশ বড় সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ, অপ্রকাশের মধ্যে আছে বিচিত্র সম্ভাবনার ঐশ্বর্য।

কিন্তু সুব্রত কথা না বললে কি হবে, ভুবনবাবুকে কথার মোহে পেয়ে বসেছে। অবশ্য কথা বলতে ভুবনবাবু চিরকালই ওস্তাদ, ক্লাসে তাঁর বক্তৃতা খুব মনোজ্ঞ হোতো, বন্ধু মহলে যে কোনো বিষয় নিয়েই তিনি আলাপ করতেন, তাই উপভোগ্য হয়ে উঠত। অথচ তাতে তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য কিছুমাত্র শিথিল হোতো না। নিজেকে উপভোগ্য করবার জন্য লঘু তারল্যের আশ্রয় না নিলেও তাঁর চলত।

কিন্তু এখন ভুবনবাবু যেন বদলে যাচ্ছেন, কথাবার্তায় খানিকটা লঘুতা তিনি ইচ্ছা করেই আনেন। কথার তারল্যে নিজের জরাকে যেন ভাসিয়ে নিতে চান। নিজের শক্তির সীমা যেন তিনি জেনে ফেলেছেন। কথা, কথাই এখন তাঁর একমাত্র সম্বল। শুধু কথার মধ্যে দিয়েই নিজেকে তিনি উপভোগ্য করবেন, উপভোগ করবেন।

সেদিন আধুনিক প্রসাধনের সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। ভুবনবাবু বললেন দেখ, 'যত গোঁড়া আর যত বুড়োই হই তোমাদের সাজসজ্জা মনে মনে আমি

পছন্দই করি। আর কিছু না হোক এ যুগে প্রসাধনের সাধনায় তোমরা সিদ্ধিলাভ করেছ। আজকালকার প্রসাধনে সেকালের ভারি অলংকার নেই, কিন্তু অহংকার আছে।'

অবন্তীর প্রসাধনে সেদিন একটু বিশেষ পারিপাট্য ছিল। মুহূর্তের জন্য তার মুখে আরক্ত সলজ্জ আভাস ফুটে উঠল, কিন্তু পরের মুহূর্তেই তার স্বাভাবিক প্রগলভতার সঙ্গে বলল, 'এই স্বীকৃতিতে সমস্ত গোঁড়ামি আর বুড়োমির দুষ্কৃতি থেকে আপনি রেহাই পেলেন।'

ভুবনবাবু বললেন, 'কিন্তু গোঁড়ামিকে যত সহজে ঝেড়ে ফেলা যায়, বুড়োমিকে তেমন পারা যায় না। তা দেহের সঙ্গে লেগে থাকে। তাঁর কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটু করুণ অসহায়তার সুর বেজে উঠল।'

এক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলল না। একটু চুপ ক'রে থেকে ভুবনবাবু নিজেই নিজের প্রতিবাদ করলেন, 'কিন্তু ওটা শুধু দেহের সঙ্গেই থাকে, মনের সঙ্গে নয়। মনের বয়স বাড়া মানে বার্ধক্য নয়, বৃদ্ধি। বার্ধক্য কথাটা বোধ হয় বৃদ্ধি থেকেই এসেছে। একেই বলে শাব্দিক পরিহাস।'

'কোনো কথা বলছ না যে অবন্তী' ?

'শব্দতত্ত্বে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি।' অবন্তী একটু হাসল।

ভুবনবাবু যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, কিন্তু হার মানলেন না, বললেন 'শুধু শব্দতত্ত্ব কেন, কোনো তত্ত্বই তোমাদের ভালো লাগে না। তোমরা আজ কাল বড় লঘু-চেতা হয়ে গেছ। শুধু তথ্য খুঁজে বেড়াও, কি বল সুব্রত ?' সুব্রত বলল, 'নিশ্চয়ই —আমারও তাই মত।'

সুব্রত আর কিছুই বলতে পারল না। অথচ ভুবনবাবুর সাথে তার মতৈক্যের কথা ছাড়া এ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলবার ছিল। সে এ সব সম্বন্ধে নতুন ক'রে ভেবেছে, নতুন পদ্ধতিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছে। এ যুগ নিজের অক্ষমতাকে ক্ষমতা বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সত্যকে মঙ্গলকে এ যুগ পুরোনো বলে অবজ্ঞা করে। কারণ, তাকে নতুন রূপ দেওয়ার সাধ্য তার নেই, নতুন ক'রে সৃষ্টি করার শক্তি তার লোপ পেয়েছে। কিন্তু সুব্রতের ভাষায় যা প্রকাশ পেল তা কত হাস্যকর; তা নিতান্ত ছেলেমানুষের মত হোলো। কথা বলতে সুব্রত কখনো পারে না। ছেলেবেলায় ভাষা ফুটতে তার অনেক সময় লেগেছিল। অনেকেই ভেবেছিল, সে বুঝি বোবাই হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা বলতে যদি বা শিখল, বেশি কথা বলতে কিছুতেই শিখল না। অতি

সংক্ষেপে নিজের প্রয়োজনকেই শুধু সে ভাষায় কোনো রকমে প্রকাশ করতে পারে, অপ্রয়োজনীয়তার আনন্দ সে উপভোগ ক'রে শুধু চিন্তায়। মনে মনে কথা বলে নিজের অক্ষমতার সঙ্গে সুব্রত প্রায়ই আপোষ ক'রে নিয়েছে। নিজের স্বভাবের সঙ্গে কতকাল আর লোক যুঝতে পারে। ভুবনবাবুর কথা বলবার শক্তিতে সুব্রত চমৎকৃত হয়, তার ঈর্ষা হয় না, হয় আনন্দ। সুব্রতের আদর্শ যেমন তাঁর মধ্যে রূপ পেয়েছে তেমনিই তার ভাষা ভুবনবাবুর কণ্ঠে। সব সময় তাঁর কথার সঙ্গে সুব্রতের অবশ্য মেলে না, কিন্তু তাঁর অনেক কথার মধ্যেই সুব্রত যেন নিজেকেই প্রকাশিত দেখতে পায়। বিশেষ ক'রে অবন্তীর সঙ্গে তাঁর এই কথোপকথন সুব্রতের বেশ উপভোগ্য লাগে। অবশ্য মাঝে মাঝে মামার চপলতায় সুব্রত কিছু ক্ষুব্ধ হয়, একটু হয় তো লজ্জিতও বোধ করে, যেমন সে নিজের চাপল্যের জন্য করত। কিন্তু লজ্জা এবং ক্ষোভ ছাড়া এই লঘুতায় কোথায় যেন একটু লোভও আছে। বিশেষ ক'রে ভুবনবাবু যখন তার সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেন। তাঁর এ ধরণের সূক্ষ্ম পরিহাসে বিরক্ত হওয়ার চেয়ে সুব্রত মনে মনে একটু আমোদই বোধ করে।

কিন্তু অবন্তী সুব্রতের মত নয়, অপ্রয়োজনীয় বহু কথা সে বলতে পারে, বহু কথা সে বলতে ভালোবাসে। একটু হেসে অবন্তী বলল, 'তাই নাকি? কিন্তু আমার তো মনে হয় আপনি নিজের আসল মত লজ্জায় গোপন ক'রে যাচ্ছেন।' তারপর ভুবনবাবুর দিকে চেয়ে বলল, 'কিন্তু তথ্য আর তত্ত্বের মধ্যে কোন অহি-নকুলের সম্বন্ধ আছে বলে আমার মনে হয় না। তথ্যের পথে আমরা তত্ত্বে পৌঁছি। কিন্তু আপনারা পথের কষ্ট স্বীকার করতে রাজী নন, তথ্যহীন কল্পনাতেই আপনাদের আনন্দ।'

বিতর্ক কতক্ষণ চলত বলা যায় না। এই সময় হিমানী এলেন ঘরে। তাঁর দ্রুত নিঃশ্বাস পতনের শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। ওঠানামা করতে আজকাল একটু কষ্টই হয়। সিঁড়ি ভাঙবার পক্ষে একটু যেন বেশিই মোটা হয়ে পড়েছেন হিমানী। একটু দম নিয়ে বললেন, 'এই যে অবন্তী, কেমন আছ, কখন এসেছ জানতেও পারিনি, নিচ থেকে ওপরের খোঁজ খবর নিতে পারারও কথা নয়।'

অবন্তী বলল, 'অন্তত ঘুমিয়ে থাকলে তো নয়ই, আপনার ঘরের সামনে দিয়ে আসতে আসতে দেখলাম, আপনি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন।'

হিমানী প্রতিবাদ করলেন, 'আমার কখনো নাক ডাকে না।'

অবন্তী হেসে বলল, 'ডাকলেও তা আপনার শুনতে পাওয়ার কথা নয়।'

বিরক্তির ভঙ্গিতে হিমানী মুখ ফেরালেন, সুব্রতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর এবেলা পথ্যের কি ব্যবস্থা? উনি তো ওবেলা আমাকে শাসিয়েছেন—'

সুব্রত নির্মম এবং নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে জবাব দেয়, 'উহুঁ লুচি।'

ভুবনবাবু কাতরভাবে বলেন, 'দোহাই তোমাদের, আমি গরীবের ছেলে। ও সব বড়লোকের খাদ্য আমার রোজ মুখে রুচবে না। আমার জন্যে দুটো ডাল ভাতেরই ব্যবস্থা করো।'

সুব্রত বলল, 'কিন্তু, আজ যে পূর্ণিমার রাত সে কথা কি ভুলে গেছেন?'

ভুবনবাবু বললেন, 'মনে রেখেই বা কি লাভ।'

অবন্তী এবার উঠে দাঁড়ায়, 'চলুন সুব্রতবাবু একটু এগিয়ে দেবেন।'

সুব্রত কিছু বলবার আগেই ভুবনবাবু বলে ওঠেন, 'নিশ্চয়ই, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও সুব্রত, এগিয়ে দিয়ে এসো।'

উৎসাহের আধিক্যে মনে হয়, ভুবনবাবু যেন নিজেই যাচ্ছেন।

ওরা চলে গেলে ভুবনবাবু হঠাৎ বলেন, 'অবন্তীর সঙ্গে সুব্রতের বিয়ে হলে কেমন হয়!'

'তুমি অবাক করলে। ঐ ফাজিল মেয়েটার সঙ্গে?' হিমানী বিরক্তির স্বরে জবাব দেন।

'কিন্তু পড়াশুনোয় মেয়েটি খুব ভালো।'

হিমানী এবার গম্ভীর হয়ে যান। পড়াশুনোওয়ালা মেয়ের ওপর ভুবনবাবুর চিরদিনের পক্ষপাতের কথা হিমানীর মনে পড়ে যায়। অথচ ভুবনবাবু কোনোদিন হিমানীর স্বল্পশিক্ষার জন্য প্রকাশ্যে কোনো ক্ষোভ করেননি, হিমানীকে কোনো অবহেলা অনাদর করেননি, বলতে গেলে দীর্ঘ দাম্পত্যজীবন তাঁদের সুখেই কেটেছে। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার যখনই প্রশংসা করেন ভুবনবাবু তখনই হিমানীর মন যেন কেমন ক'রে ওঠে। ভুবনবাবুর গোপন ক্ষোভ যেন আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। সমস্ত শিক্ষিতা মেয়েদের ওপর হিমানীর ঈর্ষা হয়। মনে মনে স্বামীকেও তিনি ক্ষমা করতে পারেন না। তাঁর এই পক্ষপাতিত্ব, এই প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ হিমানীর কাছে প্রায় বিশ্বাসঘাতকতার সামিলই মনে হয়।

কিছুক্ষণ পরে হিমানী চুপচাপ উঠে চলে যান। ছোট মেয়েটা খেতে বসে কি নিয়ে কোন্দল করছে, ভারি আবদার বেড়েছে মেয়েটার।

হিমানীর কালো, মোটা, সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে যেতে থাকা স্থূল শরীরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভুবনবাবুর নিজেকে অত্যন্ত বঞ্চিত

মনে হয়। তিনি যেন উপবাসী রয়ে গেছেন, বুভুক্ষু রয়ে গেছেন, যৌবনে যেন তিনি কোনোদিন কিছু উপভোগ করেননি। অলক্ষ্যে কখন প্রৌঢ়ত্ব এসে পড়েছে। আর সম্পূর্ণ বুড়ো হবার আগেই এল দুর্দৈবের পঙ্গুত্ব। এই রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শময়, পৃথিবী তাঁর কাছে যেন অনাস্বাদিত রয়ে গেল। বিগত দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের দিনগুলির মধ্যে একটি উদ্বেল রঙীন মুহূর্তের কথাও আজ তাঁর মনে পড়ল না। বিশ বছর যেন একটানা কেবল একটা অভ্যাসের মধ্যে কেটেছে। নিতান্তই একটা শারীরিক অভ্যাস, আর কিছু নয়।

মনে মনে সঙ্কল্প করলেন ভুবনবাবু, যেমন করেই হোক অবন্তীর সঙ্গে সুব্রতের বিয়ে তিনি দেবেনই। হিমানীর কোন বাধা তিনি মানবেন না। অনেক তো মেনেছেন আর কেন ?

স্বখাত

অমৃতসরে চাকুরি উপলক্ষে মাস কয়েক প্রবাস জীবন কাটিয়ে এসে বন্ধু রমেনকে দেখে ভবতোষ অবাক হয়ে গেল। মুখে সেই প্রসন্ন হাসি নেই, মনে নেই আনন্দ। অবশ্য ইতিপূর্বে অন্য বন্ধুদের চিঠিপত্রে খবর কিছু কিছু সে পেয়েছিল। বাপের পাল্লায় পড়ে রমেনকে কালো এবং নিরক্ষরাপ্রায় মেয়েকে বিয়ে করতে হয়েছে। কিন্তু বউয়ের রঙ কালো বলে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়, এমন ছেলেও যে এযুগে থাকতে পারে রমেনের মুখ না দেখলে তা ভবতোষের বিশ্বাস হোতো না। সমস্ত ঠাট্টা পরিহাসের উত্তরে রমেন জবাব না দিয়ে কেবল ম্লান হাসে। বাল্যবন্ধু মিতভাষী রমেনের এই হাসিতে এমন একটু বেদনার আভাস থাকে যা, ভবতোষের সিনিক মনকেও স্পর্শ না ক'রে পারে না। দুঃখটা তার কাছে যত লঘুই মনে হোক রমেনকে যে তা গভীরভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ধরেছে, এ কথা ভবতোষ মনে মনে টের পায়।

রমেনের বাবা নিবারণবাবু একদিন নিজেই এলেন ভবতোষের ওখানে। পরম অন্তরঙ্গ স্বরে বললেন, 'তুমি এসেছ বাবা ভবতোষ, আমি এবার সত্যিই নিশ্চিন্ত হয়েছি। ছেলেবেলা থেকেই তোমার কথা ও মেনে চলে, ওর অসীম নির্ভর তোমার ওপর। আর সব বন্ধুরা ক্ষেপিয়ে ওর আরো মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছে। তুমি একটু ওকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলো, এমন করলে লোকে কি মনে করবে।'

'কেন, কি করে?'

'না, করেও না কিছু বলেও না কিছু, সেই তো হয়েছে আরো মুস্কিল। ওর ওই ভূতান্তরিত ভাব দেখেই তো আমার হৃদয় ফেটে যায়। আর ওই নিরপরাধ কচি মেয়েটার মনই বা কেমন করতে থাকে বল তো?'

'সে তো সত্যিই, কিন্তু বউ একটু দেখে শুনে আনলেই পারতেন।'

নিবারণবাবু চটে উঠলেন, 'আবার কি দেখে শুনে আনব? সদ্বংশের ব্রাহ্মণের

ঘরের মেয়ে, লেখাপড়াও মোটামুটি জানে, দেখতে শুনতেও কুশ্রী বলা চলে না, আবার কি ? তোমাদের যে একেবারে বি এ, এম এ পাশওয়ালা অসামান্য রূপসী না হলে পছন্দ হবে না, তা কি ক'রে জানব ?'

'তেমন পছন্দটাকে কি আপনি খুব খারাপ মনে করেন ?'

'খারাপ নয় তো কি ? ঘরের স্ত্রী খুব রূপসী আর বুদ্ধিমতী হওয়াই কি ভালো ?'

ভবতোষ হাসল, 'তা হলে তিনি বেশি দিন আর ঘরে থাকেন না, এই তো আপনার আশঙ্কা ?'

একমুহূর্ত ক্রুদ্ধ-বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থেকে নিবারণবাবু অদ্ভুত একটু হাসলেন, 'না বাবা ভয় সে জন্য নয়, ঘরেই তিনি থাকেন কিন্তু পুরুষের বিদ্যাবুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞান সমস্ত হরণ ক'রে একেবারে সর্বময়ী হয়ে থাকেন, স্বামীর আর স্বামিত্ব থাকেনা।,

নিবারণবাবু বিদায় নিলে ভবতোষ মনে মনে না হেসে পারল না। কত রকম দুঃখই যে আছে সংসারে। তার নিজের সমস্যা অবশ্য একটু ভিন্ন ধরণের। স্নেহের আতিশয্যে তার বাবা তার ঘাড়ে একটি বউ গছিয়ে দিয়ে যাননি বটে কিন্তু অপরিমেয় দেনায় আর অসংখ্য পোষ্যে দাঁড়ির দুই পাল্লা সমান ক'রে রেখে গেছেন। দুটি বোনেরই বিয়ের বয়স প্রায় অতিক্রান্ত হতে চলেছে। অবশ্য সেজন্য ভবতোষের খুব বেশি আফশোষ নেই কেননা কোনো বয়সেই মেয়েরা আজকাল আর অরক্ষণীয়া নয়। কিন্তু পাড়ার ছেলেগুলি ওদের প্রেমে পড়বার জন্য নাকি অত্যন্ত ঔৎসক্য দেখাচ্ছে। তার মধ্যে দু'একটি সবর্ণের ছেলেও আছে। অবশ্য অসবর্ণ হলেও আপত্তি ছিল না, কিন্তু সকলেই প্রেমে পড়বার জন্যে যেমন উৎসুক বিয়ে করবার জন্যে তেমন নয়। কেননা, এ সব যুদ্ধসংক্রান্ত অস্থায়ী চাকুরিতে স্থায়ীভাবে কোনো মেয়ের ভরণপোষণের ভার নেওয়ার ভরসা হয় না, তার বদলে ছোটখাট উপহার দিয়ে কিংবা দু'এক সন্ধ্যা সিনেমা দেখিয়ে সাময়িক প্রেমিক হতেই সাধ যায়। সেজো ভাইটি আছে মেসোপটেমিয়ায়। মাস কয়েক ধরে তার খোঁজখবর নেই, সাংসারিক কাজ কর্মের অবসরে মা ইতিমধ্যেই তার জন্যে ডুকরে ডুকরে কাঁদা আরম্ভ করেছেন। দুশ্চিন্তা এবং ভ্রাতৃবাৎসল্য ভবতোষের মনেও আছে, কিন্তু তবু কেন যে মায়ের কান্না শুনলে দুঃসহ বিরক্তিতে তার সমস্ত শরীর রি-রি করতে থাকে তা কে বলবে। চাকুরিস্থানেও শনি বক্রভাবে অবস্থান করছেন,

ওপরওলাদের সঙ্গে বনিবনাও হচ্ছে না। অথচ ফস ক'রে ছেড়ে দেওয়ার মত অবস্থাও নয়।

এ সব দুঃখের কোনোটিই নিবারণবাবু কিংবা তাঁর একমাত্র ছেলে রমেনের নেই। কলকাতায় বাড়ি আছে, সওদাগরী অফিসে আছে স্থায়ী চাকুরি। পোষ্যের সংখ্যা স্বল্প। তবু এঁদের মনেও দুঃখের অভাব নেই। নিবারণবাবুর ছেলের মুখে নেই হাসি আর তাঁর ছেলের বউয়ের গায়ে নেই দুধে আলতার রং। কিন্তু রং তো থাকারই কথা ছিল। হয় তো নিবাবণবাবুর নিজের ব্যক্তিগত আদর্শে আর কিঞ্চিৎ আর্থিক আসক্তিতে সে রংকে কিছু নিষ্প্রভ হতে দিয়েছেন। আব ভীরু মুখচোবা রমেন জাঁদরেল বাপের সামনে যেমন মাথা তুলতে পারেনি, তেমনি ভুলতে পারছে না অর্ধশিক্ষিতা সাধারণ একটি বাঙালী মেয়ের পতিত্ব। বন্ধু-সমাজ তাকে পতিত ক'রে রেখেছে। আসলে স্ত্রীর শিক্ষা এবং রূপ তো স্বজনবন্ধুদেব কাছে আত্মমর্যাদা বাড়াবার জন্যেই। দামী ঘড়ির মত, রুচিসম্মত আসবাবের মত, স্ত্রীও যদি বন্ধুদের সপ্রশংস ঈর্ষা জাগাতে না পারল, তবে আর তার সার্থকতা কি! মনে মনে হাসল ভবতোষ।

পরদিন ভবতোষ রমেনের লাইব্রেবা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হোলো, এবং তার স্ত্রী ও শ্বশুরকুল সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিল। খড়দহের বিখ্যাত নিত্যানন্দ পবিবারের মেয়ে। সমস্ত পূর্ববংগে ওঁদের শিষ্যসেবকেবা ছড়িয়ে আছে, তাদের পারমার্থিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদেব আর্থিক সংস্থান সকলেই অল্পবিস্তর ক'রে গেছেন। রমেনের শ্বশুর কিছু ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে পৈত্রিক সম্পত্তিটুকুই কেবল গ্রহণ করেছেন। শিষ্যমহল অন্য সরিকদের কাছে বিক্রি ক'রে দিয়ে মহকুমা শহরের আদালতে পেস্কারী নিয়েছেন; বয়সের সময় রোজগার নিতান্ত কম করেননি, পৈতৃক তালুক এবং খামার দুই-ই কিছু কিছু বাড়িয়েছেন।

এক পুরুষে এ কালের আদবকায়দায়ও নিতান্ত কম অগ্রসর হননি। মেয়েকে ইংরেজী স্কুলের থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়েছেন। দু'একখানা রবীন্দ্রসংগীত শিখিয়েছেন এবং স্বামীর বন্ধুবান্ধব দেখলে যে এক হাত ঘোমটা টানতে হয় না, এটাও সে বাপের বাড়ি থেকেই শিখে এসেছে।

সব তথ্য একে একে সরবরাহ ক'রে রমেন বলল, 'সুতরাং বুঝতেই পারছ

ভবতোষ পিতৃদেবের অভিমতে আফশোষের আমার আর কোনো কারণ থাকতে পারে না।'

ভবতোষ বলল, 'সেটা কেবল পিতৃদেবের অভিমত তাই বা ভাবছ কেন, যাই হোক, বউতো আগে দেখাও। তারপরে বিচার ক'রে দেখব, আক্ষেপ যথার্থই তোমার কর্তব্য কিনা।'

'আচ্ছা, তাহলে তোমার রায়ের প্রতীক্ষাতেই রইলাম।'

রমেনের ন'দশ বছরের একটি বোনের সঙ্গে তার স্ত্রী এলো ঘরে। ভবতোষ আড়চোখে দেখে নিলে মেয়েটিকে, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হলো একেবারে সোজাসুজি তাকালেও ক্ষতি ছিল না। রমেনের বিনয় যে এমন নির্মমভাবে সত্য তা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। বছর আঠারো-উনিশ হবে বয়স। আর এই বয়সের যৌবনটাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পুরুষের চোখে মেয়েদের যৌবন যথেষ্ট নয় ; তার ওপর নিজের শ্রেণীগত শিক্ষা আর রুচির প্রলেপ থাকা চাই। একবার গাঁয়ের কোনো এক আত্মীয় বাড়িতে গিয়ে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভবতোষ চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তার নাকে নাকছাবি দেখে। এই মেয়েটির নাকে অবশ্য নাকছাবি নেই, কিন্তু সমস্ত মুখে স্থূল সারল্যের সঙ্গে অদ্ভুত একটু চতুর মনোভাবের ঢং মিশান রয়েছে। তা যেমন হাস্যকর তেমনি অশ্লীল, মেয়েটি যেন ইতিমধ্যেই জগৎরহস্যের পার দেখে ফেলেছে। পুরুষের স্বভাব, মেয়েদের সম্বন্ধে তার সমস্ত বাসনা কামনার স্বরূপ—কিছুই যেন ওর জানতে বাকি নেই।

ভবতোষ দু'হাত তুলে ছোট একটি সপ্রতিভ নমস্কার জানিয়ে বলল, 'বসুন। রমেন যে এমন লুকিয়ে বিয়ে ক'রে ফেলবে, তা আমি আশঙ্কাই করিনি, মিষ্টান্নের খরচ বাঁচাবার মতলব বোধ হয় গোড়া থেকেই ছিল, না হলে একটা খবর অন্তত দিতে পারত। বা, বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন যে।'

মাধুরী নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সব চেয়ে দূরের চেয়ারটায় গিয়ে বসল।

রমেনের বন্ধুদের তার ভাল লাগে না, এরা যেন কেবল যাচাই করবার জন্যে আসে তার কতটুকু বিদ্যা, কতটুকু রূপ। বিয়ের চার-পাঁচ বছর আগে থাকতে এই যে যাচাই-বাছাই আরম্ভ হয়েছে, এর যেন শেষ নেই। ভেবেছিল বিয়ে হয়ে গেলে আর এসব বালাই থাকবে না, কিন্তু ব্যাপারটা ইদানীং যেন আরও

বেড়েছে। স্বামীর নিত্য নতুন বন্ধু আসবে আর তাদের সামনে ভেবেচিন্তে ওজন ক'রে ক'রে কথা বলতে হবে, জবাবটা একটু কাঁচা হয়ে গেলেই স্বামীর মান যায়, মন পাওয়া যায় না।

রমেন একেকদিন স্পষ্টই বলে, 'মানুষের সঙ্গে কথা বলতেও শেখনি।'

মাধুরী রাগ ক'রে জবাব দেয়, 'না শিখিনি তো, তার হবে কি। আমি লেখাপড়া শিখিনি, দেখতে ভাল না, এ কথা তো সব বন্ধুকেই তুমি বলে দিয়েছ, তবে আর তোমার লজ্জা কিসের? এতই বলেছ আর একটু বাড়িয়ে বলতে পারলে না, আমার বউ বোবা, একেবারেই কথা বলতে পারে না, তাহলে তুমিও বাঁচতে অমিও বাঁচতুম।'

মাধুরীর কথার ঝাঁঝে তখনকার মত রমেন নিজেই বোবা হয়ে যায়।

নমস্কার বিনিময়ের পর একটু চুপ ক'রে রইল ভবতোষ। কি কথা বলা যায় এর সঙ্গে। তারপর একটু ভেবে বলল, 'কই আমার কথার জবাব দিলেন না?'

একটু যেন চমকে উঠল মাধুরী, 'কোন কথার?'

'মিষ্টান্ন থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম কেন?'

'ও, তা আমি কি জানি?

'কিচ্ছু জানেন না?'

'নিশ্চয়ই আপনাদের ভাগ্যে ছিল না।'

ভবতোষ একবার রমেনের মুখের দিকে তাকাল। স্ত্রীর এমন নির্ব্বোধ জবাবে তার মুখ হতাশায় ম্লান।

ভবতোষ বলল, 'যা বলেছেন। আমাদের ভাগ্যই খারাপ। রমেনের কিন্তু ভাগ্য ভালো।'

'কেন, একথা বলছেন যে?'

'কেন বলছি তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন।'

ভবতোষের দিকে তাকাতেই মাধুরী সলজ্জে চোখ নামাল।

'আপনি ঠাট্টা করছেন, এতো সবাই জানে, আমাকে ওঁর পছন্দ হয়নি।'

'এই সব বুঝি ও বলে বেড়ায়?'

'বলেই তো, সকলের কাছেই বলে।'

'কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না। ওর মুখের কথা আর মনের কথা এক নয়। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে যে ভালবাসে এ কথা বন্ধুদের কাছে অস্বীকার করতে তারা কম ভালবাসে না।'

'তাই নাকি ? আপনি জানলেন কি ক'রে ? বিয়ে করেছেন বুঝি ?'

'উঁহু ঠিক ধরতে পারলেন না। এ সব কথা লোকে বিয়ে করার আগে শেখে আবার বিয়ে করার পরে ভুলে যায়।'

মাধুরী হেসে বলল, 'আপনার সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই। যাই চা ক'রে নিয়ে আসি।'

ভবতোষ বলল, 'আর আপনার কাছে কথা গোপন করবার জো নেই। এতক্ষণ প্রাণটা চা-চাই করছিল বটে,—কি ক'রে বুঝতে পারলেন বলুন তো ?'

মাধুরী দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে একবার ফিরে তাকিয়ে বলল, 'ও আমরা বুঝতে পারি।'

সে ঘর থেকে চলে গেলে ভবতোষ রমেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চমৎকার মেয়ে, আমার তো বেশ লাগল।'

রমেন বলল, 'তুমি ঠাট্টা করছ।'

ভবতোষ বলল, 'হুঁ, আমি ঠাট্টা করবার আর মানুষ পেলাম না, কতবড় রসবোধ তোমার যে, তোমার সঙ্গে আমি ঠাট্টাপরিহাস করতে যাব। একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কি এই বউকে কেউ খারাপ বলে ?'

বন্ধুর তিরস্কারে ক্ষুব্ধ হওয়ার চেয়ে মনে মনে যেন একটু খুসিই হোলো রমেন 'কিন্তু তুমি ওর মধ্যে কী এমন দেখতে পেলে বল তো ?'

বন্ধুর মনে আনন্দের আমেজ লেগেছে দেখে ভবতোষ মনে মনে হাসল, তারপর বলল, 'সে যদি আমার দুটো চোখ তোমাকে ধার দিতে পারতাম তা হলে বুঝতে। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়, তাই আমি এক মুহূর্তে যা দেখলাম জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তে একটু একটু ক'রে তোমাকে তাই দেখতে হবে।'

রমেন বলল, 'তোমাব সব কথাতেই হেঁয়ালী।'

হেঁয়ালীই বটে। কিন্তু বেশ লাগে মাঝে মাঝে এমন হেঁয়ালী করতে। বিশেষত জীবনটা যখন এত কাঠখোট্টা, এত নীরস, একেবারে জলের মত পরিষ্কার আর জলের মত পান্‌সে তখন মাঝে মাঝে চেষ্টা ক'রে যদি একটু দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর ছোঁয়াচ তাতে লাগাতে পারা যায় মন্দ কি। আর তো কিছু করবার শক্তি নেই, কোনো দিক থেকেই জীবনটাকে একটু মোড় ফেরান যায় না; কেবল যত

ইচ্ছা যত খুশি বানানো যায় কথা, আর সেই মনগড়া কথা দিয়ে কেবল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া, যে-জীবনকে যে-জগৎকে কিছুতেই গড়ে নেওয়া গেল না।

তারপর থেকে ভবতোষ প্রায়ই আসে রমেনদের বাড়ি। চা খায় আর কথা বলে; অফিস আর সংসারের ঝামেলার ফাঁকে ফাঁকে অবসরটা বেশ কাটে। এ যেন একাধারে তার খেলা আর কর্তব্য! দাম্পত্যজীবনে সুখী করতে হবে বন্ধুকে। সাধারণ আটপৌরে স্ত্রীকে প্রেয়সী বানিয়ে তুলতে হবে।

নিজের শক্তির পরিচয়ে ভবতোষ নিজেই বিস্ময় বোধ করে। কোনদিন কাব্য-চর্চার ধার সে ধারেনি, নিতান্ত কাঠখোট্টা বস্তু-জগতের মানুষ। ছেলেবেলা থেকেই নানা দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে আসতে হয়েছে। নরম ভাবালুতা তার ধাতে নেই। কিন্তু দরকার হলে সেও যে এমন বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারে তা কে জানত?

মাধুরী সম্বন্ধে তার বাছা বাছা চমকপ্রদ বিশেষণগুলিতে রমেন খুশি হয়, চাপা লজ্জায় আর আনন্দে মাধুরীর শ্রীহীন সৌন্দর্যহীন ভোঁতা মুখও সুন্দর দেখায়; কিন্তু সব চেয়ে খুশি হয় ভবতোষ নিজে। এক একটি ধারালো শব্দ তার মুখ থেকে খসে পরে আর তার ঔজ্জ্বল্যে সমস্ত পৃথিবী যেন জলজল করতে থাকে।

অফিসের ফাইলের পাতা উল্টাতে উল্টাতে কিংবা কোনো সুপিরিয়র অফি-সারের সামনে, হয়ত বা মায়ের সঙ্গে কোন বৈষয়িক পরামর্শ করবার সময়— নিতান্ত অস্থানে অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে কখন যে একেকটি কথা মনের ভিতর থেকে নীল পদ্মের মত ভেসে ওঠে তার ঠিক নেই, আর সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সমস্ত প্রতি-কূলতা অতিক্রম ক'রে মন প্রসন্ন মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে যায়। চোখের সামনে ভাসতে থাকে রমেনের ছোট ঘরখানা। রমেন, তার স্ত্রী, ভবতোষ আর তার অফুরন্ত কথার ঝরণা।

নিবারণবাবু এবং পরিবারের অন্য সকলেই বেশ কৃতজ্ঞ। রমেনের মুখে হাসি ফুটেছে; হাসি ফুটেছে মাধুরীর মুখে। আর এই অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলেছে ভবতোষ, যে রমেনের অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের মত নয়, যে স্ত্রীর বিদ্যা আর শ্রীহীনতার ইঙ্গিত দিয়ে রমেনকে ক্ষেপিয়ে তোলে না। ভবতোষ মনে মনে হাসে। সেও অবশ্য ক্ষেপিয়েই তোলে কিন্তু এ আরেক রকমের ক্ষেপামি। সুস্থতার সঙ্গে এই ক্ষেপামির রাসায়নিক মিশ্রণ না ঘটলে রঙ থাকে না, পৃথিবীতে রস থাকে না।

রমেন আর মাধুরী সিনেমায় যাবে, সঙ্গী ভবতোষ। খেয়াল হল জ্যোৎস্না রাত্রে নৌকো ক'রে ওরা গঙ্গায় বেড়াবে, ভবতোষ সঙ্গে আছে। ভবতোষ না হলে ওরা অসম্পূর্ণ। আর ওরা সামনে না থাকলে, সঙ্গে না থাকলে, ভবতোষের কথার উৎস অমন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে না।

সেদিন অফিস ছুটি। কিন্তু সাংসারিক কাজে ছুটি নেই। সমস্ত দিনটা মায়ের ফাই-ফরমাস খাটতে হলো। বোনদের আবদার মত কিছু জিনিস আনতে হোলো বাজার থেকে। ছোট ভাই এসে চেপে ধরল, তার অঙ্ক বুঝিয়ে দাও। সকলের দাবি মিটিয়ে ভবতোষ একটু বাইরে যাচ্ছে, মা ডেকে বললেন, 'এই রোদ্দুরে কোথায় যাচ্ছিস খোকা, এখনো তো তিনটে বাজেনি।'

ভবতোষ একটু রুক্ষভাবে বলল, 'কেন, আরো কিছু দরকার আছে নাকি, বলে ফেলো।'

'না আমার আর কিছু দরকার নেই। চা-টা খেয়েই না হয় বেরুতিস।'

'ও, সে চায়ের তো তোমাদের অনেক দেরি। আমার একটু কাজ আছে বাইরে।'

রান্নাঘরের সামনে দিয়েই পথ। সেটুকু অতিক্রম করতে না করতেই ছোট বোন নীলিমা এসে সামনে দাঁড়াল। হাতে চায়ের কাপ, অল্প অল্প রুপালি ধোঁয়া উঠছে।

নীলিমা হেসে বলল, 'তোমার কাজ যে কোথায় তাতো জানি রাঙাদা, চা-টা খেয়েই যাও, তাতে অন্য জায়গায় আর এক কাপ খাওয়ার নিশ্চয়ই বাধা হবে না।'

অসাময়িক এবং অপ্রত্যাশিত চায়ে তৃপ্ত হয়ে ভবতোষ বলল, 'খুব যে কথা শিখেছিস, কোথায় যাচ্ছি কি ক'রে জানলি?'

'সেটা জানা এমন কিছু আশ্চর্য নয়, কিন্তু আশ্চর্য তোমার পছন্দ।'

ভবতোষ সকৌতুকে বলল, 'কেন পছন্দটা এমন মন্দ দেখলি কিসে?'

নীলিমা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'না মন্দ আর কি। তবু যদি রমেনদার বউকে স্বচক্ষে না দেখতাম।'

রমেনদার স্ত্রীর প্রসঙ্গে নীলিমার কাছে ভবতোষ নিজেই এমন অনেকবার মুখ বাঁকিয়েছে, কিন্তু আজ নীলিমার এই মুখ বাঁকানো—তীরের বাঁকা ফলার মত গিয়ে তার হৃদয়ে ঢুকল। অথচ কথাটি তো সত্যি। প্রসংসা করবার মত কিছুই

নেই মাধুরীর মধ্যে। আর এই না থাকায় কিছুমাত্র ক্ষতিও নেই ভবতোষের। তবু একটা তীব্র বেদনায় মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

রমেন মধুরীকে নিজের লেখা একটা গল্প পড়ে শোনাচ্ছিল, ভবতোষ এসে ঘরে ঢুকল।

'ইস্, রসভঙ্গ করে ফেললাম নাকি?'

মাধুরী একটু সরে বসে সলজ্জভাবে বলল, 'না-না, আসুন আসুন, আমি তো ভাবতেই পারিনি এই দুপুরে—'

ভবতোষ চেয়ার টেনে বসে বলল, 'আমার দুর্ভাগ্য, অথচ আমি যদি বলি এই দুপুর ভরে আমি কেবল এই কথাই ভাবছি, তাহলে রমেন গল্প রেখে এখুনি লাঠি নিয়ে আসবে, সুতরাং সে কথা মনেই চাপা থাক। গল্পটা শেষ ক'রে ফেল রমেন।'

মাধুরী বাধা দিয়ে বলল, 'না না ও থাক। লেখা গল্পের চেয়ে মুখের গল্পই আমার ভালো লাগে, ভগবান যখন মুখ দিয়েছেন তখন কেন যে মানুষ গল্প না বলে লিখতে যায় আমি বুঝতে পারি না।'

ভবতোষ বলল, 'আমিও না। কিন্তু অমন ক'রে বলবেন না, রমেন আমাকে এখুনি ঘর থেকে বার করে দেবে।'

রমেন হেসে বলল, 'যাই বল ভবতোষ, ইদানীং তুমি যেন বড় ভীরু হয়ে পড়েছ, এত ভীরুতা যেন ভাল ঠেকছে না।'

ভবতোষ মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই শুনুন।'

মাধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দুই বন্ধুতে বসেই শোনাশোনি করুন, আমি যাই, কাজ আছে।'

ভবতোষ বলল, 'বাঃ, আমি আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার কাজের কথা মনে পড়ে গেল।'

মাধুরী বিব্রত হয়ে বলল, 'আচ্ছা বলুন, আপনার কথা শুনেই যাই।'

ভবতোষ বলল, 'আমার প্রথম কথাই হলো এই, আমার কথা শুনেই যেতে পারবেন না।'

'তবে কি করতে হবে?'

'শুনে বসে থাকবেন এং বসে শুনতে থাকবেন।'

মাধুরী বলল, 'বাঃ, আপনার আবদার তো কম নয়, আর আমার কাজ ক'রে দেবে কে ? বাজে কথা ছাড়ুন, কি বলবেন চট ক'রে বলে ফেলুন দেখি।'

মাধুরীর ভাবান্তরটা ভবতোষ লক্ষ্য না ক'রে পারল না। এই রূপহীনা অর্ধ-শিক্ষিতা মেয়েটি আত্মপ্রত্যয়ে হঠাৎ এমন দৃঢ় হয়ে উঠল কি ক'রে ?

ভবতোষ বলল, 'একটি মেয়ে আপনার নিন্দা করছিল।'

'আমার ? কেন ?'

'কেন আবার ? নিন্দার কি কোন কারণ থাকে ? বলছিল আপনার নাকি রূপ নেই।'

একবার আরক্ত হয়ে মাধুরীর মুখখানা আরো ম্লান হয়ে উঠল, 'সে কথা তো সত্যিই।'

ভবতোষ বলল, 'না সত্যি নয়, রূপ ধরবার মত চোখ সকলের থাকে না। আর রূপটা বড় কথা নয়। আমরা পাঁচজনে মিলে তার একটা বাঁধা-ধরা সাধারণ মাপকাঠি তৈরি করে নি। আমরা যাকে বলি অসাধারণ, তাও সেই কাঠির মাপেই মাপা। সেই মাপের একটু এদিক ওদিক হলে আর রূপ আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু সে আমাদের দৃষ্টিরই দুর্বলতা। রূপ দিয়ে কি হবে, আপনার স্বরূপ আছে, যা রূপের চেয়ে অনেক দামী।'

মাধুরীকে যেতে দেখে ভবতোষ বলল, 'ও কি, চলে যাচ্ছেন যে ?'

মাধুরী চলে যেতে যেতে বলল, 'এই বুঝি আপনার কাজের কথা, ফের যদি আবার আপনি ও রকম পাগলামি শুরু করেন—,' বলতে বলতে মাধুরী বেরিয়ে গেল।

রমেনও একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'সত্যি ভবতোষ, হোলো কি তোমার, পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমি ?'

তার কণ্ঠে বিরক্তি চাপা রইল না।

হঠাৎ ঘা খেয়ে ভবতোষ ম্লান হেসে উঠে দাঁড়াল, 'তোমার বউকে একটু ক্ষেপিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি যে ক্ষেপে যাবে—'

'না না, বসো বসো।'

কিন্তু ভবতোষ আর বসল না। না আর নয়, আর তাকে দিয়েকোন প্রয়োজন নেই। এবার তার প্রস্থানের সময় হয়েছে।

তবু কি অদ্ভুত কথা। রূপ আর স্বরূপ। কিন্তু এর চেয়েও আরো ভালো কথা আরো চমৎকার ক'রে কেন বলতে পারল না ভবতোষ, যাতে মাধুরী

সমস্ত কুশ্রীতা সমস্ত মালিন্য, দেহমনের সকল দৈন্য ঢাকা পড়ে যায়; যে কথার টুকরো হীরকখণ্ডের মত ওর সমস্ত অঙ্গ ভরে জ্বলতে থাকে।

ভবতোষ একবার থমকে দাঁড়াল। এসব কি ভাবছে সে? না আর নয়। যথেষ্ট কৌতুক করা হয়েছে। এবার নিজেকে ওদের ভিতর থেকে সরিয়ে আনতে হবে, তার আর কোন প্রয়োজন নেই। বন্ধু রমেন ওই কুশ্রী কুরূপা বউকে ইতিমধ্যেই দুর্লভ মাথার মণি ক'রে তুলেছে, হারাই-হারাই ভেবে মন তার শঙ্কিত। এরই মধ্যে ওর ঈর্ষাকাতর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি চোখে ভাসতে শুরু করেছে। ভবতোষ নিজের মনেই হাসল। আর নয়, উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয়েছে এবার ভবতোষ নিজেকে নেপথ্যে নিয়ে যাবে। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে তার।

ভবতোষ ওদের বাড়ির সীমানা পার হয়ে অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু কী অদ্ভুত ভ্যানিটি মেয়েদের, মাধুরীর মত মেয়েও কি ক'রে ভাবতে পারল এই উচ্ছ্বসিত স্তবস্তুতি তার জন্যেই, আর এ সব একেবারে অকৃত্রিম—একটুও ঠাট্টা নয়। আসলে ভবতোষ যদি কারো রূপে মুগ্ধ হয়ে থাকে সে তার আপন কথার মাধুরীর। কিন্তু সে কথা রমেনের বুঝবার সাধ্য নেই, তার স্ত্রীর তো নেই-ই।

ঘুরে ঘুরে কখন এসে ভবতোষ অন্যমনস্কের মত ওদের সদর দরজা দিয়ে ঢুকে ছাদের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা কেউ দেখলে কি ভাববে। এই মুহূর্তেই ভবতোষের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু সেদিনের মত আবার যদি সে এসে ছাদের আল্‌সে ধরে ঝুঁকে দাঁড়ায় আর ভবতোষকে দেখতে পেয়ে বলে, 'কি, চা না খেয়েই পালিয়েছিলেন যে বড়?'

ভবতোষ বলবে, 'পালাবার কি আর জো আছে!'

মাধুরী হেসে জবাব দেবে, 'জো, নেই, স্বীকার করছেন তাহলে?'

হঠাৎ ভবতোষের সমস্ত শরীর শিউরে উঠল, এক দুর্বোধ্য আনন্দ আর দুঃসহ বেদনায় তার সমস্ত সত্তা যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। এ কি হোলো, তার অপরূপ কথার মাধুরী কেবল কি পৃথিবীর ওই একটিমাত্র কুরূপা মেয়ের দেহাধার ছাড়া কিছুতেই অন্য কোন রূপ খুঁজে পেল না?

রোগ

কিছুক্ষণ আগে একরকম জোর করেই কল্যাণী বিভূতিকে বসিয়ে গেছে নীলিমার রোগশয্যার পাশে। হেসে বলেছে, 'কি রকম ভাই তুমি, ভাড়া-করা নার্সরাও তো একটু নাওয়া খাওয়ার ছুটি পায়। আমরা কি তাও পাব না? কেবল ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে। এমন স্বার্থপর লোক যদি আর দুটি থাকে। আজ তো রবিবার, আজ তো আর অফিসটপিস নেই তোমার। আড্ডা? তা নয় একটা দিন বাদই দিলে? আজ সারাদিন তোমার ডিউটি রইল এখানে। মনে কর অফিসেই আছ। একটুও যদি ঘরে ঢুকি আমরা আজ।' তারপর বিভূতির চোখের দিকে চেয়ে অভয় দিয়ে গেছে, 'একটুক্ষণ কেবল বস, খেয়েই চলে আসব। ও তো ঘুমোচ্ছে। কিচ্ছু করতে হবে না তোমাকে, শুধু বসে বসে কেবল পাহারা দেওয়া।'

কিন্তু এই কয়েক মিনিটেই বিভূতির দম বন্ধ হবার জো হয়েছে। আর যা কিছু বল তাই সে করতে পারে, দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি, ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা কিছুতেই সে পিছ্‌পা নয়; কিন্তু সেবাশুশ্রূষা তার দ্বারা হবে না। এই ভূতের মতন রোগীর ঘরে চুপচাপ বসে থাকা—নিজেকেই যেন রোগী বলে মনে হয় একেক সময়।

মাসখানেক ধরে প্রায় যমেমানুষে টানাটানি গেছে নীলিমাকে নিয়ে। জলের মত ব্যয় হয়েছে টাকা। এই বাজারেও দামী ওষুধপত্র কিনতে বিভূতি কার্পণ্য করেছে তা কেউ বলতে পারবে না। তবু শ্বশুরবাড়ির লোক খুশি হয়নি, নীলিমার মনে অসন্তোষ রয়ে গেছে। মেয়েদের মত কাজকর্ম বন্ধুবান্ধব ফেলে সে যদি দিন-রাত বসে বসে সেবা করতে পারত তা হলেই কেবল হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া হোতো যেন, তা হলেই সখ মিটত সকলের।

প্রথম কিছুদিন বিভূতির অদ্ভুত অপটুতায় কেউ কোন কথা বলেনি। বরং একটু একটু উপভোগই করেছে। রোগ, রোগের চিকিৎসা কি নার্সিং সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানটুকু পর্যন্ত যেন নেই বিভূতির। শিশি থেকে ওষুধের গ্লাসে এক এক ডোজ ওষুধ ঢালতে পর্যন্ত সে পারে না—যা পাঁচ সাত বছরের ছেলেমানুষেও পারে। কথায় কথায় এমন সব মন্তব্য ক'রে বসেছে যে, ক্ষিতীশবাবু, মন্দাকিনী বা কল্যাণী

কেউ না হেসে থাকতে পারেননি। সে সব কথা শুনে কে বলবে বিভূতি একজন উচ্চ শিক্ষিত পূর্ণবয়স্ক যুবক—আকৈশোর যার ক'লকাতায় কেটেছে। গাঁয়ের কোনো নিরক্ষর চাষীও এর চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে। বিভূতি কি চোখকান বুজে চলে, এতখানি বয়স পর্যন্ত সে কি কারো অসুখবিসুখ হতে দেখেনি, ওষুধপত্রের নাম শোনেনি, কোনো ডাক্তার কবিরাজের সঙ্গে আলাপ করেনি কোনোদিন?

কিন্তু নীলিমার রোগভোগের দিন যত বেড়েছে, রাত জাগার পালা যত বেশি পড়েছে, ততই বিভূতির অদ্ভুত অপটুতা থেকে সকলের সস্নেহ প্রশ্রয় এবং কৌতুক উপভোগের মাত্রা কমতে কমতে শেষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। প্রত্যেকেই বিরক্ত হয়েছে। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। নাওয়া নেই খাওয়া নেই, বুড়ো মানুষ হয়ে রাতের পর রাত জাগছেন ক্ষিতীশবাবু—সারাদিনের অফিসের খাটুনির পর। এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই মন্দাকিনী আর কল্যাণীর, আর স্বাস্থ্যবান জোয়ান পুরুষ হয়ে বিভূতি পাশের ঘরে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে, ছুটির দিনে বন্ধুমহলে আড্ডা দিয়ে ফিরছে রাত বারোটায়—এদিকে নিজের স্ত্রী বসেছে মরতে। মায়া দয়া, কর্তব্যবোধ না থাক, একটু চক্ষুলজ্জাও তো থাকে মানুষের।

এসব সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা বিভূতির যে কানে না গেছে তা নয়। কানে যাতে যায় সেই জন্যেই এসব আলোচনা হয়েছে, বিভূতি পাশের ঘরে আছে তা জেনেও।

'সত্যি কলিদি, ভারি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের। আমি তখনই তো বলেছিলাম হাসপাতালে দিয়ে আসি, কিংবা রেখে আসি আমার মার কাছে, নিজের বাসায়। সেখানে শুশ্রূষার কোনো অসুবিধা হবে না। মা'র কিছুতে ক্লান্তি নেই। আমার মা এমন পাঁচ সাতটা রোগীর শুশ্রূষা করতে পারেন একা। আর কারো দরকার হয় না তাঁর।'

কল্যাণীর মুখ শক্ত এবং কালো হয়ে উঠেছে, তারপর তীক্ষ্ণ একটু হেসে বলেছে সে, 'তাই তো এমন মার এমন ছেলে, কিন্তু যে রকম রোগী, তোমার বাড়িতে নিয়ে যেতে শুশ্রূষার আর দরকার হোতো না, একেবারে কেওড়াতলায় নিয়ে হাজির করতে হোতো।'

'তা হোতোই বা, কষ্ট তো আপনাদের এমন ক'রে পেতে হোতো না রাত জেগে জেগে। আচ্ছা, কাল থেকে একটা নার্স ঠিক ক'রে দি কেমন?' কোনো

জবাব না দিয়ে কল্যাণী নিজের কাজে মন দিয়েছে। শিক্ষিত হলেই মানুষের হৃদয় উদার হয় না। এত অকৃতজ্ঞ, এত অভদ্র আর ছোট অন্তঃকরণ বিভূতির। দু'-দিনের মধ্যে তার সঙ্গে কথা বলতেই প্রবৃত্তি হয়নি কল্যাণীর।

খানিক বসে থেকে অতি সন্তর্পণে বিভূতি উঠতে যাচ্ছে, নীলিমা ধীরে ধীরে চোখ মেলল।

'পালাচ্ছ বুঝি ?'

ক'দিন ধরে একটু একটু কথা বলতে পারে নীলিমা।

বিভূতি বলল, 'পালাচ্ছি মানে ? ও ঘর থেকে আসছিলাম একটু।' নীলিমা একটু চুপ ক'রে যেন দম নিল। তারপর আবার আস্তে আস্তে বলল, 'আচ্ছা যাও। ভারি কষ্ট হয় তোমার, ভারি ঘেন্না করে এখানে আসতে না ?'

নিষ্করুণ কঠিন কণ্ঠে বিভূতি জবাব দিল, 'ঠিক ধরেছ।' বিভূতি আবার উঠে দাঁড়াল। এবার নীলিমা তার দুর্ব্বল ক্ষীণ হাতখানি দিয়ে বিভূতির পায়ের পাতা স্পর্শ করল, 'একটু বসো, শুধু আর একটুখানি।'

নীলিমার দিকে তাকাল বিভূতি। কী করুণ আর ক্লান্ত দুটি চোখ নীলিমার। ভারি মায়া হয় দেখলে। মনেই পড়ে না, এই একটু আগেও দুবল কণ্ঠে কী কঠিন কথা তাকে বলেছে নীলিমা। ওর বিছানার পাশে ঘেঁষে আবার বসে পড়ল বিভূতি। দু' একগাছা রুক্ষ চুল ওর কপালের ওপর উড়ছে। বিভূতি হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে গেল। নীলিমা তার শীর্ণ দুবল হাত রাখল বিভূতির হাতের ওপর, বলল, 'আর চলে যেও না।'

এই নির্ভরতা, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ– ভারি চমৎকার লাগল বিভূতির। এমন মিষ্টি কাতর মিনতি নীলিমার কণ্ঠে যেন আর কোনোদিন শোনা যায় নি। বিভূতি ওর সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। দীর্ঘ ঋজু দেহ আরো শীর্ণ হয়েছে রোগে। ফ্যাকাশে হয়েছে রঙ, রক্তের চিহ্নমাত্র নেই এতটুকু। তবু এই রোগশীর্ণ দেহ কেমন যেন ভারি সুন্দর লাগল বিভূতির চোখে। কেমন অসহায়ভাবে বিছানার সঙ্গে একেবারে যেন মিশে রয়েছে নীলিমা। কিন্তু এক রুগ্নতা এক অপূর্ব করুণ সৌন্দর্য এনে দিয়েছে যা কোনোদিন চোখে পড়েনি বিভূতির। এক মুহূর্ত বিভূতি অপলকে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। সুন্দরী নারীর দেহে যে কোনো কিছুই অলংকার হয়ে উঠে; কিন্তু রোগও যে এমন অপরূপ সুষমা এনে দিতে পারে তা

তো বিভূতির জানা ছিল না। রোগকে তাহলে যতটা কুৎসিত সে ভেবেছিল তা কি সে নয়?

বিভূতির অপলক মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল নীলিমার। কী বুঝল, সেই জানে। একটু বুঝি রক্তের আভাস দেখা দিল তার শীর্ণ কপালে, একটু বুঝি হাসি এসে গেল তার পাতলা শুকনো ঠোঁট দু'টির মাঝখানে। গভীর আত্ম-তৃপ্তিতে নীলিমা বলল, 'আমি যদি মরে যেতাম কী করতে?'

বিভূতি বলল, 'মরে যাবে কেন?'

নীলিমার পাতলা ঠোঁটে আবার একটু হাসি ফুটে উঠল, 'তুমি আর চলে যাবে না বলো, সব সময়েই থাকবে এখানে।'

বিভূতি তার সরু লম্বা আঙুলগুলি আলগোছে রাখল ওর ঠোঁটের ওপর। যেন ওই ক্ষীণ পাতলা হাসিটুকু আঙুল দিয়ে সে ছুঁয়ে দেখতে চায়!

সস্নেহে বলল, 'সব সময়েই তো এখানে আছি নীলি।'

নীলিমা নিশ্চিন্তে একবার চোখ বুজল। নিজের শক্তি সম্বন্ধে এতক্ষণে সে সচেতন হয়ে উঠেছে। আর সাধ্য নাই বিভূতির তাকে ঘৃণা করবার, তার রোগকে ঘৃণা করবার, তার কাছে না এসে থাকবার। ওর চোখের মুগ্ধতা নীলিমাকে আশ্বাস দিয়েছে, পথ দেখিয়েছে।

পরদিন অফিসের পর বিকাল বেলায় বিভূতিকে আর ডেকে বসাতে হোলো না, নিজেই এসে সে বসল। 'কেমন আছ এখন নীলি?'

নীলিমা পরম নির্ভরতার সঙ্গে তার হাতখানা বিভূতির কোলের ওপর তুলে দিল, 'এখন? এখন খুব ভালো লাগছে।'

বিভূতির দিকে চেয়ে নীলিমা একটু হাসল। অদ্ভুত লাগে ওর এই রুগ্ন-দুর্বল হাসি।

নীলিমা বলল, 'ভারি স্বার্থপর আমি, না? সব সময় তোমাকে কাছে আটকে রাখতে চাই। ভালো লাগে না যে একটুও তোমাকে ছাড়া। আর কেউ কাছে এলে রাগ হয়ে যায় আমার। ওরা ভাবে রোগে ভুগে ভুগে আমার মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে। সত্যিই কি খিটখিটে হয়ে গেছি আমি খুব?'

যে কথাগুলিকে অন্য সময় ন্যাকামি মনে হতে পারত বিভূতির, এখন এই রোগশয্যায় নীলিমার অসহায় দুর্বলকণ্ঠে তা অত্যন্ত মধুর লাগে। নীলিমার

আঙুলগুলি নিয়ে বিভূতি নাড়াচাড়া করতে থাকে; ভালো লাগে ওর রুক্ষ চুল-গুলির ওপর হাত বুলাতে, ছোট সাদা কবুতরের মত কী কোমল পেলব আর অসহায় এই নীলিমা। অতি সন্তর্পণে ওকে বুকে তুলে নিতে ইচ্ছা করে বিভূতির। কিন্তু সাবানের ফেনার মত নরম আর ক্ষণস্থায়ী ও। ওকে ধরলেই যে মিলিয়ে যাবে!

নীলিমা বলে, 'তুমি শুধু আমার কাছে বসে থাকো। আর কিছু চাই না, কাউকে চাই না আমার। কোনো ওষুধবিসুধ লাগবে না, শুধু তুমি আমার কাছে কাছে থাকো, তাতেই আমি ভালো হয়ে উঠব।'

বিভূতি ওর হাতটা নিজের মুঠির ভিতর নিয়ে আস্তে আলগোছে একটু চাপ দেয়, 'আমি তো তোমার কাছেই আছি নীলি।'

বেল ফুলের একটা চারা আছে টবে উঠানের একধারে। দু'তিনটে ফুল ফুটেছে তাতে। কল্যাণীকে দিয়ে ফুল দুটো তুলে আনলে নীলিমা। বিভূতি আসতে তার হাতে দিয়ে বলল, 'নাও।'

প্রথম প্রেমের দিনগুলি যেন ফিরে এসেছে নতুন ক'রে। সেই একটু ছোঁয়া, একটু কথা, একটু হাসি। আর এই টুকরোগুলি জড় ক'রে মনে মনে তা দিয়ে মালা গাঁথা।

কী হয়েছে বিভূতির। নতুন এক নেশায় যেন পেয়ে বসেছে তাকে। অফিসে কোনোরকমে ঘণ্টা সাতেক কাটিয়ে আজকাল সে একেবারে সোজা চলে আসে নীলিমার কাছে। আড্ডা নেই, বন্ধুবান্ধব নেই, সমস্ত পৃথিবী যেন ধরা দিয়েছে নীলিমার ঘরটুকুর মধ্যে। পরিসর তার কম, কিন্তু কী ঘন আর কী গভীর! আর প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন রঙ বে-রঙের ফুল কিনে নিয়ে আসে বিভূতি। রুক্ষ এলোচুলের মধ্যে গু'জে দেয়, কয়েকটা বালিশের পাশে আর বিছানা ভরে ছিটিয়ে রাখে।

মন্দাকিনী বড় মেয়েকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'ও কি হচ্ছে যত সব সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড। অসুখের বিছানায় ফুল ছড়িয়ে রাখতে কেউ কোনো দিন দেখেছ কখনও? নিষেধ করে দিস তো বিভূতিকে।'

কল্যাণী ম্লান হাসে, 'আমি নিষেধ করবার কে মা? আমার নিষেধ অন্যে শুনবেই বা কেন?'

কিন্তু এক ফাঁকে কল্যাণী ঘরে ঢোকে ওদের। বলে, 'ইস, ফুলের গন্ধে ঘর একেবারে ভরে উঠেছে যে! এ কি রোগশয্যা না ফুলশয্যা নীলি?'

নীলি বলে, 'ফুলশয্যার দিনে আমার জ্বর হয়েছিল মনে আছে দিদি? আজ রোগশয্যায় তার প্রতিশোধ নিচ্ছি।'

ভারি সুন্দর লাগলো নীলিমার কথা বিভূতির। এত চমৎকার ক'রে সে বলতে পারে। আর এমন একান্ত ক'রে সম্পূর্ণ ক'রে নীলিমাকে যেন কোনোদিন পাওয়া যায়নি। নীলিমা সম্পূর্ণ তার। ভাবতেও কী আনন্দ লাগে, কী চমৎকার এর অনুভূতি। মৃদু গুঞ্জরণে সময় কাটে। কত কথা আর কত গল্প। নীলিমা বলে, 'মরে গেলে তো ভারি ঠকে যেতাম, তোমাকে এমন কাছে পেতাম কেমন ক'রে?'

হঠাৎ নীলিমার চোখ দু'টি সজল হয়ে ওঠে, ভারি হয়ে আসে গলা। বিভূতি ছেলেমানুষের মত বলে, 'মরে গেলেই হোলো আর কি?'

নীলিমা বলে, 'কিন্তু এই অসুখে অনেক টাকা পয়সা তোমার নষ্ট হয়ে গেল তো।'

বিভূতি যেন লজ্জিত বোধ করে টাকাপয়সার কথায়, 'তা যাক, তোমাকে তো ফিরে পেলাম।'

শান্ত গভীর চোখ মেলে নীলিমা স্বামীর দিকে তাকায়। নির্ভর প্রসন্নতায় অদ্ভুত সুন্দর দুটি চোখ। এত মূল্য নীলিমার স্বামীর কাছে, এত মূল্য তার মত নিতান্ত সাধারণ একটি মেয়ের।

একান্ত ক'রে নীলিমার এই আত্মসমর্পণ অতি অপূর্ব মনে হয় বিভূতির। কিন্তু সেরে উঠতে বেশ সময় লাগে নীলিমার। অমাবস্যায় পূর্ণিমায় অন্য উপসর্গের সঙ্গে জ্বরও বাড়ে। আবার ডাক্তার আসে, আসে ওষুধপত্র। কিন্তু কল্যাণীদের আর তেমন সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে হয় না। সেবা-পরিচর্যা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু শিখে ফেলেছে বিভূতি। নীলিমার শুশ্রূষায় বিভূতি যেন নতুন এক আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে। যে সব কাজকে আগে সে ভয় করত, ঘৃণা করত, তাতে এখন তার তৃপ্তির অন্ত নেই।

আরো এক নতুন খেয়াল দেখা দিয়েছে বিভূতির। ওষুধপত্র তো আনেই সঙ্গে সঙ্গে কোন এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে মোটামোটা ডাক্তারী বইগুলিও সে বয়ে নিয়ে আসে, আর নীলিমার শিয়রে বসে রাত জেগে ম্লান আলোয় ওই সব নীরস বিজ্ঞানের বই সে পড়তে আরম্ভ করে। জটিল স্ত্রীরোগে ভুগছে নীলিমা। ডাক্তারের

কথায় সব বোঝা যায় না, ডাক্তার কোনদিন সব কিছু খুলে বলেও না রোগীর আত্মীয়স্বজনকে। নিজেকেই কষ্ট ক'রে জানতে হবে বিভূতির কোথায় এসবের উৎপত্তি, কিসেই বা এর নিরাময়। সব বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে ভারি কঠিন লাগে, তবু অসীম ধৈর্য বিভূতির, অপরিসীম অধ্যবসায়। নীলিমার জন্য সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্রকেই সে যেন ভালোবেসে ফেলেছে। নতুন এক জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করেছে সে। এমন যে নীরস বিজ্ঞান তাও নীলিমার সাহচর্যে অপূর্ব রসময় হয়ে উঠেছে তার কাছে। আজ যা রাত জেগে পড়ে, কাল তা নীলিমাকে সে সরল ভাষায় বুঝিয়ে দেয়; বেশ লাগে বিভূতির।

চিকিৎসক হিসাবে বেশ খ্যাতি আছে বীরেনবাবুর, অভিজ্ঞতাও দীর্ঘ দিনের। সময় লাগলেও নীলিমা দিনের পর দিন ভালোই হয়ে উঠেছে তাঁর চিকিৎসায়, তবু এই দিনগুলির কি আর শেষ হবে না, যেন যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। কতদিনে নীলিমা উঠে দাঁড়াতে পারবে?

সবাইকে নীলিমা জিজ্ঞাসা করে। স্বামীকে বলে, 'কত কষ্টই যে তোমাকে দিচ্ছি মাসের পর মাস।'

'কষ্ট! আমার তো একটুও কষ্ট হয় না নীলিমা।'

বিভূতির কণ্ঠে প্রসন্নতার আভাস পেয়ে নীলিমা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থাকে।

পর পর গোটা দুই জো' বাদ যায়। তারপর থেকে বেশ দ্রুতবেগেই সুস্থ হয়ে ওঠে নীলিমা। বীরেনবাবু বিস্মিত হন। এত প্রাণশক্তির ওর মধ্যে! এত দীর্ঘ রোগ ভোগের পর এত তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যলাভ করতে তো কাউকে দেখা যায় না। আজকাল একটু একটু উঠে বসতে পারে নীলিমা। বসে বসেই হাত বাড়িয়ে ওষুধের শিশি আর অন্য সব জিনিসগুলি নিজের পছন্দমত গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

বিভূতি বলে, 'ওসব দুদিন বাদেই না হয় কোরো নীলিমা, আগে ভালো হয়ে ওঠো।'

নীলিমা অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলে, 'ভালো তো আমি হয়েই গেছি।'

চিকিৎসকও তাতে সায় দেন। ওকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দভাবে চলতে দেওয়াই এখন ভালো। মনের জোরই আসল জোর।

দেখতে দেখতে যেন নতুন শরীর গ্রহণ করে নীলিমা। শরীরকে পিছনে ফেলে

এগিয়ে যায় তার মনের উৎসাহ। নারকেল গাছ দুটোর ফাঁকে হলুদ রঙের চাঁদ ওঠে গোল হয়ে। কি সুন্দর, কি চমৎকার নতুন সবুজ পৃথিবী তার চোখের সামনে। দু'একজন আত্মীয়-বন্ধু আসে অভিনন্দন জানাতে। হাতে টুকিটাকি উপহারের জিনিস। উল্লাসে উচ্ছ্বাসে বালিকার মত চপল হয়ে ওঠে নীলিমা। যেন মানুষ এই প্রথম দেখল জীবনে।

'অরুণদা, চল না সিনেমায় নিয়ে যাবে আজ আমাকে সন্ধ্যার শো'তে।'

অরুণ হাসে, 'আজ নয় নীলি, আরো যাক দু'চার দিন।'

নীলিমা যেন আটদশ বছরের মেয়েতে পরিণত হয়েছ। 'কেন যাবে আরো দু'চার দিন? আজই, আজই চল। বিশ্বাস কর, আমি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছি। ভাল হইনি?'

'নিশ্চয়ই, সুন্দরও হয়েছ।'

নীলিমা খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে, 'তোমার অসভ্যতা আর গেল না অরুণদা।'

আর পাশের ঘরে বসে তার এই হাসি আর উল্লাস অত্যন্ত কুশ্রী মনে হয় বিভূতির কাছে। কী তরল, কী ছেলেমানুষ হয়ে গেছে নীলিমা। কোথায় গেল অতল রহস্যময় কালো চোখের সেই করুণ প্রশান্ত দৃষ্টি? কোথায় সেই অনুভূতিঘন গভীরতা? সে মরে গেছে, সে নীলিমা আর নেই।

ট্রাঙ্ক থেকে দামী বিচিত্র রঙের শাড়ি বার করল নীলিমা, প্রসাধন করল অনেকক্ষণ ধরে আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে সে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। বেশ লাগে নিজেকে দেখতে। খানিক পরে ঘুরে গেল বিভূতির ঘরে।

বিভূতি ঘাড় গুঁজে সেই মোটা ডাক্তারী বইটা পড়ছে। নীলিমা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বইটাকে, 'ওকি হচ্ছে বসে বসে, ওই অলুক্ষুণে হতচ্ছাড়া বইটা এখনো রেখেছ বাড়িতে? বিদায় ক'রে দাও, বিদায় ক'রে দাও ওকে। চলো যাই, একটা রিটার্ন ভিজিট দিয়ে আসা যাক মীনাদের বাড়ি থেকে। সেখান থেকে একেবারে সিনেমাতে। টিকিট কেটে অরুণদা অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে।'

খুশিতে টলটল করছে নীলিমার চোখমুখ, সর্বাঙ্গ। কিন্তু বিভূতির মনে হলো তা বড় তরল, বড় হাল্কা। শোভন সংযত প্রকাশের অভাবে তাকে রীতিমত অশ্লীল বলে মনে হয়।

নীলিমা হাত ধরে টেনে তুলল বিভূতিকে। শরীরে তার কতখানি নতুন শক্তির সঞ্চার হয়েছে তার পরিচয় দিচ্ছে যেন সে, 'ওঠ ওঠ, শিগগির জামাকাপড়টা পাল্টে নাও। ওই দেখ, বসে বসে ওকি করছ? ওই সব রাবিশ শিশি বোতলের স্তূপ তাক ভরে সাজিয়ে রেখেছ যে অত যত্ন ক'রে, ডিসপেনসারি খুলবে নাকি? না ভেবেছ, ওগুলি বাড়ি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে? আচ্ছা কাণ্ড তোমার। বাবারে বাবা, দিনের পর দিন কতখানি ক'রে বিষই যে গিলতে হয়েছে ঢকঢক ক'রে। ফেলে দাও ফেলে দাও ওসব। কী হবে ছাই আর ও গুলি দিয়ে। নাও তৈরি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি, আর দেরি কোরো না লক্ষ্মীটি।'

দুঃসহ বিরক্তিতে মন ভরে ওঠে বিভূতির। যে রোগকে সে ঘৃণা করত তার আর চিহ্ন নেই নীলিমার শরীরে। ওর শীর্ণ গালে রক্তের সঞ্চার হয়েছে। নতুন স্বাস্থ্যের আবির্ভাব হয়েছে ওর দেহে। তবু ওর দিকে চেয়ে চেয়ে কেন যেন ঘৃণায় রি রি করতে থাকে বিভূতির সর্বাঙ্গ। মন ভরে যায় অদ্ভুত বিতৃষ্ণায়। কঠিন শুষ্ককণ্ঠে বলে, 'কি ছেলেমানুষী আরম্ভ করেছ নীলিমা, যাও এখান থেকে, তোমার যা খুশি কর গিয়ে।' মেঝে থেকে বইটা আবার তুলে নিল বিভূতি।

নিজের আনন্দের রঙে নীলিমার সমস্ত পৃথিবী এতক্ষণ রঙীন হয়েছিল। ভেসে চলেছিল খুশির স্রোতে। এবার হঠাৎ ঘা খেয়ে নীলিমা স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকাল। এই কি বিভূতির চোখ? আনন্দ নেই, উল্লাস নেই, বিভূতির চোখ কি পাথরে গড়া? ঘৃণায় আর বিরক্তিতে তা যেন বিকৃত আর ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে মনে পড়ল, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পর বিভূতি তাকে আর কোনো উপহার এনে দেয়নি। এই ক'দিনের মধ্যে কোনো উৎসাহ জাগায়নি, অভিনন্দন জানায়নি। বিভূতি কি চায় না তাহলে নীলিমা নীরোগ হয়ে উঠুক, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করুক। আত্মীয়, পাড়াপ্রতিবেশী পর্যন্ত আশীর্বাদ ক'রে গেছে, আনন্দ জানিয়ে গেছে নীলিমা ভালো হয়ে উঠেছে বলে; আর বিভূতি তার স্বামী হয়ে, পৃথিবীতে তার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী সবচেয়ে ভালবাসার পাত্র হয়ে এতে খুশি হতে পারল না? নীলিমার আরোগ্য চায় না, স্বাস্থ্য চায় না, সৌন্দর্য চায় না, তবে কী চায় বিভূতি, কী চায়? নীলিমা কয়েক পা এগিয়ে এলো বিভূতির কাছে, একখানা হাত রাখল বিভূতির কাঁধে, 'এই শোন।'

বিভূতি ঘাড় ফেরাল, বিরক্তিতে কপাল তার কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে, 'আবার? আবার এসেছ তুমি ইয়ারকি দিতে? কিন্তু আমি তো আর তোমার মত নবজন্ম লাভ করিনি যে উড়ে উড়ে বেড়াব প্রজাপতি সেজে? চিকিৎসা বাবদ অনেক

দেনা হয়েছে বাজারে, সেগুলো শোধ দেওয়ার ভাবনা আমাকেই ভাবতে হবে। বলেছি তো, তুমি যাও না, বেড়িয়ে এসোগে যেখান থেকে খুশি।'

নীলিমার মুখে অদ্ভুত হিংস্র একটুকরো হাসি। একঝলক তরল বিষ যেন লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে. 'পাগল হয়েছ! তুমিও যেমন। কোথায় আবার যাব বেড়াতে। তার চেয়ে ওদের কাউকে বল বিছানাটা পেতে দিক, আবার শুয়ে পড়ি। তাক থেকে ওষুধের শিশিগুলি নামিয়ে আনো, আর তুমি এসে বস শিয়রের কাছে আগের মত ওই ডাক্তারি বইটা নিয়ে। রোগশয্যাই যে আমাদের ফুলশয্যা। এ ছেড়ে যাবো আবার কোথায়। এই দিব্যি ক'রে বলছি তোমাকে, আমি আর কোনদিন উঠতে চাইব না।'

সদ্য চুনকাম করা দেয়ালগুলি শুধু শুভ্রই নয়, শূন্যও। একখানা ফটোগ্রাফ কিংবা ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত নেই। একপাশে একখানি তক্তপোশে বিছানা পাতা। সাদা, চাদরটা মেঝে পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পাশেই ছোট একটি টেবিল, দু'একখানা বইপত্র আর একটি ফুলদানিতে কয়েকটি চন্দ্রমল্লিকা। তক্তপোশের উপর পা ঝুলিয়ে বসে অমিতার দিকে আর একবার তাকালো চিন্মোহন। ঘরের মতই নিরাভরণ শুভ্র ওর সজ্জা। ভিজে এলোচুল সমস্ত পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে, ও যেন কালো শ্লেটের ওপর খড়ি দিয়ে লেখা একটি শ্লোকের স্তবক।

ইচ্ছা করলে এখান থেকেই হাত বাড়িয়ে ওর একখানা হাত চিন্মোহন তুলে নিতে পারে। অমিতা একটুও বাধা দেবে না, একটুও বিস্মিত হবে না। তবু থাক, এই স্তব্ধ গম্ভীর মর্মরমূর্তির সামনে বসে প্রশান্ত মাধুর্যে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, কোনো ক্ষোভ থাকে না, কোনো চাঞ্চল্য জাগে না। রূপের এই অনুভূতি চিন্মোহনের জীবনে এই নতুন। এতকাল উজ্জ্বল শিখায় নিজেকে আহুতি দিয়েছিল আনন্দ। দহনজ্বালায় নিজের অস্তিত্বকে তীব্রভাবে অনুভব করা যেত। কিন্তু অমিতার সঙ্গে পরিচয় না হলে জীবনে মধুর প্রশান্তির এই আস্বাদন আর হয় তো ঘটে উঠত না।

কোনো কোনো দিন চুলের মত সূক্ষ্ম একটু কালো পাড় থাকে, কাপড়ে, আজ একেবারে সাদা থান পরেছে অমিতা। তাতে গাম্ভীর্য যেন আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে। রিক্ততার মধ্যেই যেন ওর ঐশ্বর্যের পূর্ণ প্রকাশ। একটু চুপ ক'রে থেকে চিন্মোহন ডাকল, 'শ্বেতা'।

বেশ আর পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে ওর নাম দিয়েছে চিন্মোহন মহাশ্বেতা। স্নিগ্ধ হাসল অমিতা। চিন্মোহনের মনে হোলো, ওর হাসির রঙও যেন সাদা এক-গুচ্ছ যুঁই ফুলের মত। যেমন স্বল্প, তেমনি সুন্দর।

'তবু ভালো, আজ আর মহাশ্বেতা নই।'

চিন্মোহন বলল, 'মহাশ্বেতাই তো। আমার দেওয়া নাম যাতে সম্পূর্ণ সার্থক হয় তার জন্যে শাড়ির প্রান্ত থেকে কালো রেখাটুকু পর্যন্ত তুলে দিয়েছ।'

অমিতা কোনো কথা বলল না।

চিন্মোহন বলল, 'বেশ, আমার কোনো আপত্তি নেই, এ বেশ যেদিন নিজে থেকে বদলাবে আমি সে দিনের প্রতীক্ষা ক'রে থাকব। কিন্তু বদলাতে একদিন হবেই।'

চিন্মোহন তার চোখের দিকে তাকাতে অমিতা চোখ নামিযে নিল। কি যেন আছে চিন্মোহনের দৃষ্টিতে, যাতে সমস্ত অন্তর থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে।

বেশ বদলান আর রোধ কবা যাবে না একথা অমিতাও জেনেছে। সে সম্ভাবনা দিনের পর দিন, মুহূর্তের পর মুহূর্তে ক্রমেই নিকটতর হয়ে আসছে। বদলাতে হবে। শুধু কি বেশ? জীবনেব মূল ধারাই ছুটবে নতুন গতিতে। কিন্তু কেমন হবে সে পথ? কেমন হবে পরিবর্তন। এখনো শঙ্কায় মন দুলতে থাকে, সংশয় সম্পূর্ণ ঘুচতে চায় না। এই পাঁচ বছবের বৈধব্য জীবনের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে গেছে। এ ছাড়া অন্য জীবনের কথা কল্পনাও যেন করা যায় না। কিন্তু যার স্মৃতির জন্যে এই কৃতজ্ঞতা সেই মৃত অমূল্যের ওপর মন কি অমিতার আজো তেমনি একনিষ্ঠ আছে? দৈনন্দিন জীবনে বিধবার আচার নিষ্ঠা সে তেমনি মেনে চলেছে, কিন্তু নিজের মনের খবব তো অমিতা জানে। এই শুভ্র বেশবাসের সঙ্গে মনের মিল কই? কত রাত্রে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছে অমিতা, তবু অমূল্যেব মুখ স্পষ্ট ক'রে মনে পড়েনি; সেখানে ভেসে উঠেছে চিন্মোহনের প্রতিমূর্তি। অমিতা আর পারে না, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আর আত্মনিরোধের অন্ত কবে হবে? গোপন কাঁটায় মুহুর্মুহু ক্ষতবিক্ষত হওযায় শক্তি আর অমিতার নেই। এবার সে শিথিল দেহে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবে। দুর্বার স্রোত যেখানে খুশি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাক।

তবু ওর চোখেব সামনে নিজেব মনকে এমন ক'রে উন্মুক্ত ক'বে মেলে ধরবার কি প্রয়োজন ছিল? এর চেয়ে আজীবন প্রাচ্ছন্ন থাকতে পারলে নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে পারলে যেন কৃতিত্ব ছিল, আনন্দ ছিল বেশি! দিনের পর দিন পাপড়ির পর পাপড়ি খুলতে থাকবে, তবু তার মনেব কিছুতে নাগাল পাবে না চিন্মোহন; অমিতা তেমনি ভেবে রেখেছিল। কিন্তু তা হোলো কই। কখন কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে একসঙ্গে সমস্ত দলগুলি খুলে গেল অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ওর চোখের আলোয় কিছুই আর গোপন রইল না।

পর্দার বাইরে থেকে ভুবনবাবু ডাকলেন, 'অমি, মা।'

অমিতা হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারল না।

চিন্ময়োহন বলল, 'আসুন।'

ভুবনবাবু ঘরে ঢুকতেই চিন্ময়োহন চেয়ার ছেড়ে দিয়ে তক্তপোশের এক পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে সংকোচের সঙ্গে অমিতা আরো খানিকটা সরে বসল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভুবনবাবু মনে মনে হাসলেন। ওর বৈধব্যক্লিষ্ট শীর্ণ চেহারায় যেন এক নতুন রঙের ছোপ লেগেছে। বয়স ওর পঁচিশ হতে চলল, গত বছর বি, টি, পাশ করে গুরুগম্ভীর হেড মিস্ট্রেস হয়েছে। বাড়িতেও খাওয়া শোওয়া নিয়ে ওর কড়া শাসনে ভুবনবাবুকে সর্বদা তটস্থ থাকতে হয়। সেই মেয়ের এই বালিকাসুলভ লজ্জা তাঁর চোখে ভারি অপরূপ লাগল। ভুবনবাবু মুহূর্তের জন্যে যেন পলক ফেলতে ভুলে গেলেন। ওর দেহ মনে যেন লাবণ্যের নতুন জোয়ার এসেছে, বাঁচবার নতুন সার্থকতা। দীর্ঘ দীনের সংস্কারবদ্ধ মনকে ধিক্কার দিলেন ভুবনবাবু। এ সম্ভাবনার কথা যদি তাঁর আরো চার বছর আগে মনে পড়ত, তাহলে এই ব্যর্থ কৃচ্ছ্র সাধনে ওর জীবনের এতগুলি দিন এমন করে নষ্ট হয়ে যেত না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে চিন্ময়োহনের দিকে তাকিয়ে ভুবনবাবু বললেন, 'একটা কথা নিশ্চিত ক'রে জেনে নেওয়া দরকার চিন্ময়োহন। তোমরা দুজনেই বয়ঃপ্রাপ্ত, সে হিসেবে ভালোমন্দ সমস্ত বোঝাপড়া নিজেরাই ক'রে নিতে পার, মাঝখান থেকে আমার হস্তক্ষেপের অবশ্য কোনো প্রয়োজন নেই,—'

চিন্ময়োহন বাধা দিয়ে বলল, 'না না তা কেন, অভিভাবক হিসেবে নিশ্চয়ই আপনার অনেক কিছু জানবার থাকতে পারে।'

ভুবনবাবু হাসলেন, 'সে কথা থাক। নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই কয়েকটা কথা স্পষ্ট বুঝতে চাই। নতুন কিছু নয়। সে দিন তুমি যখন আমার কাছে প্রস্তাব করেছিলে তখন আমি যা জিজ্ঞেস করেছিলাম তার জবাব তো এখনো পাইনি চিন্ময়োহন।'

চিন্ময়োহন বলল, 'হ্যাঁ। খোলাখুলিভাবেই আমি সকলের সঙ্গে আলোচনা করেছি। দাদা তো সম্পূর্ণ সমর্থনই করেন। অনেক ক'রে বুঝিয়ে বলবার পর মায়ের সম্মতিও শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। হয় তো সেটা তাঁর সানন্দ সম্মতি নয়, কিন্তু এ ধরণের কিছু কিছু প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি অমিতার আছে বলেই আমি জানি। যদি নাই পারে তাতেই বা ক্ষতি কি। বর্তমান যুগের বিবাহটা ব্যক্তিগত, পরিবারগত নয়।'

ভুবনবাবু এবারও একটু মৃদু হাসলেন, 'সে কথা সত্য। কিন্তু পরিবার আর সমাজ—কয়েকজন জ্ঞাতি বন্ধু নিয়ে সে সমাজের গণ্ডী যত ছোটই হোক তাকে

অস্বীকার করা অত সহজ নয়। জীবনে কিসের যে কতটুকু প্রভাব তার হিসেব কি খুব সহজ চিন্মোহন ?'

ভুবনবাবুর কথার শেষের দিকটায় যেন একটু ক্লান্ত করুণ সুর বেজে উঠল। ইতিহাসটা চিন্মোহনের কিছু কিছু জানা। নিজের সম্পর্কিত পিসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন ভুবনবাবু। মাত্র এইটুকু অবৈধতায় পরিবারের সঙ্গে আজীবন তাঁদের বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছে। সেই নিঃসঙ্গ রুক্ষতা তাঁদের দাম্পত্যজীবনকে স্পর্শ করতে ছাড়েনি।

চিন্মোহন চুপ ক'রে রইল। কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে অমিতা বলল, 'যাই বাবা চা করে আনি।'

ভুবনবাবু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

সপ্তাহখানেক সময় নিয়েছিল অমিতা। সপ্তাহের শেষে আরো এক সপ্তাহ সময় চাইল। কিন্তু অসহিষ্ণু চিন্মোহন মাথা নাড়ল, 'না আর সময় তুমি পাবে না। আয়ুর সমস্ত সপ্তাহই তাহলে এমনি একটি একটি ক'রে কাটবে। আর বিলম্ব নয়। যা হয় কালই।'

ওর এই অসহিষ্ণুতা মাঝে মাঝে বেশ লাগে অমিতার। আরো বেশি অসহিষ্ণু, বেশি রূঢ় যদি হয়ে উঠত চিন্মোহন, তাহলে অমিতার দায়িত্ব যেন আরো অনেক কমত। তার সমস্ত দ্বিধাসংশয়ের তন্তু নির্দয় হাতে উন্মোচিত ক'রে ফেলুক চিন্মোহন। অমিতা বাধা দেবে না।

স্থির হোলো বিয়ে হবে রেজেস্ট্রি করেই, তবু চিন্মোহনের পারিবারিক সন্তুষ্টির জন্যে হিন্দু অনুষ্ঠানগুলিও পালন করা হবে।

লজ্জায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে অমিতার মন। আবার সেই অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি। কিছুতেই মন সাড়া দেয় না।

একটু চুপ ক'রে থেকে অমিতা বলে, 'ওগুলি কি না করলেই নয়।'

চিন্মোহন বলে, 'আমার জন্যে ওগুলি নিতান্তই অনাবশ্যক কিন্তু আত্মীয় স্বজনের জন্যে কিছুটা প্রয়োজন আছে বইকি। তবু জিনিসগুলি যে বিরক্তিকর সন্দেহ নেই। কত যে অসংখ্য মেয়েলি আচারের মধ্য দিয়ে পার হতে হয় তার ঠিক নেই। 'তবু', চিন্মোহন মিষ্টি হাসল, 'তবু একবারের অভিজ্ঞতা তোমার যখন হয়েছে তত অসুবিধা হবে না বোধ হয়। কিন্তু ওদের পাল্লায় পড়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ আমার

দশাটা কি হবে ভেবে দেখ তো।'

হঠাৎ ভারি বিবর্ণ দেখাল অমিতার মুখ। চিন্মোহন বিস্মিত হয়ে বলল 'কি হোলো ?'

ম্লান হাসল অমিতা, 'কি আবার হবে।'

কিন্তু কি যে হয়েছে তা বুঝতে বাকি নেই চিন্মোহনের। অমিতার পূর্বজীবন সম্বন্ধে পারতপক্ষে কোনোদিন কোনো কৌতূহল চিন্মোহন প্রকাশ করেনি, এ প্রসঙ্গ সতর্কভাবে সে বরং এড়িয়েই যায়। তবু কোনো মুহূর্তে তার উল্লেখ মাত্রেই অমিতা যদি এমন আঘাত পায়, এতটা অসহায় বোধ করে, তাই বা কি ক'রে চিন্মোহন সহ্য করবে ? বয়স এবং অভিজ্ঞতা কি কম হয়েছে অমিতার, যে তার মন আজো এতখানি স্পর্শকাতর থাকবে।

'একটা কথা আজ একটু খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে চাই অমিতা।' চিন্মোহনের কণ্ঠ একটু রূঢ় এবং গম্ভীর শোনাল।

'বলো'

'তোমার পূর্বজীবনের প্রসঙ্গ এতকাল সযত্নে দুজনে আমরা এড়িয়েই গছি। কিন্তু ফল তাতে ভালো হয়নি দেখা যাচ্ছে। এর চেয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনাই বরং ভালো। বেদনা আর দুর্বলতার স্থানকে লুকিয়ে রেখে কাজ নেই। অমূল্যবাবুকে তুমি আজো ভুলতে পারনি, এই তো স্বাভাবিক। এজন্যে আমার কোনো ঈর্ষাও নেই, ক্ষোভও নেই। আমার শুধু দুঃখ এই, তাঁর কথা আমার কাছ থেকে তুমি সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে চাও। অন্যান্য প্রসঙ্গের মত তাঁর কথাও এমনকি তোমাদের সে দাম্পত্যজীবনের খুঁটিনাটি কাহিনী পর্যন্তও দুজনে আমরা আলোচনা করতে পারি।'

অমিতা অদ্ভুত একটু হাসল, 'প্ল্যানটা যেমন ভালো তেমনি কৃত্রিম। জীবনকে সব সময় অমন ফরমূলায় বাঁধা যায় বলে কি মনে হয় তোমার ?'

চিন্মোহন বলল, 'বেঁধে নিতে পারলে অনেক সময় কিন্তু ভালোই হয়। নিজেদের গড়া যে বাঁধন তাকে ভয় কিসের, সে তো ছন্দের বাঁধনের মত। বিয়েকেও তো লোকে বন্ধন বলে।'

মনে মনে যত বিরূপতাই থাক মুহূর্তের জন্যে সকলে মুগ্ধই হলেন। রূপ যেমন আছে, সংযত রুচিও তেমনি। বয়স যতটা বেশি বলে শোনা গিয়েছিল, মুখে ততখানি ছাপ পড়েনি। বিদ্যার সঙ্গে বন্দুকের সঙ্গীনের মত তীক্ষ্ণাগ্র অহংকার

উঁচু হয়ে নেই। শুধু চিন্মোহনের সঙ্গেই তার সম্পর্ক নয়, পরিবারের সকলের সঙ্গেই অন্তরঙ্গ হতে অমিতা উৎসুক।

তবু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অমিতার মনে অস্বস্তির গোপন কাঁটা কোত্থেকে এসে বিঁধতে লাগল। মন্দাকিনীকে প্রণাম করতে গেলে তিনি হঠাৎ পা সরিয়ে নিলেন, 'থাক্ থাক্।'

অপ্রতিভ হয়ে অমিতাকে সরে দাঁড়াতে হোলো।

বাইরের ঘরে শোনা গেল চিন্মোহনের বড় ভাই মনোমোহন বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বন্ধুদের কাছে বক্তৃতা করছেন, 'আমি বেশ ভেবেচিন্তে ইচ্ছা করেই মত দিয়েছি, বুঝলে বন্ধু। এমন সচেতন চেষ্টা ছাড়া বিধবাবিবাহ আমাদের সমাজে প্রচলিতই হবে না। লজ্জা আর সংস্কারের জড়তা এমন জোর করেই ঘুচানো দরকার।'

অমিতা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে যায়।

খেতে বসেও অসুবিধার অন্ত নেই। পুরুষদের খাওয়া হয়ে গেলে চিন্মোহনের বোন সুনন্দা আর তার বউদি সরমার সঙ্গে অমিতাকে খেতে দেওয়া হোলো। পরিবেশনের ভার নিয়েছে সম্পর্কিত এক ঠানদি। বিবাহাদি ব্যাপারে খাটতে যেমন তিনি পারেন তেমনি পারেন কথা বলতে। তাঁর রসনার সরসতার খ্যাতি আছে পাড়ায়।

নিরামিষ আমিষ নানারকমের তরকারি। কিন্তু অমিতা শুধু নিরামিষ তরকারি দিয়েই খেয়ে চলেছে। আমিষ একটাও সে স্পর্শ পর্যন্ত করছে না। ঠানদি তা লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'ওমা নতুন বউ যে মাছের তরকারি একটাও ছুঁয়ে দেখলে না। এত কষ্ট ক'রে রঁাধলুম তো ভাই তোমার জন্যেই।'

সলজ্জভাবে অমিতা বলল, 'আজ থাক।'

'ওমা থাকবে কেন, সধবার যে রোজ মাছ খেতে হয়।'

সুনন্দা বলল, 'খান বউদি চমৎকার হয়েছে।'

সরমাও বলল, 'একটা তরকারি অন্ততঃ খাও।'

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে একটুকরো মাছ মুখে দিল অমিতা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দুঃসহ বিবমিষায় ভাতের গ্রাসটা সে ঢেলে ফেলল মেঝের ওপর। সবাই অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লজ্জায় আর অস্বস্তিতে প্রত্যেকটি মুহূর্ত অসহনীয় লাগতে লাগল অমিতার।

ঠানদি কিছুক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি মুখ টিপে হাসতে লাগলেন। 'ও তাই বল। তা চিন্ময়র সঙ্গে

ভাব তো নাতবউয়ের শুনেছি অনেকদিন থেকেই। বিয়ে যে হবে এ তো প্রথম থেকেই জানত। মাছকোচ খাওয়ার অভ্যাসটা তখন থেকে আরম্ভ করলেই তো হোতো। তাহলে আর এমন অসুবিধায় পড়তে হোতো না। সে সব বিধিনিষেধ তো আর সকলের জন্যে নয়।'

অমিতা চেয়ে দেখল, সকলের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছে।

খেয়ে দেয়ে উঠে সুনন্দা বলল, 'ঠানদি চিরকালই ভারি ঠোঁটকাটা, আপনি কিছু মনে করবেন না বৌদি।'

অমিতা নীরবে ম্লান একটু হাসল। বাইরের আচার-আচরণ নিয়ে এমন আকস্মিক অসুবিধায় পড়তে হবে, নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে এ ধারণা তার কিছুতেই মাথায় আসেনি।

সুনন্দা সহানুভূতির স্বরে বলল, 'গা বমি বমি লাগছে নাকি এখনো? একটা পান খেয়ে দেখুন না বউদি, সেরে যাবে।'

অমিতা বলল, 'পান তো আমি খাইনে।'

সুনন্দা হাসল, 'খান না বলে কি এখনো খেতে হবে না নাকি? আমিই কি সবদিন খাই? কিন্তু নিমন্ত্রণ-টিমন্ত্রণের পর পান খেলে ভারি চমৎকার লাগে। দাঁড়ান আমি সেজে আনছি, ভালো যদি না লাগে কি বলেছি।'

চৌদ্দপনের বছরের কিশোরী মেয়ে। ওর নিজের ভালো লাগার স্রোতে অন্যের অসুবিধাটা ও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। স্কুলে এমন অনেক ছাত্রীর সঙ্গে নিত্য পরিচয় হয়েছে অমিতার, কিন্তু কারো সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে পারেনি।

সারাদিনের মধ্যে চিন্মোহনের আর সাক্ষাৎ নেই। ভিড়ের মধ্যে বাইরে বাইরে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে; তাকে দেখাই যায় না আর। মনে মনে অমিতা হাসে। এতদিনের সেই সপ্রতিভ চিন্মোহন বিয়ের পর হঠাৎ এমন লাজুক হয়ে উঠলো কি ক'রে।

সন্ধ্যায় সরমা আর সুনন্দা প্রসাধনের নানা উপকরণ নিয়ে বসল, অমিতাকে নিজেদের পছন্দমত সাজাবে।

বিব্রত হয়ে অমিতা বলল, 'এ সব কেন এত?'

সুনন্দা বলল, 'কেন নয়? আগের মত আজো কি সেই সাদা—'

চোখের ইসারায় সরমা তাকে নিষেধ ক'রে বলল, 'ছি।'

অমিতা ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে। তাকে নিয়ে যা খুশি করুক ওরা। অস্বস্তি প্রথমটায় লাগলেও এ ধরনের আত্মসমর্পণে অদ্ভুত তৃপ্তিও যে একরকম পাওয়া যায় তা যেন বহুকাল পরে আবার নতুন করে অনুভব করল অমিতা। এ যেন আর কেউ আর কারো শরীর। সুনন্দাদের একজন হয়ে অমিতাও যেন কৌতুক বোধ করছে।

আলতায় দুটো পা একেবারে লেপে দিয়েছে সুনন্দা। কপাল আর সিঁথি নিয়ে পড়েছে সরমা। সিঁদুরের সূক্ষ্ম রেখায় তার তৃপ্তি নেই। নিজের মত ক'রে অমিতার সিঁথিও সম্পূর্ণ সে এয়োতির চিহ্নে উজ্জ্বল ক'রে তুলল। কপালে বড় ক'রে এঁকে দিল সিঁদুরের ফোঁটা। কে বলবে বিধবার বেশে পাঁচ পাঁচটি বছর কাটিয়ে এসেছে অমিতা। খাওয়া দাওয়ার পর সুনন্দার পাল্লায় পড়ে এ বেলাও পান খেতে হোলো। তাছাড়া দীর্ঘদিন পরে হলেও পানের স্বাদটা অমিতার ভালোই লেগেছে।

সাজিয়ে-গুজিয়ে সুনন্দা তাকে ঠেলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল নিজের বড় দেয়াল আয়নাটার সামনে, 'দেখুন কি চমৎকার মানিয়েছে, আমূল বদলে গেছেন একেবারে। নিজেকে নিজে চিনতে পারছেন তো?'

মৃদু হাসল অমিতা, 'না পারাইতো ভালো।'

হাতের তালুতে মাথা রেখে কি একটা বই পড়ছিল চিন্মোহন। অমিতাকে দেখে হঠাৎ চমকে উঠল।

'একি হয়েছে?'

অমিতাও একটু বিস্মিত হোলো, 'কেন, কি আবার হবে।'

চিন্মোহন যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, 'তোমাকে এমন বিশ্রী সঙ সাজাল কে।'

কথার ভঙ্গিটা কেমন যেন দুঃসহ লাগল অমিতার, বলল, 'কে আবার সাজাবে? আমি নিজেই সেজেছি। কেন খুব খারাপ লাগছে নাকি?'

চিন্মোহনের ঠোঁটে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল, 'না না না, অতি চমৎকার, অতি চমৎকার। দশ বছর বয়স কমে গেছে তোমার। একেবারে চতুর্দশী বালিকা-বধূ।'

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে চমকে উঠে চোখ তুলতেই অমিতা দেখতে পেল চিন্ময়মোহনের শিয়রের খানিকটা ওপরে, দেয়ালে টাঙানো দিন কয়েক আগেকার অমিতারই একখানা ফটো। নিচে সযত্নে লেখা, মহাশ্বেতা।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমিতা। এই বিচিত্র বর্ণবাসের অন্তরালে তার মন মরুভূমির রিক্ততায় ধু ধু করছে।

কুমারী শুক্লা

একটু দুর থেকেই চুনকামের উগ্র গন্ধটা নাকে আসে। এই ক'দিন আগেই নিজের গরজে শুক্লা বাড়িটায় চুনকাম করিয়েছে। বাড়ির যিনি মালিক তিনি থাকেন কাশীতে। মাস অন্তে ভাড়াটা পেলেই হোলো। আর কোনদিকে লক্ষ্য নেই। আর যারা বাসিন্দা, অন্য সব শিক্ষয়িত্রী আর ছাত্রীরা, তাদের নজরও এদিকে ভারি কম ; মাথাগু'জে কোনো রকম ক'রে থাকতে পারলেই তাদের চলে যায়। ভালো লাগে না কেবল শুক্লার। অপরিচ্ছন্ন ঘরে মন তার আরো অপ্রসন্ন, মেজাজ আরো খিটখিটে হয়ে ওঠে। নিজেকেই যেন নিজে সহ্য করা যায় না। গন্ধটা কিন্তু বেশ। ওদের কাছে চুনকামের গন্ধটা কেন যে খারাপ লাগে, তা শুক্লা বুঝে উঠতে পারে না ; তার তো বেশ লাগে।

এত চেষ্টাতেও বাড়িটার পৌরাণিকতা সবটুকু ঢাকা পড়েনি, তবু বাইরে থেকে এখন সাদা ছোট্ট বাড়িটাকে বেশ ভালোই দেখা যায়। আর এদিকটাই সব চেয়ে সুন্দর শহরটির। একটি কুঁড়ে ঘরকেও চমৎকার মানাত এখানে। কোনোরকম কোলাহল গোলমাল নেই, নেই দোকান-পাটের ভিড়। শহর আগেই যেন শেষ হয়েছে, এটা সীমান্ত— শহর আর গ্রামের। খানিকটা দুরে পূবের দিবে বড় রকমের একটা মাঠ। অবশ্য এখন এই বর্ষার সময় মাঠ বলে মোটেই আর তাকে মনে হয় না। পাটগুলি কেটে নিয়ে যাওয়ায় দিগন্ত পর্যন্ত খালি জলই চোখে পড়ে কালো রঙের। সাগর কি এমন স্থির নিস্তরঙ্গ ? সমুদ্র অবশ্য শুক্লার কোনদিন দেখা হয়ে ওঠেনি, যদিও সুযোগ মাঝে মাঝে এক-আধটু এসেছে, কিন্তু সব সুযোগই কি গ্রহণ করা যায় ? মাঝে মাঝে দু'একখানা ধানের ক্ষেত। বেশ লাগে দেখতে খানিকটা উঁচু সবুজ জমি যেন জলের ওপর ভেসে রয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপ-গুলিও বোধ হয় এমনিই দেখতে।

ঢুকতে না ঢুকতেই ঝি ক্ষীরোদা এসে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে, 'আপনার

দু'খানা চিঠি এসেছে বড়দিদিমণি! জানালা দিয়ে আপনার ঘরের টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছি।'

মিশি-রঞ্জিত ঠোঁটে বিদ্যুতের মত এক ঝলক হাসি খেলে যায় ক্ষীরোদার।

শুক্লা গম্ভীর ভাবে বলে, 'বেশ করেছ। কিন্তু আবার তুমি মিশি দিতে শুরু করেছ ক্ষীরোদা? না তোমাকে নিয়ে আমি পেরে উঠলুম না। আমি তো বলে দিয়েছি, এর চেয়ে তুমি হুঁকো টানো, সেও সহ্য হবে। মনে রেখ, বার বার এই শেষবার।'

ক্ষুণ্ণ হয়ে ক্ষীরোদা পিছিয়ে যায়। বাপরে একেবারে মেম সাহেবের মেজাজ! অনেক জায়গায় সে চাকরি করেছে, কিন্তু এমন বদমেজাজি মেয়েমানুষ সে যদি আর দুটো দেখে থাকে।

চিঠি। আজও মাঝে মাঝে চিঠি আসে শুক্লার নামে। জীবনে এত চিঠি সে পেয়েছে সে সব যদি রাখত, তাহলে শুধু চিঠি দিয়েই বোধ হয় নিজেকে ঢেকে রাখতে পারত। কিন্তু সত্যি, শুধু চিঠি দিয়েই কি নিজেকে ঢেকে রাখা যায়? কি লাভ চিঠি জমিয়ে জমিয়ে? কাগজগুলি বিবর্ণ হয়ে ওঠে, অক্ষরগুলি আসে অস্পষ্ট হয়ে। বাক্সে, দেরাজে এনভেলপের বাণ্ডিল রাশের পর রাশ জমে ওঠে। ভাবতে ভালো লাগে, একদিন খুলে দেখা যাবে। কিন্তু খোলা আর হয়ে ওঠে না। তারপর হঠাৎ একদিন সমস্ত জড় ক'রে শুক্লা ছিঁড়ে ফেলে কিংবা পুড়িয়ে দেয়। আর ঠিক পর মুহূর্তেই মনে হতে থাকে, নষ্ট না করলেই বা কি ক্ষতি ছিল?

তবু নতুন চিঠি পেতে আজও ভাল লাগে। চিঠি। সোনার অলঙ্কারের মত আজও মধুর নিকণে বাজতে থাকে শব্দটা। কি না থাকতে পারে ঐ সাদা একখানা এনভেলপের মধ্যে! কত সম্ভাবনা আর বিস্ময়ের বিচিত্র রঙই না বয়ে আনতে পারে ইচ্ছা করলে।

মেয়েদের সাপ্তাহিক পরীক্ষার খাতাগুলি টেবিলের ওপর রেখে ঘরের বাকি জানালা কয়েকটাও শুক্লা খুলে ফেলে। একঝলক হাওয়া এসে টেবিলের ধারের ক্যালেণ্ডারটার পাতা উল্টোতে থাকে পত্‌পত্‌ ক'রে। আলগোছে প্রথম এনভেলপটা শুক্লা তুলে নিল, ওপরের হাতের লেখাটা দেখে একটু চম্‌কে উঠল। এতদিন পরে প্রশান্ত আবার তাকে চিঠি লিখেছে! এনভেলপের কিনারাটা ছিঁড়তে গিয়ে হাতটা একটু হয়ত কেঁপে উঠল। অতি সংক্ষিপ্ত একটুকরো চিঠি।

প্রশান্ত লিখেছে, শুক্লা, কুশ্রী ব্যাধিতে হাসপাতালে পচে মরছি, এলে শেষ দেখা হতে পারে।

শুক্লা বেশ দৃঢ় হয়ে রইল. বিচলিত হতে নিজের কাছেও সে লজ্জাবোধ করে। যন্ত্রবৎ দ্বিতীয় চিঠিখানাও শুক্লা খুলে ফেলল। চিঠিখানা অমলেন্দুর। এও সংক্ষিপ্ত।

শেষ পর্যন্ত বিয়ে করাটাই ঠিক হোলো, শুক্লা। পণের টাকায় বাবার ঋণের ভার অন্তত খানিকটা তো লাঘব হবে। স্নিগ্ধ সরল কৈশোরের সংস্পর্শে নবত্ব-লাভের বৃথা আশা তোমার মত আমার নেই, সে চেষ্টা তুমিও তো করেছিলে। কৌতুকের আর একটা নতুন ক্ষেত্র তো পাব, সেই হোলো আনন্দ। পরম বন্ধু হিসাবে তোমার নিমন্ত্রণ রইল।

ও ঘরটা মেয়েদের কল্লোলে মুখর হয়ে উঠেছে ; তার মৃদুগুঞ্জন এদিকেও ভেসে আসছে। প্রতিমার গলা উঁচু হয়ে উঠেছে সব চেয়ে। এতক্ষণ সব মেয়েরা বোধ হয় তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ক'দিনেই মেয়েদের কাছে বেশ পপুলার হয়ে উঠেছে। সকলের সঙ্গেই তার সখিত্ব। হাসতেও যেমন পারে, হাসাতেও পারে তেমনি প্রতিমা। এক এক সময় ভারি ঈর্ষা হয় শুক্লার। সেও যদি নিজেকে অমনি ছেড়ে দিতে পারত, অমনি তরল হয়ে মিশে যেতে পারত সকলের সঙ্গে ; কিন্তু শুক্লা বেশ জানে কিছুতেই তা সে পেরে উঠবে না। জোর ক'রে চেষ্টা করতে গিয়ে অনর্থক নিজেকেই সে হাস্যকর ক'রে তুলবে, কাউকে সে হাসাতে পারবে না। তার চেয়ে এই ভালো, ভয় আর শ্রদ্ধার দূরত্ব, সম্মান আর আভিজাত্যের নিঃসঙ্গতা।

শুক্লা জোর করেই মেয়েদের খাতাগুলি টেনে নিল। কিছুতেই সে বিচলিত হবে না, তার দৃঢ়তা টলবে না কিছুতে। একটু পরে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সেকেণ্ড টিচার অরুণা ঢুকল ঘরে। এই একটি মেয়ে তাকে কিছুতেই সমীহ করে না ; বিদ্রূপে, পরিহাসে জোর করেই শুক্লাকে সে দলে টেনে নামাবে। মাঝে মাঝে অবশ্য দুঃসহ মনে হয়, কিন্তু একেক সময় বেশ লাগে ওর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে।

'অস্তরবির রশ্মি আভায় খোলা জানালার ধারে—কুমারী শুক্লা কি করছেন বসে বসে?'

শুক্লা একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'কাব্যকাহিনী পাঠ করছেন না—দেখতেই পাচ্ছিস, অঙ্কের খাতা দেখতে হয় আজকালকার শুক্লাকে।'

অরুণা বলল, 'কিন্তু সে কি শনিবারই ছুটির পর? আচ্ছা দাও আমি দেখে দিচ্ছি।'

খাতা ক'খানা জোর ক'রে তুলে নিতেই খোলা চিঠিখানা চোখে পড়ে গেল অরুণার। 'ও বাবা, তবে নাকি কাহিনী নয়? পড়ব শুক্লাদি?'

অন্যের জীবনরহস্যের সম্বন্ধে অদ্ভুত কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা অরুণার। তার বয়স, শিক্ষা, সুরুচিও তাদের সম্পূর্ণ সংহত করতে পারেনি। অন্যদিন হলে শুক্লা তাকে কঠিন ভর্ৎসনায় লাঞ্ছিত করত, ছিনিয়ে নিয়ে যেত চিঠি, কিন্তু আজ সে নিশ্চল হয়ে রইল। দেখুক ও। রহস্য যখন শেষ হয়ে গেল, তখন আর অনাবৃত করতে ক্ষতি কি। আর অনাবৃত না করেই কি শুক্লা আজ থাকতে পারবে?

'আচ্ছা পড়।'

অরুণা বলল, 'না থাক, তুমি হয় তো মনে মনে রাগ করছ।'

ম্লান হেসে শুক্লা বলল, 'না রাগ করছিনে, পড় তুই।' একটু পরে শুক্লা আবার অরুণার দিকে চোখ ফিরাল।

'কিছু বুঝতে পারলি?'

'সামান্য। কন্‌টেক্স্ট না হলে কি সবটা বোঝা যায়?'

'কণ্টেক্স্ট? আচ্ছা শোন।'

নিজেকে নগ্ন করতে আজ অদ্ভুত আনন্দ পাচ্ছে শুক্লা।

'আমি মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছি। ততক্ষণে তুই দু'কাপ চা কর দেখি। ঐ কোণটায় সব রয়েছে দেখ।'

বোর্ডিং-এর মধ্যে চা তৈরিতে সবচেয়ে দক্ষ অরুণা। মিনিট কয়েকের মধ্যেই সে দু'কাপ চা এনে রাখল টেবিলের ওপর। এক কোণে আর একটা চেয়ারের ওপর একরাশ বই ছিল। সেগুলিকে নিচে নামিয়ে রেখে চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে এল টেবিলের কাছে, দরজাটা দিয়ে এল ভেজিয়ে। শুক্লা অদ্ভুত একটু হেসে আরম্ভ করল, 'বুঝতেই তো পারছিস, ঐ দু'জন লোকের সঙ্গে আমার খানিকটা হৃদয়-গত সম্পর্ক ছিল।'

অরুণা বলল, 'হ্যাঁ, সেটা দুর্বোধ্য নয়!

বছর দশেক আগে প্রথম পত্রলেখক প্রশান্তের সঙ্গে আমার বিয়ে সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের মাসখানেক আগে এমনি একটা ছোট্ট সুন্দর সহরে

আমাদের দুই পরিবার পাশাপাশি দুটো বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছিল। পারিবারিক বিরোধহীন আমরা ছিলাম সুখী রোমিও জুলিয়েট। প্রশান্তের ছিল শুধু মা; তিনি তখনো এসে পৌছাননি। আমাদের পরিবারও তখন বড় ছিল না : মা, বাবা, ঠাকুরমা আর ছিলেন সোনাকাকা। দিন তারিখ সব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। তার আগে বহুদিন ধরে চলছিল আমাদের মন জানাজানির পালা।

সেদিন কেবল ভোর হয়েছে, বাগানের ধারের ছোট খোলা বারান্দায় ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে আমি দাঁত মাজছি। পেষ্টের সাদা ফেনায় মুখ ভরে যাচ্ছে, এমন সময় একটা সাদা গোলাপের তোড়া হাতে প্রশান্ত এসে উপস্থিত হোলো। তোর মতই তখন সারাটা দিন সে কেবল কবিতা আবৃত্তি করত, কিন্তু লিখতে পারতো না। ছবি আঁকার হাত ছিল সামান্য, কিন্তু সখ ছিল অসামান্য চিত্রকর হবার। আমার দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অদ্ভুত কঠিনভাবে বলল, 'এখান থেকে উঠে গিয়ে দাঁত মাজ শুক্লা। পরিষ্কার দাঁত দেখতে বেশ ভালো কিন্তু দাঁত পরিষ্কার করা মোটেই দেখতে পারা যায় না, অত্যন্ত কুৎসিত, ভালগার, বীভৎস।'

তুই হাসছিস? গোড়ায় অবশ্য ব্যাপারটা হাসিরই ছিল। আমিও হেসে উঠেছিলাম, ফলে খানিকটা ফেনা লেগে গিয়েছিল অমন চমৎকার শাড়িটায়। কিন্তু প্রশান্তের রাগ আরো বেড়ে উঠল; চেঁচিয়ে বলল, 'হাসছ, লজ্জা করছে না? এমন নির্লজ্জতা শিখলে কোত্থেকে? যাও, আমার সামনের থেকে যাও— যাও বলছি—।'

আমার মেজাজও গরম হয়ে উঠল, ইতরতা আমিও সহ্য করতে পারিনে। বললাম, 'ভুলে যাচ্ছ যে বাড়িটা আমাদের, ইচ্ছে হলে তুমিই বরং এখান থেকে চলে যেতে পার।'

প্রশান্ত বলল, 'ও আচ্ছা বেশ।'

ভাবলুম এইতো স্বাধীনতা! আমাদের স্বাধীনতা দেওয়া, কালচারড্ করাটাও ওদের একটা লীলা। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে নিজের পদমর্যাদা বাড়াবার জন্যেই শিক্ষিতা স্ত্রী, কিম্বা প্রণয়িনী ওদের দরকার। আমাদের যথার্থ শিক্ষা, যথার্থ স্বাধীনতা ওরা চায় না। স্বাধীনতা মানে—ওদের রুচি অনুযায়ী চলা, ওদের নির্বাচিত বই পড়া, ওদের খুশি অনুযায়ী প্রসাধন, ওদের বেছে দেওয়া বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা। তবু তো স্ত্রী হতে হয়নি এখনো। মনে মনে সংকল্প করলুম কখনো হবোও না।

প্রশান্তও এলো না। ওর আঘাতটা ছিল অন্য রকমের—সেটা অসৌন্দর্যের, আমার সেই মুহূর্তের কুৎসিত মূর্তিটাই ওর মনে চিরস্থায়ী হয়ে রইল। আর ঠিক সেইদিনই কাউকে না জানিয়ে ও ক'লকাতা চলে গেল। ওর মনের ভাবটা বুঝতে আমার দেরি হোলো না। কিন্তু এতকাল যা ভালো লেগেছিল, এই মুহূর্তে ওর সেই কবিয়ানাই আমাকে আরো ক্রুদ্ধ ক'রে তুলল। কি হবে এই দুর্বল কাদার পুতুল নিয়ে? বাস্তব জগতে কতটুকু ওর মূল্য, কতটুকু নির্ভর করা যাবে ওর ওপর? আর এই ক্ষণভঙ্গুর কাঁচের আলমারীর মত প্রেম! অতি সযত্নে, অতি সাবধানে যাকে রাখতে হয়; রঙীন বুদ্‌বুদের মত যা অবাস্তব আর হাস্যকর —কি হবে সেই প্রেম দিয়ে।

প্রশান্ত এল না। আমি ফটোগ্রাফার ডাকিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ছবি তুললাম, ওকে দেখাবার জন্যে। তবু ও ফিরল না। রঙীন বুদ্‌বুদের মতই ও মিলিয়ে গেল। ভালোই হোলো। ওর নিজের যথার্থ মূল্য এতদিনে টের পাওয়া গেল, নিঃসংশয় হওয়া গেল ওর প্রেমের আয়ু আর সত্যতা সম্বন্ধে। এতকাল যেন কেটেছে খেলার খেলায়, এখন শক্ত হতেই মজা লাগছে, নিজের সঙ্গে যুঝতে, মজা লাগছে নিজেকে অস্বীকার করতে, গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে ভেঙে ফেলতে আনন্দ লাগছে সেই সাজানো কাঁচের আলমারীকে।

বাবা বললেন, 'দূর হয়ে যা হারামজাদী, লেখাপড়া শিখেছিস বলেই কি স্বেচ্ছাচারিণী হতে হবে? তা আমার বাড়িতে বসে চলবে না।'

মা বললেন, 'আহা এমন সম্বন্ধটা হাত ছাড়া হয়ে গেল, এই বুড়োধাড়ী মেয়েকে কে শেষে বিয়ে করবে। বাবাকে বললেন, তোমারই তো দোষ। আমি আগেই বলেছিলাম, অত আদর দিও না, সময়মত বিয়ে দিয়ে দাও।'

ঠাকুরমা বললেন, 'তোদের জ্বালায় আমি কি গলায় দড়ি দিয়ে মরব? লোকের কাছে মুখ দেখাবার আর জো রইল না। যেমন ম্লেচ্ছ আচার শিখিয়েছ তেমনই তো হবে? বিয়ের চাইতে এখন উড়ে উড়ে বেড়াবারই ওর ইচ্ছা। এমন তো হবেই, নামটা পর্যন্ত ম্লেচ্ছ রেখেছে। আমি তখনই ছোট খোকাকে বলেছিলুম, ভালো দেখে একটা ঠাকুর দেবতার নাম রাখ। স্বভাবও হবে ওর ঠাকুর দেবতার মত। তা না,—কি একটা নাম রেখেছে শুক্লা না কি মুখেও আসে না ছাই, মুখে আনতে আমি চাইওনে।'

নামরক্ষক সোনাকাকা গম্ভীর হয়ে তাঁর আইনের বইতে মন দিলেন। কোনো মন্তব্য করলেন না।

তিন চার বছর পরে দ্বিতীয় সর্গের যখন শুরু তখন আমাদের সংসারের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। সোনাকাকা ওকালতি পাশ করে মহকুমা শহরে গিয়ে বসেছেন, কিন্তু বাসা খরচ প্রতি মাসে উঠছে না। বাবার সামান্য একটু লোভের জন্যে কাস্টমস হাউসের অতদিনের ভাল চাকরিটা তখন গেছে, আর কোনো চাকরি জোটেনি, দেশের বাড়িতে বসে বসে মেজাজ দিনের পর দিন খারাপ ক'রে তুলেছেন, মার সঙ্গে ঝগড়া করছেন, ঠাকুরমার সঙ্গে করছেন বকাবকি। মুখচোরা ভাইকে ওকালতি পড়িয়েছেন বলে অনুতাপ করছেন প্রত্যেকদিন। আর আমি বি. টি. পাশ করে বর্ধমানে একটা মাষ্টারী কেবল পেয়েছি। অবশ্য সুর তখন থেকেই ফেরা আরম্ভ করেছে, সবাই বলছেন—ও ছেলের সঙ্গে বিয়ে না হয়ে আমার ভালোই হয়েছে। ঘরে অমন সুন্দরী বউ থাকা সত্ত্বেও চরিত্র যার ঠিক থাকে না, তার সঙ্গে বিয়ে হলে দুঃখের অবধি থাকত না। এতদিন পরে ওর গুন-পনা সব বেরিয়ে পড়ছে। মা আর আমার বিয়ের কথা বলছেন না, কারণ ইতিমধ্যে আমার ছোট একটি ভাই হয়েছে। আমার কাছে বাবার মেজাজ বেশ নরম; আর ছুটি ছাটায় বাড়িতে গিয়ে দেখি, যদিও দাঁত এখন প্রায় সবগুলিই পড়ে গেছে তবু ঠাকুরমার মুখে আমার নাম বেশ স্পষ্টই উচ্চারিত হয়, একটুও বাধে বলে মনে হয় না।

এমনি সময় কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে চোখ দেখাতে গেছি, হঠাৎ পিছন থেকে কে ডেকে উঠল, 'আরে শুকাদি যে।' চোখ ফেরাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে চোখ নামিয়ে নিল অমলেন্দু। পরক্ষণেই সোজাসুজি চেয়ে বলল, 'আপনি এখানে!'

'চোখ দেখাতে এসেছি। তুমি?'

'পড়ছি, এবার থার্ড ইয়ার।'

একটু পিঠচাপড়ানো ধরনেই বললুম, 'বেশ বেশ।'

মামাবাড়ির পাশের বাড়িতেই ওদের বাড়ি। ছেলেবেলায় মামাদের গ্রামে যখন বেড়াতে যেতাম মাঝে মাঝে, ওকে দেখতুম খেলতে। ভারি ডানপিটে ধরনের ছেলে; অল্প বয়সে ও গাছে চড়ায়, নৌকা বাওয়ায় বড় বড় ছেলেদের সঙ্গেও পাল্লা দিত। বয়সে আমার চেয়ে ছোটোই ছিল দু'তিন বছরের, পড়তও দু'ক্লাস নিচে। সেই অমলেন্দু এখন মাথায় বেশ বড় হয়ে উঠেছে। বেশ শক্ত স্বাস্থ্যবান চেহারা, দেখে বেশ ভালই লাগল। চোখ দেখিয়ে চশমা নেওয়ার ও ই ব্যবস্থা ক'রে দিল। এই উপলক্ষে দু'তিনদিন আমাকে আসতে হোলো এবং সস্তায়

ভালো চশমার জন্যে একদিন বাজার ভরে বিভিন্ন দোকানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হোলো। চশমা পরের দিনই পেয়ে গেলাম। অনুমান করতে বাকি রইল না— অদৃশ্য এক রঙীন চশমা অমলেন্দুও ইতিমধ্যে পরে বসেছে। কিন্তু অমলেন্দু বেশ চালাক দৃঢ়চরিত্রের ছেলে। সূক্ষ্ম রুচি আর মনের আভিজাত্য ওর প্রচুর, সহজে ধরা দেবার ছেলে ও নয়। আর যা সহজ তা আমিও চাইনে, যদি কিছু গড়ে ওঠে, কঠিন বাস্তবকে ভিত্তি করেই তা গড়ে উঠুক। রঙ নয়, ছবি নয়, কবিতা নয়, শক্ত বাস্তব কিছু চাই। বয়স কম হলে কি হবে, পাঠ্যাবস্থা থাকা সত্বেও সংসারের নানা বিষয় ও দেখে, দেশের বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে ও নিজেই খোঁজ-খবর নেয়। ওর বাবা গোঁড়া ব্রাহ্মণ। তিনিও পাকা বৈষয়িক। কিন্তু ও যেন ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। তাঁকে ভয় করছে না, স্নেহ করছে। পরে দেখেছিলুম ভয়ের চেয়ে এই স্নেহ আরো কত অসহায়। চায়ের দোকানে চায়ের কাপ সামনে ক'রে যখন আমাদের আলাপ চলত, তখন এই সব বৈষয়িক আলোচনাই হোতো বেশি; ওর বাবার কথা, বিষয় সম্পত্তির কথা, বিভিন্ন বিষয়ে ওর ব্যক্তিগত মতা-মতের কথা ও জোর দিয়ে বলত। রীতিমত গদ্যময় আলোচনা, তবু ভালো লাগত, তবু চায়ে চুমুক দেওয়ার কথা মনে থাকত না। মানে—মনে বেশ থাকত, কিন্তু চুমুক আমরা ইচ্ছা করেই দিতাম না। এইটুকু ভান করতে আমরা ভালো-বাসতাম। রূপালি চায়ের কাপ থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠত ওপরের দিকে। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখতাম, কিন্তু ছুঁতাম না; অপচয়ের আনন্দ, আভিজাত্যের আনন্দ। কিন্তু একটু একটু ক'রে চা জুড়িয়ে যেত, আমরা জুড়িয়ে যেতাম।

হঠাৎ চায়ের কথা মনে হওয়ায় চায়ে একটা চুমুক দিয়ে নিল শুক্লা, বলল, 'যাঃ এও তো দেখছি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

কিন্তু অমন শক্ত চেহারা নিয়েও অমলেন্দু ক্রমে ক্রমে নরম চিঠি লেখা শুরু করল। প্রথম প্রথম ও লিখত, শুক্লাদি। কিন্তু কিছুদিন পরে সম্বোধনটা ও তুলে দিল, আমি মনে মনে হাসলাম। কিন্তু কিছুদিন বেশ লাগল এই সম্বোধনহীন চিঠি। এত বেশি নাম, আর এত বেশি সম্বোধন এর আগে পেয়েছি যে, এখন অনামিকা থাকাটাই নতুনত্ব মনে হোলো। কিন্তু কিছুদিন পরেই আমি লিখলাম, এমন সম্বোধনহীন চিঠি লিখলে সম্বন্ধ কি ক'রে গড়ে উঠবে? চিঠিটা পোস্ট করার পরমুহূর্তেই অবশ্য মনে মনে অনুতপ্ত হলাম। এত সহজে ধরা দিতে গেলাম কেন? ও তার জবাবে লিখল, জায়গাটা সাদা থাকলেই তোমার নাম লেখা হোলো বলে মনে হয়। অমন শুভ্র নামের ওপর কখনো রঙ বুলাতে কি ভালো লাগে?

অমলেন্দুও তা হলে ধরা দিচ্ছে !

ক'লকাতায় আমার দুর সম্পর্কের এক দাদু আছে। বাবার কি রকম মামা হন তিনি। আমি মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতেই গিয়ে উঠতুল। বয়সে বুড়ো হলেও আধুনিকদের সঙ্গে তিনি বেশ পাল্লা দিচ্ছিলেন সব বিষয়ে—বেশেবাসে ভাষায়। আমার সঙ্গে তিনি সর্বদা ফ্লার্ট করতে ভালোবাসতেন। অমলেন্দুর যাতায়াতে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না, বরং প্রশ্রয় দিয়েই তিনি যেন আনন্দ পেতেন।

একদিন আয়নার সামনে বসে বেণী বাঁধছি, অমলেন্দু হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হোলো ; উচ্ছ্বসিতভাবে বলল, 'মেয়েদের প্রসাধিত রূপের চেয়ে তাদের প্রসাধনের রূপ আরো চমৎকার। শুক্লা, এমন সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে আজ।'

হঠাৎ অনেকদিন আগের কথা আমার মনে পড়ে গেল, হেসে উঠলাম, 'এই, অত কবিত্ব কোরো না, সব অঙ্গের প্রসাধন সম্বন্ধে বোধ হয় সে কথা বলা চলে না।'

অমলেন্দু হঠাৎ যেন আহত হয়ে পিছিয়ে গেল, বলল, 'ঠিক বলেছ, ভুল হয়ে যাচ্ছিল, রক্ষা করেছ তুমি। কবিত্ব তো আমাদের করবার কথা নয়।'

কিন্তু কেন সে আমার কথা মেনে নিতে গেল ? কবিত্বের রূপ কি একরকম ? কেন সে নতুন করে লিখলে না কবিতা, আঁকলে না নতুন ছবি ? শুধু আমার নিষেধ ? না আরো নানা নিষেধ ছিল তার,— নানা রকমের হিসাব।

তবু দেখাশুনা চলতে লাগল, চলতে লাগল সতর্কভাবে কবিত্ব বাদ দিয়ে। বয়স বাড়তে লাগল, বছরের পর বছর। ও আমার পূর্বের অভিজ্ঞতা ইঙ্গিতে জেনে ফেলল, আমিই ইচ্ছা ক'রে ওকে জানালাম। মিথ্যা মোহ নয়, ছলনা নয়, যা গড়ে ওঠে তা কঠিন সত্যের ওপর গড়ে উঠুক।

একদিন দেখলুম ওর চোখের কোণে ক্লান্তি জমে উঠেছে। বললুম, 'আর কেন, বিয়ে করে ফেল অমলেন্দু।'

অমলেন্দু বলল, 'কি সাংঘাতিক মেয়ে। এই যদি মনে ছিল, আগে কেন বললে না ? কত ভালোভালো দিন গেল পঞ্জিকায়।'

উপহাসটা হজম ক'রে বললুম, 'কি সাহস তোমার এমন কথা মুখে আনতে পারলে ? বয়সে দু'বছরের বড় কিন্তু জাতে দু'ধাপ ছোট, কায়স্থের মেয়েকে বিয়ে করবার দিনক্ষণ সারা পঞ্জিকায় কোথাও পাবে না। আমি বলছি, নোলকপরা ছোটখাট কোনো একটি ব্রাহ্মণকুমারীকে গ্রহণ কর।'

অমলেন্দু বলল, 'মাষ্টারী করবার মহৎ দোষই হোলো এই যে, স্কুলের বইয়েও

সব জায়গাকে নিজের স্কুল আর সব লোককে ছাত্র বলে মনে হয়। উপদেশের প্রবৃত্তিকে রোধ করা যায় না।'

তারপর আরো দিন কাটতে লাগল, দিনের পর দিন আমরা শুকিয়ে উঠতে লাগলাম, ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগলাম। আর এই শুকিয়ে ওঠাতেই, ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়াতেই যেন বড় কৃতিত্ব, আমাদের বড় প্রতিযোগিতা।

কিন্তু অমলেন্দুকে যখন প্রথম দেখেছিলাম, ভেবেছিলাম ওর মধ্যে আমি নতুন হয়ে উঠব, ওর মুগ্ধ দৃষ্টিতে গ্রহণ করব নবজন্ম। কিন্তু আমি ওকে অজ্ঞাতসারে টেনে নিয়ে এলাম আমার সমান ধাপে, শুষ্কতার মরুভূমিতে ঠাণ্ডা বরফাচ্ছন্ন মেরুদেশে। জিত আমারই, জোর আমারই বেশি। কি বল? মাংসল, পেশীবহুল দেহই আছে অমলেন্দুর, মনের দিক থেকে প্রশান্তের মতই সে দুর্বল।'

শুক্লা থামল।

মাঠভরা কালো জল সন্ধ্যার ছায়ায় আরো কালো হয়ে উঠেছে।

শুধু চেহারাতেই নয়, কথায় বার্তায় চালচলনেও ত্রিলোকেশবাবুর বয়সের ছাপ এত কম পড়েছে যে, মাস কয়েক একসঙ্গে থাকার পর একদিন তিনি যখন প্রসঙ্গক্রমে বললেন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ, আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি। অথচ এই কম বয়সী কলপটা তিনি যে ইচ্ছা ক'রে পরেছেন তাও নয়, তা যেন নিতান্ত সহজভাবে তাঁর দেহ আর মনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, শারীরিক দিক থেকে যেমন তাঁকে কোনো ছুটোছুটি খেলাধুলোর সাহায্য নিতে হয়নি, তেমন আলাপ আলোচনায় কি প্রসঙ্গ নির্বাচনেও যুব-সুলভতার পরিচয় দেওয়ার জন্যে তাঁর আগ্রহ দেখিনি।

প্রায় তাঁরই সমবয়সী আমার এক আত্মীয়ের অযাচিত অভিভাবকতায় আমি একবার ক্ষুব্ধ হয়ে ত্রিলোকেশবাবুর সঙ্গে তা নিতে আলোচনা করেছিলাম। তিনি আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে বললেন, 'ওটা বয়সের ধর্ম।'

বললুম, 'বয়স আপনিও মানেন নাকি ?'

তিনি হেসে বললেন, 'না মানব কেন ?'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তাকে মানতে হয়না, সে আপনিই মানিয়ে নেয়। বয়স্ক লোকদের যে তারুণ্যের পরিচয় পান একটু ভাল ক'রে যদি লক্ষ্য ক'রে দেখতে শেখেন তাহলে তার গিল্টি করা রূপ ধরে ফেলতে দেরি হবে না। আসলে নকলে বড় মারাত্মক ভেদ, নিখিলবাবু।' ত্রিলোকেশবাবু চুরুট ধরাতে ম্লান একটু হাসলেন।

এতকাল একসঙ্গে আছি, একই ঘরে পাশাপাশি সিটে রাত জেগে কতদিন কত আলাপ আলোচনা করেছি, কিন্তু তার মধ্যেও যে এমন একটি ক্লান্ত বিক্ষুব্ধ মন লুকিয়ে ছিল তা এতদিন লক্ষ্য করিনি। আমি চুপ ক'রে রইলাম।

খোলা ছাতেও রাত্রির অন্ধকার এত ঘন হয়ে এসেছে যে, আমরা কেউ আর কারো মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ত্রিলোকেশবাবু খানিকটা আত্মগতভাবেই বললেন,

'আমার মুখে এ-সব কথা শুনে আপনি হয় তো বিস্মিত হচ্ছেন, কিন্তু আমি নিজেই কি সেদিন কম বিস্মিত হয়েছিলাম।'

তারপর হঠাৎ তিনি বললেন, 'চলুন উঠি, এবার ঘুমোবার চেষ্টা দেখা যাক। গরমটা অনেক কমেছে।'

বললাম, 'আরো কিছুক্ষণ বসা যাক না ত্রিলোকেশবাবু।'

ত্রিলোকেশবাবু হাসলেন, 'ও, আপনি বুঝি গল্পের গন্ধ পেয়েছেন।'

আমিও হাসলুম, 'তা একটু পাচ্ছি বই কি। আর আপনার উদার দাক্ষিণ্যের ওপর আমার বিশ্বাস আছে।'

'বটে? তাহলে তো সে বিশ্বাস আর বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতেই হয়। চুপ ক'রে থেকে ত্রিলোকেশবাবু কি ভাবলেন, তারপর বললেন, 'আচ্ছা, ধরুন এক ভদ্রলোক বয়স—তা এই আমার মতই—নাম—পাত্রপাত্রীর নামগুলি আপনাকে জোগাতে হবে, নিখিলবাবু, নাম সহসা আমার মাথায় আসে না।'

'আচ্ছা, সেজন্যে ভাবনা নেই, তবে আপাততঃ একটা নামের ব্যবহার আমরা বাঁচাতে পারি আপনি যদি উত্তম পুরুষে গল্পটা আরম্ভ করেন। কথা দিচ্ছি সেটাকে টেকনিক হিসাবেই নেব, আপনার নিখুঁত আত্মজীবনী বলে বিশ্বাস করব না।'

আবহাওয়াটা হাল্কা ক'রে দেওয়ায় ত্রিলোকেশবাবু যেন খুশিই হলেন। তরলকণ্ঠে বললেন, 'করবেন না তো? খুব আশ্বস্ত হলাম। আচ্ছা, শুনুন।

'জানেন বোধ হয়, এই ইনসিওরেন্সের অফিসে চাকরী নেওয়ার আগে আমি সেদিন পর্যন্ত আমাদের গাঁয়ের স্কুলে মাষ্টারী করতাম! এক হিসাবে এই শহর থেকে নিরুপায় হয়েই গাঁয়ে আমাকে পালাতে হয়েছিল। ইদানীং এই যুদ্ধের আমলের মত না হোক আমরা যখন পাশটাশ ক'রে বেরুই তখন চাকরী কলকাতায় মোটামুটি সুলভই ছিল, তবু যে আমি কিছু সুবিধা করতে পারিনি তার কারণ আমার বড়লোক পদস্থ আত্মীয়দের ধারণা আমি অহংকারী, অপরিণামদর্শী, আর আমার দু'চারজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মনোভাব আমি ভীরু, দুর্বল, মুখচোরা। খবরের কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপন থেকে ঠিকানা টুকে রাখতাম। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। দরখাস্ত লিখতে আমার গায়ে জ্বর আসত। মনে মনে বহু রিহার্সাল দেওয়ার পর দু'চারজন সাহেবসুবোর সঙ্গে একেক দিন দেখা করতে যেতাম, কিন্তু আলোচনার পর দ্বিতীয়দিন আর ওমুখো হতাম না। চাকরী সংগ্রহের পক্ষে একদিন

দেখা করাটা মোটেই যে পর্যাপ্ত নয় সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এতদিনে হয় তো আপনার হয়েছে।

যা হোক, সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়ে গাঁয়ের স্কুলে মাষ্টারী আর পুত্রকলত্র পরিবৃত হয়ে নির্বিবাদে গার্হস্থ্যজীবন যাপন করছিলাম, এমন সময় এলো দুর্ভিক্ষ। জেলে আর নমশূদ্রদের স্কুল! প্রথম ধাক্কাতেই স্কুল গেল উঠে। তাহলেও ঘরে সংবৎসরের খোরাক আছে. তাই সাধারণ লঙ্গরখানার সম্পাদক হলাম। স্কুলের চেয়ার ছেড়ে বাড়ির ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম বিশ্রামের আশায়।

কিন্তু স্ত্রী ছাড়লেন না, স্কুল উঠেছে অথচ আমার ওঠার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা, তিনি ভয়ংকর বিপদ গণলেন।

চিরটা কালই কি এরকম যাবে? এতখানি বয়স হোলো অথচ—

বললুম, আমিও তো তাই ভাবছি, এতখানি বয়স নিয়ে নতুন ক'রে কিই বা আর করতে পারি? স্ত্রী ভ্রূ কুঁচকে বললেন, বাজে কথা রাখো, কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়। কি এমন বয়সটা হয়েছে যে চাকরীর চেষ্টায় বেরুতে পারবে না। এ বয়সে আমার ছোড়দা এখনও বিয়ে পর্যন্ত করেননি জানো?

হেসে বললুম. বয়সটা যে মুহূর্তে মুহূর্তে তোমার সুবিধামত ওঠে নামে তা জানতাম না।

কিন্তু বেরুতেই হোলো। সত্যি, বসে থাকলে চলবে কি ক'রে, বিঘা কয়েক ধানী জমি থেকে নিতান্ত না হয় খোরাকটাই হয় বছরের, সংসারে আরো তো অনেক কিছুর দরকার।

চলে এলুম ক'লকাতায়। দেখা গেল আগে যা পারতাম না, এখন তা বেশ পারি। দু'তিনটি পদস্থ বন্ধুর সঙ্গে একাধিক দিন দেখা করলাম এবং তাঁদের একজনের অফিসে এবং অধীনে চাকরীও নিয়ে ফেললাম। তিনি এখানকার একটা নামকরা ইনসিওরেন্স অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। সুতরাং আপনাকে একটা নাম সরবরাহ করতে হবে নিখিলবাবু।'

ত্রিলোকেশবাবু যে কোন অফিসে কাজ করেন তা জানি এবং তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরও আমার অচেনা নয়, তাই ত্রিলোকেশবাবুর এই লুকোচুরি ভারি ছেলেমাহুষি মনে হোলো। তবু তাঁর সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়ে বললুম, 'ধরা যাক তাঁর নাম নগেনবাবু।'

'নগেনবাবু? আচ্ছা বেশ। নগেনবাবু প্রায় আমার সমবয়সী হলেও ধনে পদমর্যাদায় অনেক উর্ধ্বে। অন্য সকলের সামনে তাঁকে নগেনবাবুই বলতে হয়

এবং তাঁর সামনেও তাঁর নাম ধরবার প্রয়োজন হয় না।

সেদিন কাজের চাপ ছিল বেশি। অথচ সাড়ে পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে এ্যাসিসট্যান্টটি এমন মুখ কাঁচুমাচু ক'রে ছুটি চাইল যে, না দিয়ে পারলাম না। ঘাড় নিচু ক'রে কি একটা ফাইল দেখছিলাম, কাঁধে চাপড় পড়তে চমকে মুখ তুলে তাকালাম। দেখি নগেনবাবু সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন, বললেন, আমার ধারণা ছিল দীর্ঘকাল মাস্টারী করলে লোকে বোকা হয়ে যায়, কিন্তু তুমি এত সেয়ানা হলে কি ক'রে?'

অবাক হয়ে বললুম, চালাকির কি দেখলে।

এমন ক'রে কাজ দেখাতে আমিও পারতুম না।

কাজ দেখানো! মুখটা হয়ত আরক্ত হয়ে উঠে থাকবে, নগেনবাবু হাত ধরে আমাকে চেয়ার থেকে টেনে তুললেন, তাছাড়া আবার কি? আচ্ছা তোমার হিউমার বোধটা কি জীবনেও আসবে না? হয়েছে, এবার ওঠো, চল আমার সঙ্গে।

কোথায়?

যোগলক্ষ্মী দেবীর ওখানে।

হঠাৎ ত্রিলোকেশবাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বুঝতে পারলাম অসতর্ক মুহূর্তে নামটা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু কিছুই যেন হয়নি এমনি সপ্রতিভ-ভাবেই ত্রিলোকেশবাবু আবার বলতে আরম্ভ করলেন।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, যোগলক্ষ্মী দেবীর ওখানে?

হ্যাঁ, তাঁর হুকুম। এখানে এসেছ অথচ দেখা করনি, এতে তিনি ভারি দুঃখিত হয়েছেন। তোমারও খুব অন্যায় হয়ে গেছে যাই বল। বিশেষ ক'রে ওঁরা তো তোমার কি রকম আত্মীয়ও শুনেছি।'

যোগলক্ষ্মী। খবরের কাগজে এখনো তাঁর নাম মাঝে মাঝে দেখতে পাই। এখনও তিনি দু'একটা শিল্প প্রদর্শনী আর অনাথ আশ্রমের উদ্বোধন করেন, রাজনৈতিক নেতাদের স্মৃতি-বার্ষিকীতে উপস্থিত থাকেন, দু'একটা সাহিত্য সভায়ও কি কি বক্তৃতা করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কাগজে পড়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, আমি তাঁকে কি অদ্ভুত ভাবেই না ভুলে যেতে পেরেছি যে, তাঁর নাম কাগজে পড়লেও সেই সঙ্গে অতীতের কোনো কাহিনী আর আমার মনে পড়ে না। কিন্তু নগেনের মুখে তার নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির সেই রুদ্ধ দুয়ার হঠাৎ যেন আমার খুলে গেল।

বললুম, থাক না আজ, আর একদিন যাওয়া যাবে।

আর একদিন কেন আবার, গরজটা শুধু তাঁর নয়, আমাদেরও। নতুন একটা ফায়ার ইনসিওরেন্স খোলার কথা চলছে। যোগলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে সেই আলোচনাও হবে। সেদিনও তিনি বেশ মোটা রকমের শেয়ার কিনতেই রাজি ছিলেন, আবার যে কেন পিছুচ্ছেন বুঝতে পারছি না। চলো যে ভাবেই হোক তাঁকে সম্মত করাতেই হবে। এতটা এগিয়ে আর পিছোন যাবে না, এসো।

তখনং বাড়ি ছিল শ্যামবাজারে। সেই পুরোনো বাড়ি ভাড়া দিয়ে বালিগঞ্জে আধুনিক প্রথায় এক নতুন বাড়ি করেছেন যোগলক্ষ্মী। সেই প্রাচীন পরিবেশ কিছু নেই। গেটের কাছে একখানা চেনা মুখও চোখে পড়ল না। তবু আগেকার কথা মনে ওঠায় এতকাল পরে বুকের মধ্যে আজও যেন একটু কম্পন অনুভব করলাম।

বসবার ঘরে এসে দেখলাম সেই পুরোনো আসবাবের সবই যোগলক্ষ্মী ফেলে আসেননি। দেওয়ালের চারদিক ঘিরে দেশী বিদেশী রাজনীতিক আর শিল্পী সাহিত্যিকদের ছবি। সোফা কৌচের সঙ্গে ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে তক্তাপোশের উপর সেই বিস্তীর্ণ ফরাশটাও আছে, কেবল নেই সেদিনের ভিড়। যোগলক্ষ্মী দেবীর বৈঠকখানা যে এত জনবিরল কোনোদিন হতে পারে তা কি কখনও ধারণায় আনা যেত ?

চাকর এসে পান সিগারেট পরিবেশন করল এবং জানাল কর্তামা ঠাকুরঘরে ঢুকেছেন, আর কেউ এলে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

নগেন ঠোঁট চেপে বললেন, তবেই হয়েছে, তোমার জন্যেই যত দেরি হোলো। এখন ঠাকুর ঘর থেকে কখন বেরোবেন তার ঠিক কি ?

ঠাকুর ঘর! আগেও অবশ্য যোগলক্ষ্মী ঈশ্বর বিশ্বাস করতেন। কিন্তু আচার অনুষ্ঠানে সেই বিশ্বাসকে দিনযাত্রায় এমন ক'রে চিহ্নিত ক'রে রাখতেন না। রাজনীতি ছাড়া অন্য কোনোদিকে মন দেওয়ার তাঁর কিছুমাত্র সময় ছিল না। এখন সেই কর্মবহুল, ঘটনাবহুল জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর খানিকটা সময় ঠাকুর দেবতা দিয়ে যদি ভরে তোলবার তার প্রয়োজন হয়ে থাকে বিস্মিত হবার কি আছে ?

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কিছুদূর থেকে তাঁর কথা শোনা গেল। ওদের চা-টা দেওয়া হয়েছে ? কেবল পান আর সিগারেট ? বুদ্ধি ক'রে চায়ের কথা বলতে পারলিনে ? মেয়েটা বুঝি এখনো ফেরেনি, তার সভা সমিতি কি রাত বারটা

অবধি চলবে? এদিকে তাঁর পায়ের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের শব্দও শুনতে পাচ্ছি। যোগলক্ষ্মী আসছেন।

একটু পরেই তিনি এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। কিন্তু এই কি যোগলক্ষ্মী? সেই পূজোর ঘরের পোশাকেই চলে এসেছেন। খাটো গরদের থান পরনে, কপালে তিলকসেবার চিহ্ন পরিস্ফুট। আগেও অবশ্য একটু পুষ্টাঙ্গীই ছিলেন যোগলক্ষ্মী। কিন্তু এখনকার চেহারার সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। মেদমাংসের বাহুল্য গরদের খাটো থানে কিছুতেই বাধা পড়তে চাইছে না। আর কোথায় সেই চুল? সমস্ত মাথাটা সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত ছোট ক'রে ছাঁটা। মাথার খাটো আঁচলের বাইরে সামনের দিকের চুলগুলি অধিকাংশই প্রায় সাদা হয়ে এসেছে। আর দু'পাশ দিয়ে কেশহীন স্থূল অনাবৃত ঘাড়ের খানিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে পড়ল সমস্ত পিঠ ছেয়ে রহস্যঘন কি চুলই ছিল যোগলক্ষ্মীর। বিধবা হওয়ার পরও দীর্ঘকাল ধরে চুলের তিনি যত্ন নিয়েছেন। শুনেছিলাম একবার তাঁর এক বিধবা ননদ এই নিয়ে তাঁকে শ্লেষ করেছিলেন, দেশের কাজের জন্যে থিয়েটারওয়ালীদের মত চুল রাখাও দরকার হয় নাকি বউ? যোগলক্ষ্মী জবাব দিয়েছিলেন, হয় বৈকি দিদি, দশজনের সামনে আমাকে বেরুতে হয় বলেই তাদের চোখ দুটোর কথাও আমাকে ভাবতে হয়।

আজ ছোট ক'রে ছাঁটা যোগলক্ষ্মীর এই কাঁচাপাকা চুলগুলি দেখে হঠাৎ আমার এক অদ্ভুত কথা মনে হোলো। রাজনীতি ছেড়েছেন বলেই কি যোগলক্ষ্মী এমন ক রে চুল ফেলে দিলেন, না কাঁচাপাকা চুলগুলির মায়া তাঁকে বাধ্য হয়ে ত্যাগ করতে হোলো বলেই তিনি রাজনীতি ছাড়লেন। মুহূর্তকাল বোধহয় স্তব্ধ হয়ে ছিলাম। তারপর জীবনে সেই সর্বপ্রথম নির্ভয় নিঃসংকোচে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে স্পষ্টকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন?

যোগলক্ষ্মী স্নিগ্ধ হাসলেন, ভালো। আমাকে কি কোনদিন খারাপ থাকতে দেখেছ? তারপর নগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের বসিয়ে রেখেছি বোধ হয়। নগেনবাবু বললেন, না না তাতে আর কি হয়েছে সে জন্যে ভাববেন না।

যোগলক্ষ্মী আবার একটু হাসলেন, আর এখন ভেবেই বা কি করতে পারি বলুন? আপনাদের দেরি দেখে ভাবলুম এই ফাঁকে সন্ধ্যাটা সেরে ফেলি।

নগেনবাবু বললেন, তা বেশ করেছেন, কিন্তু তাড়াতাড়িতে দেবতার অংশে কিছু কম পড়ে না থাকে তাই ভাবছি।

যোগলক্ষ্মীর ঠোঁঠের উপর দিয়ে হাসির ঝিলিক খেলে গেল, তাই নাকি ? নাস্তিক হলেও দেবতার উপর তো আপনাদের এখনও ভারি মমতা আছে দেখ্‌ছি। কিন্তু আমার তো ধারণা অংশের হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ে তাঁর বেশি দুশ্চিন্তা নেই, যতটা আপনাদের।—দাঁড়ান, প্রসাদের থালা তো ঘরেই ফেলে এসেছি, নিয়ে আসি। ত্রিলোকেশ, তোমার কি খবর আজকাল। ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করো, না তেমনি নাস্তিকই রয়ে গেছ ?

আমার হয়ে নগেনবাবু জবাব দিলেন, সে যাই থাক, তাতে আটকাবে না। আজকালকার নাস্তিকেরা অত বোকা নয়, ঠাকুর দেবতাতেই তাদের আপত্তি, প্রসাদে কোনো আপত্তি নেই। কি বল হে ত্রিলোকেশ ?

যোগলক্ষ্মী বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরেই শ্বেত পাথরের ছোট্ট একখানা রেকাবি হাতে ফিরে এলেন। দু'টি সন্দেশ তুলে প্রথমত নগেনবাবুর হাতে দিলেন, তারপর আমার ঈষৎ প্রসারিত হাতের তালু আঙুলে ছুঁয়ে দু'টি সন্দেশ আমার হাতে রাখলেন, বললেন, খেয়ে দেখ, ভীম নাগের চেয়ে নিতান্ত ফেলনা যাবে না বোধ হয়।

নগেনবাবু টীকা ক'রে বললেন,ওঁর নিজের হাতে তৈরি।

কোনো একটা ঘটনার পর সেকালে যোগলক্ষ্মী আমার হাত ছুঁয়ে এমন ক'রে কিছু দিতেন না, আজ এতকাল পরে দেখলাম আমি আবার স্পৃশ্য হয়েছি, কিন্তু কোথায় সেই স্পর্শানুভূতির তীব্রতা ? আঙুলগুলি অত মোটা বলেই কি সেগুলি আমার চর্মের বহিরাবরণে এসে থেমে রইল, তাদের স্পর্শে রক্তের সমুদ্র দুলে উঠল না ?

সন্দেশটা মুখে তুলতে যাব একটু দূরে কার লঘু পায়ের শব্দ শোনা গেল আর আমাদের দোড়গোড়ায় এসে হঠাৎ সেই শব্দ থেমে পড়ল। সন্দেশ সুদ্ধু হাতটা লুকিয়ে সামনের দিকে তাকালাম। আঠার উনিশ বছরের একটি তন্বী সুন্দরী মেয়ে। তার চোখ এবং ঠোঁটের কোণ থেকে কৌতুকের বাঁকা হাসি তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি।

যোগলক্ষ্মী ততক্ষণে পিছনে ফিরেছেন, দস্যি মেয়ে, রাত এই নটার সময়—এতক্ষণে বুঝি তোমার সভা ভাঙলো ?

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চিনতে পারছো তো ? আমার কনিষ্ঠা নন্দিনী দিল্লী।

বললুম, চেনা একটু কঠিনই। খুব ছেলেবেলায় তো দেখেছি।

দিল্লীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে যোগলক্ষ্মী আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। সে হাসিতে বাৎসল্যের স্নিগ্ধতা।

বললেন, বলো কি, তুমিও আবার এসব কি মিথ্যাসাক্ষী দেওয়া আরম্ভ করলে? ও আবার কোনোদিন ছোট ছিল নাকি? ওর তো ধারণা ও এত বড় হয়েই জন্মেছে, ওকে কি কারো নাইয়ে খাইয়ে দিতে হয়েছে, না কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করতে হয়েছে?

যোগলক্ষ্মীর হাসির সঙ্গে হাসি মিলিয়ে দিল্লীর দিকে সস্নেহ কৌতুকে তাকালাম, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আমার ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেল, নিজের শৈশবকে ও যদি ভুলে গিয়ে থাকে সে কি এতই অস্বাভাবিক? ওর দিকে তাকালে অন্য কারোই কি ওর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে? যোগলক্ষ্মী বললেন, আয় ঘরে আয়, এঁকে চিনতে পারছিস্? তোর মামীমার মেজদা, ডিঙামানিকের ত্রিলোকেশ চৌধুরী।

দিল্লী ছোট্ট নমস্কার জানিয়ে মৃদু হেসে বলল, ও, আপনার গল্প ছোটবেলায় অনেক শুনেছি, অনেক পড়েছি।

তারপর হঠাৎ নগেনবাবুর দিকে ফিরে বলল, এই যে নগেনবাবু, অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি। তারপর চিন্ময়ের খবর কি বলুন তো, ও যে কলেজেও আসছে না, এসোসিয়েশন অফিসে রিহার্সেলেও আসছে না, কি হোলো হঠাৎ ওর?

চিন্ময় নগেনবাবুর বড় ছেলে, ইংরেজী সাহিত্যে এম, এ পড়ছে দিল্লীর সঙ্গে। নগেনবাবু সলজ্জ হেসে জবাব দিলেন, সে বোধ হয় তোমরাই ভালো জান।

দিল্লী বলল, তা একটু একটু জানি। দয়া ক'রে কালই একবার ওকে পাঠিয়ে দেবেন তো, এমন ছেলেমানুষ।

হঠাৎ চমকে উঠলাম, কথাটা আরো যেন কোথায় শুনেছি। যোগলক্ষ্মীর খ্যাতি আর প্রতিপত্তির সঙ্গে উত্তরাধিকার সূত্রে এই অল্প বয়সে দিল্লী কি তার মায়ের সেই বৈশিষ্ট্যকেও আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে? সেই পুরুষ-মানুষকে ছেলেমানুষ বলতে পারার বাহাদুরি?

তরতর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দিল্লী আর একবার মুখ বাড়িয়ে বলল, ওকে আসতে বলবেন, আর বলে দেবেন হিরোর পার্ট ওকেই দেওয়া হবে।

তরল মিষ্টি একটু হাসির শব্দ শোনা গেল।

মেয়ের এমন প্রগল্‌ভতায় জানি না যোগলক্ষ্মীও লজ্জাবোধ করলেন কিনা।

আমার দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভভাবে একটু হেসে বললেন, বোসো চায়ের ব্যবস্থা ক'রে আসি।

বললুম, চায়ের জন্যে অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আর তার জন্যে আপনার যাওয়ার কি দরকার?

আর কে আবার যাবে, ঐ মেয়ে করবে চা? ওর বাথরুম থেকে বেরুতে বেরুতেই রাত দশটা, আমিই পারব! এক কাপ চা ক'রে আনতে পারব না এমনই কি অথর্ব হয়ে গেছি ভেবেছ?

চা এল। যোগলক্ষ্মী খুঁটে খুঁটে আমার পারিবারিক অনেক সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। কেমন আছে কল্যাণী? কেমন আছে ছেলেমেয়েরা? বড় ছেলের বয়স কত হোলো? বললুম, বছর তেরচোদ্দ হোলো বোধ হয়। যোগলক্ষ্মী বললেন, বোধ হয়! এখনও তেমনি আছ, সংসারে কিছুরই সঠিক খবর রাখো না, ভাই বোনে কটি হোলো ওরা?

এবার সুনিশ্চিত জবাব না দিয়ে উপায় রইল না।

একটু চুপ ক'রে থেকে যোগলক্ষ্মী বললেন, আমি সব শুনেছি নগেনবাবুর কাছে, সেই বুড়ো বয়সে ক'লকাতায় তো এলেই শেষ পর্যন্ত, কিন্তু সময় থাকতে এলে না। ওই সব মাস্টারি টাস্টারিতে কি আর চলে?

যাওয়ার সময় যোগলক্ষ্মী দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন, এসো কিন্তু আর একদিন। তারপর নগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা আমার আগের কথাই ঠিক রইল নগেনবাবু, দেবতাকে যা মানত করি অবস্থা ভেদে তার বরং হ্রাসবৃদ্ধি চলে। কিন্তু আপনাদের বেলায় তো আর তার জো নেই, একটু কম হলেই আপনারা জোর চালান। কিন্তু সকলের সাধ্য কি সমান? গরীব বিধবার টাকাগুলো তো জলে যাবে না নগেনবাবু?

না না, কি যে বলেন, আপনার মুখে ও কথা মানায় না, দেখছেন তো বাজার? দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়ে ফিরে আসবে।

একটু থেমে হঠাৎ ত্রিলোকেশবাবুবললেন, 'চলুন এবার বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, এখন হয় তো ঘুম আসবে।'

আমি হেসে বললাম, 'কাহিনী শেষ না হলে শুধু কি আমারই ঘুম আসবে না ভেবেছেন?'

ত্রিলোকেশবাবু তবুও চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ ক'রে রইলেন। এতক্ষণে সত্যিই ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মনে হোলো ত্রিলোকেশবাবু সত্যিই আজ আর কিছু বলবেন না। উঠব কিনা ভাবছি ত্রিলোকেশবাবু বললেন, 'আচ্ছা, শুনুন। বাকিটা না শুনলে আপনি যখন নিজে নিজে না বানিয়ে ছাড়বেন না তখন আপনাকে বলাই ভালো।

হিরো হতে চিন্ময়ের কিছু দেরি লেগেছিল। অবশ্য তার কৃতিত্ব এবং দায়িত্ব কেবল আমারই নয়, দিল্লীর স্বভাবেরও। আগেই বলেছি জিনিষটা তার মার কাছ থেকে পাওয়া। মতের দিক থেকে যোগলক্ষ্মীর সঙ্গে ইদানীং দিল্লীর কোনো কিছুরই মিল ছিল না, না রাজনীতিতে, না ধর্মমতে, না সাহিত্যবিচারে। কিন্তু স্বভাবে যেন কোথায় খানিকটা সাদৃশ্য ছিল। এমন কি আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যোগলক্ষ্মী এ যুগে জন্মালে ঠিক দিল্লীর মতই হতেন, তাঁর নীতিজ্ঞান এবং রাজনীতি হয় তো এমনি রূপান্তর গ্রহণ করত। সহকর্মী এবং সমবয়সী ছেলেদের সম্বন্ধে দিল্লীর মনোভাবটা ঠিক সেকালের যোগলক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। দিল্লীর কাছেই শুনেছি ছেলেবেলা থেকে তার মা তাকে সাধারণত নিজের এবং নিজের প্রবীণ বন্ধুদের সাহচর্যে রেখেছেন। তাদের আলাপ আলোচনা চালচলনেই দিল্লী অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। ম্যাট্রিক পাশ করার পর থেকে যোগলক্ষ্মী অবশ্য আর মেয়েকে নিজের গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখতে পারেননি। ভিন্ন মত, ভিন্ন রুচি এবং বিভিন্ন রকমের বন্ধু সে সংগ্রহ করেছে। আমার যতটা বিশ্বাস কৈশোরেই প্রেম সম্বন্ধে তার কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল যাতে কোনো বন্ধুর সানুরাগ মনোভাব তার কাছে পরিহাসের বস্তু হয়ে উঠেছিল। বিদ্যা বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও সমবয়সীরা তার কাছে সবাই ছেলেমানুষ, যেন নিতান্তই কৌতুকের পাত্র।

প্রথম প্রথম আমিও দিল্লীর কাছে কৌতুকের বিষয়ই ছিলাম। যেন প্রাগৈতিহাসিক কিম্ভূতকিমাকার কোনো জন্তু এবং তার জন্যেই জীবতাত্ত্বিকদের কাছে নিতান্ত মূল্যবান। তার বহু বন্ধুর সঙ্গে আমাকে সে এই ভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, ইনি সেই ত্রিলোকেশ চৌধুরী। এক সময় আনক্যানি গল্প লিখে খুব নাম করেছিলেন।

তবু আমাকে দিল্লীর যদি ভালো লেগে থাকে সে কেবল আমার সঙ্গে তর্ক করবার জন্যে। আর লেখা ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে আমারও তর্ক করবার শক্তি না হোক আসক্তি বেড়েই গিয়েছিল। বিতর্ক প্রায়ই হোতো সাহিত্য সংক্রান্ত। দিল্লীর বক্তব্য ছিল আমরা, এই ত্রিলোকেশ চৌধুরীরা সাহিত্যে কিছুই করতে

পারিনি। কেবল মধ্যবিত্ত যৌনজীবনের বিকৃতি, ছোট ক্ষোভ, ছোট ঈর্ষা—এরই উপর কারিকুরি করেছি। আধুনিক সাহিত্যের নমুনা হিসাবে আমাকে মাঝে মাঝে তার নিজের এবং বন্ধুদের কবিতা গল্প পড়ে শোনাত। কিন্তু আমি যে তেমন রসগ্রহণ করতে পারছি না এটা বুঝতে তার দেরি হোতো না। সঙ্গে সঙ্গে সে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠত, এ আপনার ঈর্ষা, নিজে লেখা ছেড়ে দিয়েছেন বলে কারোর লেখাই আপনার সহ্য হয় না। আপনাকে দিয়ে আবার লেখাতে হবে, তাহলে বুঝবেন লেখা কত কঠিন।

লেখার কাঠিন্য তাহলে তোমরাও মানো।

এই সেরেছে। আপনি এবার নিশ্চয়ই দৈবী ইন্‌স্‌পিরেশনের কথা এনে ফেলবেন।

দৈবী না হোক মানবীয় ইন্‌স্‌পিরেশনে তো আপত্তি নেই।

আছে বৈ কি, কথাটার এসোসিয়েশনই খারাপ। কোনো লেখক যখন বলেন আজকাল আর লিখতে পারছিনে—আমার ভারি হাসি পায়। লিখতে না পারাটা কি ক'রে সম্ভব যখন ছেলেবেলার অক্ষর পরিচয়টা আমরা চেষ্টা করেও ভুলতে পারিনে? আমার তো বরং একেক সময় দেখে দারুণ বিস্ময় লাগে যে, যাই কিছু না লিখি তারই কোনো না কোনো মানে হয়ে যায়, কি অদ্ভুত! শুধু অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে গেলেই হোলো। দিল্লীর শেষের কথাগুলির মধ্যে এমন একটা আন্তরিক উল্লাস ছিল যে সহসা কোনো প্রতিবাদ করতে আমার বাধল।

একটু চুপ ক'রে থেকে দিল্লী, বলল, আপনাকে কিন্তু আমাদের কাগজে সামনের মাসে লিখতে হচ্ছে। আমি কথা দিয়েছি।

বললুম, তার চেয়ে তোমাদের লেখার প্রশংসাও বরং আমার পক্ষে সহজ। কথা দিয়ে ভুল করেছ। লেখা ছেড়ে দিলেই বরং ঈর্ষা, আর অহমিকা ছাড়ে, অন্যের লেখার রসগ্রহণে সুবিধা হয়। কেন না প্রত্যেক লেখকেরই ধারণা একমাত্র তার কাছেই কলালক্ষ্মী ধরা দিয়েছেন।

দিল্লী হাসল, আপনি তাহলে উদার হওয়ার জন্যেই লেখা ছেড়েছেন, যাক, উদ্দেশ্যটা অন্তত মহৎ।

শুধু উদার নয়, সহজ হওয়ার জন্যেও। কি লাভ বৃহৎ পৃথিবী থেকে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে। চারিদিকের লোক চলে ফেরে হাসে কাঁদে, নিজের প্রয়োজনে নিজের আনন্দে তারা বাঁচে। আর কলম নিয়ে আমরা ছুটি তাদের পিছনে পিছনে। কতটুকু আমরা তাদের দেখতে পারি, কতটুকু গ্রহণ করতে পারি,

নিতান্ত যতটুকু আমরা লিখতে পারব। আমাদের লেখার ভঙ্গির সাথে দেখার ভঙ্গি এক হয়ে যায়। দিনের পর দিন রাতের পর রাত পৃথিবী রং বদলায় আর আমি কেবল কাগজের ওপর কথা কাটি আর কথা বদলাই।

দিপ্তী একদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, আমি হঠাৎ থেমে যেতে সে চোখ নামিয়ে নিল। তারপর হেসে বলল, নিষ্ফলতার ওপরে এমন ক'রে রং ফলাতে আপনার মত আর কেউ পারবে না।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হোলো রং কি কেবল জীবনের নিষ্ফলতার ওপরই লেগেছে?

মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে ও বেড়াতে বেরোত। কদাচিৎ কোনোদিন সিনেমায়ও যেতাম। কখনো কখনো চিন্ময় থাকত, কোনদিন বা যোগলক্ষ্মী, কোনো কোনোদিন আবার কেউই থাকত না। সিনেমা দেখে এসে দিপ্তী নিন্দা করত এবং আমার সঙ্গে তার মতের অমিল হোতো না।

এমনি ক'রে আরও কিছুদিন কাটল। দিপ্তী মাঝে মাঝে তাদের এসোসিয়েশনে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে প্রায়ই জোর জবরদস্তি করত কিন্তু সেখানে যাওয়ার কল্পনায় আমি তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম না। দিপ্তী বলত, যাচ্ছেন না কেন জানি। আচ্ছা আমার বন্ধুদের সামনে আপনি অত নার্ভাস ফিল্ করেন কেন? ওদের সামনে আপনার কথার ধারও যেমন কমে, রংও তেমনি ফিকে হয়ে আসে।

তাই নাকি, কিন্তু তাতে তোমার বন্ধুদের বা তোমার কোনো ক্ষোভের কারণ তো দেখি না। জয়ের আনন্দের ভাগ তুমিও তো পাও, না পাও না?

দিপ্তী অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, কেন পাব না?

তার সমস্ত মুখ যেন আরক্ত হয়ে উঠল।

আর সেই রক্তিম সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্যে নিজের অকৃতার্থতার গ্লানিতে আমার সমস্ত অন্তর ভরে গেল।

বোধ হয় মুহূর্তকাল দু'জনেই চুপ ক'রে ছিলাম। যোগলক্ষ্মী ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। এটা যোগলক্ষ্মীর লাইব্রেরী ঘর। তাঁর স্বামী ভুবনবাবুর ছেলেবেলা থেকে বই কেনার ভারি শখ ছিল। বই কিনবার বা পড়বার দিকে যোগলক্ষ্মীর যে বিশেষ ঝোঁক ছিল তা নয়। কিন্তু স্বামীর অনেক সখের মত এ সখটাকেও এমন আত্মগত

ক'রে নিয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরও বহুকাল ধরে তিনি কিছু কিছু বই কিনে এই পারিবারিক লাইব্রেরীটিকে মূল্যবান ক'রে তুলেছেন। চারদিক ঘিরে সার সারি কাঁচের আলমারি আর তার ভিতরে অসংখ্য বইয়ের স্তূপ ঘরটির মধ্যে স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য এনে দিয়েছে।

যোগলক্ষ্মী বলেন, সমস্ত বাড়ির মধ্যে এই ঘরটিতে এসে কি যে শান্তি পাই তা বলতে পারিনে। ইচ্ছা করে দিনের পর দিন এখানে লুকিয়ে থাকি।

কি মন্তব্য করা যায় ভেবে পেলাম না। দিল্লীও দেখলাম চুপ ক'রে রয়েছে। একটু থেমে যোগলক্ষ্মীই আবার কথা বললেন,

আজ আবার কি তর্ক হচ্ছিল তোমাদের?

বললুম, দিল্লী বলছিল ওর বন্ধুদের সঙ্গে আমি নাকি মন খুলে আলাপ করি না।

দিল্লী জোর ক'রে সপ্রতিভ হতে চেষ্টা করল,

যেন ইচ্ছা করলেই উনি করতে পারেন। করেন না মানে, করতে পারেন না। তোমার এই বন্ধুটির মত নার্ভাস লোক আমি আর দুটি দেখিনি মা। কি ক'রে যে তোমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল আমি ভেবে পাইনে। তোমাদের মধ্যে কোনোদিক দিয়েই তো কোনো মিল নেই। আড়চোখে একবার তাঁকিয়ে দেখি যোগলক্ষ্মীর গৌরবর্ণ মাংসল মুখখানা লাল টকটক্ করছে। কিন্তু দেখতে না দেখতেই তা আবার ছাইয়ের মত পাণ্ডুর হয়ে গেল। দিল্লীর কথার মধ্যে যেন একটু বেশি রকম ঘনিষ্ঠ সুর ছিল। আমার কানেও তা ধরা পড়ল। মনে হোলো তার ঐ ভঙ্গির প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু কিছুতেই যেন কথা খুঁজে পেলাম না। এও মনে হোলো যাই কিছু বলতে যাব, তাই অত্যন্তরকম নাটকীয় হয়ে উঠবে। কিন্তু আমি যা পারিনি যোগলক্ষ্মী তা অবলীলায় পারলেন। দিল্লীকে তিনি এমনভাবে ধমক দিলেন যে, সে যেন নিতান্তই সাত আট বছরের একটি খুকি। বললেন, হয়েছে, হয়েছে। লেখাপড়া শিখে ভারি পণ্ডিত হয়েছ কিনা। আমার বন্ধুদের সমালোচনা না করলে চলবে কেন?

দিল্লী বোধ হয় এমনটা প্রত্যাশা করেনি। আমিও নয়। ক্রোধে এবং লজ্জায়, খানিক আগে তার মা'র মুখ যেমন দেখাচ্ছিল দিল্লীর মুখও তেমনি হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সপ্রতিভ পরিহাসের সুরে সে বলল, বন্ধুদের নিন্দা শুনলে মেজাজ আর ঠিক রাখতে পার না বুঝি। কথায় কথায় আজকাল এমন ক্ষেপে যাচ্ছ যে, আমার ভয় হচ্ছে এতদিনে সত্যি তুমি বুড়ি হয়ে পড়লে। বসো, একটু চায়ের

ব্যবস্থা করা যায় কি না দেখি। গরম চা না হলে তোমার মেজাজ আজ আর ঠাণ্ডা হবে না। দিল্লী উঠে যাওয়ার পরও একমুহূর্ত যোগলক্ষ্মী গম্ভীর হয়ে রইলেন, তারপর কণ্ঠকে যথাসাধ্য প্রসন্ন এবং সহজ করতে চেষ্টা ক'রে বললেন, আচ্ছা ত্রিলোকেশ।

আমি তাঁর চোখের দিকে সহসা তাকাতে পারলাম না। সেদিন ভেবেছিলাম আর কোনো ভয় নেই, আর কোনো সংকোচ নেই আমার, কিন্তু তখন কি জানি নতুন ভয়, নতুন লজ্জা এমন ক'রে সঞ্চিত হয়েছিল।

বলুন।

আমি ভাবি কি ক'রে তুমি এতদিন মাষ্টারি করলে, ছেলে মেয়েরা দুষ্টুমি করলে আচ্ছা ক'রে একটা ধমকও দিতে পার না?

কথাটা কেবল যেন তিরস্কার নয়। তা হলে কি এত মধুর শোনাত? মনে পড়ল কল্যাণীও যেন ঠিক এই ভঙ্গিতে অনুযোগ করে।

বললুম, ধমক কি আর সকলের গলাতেই মানায়? কারো কারো ধমক এমন হয় শুনতে যে, ছেলেদের কাছেও তা ভয়ংকর না হয়ে হাস্যকর হয়ে ওঠে।'

কথা শুনে যোগলক্ষ্মীও হাসলেন, তবু আড়ালে আড়ালে একটু একটু চর্চা কোরো, না হলে ছেলেমেয়েরাই একদিন ধমকাবে দেখো।

কিন্তু যোগলক্ষ্মীর ধমক খেয়েও দিল্লী ফিরল না। বরং ধমক খেয়েছে বলেই সে যেন আরো বেড়ে উঠল। আমি যত তাকে এড়াতে চেষ্টা করি, নানা কাজে আমাকে তত তার প্রয়োজন পড়ে। এটা যে যোগলক্ষ্মীর ওপর তার জেদ সে সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, তবু একেবারে নিঃসন্দেহ হতেই কি ইচ্ছা করত?

দলের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে দিল্লী একটা কাগজ বের করত। এবং বলা বাহুল্য সেই ছিল তার সম্পাদক, এই কাজে সহায়তা করবার জন্যে আজকাল প্রায়ই আমার ডাক পড়ে।

একদিন বললুম, কিন্তু পরামর্শটা হয়ত তোমাদের দলে কু-পরামর্শ বলেই গৃহীত হবে, কেন মিছামিছি তোমাদের বন্ধুদের ক্ষুণ্ণ করবে দিল্লী?

ভাববেন না, আমার বন্ধুরা আপনার মত সহজে ক্ষুণ্ণ হবার পাত্র নয়।

তারপর দিল্লী একটা লেখা বের ক'রে একটু মুচকি হেসে বলল, তাই বলে এটা কিন্তু অমনোনীত ক'রে বসবেন না।। এ কেবল আমার বন্ধুদের ক্ষুণ্ণ করা নয়, বুঝেছেন ?

নাম নেই তবু লেখার ধরনে বুঝতে পারলুম গল্পটা দিল্লীর নিজের, শুধু তাই নয় ইদানীং আলাপ আলোচনায় যে সব কথা বলেছি তার অধিকাংশই দেখি রচনাটির মধ্যে স্থান নিয়েছে। এমন কি আমার বলবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত যেন অক্ষরে অক্ষরে গাঁথা। লিখতে পারি না বলে আর যেন কোনো ক্ষোভ আমার রইল না। মনের কথা কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলার কষ্ট এবং আনন্দের সঙ্গে এতকাল পরিচয় ছিল, কিন্তু অন্য কারো লেখায় তার নিখুঁত প্রতিবিম্ব পড়লে যে অনুভূতি মনের মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে তার সাক্ষাৎ জীবনে এই প্রথম পেলাম।

বললুম, করেছ কি, ধরা পড়ে যাবে যে।

দিল্লী বলল, অতই কাঁচা মনে করেছেন বুঝি ? ধরা পড়বার ভয় তো কেবল একজনের কাছে ? আগে ভাগে তাকেই যদি ধরিয়ে দিই—'

চক্রান্তটা ঠিক ধরতে পারছি না।

দিল্লী মুচকি হেসে বলল, গল্পটা আপনার নামে ছাপব।

সন্ত্রস্ত হয়ে বললুম, পাগল নাকি ? এমন কাজও কোরো না।

দিল্লী বলল, ধরা পড়বার ভয় তা হলে কেবল আমারই নয় দেখা যাচ্ছে।

ভয়! ভয়ের কথা তখন পর্যন্ত আমার মনেই আসেনি কিংবা এলেও সন্তর্পণে তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছি। প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে এসে নতুন কোনো ভয় নতুন কোনো ঝুঁকি নেওয়ার মত প্রবণতা মনের আর থাকে না। অভ্যস্ত দিনযাত্রার ফাঁকে যদি কোনো নতুন বিস্ময়ের সন্ধান মেলে তাকে নিরাপদ মসৃণতায় শোধন না করা পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না।

সংসার চিন্তা এবং অফিসের ক্লান্তিকর খাটুনির পর অবসরটা এ ধরনের বিশ্রম্ভালাপে বেশ কাটছিল। মনে মনে এই আশাই হয় তো ক'রে রেখেছিলাম চিরকাল এমনি করেই কাটবে। এই পরিমিত স্বল্প সময়টুকু ভরে একটি সূক্ষ্ম রস-ধারা অনন্তকাল ধরে বয়ে চলবে, তাতে কোনোদিন ঝড় উঠবে না, প্লাবন আসবে না, ভয় করবার কিছু থাকবে না।

যোগলক্ষ্মী মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলতেন। এই বয়সেও তাসে

এমনভাবে মত্ত হয়ে যেতে দেখে আমি বিস্মিত না হয়ে পারতুম না। খেলাটা যেন তাঁর কাছে কেবল খেলাই নয়, কাজের মতই গুরুতর ছিল। খেলার ভুল হলে তার ব্যঙ্গ আর তিরস্কারের হাত থেকে হতভাগ্য সঙ্গীর ত্রাণ পাওয়ার জো ছিল না। আমি মাঝে মাঝে দর্শকের দলে গিয়ে বসতাম, যোগলক্ষ্মীর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে কোনোদিন যেমন আমার যোগ ছিল না তেমনি তাস খেলাতেও তাঁর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য আমার কোনোদিন হয়নি।

তাসের আসরে সেদিন যোগলক্ষ্মীর বিশেষ বিশেষ বন্ধুর সমাগম হয়েছিল। নগেনবাবু ছিলেন। এলাহাবাদ থেকে ছুটিতে এসেছিলেন অধ্যাপক যতীনবাবু। আমারই সমবয়সী। এরই মধ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে উঠেছিল। আজ তিনিই আমাকে টেনে নিয়ে কাছে বসালেন, খেলাটেলা এক আধটু শিখুন ত্রিলোকেশবাবু।

কি একটা কাজের অছিলায় দিল্লী একবার এ ঘরে এসে ঘুরে গেল। তারপর আর একটু বাদেই এল শম্ভু। আমার কাছে এসে বলল, পড়ার ঘরে দিদিমণি আপনাকে ডাকছেন।

সবাই একবার ওর দিকে অর্থবোধক ভঙ্গিতে তাকালেন। তারপর হঠাৎ যেন আপন আপন তাসগুলির ওপর গভীর মনোযোগী হয়ে পড়লেন প্রত্যেকে।

যতীনবাবু বললেন, আপনাকে এখানে মাষ্টারীও করতে হয় তা তো বলেননি। তারপর তাসগুলি উঁচু ক'রে নিজের মুখ আড়াল করলেন। বোধহয় হাসি গোপন করবার জন্যে।

যোগলক্ষ্মীর কথায় চমকে উঠলাম। তিনি অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলছেন, যাও ত্রিলোকেশ একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে এসো। পরীক্ষার চাপে শ্রীমতীর এতদিনে বোধ হয় সুমতি হোলো। আমি তো হাজার বার বলেও ওকে একবার বই নিয়ে বসাতে পারিনে, তুমি জাত মাষ্টার, তোমার ধমকটমকে যদি কিছু কাজ হয়। তারপর যতীনবাবুর দিকে তাকিয়ে তিনি একটু হাসলেন, মাষ্টারীর কথা বলেছিলেন, ও বড় সাংঘাতিক জিনিষ। একবার ও ব্যবসা নিলে রক্ষা নেই। আপনি ছেড়ে দিলেও তা আপনাকে ছাড়বে না।

যোগলক্ষ্মীর দিকে একবার তাকালাম। তখনো তাঁর মুখে হাসি লেগে রয়েছে। কী এই হাসির অর্থ। একি তাঁর ব্যঙ্গ, একি তাঁর অভিমান কিংবা দুই-ই ?

গম্ভীর মুখে সিঁড়ি বেয়ে দিল্লীর পড়বার ঘরে এসে উপস্থিত হলাম। চায়ের সরঞ্জাম সামনে ক'রে বসে নিজের মনে সেগুলি নিয়ে দিল্লী যেন খেলা করছে।

সুন্দর একখানি টেবিলঢাকনিতে মোড়া ছোট্ট গোল টেবিলটার ওপর ফুলদানীতে দু'টি চন্দ্রমল্লিকা। আমাকে দেখে দিল্লী বলল, আসতে পারলেন এতক্ষণে ?

বললুম, 'হুঁ', কি ব্যাপার বল দেখি ?

বাঃ, কথাটা যে আমিই জিজ্ঞেস করব ভেবেছি। ব্যাপার কি, হঠাৎ অমন তাসে মেতে উঠলেন যে ? অথচ খেলার তো কিছু জানেন না। ফাঁকি যাদের দিতে চান তারা আপনার চেয়ে ঢের চালাক। অনর্থক পণ্ডশ্রম ক'রে লাভ কি। তার চেয়ে নিশ্চিন্তে চুপ চাপ বসে চা খাওয়া অনেক ভালো।

এক কাপ চা আমাকে এগিয়ে দিয়ে আর এক কাপ দিল্লী নিজের দিকে টেনে নিল।

ওর এ ধরনের প্রগল্ভতা আমার অপরিচিত নয়। কিন্তু আজ যেন তা সমস্ত সীমা অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে মনে হোলো। ওর গাঢ় রক্তবর্ণ দু'টি প্রবালের দুলে, কবরীর উদ্ধত ভঙ্গিতে পৃথিবীর সমস্ত অসংযম, সমস্ত আতিশয্য যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল।

এ সব অবশ্য এখন যেমন ক'রে আমি দেখতে পাচ্ছি সেদিন ঠিক তেমন ভাবে দেখিনি। আমার চোখের সামনে তখন যোগলক্ষ্মী আর তাঁর বন্ধুদের সকৌতুক চোখগুলি বারংবার ভেসে ভেসে উঠেছে।

ওর সামনে সোফাটায় বসলুম। কিন্তু চা আমি স্পর্শ করলুম না, বললুম, শম্ভু আমাকে বলছিল আমার কাছ থেকে পরীক্ষার পড়া নাকি তোমার বুঝে নেবার আছে।

দিল্লী মৃদু হাসল, ও ছাড়া শম্ভু আর কি বলতে পারত।

আর হঠাৎ ওর সেই হাসি, সেই ছোট্ট টুকরো টুকরো কয়েকটি কথায় আমার মনে হোলো পৃথিবীতে এর চেয়ে দুঃসহতর অশ্লীল কিছু যেন আর হতে পারে না। ও যখন আরও স্পষ্ট, আরও মুখর হয়ে উঠবে কি ক'রে আমি তা সহ্য করব।

হঠাৎ উনিশ কুড়ি বছর আগেকার আরেকটি দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেদিন অসহ্য আবেগে একটি যুবক যোগলক্ষ্মীর এক খানি হাত নিজের মুঠির মধ্যে চেপে ধরেছিল। আজ বুঝতে পারছি কেন যোগলক্ষ্মী সেদিন একবার শিউরে উঠে পাথরের মত অমন নিঃস্পন্দ হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর একটু পরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কেমন ক'রে বলতে পেরেছিলেন, ছিঃ, কি ছেলেমানুষি হচ্ছে ত্রিলোকেশ।

আমার ভাবান্তর হয়তো দিল্লী তখনো লক্ষ্য করেনি। কিংবা লক্ষ্য করলেও

আমল দিতে চায়নি। নিজের ঐশ্বর্যে ও তখন পরিপূর্ণ। আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে গেলেন যে। চা খান। ভালো কথা আপনাকে একটা খবর তো এতক্ষণ দিইনি।

শুষ্ক কণ্ঠে বললুম, 'কি খবর ?'

একটা দিন সবুর করতে পারলে খবরটা আপনাকে চাক্ষুষ দেখাতে পারতাম, কিন্তু সবুর করা আর আমার স্বভাবে নেই। তাতে মেওয়া যদি না ফলে না ফলল। সেই গল্পটা প্রেসে দিয়েছি আর আমাদের দু'জনের নামে সেটা বেরুচ্ছে। ভেবে দেখলাম ধরা যদি পড়তেই হয় দু'জনে একসঙ্গে পড়াই ভালো।

মুহূর্তকাল আমি যেন কোনো কথা বলতে পারলাম না। এ আমি করেছি কি! নিজেকে এমন করেই ছেড়ে দিয়েছি যে, দিল্লীর মত এতটুকু ঐ মেয়ে আমাকে খেলার সঙ্গী ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না ? আমার বয়স, আমার সাংসারিক আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা কিছুরই কি গুরুত্ব নেই, ওর লঘু চাপল্যে সমস্তই কি এমন ক'রে ভাসিয়ে দেওয়া যায় ?

হঠাৎ কঠিনকণ্ঠে বললাম, আমার নাম নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলবার স্পর্ধা তোমার কাছে থেকে আশা করিনি দিল্লী।

মুহূর্তকাল বিস্মিত হয়ে দিল্লী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর অদ্ভুত একটু হেসে বলল, অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন ? যাতে কেউ কিছু মনে না করতে পারে, তার জন্যে ব্রাকেটে দু'জনের বয়সের কথাটা উল্লেখ ক'রে দিলেই হবে।

জবাবে কি একটা কথা বলতে গেলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোনো কঠিন কথাই বাংলা কি ইংরাজী ভাষায় খুঁজে পেলাম না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সিঁড়ির মুখেই নিচের ঘর থেকে তুমুল হাস্যধ্বনি শুনতে পেলাম। তাদের আসরে হয় তো নতুন কোনো কৌতুকের কথা উঠে থাকবে।

নিভন্ত চুরুটটা সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ত্রিলোকেশবাবু একটু হাসলেন, 'চলুন আমরাও এবার উঠি।'

বললুম, 'হ্যাঁ চলুন।'

হলদে বাড়ি

চাঁদের আলো সাদা মোমের মত গলে পড়েছে শহরের ওপর। সমস্ত রাস্তাটা মখমলে ঢাকা।

আর গলন্ত মোমের মতই নরম অঞ্জনার হাত। আঙুলগুলি এমনভাবে জড়িয়ে আছে চিন্ময়ের আঙুলের সঙ্গে যে, তার মনে হচ্ছে হাত ছাড়িয়ে নিলেও গলানো মোম তার হাতে জড়িয়ে থাকবে। হাত অবশ্য ছাড়িয়ে নিল না চিন্ময়, অঞ্জনার হাতখানা তুলে নিয়ে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়াল।

কয়েকজন লোক অঞ্জনার একেবারে ডান কাঁধ ঘেঁষে চলে গেল। কোনো রকমে কাঁধটা সংকুচিত ক'রে স্পর্শ বাঁচাল অঞ্জনা।

'দেখেছ রাস্তায় কি ভিড়!'

চিন্ময় বলল, 'অন্তত চারগুণ লোক বেড়েছে ক'লকাতায়।'

'আরো বেশি, আরো বেশি। কিন্তু যাই বল, এবার সত্যি সত্যি কসমোপলিটান শহর হয়ে উঠল ক'লকাতা। আমেরিকান, অষ্ট্রেলিয়ান সব এসে তাঁবু পেতেছে, না আছে এমন দেশ নেই। বেশ লাগে আমার। শুধু যদি ওদের চেহারাটা অত কুৎসিত না হোতো।'

চিন্ময় হাসল, 'ভারি একটা আফ্‌সোসের কথা বটে।'

অঞ্জনা বলল 'দেখ যুদ্ধ জিনিষটা আমার কাছে যে খুব অপছন্দের তা নয়। কিন্তু এখনকার মারণাস্ত্রগুলি বড় অসুন্দর। তলোয়ারের মত সূক্ষ্ম ধারালো ঝকঝকে নয়। বড় স্থূল, জটিল সব যন্ত্র। অনেকখানি জায়গা জুড়ে সব পড়ে থাকে। তাই যুদ্ধক্ষেত্রেরও আজ সমস্ত পৃথিবী না জুড়লে চলেনা।

চিন্ময় বলল, 'হ্যাঁ, প্রাসাদের জানালা খুলে বসে বসে দেখবে, তারপর বিজয়ীর কণ্ঠদেশ লক্ষ্য ক'রে বরমাল্য দেবে ছুঁড়ে তার উপায় নেই। এ যুদ্ধে বরং সভয়ে জানালা দরজা বন্ধ ক'রে রাখতে হয়, কখন বোমার গুঁড়ো এসে চোখে পড়বে। বড় প্রোজেইক।'

অঞ্জনাও হাসল, 'তা ছাড়া কি। ঝকঝকে ইস্পাতের তলোয়ার, আর প্রবালের মত গাঢ় টকটকে লাল রক্ত, ভেবে দেখ তো কি সুন্দর, কোনো বাহুল্য নেই, সূক্ষ্ম পরিচ্ছন্নতা। সে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সত্যি বলা যায়, মরণ রে, তুঁহুঁ মম

শ্যাম সমান। এদিক থেকে সেকালই আমার পছন্দ।'

চিন্ময় হাসল, 'তোমার পছন্দের তারিফ করছি। তবে ওটা কিন্তু সেকালও নয় এ কালও নয়, কেবল যাত্রার কাল।'

অঞ্জনা মুখ ভার করল, 'বেশ বেশ, যাত্রাই হোলো, ভারি তো ঐতিহাসিক। কেবল তথ্য খুঁটে খুঁটে গেলে। তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারলে না।' চিন্ময় বলল, 'মারাত্মক আঘাত হেনেছ এবার। সন্ধি প্রার্থনা করছি।'

অঞ্জনা হাসল, 'বিনা সর্তে তো?'

চিন্ময় বলল, 'না একেবারে বিনাসর্তে নয়, দু'একটা সর্ত আছে।'

পথ দিয়ে যেন ওরা হেঁটে যাচ্ছে না, হাওয়ায় ভেসে চলেছে। রাস্তায় ভীড় এখনো আছে। ট্রাম বাস আর ট্যাক্সি চলছে সশব্দে। পেভমেণ্টের ওপর স্থানে স্থানে কতকগুলি লোক হাত পা জড়ো ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছে। অভ্যাসবশে তাদের পাশ কাটিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে চিন্ময়, আর তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে অঞ্জনা। দু'পাশের বাড়িগুলি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। জোৎস্নায় ভিজে উঠেছে কিন্তু বর্ণ গন্ধ ধ্বনি ভরা এই পরিচিত পৃথিবী ওদের কাছ থেকে যেন অবলুপ্ত হয়ে গেছে। সব কিছুতে মিলিয়ে আছে শুধু একটা অশরীরী সৌরভ. বহুদূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট সেতারের মধুর একটা টান। কিন্তু আরো খানিকটা এসে একটা গলির মোড়ে এই জোৎস্নার সমুদ্রের মধ্যে কদাকার এক কুমীরের পিঠ ভেসে উঠল অঞ্জনার চোখের সামনে।

রাস্তা থেকে কয়েক হাত দুরে গলির মধ্যে ডানদিকে বড় একটি ডাষ্টবিন। তারই ভিতর ঝুঁকে পড়ে একটা লোক দু'হাতে কি ঘাঁটছে, তার পিঠটা কেবল দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ পায়ের শব্দ পেয়ে লোকটা মুখ তুলে তাকাল। হাতে তার কিচ্ছু ওঠেনি। কেবল তরল খানিকটা জিনিষ দু'হাতে জড়িয়ে গেছে। তাতে জিভ লাগিয়ে একটু চেটে লোকটিও মুখ বিকৃত করল। তারপর অঞ্জনাকে দেখে ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে দু'হাতে তার জানু পর্যন্ত জড়িয়ে ধরল। মুহূর্তের মধ্যে কাণ্ডটি ঘটে গেল। চিন্ময় কি অঞ্জনা বাধা দেওয়ার অবকাশ পর্যন্ত পেল না। দু'জনেই একটুকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অঞ্জনা নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'ছি ছি, ছাড়ো ছাড়ো।'

প্রত্যুত্তরে লোকটি অঞ্জনার হাঁটু দুটি আরো আঁকড়ে ধরে প্রায় নিজের বুকের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল, তারপর ঊর্ধ্বে অঞ্জনার মুখের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস ক'রে কি বলল বোঝা গেল না।

অঞ্জনা আবার অসহায়ের মত বলল, 'ছাড়ো ছাড়ো।'

পাশ থেকে চিন্ময় ধমক দিয়ে উঠল, 'এই ছাড়্ ছাড়্ শিগ্‌গির।'

লোকটি যেন ভ্রূক্ষেপই করল না. বার দুই জুতার ওপর মুখ রাখল অঞ্জনার. তারপর আবার মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠল। তার মুখের বিকৃত ভঙ্গিতে কেবল বোঝা গেল সে কাঁদতে চাচ্ছে।

অঞ্জনা তিরস্কারের স্বরে চিন্ময়কে বলল, 'তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল মজাই দেখবে?'

এবার চিন্ময় বাহু ধরে লোকটিকে ছাড়িয়ে নিল। ধমক দিয়ে বলল, 'দূর থেকে চাইতে পারিসনে? পা ধরতে গেলি কোন সাহসে?'

অঞ্জনা বিরক্তকণ্ঠে বলল, 'থাক্ থাক্ বীরত্ব খুব দেখা গেছে। এবার কিছু দিয়ে ওকে বিদায় ক'রে দাও।'

চিন্ময়ও নিরুত্তরে গম্ভীর মুখে ব্যাগ খুলে একটা সিকি ছুঁড়ে দিল লোকটার দিকে।

আরো খানিকটা পথ হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে গিয়ে অঞ্জনা ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় থামল। পরমুহূর্তে চিন্ময় গিয়ে আলগোছে অঞ্জনার কাঁধে হাত রাখল।

অঞ্জনা শিউরে উঠে কাঁধটাকে সংকুচিত করল, 'ছি, ছুঁয়ো না। আমার সমস্ত গা ঘিন্ ঘিন্ করছে। বাড়ি গিয়ে স্নান না ক'রে নিলে আর ভালো লাগবে না। আর তুমিই বা কি রকম, ঐ হাত দিয়েই না লোকটাকে সরিয়ে দিয়েছিলে— আর সেই হাতই আমার কাঁধে রাখছ?'

এ সময় কথা কাটাকাটি করলে ফল আরো খারাপ হয়। চিন্ময় গম্ভীর মুখে হাতটা সরিয়ে নিল।

অঞ্জনা এবার কোমলকণ্ঠে বলল, 'আর হাঁটতে ইচ্ছা করছে না। এখনো বেশ খানিকটা পথ। একটা ট্যাক্সি ডাকবে?'

চিন্ময় বলল, 'এখনি ডাকছি। অনেক আগেই ডাকা উচিত ছিল।'

ট্যাক্সিতে উঠে অঞ্জনা বেশ একটু ফাঁক রেখে সরে বসল। আবার বলল, 'ভারি গা ঘিন্ ঘিন্ করছে। বাড়ি গিয়ে ভালো ক'রে চান ক'রে ফেলতে হবে।'

শুচিতার বাড়াবাড়িতে অদ্ভুত শুচিবায়ুতা দাঁড়িয়ে গেছে অঞ্জনার। ঠিক ওর ঠাকুরমার মত। ওর মাও নাকি এমনি ছিলেন শোনা যায়।

যেন একটা বাংলা দৈনিক পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করছে এমন ভাবে চিন্ময় বলল, 'ওদের সব এখন হাসপাতালে পাঠান হচ্ছে!'

অঞ্জনা বলল, 'তাই তো দেখছি কাগজে।'

তিন চার মিনিটের মধ্যে বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সি থামল। জ্যোৎস্নার সমুদ্রে সাদা একখানা জাহাজ নোঙর ফেলে রয়েছে। আসলে রঙ এই জাহাজী প্যাটার্ণের বাড়িখানার সাদা নয়, হাল্কা হলদে। রাত্রে এমন দেখাচ্ছে! ধব্‌ধবে সাদা রঙ পছন্দ রমলার, কিন্তু অঞ্জনা ভক্ত হলুদ রঙের, সোনালি হলুদ।

ক্ষিতীশবাবু ছোট মেয়ের পছন্দমতই রঙ করিয়েছেন বাড়িখানার। আর রমলার পছন্দ অনুযায়ী রঙ রাত্রে হয়ে যায়।

হলদে রঙ পছন্দ অঞ্জনার। জানালা দরজায় হলদে রঙের পর্দা, ফুলদানির ফুল আর কাঁচের আলমারির সারিগুলি প্রায়ই সব হলদে।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে গম্ভীর মুখে দু'জনে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠল।

ডান দিকের আর একটা ঘরে ক্ষিতীশবাবু ঝুঁকে পড়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত একটা বই লিখছেন। পেন্‌সনের পর যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারি কৌতুহলী হয়ে উঠেছেন ক্ষিতীশবাবু। ঘরের দেওয়ালগুলিতে নানা দেশের বড় বড় মানচিত্র, আলমারিগুলিতে মোটা মোটা বই। সাময়িকপত্রে বিভিন্ন ছোট ছোট আর্টিকেল লিখে এবার একটা বড় বইয়ে তিনি হাত দিয়েছেন—তাই নিয়েই ব্যস্ত। কাল তাঁর তেষট্টিতম জন্মতিথি গেছে। সেই উপলক্ষে মেয়ে, জামাই আর ভাবীজামাই চিন্ময় এসেছেন। আজও তাঁদের যেতে দেননি। রবিবার অফিস আদালত সবই তো বন্ধ, কি এমন কাজকর্ম থাকতে পারে, যা থাকে কাল করলেই চলবে।

তেতালার বড় রুমটায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চুরুট টানছেন অর্জুনবাবু। রমলা শঙ্কিত মুখে বারবার দোরের কাছে আসছে আর ফিরে গিয়ে বসছে।

দোরের পাশে এসে দু'জনে দাঁড়াতেই অর্জুনবাবু বললেন, 'এই যে এসেছ, তোমার দিদি তো অস্থির হয়ে উঠেছেন এরই মধ্যে।'

অঞ্জনা বলল, 'অস্থির হবার কি আছে, আসছি।'

তারপর পূবদক্ষিণ কোণে তার নিজের ঘরটায় গিয়ে ঢুকল।

অর্জুনবাবু বললেন, 'কি ব্যাপার, হঠাৎ এমন ছদ্ম গাম্ভীর্য কেন? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দু'জনে মিলে পরামর্শ ক'রে এসেছ বুঝি?'

রমলা উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অঞ্জু ওভাবে মুখ গম্ভীর ক'রে চলে গেল যে? রাস্তায় কোন কিছু ঘটেনি তো?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চিন্ময়ের দিকে তাকালেন রমলা।

চিন্ময় ভারি বিরক্ত বোধ করল। এই ডিটেকটিভগিরির কি মানে হয়? তারপর অর্জুনবাবুর দিকে চেয়ে চিন্ময় জবাব দিল, 'কি আবার ঘটবে। একটি লোক হঠাৎ অঞ্জনাকে পথের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিল।'

আতঙ্কে অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠলেন রমলা। কিন্তু অর্জুনবাবু হেসে উঠলেন হো হো ক'রে। বললেন 'স্যারেশনটা থার্ড'পার্সনেই সুবিধা বটে। লোকটিকে দোষ দেওয়া যায় না; এমন জ্যোৎস্নাধবল রাত, জনবিরল পথ। ওই তো সম্পূর্ণ কাঙ্ক্ষিত পরিণতি। ওতে আকস্মিকতার কি আছে?'

চিন্ময় বিরক্ত হয়ে বলল, 'পা জড়িয়ে ধরেছিল একটা ভিখিরি।'

এবারো অর্জুনবাবু হাসলেন, 'একেবারে পা? তা কি করবে ভাই, মাঝে মাঝে ভিখিরিও সাজতে হয় বইকি।'

চিন্ময় এবার অসহায়ভাবে রমলার দিকে তাকাল। রমলা ধমক দিয়ে উঠলেন অর্জুনবাবুকে, 'কি যা তা আরম্ভ করেছ। ভালো লাগে না। সব সময়েই তোমার রসিকতা?'

তারপর আদ্যোপান্ত সব শুনে রমলা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। দু' তিন বছর বয়সেই মা মারা যায় অঞ্জনার, সন্তান স্নেহে রমলাই এই ছোট বোনটিকে মানুষ ক'রে তুলেছেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে রমলা বললেন, 'যা মেয়ে, এখন একটা কাণ্ডকারখানা না ঘটালেই বাঁচি।'

অর্জুনবাবু বললেন, 'কাণ্ড আবার কি ঘটাবে। তুমিও যেমন, গেল কোথায়?'

রমলা বললেন, 'কোথায় আবার বাথরুমে। সারা রাতের মধ্যে চান শেষ হয় কিনা দেখ।'

চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'এমন শুচিবায়ু হয়ে উঠল কি ক'রে।'

রমলা বললেন, 'ছেলেবেলা থেকেই সৌখীন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খুব ভালোবাসে। বাবা বলতেন, ও সৌখীন হবে না তো হবে কে, ও আমার সৌন্দর্যের প্রতিমা। তোরা কোন বাধা দিস না যা খুশি করুক, ওকে খুশি দেখতে ভালো লাগে না তোদের? বাড়ির কোথাও এক কণা ধুলো জমলে, কি এক টুকরো

কাগজ পড়ে থাকলে ও সহ্য করতে পারে না। সেই মুহূর্তে তা পরিষ্কার করিয়ে তবে ছাড়বে। ঝি চাকরদের একটুও অপরিচ্ছন্ন থাকবার জো নেই, ও নিজে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ পছন্দ ক'রে দিয়েছে. দু'তিন রকমের। তা আবার সপ্তাহে সপ্তাহে বদলানো চাই—ওর জানালাগুলির পর্দার রঙের মত। এমন কি চাকরদের. কারো মুখে একদিনের দাড়ি জমবে তার জো নেই, ডেইলি তাদের শেভ করতে হবে। ঝিদের সে বালাই নেই। কিন্তু তাদের বিপদ চুল নিয়ে। উস্‌কো খুস্‌কো তারা থাকতে পারবে না, আবার এক ফোঁটা তেল বেশি পড়ে গেলেও চলবে না। দেখতে একটু বেশি রকমের কুশ্রী এমন একটি ঝি একবার এ-বাড়িতে এসেছিল কাজ করতে, দু' মাসের মাইনে বেশি দিয়ে ও তাকে বিদায় ক'রে দিয়েছিল। এর আগে একটি পাঞ্জাবী ড্রাইভার ছিল নাম ইন্দ্রনাথ, ভারি সুপুরুষ। খুব ভালোবাসতো তাকে অঞ্জনা। মোটরে বসে চারপাশের আর কিছুর দিকে ওর চোখ থাকত না. কেবল ইন্দ্রনাথকে দেখত আর দেখত ওর গাড়ি চালানো।

চিন্ময় একবার চোখ তুলে রমলার দিকে তাকাল।

রমলা মৃদু হাসলেন. 'তারপর দাঁতরসায় একদিন সেই ইন্দ্রনাথের গাল উঠল ফুলে. ও আর বেরোয় না ঘর থেকে, ওঠে না গাড়িতে. মুখ ভার ক'রে ঘরের মধ্যে চুপ চাপ বসে থাকে বললুম কি হোলো তোর ?'

ওকে তুমি হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও দিদি এক্ষুণি।

বলিস কিরে, আর একটা ড্রাইভার না হয় ঠিক ক'র—বাবার কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে যে।

তা হোক গিয়ে. তুমি পাঠিয়ে দাও।

সমস্ত মুখটাই ফুলে গেছে, হাসতে আর পারে না ইন্দ্রনাথ, তবু কথা শুনে হাসবার অদ্ভুত চেষ্টা ক'রে সে বলল, এজন্যে আবার ডাক্তারের দরকার কি দিদিমণি, আমি এমনিতেই ভাল হয়ে যাব। অসুখের চেয়ে ডাক্তারকে ইন্দ্রনাথ বেশি ভয় করত। তার আশঙ্কা ছিল ডাক্তার দেখালে সমস্ত দাঁত তারা তুলে ফেলে দেবে। কিন্তু কিছুতেই অঞ্জু শুনবে না।. না খেয়েদেয়ে পড়ে রইল। একেবারে ছোট নয় তখন, চোদ্দপনের বছর বয়স হ'বে। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রনাথকে পাঠান গেল জোর ক'রে। কিন্তু সে আর ফিরে এল না। বোধ হয় ডাক্তারও ইন্দ্রনাথ দেখায়নি, দাঁতরসাও তার সম্পূর্ণ সারেনি। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম সে একেবারে দেশে চলে গেছে। বাবার বেশ অসুবিধা হয়েছিল ক'দিন। আর সেই

প্রথম এবং সেই শেষ ওকে খুব বকেও ছিলেন। তার কয়েকদিন পর থেকেই হিষ্টিরিয়া—তাড়াতাড়ি থেমে গেলেন রমলা।

চিন্ময় আর একবার রমলার দিকে তাকাল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল অঞ্জনা। স্নান সেরে শাড়ী বদলে এসেছে। সম্পূর্ণ নতুন দেখাচ্ছে তাকে। সৌন্দর্যের প্রতিমাই বটে। প্রসাধনের সামান্য পবিবর্তনে ওকে একেকবার এক এক রকম দেখায়। চিন্ময় মুগ্ধ হয়ে ভাবল, এ কি শাড়ীর রঙ, না মনের রঙ। কোনো গ্লানি নেই, ক্ষোভ নেই, দৈন্য নেই পৃথিবীতে। শুধু তরল জ্যোৎস্নায় গড়া এই সুন্দরী বসুন্ধরা। অঞ্জনা শুধু নিজেই সাজেনি, আপন সজ্জায় পৃথিবীকে সাজিয়ে তুলেছে।

অর্জ্জুন বাবু বললেন, 'এসো।'

অঞ্জনা বলল, 'বা, আমাকে দেখেই সব চুপ ক'রে গেলেন যে।'

অর্জ্জুনবাবু বললেন, 'তোমাকে চুপ করেই দেখতে হয়।'

'কিন্তু ঐ চুরুটটা আগে ফেলে দিন। কি দুর্গন্ধ।' হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় অঞ্জনা শিউরে উঠল, মনে হোলো শুধু চুরুটের নয় আরো যেন কি একটা বিশ্রী গন্ধ সমস্ত ধরময় ভেসে বেড়াচ্ছে। পাপিয়ার সুরভিতেও তা ঢাকা পড়ছে না।

রমলার চোখের ইসারায় অর্জ্জুনবাবু তাড়াতাড়ি ফেলে দিলেন চুরুটটা। রমলা বললেন, 'থাক, আর কোনো কথা নয়, চল সব খেয়ে নেওয়া যাক। বাবাকে তাঁব লেখার ঘরে গিযেই জোর কবে খাইয়ে এসেছি। যুদ্ধের বই তো নয়, তিনি যেন নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছেন। নাওয়া খাওয়ার সময় পর্যন্ত নেই। ব্লাড প্রেসারের বোগী, এত অনিয়ম অত্যাচার যদি সয় তো কি বলেছি। আবার বেড়ে পড়বে অসুখ, তখন বুঝবেন মজা। ঠাকুর চাকরগুলি বোধ হয় যোগনিদ্রায় অভিভূত। ঠেলে তুললে তবে তাঁরা উঠবেন। এসো সব।'

অঞ্জনা বলল, 'তোমরা খাও গিয়ে দিদি। আমার ভালো লাগছে না, খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'মাত্র দুটিখানি খাবি অঞ্জু, রাত্রে উপোস দেওয়া ভালো নয়।'

সব পড়ে রইল। দু'চার চামচ কোনো রকমে মুখে দিয়ে অঞ্জনা টেবিল থেকে উঠে পড়ে বলল, 'আমার ভারি খারাপ লাগছে। উঠলুম আমি।'

রমলা শুষ্ক মুখে বললেন, 'আচ্ছা তুই যা। একেবারে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। আমি আসব সঙ্গে ?'

'না না, তোমার আসতে হবে না। সব তাতেই বড় বাড়াবাড়ি তোমার দিদি।'

কিন্তু খেয়ে উঠে সবাই হাত মুখ ধুতেই অঞ্জনার ঘর থেকে অদ্ভুত শব্দ কানে এল সকলের।

রমলা বললেন, 'আমি আগেই বুঝেছি।'

চিন্ময় বলল, 'তাহলে খেতে না দেওয়াই উচিত ছিল।'

মুহূর্তের মধ্যে অঞ্জনার ঘরের সামনে সবাই এসে জড়ো হয়েছে। বই ছেড়ে উঠে এসেছেন ক্ষিতীশবাবু। চারকবাকরের ভিড় জমে গেছে দোরে।

বমিতে সমস্ত ঘরটা ভেসে যাচ্ছে। শাড়ীতে লেগে গেছে খানিকটা। নিজের গায়ের গন্ধে অঞ্জনা নিজেই যেন পাগল হয়ে যাবে। একবার সমস্ত বেশবাস খুলে ফেলতে চাচ্ছে অঞ্জনা, আবার সেগুলিকে চেপে ধরছে লজ্জায়।

রমলা সকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'সরে যাও, ভিড় কোরো না এখানে। ভয় নেই অঞ্জনা।'

অঞ্জনা চারিদিকে তাকিয়ে বলল, 'কি নোংরা, কি দুর্গন্ধ, আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও, শিগ্‌গির সরিয়ে নিয়ে যাও, টিঁকতে পারছিনে। কি নোংরা আর কি বিশ্রী গন্ধ।'

ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ ক'রে রমলা ওর কাপড় ছাড়ালেন। তারপর পাশের আর একটা পরিচ্ছন্ন ঘরে নিয়ে খাটের ওপর শুইয়ে দিলেন ওকে। এ ঘর চিন্ময়ের জন্যে ঠিক করা হয়েছে। পুব দক্ষিণ খোলা। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো গলে পড়ছে।

কিন্তু খাটে শুয়ে একটুক্ষণ চোখ বুজে চুপ ক'রে থেকে অঞ্জনা বার কয়েক নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে কষ্টে কিসের ঘ্রাণ নিয়ে মুখ বিকৃত করল, 'উঁ এখনও তাই। এখনও সেই গন্ধ, আমি টিকতে পারছি না। সমস্ত বাড়িটাই কি নোংরা হয়ে উঠল।'

আরো কয়েকবার নাসিকা কুঞ্চিত করল অঞ্জনা, 'গন্ধে টিকতে পারছি না, আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাও।'

রমলা এগিয়ে এসে ধমক দিয়ে বললেন, 'এই চুপ কর, কি ছেলেমানুষি হচ্ছে অঞ্জু। চুপ।'

পাশে চিন্ময় দাঁড়ানো। রমলা তার দিকে চেয়ে চুপে চুপে বললেন, 'এই সময়

ধমক দিতে হয়, চড়চাপড় দিতে হয় দরকার হলে।' কিন্তু ঠেকানো গেল না বোধ হয়। রমলা ফিস ফিস ক'রে বললেন, 'ফিট হচ্ছে, আমি আগেই বুঝেছিলাম।'

দুটো হাত অঞ্জনা টান ক'রে মেলে ধরল, আঙুলগুলো দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ।

রমলা চিন্ময়কে বলল, 'দেখ দেখি থামাতে পার কিনা।'

চিন্ময় এগিয়ে গিয়ে অঞ্জনার প্রসারিত হাতখানা আস্তে আস্তে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। সমস্ত শরীর ঘৃণায় সংকুচিত ক'রে শিউরে উঠল অঞ্জনা, 'ছি ছি ছি, ছাড়ো ছাড়ো।'

সঙ্গে সঙ্গে কি যেন মনে পড়ে গেল চিন্ময়ের। তারপর ধীরে ধীরে সে সরে দাঁড়াল।

গেটে মোটরের শব্দ। ডাক্তার এসে পৌঁছুলেন।

খুসিতে রেবার মুখ আরও সুন্দর দেখায়। দোতালা বাড়িটার সমস্ত ঘরগুলি, ঘরের সমস্ত আসবাব-পত্র সে ঘুরে ঘুরে দেখে। কখনো বা জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে বাইরের চলন্ত জনস্রোত, কখনো বা ফুলের টবগুলি হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। সরোজিনী পিছনে পিছনে আসেন আর মুচকি হাসেন। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে রেবা জিজ্ঞাসা করে, 'সমস্ত বাড়িটাই কি আমাদের মা? কোন ভাড়াটে এসে এখানে কোন দিন থাকবে না তো?'

সরোজিনী হেসে বলেন, 'তুমি যদি থাকতে দাও তো থাকতে পারে সমস্ত বাড়িই যখন তোমার।'

রেবা ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলে, 'নীচের তলায় অবশ্য কেউ এসে থাকতে পারে। না হলে বাড়িটা ভারি খালি খালি লাগবে।'

সরোজিনী সহাস্যে জবাব দেন, 'তা কি ক'রে হবে মা। গোটা নীচের তলাটাই যে অবিনাশের ষ্টুডিয়ো।'

রেবা আরও গম্ভীর হয়ে যায়, 'ঠিক, তাই তো।'

ওর মুখের ওপর থেকে সহজে চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে না সরোজিনীর। পাথর কেটে অবিনাশ যে সব মূর্তি গড়ে, তারই একখানা যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল ধরে এর জন্যই যেন সে এতকাল প্রতীক্ষা করছিল। দেশ-বিদেশে শুধু রূপ খুঁজেই বেড়িয়েছে অবিনাশ। কিন্তু কিছুতেই কোন মেয়েকে তার পছন্দ হয় নি।

সরোজিনী বলতেন, 'তোর কপালে আছে কালো কুশ্রী মেয়ে। অত বাছা-বাছির ফল কি কোনদিন ভালো হয়?'

শ্যামবাজারের এক অখ্যাত গলিতে মধ্যবিত্ত এক কেরাণীর ঘরে এমন রূপ যে এতদিন লুকিয়েছিল, তা অবিনাশের ছাড়া আর কার চোখে পড়বে,—সারাজীবন ধরে পৃথিবীতে যে কেবল রূপ খুঁজেছে আর সৃষ্টি করেছে।

অবিনাশের ষ্টুডিয়োতে ঢুকে রেবা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর

খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে, 'সত্যি, কি অদ্ভুত মানুষ তুমি। আমি কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি মোটে টেরই পেলে না।'

কি একটা অসমাপ্ত মূর্তির সামনে নিবিষ্ট মনে অবিনাশ কাজ ক'রে যাচ্ছিল, মৃদু হেসে ঘাড় ফিরাল, 'আগে থেকে টের পেলে অমন মিষ্টি হাসি কি শুনতে পেতাম ?'

হাসি বন্ধ করে রেবা জবাব দেয়, 'মা গো, কি অসভ্য তুমি। কিন্তু অসাধারণ ক্ষমতা তোমার। এত বড় আর এমন সুন্দর বাড়ি আমাদের বিজয় কাকাও করতে পারেন নি। তুমি যে এত বড়লোক, তা সত্যি আগে বিশ্বাস হয় নি।'

কেমন একটু ম্লান ছায়া পড়ে অবিনাশের মুখে, মৃদু হেসে বলে, 'তাই না কি ?'

জবাব না দিয়ে বড় বুদ্ধমূর্তিটার দিকে রেবা একবার তাকায়। আর অবিনাশ অপেক্ষমাণভাবে তাকিয়ে থাকে রেবার দিকে, নিশ্চয়ই সুন্দর কোন মন্তব্য এবার তার মুখ থেকে বেরুবে। কিন্তু ততক্ষণে জানালা দিয়ে রেবার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর।

'এই শোন, শিগগির এস, যদি দেখবে তো ছুটে এস শিগগির।'

রেবার কলকণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। অনন্যোপায় হয়ে অবিনাশকে উঠে আসতে হয়।

'কি ?'

রেবা বলে, 'দেখ ভিখারিটার দুটো পা-ই কাটা। তবু হামাগুড়ি দিয়ে কি ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে চেয়ে দেখ। পা নেই তবুও চলবে। যদি নিজেদের বাড়িতে থাকতুম, চেঁচিয়ে ওকে আমি ঠিক এদিকে ডেকে আনতুম। কিন্তু এখানে তা করতে গেলে লোকে নিন্দা করবে। কিন্তু যাই বলো ভারি অদ্ভুত লাগছে আমার। একটা পাও নেই তবু ওর চলা থামছে না।'

অবিনাশ এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থাকে, তারপর বলে, 'আর আমার তৈরি মূর্তিগুলোর দুটো ক'রে পা থাকা সত্ত্বেও এক পাও কেউ নড়ছে না, তাই নয় ? কিন্তু জানো রেবা নড়ে ওরা ঠিকই, কেবল সকলের তা চোখে পড়ে না। পুত্তলিকার চোখ আছে, দেখতে পায় না, আসলে তেমন পুতুলের সংখ্যা মানুষের মধ্যেই বেশী।'

মূঢ় দৃষ্টিতে রেবা স্বামীর দিকে তাকায়। কথার অর্থ সবটা না বুঝতে পারলেও ক্রোধের আভাসটা তার কাছে অস্পষ্ট থাকে না। অবিনাশ তার ওপর রাগ

করেছে, কিন্তু কেন? বড় বড় শিল্পীদের মেজাজ কি এই রকম? অবিনাশ যে তাকে পছন্দ করবে, একথা বাড়ির কেউ ধারণা করতে পারে নি। বাংলাদেশের নামকরা শিল্পী অবিনাশ। অনেক নামকরা সুন্দরীকে সে অপছন্দ করেছে। রেবাকে যে তার পছন্দ হয়ে গেছে এটা রেবার ভাগ্য আর শিল্পীর খেয়াল। বড়দার মুখে এই ধরনের ব্যাখ্যাই সে শুনেছে। মা বলেছিলেন, 'আর তো কোন দিক থেকে কোন আপত্তির কারণ নেই বিভূতি, তোদের মুখেই শুনছি বাংলা-দেশের ইনি একজন নাম করা লোক, অবস্থাও খুব ভালো। কিন্তু আমার রেবার তুলনায় বয়সটা একটু যেন বেশী মনে হয়, পঁয়ত্রিশ চল্লিশের কম কি হবে? আর—'

বাধা দিয়ে বিভূতি বলেছে, 'পুরুষের পক্ষে ও আবার একটা বয়স? সবাই তো আর তোমার বড় ছেলের মত নয় যে বাল্যকালেই বিয়ের পর্বটা শেষ ক'রে রাখবে। সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন করে তবে আজকালকার ছেলেরা বিয়ে করে। আর যে দিন কাল, তাতে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হ'তে লোকের অতটুকু বয়সের প্রয়োজন হয়। এ তো আর বাপ-দাদার আমলের সম্পত্তি পেয়ে বড়লোক হয় নি, কিংবা পাট-রসুনের কারবারে সিন্দুক ভরে নি, শিল্পের সেবা ক'রেছে। একদিক থেকে এসেছে যশ, আর একদিক থেকে অর্থ, শুধু মূর্তিকেই তো গড়েনি, নিজের প্রতিষ্ঠাকেও গড়ে তুলেছে। হ্যাঁ, আর কি আপত্তির কথা বলছিলে—'

সৌদামিনী ভয়ে ভয়ে বলেছেন, 'না না আমার আবার আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে। পাঁচুর মা বলছিল—ভদ্রলোকের চেহারাখানা দেখতে ঠিক ভদ্রলোকের ছেলের মত নয়। লক্ষ্মীপ্রতিমার মত রূপ আমার রেবার, তার বরের চেহারা যদি এমন হয়—পাঁচুর মা-ই বলছিল—'

বিভূতি কিছুক্ষণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর জবাব দিয়েছে, 'বাড়ির ঝিই বুঝি হয়ে উঠেছে তোমার পরামর্শদাতা। বেশ তো, সে-ই তোমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করুক। আমরা তো জানতুম পুরুষের রূপের প্রয়োজন হয় না। যশ আর ঐশ্বর্যই যথার্থ রূপ। 'কন্যা বরয়তে রূপম্,' কথাটা বুঝি কন্যার জবানী-তেই তুমি বললে? কিন্তু এক রূপ ছাড়া তোমার মেয়ের কি আছে বলো তো? ষোল-সতের বছর বয়স হয়েছে ভালো ক'রে বাংলা একখানা বই পর্যন্ত পড়তে পারে না। সংসারের কাজকর্ম কি জানে না জানে তুমিই জানো। চেষ্টা কি আমি কম করেছি, এই অভাব-অনটনের সংসারেও দিয়েছিলাম তো ভর্তি ক'রে। কিন্তু ফি বছরে ফেল। রূপের গরবেই অস্থির, আর পড়াশুনো।'

পাশের ঘর থেকে দাদা আর মায়ের কথোপকথন কান পেতে সব শুনেছে রেবা, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে; ভদ্রলোক এর চেয়েও যদি বুড়ো আর বিশ্রী চেহারার হোত তা হলেও তার সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় রেবার আপত্তি থাকত না। দাদার সংসারে আর এক মুহূর্তও তার থাকতে ইচ্ছা নেই।

অবিনাশ অপলকে ওর দিকে চেয়েছিল। বিষণ্ণ, চিন্তিত ভঙ্গীতে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে রেবাকে। এই ভঙ্গীর একটি মূর্তি গড়তে হবে ওর। অবিনাশ মনে মনে ঠিক করল।

কিন্তু মুহূর্ত খানেক মাত্র, তার পরেই রেবার ঠোঁটে আবার হাসি ফুটে উঠেছে।

'হাসছ যে?' অবিনাশ একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

হাসি চাপতে চাপতে রেবা বলল, 'ছোড়দার কথা মনে পড়ে গেল, দাদা হলে হবে কি, ভারি ফাজিল।'

'কেন, কি ফাজলামি করেছিলেন তিনি?'

হাসিতে রেবা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। 'তিনি? ছোড়দা হয়ে পড়ল 'তিনি'? আমার চেয়ে মাত্র দেড় বছরের বড়। আর সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে বলে তুমি তাকে তিনি বলবে?'

অবিনাশও হাসল, 'আচ্ছা তা না হয় না-ই বললুম, কিন্তু হাসছিলে কেন?'

'ছোড়দা কি বলছিল জানো? তুমি আমাকে বিয়ে করেছ মডেল করবে বলে। প্রত্যেক আর্টিষ্টেরই নাকি দু'একটি ক'রে মডেল থাকে। অর্ডার মাফিক ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিভাবে তাদের কর্তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কোমর বাঁকিয়ে, ছোড়দা তাই দেখাচ্ছিল। মাগো, এমন হাসাতে পারে ছোড়দা। আর যাই কর, আমাকে কিন্তু তোমার মডেল হ'তে বলো না, ছোড়দার ভঙ্গী আমার মনে পড়বে, আর হাসতে হাসতে আমি মারা পড়ব।'

অবিনাশের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে, 'আচ্ছা যাও, মারা তোমাকে পড়তে হবে না।'

দোরের বাইরে হঠাৎ চোখ পড়ে গেছে রেবার, 'কে, মণিরাম? দাঁড়াও, দাঁড়াও তোমাকে আমি একটা জিনিষ কিনতে দেব,' রেবা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়।

আসলে জিনিস কিন্‌তে দেওয়াটা ছল। মণিরামের বরিশালী ভাষা শুনতে এবং শুনে হাসতে ভালবাসে রেবা। তার মুখের ওপরই তার অনুকরণ করে। বাড়ির অন্য কেউ এমন করলে ভারি অসন্তুষ্ট হয় মণিরাম—কিন্তু রেবাকে দেখলে সে একেবারে খাস বরিশালের ভাষা আরম্ভ করে। রেবা যত বেশী হাসে, উচ্চারণের টান মণিরাম তত বাড়িয়ে দেয়। ঘরের ভিতর থেকে তা শুনে অবিনাশের মনে হয় বরিশালী ভাষা জানা না থাকলে রেবাকে হাসাবার জন্য বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গীর সঙ্গে নৃত্য পর্যন্ত করতে পারত মণিরাম, ওর মত লোকের মনেও রূপোপভোগের সাধ আছে। রূপ, কিন্তু এই মূঢ় ছেলেমানুষের রূপ দিয়ে কি করবে অবিনাশ? যার কেবল রূপই আছে, রূপবোধ নেই, রূপ-সৃষ্টির কোন কাজে যাকে লাগান যাবে না, তাকে দিয়ে কি হবে অবিনাশের?

যত দিন যায় বিরক্তি অবিনাশের তত বেড়ে ওঠে। রেবার চঞ্চল প্রাণবত্তা কিছুর মধ্যেই যেন ধরে রাখা যায় না। যত ব্যর্থ হয় অবিনাশ, তত তার ক্রোধ বাড়ে। ইতিমধ্যে অনেকবার চেষ্টা ক'রেছে রেবার মনে যাতে শিল্প-বোধ আসে, কিন্তু কোন লাভ হয়নি, এসব কথা তুললেই সে পালিয়ে যায়। কোন না কোন ছলে চলে যায় বাইরে। ইদানীং সযত্নে বরং সে অবিনাশকে পরিহার ক'রেই চলতে চায়।

নতুন একটি দেবমূর্তিতে হাত দিয়েছে অবিনাশ। ময়মনসিংহের কোন এক জমিদারের ষোড়শী কন্যা বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে। তাঁর মন যাতে প্রবোধ মানে, ধর্মভাব জাগে, তার আয়োজনের অন্ত নেই, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবার দেবমূর্তির প্রয়োজন। মদনমোহনের মনুষ্যপ্রমাণ মর্মরমূর্তি অবিনাশকে গড়ে দিতে হবে।

খানিক পরে সরোজিনী ঘরে ঢুকলেন। এইমাত্র পূজার ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। শ্বেত পাথরের রেকাবীতে দেবতার প্রসাদ। কয়েক খণ্ড শসা, আর দুটি নতুন গুড়ের সন্দেশ তাঁর নিজের হাতের তৈরী।

'হাত পাত অবিনাশ।'

কাজের সময় কারো বাধা অবিনাশ সহ্য করতে পারে না, ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে বিরক্তির স্বরে বলে 'কেন, হয়েছে কি?'

সরোজিনী প্রসন্ন হাসেন, 'কিছুই হয়নি, প্রসাদ নে।'

'ওঃ, মিছামিছি কেন বিরক্ত করতে আসো বলোতো? প্রসাদের আমার দরকার হয় না। তোমার মত পৌত্তলিক আমি নই, তাতো জানোই।'

সরোজিনী হাসেন, 'তুই-ই বা পৌত্তলিক কম কিসে! জীবন ভ'রে এত পুতুল আর কে গড়েছে?'

সরোজিনীর সস্নেহ ব্যবহারের স্নিগ্ধতায় নিজের আচরণের জন্য মনে মনে লজ্জাবোধ করে অবিনাশ। হাত বাড়িয়ে একখণ্ড শসা তুলে নিয়ে বলে, 'তা ঠিক। পাথর কেটে কেটে সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টাই কেবল করলুম, নিজের জীবনকে সুন্দর ক'রে গড়তে শিখলুম না।'

বাৎসল্য-স্নিগ্ধ কণ্ঠে সরোজিনী জবাব দেন, 'কেন, কার চেয়ে তুই কম? কিন্তু পরের মেয়ের সঙ্গে অমন রুক্ষ ব্যবহার করিসনে অবিনাশ। দেখিসনে মেয়েটা এ ক'মাসের মধ্যেই কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। ওর মুখ ভার দেখলে আমার ভালো লাগে না। ওর ম্লান বিষণ্ণ মুখ দেখলে আমার বুকের ভিতর যেন কেমন ক'রে ওঠে।'

অবিনাশ জবাব দেয়, 'কিন্তু সংসারে লোককে মাঝে মাঝে গম্ভীরও তো হ'তে হয় মা। মানুষের সেও এক রূপ। আচ্ছা, ওকে একবার পাঠিয়ে দিওতো এখানে।'

একটু পরে রেবা এসে উপস্থিত হয়, 'সত্যি ডেকেছ আমাকে?'

অবিনাশ বলে, 'কেন, তোমাকে কি আমি ডাকতে পারিনা। তুমিই তো আসতে চাও না এ ঘরে।'

'আসতে কি আর ইচ্ছে করে না আমার?'

'করে? কেন, বলতো?'

অর্থপূর্ণভাবে রেবা একটু হাসে, 'আহা, কিছু যেন বোঝেন না।'

বোঝে, অবিনাশ সবই বোঝে। অবিনাশের আদর চায় রেবা, তার কাছ থেকে হাল্কা গল্প-গুজব শুনতে রেবা ভালোবাসে, এ ঘরে আসে রেবা নিতান্ত অবিনাশের জন্যই; অবিনাশের সৃষ্টির দিকে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য কি আগ্রহ নেই রেবার, কিন্তু ও ধরনের দৈহিক আরাম তো যে কোন পুরুষই রেবাকে দিতে পারত। তার জন্য শিল্পী অবিনাশের কি প্রয়োজন ছিল। দেশ-দেশান্তর থেকে কত নরনারী অবিনাশের এই ষ্টুডিয়ো দেখতে এসেছে, দেখে মুগ্ধ হয়েছে, শুধু কোন মুগ্ধতা এলো না, বিস্ময় জাগলো না রেবার মনে, তার শিল্পকে তার সৃষ্টিকে একটুও ভালোবাসল না রেবা! স্বামীর খ্যাতি আছে, ঐশ্বর্য আছে এটুকুই সে বোঝে, তার সৃষ্টির প্রতিভাকে উপলব্ধি করবার মত বোধশক্তি রেবার নেই।

'আচ্ছা রেবা, ষ্টুডিও ভ'রে নানা রকমের এত যে মূর্তি, এর কোনটিই কি

তোমার মনে আনন্দ দিতে পারল না, এর কিছুই কি তোমার ভালো লাগে না. সত্যি বলো তো ?'

রেবা জবাব দেয়, 'বাঃ ! তোমার নিজের হাতে তৈরি জিনিষ, আর আমার ভালো লাগবে না ? সব আমার ভালো লাগে ?'

নৈরাশ্যের বিবর্ণ হাসি অবিনাশের ঠোঁটে কিছুক্ষণ লেগে থাকে।

ঝুলনের আগেই মূর্তি সম্পূর্ণ ক'রে পাঠিয়ে দিতে হবে। দিনরাত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে হয় অবিনাশকে। মূর্তি শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আশ্চর্য জমিদারের তরফ থেকে কোন খোঁজ-খবর নেই। অবশেষে দু'দিন পরে সহরের ম্যানেজার এসে উপস্থিত হলেন। অন্য কি কার্যোপলক্ষে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, যাওয়ার পথে হয়ে গেলেন অবিনাশের বাড়ি। অবিনাশ বলল, 'কি ব্যাপার ? মূর্তি কি নেওয়ার ইচ্ছা নেই আপনাদের ?'

ম্যানেজার বললেন, 'আমরা ভারি লজ্জিত মশাই, যার জন্য মূর্তির দরকার ছিল, তার আর প্রয়োজন নেই।'

ম্যানেজার গোঁফের তলায় মুচকি হেসে বললেন, 'সে সব বড় ঘরের বড় কথা আমাদের মুখে সাজে না।'

অবিনাশ মহাবিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

'বেশ, না সাজে না বলবেন। শুধু এইটুকু আমি শুনতে চাই, মূর্তিটি আপনারা নেবেন, না আর কাউকে বিক্রি ক'রে দেব ?'

ম্যানেজার বললেন, 'আহা শুনুনই না মশাই আগাগোড়া, তারপরে চটবেন।'

'বলুন।'

'বলব কি মশাই বড় ঘরের সব বড় বড় কথা। আমি কিন্তু আগে থাকতেই একটু একটু টের পেয়েছিলাম। পুরানো মন্দিরের ঠিক সংলগ্নই আমার বাসা কি না। আসতে যেতে সব আমার চোখে পড়ত। কর্তা আর গিন্নী অবশ্য বলাবলি করতেন—মল্লিকার ধর্মে ভারি মত হয়েছে, ঠাকুরের ওপর অচলা ভক্তি। আমি দেখতুম ঠাকুরের ওপরই বটে, তবে শালগ্রাম ঠাকুরের ওপর নয় পুরোহিত ঠাকুরের ওপর। বুড়ো বাপের বাতব্যাধি হওয়ায় যজমানী কাজে ছোকরাই আসত কি না।'

'তারপর ?'

'তারপর আর বলবার মত কথা নয়। নানা কেলেঙ্কারী ব্যাপার। এই দুর্ঘটনার পর থেকে মেয়ে, মন্দির, মদনমোহন, সব কিছুর ওপরই কর্তা ক্ষেপে গেছেন। কার ঘাড়ে দুটো মথো আছে যে মূর্তির কথা তাঁকে মনে করিয়ে দেয় ?'

ম্যানেজার আর একবার দেবমূর্তিটির দিকে তাকালেন। 'কিন্তু যাই বলুন মূর্তিটি ভারি চমৎকার হয়েছে আপনার। অবশ্য মুখে দেবভাবের কিছু অভাব আছে। যা হোক আমি তো আর জমিদার নই, তাঁর সামান্য কর্মচারী মাত্র, তাঁর মত অত টাকা তো আর আমি দিতে পারব না। শ'দুয়েক টাকার মধ্যে যদি দেন আমাকে, মূর্তিখানি আমি নিয়ে যাই।'

ক্রোধে বিকৃত হয়ে উঠল অবিনাশের মুখ। 'আজ্ঞে না ধন্যবাদ।'

পাশের ঘর থেকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রেবা সব শুনছিল আর সকৌ-তুকে হাসছিল, অবিনাশের কর্কশ কণ্ঠে চমকে উঠল। রাগলে যেন আরও বেশী কুশ্রী দেখায় অবিনাশের মুখ। আর তারই পাশে চোখে পড়ল মদনমোহনের মূর্তি, স্থির প্রসন্ন হাসি মুখটিতে অনুক্ষণ লেগে রয়েছে। সত্যিই ভারি সুন্দর হয়েছে তো মূর্তিখানা। মনে মনে কথাটা রেবা আবৃত্তি করলে।

ম্যানেজার বিদায় নিলে রেবা ছুটে এল ঘরে, 'এই শোন, মূর্তিটি কাউকে বিক্রি করতে পারবে না কিন্তু ওটি আমি নেব, ভারি চমৎকার হয়েছে।'

অবিনাশ শ্লেষের হাসি হাসল, 'ম্যানেজারের মুখ থেকে কথাটা মুখস্থ ক'রে নিয়েছ বুঝি।'

'বাঃ? তা কেন? সত্যি আমার ভারি ভালো লেগেছে।'

অবিনাশ বলল, 'তাই নাকি? আমার অসীম সৌভাগ্য। কিন্তু দু'দিনের মধ্যে হাজার টাকায় মূর্তিটি বিক্রি হয়ে যাবে দেখে নিয়ো।'

রেবা বলল, 'হাজার টাকা তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ো। গয়না বেচে শোধ দেব।'

সরোজিনী শুনে হাসলেন, 'কথা শোন মেয়ের। বেশ তো অবিনাশ। সখ হয়েছে বৌমার, রাখুক না। তোর ষ্টুডিয়োতেও তো কত মূর্তি তুই নিজে সখ ক'রে রেখেদিয়েছিস। আর খদ্দের যদি আসেই, তা হলে না হয় বিক্রি করে দিবি, তাতে কি।'

রেবা মনে মনে বলল, 'হুঁ দিলেই হোল আর কি। একবার ঠাকুর-ঘরে নিয়ে যেতে পারলে এ মূর্তি সেখান থেকে বার ক'রে আনবে সাধ্য কার। মা নিজেই আপত্তি করবেন তখন।'

অবিনাশ কি এক কাজে বাইরে গিয়েছে। সরোজিনী মেঝের ওপর শীতলপাটি বিছিয়ে চৈতন্য-চরিতামৃত পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছেন, সেই ফাঁকে মণিরামের সাহায্যে মূর্তিটি একেবারে ঠাকুরঘরে নিয়ে বসিয়ে রাখল রেবা।

একেই সকাল থেকে অবিনাশের মেজাজ খারাপ হয়ে আছে, তারপর তার বিনা অনুমতিতে রেবা এই কাণ্ড করেছে দেখে তার ধৈর্য একেবারে লোপ পেল। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করল রেবাকে, সরোজিনীকেও কসুর করল না, আর মণিরামকে ঘাড় ধরে বের করে দিল বাড়ি থেকে। রেবার চোখ ফেটে জল আসতে লাগল, আর সেই সঙ্গে বার বার মনে হ'তে লাগল রাগ করলে এত কুশ্রী দেখায় অবিনাশকে যে, তার দিকে একেবারেই চাওয়া যায় না।

সন্ধ্যার পর ক্রমেই অবশ্য মেজাজটা পড়ে এল অবিনাশের। পরিপাটি ভোজ-নের পর চিত্ত বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সত্যি, এত কাণ্ড না করলেও চলত। মনে মনে বেশ লজ্জিতই হোল অবিনাশ। বিছানায় শুয়ে চুরুট টানতে টানতে মনে মনে অবিনাশ প্রতিজ্ঞা করল, মূর্তিশিল্প আর না, এবার থেকে জীবন-শিল্পের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মার কাছে আগেই ক্ষমা চেয়েছে। রেবা এলে তার কাছেও মার্জনা ভিক্ষা ক'রে বলবে, 'মূর্তিটা তোমাকে দিয়ে দিলুম।' এতদিন পরে শিল্পবোধ জেগেছে তা হ'লে রেবার, শিল্পকে সে ভালবাসতে শিখেছে।

খাওয়া দাওয়া সেরে রেবা যখন ওপরে এল, অবিনাশের ততক্ষণে নাক ডাকা আরম্ভ করেছে। রেবা মুহূর্তকাল স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। এতদিন ভালো ক'রে চেয়ে দেখেনি। আজ মনে হোল, ঘুমুলেও বড় বিশ্রী দেখা যায় অবিনাশের মুখ। প্রৌঢ় মুখে রুক্ষতার ছাপ পড়েছে। স্থানে স্থানে কুঁচকে গেছে চামড়া। এত অসুন্দর তার স্বামী আর সত্যিই এত বুড়ো। নিশ্চয়ই বয়স পাঁচ সাত বছর তাদের কাছে কমিয়ে বলেছিল। পঁয়তাল্লিশের একটা দিনও কম হবে না কিছুতে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ ফিরিয়ে নিতেই দেয়ালের বড় আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছায়া ভেসে উঠল রেবার। সত্যিই এত সুন্দর সে দেখতে! অপলকে রেবা কিছুক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। আর উগ্র আনন্দে অপূর্ব হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। তার যৌবন, তার সৌন্দর্য অবিনাশের কুশ্রী ব্যবহারের একমাত্র প্রতিশোধ।

জানালার ফাঁক দিয়ে ঘুমন্ত সহরতলী চোখে পড়ে। নারিকেল গাছ-গুলোর মাথার ওপর গোল হয়ে উঠেছে চাঁদ। সমস্ত পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ভেসে গেছে। এখানে অবিনাশের কোন অস্তিত্ব নেই, তার কথা অনায়াসে বিস্মৃত হওয়া যায়।

অপূর্ব আনন্দে সমস্ত মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে রেবার। দেরাজ থেকে চাবি নিয়ে কাঁচের আলমারী খুলে একখানা স্কাই ব্লু শাড়ি সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিল রেবা। ড্রেসিং টেবিলের ওপর প্রসাধনের নানা টুকিটাকি আসবাব। কৌটো খুলে আঙু-লের ডগায় ক্রীম নিয়ে সস্নেহে নিজের সুগৌর কপোলে বুলিয়ে দিল। দেশী বিদেশী

নানা রঙের ফুলদানীগুলি সাজিয়ে রেখেছে। তার ভেতর থেকে বেলকুঁড়ির মালাটা তুলে নিয়ে ঘনবদ্ধ কবরীতে রেবা জড়াতে লাগল।

পাশের ঘর থেকে সরোজিনী এই সময় ডেকে বললেন, 'বউমা, ঘুমিয়েছ ?'

এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস রোধ ক'রে রাখল রেবা, তারপর কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল, 'না।'

সরোজিনী বললেন, 'ঠাকুরঘর বোধ হয় খোলা রেখে এসেছ। রাতে বিরাতে কিছু একটা ঘরে ঢুকবে, যাও বন্ধ ক'রে এসো।'

মদনমোহনের প্রসন্ন সুন্দর মুখ হঠাৎ রেবার চোখের ওপর ভেসে উঠল, স্নিগ্ধ-কণ্ঠে জবাব দিল, 'যাই মা।'

খানিক পরে ঘুম ভাঙল অবিনাশের। উজ্জ্বল আলোয় সমস্ত আসবাবপত্র সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বিছানা শূন্য, ঘরের কোথাও রেবা নেই। মনে মনে হেসে অবিনাশ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। নিশ্চয়ই রেবা কোথাও বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অভিমানে। আজ অবিনাশের মান-ভঞ্জনের পালা। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে বেরোল অবিনাশ। হঠাৎ পিছন থেকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে চমকে দেবে রেবাকে।

তেমনি নিঃশব্দ পায়ে বাড়ির সবগুলি ঘর দেখতে দেখতে রেবাকে খুঁজে বেড়াল অবিনাশ। কিন্তু কোথাও রেবার দেখা মিলল না। হঠাৎ অবিনাশের চোখে পড়ল সরোজিনীর পূজার ঘর থেকে নীলাভ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এত রাত্রে কে ওখানে ? রেবা কি শেষ পর্যন্ত ঠাকুর-ঘরে ঢুকেছে। অবিনাশ নিঃশব্দে এগিয়ে গেল।

ভেজান দরজাটা আস্তে ঠেলে দিল অবিনাশ, তারপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নরম নীল আলোয় সমস্ত কক্ষটি অপূর্ব রহস্যময় হয়ে উঠেছে। মদনমোহনের গলায় দুলছে বেলকুঁড়ির মালা। আর তার সামনে আর একটি মর্মরমূর্তির মত রেবা দাঁড়িয়ে। মাথার আঁচল খসে পড়েছে মাটিতে। হাতের মোমবাতি থেকে গলিত মোম ঝরে ঝরে পড়ছে সেই আঁচলের ওপর।

'রেবা।'

অবিনাশের কণ্ঠ করুণ আর্তনাদের মত কক্ষময় প্রতিধ্বনিত হোল। চমকে উঠে মুখ ফিরাল রেবা। লজ্জায় শঙ্কায় অপূর্ব সুন্দর দুটি চোখ।

মালঞ্চ

মেল স্টিমারটা ছেড়ে যাওয়ার পর ঘণ্টা খানেক যেতে না যেতেই নদীর অন্য দিক থেকে আর একটি সিটির শব্দ ভেসে এল। যেন খানিক দূরে একটা বাঘা কুকুর গর্জে উঠেছে।

স্টিমার ঘাটা থেকে কয়েক গজের মধ্যেই ছোট বড় খান চারেক শণের ঘরে অস্থায়ী সরকারী হাসপাতাল। আগে নাম ছিল এফ, আর, ই—ফ্যামিন রিলিফ এমারজেন্সী। দুর্ভিক্ষপীড়িত, মুমূর্ষু স্থানীয় নিম্ন-শ্রেণীর সব স্ত্রী-পুরুষদের এখানে আশ্রয় আর চিকিৎসা মিলত। আজকাল মাস কয়েক হল নামটা পাল্টে রাখা হয়েছে সুজনগঞ্জ এ জি, অর্থাৎ অক্‌সিলিয়ারী গবর্নমেণ্ট হসপিটাল। এতে মর্যাদাটা কিছু বাড়লেও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েই গেছে।

ফিমেল ওয়ার্ডে বিভূতি একটি ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালিরিয়ার রোগিনীকে পরীক্ষা করছিল। পাশে দাঁড়িয়েছিল স্টাফ নার্স মালঞ্চ। সিটি শুনে সে কান খাড়া করল তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ব্যাপার কি ডাক্তারবাবু।'

বিভূতি একবার চোখ তুলে তার দিকে তাকাল, বলল, 'বোধহয় সিভিল সার্জন। তাঁর লঞ্চের এই রকম শব্দ শুনেছি।'

মালঞ্চ বলল, 'সিভিল সার্জন; তাহলে আপনি এক্ষুনি ঘাটে যান ডাক্তারবাবু।'

বিভূতি ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, 'আমি কখন কি করব না করব সে কি তোমাকে বলে দিতে হবে নার্স ?'

মালঞ্চ মুখ ম্লান ক'রে বলল, 'আজ্ঞে না, আমার অন্যায় হয়েছে।'

বিভূতি অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বলল, 'ডাক্তার নার্সের কাছে রোগীই সবচেয়ে বড়।'

এবার সেই কুকুরকণ্ঠী হর্ন আরও স্পষ্ট এবং আরও উচ্চতর হয়ে উঠল। সিভিল সার্জেনের মোটরলঞ্চ নিশ্চয়ই ঘাটের খুব কাছে এসে পড়েছে।

বিভূতি উঠে দাঁড়াল।

মালঞ্চ বলল, 'আচ্ছা ডাক্তার বাবু—।'

বিভূতি ফিরে তাকাল, 'বলো।'

মালঞ্চ একটু ইতস্তত করে বলল, 'আওয়াজটা কি সত্যিই হর্নের না ডাক্তার সাহেবের পোষা কুকুরের।'

বিভূতি সকৌতুকে হাসল। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হবে মালঞ্চের। কিন্তু এখনো ছেলেমানুষি কৌতুহল তার যায়নি। ওদের মত প্রাকৃত জনের বোধ হয় কোন বয়সেই যায় না।

বিভূতি হেসে বলল, 'তোমার কি মনে হয়।'

মালঞ্চ বলল, 'আমার মনে হয় কি জানেন। সার্জেন সাহেবের কুকুরও ডাকে, হর্নও বাজে। অনেক দূর থেকে পাছে তাঁর কুকুরের ডাক শোনা না যায় তাই হর্নের শব্দটা কুকুরের মত করে নিয়েছেন। কুকুর নিশ্চয়ই খুব ভালোবাসেন ডাক্তার সাহেব।'

বিভূতি বলল, 'তা বোধ হয় বাসেন। তোমরা সব ঠিকঠাক থেকো। সিভিল সার্জন হয়তো এখনই আসতে পারেন।'

ফিকে হলদে রঙের মাঝারি আকারের লঞ্চখানা ততক্ষণে ঘাটে এসে ভিড়েছে। খালাসীরা বড় বড় দুটো তক্তা নামিয়ে দিয়েছে মাটিতে। ধ'রে নামবার জন্য বাঁশের সরু লগি দুটি খুঁটো পুঁতে তারা বেঁধে দিতে যাচ্ছিল, নন্দী সাহেব ভিতর থেকে বারণ করলেন, 'দরকার নেই।' তারপর লঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

চল্লিশের দু'এক বছর ওদিকেই হবে বয়স। গৌরবর্ণ দীর্ঘ চেহারা, নিখুঁত সাহেবী বেশে তাঁকে চমৎকার মানিয়েছে।

সেলামে নমস্কারে যে সব অভিবাদন আসছিল স্মিতহাস্যে তার প্রত্যেকটির যথাযোগ্য অভিবাদন জানালেন নন্দী সাহেব। তারপর সেই তক্তার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন পারে।

থানার ইনস্পেক্টার, কোর্টের মুন্সেফ, উকিল, ডাক্তার, স্থানীয় বণিক সমিতির প্রেসিডেণ্ট সেক্রেটারী—ছোট সহরের বড় বড় নাগরিকেরা অভ্যর্থনার জন্য মুহূর্তের মধ্যে সব এসে উপস্থিত হয়েছেন। সহকারী দেবেশের সঙ্গে হাসপাতালের ইনচার্জ বিভূতিকেও দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে।

মুন্সেফবাবুই এগিয়ে এলেন প্রথমে, 'এমন ব্যাকওয়ার্ড জায়গা! কোন রকম যানবাহনের ব্যবস্থাই নেই। একটা সাইকেল রিক্সা পর্যন্ত এখানে মেলে না স্যার।'

নন্দী সাহেব হাসলেন, 'এই ছটাকখানেক জায়গায় যানবাহন আপনি

চালাবেন কোথায় মুন্সেফবাবু। ওসবের জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। কিছু কাল যাবৎ প্রায় জলচর হয়ে পড়লেও পায়ের ব্যবহার এখনো ভুলিনি।'

বিভূতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তারপর বিভূতিবাবু, খবর সব ভালো? আপনার হাসপাতাল চলছে তো ঠিকমত?'

বিভূতি বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।'

নন্দী সাহেব বললেন, 'বেশ তাহলে চলুন আগে হাসপাতালটাই দেখে আসা যাক আপনাদের। সামনের ঐ শণের ঘরগুলোই তো!'

পরিদর্শনটা কিছু অতর্কিত এবং বিনা বিজ্ঞাপিত।

বিভূতি বলল, 'আসুন।'

আর সবাইকে বিদায় দিলেন সিভিল সার্জন, বললেন, 'আপনাদের আর কষ্ট দেব না। তারপর বিভূতিকে বললেন, 'চলুন।'

তিন চারখানা ছোট ছোট ঘর আর একখানা বড় আটচালায় জেনারেল ওয়ার্ড, বাঁশের বাখারির বেড়ায় পাঁচ ছ'টি খোপে ভাগ করা হয়েছে। কোনটিতে আউটডোরের রোগীদের দেখা হয়। কোনটি সুপারিনটেণ্ডেণ্টের খাস কামরা।

আসবাবপত্রের নামগুলি ইংরাজী কিন্তু জিনিষগুলির অধিকাংশই একেবারে খাঁটী স্থানীয় সংস্করণ। মুলি বাঁশের বাঁখারি বেঁধে তৈরী করা হয়েছে মশারির স্ট্যাণ্ড। ডোরাকাটা জোলাকী থান কাপড়ের ছোট ছোট উটমুখো সব মশারি। বাঁশের আর বাজে কাঠের তৈরী স্থানীয় ছুতারের গড়া টেবিল। সবগুলি পা ঠিক সমানভাবে দাঁড়ায় না। সিভিল সার্জন দেখেন আব মুখ মুচকে হাসেন। নার্স'রা এরই মধ্যে হঠাৎ ভারি ব্যস্ত এবং কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে। নন্দী সাহেব সকৌতুকে একবার তাদের দিকে তাকালেন। অল্প বয়সী, আধা বয়সী নিম্ন শ্রেণীর সব স্ত্রীলোক। রঙ প্রায় প্রত্যেকটিরই ঘন কালো। হাত পায়ের গড়নে কি মুখে চোখে তেমন কোনো শ্রী ছাঁদ নেই। বরং অশিক্ষার একটা পুরু ছাপ আছে।

নন্দী সাহেব বিভূতিকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এসব আমদানী করলেন কোত্থেকে। একেবারে ফরমায়েস দেওয়া মনে হচ্ছে।'

বিভূতি বলল, 'এখানকারই সব নমঃশূদ্র আর চাষী কৈবর্তদের মেয়ে। লোকাল রিক্রুটমেণ্টে সরকারের খরচও কম পড়ে আর এসব দুঃস্থ পরিবারেরও কিছুটা সুরাহা হয়।'

নন্দী সাহেব বললেন, 'তা তো হয়, কিন্তু নার্সিং কি ঠিকমত ওদের দিয়ে চলে? ওদের হাতে ওষুধপথ্য খেতে রোগীদের কি প্রবৃত্তি হয়?'

বিভূতি বলল, 'প্রবৃত্তি হবে না কেন স্যার। ওদের মা বোনের মুখ হাতওতো ওই রকমই। আর নার্সিং সম্বন্ধে মোটামুটি আমি শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছি। এখনো সপ্তাহে দু'তিনদিন আমি ওদের ক্লাস নিই, আমার স্ত্রীও ওদের মোটামুটি সাধারণ লেখা-পড়াটা শিখাবার চেষ্টা করছেন।'

নন্দী সাহেব বললেন, 'বটে, তাহলে আপনারা দু'জনে মিলে ওদের একেবারে মানুষ না করে ছাড়বেন না দেখছি।'

তারপর নন্দী সাহেব মাঝ বয়সী একটি নার্সকে হাতের ইসারায় ডেকে আনলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম কি তোমার?'

নার্সটি কম্পিত গলায় জবাব দিল, 'হরিদাসী।'

'ডিউটিতে আসবার সময় দাঁতে মিশি দিতে হয় না একথা ডাক্তারবাবুরা তোমাদের বলে দেননি?'

সহকারী দেবেশ বলল, 'অন্ততপক্ষে হাজার বার বলেছি স্যার—'

'হাজার বার বলার পরেও যখন এই অবস্থা তখন উপযুক্ত স্টেপ নেননি কেন?' নন্দী সাহেব বিভূতির দিকে তাকালেন।

বিভূতি বলল, 'আজ্ঞে ক্রমে ক্রমে এসব অভ্যাস ছাড়াবার চেষ্টা করছি। কজন ছেড়েও দিয়েছে। জনকয়েক কেবল এখনও পারেনি। মিশি ব্যবহার না করলে নাকি ওদের মাথা ঘোরে, বমি হয়, কিছুতেই ভালো করে ডিউটি দিতে পারে না।'

নন্দী সাহেব ভ্রূকুটি করলেন, 'হুঁ, আমি তা'হলে ঠিকই শুনেছিলাম, ওরা কিছু বেশি Indulgence-ই পাচ্ছে।'

বিভূতি প্রতিবাদ করে বলল, 'না স্যার, আপনি ভুল শুনেছেন, এদের নিয়ে যে কষ্টে—'

নন্দী সাহেব গূঢ় ব্যঞ্জনায় হাসলেন, 'আমরাও তাই ঠিক করেছি। এত কষ্টের আর কোন মানে হয় না আপনাদের।'

এরপর আরো দু'একটি ওয়ার্ড পরিদর্শন করলেন নন্দী সাহেব। সর্ব্বত্রই তিনি খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলেন। কোথাও রোগীদের ওষুধপথ্য ঠিকমত খাওয়ানো হচ্ছে না, কোথাও মশারি যেমন তেমনভাবে টাঙানো হয়েছে, ভিতর দিয়ে মশা যাচ্ছে, কোন কোন রোগীর বিছানাপত্র অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। নন্দী সাহেবের মুখ ক্রমেই গম্ভীর এবং অপ্রসন্ন হয়ে উঠতে লাগল।

ফিমেল ওয়ার্ডে মালঞ্চ অন্য সব নার্সদের কাজকর্ম দেখিয়ে দিয়ে একটা বাঁশের

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে পেনসিল দিয়ে খাতায় কি টুকে নিচ্ছিল। লেখার দ্রুততায় হালকা টেবিলটা কাঁপছিল ঠক ঠক করে। নন্দী সাহেব এসে ঘরে ঢুকলেন। তাড়াতাড়ি খাতা পেনসিল রেখে নমস্কার জানাল মালঞ্চ।

নন্দী সাহেব পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন একবার। এতক্ষণ পরে এই একটি মাত্র নার্স তার চোখে পড়ল যার দিকে চাইলে চোখ পীড়িত না হয়ে প্রসন্ন হয়। রঙ এর কালো পাথরের মত কিন্তু নাক চোখ যেন কোন নিপুণ হাতে পাথর কুঁদে বার করা। নন্দী সাহেব বিভূতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটি কে?'

বিভূতি বলল, 'মালঞ্চ। আমাদের স্টাফ নার্স।'

নন্দী সাহেব বললেন, 'এও কি –'

বিভূতি ইংরাজীতে জবাব দিল 'হ্যাঁ, এও ঐ চাষী কৈবর্তের মেয়ে। তবে ওদের বংশে কিছু লেখাপড়ার চর্চা ছিল। তা ছাড়া মেয়েটি বেশ চালাক চতুরও।'

নন্দী সাহেব মৃদু হাসলেন, 'হ্যাঁ, সেটা মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

বিভূতি বলল, 'তাছাড়া পড়াশুনোয় অমনিতেও খুব ঝোঁক। আমার স্ত্রীর কাছে নিয়মিত একবার করে যায় পড়া দেখিয়ে নিতে।'

নন্দী সাহেব আবার একটু মৃদু হাসলেন, 'Publicity-র জন্য আপনি তাঁর কাছ থেকে কত পান বিভূতিবাবু?'

বিভূতি বলল, 'কার কাছ থেকে?

নন্দী সাহেব বললেন, 'I mean your wife'

সহকারী দেবেশ এমন কি নার্সরাও হাসি গোপনের চেষ্টা করল, ডাক্তারী শব্দ ছাড়াও এ ধরনের দু'একটা ইংরাজী কথা এরা বুঝতে শিখেছে এবং দেশীয় রীতিতে বিদেশীয় শব্দগুলির নির্ভুল উচচারণও আয়ত্ত করে ফেলেছে।

এরপর মালঞ্চকে নার্সিং সংক্রান্ত দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন নন্দী সাহেব। দু'একটি রোগীকে এক আধটু পরীক্ষা করলেন। সেই ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার কেসটি ছাড়া কঠিন কোন কেস নেই বললেই চলে। সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশা আর দু'একটা টাইফয়েড রোগীছাড়া অন্যান্য রোগীর সংখ্যা খুব বেশি নয় বর্তমানে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে নন্দী সাহেব ফের লঞ্চের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'খাতাপত্র আমার লঞ্চেই পাঠিয়ে দেবেন বিভূতিবাবু, সেখানেই দেখব।

আর কাল ভোরে দেবেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন আমার লঞ্চে। কথাবার্তা বলা যাবে।'

আমন্ত্রণ এল অনেকের কাছ থেকেই, মুনসেফবাবু, দারোগাবাবু, বিভূতি স্বয়ং, প্রত্যেকেই নন্দী সাহেবকে নিজের বাসায় নেওয়ার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি সবাইকেই স্মিত হাস্যে ফিরিয়ে দিলেন, কাল তিনি সবাইর অনুরোধই রাখবেন। এসেছেন যখন, জায়গাটা একটু ঘুরেটুরে দেখবার তাঁর নিজেরই খুব ইচ্ছা আছে। কিন্তু আজ নয়। আজ তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত। রাতটুকু তাঁর বিশ্রা-মের দরকার। খাওয়া দাওয়া? চাকর আর বাবুর্চিরাই সে ব্যবস্থা করবে। সেজন্য কাউকে ভাবতে হবে না, তবে তাঁরা যেন ফর্দমাফিক বাজারের ব্যবস্থাটা করে দেন। তাঁর চাকরের পক্ষে হয়তো অসুবিধা হবে। জায়গাটা তার পক্ষে নতুন।

যদিও বিশেষ কিছু নয়, ঘি, ডিম, গোলআলু, গোটাতিনেক মুরগী, সরু চাল এমনি আরও কয়েকটি নিতান্ত সাধারণ খাদ্যবস্তু। রাতের মত এতেই চলবে। কিন্তু এখানে রাত্রে বাজার মেলে না, হাটবার ছাড়া সন্ধ্যার পর সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। তবু দোকানে যারা ঘুমায় তাদের ডাকাডাকি করে ঝাঁপ খুলিয়ে কিছু কিছু জিনিষ সংগ্রহ করল বিভূতি আর দেবেশ। কিন্তু মুরগীও মিলল না ডিমও মিলল না।

সিভিল সার্জনের চাকর বলল, 'কিন্তু ওসব ছাড়া তো সাহেবের একবেলাও চলে না, অন্তত দুটোর একটা তো চাই-ই।'

বিভূতি বলল, 'আচ্ছা তোমরা যাও, জিনিসগুলি যেভাবেই হোক জোগাড় করে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

নন্দী সাহেবের মন্তব্যগুলির কথা ভেবে রাত্রে শুয়ে শুয়ে বিভূতি মনে মনে হাসল। সবরকম দৈন্য, সব মালিন্যই দূর করতে জানে বিভূতি। কেবল ঠিকমত সময়ের অপেক্ষায় আছে। মহৎ কাজের জন্য ধৈর্যের দরকার, সহিষ্ণুতার দরকার। রূঢ় কথায় চোখ রাঙিয়ে রাতারাতি মানুষকে যেটুকু শোধরান যায় তা পরের রাত পর্যন্ত টেকে না—এইই বিভূতির বিশ্বাস। যে কোন কাজকর্মে, কিংবা যে কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজের অত্যন্ত মন্থরতাকে এমনি করেই বিভূতি সমর্থন করে। খুব বেশী রাগ বিভূতি কারো ওপরই করতে পারে না। তাই রাগ

করাটাকে অশোভন অসুন্দর অভদ্রোচিত বলে ভাবে। ফলে মনকে সে যতই নির্মল রাখুক—চারদিকে মালিন্য জমতে দেরী হয় না। যে কাজের ভার সে নেয় সে কাজে গলদ দেখা যায়। অধস্তন যাদের ওপর সে নির্ভর করে তারা তাকে ভয় করে না। বিভূতি বলে, 'ভয় না করুক তারা আমাকে ভালো তো বাসে।'

তা অবশ্য বাসে। কিন্তু আড়ালে গিয়ে মুখ টিপে টিপে তারা আবার হাসেও।

ডিম আর মুরগীর ভেট যথাসময়েই পাঠান হোল। তবু পরদিন ভোরে লঞ্চে বিভূতিকে ডেকে সিভিল সার্জন একে একে নানারকম অভিযোগের কথা শোনালেন। বিভূতির পরিচালনায় হাসপাতালে ভয়ঙ্কর অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আসবাবপত্র উধাও হচ্ছে। কাছাকাছি গ্রামগুলিতে নিম্নশ্রেণীর বউ-ঝিরা যে সব খাটো খাটো ডুরে শাড়ি পরে রয়েছে তার অধিকাংশই নাকি হাসপাতালের মশারি থেকে তৈরী। রোগীদের চিকিৎসা এবং সেবাযত্ন আশানুরূপ হচ্ছে না কারণ সরকারী ওষুধ লোক বুঝে সহরের ঘরে ঘরে বিক্রি এবং উপহৃত হচ্ছে আর নার্সরা সুস্থ মানুষদের নিয়ে এত ব্যস্ত রয়েছে যে, অসুস্থদের ওপর মনোযোগ দেওয়ার সময় করে উঠতে পারছে না।

বিভূতি শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'কিন্তু এসব কি আপনি বিশ্বাস্য বলে মনে করেন?' সিভিল সার্জন একটু হাসলেন, 'আমার বিশ্বাস করা না করার কথা তো হচ্ছে না, বিভূতিবাবু। অভিযোগগুলি এখানকার হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। আর হাসপাতালে যে কিছুটা সুবন্দোবস্তের অভাব ঘটেছে তা তো নিজের চোখেই দেখলাম।' বিভূতি এবারেও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'বেশ, হাসপাতালের চার্জ তাহলে আর কারো ওপরে দিন।'

সিভিল সার্জন আবার প্রশান্তভাবে একটু হাসলেন। 'এ আপনার রাগের কথা, অভিমানের কথা বিভূতিবাবু।'

তাঁর কথা বলবার মধুর ভঙ্গি দেখে মনে করা শক্ত যে তিনি বিভূতির ওপর-ওয়ালা হর্তাকর্তা, কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ এইমাত্র তিনি বিভূতির বিরুদ্ধে উপস্থিত করেছেন।

সিভিল সার্জন আবার বললেন, 'চার্জ নেওয়ার মত আপনার চেয়ে যোগ্যতর লোক যে এখানে নেই তা আমরা জানি। অন্য লোককে চার্জ দিলেই কি এখানকার হাওয়া ফিরবে আপনি ভাবেন। তা নয়, সমস্যার সমাধান ওভাবে হবে না। হাসপাতালটাই এখান থেকে আমরা তুলে নিতে চাইছি।'

'তুলে নেবেন।' মৃদু আর্তনাদের মত শোনাল বিভূতির গলা।

সিভিল সার্জন একটু যেন বিস্মিত হলেন, বললেন, 'হ্যাঁ। এখানে গভর্ণমেণ্টের খরচ পোষাচ্ছে না সেই হচ্ছে আসল কারণ বুঝছেন? অবশ্য একেবারে abolish করা হবে না; Subdivisional town এর সঙ্গে এটা amalgamated হয়ে যাবে। এখানকার কিছু staff সেখানে transfer করলেই চলবে। আপনি সেখানে কিংবা আমাদের অন্য কোন হাসপাতালে যেতে পারেন। Qualified man ইচ্ছা করলে ফের private practice করতে পারেন আপনি। শুনেছি এতকাল তো তাই করছিলেন।' সিভিলসার্জন একটু হাসলেন।

শেষ কথাটি বিভূতির কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। বিভূতি বলল, 'কিন্তু এখানকার লোক তো যথেষ্ট suffer করবে। কাছে ধারে কোন রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, ভালো কোন ডাক্তার কবিরাজ নেই, আর থাকলেও পয়সা দিয়ে ওষুধ কিনে খাবার ক্ষমতা ওদের মধ্যে ক'জনের আছে। এই হাসপাতাল খোলায় ফলে স্থানীয় অনেক স্ত্রী-পুরুষকে provide করা হয়েছিল। এই দুর্দিনে তারা হঠাৎ বেকার হয়ে পড়বে। এখানকার কয়েকটি নার্সের আয়ে মা বাপ ভাই বোন, ভাইপো, ভাইঝির এক একটা বড় বড় সংসার চলছে—আমি খোঁজ নিয়েছি। হঠাৎ এরা বেকার হয়ে পড়লে সেই সব family-র দুর্দশার শেষ থাকবে না। কথাটা একবার দয়া করে ভেবে দেখুন।'

নন্দী সাহেব বললেন, 'সবই তো বুঝি বিভূতিবাবু। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখায় কিছু কি এসে যায়? ভেবে আমরা কিছুই দেখতে পাই না, যা দেখি তাতে আবার ভাববার ক্ষমতা থাকে না। বাংলা দেশে সুজনগঞ্জ কি একটা? ভেবে আপনি কি করতে পারেন বলুন।'

না, অন্ততঃ এই সিভিল সার্জনের কাছে সে যে কিছু করে উঠতে পারবে না সে সম্বন্ধে বিভূতি প্রায় নিঃসংশয় হয়েছে। ক্ষুব্ধ উদ্বিগ্ন মনে বিভূতি বাসার দিকে চলল।

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে মালঞ্চ তরকারী কুটে দিচ্ছিল। এরকম টুকটাক কাজ অন্যান্য নার্সরা তো করেই, মালঞ্চ নিজেও এসে একএক দিন হাত দেয়। আজ কিন্তু মীনা নিষেধ করেছিল, 'দরকার নেই তোমার তরকারী কোটায়। আমি একাই করে নিতে পারব। তোমাদের সিভিল সার্জন এসেছেন। হাসপাতালে তোমাকে দেখতে না পেয়ে খুঁজে খুঁজে হয়তো এখানেই এসে পড়বেন। তার চেয়ে যার যার কাজকর্ম করো গিয়ে সে-ই ভালো।'

মালঞ্চ জবাব দিয়েছিল, 'কাজকর্ম মানে তো সেই রোগী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি তা

কি আর সব সময় ভালো লাগে দিদিমণি? আমরাও গেরস্ত ঘরের মেয়ে। তাছাড়া আমার ডিউটি সেরে আমি এসেছি, আপনি ভাববেন না।' তারপর একটু থেমে মৃদু হেসে মালঞ্চ বলেছিল, 'আর আমাকে খুঁজে খুঁজে ডাক্তার সাহেব যদি এখানে এসেই পড়েন তাতে তাঁর লাভ বই লোকসান হবে না।'

শাসনের ভঙ্গিতে মীনা ভ্রূ কুঁচকালো। ঠোঁট দুটি উঠল শক্ত হয়ে। বলল, 'কি সব বাজে বকছ মালঞ্চ।'

ধমক খেয়ে মালঞ্চের ঠোঁট ঠিক শক্ত নয়, যেন একটু স্ফীত হ'তে চাইল। নীচু হয়ে তাড়াতাড়ি তরকারী কোটায় মন দিল মালঞ্চ। এদের কাছে মান অভিমানের কোন দাম নেই। এরা এক মুহূর্তে যতটুকু কাছে টানে পরের মুহূর্তে তার চেয়ে অনেক বেশী ঠেলে দূরে। দিদিমণিও তাই ডাক্তারবাবুও তাই। তবু দূরে সরে থাকতে পারে না মালঞ্চ। তাকে ফিরে ফিরে আসতেই হয়। এদের গায়ের গন্ধটুকুও যেন তাকে আকর্ষণ করে, ঘরের হাওয়া টানে মনকে। মালঞ্চের চোখে ভালো লাগে মীনার শাড়িপরার বিশেষ ধরন, চুল বাঁধবার ছাঁদ, তার রান্না করতে করতে ছেলে পড়ানো। মালঞ্চের চোখে ভালো লাগে কথায় কথায় ডাক্তারবাবুর অন্যমনস্ক হয়ে পড়া, ঘর-সংসারের সম্বন্ধে গভীর ঔদাসিন্য, হাস-পাতালের কাজে, রোগের চিকিৎসায় একেবারে মগ্ন হয়ে যাওয়া। তখন ভারি অদ্ভুত দেখায় ডাক্তারবাবুকে। যেন এক রহস্যময় দামী মার্বেল পাথরের মূর্তি। তার চারিদিকটা নিষেধের বেড়ায় ঘেরা। তবু সেই বেড়া ডিঙাতে লোভ হয়, ইচ্ছা হয় তাকে একবার ছুঁয়ে দেখতে; যত ভয়, যত সংশয়, যত শাসনই থাক না কেন। এমনি একটি মূর্তি দেখেছিল সেবারে মালঞ্চ কাঞ্চনপুরের জমিদার বাড়িতে যাত্রা শুনতে গিয়ে। সে মূর্তিকে ছুঁয়ে দেখতে পারেনি, কিন্তু যন্ত্রপাতি, সাবান, তোয়ালে এগিয়ে দিতে গিয়ে এ মূর্তিকে তো কতবার কত ছলে ছুঁয়েছে। কিন্তু একজনের ছোঁয়ায় লাভ কি ছোঁয়াছুঁয়ি যদি না হয়? আঙুলের ছোঁয়া কি পৌঁছায় পাথরের মধ্যে।

বিভূতির গলার আওয়াজে মালঞ্চের চমক ভাঙল। 'রান্নাবান্না তোমার হোল মীনা? একবার এঘরে এসতো একটু।'

হাতের কাজ ফেলে মীনা চলে গেল ওঘরে আর বঁটিতে বেগুন ঠেকিয়ে মালঞ্চ রইল উৎকর্ণ হয়ে। স্বামীস্ত্রীর কথাবার্তার যতটুকু কানে গেল তাতে আসল ব্যাপারটা বুঝতে তার বাকি রইল না। সরকারি হাসপাতালটা উঠে যাচ্ছে এখান থেকে, আর সেই জন্যই সিভিল সার্জন সাহেব এবার এসেছেন। ধক করে

উঠল মালঞ্চের বুকের মধ্যে। প্রথম প্রথম কতদিন এই হাসপাতালের ঘরগুলি নিজের হাতে ঝাঁট দিয়েছে মালঞ্চ, ন্যাতা দিয়ে নিকিয়েছে সযত্নে; নিজের বাড়ির লোকের মত রোগীদের সেবা করেছে তাদের নোংরা অপরিচ্ছন্ন বিছানা পরিষ্কার করেছে আপন হাতে। সেই হাসপাতাল এখান থেকে মুখের কথায় তুলে নিচ্ছে তারা; একটু দয়ামায়া নেই শরীরে; একটু বিচার বিবেচনা নেই মনে। মীনার শেষ কথাটি কানে গেল মালঞ্চের। 'অবশ্য শেষের দিকটায় ইদানীং আমরা এখানে বেশ আরাম আর শান্তিতেই ছিলাম। তবু হাসপাতাল যদি ওরা নাই রাখে না রাখবে, অত ভাবছ কেন তুমি, কোথাও না কোথাও তোমাকে ওরা বদলি তো করবেই, আর তাও যদি না হয় তাতেই বা কি। হাসপাতালের বাইরেও তো রোগীপত্তর আছে আর তোমার বিদ্যাও কেউ কেড়ে নেয়নি।'

ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠল মালঞ্চ। ঠিকই বলেছে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী। ওরা যতই এখানকার লোকের সঙ্গে মিশুক আপন বলে ভাবুক আর আপন বলুক তাদের, এরা যে পর সেই পর। বিদেশী মানুষ, চাকরী করতে এসেছে। এখানকার চাকরী গেলে অন্য কোথাও গিয়ে চাকরী খুঁজবে। হাসপাতালের ভালোমন্দে ওদের কি এসে যায়। এখানকার লোকের মত ওদের তত বাজবে কেন। বিভূতির বিরুদ্ধেও অকস্মাৎ অভিমান আর আক্রোশে পূর্ণ হয়ে উঠল মালঞ্চের মন। ডাক্তারবাবু তাদের কেউ নন। মিথ্যাই সে তাঁকে এতদিন আপন মনে করে এসেছে, দেবতা মনে ক'রে এসেছে।

তরকারী কোটা ফেলে রেখে মালঞ্চ বেড়িয়ে এল বিভূতির বাড়ী থেকে। এল হাসপাতালে। নার্সদের বলল, রোগীদের বলল, মেথর ঝাড়ুদার কাউকে জানাতেই বাকি রাখল না যে, এখানকার হাসপাতাল সরকার তুলে নিচ্ছেন। রাত পোহাতে না পোহাতে এতগুলি মেয়েপুরুষের মুখ থেকে অন্ন চলে যাবে, এতগুলি রোগীর মুখে ওষুধ পড়বে না।

নার্সরা ঘিরে ধরল, ছোটরা বলল, 'উপায় কি দিদি।' বড়রা পরামর্শ দিল 'উপায় একটা কিছু বার করতেই হবে মালঞ্চ। আয় সবাই মিলে ডাক্তারবাবুকে ধরি।'

আগুনের মত জ্বলে উঠল মালঞ্চ, জবাব দিল, 'ছাই করবে ডাক্তারবাবু।'

ছোট বড় সবাই শিউরে উঠল, 'ছিছি, মালঞ্চ দেবতাকে কি এমন হেলা তুচ্ছ করতে আছে। কত করেছেন তিনি এই হাসপাতালের জন্য।'

মালঞ্চ বলল, 'ছাই করেছেন। দেবতা, দেবতা না ঘোড়ার ডিম। দেবতা

হ'লে কি সাহেবের সামনে অমন ভিজে বেড়ালের মত থাকে। দেবতারা কি সাহেবের ভয়ে বউয়ের আঁচলের তলায় গিয়ে লুকোয়?'

পদ্মা মালঞ্চের সখী আর সহকারিণী। মালঞ্চের সঙ্গে হাসি তামাসায় সাহস সেই যা কিছু রাখে। মালঞ্চকে গোপনে ডেকে পদ্মা তার কানে কানে বলল, 'এবার রাগের কারণটা কিন্তু তোর বুঝতে পারছি ভাই।'

মালঞ্চ বলল, 'কি রকম?'

পদ্মা ফিস ফিস ক'রে বলল, 'লুকোলেনই যদি তোর আঁচল ছেড়ে বউয়ের আঁচলের তলায় কেন গেলেন, এই তো তোর দুঃখ? কিন্তু মিথ্যেই তুই রাগ করছিস। লুকোবার মত আঁচল তোর কই, ওই এ্যাপ্রনের তলায় কি কাউকে ঢেকে রাখা যায়?'

মালঞ্চ ধমক দিয়ে বলল, 'তোর ওসব বিশ্রী ঠাট্টা সব সময় ভালো লাগে না পদ্মা, আমার অনেক কাজ আছে এখন।'

ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতে কথাটা ছোট সহরের পাড়ায় পাড়ায় রটে গেল, সেখান থেকে ছড়াল সহরতলীর গ্রামগুলিতে।

অঞ্চলটার বেশির ভাগই নমঃশূদ্র আর কৈবর্তের বাস। হাসপাতালের জন্য দলে দলে এসে তারা নিজেরা ঝাড় থেকে বাঁশ কেটেছে, খুঁটি পুঁতেছে, শণ দিয়ে চাল ছেয়েছে, মাটি কেটে বেঁধেছে ভিত। কাজের জন্য অকালের সময় পয়সা অবশ্যই সকলেই পেয়েছে। কিন্তু পয়সাই কি সব? সে পয়সা তো দু'চার সের চাল কিনতেই তখন ফুরিয়েছে। পয়সা নয়, তাদের কাজের সাক্ষী হিসাবে স্বয়ং হাসপাতাল দাঁড়িয়ে আছে চিরস্থায়ী হয়ে—তাই তাদের মেহনতের বকশিস, তুচ্ছ মজুরী নয়। ঘরে কারো ছেলে মরেছে, মেয়ে মরেছে, কারো ঘরের বউ এখানে এসে উঠেছে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে, চিকিৎসায় ভালো হয়ে কেউ কেউ আবার ফিরেও এসেছে রোগা মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়ে। এ সেই হাসপাতাল। দূর দেশের লোক বলে সুজন গঞ্জের হাসপাতাল। সুজনগঞ্জ তাদেরই গঞ্জ—এই সব চরহাটি, তেঁতুলতলা, ঝুমুরকান্দির লোকদের।

মাতাব্বররা দেখা করতে এল হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর সঙ্গে।

'যা শুনছি সত্য নাকি ডাক্তারবাবু।'

হয়তো সত্য, কিন্তু তার তো দেরি আছে। আগেই এ সব বিষয় নিয়ে ঝামেলা করছে কেন তারা, সিভিল সার্জনের কানে গেলে ফল হয়তো এতে খারাপই হবে। এ সব কথা এদের জানালেই বা কে? খোঁজ নিয়ে জানল

বিভূতি মালঞ্চই এর মূলে। সেই আড়ি পেতে শুনে এসেছে তাদের স্বামীস্ত্রীর কথা। তারপর গল্পে, গাঁয়ে রটিয়ে দিয়েছে সর্বত্র। এমন কি ভীরু, আর বউয়ের আঁচল ধরা বলে তার বদনাম রটাতেও মালঞ্চ কসুর করেনি। ম্লান একটু হাসল বিভূতি। নিঃশব্দে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে মালঞ্চকে সত্যিই বোধ হয় কিছু বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। এতটা সঙ্গত হয়নি। ধমক দেওয়া উচিত ছিল।

বিকেলের দিকে সিভিল সার্জনকে চা খাওয়ার জন্য সবিনয়ে নিমন্ত্রণ জানাল বিভূতি।

নন্দী সাহেব হাসলেন, বললেন, 'সে কি কথা! আমার মত এমন বেদলী মানুষকে নিয়ে টানাটানি করছেন কেন?'

বিভূতিও হাসল, বলল, 'চা-তো আর বৃহৎ ব্যাপার নয়, এটা দলাদলির বাইরে।'

নন্দী সাহেব অপূর্ব ভঙ্গিতে জোড়া ভ্রূ কুঁচকে হাসলেন, 'তাই কি? না ঘরের মধ্যেই আপনার দলাদলি হয়েছে। মনে হচ্ছে এই নিমন্ত্রণটা যেন সেই অন্য দলের পক্ষ থেকে।' উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন নন্দী সাহেব. তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, 'আচ্ছা বিভূতিবাবু—'

'বলুন।'

'এই খানিক আগেই না আপনি হরিজন আর নাবাজনের representation পাঠিয়েছিলেন।'

বিভূতি বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি।'

নন্দী সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, প্রথমে এল গাঁয়ের মাতব্বরেরা, তারা চলে যাবার খানিক বাদে এল আপনার নার্সদের দল। বলে গেল, এ হাসপাতাল তুলে দিলে নাকি তারা সব সর্বস্বান্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং এমন নিষ্ঠুর অধর্ম যেন আমি কোন ক্রমেই না করি। আমি কি বিশ্বাস করব যে, এসবের কিছু আপনি জানেন না,—আপনি এতক্ষণ ধরে নিতান্তই কেবল স্ত্রীকে চায়ের আয়োজনে সাহায্য করছিলেন।'

বিভূতি স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার হাত থেকে যেন এরই মধ্যে কর্তৃত্ব খসে পড়েছে। তাকে না জানিয়ে, তার পরামর্শ না নিয়ে সুরু হয়েছে কাজ, তাকে

ভিড়িয়ে তার বিরুদ্ধে মালঞ্চ নার্সদের দলবদ্ধ করেছে, জুটিয়েছে আর সবাইকে। মালঞ্চকে সত্যিই এতখানি বাড়তে দেওয়া ঠিক হয়নি।

নন্দী সাহেব বললেন, 'তাই বলি আপনি এত গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন বিভূতিবাবু। চায়ের নিমন্ত্রণ আমি সানন্দে গ্রহণ করছি। সত্যিই তো চায়ের কাপে ঝড় তোলা কেন।'

এক ফাঁকে বিভূতি ডেকে পাঠাল মালঞ্চকে। বলল, 'এসব কি হচ্ছে?'

মালঞ্চ নিতান্ত নিরীহ ভঙ্গিতে বলল, 'কিসের কথা বলছেন ডাক্তারবাবু।'

বিভূতি কঠিন স্বরে বলল, 'কিসের কথা বলছি তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে এত বাড় হয়েছে তোমার।'

প্রশ্রয়! মনে মনে হাসল মালঞ্চ। কাউকে প্রশ্রয় দেওয়ার মত সাহস কি ডাক্তারবাবুর আছে? তবু সবাই তাঁর কাছ থেকে এক ধরনের প্রশ্রয় পায়। তিনি দেন বলে নয়, তিনি না দিয়ে পারেন না বলে। কিন্তু তেমন প্রশ্রয় তো মালঞ্চ তাঁর কাছে চায়নি।

বিভূতি বলল, 'চুপ করে রইলে কেন। জবাব দাও আমার কথার।'

মালঞ্চ বলল, 'আমরা হাসপাতালটি রাখতে চাই।'

'আর আমি চাই না?'

'আমাদের মত অত জোরে বোধ হয় না।'

বিভূতি তীক্ষ্ণ একটু হাসল, 'তাই নাকি? আচ্ছা বেশ, তোমার জোরের নমুনাটা একবার দেখবার অপেক্ষায় রইলাম।'

জোরের নমুনা! মাতব্বররা বলে গেছে এর পর তারা মিটিং করে দরখাস্ত পাঠাবে জজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। কিন্তু দরখাস্তে বিশ্বাস নেই, জজ ম্যাজিস্ট্রেটকেও নয়। রাত যত বাড়তে লাগল ততই আরেক রকমের জোরের কথা তার মনে পড়তে লাগল। বেছে বেছে আরও দশ পনের জন নার্সকে নিয়ে সে বিকেল বেলায় গিয়েছিল সিভিল সার্জনের লঞ্চে। তাঁকে দুঃখের কথা জানাতে, তিনি কোন কথা শুনতে চাননি, বারবার বিরক্তি প্রকাশ ক'রে অসন্তুষ্টি জানিয়েছিলেন। হতাশ হয়ে সবাই যখন ফিরে এসেছে, তক্তা বেয়ে নেমেছে এসে পথে, তখন হঠাৎ তিনি মালঞ্চকে ফের ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

'রাগ করলে নাকি মালঞ্চ?'

এ যেন সেই প্রবল পরাক্রান্ত সাহেবী পোষাকের সিভিল সার্জন নয়, এ যেন আর কারো গলা, নরম আর মিষ্টি। মালঞ্চ সহসা কানকে বিশ্বাস করতে পারেনি।

সভয়ে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে। সোনার চশমার ভিতর থেকে ঘোলাটে রঙের যে দুটি চোখ তাকে চেয়ে চেয়ে দেখলে খানিক আগে সেই চোখই কি শাসনে রাঙা হয়ে উঠেছিল। মালঞ্চ নিজের চোখকে বিশ্বাস করেনি।

তাকে নিরুত্তর দেখে সিভিল সার্জন আবার একটু হেসেছেন, 'রাগ করলে কি করব বলো। দল সুদ্ধ সবাই মিলে অমন ভিড় করে এলে কিছু শোনা যায়, না কিছু বলা যায়?'

সাহস সঞ্চয় ক'রে এবার মালঞ্চ জবাব দিয়েছে, 'তাহলে আমি বিদায় দিযে আসি ওদের, আমার একার মুখেই শুনুন সব।'

নন্দী সাহেব মুখ টিপে হেসেছেন 'শুনবই তো, এত ব্যস্ত কেন। শুধু বলবার জন্য উৎসুক কেউ থাকলেইতো হবে না, শুনবার জন্য উপযুক্ত সময়ও তো চাই। বাইরের গণ্ডগোলে তোমার কথা যাতে ভুল না শুনি তাওতো দেখতে হবে।'

মালঞ্চ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তাহলে কখন আসব।'

নন্দীসাহেব বলেছিলেন, 'তাও কি আমাকে বলে দিতে হবে? যখন তোমার সুবিধা হয়, তোমার রোগীরা যখন শান্ত হয়ে ঘুমায়, নীরোগ যারা, তারাও মিছি-মিছি ছটফট ছুটোছুটি করে না, তেমনি একটা সময়ই সবচেয়ে ভালো।'

মালঞ্চ বলেছিল, 'আচ্ছা আসব। কিন্তু কথা দিন আপনি আমাদের অনুরোধ রাখবেন।'

'রাখব বইকি, কিন্তু সেটা নির্ভর করবে সম্পূর্ণ তোমার ওপর—একথাও মনে রেখ।'

মনে রাখবে বইকি মালঞ্চ। যেমন ক'রেই হোক, যে মূল্যেই হোক সে-ই একমাত্র রক্ষা ক'রেছে এই হাসপাতালকে, আর কারো তা সাধ্যে কুলোয়নি, একথা আর সবাই একদিন ভুলবে, কিন্তু মালঞ্চ মনে ক'রে রাখবে বইকি।

নিজের ঘরে আজ খানিক আগেই গিয়ে ঢুকলো মালঞ্চ। বলল, শরীর ভালো নেই। তারপর বাক্স খুলে মেঝের ওপর ছড়িয়ে ফেলল নানাজনের নানা গোপন উপহার। শাড়ি, সাবান, গন্ধতেল, আংটি আর হার, এতদিন কাউকে সে কোন সাড়া দেয়নি। ছুঁয়ে দেখেনি কোন জিনিষ। তবু সেগুলি বাক্সে জমে উঠেছে। ভেবেছে সময়মত ভিখারীদের বিলিয়ে দেবে, না হয় পুড়িয়ে ফেলবে আগুনে,

কিংবা তেমন দিন যদি আসে ডেকে দেখাবে একজনকে। একবার দেখবে তিনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন এসব।

কিন্তু সে আশা আর নেই। কোনদিন কোন উপহার জোটেনি তাঁর কাছ থেকে মালঞ্চের, আজ পেয়েছে চরম উপহার—বিদ্রূপ আর পরিহাস ধমক আর চোখ-রাঙানি। আজ তার জোরের নমুনা দেখতে চেয়েছেন ডাক্তারবাবু। রাত যখন আরও বাড়ল, বড় একটা সাদা চাদরে নিজেকে ঢেকে নিল মালঞ্চ। তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাইরের অন্ধকারের মধ্যে।

ঘণ্টাকয়েক বাদে ফেরার পথে হাসপাতালের কম্পাউণ্ডের সামনে দেখা হোল বিভূতির সঙ্গে। হারিকেনটা উঁচু ক'রে ধরে বিভূতি বলল, 'এই যে মালঞ্চ, এতক্ষণ ধরে তোমাকেই খুঁজছিলাম' কিন্তু মালঞ্চের দিকে তাকিয়ে বিভূতি তারপর আর কোন কথা খুঁজে পেল না। মালঞ্চের মনে পড়ল গায়ের চাদরটা ভুলে লঞ্চেই ফেলে এসেছে।

মিনিটখানেক মালঞ্চও চুপ করে রইল, তারপর একটু বাঁকা হাসি হেসে বলল, ভাগ্য ভালো। যা হোক এতক্ষণ ধ'রে যাকে খুঁজছিলেন, এতক্ষণ পরে তো শেষ পর্যন্ত তাকেই পেলেন।'

উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত বিভূতি হঠাৎ মালঞ্চের হাত চেপে ধরল, বলল, 'তাকেই পেলাম মানে? সত্যি ক'রে বলো মালঞ্চ কম্পাউণ্ড ছেড়ে কোথায় তুমি ছিলে এতক্ষণ, কোথায় গিয়েছিলে।'

মালঞ্চ বলল 'সে কথা শুনে দরকার নেই আপনার, হাত ছাড়ুন।'

'হাত ছাড়ব? আগে জবাব দাও আমার কথার।'

মালঞ্চ বলল, 'হাত ধরে জবাব আদায় করবার সাহস আপনার কতক্ষণ ধ'রে হ'ল ডাক্তারবাবু। নিশ্চয়ই ভেবেছেন, এতক্ষণ একজন যখন ধ'রে রেখেছিল তখন আপনারও আর ধরতে বাধা নেই কেমন? কিন্তু আমারই না হয় জাত গেছে, নিজের জাতের ভয় তো আছে আপনার।'

অপ্রতিভ বিভূতি মালঞ্চের হাতখানা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল। তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'ঘরে যাও মালঞ্চ, পোষাকটা বদলে এসো। সেই ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার কেসটি হঠাৎ ভারি খারাপ হয়ে পড়েছে। দুজনেরই সেখানে থাকা দরকার।' এর পর শান্ত ম্লান একটু হাসি বিভূতির ঠোঁটের ওপর দেখা দেল। বিভূতি বলল, 'একটা কথার জবাব তোমাকে দেওয়া হয়নি মালঞ্চ। নিজের জন্য ভয় আমার কোদিন ছিল না, ভয় ছিল তোমার জন্যই। এবার তা

ভাঙল। কিন্তু তোমাকে ছুঁয়ে জাত আজ আমার যায়নি, কোনদিন যাবেও না।'

মালঞ্চের চোখ দুটি যেন এতক্ষণ পরে ছল ছল করে উঠল।

বিভূতি সেদিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'যাও, তৈরী হয়ে এসো।'

রাত আর বেশি নেই। কুকুরের গলার অদ্ভুত শব্দ করতে করতে ছেড়ে যাচ্ছে সিভিল সার্জনের লঞ্চ।

ভোরে আর সময় মিলবে না বলে স্বজনগঞ্জের অধিবাসীরা বিদায় অভিনন্দনটা তাঁকে রাত্রেই জানিয়ে রেখেছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

সংকলন

নরেন্দ্র/১ম/৩৭

বিজ্ঞপ্তি ঃ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র-র বহুতর রচনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকলেও অনেক রচনা অগ্রন্থিত রয়েছে। বেশ কিছু রচনা অপ্রকাশিতও রয়েছে। এ-ছাড়া তাঁর মহামূল্যবান অপ্রকাশিত কয়েকখানি ডায়েরি রয়েছে। এই সংকলন অংশে তাঁর এইসকল রচনা ক্রমশ প্রকাশিত হবে।

সাহিত্যানুরাগী পাঠক, গ্রাহক এবং বাংলাসাহিত্য বিষয়ে গবেষণারত বিদগ্ধজন এই প্রকার অগ্রন্থিত বা অপ্রকাশিত রচনার অনুসন্ধান দিলে বাধিত হবো।

—সম্পাদক

মূক

তোমাকে বাসি ভালো এ কথা ক্ষণে ক্ষণে
বলিব তোমা ভাবি সদাই মনে মনে।
বলিতে যবে চাই কথা না খুঁজে পাই
হতাশ হয়ে ফিরি আপন গৃহকোণে।

নীরব ব্যাকুলতা দেখো না চোখ তুলি
তুমি যে চাও শুধু সাজানো কথাগুলি,
কথার মালা গেঁথে পারিনে নিয়ে যেতে
তাই তো আসি ফিরে আবার যাই ভুলি।

সবে যে আসে নিয়ে কথার সাজি ভরি
চরণ ডালি দেয় রজনী-দিন ধরি
অধরে ক্ষরে শুধু কপট কথা-মধু
ওদের ব্যবহারে আপনি লাজে মরি।

কেবল আসি যাই না জানি কোন কাজে
আমার মনোবীণা তোমার সুরে বাজে
শুধু কি ভালোবাসা পাবে না কভু ভাষা
গুমরি মরি যাবে আপন হৃদিমাঝে?

—'দেশ', শ্রাবণ, ১৩৪৩

জোনাকি

কানে কানে

গুঞ্জরিত যে সুর আমার
তোমার কানে কানে
রাগিণী তার না-ই রহিল
না-ই রহিল মানে।

অর্থ কি সুর চাই কি মোরা
চাই যে কানাকানি
কানের কাছে সঙ্গোপনে
অধর যখন আনি।

তাই তো প্রিয়া হৃদয় তোমার
ভাস্‌বে গানে গানে
যা-ই কিছু না গুঞ্জরি গো
তোমার কানে কানে।

ছন্দ তালের অসঙ্গতি
রাগিনী আর রাগে
যতেক অভাব, মোদের প্রিয়া
ভরবে অনুরাগে।

অঙ্গ কেনো রোমাঞ্চিত
মধুর আবেশ ভরে
অর্থ বিহীন ধ্বনির পুঞ্জ
পড়ছে যবে ঝরে।

হৃদয় এতো পুলক-উছল
কেনো কেউ কি জানে
গুঞ্জরিত বে-সুর যবে
তোমার কানে কানে।

প্রিয়া প্রশস্তি

কবিতায় ছন্দ, সঙ্গীতে সুর,
পুষ্পে বধূ তুমি গন্ধ মধুর।
পূর্ণিমা শশী প্রিয়া নীল গগনে,
আনন্দ ধারা মোর রুদ্ধ মনে।

বরিষা আকাশে প্রিয়া ইন্দ্রধনু,
বিজলির লেখা সম উজ্জলতনু।
চন্দন তরু তুমি গহন বনে
আনন্দ ধারা মোর রুদ্ধ মনে।

অচল শিখরে তুমি ঝরণা ধারা,
সান্ধ্য গগনে তুমি শুক্রতারা,
বাঁশরীর ধ্বনি সম শুভ লগনে
আনন্দ ধারা মোর রুদ্ধ মনে।

রুগ্ন নয়নে সুখ-স্বপন সমা
কল্পনা কবি মনে কী মনোরমা।
গুঞ্জন সুর-মধু প্রিয়-শ্রবণে
আনন্দ ধারা মোর রুদ্ধ মনে।

দূর দেবালয় হোতে গন্ধারতি,
গত জনমের শত মধুর স্মৃতি
চকিতে ভাসিয়া আসা ধীর পবনে
আনন্দ ধারা মোর রুদ্ধ মনে।

জানালার নিচে নিশি হাস্নাহানা
সবুজ পাতার তলে আধো-অজানা
সুরভি ভরিয়া যাওয়া ভাঙা-স্বপনে
আনন্দ ধারা মোর রুদ্ধ মনে।

ফিরিয়া চলিতে পথে তাকানো ছলে,
চকিতে বুজানো চোখ হাতের তলে,
কঙ্কন ধ্বনি মৃদু সুখ-শয়নে
আনন্দ ধারা মোর রুদ্ধ মনে।

জানালার ফাঁকে আসা জোছনা রাশি
অধরের ফাঁকে ফাঁকে লুকানো হাসি
চুম্বন ঘন ঘন আলিঙ্গনে
আনন্দ ধারা মোর রুদ্ধ মনে।

স্মরণ

নিশীথ নিঝুম
যামিনী যখনো বিভোরে ঘুমোয়
তোমার ভেঙেছে ঘুম।
বলো তো তেমন ক্ষণে
কোন্ কথা পড়ে মনে ?
খোলা জানালায় চাহিয়া অন্ধকারে
কার কথা বলো মনে পড়ে বারে বারে ?

যখন বাতাসে
হাস্নাহানার গন্ধ ভাসিয়া আসে
ঘুমে শিথিলিত কবরী খুলিয়া পড়ে
যেন কার মৃদু কোমল পরশ ভরে
অঙ্গ তখন কোন্ কথা বলো স্মরি'
কেবলি তোমার কাঁপে থর থর করি।

মেলিয়া হাজার তারা
বিভোর আকাশ তোমাকে যখন
দেখিছে পলক হারা,
দেখার ভঙ্গী তার
দেখে' তব বলো কার কথা মনে
পড়ে শুধু বারবার।

বিকাল

দুপুরের সাদা রোদ ক্রমে ক্রমে লাল হোয়ে আসে
হেলিয়া পড়িল সূর্য্য ক্লান্ত দেহে পশ্চিম আকাশে,
তোমার মধ্যাহ্ন নিদ্রা ভাঙো, হোলো জাগিবার কাল
চোখ মেলে দেখো চেয়ে আসিয়াছে রঙীন বিকাল।

অনেক ঘুমালে তুমি বহু লেখা হোয়ে গেলো মোর
এতক্ষণ দুই ভিন্ন স্বপ্ন-লোকে ছিলাম বিভোর,
ওঠো, ওঠো, এখন যে হোয়ে এলো মিলিবার কাল
পরিয়া রঙীন শাড়ী চেয়ে দেখো এলো যে বিকাল।

আকাশের নীল বুকে সে রঙের দাগ লেগে গেলো
নানান রঙের ছিটা এখানে ওখানে এলোমেলো
পড়িয়াছে আয়নায় সে রঙের কিছু উড়ে এসে
তোমার অধরে, গালে, নয়নে, কপোলে, এলোকেশে।

বাতাসে উড়িছে চুল এলোমেলো শিথিল অঞ্চল
বিকালের রঙে তারো চিত্ত আজি হোয়েছে চঞ্চল,
অন্ধকারে একা একা তুমি শুধু ঘুমাবে কি ছবি
বিচিত্র রঙের জাল বুনিয়া চলেছে যবে রবি ?

কী লোভে এখনো তুমি বুজিয়া রয়েছ দুই চোখ
তবে কি রঙীন আরো এরো চেয়ে তব স্বপ্ন-লোক
রঙীন বিকালে বসি কোনো কবি বোনে কি সেখানে
রঙীন কথার জাল গুন্ গুন্ করি' তব কানে ?

তাই বলো এ তো নয় পৃথিবীর বিকালের রঙ্
সুমধুর অনুরাগে আরক্তিম হোয়েছে বরং
তোমার ও মুখখানি ; মৃদু মৃদু শিহরিত বুক
গোপন স্বপন পুরে পেয়ে বলো কার স্পর্শ সুখ ?

বুঝেছি তোমার চোখ বুজিয়া তো রহে নাই ঘুমে
আবেশে মুদিত ওরা কার যেন চিরস্থায়ী চুমে
গুঞ্জনে চুম্বনে ঘন সুনিবিড় আশ্লেষে রভসে
মূর্চ্ছিত হয়তো তুমি মুহুঃসহ পুলকের রসে।

মিলালো লাল্‌চে আলো বিকালের রঙ্‌ মুছে যায়
আমার নয়নে মনে সন্দেহের আঁধার ঘনায়
তোমার স্বপন লোকে বলো আজ গোপনে কে এলো
সংশয় মনের পটে নানা মুখ আঁকে এলোমেলো।

বরষা

বাহিরে বরষা ঝরে ডাকছো মোরে
এখন ওখানে যাবো কেমন কোরে
তুমিই এখানে চলে এসোনা নিজে
আমার এ ঘরে এসো বৃষ্টি ভিজে।

ভিজলে তোমাকে বেশ দেখাবে ভালো
ভিজবে তোমার দু'টি নয়ন কালো
মুক্ত কবরী হোতে ঝরবে বারি
ভিজলে তোমাকে ভালো দেখাবে ভারি।

তোমার নয়ন হোতে কাজল যাবে
বৃষ্টি কপোল হোতে রঙ্‌ মোছাবে
সিক্ত বসন গায়ে লেপ্‌টে' রবে
ভিজলে ভালোই তুমি দেখতে হবে।

আমার ঘরের মাঝে বৃষ্টি হবে
অঙ্গে তোমার জল ঝরবে যবে
গভীর কৃষ্ণ তব কেশের রাশি
সজল মেঘের মতো রহিবে ভাসি'।

আমার শ্রবণ ভরে বৃষ্টি হবে
কণ্ঠে তোমার সুর ঝরবে যবে
মধুর কণ্ঠ হোতে সুরের ধারা
ঝরবে বাদল সম আপন হারা।

আমার চোখের 'পরে বৃষ্টি হবে
ঝরবে তোমার সুধা দৃষ্টি যবে
কাজল মেঘের দু'টি তারকা তলে
কভু বা বাদল কভু বিজলী ঝলে।

আমার অধর 'পরে বৃষ্টি হবে
অধরে তোমার চুমো ঝরবে যবে
নয়ন অধর আর কপোল চুমি'
আনবে অঙ্গে মম বরষা তুমি।

চকিত পরশে তব অপরিমিত
অঙ্গে তড়িৎ হবে সঞ্চারিত
বিভল অবশ তনু চলবে ভেসে
কোমল দেহের কূলে লাগবে এসে।

প্রশ্ন

লিখিতে লিখিতে মোর যাহা কিছু রয়ে যায় বাকি
অলখিত সে রচনা পড়ে নাকি তব দু'টি আঁখি?
আপনার মনে মনে শোনো না কি মোর মৌন ভাষা
ছন্দের বাঁধনে বাঁধা নাহি পড়ে যে বেদনা আশা,
তোমার মনের কোণে তারাও কি ধরা দেয় নাকি,
তব আঙিনায় নেমে আসে নাকি উড়ে যাওয়া পাখী?

হাওয়ায় মিলয়ে যায় ছুঁতে ছুঁতে আমার যে কথা
বলিব বলিয়া বলা হয়নাকো যে সব বারতা,
যাহারা পড়েছে ঢাকা বিস্মৃতির ঘন কুয়াশায়
সন্ধ্যায় তোমার মনে ফেরে নাকি আপন বাসায় ?
ভীরু যারা ওঠে নাই আজো আর যাহাদের পাখা
তোমার নিভৃত নীড়ে তারাও কি রহে নাই ঢাকা ?
মোর অকথিত বাণী যত মোর রাগিনী অগীত
তোমার বীণার তারে বলো তারা হয় কি ঝঙ্কৃত ?

আনমনা

মাধবী লতিকা ঝুলিয়া পড়েছে আমলকি ডাল হোতে
খসে মাঝে মাঝে এক একটি ফুল কুমারের ক্ষীণ স্রোতে
মৃদু ঢেউয়ে ঢেউয়ে কোথা ভেসে যায় অজানা দেশের দিকে
আনমনে তুমি কি দেখিছ হেথা চাহিয়া নির্নিমিখে ।

এখানে ওখানে এলোমেলো ঘন সবুজ সুপারি সারি
কুমারের বুকে দুলিছে বাতাসে কাঁপিতেছে ছায়া তারি
আঁধার নামিয়া আসে ধীরে ধীরে ওপারের বেণু-বনে
চাহিয়া চাহিয়া এ সবের দিকে বলো কি ভাবিছ মনে ।

কবরী ভাঙ্গিয়া ঘন কেশরাশি পড়িয়াছে খুলে খুলে
শিথিল আঁচল অবশ আবেশে লুটায় চরণমূলে
উন্মনা মন ভেসে গেল কোথা, অয়ি ধ্যান নিমগনা,
চকিত পরশে তনু তো তোমার শিহরিয়া উঠিল না ।

এ বিকাল বেলা বলো কি একেলা চলি আনমনে আজি
আপন খেয়ালে ভরিয়া ভরিয়া তুলিছে স্মৃতির সাজি
পিছনের পথে পড়িয়া রয়েছে শুষ্ক যে ফুলগুলি
আজি পুনরায় তাদের কি তুমি যতনে নিতেছ তুলি ?

ফিরিয়া গিয়াছ কৈশোরে বুঝি কিংবা বাল্যকালে
সখা সখী সব ঘিরিয়া ঘিরিয়া বেঁধেছে প্রীতির জালে,
চিত্ত তোমার মত্ত বুঝি বা সেই মধুময় পুরে
খুসিতে ভরিয়া উঠিছে হৃদয়, পুরান সে কোন্ সুরে।

সেখানে তোমার খেলা ঘরে আজো চরণচিহ্ন আঁকা
এখনো বাতাসে বাতাসে তোমার চুলের গন্ধ মাখা
উছল পুলকে উঠেছে মাতিয়া যত পুতুলের দল
ওঠে ক্ষণে ক্ষণে বিভল কণ্ঠে আনন্দ কোলাহল।

আমি বহু দূরে রয়েছি দাঁড়ায়ে শুভলগনের তরে
মধুর স্মৃতির খেলাঘর হোতে কখন আসিবে ঘরে
অতীত হইতে কখন বলগো ফিরিবে বর্ত্তমানে
অতল গভীর শান্ত নয়নে চাহিবে আমার পানে।

কানে কানে মোর কখন গাহিবে ধীরে গুন্‌গুন্ সুরে
নিয়ে যাবে মোরে কখন কল্প সুদূর স্বপ্নপুরে।
আমার বক্ষে তনুখানি তব কাঁপিবে ছায়ার মত
অধরে অধরে মিলিয়া আসিবে নয়নে নয়ন নত।

ভাষা

হে আমার ভাষা
অসম্পূর্ণ এখনো প্রত্যাশা
তৃপ্তিহীন রহিল এখনো
কেনো
কেনো তুমি হোতে নাহি পারো
আরো তীক্ষ্ণ, আরো দীপ্ত, তীব্রতর আরো,
তোমার শাণিত দীপ্তি বিদ্যুতের মতো
কেনো চক্ষু করে না আহত ?

বলো বলো কবে
স্পর্শে তব তীব্রতম তড়িতের সঞ্চালন হবে
কবে তব বৈদ্যুতিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি আসি
অন্তরের অন্ধতম কক্ষগুলি তুলিবে উদ্ভাসি'।
কবে তব কলহাস্য ধারা
দীর্ণ করি বাহিরিবে অবরুদ্ধ পর্ব্বতের কারা
তীক্ষ্ণ স্রোতে ভেসে যাবে যার
গভীর নৈরাশ্য যত উর্দ্ধোত্থিত কর্ণভেদী যত হাহাকার।
বাসনার জ্বালাময় আশ্লেষের আকর্ষণে কবে
রোমকূপে রোমকূপে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ যত প্রজ্জ্বলিত হবে।
মাধুর্য্যের তীব্রতায় পরিপূর্ণ কিংবা কালকূটে
তোমার চুম্বন-রস আজো নহে উৎসারিত তব রক্ত ওষ্ঠাধারপুটে।
গুপ্ত সেই রস নির্ঝরিণী
কবে হবে উদ্বেলিত আজো যাহা উৎসমূলে অন্তরচারিণী?
রুদ্রনৃত্যে উন্মত্ত প্লাবনে
ছুটিয়া চলিবে কবে অতলগর্ভ প্রশান্তির সমুদ্রের পানে।

বহুকাল পরে মনটা আবার দেশের দিকে ছুটল। আজ পাঁচ বছর বাড়ী যাইনে। এই পাঁচটা বছর ভবঘুরের মত শুধু ঘুরে ঘুরেই কাটিয়ে দিয়েছি।

ভারতবর্ষে না গিয়েছি এমন স্থান নেই। আজ কতকাল পরে বিমুখ মনটাকে আবার যেন কে বাড়ীর দিকে টানতে আরম্ভ করেছে। কে আবার টানবে? তিনকূলে এক বুড়ী পিসীমা ছাড়া আর কেই বা আছে? সেই যে সতের বছর বয়সে বিধবা হয়ে পিসীমা আমাদের সংসারে প্রবেশ করেছিলেন, আজ পর্যন্ত বের হবার পথ পেলেন না। এই সুদীর্ঘ জীবনে কত জন্ম, কত মৃত্যুই না তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে কতজনেই না আসা-যাওয়া করল। কিন্তু তিনি সেই যে এসেছিলেন আর যেতে পারেন নি। এখনও ঐ সংসারকেই আঁকড়ে ধরে তাঁকে পড়ে থাকতে হয়েছে। সংসার মানে—একটা ভাঙা বড় আটচালা টিনের ঘর আর বুড়ি-গাই বুধী। বুধীর অবস্থাও পিসীমার মতই। বাবার কোন বন্ধু তাঁকে এই গরুটি উপহার দিয়েছিলেন, খুব দুধাল জাত বলে। কিন্তু ওর দুধ যে কেমন তার স্বাদ পাওয়া আমাদের কারও ভাগ্যে ঘটে উঠেনি। বছর বছর গরুটার একটি করে বাছুর হত আর কয়েকদিন থেকেই মরে যেত: আমাদের বাড়ীর মৃত্যুর ছোঁয়াচের স্পর্শ ওর বংশেও লেগেছিল বুঝি! বাছুর মরে গেলে ওর দুধ আর কাউকে বাবা খেতে দিতেন না।

গরুটার প্রসব বহুকাল বন্ধ হয়ে গেছে। পিসীমা তবুও ওকে ছাড়িয়ে দিন নি—বাবার একটা স্মৃতিচিহ্ন বলে বোধহয়। কিন্তু বাবার স্মৃতিচিহ্ন বাড়ীটায় কোথায়ই বা নেই! ঐ কুয়াটার পাড়ে বসে তিনি প্রত্যহ হাত মুখ ধুতেন। যে গাছের বাকলখানার উপরে বসে ধুতেন, সেখানা এখনও তেমনি অক্ষয় হয়ে রয়েছে! যে খড়ম-জোড়া তিনি প্রতিদিন ব্যবহার করতেন এখনও তা হয়ত আত্মগোপন করে আছে। বেতের ছিল্‌কে দিয়ে দাঁত খুঁটবার কতকগুলি খড়কে করেছিলেন। ছোট একটা বাঁশের চোঙে করে বাইরের বেড়ায় সেগুলি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন,—পিসীমা সেগুলিকে ঘরে নিয়ে রেখেছেন। আসার সময় দেখে এসেছিলেন খড়কের চোঙটা বেড়ায় ঠিক তেমনি ভাবেই ঝুলছে। হয়ত আরও পঞ্চাশ বছরে ওর কিছুই হবে না। ওটা দীর্ঘস্থায়ী মানুষের চেয়ে! কাকা, দাদা, বন্ধু, বিশু, এমন কি—দাদার মেয়ে তিন বছরের টুনির ছোটখাট কত স্মৃতির টুকরো বাড়ীখানি আঁকড়ে ধরে আছে, শুধু তাদেরই ধরে রাখতে পারল না।

মায়ের কথা আমার একটুকো মনে পড়ে না। শুনেছি, আমার বছর খানেক বয়সের সময় তিনি মারা যান। তাঁর অভাব জীবনে আমি কখনও বোধ করিনি,—পিসীমার জন্য মানুষের যে মা থাকে, আর জীবনে তার কোন প্রয়োজন হয়, একথা আমি বহুকাল জানতেম না।

গাড়ীটা একটা ষ্টেশনে এসে থামল। অস্পষ্ট আলোকে নামটা ঠিক পড়া গেল না। পড়ার প্রয়োজনও ছিল না। ও তো বসন্তপুর। এই ষ্টেশন দিয়ে কতবার যাওয়া-আসা করেছি। তবে প্রতিবারই বাড়ীর কেউ-না-কেউ সঙ্গে ছিল। আজ একা। বিশুর মৃত্যুর রাত্রে যেদিন বাড়ী ছেড়ে চলে আসি—সেদিনও একাই ছিলাম।

আর একটা ষ্টেশন। এর পরেই আমাদের বাড়ীর ষ্টেশন। পিসীমা কি করছে এখন? এত সকালেই ঘুমোতে যায়নি। হয়ত পান ছেঁচছে বসে বসে। পাঁচ বছর কোন খোঁজ রাখিনি। এতদিন বেঁচে আছে তো। বেঁচে আছে নিশ্চয়ই। পিসীমা মরতে পারে না।—তা হ'লে কষ্ট ভোগ করবে কে? আর কষ্টই বা কি? পিসীমার আজকাল আর কোন দুঃখ-যন্ত্রণা হয় না কিছুতে। অভ্যাসে সব সহনীয় হয়ে গেছে। মৃত্যু আর পিসীমাকে কোন আঘাত করতে পারে না। বিশুর মৃত্যুতে এক ফোঁটা চোখের জলও পিসীমা ফেলেনি। আমি আর পাড়ার কয়েকটা ছেলে বিশুকে যখন শ্মশানে নিয়ে গেলাম—পিসীমা আপন মনে বসে বসে পান ছেঁচছিল।

ষ্টেশন থেকে আমাদের বাড়ী খুব বেশী পথ নয়। আধ মাইলের বেশী হবে না। রাস্তাটা দেখলাম আরও ভালো করে বাঁধান হয়েছে। রাতটা অন্ধকার। কিন্তু সঙ্গে টর্চ আছে, কোন অসুবিধা হবে না। ধোপাবাড়ী, বিশ্বাস বাড়ী আর চক্রবর্তীদের বাড়ীর উপর দিয়ে গেলে পথ অনেকটা সোজা হয়, কিন্তু কোন বাড়ীর উপর দিয়ে যেতে ইচ্ছে হ'ল না। যদি কেউ জেগে থাকে, বা পায়ের শব্দে আর কুকুরের ডাকে জাগে আর আমাকে দেখতে পায়, তবে তাদের বিস্ময় আর কৌতূহলের অন্ত থাকবে না। সে কৌতূহল নিবৃত্ত করবার আমার বর্তমানে ধৈর্যও নেই, উৎসাহও নেই, তাই রাস্তা দিয়ে একটু ঘুরেই গেলাম।

বড় আটচাল টিনের ঘরটা অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কত অর্থ ব্যয়ে ঘরগুলিকে তোলা হয়েছিল, এক-একজনের মৃত্যুর সঙ্গে এক-একখানা ঘরকে ভেঙ্গে পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। কারণ, যে ঘরে থাইসিসের রোগী মরে, সে ঘরে আর বাস করা উচিত নয়। আর বাস করবেই বা কে?

টর্চটা ফোকাস্ করে একবার ঘরের উপরে ফেললাম, ব্যাটারীর তেজ বেশী

ছিল না। ম্লানালোকে কেমন যেন অদ্ভুত দেখলাম। আরও কয়েকবার ফোকাস্ করে বাড়ীর চারদিকটা দেখলাম। কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে গায়ের লোম শিউরে উঠতে লাগল, একি ভয়? পিসীমাকে ডাকতে গেলাম, গলা দিয়ে কথা বের হতে চায় না। পিসীমার পান ছেঁচার শব্দও ত আর শুনতে পাইনে! এ জন্মের মত বুড়ী তাহলে পরিত্রাণ পেয়েছে?

হঠাৎ ঘরের দরজাটা খুলে গেল।

—"কে—কে ওখানে?"……

পিসীমার গলা। অন্ধকারেই এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'আলো জ্বাল পিসীমা,—আমি নন্তু।'

পিসীমা অন্ধকারেই আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'নন্তু!'

দিনকয়েক কাটল গ্রামবাসীদের কৌতূহল মেটাতে। কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম, কোন্ জায়গাটা কেমন—কোথায় কোন্ দেবমন্দির, কোথায় কোন্ বিগ্রহ, কোথাকার কত ভাড়া, এইসব। একজন বললেন, 'শুনেছি কাশীতে কপি নাকি খুব সস্তা? নিয়ে এলেই পারতিস কয়েকটা সঙ্গে করে…।' পালেদের বাড়ীর জেঠাইমা বললেন, 'বেশ নন্তু, বেশ, ফিরে এসেছ—খুব সুখী হয়েছি তাতে। শত হলেও বাপ-মার ভিটে।—এর মায়া কি এড়ান যায়? যারা গেছে, তারা ত গেছেই। এইবার বিয়ে-থা করে গৃহস্থ হও, বাপের ভিটেয় প্রদীপ জ্বলুক। তোমার পিসীর কথা আর বল না, সন্ধ্যা হলে যে একটু সন্ধ্যা দেবে তাও না, বারটা মাস অন্ধকারেই পড়ে আছে। এমনি কিপ্লিন।'

তিনি উঠে গেলে পালেদের বাড়ীর রাঙা ঠাকুরমা বললেন, 'খুব দরদ দেখিয়ে গেলেন। এদিকে আমটা, জামটা, সুপারিটা নিয়ে বুড়ীর সঙ্গে অহর্নিশ ঝগড়া! বুড়ীকে ও দু'চক্ষে দেখতে পারে না।'

পিসীমার নামে আরও অনেক অভিযোগ শোনা গেল। একজন অভিমানী কণ্ঠে নালিশ জানালেন, 'তোমার বাবা থাকতে নন্তু, এ বাড়ীর কত কি হ'ত, আমরা খেয়েছি। অমন মহৎ লোক আর গ্রামে হবে না নন্তু। একথা আমরা প্রত্যেকেই বলাবলি করি। সেদিন এই বাড়ীটার ওপর দিয়ে যেতে যেতে—ইদানীং এ বাড়ীতে ত আমি বড় একটা আসিই না, আসলেই বুকটার ভিতর কেমন খাঁ-খাঁ করে ওঠে—হ্যাঁ যেতে যেতে দেখি কোণের ওই গাছটার কুলগুলি সব পেকেছে। ছেলেটা ছিল সঙ্গে, বললে—বাবা, একটা কুল। দুটো কুল ছিঁড়ে ছেলেটার হাতে দিয়েছি, অমনি বুড়ী দেখতে পেয়ে তেড়ে যেন মারতে

এল। বাপ রে, বাপ! জিহ্বায় যে কি বিষ! এ-বিষেই ত এত বড় সংসারটা শ্মশান হয়ে গেল।'

ছেলের দল এসে বলল—তারা থিয়েটারের রিহার্সেল দেবার জন্য ঘরটা চেয়েছিল। বুড়ী তা দেয়নি। আর এমন সব গালাগালি করেছে যা ভদ্রলোকে মুখে আনতে পারে না।

মনে মনে ভাবি—মৃত্যুই পিসীমার পরম আত্মীয়।

জীবনকে বুড়ী কি করে সহ্য করছে?

আরও কয়েকদিন কাটে। হঠাৎ বুড়ী সেদিন বলল, "স্থলুকে একবার দেখে আয় নন্তু। তাকে আর এই যমপুরীতে আনতে চাইনে। তুই নিজে গিয়ে একবার তাকে দেখে আয়—কেমন আছে। কতকাল যে তার কোন খবর পাইনি।"

জিজ্ঞেস করলাম, "স্থলু কে?"

"স্থলু কে চিনতে পারলি নে? কোলে-পিঠে করে সে তোকে মানুষ করেছে—"

ওঃ, পিসীমার একমাত্র মেয়ে স্থলতাদি। নীলপুকুরে যার বিয়ে হয়েছে। এতদিন তার কথা মনে ছিল না। ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, কি করে এতদিন ভুলেছিলাম দিদিকে? দিদির কথা মনে পড়তে ছোটবেলার অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল, এলোমেলো ভাবে। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাদীপ দেওয়ার সময় দিদি আমাকে কোলে করে নিয়ে যেত প্রথমে তুলশীতলায়, তার পরে মণ্ডপ ঘর, তার পরে অন্যান্য সব ঘরে সন্ধ্যা দিয়ে দিদি তার খেলার রাধা-কৃষ্ণের ঘরে আমাকে নিয়ে যেত। সেখানে প্রত্যেকদিন দিদি প্রদীপ দিয়ে আরতি করত—পুরুতঠাকুরের মত। সেখানে বসে কত অশুদ্ধ উচ্চারণে ভরা সংস্কৃত শ্লোক শিখেছি দিদির কাছে। দিদি সেগুলি পুরুতঠাকুরের কাছে শিখত। এজন্য তাকে অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করতে হ'ত। ঠাকুরমশায়ের মাথায় পাকা চুল তুলে দিত, তাঁর মুখশুদ্ধির জন্য হরিতকী কেটে দিত, পূজার জন্য ফুল-দূর্বা, বেলপাতা ত দিদিই তুলত। কৃষ্ণের প্রণাম, মনসার প্রণাম, সূর্যের প্রণাম, লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রণাম—কত মন্ত্র-তন্ত্রই যে দিদি আমাকে শিখিয়েছিল। একদিনের কথা আমার খুব মনে পড়ে, কৃষ্ণকে আরতি করা হ'লে পর আমি বললাম,—দিদি আজ আমাকেও আরতি করতে হবে। দিদি বললে, মানুষকে বুঝি আরতি করে? তাতে পাপ হয় যে নন্তু। আমি বললাম, না—হয় না; যদি পাপ হয় সে পাপের ভাগী আমি হব, তোমার কিছু হবে না।—দিদি আমাকে এক কথাই বারে বারে বুঝাতে

লাগল, মানুষকে আরতি করলে ভয়ানক পাপ হয়। কিন্তু আমি কিছুতেই ছাড়লাম না। আরতি আমাকে করতেই হবে। অবশেষে অন্যোপায় হয়ে রাধাকৃষ্ণের ধ্যান আর আর প্রণাম আবৃত্তি ক'রে, তাদের কাছে অনেক ক্ষমা চেয়ে, আর অনুমতি নিয়ে দিদি আমাকে আরতি করা আরম্ভ করলো। দিদির হাত কাঁপছিল। পাপের ভয়েই বোধহয়। হঠাৎ খানিকটা তেল আর ছোট্ট একটি জলন্ত পল্‌তে আমার জামার উপর পড়ে গেল। আমি চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম। বাড়ীর অন্যান্য সকলে ছুটে এল। তাড়াতাড়ি আগুনটা নিভিয়ে ফেলা হল। বিশেষ কিছুই হয়নি, জামাটা কেবল ধরে উঠেছিল। দিদিকে সেদিন কি গালাগালি খেতে হয়েছিল! আগুন নিয়ে খেলা! পিসীমা এসে সব শুনে, হাতের কাছে একটা কাঠের চেলা পড়েছিল, তাই দিয়েই জোরে জোরে ঘা কয়েক দিল দিদির পিঠে, বেচারা দিদি। সে দাগ বোধহয় তার পিঠ থেকে এখনও মিলায়নি। অথচ আমার মন থেকে সবই মিলিয়ে গেছে আজ! দিদিকে ভুলে যাওয়ার জন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারলাম না কিছুতে। আনন্দও হ'ল। বিস্মৃতির পাড় থেকে (মৃত্যুর চেয়ে সে কম কিসে) একটি পরমাত্মীয়াকে ফিরে পেলাম। এ পাওয়া অপ্রত্যাশিত, এর আনন্দও তাই সুবিপুল।

পিসীমা বলল, 'এত কি ভাবছিস নন্তু, যেতে পারবিনে?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই পারব পিসীমা, কালই যাব, আর যদি পারি—দিদিকে নিয়ে আসব এখানে কয়েক দিনের জন্য।—কেমন?'

পিসীমা খুব খুসী হল—'দেখিস চেষ্টা ক'রে, যদি ওরা দেয়। ওরা কি আর দেবে?'

নীলপুকুরে দিদির বিয়ের সময় গিয়ে দিন তিনেক ছিলাম। আর যাওয়া হয়নি। নৌকায় যেতে হয়, নদী ঘুরে যেতে পুরা একদিন লাগে। একটা একমাল্লাই ঠিক করে নিয়ে পরের দিনই ভোরে রওনা হলাম। সন্ধ্যার ঘন্টাখানেক আগে নৌকা ভিড়ল। নদী আর নীলপুকুরের মাঝখানে ছোট্ট একটা মাঠ। ওটা পার হতে খুব বেশী সময় লাগে না। গ্রামে প্রবেশ করে দেখি পথ ঘাট সব ভুলে গেছি। কিছুই মনে নেই। একটি ছেলেকে দেখে বললাম, "বীরেন ঘোষের বাড়ীটা কোন দিকে একটু দেখিয়ে দাও তো খোকা।"

ছেলেটা বলল, "ঘোষেদের বাড়ী আপনি চিনে যেতে পারবেন না। আমার সঙ্গে আসুন।"

বাড়ীটার সামান্য দূর থেকে ভয়ানক চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, "ওকি খোকা, অত গোলমাল কিসের ও বাড়ীতে?"

ছেলেটি বলল, "বীরুকাকা গাঁজা খেয়ে এসে বৌকে মারছে। প্রায় প্রত্যেক দিনই মারে। বীরুকাকা খুব খারাপ লোক। আমি এখন যাই। ঐ ত বাড়ী।"

"না খোকা, আর একটু দাঁড়াও। তোমার বীরুকাকা কি করেন এখানে? তিনি ত কলকাতায় চাকরি করতেন।"

"এখন আর কলকাতায় থাকেন না। আমাদের বাজারে চালা উঠিয়ে দোকান করেন। মুদি দোকান, অনেক রাত্তির হয়ে গেল। বাবা এসে, বাড়ীতে না দেখলে ভয়ানক বকবে।"

ছেলেটি চলে গেলে আমি বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলাম। চেঁচামেচি সব থেমে গেছে। কিছুক্ষণ পূর্বেও যে একটা উৎকট অভদ্র চীৎকার চলছিল, তা এখন মনেও করা যায় না, বাড়ীটা এখন সম্পূর্ণ নীরব। স্তব্ধ বাড়ীর ভিতর যেতে আর পা উঠছিল না। কেমন যেন একটা সঙ্কোচ হতে লাগল। ছেলেটির মুখে যা শুনলেম তেমনি বিশ্রি ব্যাপার হয়ত এইমাত্র ঘটে গেল। এরপরে—তাছাড়া, দিদিও যে আমাকে ভুলে যায়নি তার নিশ্চয়তা কি। কি করব ভাবছি। হঠাৎ একটা ছোট ছেলের কাশি শুনতে পেলাম। পিছনে তাকিয়ে দেখি, একটি ঝুমকা জবার ঝোপ। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বছর দশেকের ছেলে বিড়ি টানছে, আর বেদম কাশছে। নতুন খাওয়া শিখছে। এখনও অভ্যস্ত হতে পারেনি। ধমকের সুরে বললাম, "এই খোকা, কি করছ ওখানে? এখানে এসে শোন ত একবার।"

ফল অন্য প্রকার হল, ছেলেটি হাতের বিড়িটা ফেলে দিয়ে প্রাণপণে ছুট দিল। আমিও পিছন পিছন ছুটতে ছুটতে বললাম, "দৌড়িও না খোকা, দৌড়িও না, শোন শোন—"

ছেলেটি থামল, অচেনা গলার স্বরে বিস্মিত হল অসম্ভব। আমি কাছে গিয়ে ওর হাতখানা ধরে ফেলে বললাম, "অত জোরে ছুটছিলে কেন বল ত? যদি পড়ে যেতে?"

ছেলেটি চুপ করে রইল। জিজ্ঞেস করলাম, "কি নাম তোমার?"

"শ্রীবিমানবিহারী ঘোষ।"

"বাবার নাম?"

"শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।"

—দিদির ছেলে! বললাম, "তোমার বাবাকে একবার ডেকে দাও ত।"

"বাবা গাঁজা খেয়ে এসে এই মাত্তর মাকে মারল শুনতে পেলেন না? আমি গেলে আমাকেও মারবে।"

বললাম, "তাহলে তোমার মাকে গিয়ে বল, উমেশপুরের নন্তু মামা এসেছে।"

ছেলেটি ছুটে গেল। মুহূর্তের মধ্যে দিদি আর জামাইবাবু একটি হ্যারিকেন নিয়ে ছুটে এলেন। জামাইবাবু বললেন, "নন্তু! কবে ফিরলে দেশে?—কোন সংবাদই পাইনি তো। তা এস, বারবাড়ীতে অন্ধকারে আছ কেন? ভিতরে যেতে পার না?"

দিদি বলল, "আয় নন্তু, ঘরে আয়।"

ঘরে গিয়ে দেখলাম, এইমাত্র একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে গেছে, বেশ বোঝা যায়। একটা জলচৌকি উল্টে পড়ে রয়েছে,—আগুনের মালসাটা ভেঙ্গে গিয়ে ঘরময় ছাই ছড়িয়ে পড়ছে। ঘরের জিনিসপত্রগুলো ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত। দিদি তাড়াতাড়ি ঘরটা ঝাঁট দিয়ে জিনিসপত্রগুলো পোছাতে আরম্ভ করলে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "জামাইবাবু, দেশে আছেন কত দিন? কলকাতায় কোন্ মার্চেন্ট অফিসে কাজ করতেন না?"

জামাইবাবু বললেন, "সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি। দাসত্ব আর পোষাল না। আজকাল গ্রামের বাজারেই একটা দোকান খুলেছি। বাজারের বার আনা খদ্দেরই আমার বাঁধা, বেশ স্বাধীন ব্যবসারে ভাই! 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'! প্রথমে দোকান খুলতে চাইলে সকলেই এসে বাধা দিল, বলল,— 'ও তুমি পারবে না।' যেন ব্যবসা করতে সাধারণ বুদ্ধির চেয়ে আর বেশী কিছু দরকার হয়। কেউ কেউ বলল—ওতে মান থাকবে না।' দেশের কি মনোবৃত্তি দেখছ? মান থাকবে দাসত্ব করলে, আর স্বাধীন ব্যবসায় হবে অসম্মান? এ জাত পরের গোলামী করবে না তো করবে কে?"

ইতিমধ্যে দিদি ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলেছে, বললে, "ওসব কথা পরেও বলতে পারবে। এখন ওকে ছেড়ে দাও খানিকক্ষণের জন্য, সারাদিন তো কিছুই খায়নি। এখন কিছু খেতে দিই।" পরে আমার দিকে চেয়ে বলল, "আয় নন্তু।"

জামাইবাবু বললেন, "সেই ভাল। তুমি খাওয়া দাওয়া কর নন্তু আমি একটু ঘুরে আসি।" বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

খেতে খেতে দিদির কাছে সবই শুনলাম।—রিডাকসনে চাকরি যাওয়ায় দেশে এসে যথাসর্বস্ব দিয়ে মুদির দোকান খুলেছে। প্রত্যেকেই নিষেধ করেছিল। কিন্তু কারও কথাই শোনেনি, ফল যা হবার হয়েছে। ওর মত লোকের কাজ দোকান করা? হিসাব পত্র কিছু রাখতে পারে কি? যা ছিল সবই গেছে। কলকাতায় থাকতে মদ চলত। ছোটলোকের সঙ্গে মিশে এখন সস্তার গাঁজা ধরেছে। নিষেধ করতে গেলেই ধরে মারে। খাটের উপর শুয়ে ছেলেটা ঘুমাচ্ছিল। ওর দিকে চেয়ে বললাম, "বিশু কোন্ ক্লাসে পড়ে? ওকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে ত?"

দিদি বলল, "স্কুল না ছাই! বলে, আমার চেয়ে বড় বিদ্বান কে আছে গ্রামে? আমি নিজেই ওকে পড়াব ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত, তারপরে দেব কলেজে ভর্তি করে। পড়ান ত কত! এক-একদিন এসে ছেলেটাকে মারতে মারতে শেষ করে ফেলে আর কি! ছেলেটাও কি মানুষ হবে? এই বয়সেই বিড়ি খেতে শিখেছে। মিথ্যে ছাড়া একটাও সত্য কথা বলে না। কথায় কথায় আমাকে মারতে ওঠে। যা দেখে-শোনে তাই শিখবে ত?—এতক্ষণ আমার কথাই বলছি! মা কেমন আছে নন্তু, তাকে বড় দেখতে ইচ্ছা করে।"

"ভাল আছে।"

ভোরে উঠে দেখি জামাইবাবু দোকানে চলে গেছে। ভাবলাম, আমিও যাই। দোকানও দেখে আসব, তাছাড়া বাজারও নাকি এখানে খুব সকালে মেলে, বাজারটাও করে আনা যাবে। জামাটা গায়ে দিয়ে, পকেটে হাত পড়তেই দেখি মনিব্যাগটা নেই। বুঝলাম সবই, খুবই সঙ্কোচ হল, তবুও দিদির কাছে গিয়ে বললাম, "একটা টাকা দিতে পারবে দিদি? যে জামাটায় মনিব্যাগটা ছিল, ভুলে সেটা রেখে আর একটা গায়ে দিয়ে এসেছি।"

দিদিও সব বুঝতে পারল। নিমেষের জন্য ওর মুখটা লাল হয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই নিভে পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। বলল, "টাকা কোথায় পাব ভাই? নগদ একটা পয়সাও কি ঘরে আসে। সব ঐ গাঁজার পিছনে। ছেলেটাকে দিয়ে মাঝে মাঝে চাল ডাল পাঠিয়ে দেয় কিছু কিছু। ঐ পর্যন্ত—"

বিকেল বেলা। দিদিদের বাড়ীর পাশেই একটা বড় পুকুর। পাড় দিয়ে নানা রকমের গাছ। সুপারী, খেজুর, নারকেল। ডাল আর পাতা পড়ে জলটা পচে একেবারে কালো হয়ে গেছে। কয়েকখণ্ড তালের গুঁড়ি দিয়ে ঘাট বেঁধে দেওয়া হয়েছে। পচা কালো জলের সঙ্গে তালের গুঁড়ির রং ঠিক মিশে গেছে। ওরই একটার উপর বসে ভাবছি, "এতদিন মৃত্যুর জন্যই শোক করে এসেছি। আজ থেকে জীবনের জন্যও আরম্ভ হল।"

পায়ের শব্দে চেয়ে দেখি দিদি!

"পচা জলে পা ডুবিয়ে কি করছিস নন্তু? জোঁক লাগবে যে। পুকুরটায় ভয়ানক জোঁক। কুল আর চালতে মাখা খাবি নন্তু? তুই ত খুব ভালবাসতিস ছোটবেলায়—"

ছেলেবেলার সেই ছেলেমানুষ দিদি!*

---

* প্রথম প্রকাশিত গল্প—দেশ পত্রিকায়, ১৩৪৩।

আত্মকথা

আত্মকথা বলা ধরতে গেলে খুবই সহজ। আর একদিক থেকে খুবই কঠিন কাজ। গ্রহণ বর্জনের পরীক্ষা আত্মকথায় বোধহয় কঠোরতর। অবশ্য লেখক সারাজীবন তাঁর নিজের রচনার ভিতর দিয়ে পরোক্ষে প্রত্যক্ষে নিজের কথাই বলেন। কখনো স্ববেশে কখনো ছদ্মবেশে তাঁর রচনার মধ্যে তিনি উপস্থিত থাকেন। তাঁর কোন লেখাই নিজের অভিজ্ঞতা কি অনুভূতি উপলব্ধির বহির্ভূত নয়।

লেখার প্রেরণা প্রথমে কোত্থেকে এসেছিল এ একটি মূল প্রশ্ন। এ প্রশ্নের যথাযথ সদুত্তর দিতে পারব এমন আশা করি না। তবে এ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। খানিকক্ষণের জন্যে নিজের মুখোমুখি বসবার একটা উপলক্ষও হয়। আত্মচরিতের উৎস সন্ধানে অভিযাত্রী হতে মাঝে মাঝে কারই বা না সাধ হয়? কিন্তু চেনা পথ বলে সে পথ কম দুর্গম নয়। বরং ফিরে তাকিয়ে দেখি বহু পুরোনো চিহ্ন লুপ্ত হয়ে সে পথ এক অচিন পথেরই সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লেখার প্রেরণা প্রথম কোত্থেকে এসেছিল এর জবাব দেওয়া সহজসাধ্য নয়। তবে সন্ধানে আনন্দ আছে। যদি বলি আরো পাঁচটি প্রবণতার মত এও একটি প্রবণতা কারো কারো মধ্যে থাকে। সহজাত বলেই তাকে মনে হয়। অনুকূল পরিবেশে তা ক্রমে পরিপুষ্ট হয়। প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। যাঁরা ভাগ্যবান তাঁরা এঁকে সারা জীবনের সঙ্গিনী রূপে পান। আবার অনেকের ক্ষেত্রেই ইনি ক্ষণসঙ্গিনী। প্রেমের মতই এঁর আবির্ভাবও যেমন রহস্যময় অন্তর্ধানের পথও তেমনি দুর্নিরীক্ষ্য।

প্রবণতার কথা বলছি। সেই প্রবণতা যে পরিবেশে পরিপুষ্ট হয়েছিল তার দিকে একবার পিছন ফিরে তাকানো যাক।

আমাদের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার একটি পল্লীগ্রামে। তার পশ্চিম দিকে একটি ছোট নদী কুমার। এই নামটি আমার কানে বড় মধুর লাগে। শব্দটির ধ্বনির জন্যে। নামের মত এর রূপটিও স্নিগ্ধ শান্ত। বর্ষায় এই নদী প্রতি বছরই প্লাবিত হত। খাল বিল ভরে যেত। কিন্তু দু-একবার বন্যার বছর ছাড়া গৃহস্থের উঠানে কখনো জল উঠত না। তেমনি সারা বছরই নদীতে জল থাকত। চৈত্র কি বৈশাখ মাসে এ জল কোমরের নিচে নামত না।

পশ্চিমে নদী আর পূর্বে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। সেই মাঠের ধার ঘেঁষে চাষী গৃহস্থদের বাড়ি। বাড়ির পরেই শস্য ক্ষেত। ধান পাটের সবুজ সমুদ্র। বর্ষায় এই মাঠও তলিয়ে যেত। প্রান্তর হয়ে যেত সায়র।

বৃহৎ গ্রাম ছিল আমাদের সদরদি। শুনেছি সদরদি একটি গ্রাম নয়। বাইশটি গ্রামের একটি মৌজা। কিন্তু ছেলেবেলায় আমাদের আনাগোনা ছিল একটি পাড়ার মধ্যেই। সেই পাড়ায় নানা জাতের বাস। চাষী মুসলমান যেমন ছিল তেমনি ছিল ধোপা নাপিত কামার কুমার, ব্যবসায়ী সাহা-সম্প্রদায়, জেলে জোলা আরো বহু রকমের বৃত্তিজীবী। এদের প্রতিটি ব্যক্তি, কি প্রতিটি সম্প্রদায়ের সঙ্গেই যে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তা নয়। কিন্তু এই পটভূমি কখনো জ্ঞাতসারে কি কখনো অজ্ঞাতে আমার চিত্তভূমিকে এক বিশেষ ধরনের রূপবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে।

তখন যেমন থাকত আমাদের পরিবারটি ছিল বৃহৎ আর একান্নবর্তী। সেই পরিবারে আমার বাবা ছিলেন সবচেয়ে বড় আর প্রধান পুরুষ। কিন্তু তাঁকে কেউ বড় কর্তা বলত না, বলত মেজো কর্তা। তাঁর দাদা শুনেছি পঁচিশ বছর বয়সে দুটি ছেলে মেয়ে রেখে মারা গিয়েছিলেন। আমি সেই জ্যাঠামশাইকে দেখিনি। তাঁর মৃত্যুর বহু পরে আমার জন্ম। কিন্তু যতদূর জানি তিনি বড়কর্তা হবার আগেই সংসার থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তবু বাবা মেজো কর্তা বলেই পরিচিত হয়ে রইলেন। তাঁর সমবয়সী কি সামান্য কমবয়সী বন্ধুরা তাঁকে ডাকত মেজদা বলে। বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর তাঁর এই সব অনুজের আনাগোনা দেখেছি আমাদের বাড়িতে। তাঁদের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক ছিল না কিন্তু ভাবের সম্পর্ক ছিল প্রগাঢ়।

আপন কাকা একজনকেই দেখেছি। তিনি ছিলেন বাড়ির ধলা কর্তা। পাড়ার ধলাদা। ধলা মানে সাদা। খুব ফর্সা রং ছিল তাঁর। দেখতেও বেশ সুপুরুষ ছিলেন। হয়তো সেই জন্যেই এই নাম।

বাবার আরো পাঁচ ভাই ছিলেন। তাঁদের আমি দেখিনি। তাঁরা সব অল্প বয়সে মারা গেছেন। কেউ কৈশোরে কেউ তারুণ্যে কেউ প্রথম যৌবনে। তাঁদের গল্প শুনতাম আমার এক ঠাকুরমার কাছে। তিনি বাবার মা ছিলেন না, ছিলেন মাতৃসমা পিসীমা। নিঃসন্তান বাল-বিধবা। ভাইপোদের লালন-পালন করেছেন। তাঁর মুখে আমার সেই মৃত কাকাদের কাহিনী শুনতাম। তাঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন বিষম ক্রোধী আর তেজস্বী পুরুষ। কেউ বা অল্প বয়সেই যোগ সাধনার অভ্যাস করেছিলেন। তাঁদের কথা শুনতে শুনতে মনে হত যেন রূপকথা শুনছি। আমাদের সেই ঠাকুরমাকে আমরা ভাই বলে ডাকতাম। সেই ভাইয়ের স্নেহ স্মৃতিতে আমার মৃত কাকারা আবার যেন জীবন্ত হয়ে উঠতেন।

সবচেয়ে জীবন্ত প্রাণবান পুরুষ ছিলেন আমার বাবা। এমন পুরুষ মূর্তি

আমি আর জীবনে দেখিনি। দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান শক্তিমান পুরুষ। তিনি একাধারে যেমন বৈষয়িক ছিলেন তেমনি ছিলেন শিল্পরসিক। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। মার্গসঙ্গীত রাগসঙ্গীতে তাঁর দখল ছিল। অথচ কোন ওস্তাদের কাছে তিনি বিধিবদ্ধভাবে গান শেখেননি। সেই সঙ্গতি তাঁর ছিল না। শুনেছি অল্প বয়সে একটি বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়েছিল। প্রথম জীবনে তাঁর জীবনসংগ্রাম ছিল কঠোরতর।

শুধু গান নয় তিনি অভিনয় করতে পারতেন। ভালোবাসতেন তাস পাশা খেলা। যখন খেলতে বসতেন খেলার মধ্যে এমন মগ্ন হয়ে যেতেন মনে হত না তিনি কাজের মানুষ। তিনি সদালাপী ছিলেন। কথোপকথনে কৌতুক রস ঢেলে দিতে জানতেন।

তাঁর সাহিত্যপ্রীতিও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলী তাঁকে পড়তে দেখেছি।

লেখালেখির মধ্যে তিনি চিঠিপত্র ভালো লিখতে জানতেন। আর দলিল-পত্রের মুসাবিদায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পেশায় তিনি মুহুরী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সেরেস্তার উকিল ছিলেন বহু বিষয়ে তাঁর ওপর নির্ভরশীল। সমব্যবসায়ীদের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল।

এই কোমলে কঠিনে গড়া একই সঙ্গে বিষয়বুদ্ধি আর শিল্পবুদ্ধিতে সমৃদ্ধ বহুকর্মা পুরুষটির প্রায় কিছুই আমি পাইনি। না তাঁর আকার না তাঁর প্রকৃতি। শুধু সাহিত্যপ্রীতি, শুধু যৎসামান্য লেখার শক্তি। শুধু নিজের যন্ত্রণাকে ভাষায় ব্যক্ত করবার কথঞ্চিৎ ক্ষমতা। এই আমার উত্তরাধিকার।

আমি বাবার মত হইনি এ সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকেই আমি সচেতন ছিলাম। আমার চার দিকের উচ্চারিত অনুচ্চারিত মন্তব্য আর মনোভাব আমাকে সচেতন করে তুলেছিল। বাবা ছিলেন আটপিঠে মানুষ। দরকার হলে যেমন কোদাল কুড়ুল চালাতে পারতেন তেমনি কলম চালাতেও তাঁর ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু গাঁয়ের ছেলে হয়েও আমি না পারি গাছে উঠতে, না পারি নৌকো বাইতে। আরো এমন হাজার কাজ পারি না যা আমার ছোট ভাই পারে, যা আমার সমবয়সীরা এমন কি কম বয়সীরাও পারে। বাবা যেমন সামাজিক মানুষ, বলতে কইতে ওস্তাদ, আমি ঠিক সেই পরিমাণে লাজুক মুখচোরা কুনো স্বভাবের।

আমার ছোট মামীমা দেখতে যেমন সুন্দরী ছিলেন তেমনি সুরসিকা। সেই আমলের তুলনায় লেখাপড়াও মোটামুটি ভালোই জানতেন। তিনি মানিকদি থেকে আমাদের বাড়িতে একদিন বেড়াতে এসে বাবাকে ঠাট্টা করে বললেন,

'ঠাকুরজামাই, খুব যে বাবা বাবা করে ছেলেকে আদর করছেন। আপনার বাবা কিন্তু তার বাবার মত হয়নি।' শুনে বাবার মুখখানা মুহূর্তের জন্য ম্লান হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই তিনি হেসে বলেছিলেন, 'বউঠান, একজন কি আর একজনের মত হয়?'

হয় না। অন্তত সব সময় হয় না। কিন্তু প্রত্যেক বাপের মনেই বোধহয় সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে ছেলে তাঁর সদ্‌গুণগুলির অধিকারী হোক। ছেলের মধ্যে তিনি তাঁর নিজের প্রতিমূর্তি দেখতে চান।

বাবার সেই আশা পূর্ণ হয়নি। আমি তা মুহূর্তে মুহূর্তে টের পেতাম। তাঁর নৈরাশ্য যে আমারও নৈরাশ্য। আমি তাঁকে ভালোবাসতাম, পিতৃগৌরবে গৌরব বোধ করতাম। আমাদের ওই অঞ্চলের মধ্যে তিনি নিজের ধরনে খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর জন্যে আমার গৌরব ছিল। কিন্তু তাঁর এই নৈরাশ্য ভিতরে ভিতরে আমাকে পীড়িত করত। মাঝে মাঝে বিদ্বিষ্ট বিরূপ করে তুলত। আমি তাঁর যত কাছে ছিলাম, তত দূরে। তাঁর চারিদিকে লোকজনের ভিড় থাকত আমি সরে আসতাম নির্জনে ঘরের কোণে।

মাঝে মাঝে মনে হয় এই নৈরাশ্য আর অসহায় নিঃসঙ্গতাই কি আমাকে কাগজ-কলমের আশ্রয় নিতে শিখিয়েছিল?

অথচ বাবা আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। যখন আমি বেশ বড় হয়েছি তখনো পাশাপাশি শুয়ে মাঝে মাঝে আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতেন। আমার দিকে পিছন ফিরে বলতেন, 'তুমি আমাকে জড়িয়ে ধর, আরো কাছে এসে জড়িয়ে ধর।'

আমরা অঙ্গাঙ্গী হয়ে থাকতাম। পরে মাঝে মাঝে আমি ভেবেছি নিজের দুর্বলতম অঙ্গকে মানুষ যেমন লুকিয়ে রাখতে চায়, মানুষ যেমন লুকিয়ে লুকিয়ে ভালোবাসে, একি সেই ভালোবাসা?

কিন্তু সৃষ্টির প্রেরণার মূলে শুধু নেতিবাদের একাধিপত্য মেনে নিতেও আমার মন সায় দেয় না। যা অস্মিতাসূচক যা সদ্ভাববাচক বাল্যে কৈশোরে তাও কি আমি প্রচুরভাবে দু হাত ভরে পাইনি? একান্নবর্তী পরিবারে ঠাকুরমা, মা, জেঠীমা, কাকীমাদের স্নেহ, সযত্ন মনোযোগ কি আমার চারিদিক ঘিরে থাকেনি? আমি যে তুচ্ছ নই, ফেলনা নই সেই বোধ আমার মনে জাগিয়ে রাখেনি? আমি যেমন বর্জন করেছি বর্জিত হয়েছি তেমনি কি গৃহীতও হইনি? গ্রহণও করিনি? মনে পড়ে ছেলেবেলায় ভোরবেলায় ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বাবা আমাকে তাঁর বিছানায় ডেকে নিতেন। একের পর এক সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতেন, আবৃত্তি

করাতেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিৎ হয়ে গান গাইতেন। শুনতে শুনতে অনেক গানের কথাই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কতদিন আমি কথা বলে দিয়েছি, তিনি গেয়েছেন। আমার পছন্দমত গান তিনি খুশি হয়ে গেয়েছেন।

ভাবতে ভালো লাগে জীবনপ্রভাতে সেই গীত-গুঞ্জিত ভোরবেলাগুলি আমার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। সেই সুর কণ্ঠে ধরা দেয়নি। কলমে কিছুটা প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

আমার বাল্যশিক্ষক অক্ষয়কুমার শীল থাকতেন আমাদের পাশের বাড়িতে। দুই বাড়ির মাঝখানে ছিল অন্ধকার বাঁশের ঝাড় আর বড় একটা এঁদো পুকুর। তারই পাশ দিয়ে ছিল ছায়াচ্ছন্ন যাতায়াতের পথ। সেই পথে মাস্টারমশাই কতবার যে যাতায়াত করতেন তার ঠিক নেই। বাড়ির কাছাকাছি গিয়েও আবার ফিরে আসতেন। বাবাকে ডেকে বলতেন, 'ভাই মহেন্দ্র, আর একটা কথা মনে পড়ে গেল।'

বাবা হেসে বলতেন, 'তোমার মনের কথার কি আর শেষ আছে মাস্টার?'

অক্ষয় মাস্টার শুধু শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি আমাদের ওই অঞ্চলের মধ্যে একজন নামকরা কীর্তনীয়াও ছিলেন। তাঁর নিজের একটি কীর্তনের দল ছিল। বছরের প্রায় সব সময় তাঁর দলবল বাড়িতে লেগে থাকত। দাম্পত্য কলহও লেগে থাকত সারা বছর। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে খোল করতালের বোল ভেসে আসত, কীর্তনের কলি ভেসে আসত বাঁশবন পেরিয়ে।

ছিপছিপে চেহারার এই মানুষটি খুব কড়া মাস্টার। রাগলে তাঁর মুখ থেকে যে-সব ভাষা বেরোত তা অশ্রাব্য। কিন্তু সেই মানুষই যখন কীর্তনের আসরে নামতেন তখন শ্রোতারা উৎকর্ণ হয়ে থাকত।

আমি বই শ্লেট নিয়ে তাঁর বাড়িতে পড়তে যেতাম। মাস্টার হিসাবে তাঁকে দারুণ ভয় করতাম, কিন্তু অভয়রূপ দেখতাম কীর্তনীয়ার মধ্যে।

শ্লেট পেনসিলে তাঁর কাছেই আমার হাতে খড়ি। মনে পড়ে প্রথম যেদিন ক লিখতে শিখলাম তিনি আমাকে কোলে করে নিয়ে এলেন সেই বাঁশ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে। আমাদের বাড়িতে এসে বাবাকে ডেকে বললেন, 'ভাই মহেন্দ্র, দেখ, তোমার ছেলে ক লিখেছে।'

চেয়ে দেখলাম তাঁর দুটি চোখ ছল ছল করছে। সেই আনন্দাশ্রুর হেতু সেদিন বুঝতে পারিনি। এই প্রবীণ শিক্ষক জীবন ভর কত শত নিরক্ষর ছেলেকে সাক্ষর করে তুলেছেন, এই ক অক্ষর তো তাঁর কাছে নতুন নয়। না কি সেই ক নিত্য নতুন। প্রতিটি ছাত্রের প্রথম ক অক্ষরের মধ্যে সেই শিক্ষকেরও যেন প্রথম বর্ণপরিচয়।

আমাদের কুলধর্মও ছিল বৈষ্ণব। বাবা মা খড়দহের গোস্বামী বংশের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁদের সেই দীক্ষাগুরুকে আমি দেখিনি। দেখেছি গুরু-পুত্রদের। ওরা কেউ না কেউ বছরে একবার আসতেন। কোন কোনবার এক সঙ্গে দু-তিন জনও আসতেন। তাঁরা যখন আসতেন বাড়িতে উৎসবের ধুম পড়ে যেত। সেই উপলক্ষে পাড়া-পড়শীরা সব আসতেন। পূবের ঘর আর দুদিকে দুখানি বারান্দা প্রায় সারাদিন লোকজনে ভরা থাকত।

এঁদের একজনের নাম ছিল ব্রজকিশোর গোস্বামী। তিনি আমাদের খুব স্নেহ করতেন। দেখতে ভারি সুপুরুষ ছিলেন। গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল গৌর। কপালে তিলক সেবা। হাতে জপমালার লাল রঙের থলি।

একদিনের কথা মনে পড়ে। তাঁকে প্রণাম করতে তিনি আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বসালেন।

দিদিভাই সামনে ছিলেন। তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ও কি করছেন? পাপ হবে যে।'

বাবার পিসীমাকে পিসীমা বলেই ডাকতেন ব্রজকিশোর। তিনি হেসে বললেন, 'না পিসীমা, পাপ হবে না। শিশুর আবার পাপ কিসের।' তারপর নিজের মনেই যেন বললেন, 'বড় হয়ে এরা কি আর আমাদের কাছে আসবে? আমাদের কাছে দীক্ষা নেবে?'

দীক্ষা সত্যিই নিইনি। ও পাট বাবা কাকাদের আমলেই শেষ হয়েছিল। বড় হয়ে গুরু পুরোহিততন্ত্রের অনেক সমালোচনা করেছি। কিন্তু তাঁর সস্নেহ ব্যবহারটুকুর কথা এখনও মনে আছে।

একথা অস্বীকার করার জো নেই, আমার মন সেই কীর্তন, ভাগবতপাঠ, পূজাপার্বন, যাত্রা, কবি, কথকতার মধ্যে রসের দীক্ষা গ্রহণ করেছিল।

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে এসে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন চাকলাদার ঠাকুরদা। বাবার মামা হতেন তিনি। আমার লেখকজীবনের প্রথম পর্বেই তাঁকে নিয়ে আমি গল্প লিখেছি। পরে পিছে ফিরে দেখা পর্যায়ের লেখাগুলিতেও তাঁর কথা বলেছি। এখানেও সংক্ষেপে একটু বলে রাখি।

ঠাকুরদার অনেক গুণ ছিল। তিনি সংসারের যাবতীয় কাজ নিখুঁতভাবে করতে পারতেন। গান বাজনা জানতেন। বিশেষ করে তবলায় তাঁর হাত খুব ভালো ছিল। তাঁর কথাবার্তা ছিল কৌতুকস্নিগ্ধ। প্রয়োজনীয় কত কিছুই তিনি জানতেন। অপ্রয়োজনের কাজও কম জানতেন না। হাউই তুবড়ি চরকি নানারকমের আতসবাজি তৈরি করতে পারতেন তিনি। তাঁর গুণপনায় যেন

শেষ ছিল না। ছিল না শুধু একটি গুণ। বিষয়বুদ্ধি। আর কোন গুণপনাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা। শুনেছি তিনি কলকাতায় গিয়েও নানা রকমের চাকরি করেছিলেন কিন্তু কোন কাজেই টিঁকে থাকতে পারেননি। কোন কাজেই তাঁর মন বসেনি। আসলে মনটা ছিল তাঁর ভবঘুরে ধরনের। ভুল করে গৃহস্থ হয়েছিলেন। সে গৃহ শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি।

আমাদের বাড়িতে স্থায়ীভাবে চলে আসবার সময় তিনি নানা জিনিস সঙ্গে এনেছিলেন। মাছধরা জাল, ছোট বড় কয়েকখানা দা, একখানা রামদা, বাঁয়া তবলা—অগুনতি জিনিস। সেই সঙ্গে এনেছিলেন বড একটি কাঠের বাক্স বোঝাই বই। সেই বাক্সে হরেক রকমের বই ছিল। তবলা তরঙ্গিনী, আতসবাজি প্রস্তুত প্রণালী, ম্যাজিক শিক্ষা। আর ছিল রামায়ণ, মহাভারত, মাইকেল গ্রন্থাবলী, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ আরো অনেক বই। এখন যাঁরা বিস্মৃতনামা, তাঁদের বহু নাটক উপন্যাস।

আমাদের গাঁয়ে এম. ই. স্কুলে পড়বার সময়ই আমি তাঁর এই বইয়ের বাক্সটি দখল করেছিলাম। তিনি আপত্তি করেননি। কি করলেও অন্য কারো সামনে লোক দেখানো আপত্তি।

আমাদের কাঁঠালতলার ছায়ায় বসে চটি (বাঁশের বাঁখারি) চাঁছতে চাঁছতে তিনি মেঘনাদবধ আর পলাশীর যুদ্ধ আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন সেই কথা আজ মনে পড়ে।

আবার কাজ করতে করতে কবিগানও গাইতেন :

"পাগলা মনটা আমার
বিরজা নদীর কূলে থেকে না জানো সাঁতার।"

কাজ করতে করতে এই ধুয়ার সঙ্গে নতুন পদ তৈরি করে করে ঠাকুরদা গান গাইতেন।

যিনি সংসারের আর পাঁচজনের মত নন সেই ভিন্ন প্রকৃতির মানুষটির প্রতি আমি দারুণ আকর্ষণ-বোধ করতাম। তাঁর কাছ ছেড়ে নড়তে চাইতাম না।

চাকলাদার ঠাকুরদার সান্নিধ্যে আমি ভারি আনন্দ পেতাম। বাড়ির অন্য কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বললে আমি ক্ষুব্ধ হতাম। প্রতিবাদ করতাম।

বাবার চেয়ে বছর তিনেকের বড় ছিলেন তিনি। বাবা তাঁকে ঠাকুরমামা বলে ডাকতেন। কিন্তু মামা ভাগ্নের মধ্যে প্রকৃতির মিল ছিল না। মামার চালচলন তাঁকে মাঝে মাঝে ধৈর্যহীন করে তুলত। বিরূপ মন্তব্য করে বলতেন, 'উনি নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছেন।'

আমার কিন্তু এই নিস্ফল অসার্থক মানুষটির ওপর গোপনে গোপনে দারুণ সহানুভূতি ছিল। তিনি কত কাজ জানতেন। আমি কিছুই জানতাম না। বা এখনও জানি না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমি এক ধরনের সাদৃশ্য অনুভব করতাম। কোন কিছুকেই আঁকড়ে ধরতে না পারার সাদৃশ্য।

কবে যে প্রথম লিখতে শুরু করি তার সন তারিখ কিছুতেই মনে পড়ছে না। বাল্যরচনার সেই বিষয়বস্তুও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে।

মনে পড়ে ঠাকুরদার সেই আমকাঠের বাক্সের মধ্যে একখানি পৌরাণিক নাটক পেয়েছিলাম 'গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ'। সে বইয়ের গোড়ার দিকটাও ছিল না শেষের দিকটাও ছিল না। তবু সেই নাটকের অনুকরণে আমিও একটি নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম।

আর একবার আমাদের পারিবারিক ইতিবৃত্ত লিখেছিলাম ডায়েরির মত করে। তখন আমি ভাঙ্গা হাই স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি। আমাদের বড়দা (আমার জ্যেঠতুতো ভাই) সেই সময় যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। এই নিয়ে দিন-কয়েক ধরে যে নানারকম আলাপ আলোচনা কথান্তর মতান্তর বাদানুবাদ হয়েছিল আমি তার বিস্তৃত বিবরণ প্রতিদিন লিখে যাচ্ছিলাম। আমি কী লিখেছি সে সম্বন্ধে বাবা খুব কৌতূহলী ছিলেন। ভাঙ্গার সেরেস্তা থেকে ফিরে এসে প্রতি রাত্রেই জিজ্ঞাসা করতেন, 'দেখি কী লিখেছিস।'

যে পিতৃহীন ভাইপোকে তিনি ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, কলকাতায় ভাল চাকরি পেয়ে বিয়ে থা করে সে পৃথক হয়ে যাচ্ছে এই নিয়ে বাবার মনে অশান্তি কম ছিল না। তবু আমি কী লিখলাম, এই পারিবারিক ঘটনা আমার মনে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল সে সম্বন্ধে তাঁর মনে বেশ ঔৎসুক্য ছিল। তাঁর কাছে আমারও কোন সংকোচ ছিল না। যা লিখেছি সব তাঁকে পড়তে দিতাম। খাতাখানা এগিয়ে দিয়ে আমার রচনার প্রথম পাঠকের মুখের দিকে আমি সাগ্রহে তাকিয়ে থাকতাম। তাঁর মুখে কখনো হাসি ফুটত, কখনো সেই মুখ গম্ভীর হয়ে উঠত। কারণ আমার সেই লেখায় পিতৃচরিত্রের সমালোচনাও ছিল। বাবা পড়তে পড়তে বলতেন, 'হুঁ। কিন্তু তোমার বানান এত ভুল হয় কেন?'

আমি ভাবতাম বানান ভুলটাই কি বড় কথা?

যৌথ পরিবারে সেই ভাঙন আমার কৈশোর মনে খুব দাগ কেটেছিল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল পৃথগন্ন হয়ে বড়দা যেন সত্যিই আমাদের কাছ থেকে বহুদূরে চলে গেলেন। অনাত্মীয় হয়ে গেলেন। আলাদা হয়ে গিয়ে জেঠীমা আর আমাদের

তেমন ভালোবাসবেন না, বউদি আর তেমন করে গল্প করবেন না। এই ধরনের আশঙ্কা আমার মনকে ছেয়ে রেখেছিল।

আমার চেয়ে বিশ বছরের বড় এই বড়দাকে আমরা দারুণ ভালোবাসতাম। তিনি ছিলেন আমাদের চোখে হিরো। বংশের মধ্যে তিনিই প্রথমে কলেজে পড়েছিলেন। কলকাতায় গিয়ে বৃটিশ মার্চেন্ট অফিসে স্থায়ী চাকরি করেছিলেন। পূজোর ছুটিতে যখন বাড়ি আসতেন আমাদের প্রত্যেকের জন্যে জামাকাপড় নিয়ে আসতেন সঙ্গে। বড়দাও অভিনয় করতে পারতেন, গান গাইতে পারতেন। তাঁর মুখেই প্রথম শুনি রবীন্দ্রনাথের গান, রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি। তিনি আমাদের আবৃত্তি শেখাতেনও। বিদেশী উপন্যাস পড়ার দিকে তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। সেই সব উপন্যাসের কাহিনী তিনি আমাদের মুখে মুখে শোনাতেন।

ভালো চিঠি লিখতে পারতেন বড়দা। তাঁর হাতের লেখা ছিল যেমন সুন্দর, লেখার মধ্যেও তেমনি ছিল মুনশীয়ানা। খুব ছেলেবেলায় আর তাঁর চিঠির উপযুক্ত জবাব দিতে পারতাম না। বাবা কি কাকা বলে বলে দিতেন আমি লিখতাম। কিন্তু তাঁদের সেই ডিকটেশন সব সময় যেন আমার মনঃপূত হত না। কাকা মাঝে মাঝে ধমক দিতেন, 'কী হল তোর, নিজেও লিখতে পারবি না, আবার আমি যা বলব তাও তোর পছন্দ হবে না। এ তো মহাজ্বালা।'

কিছুকাল পরে অবশ্য ওঁদের কাউকে আর জ্বালাতাম না। যেমন করেই হোক নিজের চিঠির জবাব নিজেই দিতাম।

চিঠি লেখা ছিল বড়দার অন্যতম বিলাস। কলকাতা থেকে তিনি সবাইকে চিঠি লিখতেন। বউদিকেই অবশ্য বেশি চিঠি লিখতেন। ঘন ঘন মোটা মোটা চিঠি আসত তাঁর। গ্রামের ডাকঘর থেকে আমিই সেই চিঠি নিয়ে আসতাম।

বউদি খামের মুখ ছিঁড়ে ছোট চিঠিটা আমার হাতে দিতেন। কিন্তু তাঁর কাছে লেখা কয়েক পাতা জোড়া চিঠি কিছুতেই হাতছাড়া করতেন না।

বউদি আমার চেয়ে দশ বছরের বড়। কিন্তু আমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। তাঁর সঙ্গে আমার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হত। একই উপন্যাস কাড়াকাড়ি করে ভাগাভাগি করে পড়তাম।

একদিন আমি দাবি করলাম, 'বউদি তোমার কাছে বড়দা কী লিখেছে দাও না একটু দেখি।'

বউদি হেসে বললেন, 'হুঁ. তোমাকে আমার ওই চিঠি দেখাই। পাকা ছেলে কোথাকার।'

তবু আমি কাড়াকাড়ি করে কিছুটা দেখেছিলাম। একটি সম্বোধন ভারি

অপূর্ব আর মধুর গেলেছিল, 'প্রাণের কুসুম'। ভেবেছিলাম ঠিক ওইরকম সম্বোধন করে আমি কবে কাকে চিঠি লিখতে পারব।

বড়দা একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'আমি শুধু চিঠিতেই সাহিত্য চর্চা করে গেলাম। তার বেশি আর এগোলো না। তুমি লিখছ। আরো লিখবে, তুমি হবে আমাদের বংশের প্রথম লেখক।'

আমারই বা বেশিদূর এগোল কই।

বড়দার জীবনপ্রবাহ বড় বিচিত্র। একসময় তিনি ছিলেন খুবই সম্ভোগী পুরুষ। সংসারের ভোগ সুখে তাঁর যথেষ্ট আসক্তি ছিল। পরে তিনি সেই সংসার ত্যাগ করেছিলেন। বিরূপাক্ষের নামান্তর রূপান্তর ঘটেছিল স্বামী কৃষ্ণানন্দে। সম্প্রতি তাঁর লোকান্তর হয়েছে।

তাঁর বিচিত্র জীবননাট্য নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে লেখার ইচ্ছা আছে। পরে একদিন লিখব।

পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে কৈশোরে তারুণ্যে আমার আরো একজন সাহিত্যসঙ্গী ছিলেন। তিনি আমাদের প্রতিবেশী দিগিন্দ্রনাথ রাহা। তিনি বড়দারই প্রায় সমবয়সী। দুই পরিবারের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। দিগিন-কাকা ছিলেন আমাদের পারিবারিক বন্ধু। পাশা খেলতে যেমন ভালোবাসতেন, সাহিত্য চর্চাতেও তাঁর তেমনি অনুরাগ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী থেকে পছন্দমত অংশগুলি তিনি পড়ে পড়ে শোনাতেন। পঠিত বিষয় নিয়ে আলাপ করতেন আলোচনা করতেন। চাকলাদার ঠাকুরদা আর আমি সেই আলোচনায় সাগ্রহে যোগ দিতাম।

ভাঙ্গা হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে যখন পড়ি আমরা ক্লাসের কয়েকজন বন্ধু মিলে একখানি হাতে লেখা পত্রিকা বের করেছিলাম। সেই পত্রিকার নাম ছিল আহ্বান। ক্লাসের সেরা ছাত্র শান্তি মুখার্জি—ভালো নাম সুখেন্দু—ছিল সেই পত্রিকার সম্পাদক। আর আমি ছিলাম ঔপন্যাসিক। আমার সেই ধারাবাহিক উপন্যাসের নাম ছিল মুক্তার হার। কিন্তু সেই হার পুরোপুরি গাঁথা হবার আগেই কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। সে উপন্যাস আর শেষ করা হল না। সেই লেখার বিষয়বস্তু ভুলে গেছি। মনে করে রাখবার মত গুরুত্বও তাতে ছিল না। কিন্তু মুক্তার অক্ষরে গাঁথা হয়ে আছে সেদিনের সেই উৎসাহ উদ্দীপনা সাহিত্যচর্চা আর বন্ধুসান্নিধ্য।

প্রায় একই সময় আমাদের গ্রাম থেকে আমরা একখানা হাতে লেখা পত্রিকা বের করেছিলাম। সে কাগজের নাম ছিল মাসিক মুকুল। আমার ভাই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র তার ব্যবস্থাপক, সহযোগী খুড়তুতো ভাই হেমেন্দ্র। আমি সম্পাদক। আর

আমাদের বন্ধু কৃষ্ণদাস বৈরাগী একাধারে ছিল সেই কাগজের কবি চিত্রকর আর লিপিকর। কৃষ্ণদাস এই পত্রিকার কয়েকখানি করে কার্বন কপিও তৈরি করত। সেগুলি বিতরিত হত পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামান্তরেও। দু-এক কপি বিক্রীতও হয়েছিল বলে মনে পড়ে। চার আনা ছিল তার দাম।

কৃষ্ণদাস প্রথমে লেখক ছিল না, ছিল গায়ক। চমৎকার গান গাইতে পারে বলে তাকে সবাই ভালোবাসত। কিন্তু আমি কী করে খোঁজ পেলাম তার লেখারও অভ্যাস আছে, ছবি আঁকারও অভ্যাস আছে। তাকে ডেকে বললাম, 'কেষ্ট, এই কাগজে তোমাকে লিখতে হবে।'

কৃষ্ণদাস সানন্দে রাজি হল। সে আমার চেয়ে বয়সে পাঁচ-ছ' বছরের বড় ছিল। আমি যখন সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র সে তখন পাশের চোমরদি গ্রামে প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারি করে। কিন্তু সাহিত্যের ব্যাপারে সে আমার আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। খুব অনুগত ছিল কৃষ্ণদাস।

আরো একজনকে ডেকে এনেছিলাম সাহিত্যের আসরে। সে আমাদের কার্তিক দেউড়ী। জাতিতে ছিল সে সাহা, বৃত্তিতে কুমার। প্রতিমা গড়ত, দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী শীতলা মনসা আরো নানা দেবদেবীর মূর্তি গড়ত কার্তিক। মাটির প্রতিমা বছর বছর গড়ত আর পূজোর পরে সেগুলি বিসর্জিত হত। জলে বিলীন হয়ে যেত সেই সব প্রতিমা।

আজ দেখি সেই মৃৎশিল্পীর সঙ্গে আমাদের কত অনেক বাকশিল্পীরও বিশেষ কোন তফাৎ নেই। আমারও জীবনভর কয়েকখানি মূর্তি বার বার গড়ি আর সেই মূর্তি স্মৃতির অতলে বিসর্জিত হয়।

কারিগর হিসাবে কার্তিক ক্রমে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিল।

আমি একদিন তার বাড়িতে গিয়ে বললাম, 'কার্তিকদা, তোমাকে আমাদের কাগজের জন্যে ছবি এঁকে দিতে হবে।'

কার্তিকদা হেসে বলল, 'তুমি তো আচ্ছা পাগল পল্টু। আমি কি তুলি ধরতে জানি না কলম ধরতে জানি? সবাই কি সব কাজ পারে?'

শেষ পর্যন্ত কার্তিকদা কিন্তু আমার অনুরোধ রেখেছিল। কাগজের জন্য ছবি এঁকে দিয়েছিল দুখানা। কবিতাও লিখেছিল দুতিনটি। আমার দাবি ছিল নিজের জীবন নিয়ে সে গল্প লিখবে। কার্তিকদা বলল, 'আমি পারব না তুমি লিখো।'

আমারও লেখা হয়নি। সবাই কি আর সব লিখতে পারে? যে কোন লেখকেরই অলিখিত রচনার তুলনায় লিখিত রচনা সামান্য।

সেই অল্প বয়স থেকেই গ্রামের যারা নানা মাধ্যমের শিল্পী তাদের সঙ্গে আমি এক ধরনের আত্মীয়তা বোধ করতাম। তাদের আমি সমাদর করতাম। তাদের সঙ্গ আমার ভালো লাগত। সবাইকে পারিনি কিন্তু তাদের কাউকে কাউকে আমি লেখার মধ্যে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি।

লেখা ছাপা হবার আগে আরো দুখানি ক্ষণজীবী হাতে-লেখা কাগজের সঙ্গে আমি যুক্ত হয়েছিলাম।

ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে পড়বার সময় আলাপ হল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে গিয়ে পৌঁছল। সাহিত্য চর্চায় পরস্পরের সঙ্গী হলাম আমরা। দুজনে মিলে বের করলাম একখানি হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা। নাম নারায়ণই দিয়েছিল জয়যাত্রা। নারায়ণের হাতের লেখা ভালো। তাই সেই হল লিপিকর। নিখিলের চিঠি নামে আমি শুরু করলাম একখানি পত্রোপন্যাস। নারায়ণ কবিতা গল্প প্রবন্ধ সবই লিখতে লাগল। আমিও তাই। কারণ সেই কাগজে আমরা দুজনেই ছিলাম প্রধান লেখক। সম্ভবত পাঠকও। সে যাত্রা দু চার পায়ের বেশি এগোয়নি।

অন্য একদল বন্ধুকে নিয়ে আরো একখানি হাতে-লেখা কাগজ বার করেছিলাম। এবার আর জয়যাত্রা নয়, অভিসার। সেই গোপন পথের সঙ্গী ছিল সত্যেন্দ্রনাথ রায়, অচ্যুত গোস্বামী, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, রণেন মজুমদার আর শান্তিপ্রিয় ঘোষ। শান্তিবাবু আমাদের চেয়ে তিন বছরের সিনিয়র ছিলেন। তিনিই ছিলেন সম্পাদক। তিনি একটি কল্পিতা সঙ্গিনীকেও গোষ্ঠীভুক্ত করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন, 'শ্যামলী সেন'।

আমি বললাম, 'এই শ্যামলীকে আবার কোথায় পেলেন। তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

শান্তিবাবু জবাব দিলেন, 'চোখ বুজুন, তাহলে দেখতে পাবেন।'

সেই অভিসার পত্রিকায় আমাদের সব দুঃসাহসিক লেখা বেরোত। আর সমালোচনাও হত তীব্র রকমের। আমরা উপভোগ করতাম।

দু' তিন সংখ্যা বেরোবার পর সেই অভিসারও নিঃসাড়ে থেমে গেল।

আমরা ইতস্তত ছিটকে পড়লাম। আমি এসে ভর্তি হলাম কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে। পুরোনো বন্ধুদের কেউ আমার সঙ্গে এল না। নারায়ণ গেল বরিশালে। সত্যেন আর অচ্যুত ফরিদপুরেই রয়ে গেল।

এই হল আমার লেখক জীবনের অমুদ্রিত প্রস্তুতিপর্ব। এই পর্বই বড় করে লিখলাম। দ্বিতীয় পর্বে মনে হয় এত কথা লেখার থাকবে না।

আমার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সনের 'দেশ' পত্রিকায়। প্রথম মুদ্রিত রচনা কবিতা। তখন বঙ্গবাসী কলেজে বি-এ পড়ি। থাকি বউবাজারের একটি দ্বিতল মাঠ-কোঠায়। গির্জার ধার দিয়ে সরু গলি। সেই গলির মধ্যে ডানদিকের দোতলা ভাড়াটে বাড়িটায় তখন তিনচার ঘর ভাড়াটে থাকত। আমি যাঁদের বাড়িতে থাকতাম তাঁরা দূর সম্পর্কে আমাদের আত্মীয় হতেন। গ্রামে ওঁরা ছিলেন পাশের বাড়ির প্রতিবেশী। খুবই স্নেহ করতেন আমাকে প্রমদা ঘোষ। আমার নাওয়া খাওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টি রাখতেন। অসুখবিসুখে সেবা করতেন। তাঁদের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। কিন্তু আদরযত্নে আন্তরিকতা ছিল। তাঁর স্বামী কুঞ্জ ঘোষের ছোট্ট একটি ফার্নিচারের দোকান ছিল বউবাজার স্ট্রীটে। সারাদিন তিনি সেই দোকানে কাজ করতেন। শিরিষ কাগজ ঘষে ঘষে মসৃণ করতেন টেবিল চেয়ার। পালিশ করতেন নিজের হাতে। দোকান বন্ধ করে রাত্রে যখন ফিরতেন, খুব সস্তার জিনিসপত্র নিয়ে আসতেন হাতে করে। একদিন একটি ছোট আর শুকনো কমলালেবু আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'পল্টু, খাও।'

দিদি মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, 'তুমি কি এগুলি পয়সা দিয়ে কিনে এনেছ না কুড়িয়ে এনেছ? ওই লেবু আবার মানুষ মানুষকে দেয়?'

রোগা অস্বাভাবিক লম্বা আধময়লা ধুতি আর ফতুয়া পরা মানুষটি স্ত্রীর ধমক খেয়ে লজ্জিতভাবে হাসলেন, 'দেখ দেখ, কী বলে।'

কৃপণ ছিলেন কুঞ্জ ঘোষ। তবু তাঁরও দাতা হবার সাধ হত।

তাঁর তিন ছেলের মধ্যে বড়টি ছিল বোবা। মেজোটি চোখে মুখে কথা বলত। রাধার পুরো নাম ছিল রাধিকামোহন। বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড় ছিল। ছেলেবেলায় ওরা যখন গাঁয়ের বাড়িতে যেত, আমরা একসঙ্গে খেলতাম-টেলতাম। সেই খেলার সঙ্গী এখন আমার ছাত্র হয়ে গেল। পড়াশুনোয় ও খুবই পিছিয়ে পড়েছিল। আমি যখন কলেজে ও তখনো স্কুলের গণ্ডিতে আবদ্ধ। তাই ওর ওপর মাস্টারি করার আমার অধিকার আছে। দিদিও তাই বলে দিয়েছিল। রাধার ছোট ভাইয়ের নাম ছিল কেষ্ট। আমি ওদের দুজনকে পড়াতাম। বিনিময়ে আমার বাসাহারের ব্যবস্থা হত। কিন্তু ব্যাপারটা উচ্চারিত ছিল না।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার ঘরে উঠতে হত। নিচে রান্নাঘরে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। ওপরের ঘরটি থাকবার। সেই ঘরে আমরা সবাই থাকতাম। সামনে এক ফালি বারান্দাও ছিল। সেখানে কেউ কেউ শুত।

সেই কাঠের ঘরে বসে ছোট্ট এক জোড়া টেবিল চেয়ার সামনে নিয়ে আমি পড়তাম পড়াতাম আর গল্প কবিতা লিখতাম।

রাধা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। মাঝে মাঝে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করত, 'কী লিখিস রে দিনরাত ? এ তো তোর কলেজের লেখা নয়।'

'কী করে বুঝলি ?'

'ওকি আর বুঝতে বাকি থাকে ?'

রাধার পড়াশুনোর দিকে বেশি ঝোঁক ছিল না। খেলাধুলো সাইকেল নিয়ে ঘোরাঘুরি এই সবই ভালোবাসত। তবু লেখাটাকে একটা বিশেষ গুণ বলে স্বীকার করত। ওর বন্ধুমহলে আমার কথা বলে বেড়াত।

আমার প্রথম প্রকাশিত রচনা কবিতা। ১৯৩৬ সনের 'দেশে' বেরিয়েছিল। তখন বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় দেশের কবিতা বিভাগের সম্পাদনা করতেন। তিনি পর পর আমার আরো অনেক কবিতা ছেপেছিলেন। তাঁর কবিতার মেজাজের সঙ্গে আমার কবিতার মিল ছিল না। তবু তিনি আমার কবিতা পছন্দ করতেন। আলাপ-পরিচয় হওয়ার পর সে-কথা আমাকে বলেছিলেন।

প্রথম প্রকাশিত কবিতাটির নাম ছিল 'মূক'। কবি যে মেয়েটিকে ভালোবাসে, তার কাছে বার বার যায়, কিন্তু বলি বলি করেও মনের কথা বলতে পারে না, এই ছিল কবিতাটির বিষয়বস্তু।

সে যাই হোক আমার নিজের কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে ওই নামটি যে এমন সার্থক হবে তা কখনো ভাবিনি। যদিও সেই '৩৬ সনের পর থেকে প্রায় বিশ বছর ধরে কবিতা লিখেছি, তবু সেই ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে, এখন তো প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। যাঁরা কবিতা আর গদ্য দুই-ই লেখেন, তাঁরাই জানেন কবিতা লেখায় আনন্দ কত বেশি। কবিতা যতই দুর্বল, আর সমকালের তুলনায় রীতির দিক থেকে পুরাকালের হোক না, তার মধ্যে ব্যক্তিসত্তাকে যেভাবে ঢেলে দেওয়া যায় তেমন আর কোন রচনায় যায় না।

১৯৩৯ কি '৪০ সনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে একযোগে আমার ছোট্ট একখানি কাব্য সংকলন বেরিয়েছিল, নাম ছিল 'জোনাকি'। তার অনেকদিন পরে আমার স্বতন্ত্র একখানা কবিতার বই বেরোয়। নাম দিয়েছিলাম 'নিরিবিলি'।

আমার প্রথম উপন্যাসের নাম 'দ্বীপপুঞ্জ'। এই বইখানি বেরোয় ১৯৪৭ সনে। তার চার বছর আগে ১৯৪২ কি '৪৩-এ বইখানি 'হরিবংশ' নামে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। তখন সাগরময় ঘোষ দেশের সহকারী সম্পাদক। তিনি চেয়েছিলেন সেই ধারাবাহিক উপন্যাস। ধারা যাতে নিয়মিত বহন করি, তার জন্যে তিনি রীতিমত তাড়া লাগাতেন।

এই বইয়ের পটভূমি ছিল গ্রাম। গ্রামকে কেন্দ্র করে গল্প অনেক লিখেছি, কিন্তু উপন্যাস দু-তিনখানার বেশি লিখিনি।

'হরিবংশে' আমাদের সদরদি গ্রামের অনেকেই এসে ভিড় করেছিল। আমাদের মধ্যপাড়ার উত্তরে ছিল সাহাপাড়া। দোকানপাট ছোটখাট ব্যবসা বাণিজ্যই ছিল এদের জীবিকা। আমাদের গ্রাম থেকে মাইল দেড়েক দূরে যে শহরটি আছে, তার নাম ভাঙ্গা। কে জানে কেন এই নাম হয়েছে। কুমার নদীর দুই ধারে শহরের দুই টুকরো পড়েছে বলেই কি? খেয়া নৌকায় ছিল পারাপারের ব্যবস্থা। আমাদের গ্রামের সাহা সম্প্রদায়ের অনেকেরই দোকানপাট ছিল সেই ভাঙ্গা শহরে। কেউ বড় দোকানের মালিক, কারো দোকান ছোট ছোট। কারো বা দোকানঘর আছে, গুদামঘর আছে, কেউ বা বাজারের মধ্যেই চট বিছিয়ে বসে যায়। রোজ সকাল-বেলায় বাজার বসে। হাট বসে সোমবার শুক্রবার। ধুলো ওড়ে, শুকনো লঙ্কা আর তামাক পাতার গন্ধ পাওয়া যায়। সেই হাট আর বাজার ছোটবেলা থেকেই দেখছি। বাবা কাকা কি চাকলাদার ঠাকুরদার সঙ্গে যেতাম ভাঙ্গার সেই হাট-বাজারে। কেনাকাটা করতে পারতাম না। পিছনে পিছনে থলি ধরতাম। সেই থলি যখন ভারি হয়ে যেত, ওঁরা হাত থেকে তুলে নিতেন।

সেই সাহাপাড়ার অনেকেই এসে ভিড় করেছিলেন আমার প্রথম উপন্যাসে। যদিও আমার বইয়ের আখ্যানভাগের সঙ্গে তাঁদের কারো জীবন-কাহিনীর তেমন কোন সাদৃশ্য ছিল না। প্রত্যেক লেখকই তাঁর চেনাজানা লোকজন থেকে কিছুটা নেন, কিছুটা বানান। এই বানানোর কাজ সব সময় সচেতনভাবে হয় না। মনে হয়, চরিত্রগুলি যেন নিজেরাই বানিয়ে বানিয়ে ওঠে। এই আত্মকর্তৃত্ব লোপেই লেখকের আনন্দ। এরই মধ্যে তিনি এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের স্বাদ পান।

বইখানির মধ্যে একটি কীর্তনের দল আছে। একটি চরিত্র আছে আত্মভোলা কীর্তনীয়ার। এই চরিত্রে আমার সেই বাল্য-শিক্ষকের ছাপ পড়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তাঁর মাস্টারিটুকু হরণ করেছিলাম, বর্জন করেছিলাম তাঁর রূঢ়তা। গুরু-দক্ষিণা দিয়েছিলাম, তাঁকে রূপলাবণ্যময় পুরুষ করে তুলে, সেই দৈহিক রূপ তাঁর নিজের ছিল না।

বইখানি যখন দেশ পত্রিকায় বেরোয়, চেনাজানা অনেকেই তাঁদের ভালো-লাগার কথা জানিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একটু বিশেষ প্রকাশভঙ্গির জন্যে একজনের কথা মনে পড়ছে। তিনি লেখক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবর্তক অফিসে কাজ করতেন। বোধ হয় এখনো সেখানেই আছেন। গল্প লিখতেন, কবিতা লিখতেন। এখনো লেখেন, তবে আগের মত অত নয়।

সেই প্রিয়দর্শন প্রিয়ম্বদ নারায়ণবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বর্মন স্ট্রীটে। তিনি দেশ অফিসে ঢুকছেন, আমি বেরোচ্ছি কিংবা হয়তো উল্টোটা হবে। দেখা হতেই তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মধুর ভঙ্গিতে হাসলেন। হেসে বললেন, 'পড়লাম দেশের গত সংখ্যা। কীর্তনের খোলের আওয়াজ এখনো শুনতে পাচ্ছি।'

আর একজনের কথা মনে পড়ে। তিনি 'কালি-কলমের' সম্পাদক মুরলীধর বসু। আমরা যখন লিখতে শুরু করি, তার অনেক আগেই কালি-কলম উঠে গেছে। পত্রিকাটি আমার কাছে তখন জনশ্রুতি মাত্র। কিন্তু সম্পাদক মুরলীধর বর্তমান আছেন। এমন সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যপ্রাণ মানুষ খুব কমই দেখেছি।

লেখক জীবনের সেই প্রায় প্রথম পর্বেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় বন্ধুত্ব হয়েছিল। শুধু বয়সেই অসম নয়, কোন বিষয়েই আমি তাঁর সমকক্ষতা দাবি করতে পারি না। কিন্তু সব ব্যবধান উপেক্ষা করে তিনি আমাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

'দেশে' যখন 'হরিবংশ' বেরোয়, আমি আর মুরলীধর দুজনেই নিবেদিতা লেনের একটি বাড়িতে থাকি। তিনতলার একই ঘরে আমার বসবাস। বোমাবর্ষণের ভয়ে আমার সেই আত্মীয়গৃহের গৃহিণীরা পুত্রকন্যা নিয়ে স্থানান্তরিতা। পাশাপাশি তক্তপোষে মুরলীবাবু থাকেন, আমি থাকি আরো অনেকেই থাকেন। আমি তক্তপোষের ওপর বসে উপুড় হয়ে 'দেশের' জন্যে কিস্তি লিখি আর তিনি চেয়ে দেখেন। লেখা বেরোলে পড়েনও।

তিনি একদিন মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি আমার নামটি চুরি করলেন কেন ? চুরি করে এমন একজনকে দিলেন যার সঙ্গে আমার স্বভাবের কোন মিল নেই। আমি কি এমন দুশ্চরিত্র ?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারিনি। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলাম তিনি কতটা রাগ করেছেন। তাঁর রাগ তত মারাত্মক নয় বুঝতে পেরে বলেছিলাম, 'আপনার ওপর আমার খুব লোভ। আপাতত শুধু নামটিই নিলাম। পরে মানুষটিকেও নেব।'

আরো একজনের কথা মনে পড়ে। তিনি সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ। এই লেখাটি যখন বেরোয়, তার কিছু আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় বন্ধুত্ব হয়েছে। শুনেছিলাম, তিনি নিবেদিতা লেনে এসেছিলেন আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে। কিন্তু আমি বাড়ি ছিলাম না বলে দেখা হয়নি। যতদূর মনে পড়ে, তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় 'প্রত্যহ' পত্রিকার অফিসে।

'হরিবংশের' ফাইল বহুদিন বাক্সবন্দী হয়ে পড়েছিল। খানিকটা আমার

অমনোযোগ, খানিকটা বা ঔদাসীন্য। সন্তোষবাবু লেখাটা পড়তে চাইলেন। বললেন, 'যখন বেরোয় খাপছাড়াভাবে পড়েছি। এখন আর একবার দিন। পুরোটা একসঙ্গে পড়ে দেখি।'

অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে তাঁকে পড়তে দিলাম। তিনি দু-একদিন বাদেই ফাইলটি ফেরত দিলেন। সেই সঙ্গে প্রশংসার বন্যায় ভাসিয়েও দিলেন। আমি চিরকালই কুণ্ঠিত, তিনি অকুণ্ঠ, উচ্ছ্বাসে উল্লাসে, সর্বত্র প্রবল। জানি না সেদিনের সেই প্রশস্তির মধ্যে কতখানি সাহিত্য বিচার ছিল, কতখানি বন্ধুকৃত্য। কিন্তু আমি সেদিন দারুণ উৎসাহ পেয়েছিলাম।

পরিবর্তন পরিবর্ধনের পরে যখন 'হরিবংশ' রূপান্তরিত নামান্তরিত হয়ে 'দ্বীপপুঞ্জ' নামে বেরোলো বইখানি, উৎসর্গ করলাম আমার সেই উৎসাহদাতাকে।

আমার প্রথম উপন্যাসের প্রকাশক হতে চেয়েছিলেন দুজনে। একজন হলেন শ্রদ্ধেয় মনোজ বসু। অবিভক্ত বেঙ্গল পাবলিশার্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী। আর একজন নাট্যকার দিগিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ধীরেন্দ্রনাথ রায় নামে আর একজন উৎসাহী উদ্যমশীল যুবকের সঙ্গে নতুন পাবলিশিং ফার্ম খুলেছেন। আমি দ্বিধান্বিত। কাকে দিই প্রকাশের ভার। কিন্তু দিগিনবাবু একদিন আমাকে কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে পেয়ে আমার বইয়ের কীর্তনীয়ার মত আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'এ বইখানা আমাকে দিন। পরেরখানা মনোজবাবুকে দেবেন।'

আলিঙ্গনাবদ্ধ আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম। বইখানি যখন বেরোয়, আমি সানুজ পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে বজদুলাল স্ট্রীটের একটি দোতলা বাড়ির একতলার বাইরের একখানি ঘরে থাকি। বেশি বৃষ্টি হলে সেখানে জল ওঠে। তক্তপোষের ওপর বসে বসে আমি 'দ্বীপপুঞ্জের' প্রুফ দেখি। নিজেই যেন এক দ্বীপবাসী। আর বৃষ্টি ভিজে ছাতা মুড়ি দিয়ে ধীরেন রায় নিতে আসেন সেই প্রুফ। দিনগুলির কথা খুব মনে পড়ে। সেদিনের বর্ষাকে ঠিক দুঃখের বর্ষা বলে মনে হত না। বরং দিনগুলি আশা-ভরসায় ভরা ছিল। আমি তখন প্রথম ঔপন্যাসিক হতে যাচ্ছি।

কয়েক বছর বাদে দিগিনবাবুদের পুস্তকালয় বন্ধ হয়ে গেল। তারও বহু বছর বাদে 'দ্বীপপুঞ্জে'র আর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন কানাইলাল সরকার তাঁদের 'ত্রিবেণী' থেকে। সেই ত্রিবেণীও বন্ধ হল। তারপর 'দ্বীপপুঞ্জে'র পাবলিশার্স হলেন মুকুন্দ পাবলিশার্স। সেই মুকুন্দ পাবলিশার্সও অচিরকালের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল। এখন বইখানি আর বাজারে পাওয়া যায় না। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

এককালের জনপ্রিয় 'চেনামহলের' অবস্থাও তাই। বেশ কয়েক বছর ধরে বইখানি ছাপা নেই। আমি হয়তো স্বজনপ্রিয়, খুব জনপ্রিয় লেখক কোনোদিনই ছিলাম না। অন্তত পাবলিশাররা সেই কথাই বলেন। তবুও তার মধ্যে 'চেনামহলে'র গোটা ছয়-সাত মুদ্রণ হয়েছে।

'চেনামহল'ও প্রথমে ধারাবাহিকভাবে দেশে বেরিয়েছিল ১৯৫১-৫২ সনে। কিস্তিতে কিস্তিতে লিখতাম। সাগরবাবু প্রেরণা দিতেন, তাড়নাও দিতেন। কিস্তি খেলাপ হলে বন্ধ বিচ্ছেদের ভয় দেখাতেন।

'চেনামহল' যখন লিখি, তখন থাকি সপরিবারে লিন্টন স্ট্রীটের একটি বাড়িতে। সে বাড়ির ব্যবস্থা ভালো ছিল না। প্রায় বস্তি বাড়ির তুল্য। কিন্তু বন্ধুজনের আনাগোনায় আর লেখার প্রাচুর্যে, স্ফুর্তিতে সেই গৃহটির কথা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'চেনামহলে'র প্রথম প্রকাশক ছিলেন অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ বসু। তিনি তখন প্রথম পাবলিশিং ফার্ম খুলেছেন। নাম দিয়েছেন ক্যালকাটা বুক ক্লাব। কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের মোড়ে দোতলায় ঘরে ছিল সেই ক্লাব বনাম অফিস। নবীন প্রবীন বহু লেখকের সমাগম হত সেখানে। সেই অফিস অন্য নামে এখনো আছে। অ-পাঠ্য ছেড়ে জ্যোতিবাবু এখন পাঠ্যবই প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু সেদিনের সেই কলকোলাহল বৈভবের দীপ্তি এখন আর নেই। জীবন পরিবর্তনশীল। একথা কাকেই বা না মানতে হয়? কখনো প্রসাদে কখনো বিষাদে।

জ্যোতিবাবু তাঁর প্রকাশিত বইগুলির অঙ্গসজ্জার দিকে খুব মন দিয়েছিলেন। নিত্যনতুন অভিনবত্বের দিকে ছিল তাঁর লক্ষ্য। 'চেনামহল'কে তিনি ফ্লক্স্-এর মলাটে মুড়ে দিয়েছিলেন। হয়তো বিয়ের বাজারের দিকে চোখ ছিল। তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। তখনকার দিনে নব-দম্পতিদের করকমলে তিনি 'চেনামহল' পৌঁছে দিয়েছিলেন। 'চেনামহলের' পরবর্তী দুটি কি তিনটি মুদ্রণের প্রকাশক 'মিত্র ও ঘোষ'। নিঃশেষিত হবার পর বইখানি বহুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় রয়েছে। ভাবতে ভালো লাগে তখন যাঁরা নবদম্পতি ছিলেন—এবং এখন পুরোনো দম্পতি পুত্রকন্যা নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করছেন—তাঁদের কারো কারো ঘরে অক্ষত না হোক অন্তত ছেঁড়া-খোঁড়া অবস্থায় চেনামহলের দু-এক কপি রক্ষিত আছে।

আমার সেই পুরোনো দিনের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাত হয়। তাঁরা কথায় কথায় 'চেনামহলে'র কথা তোলেন। হয়তো

লেখককে খুশি করবার জন্য বলেন, 'হ্যাঁ পড়েছিলাম সেই একখানা বই। কই, তেমন আর হল না।'

ভেবে রোমাঞ্চিত হই, এরই মধ্যে কিংবদন্তী হয়ে পড়েছি।

'চেনামহলে'র বহু চরিত্রের সঙ্গে কলকাতায় আমার একটি বৃহৎ আত্মীয় পরিবারের অনেকের মিল দেখা যায়। সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু হুবহু এক ছিল না। লেখাটি যখন দেশে ধারাবাহিকভাবে বেরোয়, তখন তাঁরা সেই উপন্যাস পড়তেন। কোন্ চরিত্র কার আদলে গড়া, তাঁরা অনুমান করতেন। আমার তো মনে হয়, উপভোগও করতেন। চরিত্রগুলির সঙ্গে খানিকটা খানিকটা মিল থাকলেও বইয়ের আখ্যানভাগের সঙ্গে তাঁদের জীবন কাহিনীর তেমন কোন মিল ছিল না। যেটুকু সাদৃশ্য ছিল, তার জন্যে আমার সঙ্গে কেউ কোনদিন বিসদৃশ আচরণ করেন নি। তাঁদের স্মিতমুখ দেখে আমার মনে হয়েছে, আমার লেখার উপাদান হতে তাঁদের আপত্তি নেই, লেখাটি উপাদেয় হলেই হল।

এই বইয়ের সারাংশ দিতে চেষ্টা করব না। সারাংশ যে কোন উপন্যাসের অসার অংশ। 'চেনামহলে'র চরিত্রগুলি যাঁদের চেনা নেই, তাঁদের চিনিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাও বৃথা। হয়তো তা পারবও না। এক বই কি দুবার করে লেখা যায়?

'চেনামহল' উৎসর্গ করেছিলাম আমার পুরোনো বন্ধু কলেজের সহপাঠী সেই অভিসারগোষ্ঠীর সাহিত্যরসিক সত্যেন্দ্রনাথ রায়কে। এই তীক্ষ্ণধী বন্ধুর সমালোচনা আমি সাগ্রহে শুনতাম। তার সমালোচনা সবসময় প্রীতিকর ছিল না। মাঝে মাঝে সে আমাকে শরবিদ্ধ করত। কিন্তু তার সৌহৃদ্যে আর বিদগ্ধতায় কোনদিন সন্দেহ করিনি।

আরো একখানি উপন্যাসের কথা উল্লেখ করতে হয়। 'সূর্যসাক্ষী'। এই বইখানিও দেশে ১৯৬৪ সনের মার্চ থেকে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়ে '৬৫ সনের মার্চে শেষ হয়। এখানি আমার বৃহত্তম উপন্যাস। প্রিয়তম কিনা সে সম্বন্ধে এখনো মনস্থির করিনি। তবে বিশেষ পক্ষপাত যে আছে তা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। বইখানি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৫ সনে। প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স। বইখানি প্রিয় সুহৃদ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গীকৃত।

আজকের এই রচনাটি যেভাবে লিখতে চেয়েছিলাম, সেভাবে লেখা হল না। জীবনে কটি লেখাই বা ঠিক সেইভাবে নিজের মনঃপূত হয়। ভেবেছিলাম নিজের মুখোমুখি বসব। নামব নিজের মনের গহনে। কিন্তু স্মৃতির আয়নায় আরো

অনেকের মুখ দেখতে দেখতে এগোলাম। আরো অনেকের মুখ মনে পড়লেও স্থানাভাবের আশঙ্কায় তাঁদের কথা অলিখিত রইল।

আত্মকথা বলতে গিয়ে যাঁদের কথা বলেছি সেই আত্মীয়দের মধ্যেই তো আমি পরিব্যাপ্ত! সেই তো বৃহত্তর আমি।

লেখার প্রবণতাটা নিশ্চয়ই নিজের। তার উৎপত্তি বৃদ্ধি ক্রম-পরিণতি মৃত্যু সবই রহস্যজনক। অন্তত দুজ্ঞে᾽য় দুর্ভেদ্য তাতে সন্দেহ নেই। অন্তঃপ্রেরণাও তাই। আমি তার রহস্যময়তায় বিশ্বাস করি।

কিন্তু বাইরের প্রেরণাও আছে। সুহৃদদের সেই উৎসাহ বাক্য লেখকের সৃষ্টির মূলে রস সঞ্চার করে। সারা জীবন তাকে সঞ্জীবিত করে রাখে। সবাইকার ভাগ্যে সেই উৎসাহ আর আনুকূল্য অবশ্য সারাজীবন আসে না।

কিন্তু যা পেয়েছি, যাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি, তাঁদের প্রতি যেন কোনদিন অকৃতজ্ঞ না হই। ভাই, বন্ধু বান্ধবীগণ, পরমাত্মীয়া, অনাত্মীয়া, অপরিচিতা কোন কোন পত্রলেখিকা কি লেখকেরা কতজনে কতভাবে উৎসাহ দিয়েছেন, প্রত্যক্ষে পরোক্ষে সহায়তা করেছেন তার ঠিক নেই।

ধর্মীয় কোন গুরুর কাছে দীক্ষা নিই নি, গুরুবাদ মানি নি, কিন্তু সাহিত্যের গুরু যে কত মহাজন তার কি কিছু ঠিক আছে। উত্তমর্ণেরা সংখ্যাতীত। গ্রহণের প্রকার পদ্ধতিও বিচিত্র।

গল্প লেখার গল্প

ছোট বড় মাঝারি ভালো মন্দ মাঝারি জীবনে কত গল্পই না লিখলাম। তবু অলিখিত গল্পের সংখ্যা যেন আরো বেশি। যে সব গল্প লিখব বলে ভেবে রেখেছি অথচ শেষ পর্যন্ত লেখা আর হয়ে ওঠেনি, যে সব গল্পের ইসারা সামান্য একটু সাড়া দিয়েই চঞ্চল পায়ে অদৃশ্য হয়ে উঠেছে, যারা কেবল চকিতের জন্যে দেখা দিয়েছে অথচ ধরা ছোঁওয়া দেয়নি, তাদের সংখ্যা কম নয়।

না-লেখা গল্পগুলির কথা যাক। লেখা গল্পগুলির কথাই বলি।

পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির আর দিন ভরে রাত ভরে লেখা গল্পগুলির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বাস্তব আর কল্পিত, পরচিত আর স্বরচিত সব মিলিয়ে এই গল্পগুলি যেন আমারই জীবনবৃত্ত।

অনেকদিন আগে নারকেলডাঙ্গায় একটি ভাড়াটে বাড়িতে আমি সপরিবারে ভাড়া করে ছিলাম। দোতলায় বাড়িওয়ালা থাকতেন আর একতলায় থাকতাম আমরা তিন ঘর ভাড়াটে।

সেই বাসা ছেড়ে দেবার প্রায় বিশ বছর বাদে কোন একটা উপলক্ষে আবার আমাকে ওই অঞ্চলে একদিন যেতে হয়েছিল। কি কৌতূহল হল, ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে দাঁড়ালাম সেই বাসাবাড়িটার সামনে। দেখি আমাদের সেই ঘর দুখানি জুড়ে আর একটি নবীন দম্পতী বসবাস করছে।

আমার সেই পুরোন ঘরের নতুন বাসিন্দারা আমাকে খুবই আপ্যায়ন করল। চা এল, মিষ্টি এল। এল সানুরাগ অনুরোধ, 'আবার আসবেন। কবে আসবেন বলুন।'

বিদায় নেওয়ার সময় আর একবার আমি সেই ঘর দুখানির দিকে তাকালাম। কেমন যেন একটা উদাস বৈরাগ্যে মন ভরে উঠল। এই ঘর একদিন আমার ছিল আজ আর আমার নয়। পুরো তিন বছর আমি এই ঘরে কাটিয়ে গেছি। তিনশ পঁয়ষট্টিকে তিনগুণ করলে কত হয়? বৃহৎ পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে ছোট ছোট সুখ দুঃখে আন্দোলিত হতে হতে এখানে সহস্র দিন-রজনী আমি বাস করেছি। এই বাসা যেমন এখন আর আর আমার নয়, সেই দিনরাত্রিগুলিও তেমনি আর পুরোপুরি আমার নয়। প্রত্যক্ষতা হারিয়ে তারা অতীতের ছায়ার মধ্যে মুখ লুকিয়েছে।

নিজের পুরোন গল্পগুলির দিকে তাকালেও আমার প্রায় ওই ধরণের একটা অনুভূতি হয়। এগুলি যেন আমার অতীতের লীলাক্ষেত্র। বহু গল্পের কথাই

আমার আর মনে নেই। পাত্রপাত্রীর নাম মনে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু বহু গল্পের ঘটনা-সংস্থানের কথা, তাদের শুরু আর শেষের কথাও আমি বিস্মৃত হয়েছি।

একবার এক কাণ্ড ঘটেছিল। এক ভদ্রলোক আমার একটি গল্প পড়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। গল্পটি আমার আগের লেখা কিন্তু তিনি পড়ে এসেছে সদ্যসদ্য। তিনি পাত্রপাত্রীর নাম উল্লেখ ক'রে ঘটনা-বিন্যাসের কথা বলে, জায়গায় জায়গায় লাইন পর্যন্ত মুখস্ত বলে পরম উল্লাসে উৎসাহে আমার সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। একজন লেখকের কাছে এসেছেন একজন সাহিত্যরসিক পাঠক। আমি মস্ত বড় অরসিক বনে গেলাম। গল্পটির কথা আমি একেবারেই ভুলে গেছি। আমি তাঁর সঙ্গে তাল রেখে একবার বলি, হুঁ, আর একবার বলি, হাঁ। আর একবার বলি, না।

গোঁজামিলটা তাঁর চোখে ধরা পড়ে গেল। তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু মনে করবেন না। গল্পটা কি সত্যি আপনিই লিখেছিলেন?'

বললাম, 'একদা লিখেছিলাম। কিন্তু আজ যে আমি অন্য গল্প লিখছি। লিখতে লিখতে উঠে এসেছি আপনার কাছে।'

লেখকের গল্পগুলির উৎস নিয়ে হয়তো আপনাদের কারো কারো মনে কৌতূহল আছে। আমার নিজের তেমন খুব একটা কৌতুহল নেই। গল্পের নেপথ্যে যে গল্প তা না শোনাটাই ভালো। আমার মনে হয় তাতে আসল গল্পের রস হানি ঘটে। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখি। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার আনাগোনা কখনো রাজপথে কখনো সুড়ঙ্গপথে। কখনো সেই পথরেখা চোখে দেখা যায়, কখনো বা তা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই অগোচরতাই লেখকের নিজের পক্ষে বিস্ময়কর! এতেই তার সৃষ্টির আনন্দ।

দুটি একটি গল্পের কথা বলি। ধরা যাক 'রস' গল্প।

এ গল্পের যে পটভূমি তা আমার খুবই পরিচিত। পূর্ববঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়িতে পূব দিকে ছিল একটি পুকুর। আর সেই পুকুরের চারধারে ছিল অজস্র খেজুর গাছ। ছেলেবেলা থেকে দেখতাম আমাদের প্রতিবেশী কিষাণকে সেই সব খেজুর গাছের মাথা চেছে মাটির হাঁড়ি বেঁধে রাখত। বাঁশের নল বেয়ে সেই হাঁড়িতে সারারাত ধরে ঝির ঝির করে রস পড়ত। সেই রস কড়াইতে করে, বড় বড় মাটির হাঁড়িতে করে জ্বালিয়ে গুড় তৈরি করতেন আমাদের মা-জেঠীমারা। শীতের দিনে রস থেকে গুড় তৈরির এই প্রক্রিয়া মায়ের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে রোজ দেখতাম। আমার চির-চেনা এই পরিবেশ থেকে রস গল্পটি বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু রসের যে কাহিনী অংশ মোতালেফ মাজু খাতুন আর ফুলবানুকে

নিয়ে যে হৃদয় দ্বন্দ্ব, খেজুর রসকে ঘিরে রূপাসক্তির সঙ্গে যে জীবিকার সংঘাত তা কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আসে নি। সেই কাহিনী আমি দেখিওনি, শুনিওনি। তা মনের মধ্যে যেন আপনা থেকেই বানিয়ে উঠেছে।

আর একটি গল্পের কথা মনে পড়ে। 'সেতার'। এই গল্পে যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত স্বামীকে সুস্থ করবার জন্যে স্ত্রী সেতারের টুইশন করত। সামান্য যা কিছু আয় হত তা যেত স্বামীর সেবায়। প্রয়োজনের যে সঙ্গীত চর্চা বউটি শুরু করেছিল ধীরে ধীরে সেই চর্চায় সে আনন্দ পেতে লাগল। ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে তার পরিচিতি বাড়ল, খ্যাতিও হল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে স্বামী যেদিন বাড়িতে এল স্ত্রীর সেইদিনই ডাক পড়ল একটি বড় অনুষ্ঠানে বাজাবার জন্যে। এমন সম্মান সে এর আগে কোনদিন আর পায় নি। কিন্তু স্বামী তাকে ছেড়ে দিতে চায় না। এতদিন পরে স্ত্রীকে সে কাছে পেয়েছে। কত রোগ যন্ত্রণা মৃত্যুভয় পার হয়ে সে এসে পৌঁছেছে তার দয়িতার কাছে। এত দীর্ঘদিনের বিরহের পর স্ত্রীর সঙ্গে তিলমাত্র বিচ্ছেদ যেন তার সহনাতীত। সঙ্গীতের আসরে স্ত্রীর আর যাওয়া হল না। কিন্তু তার এই থাকাটাই কি পুরোপুরি থাকা?

এই গল্প এলো কোত্থেকে? হাসপাতালে কি হাসপাতালের বাইরে আত্মীয় অনাত্মীয় বহু যক্ষ্মা রোগীকেই তো দেখেছি? গীতানুরাগিণী একটি গৃহবধূর সঙ্গেও আমার পরিচয় নিবিড়। কিন্তু এই আখ্যানটি দুটি প্রধান চরিত্র তার কাহিনী অংশ, আর কাহিনীসঞ্জাত যে হৃদয়বেদনা আগে আমি দেখিওনি শুনিওনি। মনের কোন আক্ষেপ কোন ভাবাবেগ থেকে এই গল্পের সৃষ্টি হয়েছিল আজ আমার পক্ষে তা বলা কঠিন। এই অক্ষমতাটুকু শিল্পীর অগৌরবের নয়। বরং এই অনির্বচনীয়তায় তার আনন্দ। লেখার মধ্যে সে সবই ব্যক্ত করতে চায় না, বোধ হয় পারেও না। সবই যদি ভাঙিয়ে বলে দেব তবে আভাষ আর ইসারা আছে কিসের জন্যে?

সব লেখকই নিজের চেনাজানা গণ্ডির ভিতর থেকে গল্পের উপাদান পেয়ে যান। আমিও তাঁদের ব্যতিক্রম নই। তবে কেউ কেউ বলেন আমার লেখায় সামান্য ছদ্মনামের আড়াল যদি বা থাকে, ছদ্মবেশের আড়ালটুকু থাকে না। যাদের নিয়ে লেখা তারা নিজেদের চিনে ফেলে। পাঠকদের মধ্যে যদি তাদের আত্মীয় বন্ধু কেউ থাকে তারাও জেনে যায়। এই দুর্বুদ্ধির জন্যে শাস্তি পেতে হয়েছে। আইন আদালতের শাস্তি নয়, সামাজিক শাস্তি। এই নিয়ে একজন বান্ধবীর সাথে চিরবিচ্ছেদ হয়ে গেছে। সেই দুঃখের কথা আজ মনে পড়ে। অথচ আমি আমার সেই গল্পটির মধ্যে তাঁকে ছোট করিনি, অপমানও করিনি।

হৃদয়ের পরিপূর্ণ সমবেদনা আর সহানুভূতি দিয়েই আমি সেই প্রেমের গল্পটি লিখেছিলাম। পরিণাম হল অপ্রেম।

কেউ কেউ আবার অন্যরকম অনুরোধও করেছে, 'লিখুন আমাকে নিয়ে। আমি যেন আপনার লেখার মধ্যে থাকি।'

লিখতে বসেছি সেই অনুরোধ কাহিনীকে নিয়ে। কিন্তু লিখতে লিখতে সেই একজনের সঙ্গে আরো কতজন যে মিশে গেছে। সেই বাস্তবিকার সঙ্গে লেখকের একটি মানসবাসিনী কেমন করে যে অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ কে করবে?

মেয়েটি আমার সেই গল্প পড়ে মুখ ভার করে বলেছিল, 'এ কার মূর্তি এঁকেছেন? এ তো আমি নই।'

আমি তার মুখের সঙ্গে আমার নায়িকার মুখ মেলাতে মেলাতে জবাব দিয়েছি, 'এও তুমি।'

আর একটি মেয়ের কথা বলি। সে আমাকে একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিল। অপূর্ব ভ্রূভঙ্গি করে বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে বেশি মিশব না। আপনি যে এত মেলামেশা করেন তার বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে।'

মেয়েটির জীবনে কিছু প্রণয়-ঘটিত জটিলতা ছিল। আমি তা জানতাম।

তার কথার জবাবে আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'উদ্দেশ্য? আমার তো ধারণা আমি নিষ্কাম।'

• সে বলেছিল, 'নিষ্কাম না হাতি। আপনি আসেন গল্প লেখার তাগিদে।'

আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'অমন কথা বোলো না। আমি আমার তাগিদেই আসি। তুমি তো জানো না, লেখকেরা যাদের ভালবাসে তাদের নিয়ে লিখতেও ভালবাসে। লেখাটা আবার ভালোবাসারই অঙ্গ।'

মেযেটি সঙ্গে সঙ্গে আমার কথা মেনে নেয় নি। তর্ক জুড়ে দিয়েছিল, 'অমন বড়াই করবেন না। আপনার বেশির ভাগ গল্পই প্রেমের গল্প তা জানি। তবু গল্পে উপন্যাসে আপনি যত মেয়েপুরুষকে এনেছেন যত চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন তারা সবই কি আপনার ভালোবাসার জন?'

চট করে জবাব দিতে পারিনি। কিছুক্ষণ আমাকে নির্বাক থাকতে হয়েছিল। ভেবেছিলাম কথাটা হয়তো অসত্য নয়। সবাইকে সমান ভালোবাসতে পারিনি। আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলির সকলের প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠেনি। হয়তো ইচ্ছা ছিল না, হয়তো সে সাধ্যও ছিল না।

কিন্তু পিছন ফিরে তাকিয়ে বই না পড়ে নিজের গল্পগুলির কথা যতদূর মনে

পড়ে আমি দেখতে পাই ঘৃণা বিদ্বেষ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, বৈরিতা আমাকে লেখায় প্রবৃত্ত করেনি। বরং বিপরীত দিকের প্রীতি, প্রেম সৌহৃদ্য, স্নেহ শ্রদ্ধা ভালোবাসা পারিবারিক গণ্ডীর ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাতে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তা জেনেও আমি আমার সীমার বাইরে যেতে পারিনি।

অথচ জানি সংসারে অনাচার-অবিচার আর অত্যাচারের অভাব নেই। প্রেমের শক্তি যেমন শক্তি, প্রয়োজনবোধে ঘৃণা বিদ্বেষের শক্তিও তেমনি। বৃহত্তর প্রেম গভীরতর কল্যাণকে অবারিত করার জন্যে সেই শক্তিরও প্রয়োজন আছে। শুধু আলিঙ্গন নয়, দরকার হলে আঘাত করতেও জানা চাই, আঘাত করতেও পারা চাই। সেই পৌরুষ সেই বীর্যবত্তা মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে, লেখকের রচনার মধ্যে দীপ্তি এনে দেয়।

কিন্তু এই তত্ত্ব আমি জ্ঞান দিয়ে জানি বুদ্ধি দিয়ে জানি। একে হৃদয়রসে জারিত করে রসরূপ দিতে জানিনে।

নিজের স্বভাবকে দেখে নিয়ে, নিজের প্রবৃত্তি আর প্রবণতাকে স্বীকার করে আমি সারা জীবন শুধু ভালোবাসার গল্পই লিখেছি। যে ভালোবাসা হয়তো সঙ্কীর্ণ অর্থে ভালোবাসা, সীমিত অর্থে ভালোবাসা। তবু তা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয়।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

প রি শি ষ্ট

আমাদের কথা

দাদার জন্ম ১৯১৬ সালে। আমাদের বাবার নাম মহেন্দ্রনাথ মিত্র। আমাদের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায়। ফরিদপুর টাউন থেকে বাইশ মাইল দক্ষিণে সদরদি গ্রামে। অনেকটা জায়গা নিয়ে বাড়ি। চারপোতায় চারখানা বড় টিনের ঘর। ভিতর বাড়ি, বার বাড়ির বড় বড় দুটো উঠোন। বাড়ির পিছনে একটা বাঁশঝাড়। পুব দিকে পুকুর। পুকুরের চারপাশ ঘিরে কয়েকটা খেজুর গাছ ছিল। বাড়ি থেকে খানিকটা হেঁটে গেলেই কুমার নদী! বর্ষার সময় কুমারের জল খাল বেয়ে বাড়ির কাছে চলে আসত। তখন নৌকা ছাড়া যাতায়াতের কোন উপায় থাকত না। বর্ষার সময় বাবা আর মণিকাকা নৌকোয় করে ভাঙা যেতেন। আমাদের নিজেদের নৌকো ছিল। নৌকো চালাবার জন্য বর্ষার সময় একটি লোক রাখতে হত। বাড়ি থেকে ভাঙার দূরত্ব ছিল দু মাইল। আমাদের হাট বাজার হাইস্কুল সবই ছিল ভাঙায়। মহকুমা শহর না হয়েও ভাঙা ছিল জমজমাট। ভাঙায় এক সময় তিনটে মুনসেফি আদালত চলত। বাবা আর মণিকাকা ভাঙায় দুই উকিলের সেরেস্তায় মুহুরীর কাজ করতেন।

অল্প বয়সে এক বিরাট সংসারের ভার বাবার ঘাড়ে পড়েছিল বলে বাবা বেশী দূর লেখাপড়া শিখতে পারেন নি। তাঁর বিদ্যে ছিল উচ্চ প্রাইমারী পর্যন্ত। আমাদের জ্যাঠামশাই যৌবনে মারা যান। জ্যাঠাইমা, জ্যাঠতুতো দাদা, দিদির অবলম্বন ছিলেন বাবা। বাবার পিসিমা অল্প বয়সে বিধবা হয়ে আজীবন আমাদের সংসারে ছিলেন। এ ছাড়া বাবার ছ জন বৈমাত্রেয় ছোট ভাই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আমার শুধু মণিকাকাকেই দেখেছি। বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউ দীর্ঘায়ু হন নি। লেখাপড়া কম জানলেও বাবার অনেক বিষয়ে দখল ছিল। বাবা ভাল অঙ্ক জানতেন। দাদার ম্যাট্রিকের অঙ্ক কষে দিতেন। তাঁর গানের গলা ছিল। তাঁর মুখে আমরা রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের গান শুনেছি। বাবা গান-বাজনা যেমন জানতেন তেমনি তাঁর বিষয়বুদ্ধিও ছিল পাকা। পাড়া-পড়শীদের মধ্যে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল বাধলে বাবা তা মিটিয়ে দিতে পারতেন।

বাবা ছ ফুট লম্বা ছিলেন, তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল। বাবার সঙ্গে দাদার কোন দিক থেকে মিল ছিল না। দাদার জন্য বাবার চিন্তা হত। মাঝে মাঝে মাকে বলতেন, 'পল্টু, সংসারের কোন কাজই পারে না। ওর যে কী গতি হবে।' দাদার ডাক নাম ছিল পল্টু। মা ভরসা দিয়ে বলতেন, 'পারবে। চিরকাল কি এমনটি থাকবে।'

যে মা'র কথা বলছি, যিনি তিন বছর আগে আমাদের পাইকপাড়ার বাড়িতে মারা গেলেন, তিনি আমাদের আপন মা ছিলেন না। তিনি ছিলেন বড়মা, বাবার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। আমাদের আপন মা যখন মারা যান তখন আমরা খুব ছোট, দাদার তখন চার বছর বয়স। মা'র কথা দাদার কিছু কিছু মনে পড়ত, আমার কিছুই মনে নেই। আমরা বড়মা'র কাছে মানুষ হয়েছি। বড়মা'র পর পর ছটি মেয়ে হয়ে মারা যায়। তারা এক-দেড় বছরের বেশী কেউ বাঁচে নি। বড়মা'র আপন বলতে ছিলাম আমরা। বড়মা ছিলেন বলে আমরা কোনও দিন মায়ের অভাব বুঝতে পারি নি।

বাবার পিসিমাকে আমরা ভাইদি ডাকতাম। তিনিও আমাদের খুব ভালবাসতেন। বাবা আর মণিকাকা ভাঙা চলে গেলে তিনি আমাদের তিন ভাইকে —আমাকে দাদাকে আর মণিকাকার ছেলে হেমেনকে আগলাতেন। পাড়ার বাইরে বেশীদূর যেতে দিতেন না। আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে খুব মিল ছিল। আমরা একসঙ্গে খেলতাম। যেখানে যেতাম একসঙ্গে যেতাম। দাদা পরে ছেলেদের জন্য যে সব গল্প লিখেছে তাতে আমাদের তিন জনেরই কথা আছে। সে সব গল্পের আমরা তিন চরিত্র।

আমাদের ছেলেবেলার হিরো ছিলেন জ্যাঠতুতো দাদা, বড়দা। আমাদের বংশের প্রথম ম্যাট্রিকুলেট। বড়দা আই. এ. পর্যন্ত পড়ে কলকাতায় মার্শাল অ্যাণ্ড সন্স কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছিলেন। পুজোর ছুটিতে বাড়ি এলে তাকে আমরা ঘিরে থাকতাম। বড়দা বয়সে দাদার চেয়ে কুড়ি বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু সেটা আমাদের কারোরই মনে থাকত না। বড়দা ভাল ইংরেজী বলতে পারতেন, থিয়েটার করতে পারতেন। অফিস ক্লাবে থিয়েটার করে তাঁর নাম হয়েছিল। বড়দার কাছেই আমাদের সাহিত্যের প্রথম পাঠ। তিনি আমাদের শরৎচন্দ্র পড়ে শোনাতেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন, তাঁর কাছে আমরা ডসটয়েভস্কির ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট-এর গল্প শুনতাম। বড় বউদির গায়ের রঙ একটু ময়লা ছিল বলে বড়দা তাঁকে ডাকতেন কালো বেদেনী। বড় বউদির রঙ ময়লা হলেও দেখতে খারাপ ছিলেন না। তাঁর গড়ন ভাল ছিল। কোমর অবধি তাঁর চুল পড়ত। বড় বউদির সঙ্গে আমাদের খুব ভাব ছিল। তাঁকে নিয়ে আমরা কড়ি দিয়ে দশ-পঁচিশ খেলতাম।

জ্যাঠতুতো দিদির ভালবাসা ছিল আর-এক রকম। তিনি সরল, সাদাসিধে গোছের মানুষ ছিলেন। দিদি জল-জঙ্গল ভেঙে অন্যের মাচানের শসা চুরি করে এনে আমাদের খাওয়াতেন। আমাদের জামাইবাবু স্বদেশী করে বেশ কিছু কাল

জেল খাটেন। দিদি সে সময় একটানা আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। দিদি আর জামাইবাবুকে নিয়েই দাদার প্রথম গল্প।

বাবার এক মামা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল অবিনাশ চাকলাদার। আমাদের চাকলাদার ঠাকুরদা। ঠাকুরদা বাড়িঘর ছেড়ে ঠাকুরমাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের সংসারভুক্ত হয়েছিলেন। তিনি অনেক রকম কাজ জানতেন। কিন্তু জীবিকার ব্যাপারে তাঁর কোন কাজই কাজে লাগল না। ঠাকুরদা আসার সময় বড় একটা কাঠের বাক্স সঙ্গে এনেছিলেন। তার ভিতর থেকে নানা রকম যন্ত্রপাতি বেরোল। আর বেরোলো আখ্যানমঞ্জরী, দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী জাতীয় কতগুলি পুরনো বই। দাদা সেগুলি চেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এক লাইব্রেরী করল। সে লাইব্রেরী পার্টিশনের আগে পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে টিঁকে ছিল। চাকলাদার ঠাকুরদা খুব রসিক লোক ছিলেন। কথায় কথায় রসিকতা করতে পারতেন। বাবার পাশা খেলার নেশা ছিল। কোর্ট থেকে ফিরে প্রায়ই পাশা নিয়ে বসতেন। খেলার লোকের অভাব হলে বাবা ঠাকুরদাকে পার্টনার করে নিতেন; ঠাকুরদা পাশা খেলায় উৎসাহ পেতেন না। বাবার কাছে কেবলই বকুনি খেতেন। পছন্দমত দান না পড়লে বাবা চটে যেতেন, বলতেন, 'কী ছাই পাঁশ খেলছেন, একটা দানও ভাল ফেলতে পারছেন না।' ঠাকুরদা জবাব দিতেন, 'কি করব মহেন্দ্র। পাশা তো আর আমার বাবার হাড়ে তৈরি নয় যে, যা বলব তাই পড়বে।'

এঁদের নিয়েই আমাদের ছেলেবেলা কেটেছে।

দাদা ১৯৩৩ সালে ফার্স্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি হল। দাদকে কোথায় রেখে পড়ানো যায় তা নিয়ে বাবা একটু চিন্তায় পড়লেন। কলেজ হস্টেলের চার্জ বেশী, তাছাড়া দাদা হোটেল-মেসের রান্না খেতে পারবে কিনা, সে কথাও ভাবছিলেন। আমাদের সময়ে রেসিডেন্সিয়াল টিউশনির রেওয়াজ ছিল। মফঃস্বলের ছাত্ররা অন্যের বাড়িতে থেকে ছেলে পড়িয়ে কলেজে পড়ত। বাবা ফরিদপুর গিয়ে আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় দাদার জন্য রেসিডেন্সিয়াল টিউশনি ঠিক করে দিয়ে এলেন। দাদার টিউশনিতে সুনাম ছিল না। ছাত্ররা তাকে মানত না। তার ফলে দাদাকে ফরিদপুরে অনেক জায়গায় টিউশনি বদল করতে হয়েছে। পরের বাড়ি ছেলে পড়িয়ে থাকার গ্লানি কম ছিল না। একবার এক জজ সাহেবের বাসায় দাদা একটা টিউশনি পেয়েছিল। দাদার পাশ-বালিশ নিয়ে শোয়া অভ্যেস। জজের গিন্নি সেটা পছন্দ করলেন না।

দাদাকে সে টিউশনি ছাড়তে হল। ফরিদপুরের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। দাদার সেবার সেকেণ্ড ইয়ার। আমি বাড়ি থেকে লুকিয়ে ফরিদপুরে মেলা দেখতে গেলাম। ভাবলাম দুটো রাত দাদার কাছেই থাকতে পারব। কিন্তু প্রথম রাত্রেই যে অভ্যর্থনা পেলাম তাতে এক মুহূর্তও আর সে বাসায় থাকার ইচ্ছে রইল না। ভদ্রলোক সকালবেলা দাদাকে ডেকে বললেন, 'মাস্টার এটা কি হোটেলখানা পেয়েছ, যে যাকে খুশী তাকে এনে তুলছ।' দাদা কোন কথা বলল না। দাদা কোন দিনই কারো মুখের ওপর জবাব দিতে পারত না।

ফরিদপুর কলেজেই নারায়ণ গাঙ্গুলির সঙ্গে দাদার আলাপ। নারায়ণ ফরিদপুরে এক বছর আই. এ. পড়েছিল। একবার ছুটিতে আমাদের বাড়িতে একমাস কাটিয়ে এসেছিল। আমি তখন থেকেই নারানদা বলতাম। কলেজে দাদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল নারায়ণ। নারায়ণের সঙ্গে দাদার মেজাজের মিল ছিল। দাদার আরও কয়েকজন বন্ধু না জুটেছিল তা নয়। তাঁদের চালচলন শহুরে। তাঁরা কথাবার্তায় স্মার্ট। সেজন্য অবশ্য দাদার তাদের সঙ্গে মিশতে অসুবিধা হত না। দাদা তাঁদের নিয়ে সাহিত্য চক্র করেছিল। একটা কাগজও বার করেছিল মনে পড়ছে। তাঁরা কেউ কেউ এখনও আমাদের পাইকপাড়ার বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। কিন্তু ফরিদপুর দাদার মনের ওপরে বেশী ছাপ ফেলতে পারে নি। তাঁর লেখায় সদরদি, ভাঙার কথা যতটা এসেছে, সে তুলনায় ফরিদপুরের কথা কিছুই আসে নি।

দাদা বি. এ. পড়ে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে। রেসিডেন্সিয়াল টিউশনির জের তখনও চলছে। আই. এ.-তেও দাদা ফার্স্ট ডিভিসনই পেয়েছিল। কিন্তু গোলমাল হল বি. এ.-র বেলায়। তখন নতুন সাবজেক্ট ইকনমিকস। অনেকে দাদাকে ইকনমিকস নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। ইকনমিকস দাদার ভাল লাগত না। দু দু বার দাদা ইকনমিকসের পরীক্ষা দিতে দিতে উঠে এলো। দেরি হল বি. এ. পাশ করতে। দাদা বি. এ. পাশ করে '৩৯ সালে। দাদার বিয়ে বি. এ. পাশের আগেই '৩৮ সালে। বিয়েতে দাদার গোড়াতে ভীষণ আপত্তি ছিল। প্রেম, পূর্ব প্রণয়ের ব্যাপার কিছু নয়। দাদার সংসারে ঢুকতে ভয় করত। বাবা তাকে বুজিয়ে-সাজিয়ে রাজী করালেন।

'৩৯ সাল আমার আই. এ. পাশের বছর। দাদা তখন ৬৬ নম্বর শোভাবাজার স্ট্রীটের মেসে থাকে। টিউশনি করেই থাকে। তবে রেসিডেন্সিয়াল-এর হাত থেকে ততদিনে মুক্তি পেয়েছে। দাদা আমাকে লিখল, 'মফঃস্বল কলেজে বি. এ. পড়ার কোন মানে হয় না। তুমিও কোলকাতায় চলে এসো, দুজনে একসঙ্গে থাকব।' সেই থেকে আমরা একসঙ্গে ছিলাম।

কলকাতায় প্রথম আসার দিনটি পরিষ্কার মনে আছে। দাদা আমাকে আনতে স্টেশনে গিয়েছিল। দুজনে রিকশা করে আসছিলাম। দাদা চিনিয়ে দিচ্ছিল কোনটা হ্যারিসন রোড, কোনটা কলেজ স্ট্রীট। দাদাকে খুশী খুশী লাগছিল। মেসে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কলকাতা কেমন লাগছে?' বললাম, 'ভাল লাগছে।' কলকাতা দাদার ভাল লাগত। দাদা রহস্য করে বলত, 'বেঁচে থাকতে হলে এক জায়গায় তো থাকতেই হবে। তার জন্যে কলকাতাই সবচেয়ে ভাল জায়গা।'

শোভাবাজারের মেসে দোতলার একটা ঘরে আমরা পাঁচজন থাকতাম। নারানদা এম. এ-তে ভর্তি হয়ে ওই মেসে এসে জুটেছিল। আমরা ছাড়া আরও দুজন বোর্ডার ছিলেন। তাঁরা গেঞ্জীর কলে কাজ করতেন। মাথাপিছু সিট রেন্ট ছিল দু টাকা। মেসে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। আমরা তিন জনে শোভাবাজার বাজারের ওপরকার মহামায়া হোটেলে খেতে যেতাম। সে সময় পাঁচপয়সায় ডবল ডিমের কারি পাওয়া যেত। দু আনায় একজনের একবেলা খাওয়া হয়ে যেত। তবু আমরা হিসেব করে চলতাম।

আমাদের ভরসা তো টিউশনি। দাদা পঁচিশ টাকায় দুটো টিউশনি করত।

এ সময় দাদার একটি দুটি করে গল্প বেরোচ্ছে। একটু একটু করে নাম হচ্ছে। দাদার প্রথম গল্প 'মৃত্যু ও জীবন', পড়ে দেশ-এর দপ্তর থেকে পবিত্র গাঙ্গুলি লিখলেন, 'আপনার গল্প আমাদের ভাল লেগেছে। আপনি আরও গল্প পাঠান।' 'সংসার' গল্প ছেপে রবিবাসরীয় আনন্দবাজারের সম্পাদক মন্মথনাথ সান্যাল মশাইও খুশী হয়ে চিঠি দিলেন। দাদা গল্প লিখত। নারানদাও গল্প লিখত, মেসে কারো চেয়ার টেবিল ছিল না। নারানদা বিছানায় শুয়ে শুয়ে লিখতে পারত। দাদা তা পারত না। দাদা লিখত বিছানার ওপর একটা সুটকেস পেতে। লেখার সময় দাদার অভ্যেস ছিল বিড়বিড় করে নিজের লেখা পড়া। সে অভ্যেসটা দাদার শেষ পর্যন্ত ছিল। তখন গল্প লেখার দক্ষিণা ছিল পাঁচ টাকা, দাদার বা নারানদার লেখার টাকা এলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না। আমরা তিন জনে রূপবাণী রেস্টুরেন্টে দু আনায় ফাউল কাটলেট খেতাম। টকী শো হাউসে তিন আনার সীটে গ্যারি কুপারের ছবি দেখতাম। শোভাবাজারের মেসে দাদার বন্ধুরা আসত, নারানদার বন্ধুরা আসত। সাহিত্যের আসর সরগরম হয়ে উঠত। আপ্যায়নের জন্য একতলার শ্যামসুন্দর কেবিন-এর এক পয়সা কাপ চা ছিল।

আমাদের খেলাধুলোর বাতিক ছিল না। বিকেলবেলা দু ভাই গিয়ে আহিরিটোলার পার্কে বসতাম। কোন কোনদিন হাঁটতে হাঁটতে বিডন স্কোয়ারে

চলে যেতাম। তুজনে পার্কে গিয়ে বসতে পারলে আমাদের আর কারো দরকার হত না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারতাম। দাদার পার্ক সম্পর্কে আগা-গোড়াই একটা দুর্বলতা ছিল। আমাদের পাইকপাড়ায় বাড়ির কাছেই টালা পার্ক। এ বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময় দাদা বলেছিল, কাছেই এতবড় একটা পার্ক। এর জন্যই আমাদের দশটাকা বেশী বাড়িভাড়া দেওয়া উচিত। দাদা পার্কে বসে গল্প নিয়ে আলোচনা করত। গল্প লেখার ব্যাপারে তার কোন মন্ত্রগুপ্তি ছিল না। সে গল্প নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করত। কাকে নিয়ে কোন গল্প লিখতে চায় তা বলত। কোথাও আটকে গেলে বলত, 'দেখতো তোর মাথায় কিছু আসে কিনা, কোন সাজেস্‌শন দিতে পারিস কিনা।'

'৩৯ সালেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল। সেই সুযোগে চেনা জানা অনেকেই চাকরি পেয়ে গেল, বেকার আর বড় একটা কেউ থাকল না। দাদাও একটা চাকরি পেল, অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে। বালতি টেপার চাকরি। সৈন্যরা যে সব জিনিস ব্যবহার করত দাদাদের তা চেক করে দিতে হত। আমি মনে মনে হাসলাম। দাদার এ চাকরি ভালই হয়েছে। যার কোন জিনিস সম্পর্কেই জ্ঞান নেই তার ওপর ভার পড়ল জিনিস বেছে দেবার। দাদার বস্তুজ্ঞান কম থাকলেও সাধারণ মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ কম ছিল না। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী থেকে দাদা কিছু ভাল গল্প ধরে আনল। দাদার দ্বিতীয় চাকরি যুদ্ধের অফিসেরই পারচেজ ডিপার্টমেন্টে। সেটা অবশ্য ক্লারিক্যাল চাকরি। কিন্তু দাদার ভাগ্যে সে চাকরি বেশী দিন টিঁকল না। কলকাতায় বোমা পড়ল। আমরা দেশে পালিয়ে গেলাম। বাবা আর দাদাকে ফিরতে দিলেন না। বললেন, 'তোমাকে আর বোমা মাথায় করে চাকরি করতে হবে না।'

কলকাতায় আমাদের প্রথম বাসা ১৯৪৩ সালে। দেশের বাড়ির সংসারে তখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

'৪২ সালে বাবা মারা গিয়েছেন। বড়দা জ্যাঠাইমা আর বড় বউদিকে নিয়ে অনেক আগেই পৃথক হয়েছেন। কিন্তু মণিকাকার সেই ছোট সংসার চালাতেও কষ্ট হত। দেশ থেকে বউদিকে নিয়ে এলাম। বাসা করলাম নিমতলার কাছে ৪ নম্বর রামশেঠ রোডের বাড়িতে। রাস্তার ধারে পঁচিশ টাকায় তুখানা ঘর পেলাম। তার মধ্যে আমাদের আরও ছোট সংসার। দাদা বউদি, দাদার ছোট ছোট তুই ছেলে দিবু, ডন আর আমি। দাদা তখন ক্যালকাটা ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে একটা চাকরি পেয়েছে। রাত্রে 'প্রত্যহ' নামে একটা ছোট কাগজেও দাদার পার্ট টাইম চাকরি ছিল। আমারও যুদ্ধের অফিসে রুটিন ক্লার্কের

একটা চাকরি জুটেছে। কিন্তু যুদ্ধের সময় তাতেও টানাটানি যেত না। ছোট সংসারের জন্য ভাবতে হত। সংসারের ভাবনা দাদা ভাবত না, উল্টে তার জন্যই আমরা ভাবতাম। 'প্রত্যহ' অফিস থেকে দাদার ফিরতে রাত হয়ে যেত, আমরা উৎকণ্ঠায় থাকতাম। হাঁটার সময় দাদার জুতোয় একটা ঘষটানো শব্দ উঠত, আমরা বুঝতে পারতাম দাদা আসছে।

ব্যাঙ্ক থেকে দাদাকে হঠাৎ জব্বলপুরে বদলি করল। এক একটা ঘটনা বহুকাল পরেও কী রকম স্পষ্ট মনে থেকে যায়। দাদাকে স্টেশনে তুলে দিতে গেলাম। দাদা তখন দোটানায় পড়েছে। একদিকে দূরে যাওয়ার আনন্দ, আর একদিকে আমাদের ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ। দাদা বলল, 'ভাবিস না। অসুখ-বিসুখ হলে চিঠি দেব। যেখানেই থাকি তুই আমাকে কাঁধে করে নিয়ে আসতে পারবি জানি।' রামশেঠ রোডের বাসা তুলে দেওয়ার পর আমাদের আবার সেই আগের অবস্থা। থাকার ঠিক নেই, খাওয়ার ঠিক নেই। কিছুদিন নিমতলার কাঠগুদামে কাঠের ঘরে গিয়ে থাকলাম, খাওয়া সেই পাইস্ হোটেলে। কলকাতায় আমাদের আত্মীয়স্বজন কম, মাঝে-সাঝে নিমন্ত্রণ যা একটু পেতাম দাদার শ্বশুরবাড়িতে। ওঁরা বাগবাজারে থাকতেন। নিবেদিতা লেনে দাদার মামাশ্বশুর-মেসোশ্বশুরের বাসা ছিল। আমরা সে বাসায়ও যেতাম। দুই পরিবার একসঙ্গে; বাড়িতে অনেক লোকজন। দাদার 'চেনামহলে' তাঁদেরই আদল এসেছে।

'৪৬ সালের দাঙ্গার সময় আমরা ছিলাম ৭/১ ব্রজদুলাল স্ট্রীট। একতলায় ছোট একখানা ঘর পেলাম। দাদা অফিস থেকে একজন বেয়ারা নিয়ে এলো। তার নাম ছিল গোবিন্দ। আমাদের আর পাইস্ হোটেলে ছুটতে হত না। গোবিন্দকে দিয়ে বাসাতেই রান্নার ব্যবস্থা করলাম। সে ঘরেও স্বস্তি ছিল না। বর্ষার সময় জলে ভেসে যেত। দাদা তার মধ্যে বসেই লিখত। সেই বাড়িতে থেকেই দাদা 'রস' গল্প লিখেছিল।

'৪৭ সালে আমরা এক বিপদে পড়লাম। তেমন বিপদে আমরা কোনদিন পড়িনি। ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে তখন দাদার চেক পাস করার ডিউটি ছিল। জাল চেক পাস করার দায়ে ওঁরা দাদার বিরুদ্ধে মামলা আনলেন। দাদার সবে দুটো গল্পের বই, একটা উপন্যাস বেরিয়েছে। একটু নাম হয়েছে। সে মামলায় তারাশঙ্করবাবু, সজনীবাবু আমাদের জন্য ছোটাছুটি করেছিলেন। বাগবাজারের ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য জামিন হয়েছিলেন। মামলা নিচের কোর্টে থাকল না, সেসন্স্ পর্যন্ত গড়াল। মামলা করতে হলে টাকার দরকার। আমাদের টাকার জোর কোথায়। রাত্রে দুশ্চিন্তায় ঘুম হত না। বছর খানেক পরে মামলা থেকে

আমরা রেহাই পেলাম। জুরিরা একমত হয়ে বললেন, দাদা নির্দোষ। হাইকোর্টের জজ মিস্টার ব্ল্যাঙ্কের মন্তব্যটুকু বেশ মনে আছে। ব্ল্যাঙ্ক বলেছিলেন, 'সাহিত্যিক মানুষ, সে অন্য জগতে বিচরণ করে। তার তো ভুল হতেই পারে। কিন্তু বড় ভুল হয়েছে ব্যাঙ্কের, এমন মানুষকে তাঁরা ও রকম কাজ দিলেন কেন।' মামলা মিটে যাওয়ার পরে দাদা আইনত ফের ব্যাঙ্কের চাকরি করতে পারত। কিন্তু তা আর করল না। জয়েন করে রেজিগ্‌নেশন দিয়ে দিল।

পার্টিশনের পরে মণিকাকা দেশ থেকে লিখলেন, বউমাদের আর এখানে রাখা ঠিক হবে না। ওদের কলকাতায় নিয়ে যাও। তখন আমারও সংসার হয়েছে। মেয়ে হয়েছে একটি। আমরা বাসার খোঁজে বেরোলাম। বাসা পাওয়া গেল নারকেলডাঙা মেন রোডে। এবারের বরাদ্দ দেড়খানা ঘর। দেশে গিয়ে সবাইকে নিয়ে এলাম। আমরা সবাই মিলে বড় ঘরটায় থাকতাম, দাদা বউদি থাকত ছোট ঘরটায়। ঘরটা একেবারেই ছোট। পুরো মাপের তক্তপোশ ধরে না। একটা ছোট তক্তপোশ করতে হল। দাদা বউদি দুজনেই মাথায় খাটো বলে কোনরকমে তাতে শুতে পারত। তক্তপোশের সঙ্গে মিলিয়ে দাদার ছোট টেবিলটা ছিল। দাদা তার ওপর লিখত। চেয়ার পাতার জাগয়া হত না। দিবু, ডন একটু বড় হয়েছে। ওদের নারকেলডাঙা জর্জ হাইস্কুলে ভর্তি করে দিলাম। আমি গ্রে স্ট্রীটে একটা তেলকলে চাকরি করি। দাদা নতুন কাগজ 'কৃষক'-এ চাকরি পেল। কয়েকমাস পরে ফের চাকরি বদল করতে হল। এবার আরও নতুন কাগজ 'স্বরাজ'-এ। স্বরাজ অফিস থেকে ঠিক মত মাইনে পাওয়া যেত না। দাদা লেখা থেকে কিছু কিছু পেত। আমাদের টানাটানি যেতে চায় না। নারকেলডাঙার বাসায় দোতলায় বাড়িওলা ছিলেন। একতলায় আরও একঘর ভাড়াটে ছিল, ওঁদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়াঝাঁটি হত না, আমরা মিলে মিশে ছিলাম। কিন্তু আমাদের জায়গায় কুলোয় না, আমরা বাসার খোঁজ ছাড়লাম না।

এবার এলাম লিনটন স্ট্রীটের একটা বস্তি বাড়িতে। টালির ঘর, তবে জায়গাটা একটু বেশী পাওয়া গেল। তিনখানা ঘর নিয়ে আমরা থাকতাম। বাকি দুখানা ঘরে দুঘর ভাড়াটে থাকত। দাদা এতদিনে চেয়ার টেবিলে বসে লেখার সুবিধা পেল। লিনটন স্ট্রীটের বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। আবু সৈয়দ আইয়ুব দাদাকে একটা টেবিল ল্যাম্প প্রেজেন্ট করেছিলেন। ল্যাম্পটার সুন্দর আলো হত। লিনটন স্ট্রীটে এসে দাদা 'সত্যযুগ' কাগজে চাকরি পেয়েছিল। এই বাড়িতেই নিউ থিয়েটার্স-এর সঙ্গে দাদার 'সংশয়' গল্পের কন্ট্রাক্ট হয়। দাদা ঠাট্টা করে বলত, 'বলা যায় না, নিউ থিয়েটার্স-এর হাতিই একদিন দু ভাইকে পিঠে

করে তুলে নিয়ে যেতে পারে।' কিন্তু 'সংশয়' সম্বন্ধে নিউ থিয়েটার্স-এর সংশয় আর গেল না। তার বদলে তাঁরা 'গোধূলি'র ছবি তুললেন।

নারকেলডাঙার বাড়িতে যে ঝামেলা ছিল না, লিনটন স্ট্রীটের বাড়িতে আমরা সেই ঝামেলায় পড়লাম। ভাড়াটেদের সঙ্গে ঝগড়া লাগল। জল নিয়ে ঝগড়া, চালচলন নিয়ে ঝগড়া। একটা ঘরে দুই বোন থাকতেন। তাঁদের কোন গার্জিয়ান ছিল না। বড়টি গ্রাজুয়েট। তাঁর চালচালনে আমাদের আপত্তি ছিল। তিনিই বেশী শত্রুতা করতেন। ঝগড়া-ঝাঁটিতে দাদার লেখার ক্ষতি হত। দাদা বিরক্ত হত। কিন্তু চেঁচামেচির মধ্যে যেত না। কিছুদিন পরে দাদা একটা বই লিখল, 'দেহ মন'। আমরা দেখলাম যার সঙ্গে আমাদের এত শত্রুতা, যার সঙ্গে এত ঝগড়া 'দেহ মন'-এর তিনিই নায়িকা।

ঝগড়া-ঝাঁটি করেই আমরা লিনটন স্ট্রীট ছেড়ে এলাম। '৫১ সাল থেকে দাদার 'আনন্দবাজারে' চাকরি। '৫৩ সাল থেকে আমরা পাইকপাড়ার বাড়িতে আছি। আমরা রাজা মণীন্দ্র রোডের বাসিন্দা। এ বাড়িতে আমাদের অনেকগুলি বছর কেটে গেল। দিবু, ভন—এখন দিবাকর, অভিজিৎ। একজন এঞ্জিনিয়ার, একজন প্রফেসর। ওদেরও ছেলে মেয়ে হয়েছে। এই বাড়িতেই আমার বিয়ে হল, ছেলে বড় হল।

পাইকপাড়ায় আসার পর থেকেই দাদার বাড়ি করার ঝোঁক হয়েছিল। দাদা বলত, 'মাথা গোঁজার একটু জায়গা করা দরকার।' কিন্তু আমাদের মত লোকের বাড়ি করতে হলে অনেক জায়গায় মাথা নিচু করতে হয়। দাদা তা করেছিল। পাবলিশারদের কাছে ধার দেনা করে দাদা বড় রাস্তার ওপরে আড়াই কাঠা জায়গা কিনল। সেই জায়গা বদলেই এই একতলা ভাড়াটে বাড়ি কিনে আমরা দোতলা করলাম। দোতলা করতে পেরে দাদার খুব আনন্দ হয়েছিল। দাদা বলত, 'শোভাবাজারের মেসের পর এই আমরা প্রথম দোতলায় উঠতে পারলাম।' দাদা মারা যাওয়ার অল্প কিছুদিন আগে বাড়ির তিনতলার কাঠামো উঠল। তিনতলা করায় আমার মত ছিল না। আমি বলতাম, 'তিনতলা করে কী হবে, তুমি কি বাড়ি ভাড়া দেবে না কি ?' দাদা বলত, 'সহজে কি আর ভাড়া দেব। তবে রিটায়ার করার পর কি অবস্থায় পড়ব কে জানে। একটু সম্বল থাকে তো মন্দ কি।'

বাড়ির কাছে পার্ক থাকা সত্ত্বেও ইদানীং আর দুজনের পার্কে গিয়ে বসা হত না। দাদা লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আমার বাজার করা ছিল, দুটি চাকরি,

সংসারের নানান ঝামেলা। তবু দাদা মাঝে মাঝে কাছে ডেকে বসাত। বসবার ঘরে সোফার ওপর দুজনে কাছাকাছি বসতাম। দাদা নানা রকম কথা তুলত। ধর্মের কথা উঠত। দাদা বলত, 'ধর্ম-টর্ম আমি মানি না। তবে কেউ যদি পুজো-আর্চা করে আনন্দ পায় তাকে আমার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে ইচ্ছে করে না। একটা অবলম্বন পাওয়া নিয়ে কথা। কিছু একটা আশ্রয় করতে পারলে বাঁচাটা বোধ হয় সহজ হয়। আমাদের তো মনের সংশয়ই গেল না। বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে ওসব বিশ্বাস করতে পারি না। আবার মৃত্যুর পরে কী, তা যতক্ষণ জানা না যাচ্ছে ততক্ষণ সব কিছু উড়িয়ে দিই কী করে?'

কোন কোনদিন লেখার কথা বলত, 'গল্প তো অনেক লিখলাম। এখন ইচ্ছে করে অনেক দিন ধরে বড় একটা বই লিখি। 'সূর্যসাক্ষী'র পরে দশ বছরের মধ্যে আমার আর কোন বড় বই বেরোয় নি। থিমের অভাব নেই। তবে সাস্টেইনড লেবার করা দরকার। লেখা দরকার। লিখব কি, আজকাল লেখার স্পীড একেবারেই কমে গেছে। ঘন্টায় দু পাতার বেশী লিখতে পারি না।' একটুকাল চুপ করে থেকে বলত, 'না লিখেও তো উপায় নেই। তাস-পাশা খেলি না, অন্য কোন নেশা নেই। লেখা নিয়েই থাকতে হবে। যতক্ষণ লিখি ততক্ষণ যে খারাপ থাকি তা নয়। আজকাল লিখতে কষ্ট হয় ঠিকই। কিন্তু একটা ভাল লাইন লিখতে পারলে ভাল লাগে। এখনও আনন্দ হয়। লেখার বোধ হয় ওইটুকুই পুরস্কার।'

এক একদিন দাদাকে খুব অন্যমনস্ক দেখতাম। দাদা বলত, 'ছেলেরা বড় হয়েছে, নাতি-নাতনি হল, আবার কি, এখন একদিন চলে গেলেই হয়।'—জানতাম ওটা দাদার মনের কথা নয়।

বছর দুই ধরে দাদাকে ছেলেবেলার লাইব্রেরীর নেশায় পেয়ে বসেছিল। আমাদের পাড়ার সুহৃদ-সঙ্ঘ লাইব্রেরীর জন্য দাদা খুব খাটত। দাদাই ছিল লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট, কিন্তু আমাদের লুকিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা আদায় করত। সকালবেলা একবার লাইব্রেরীতে না গেলেই দাদার চলত না। বাড়ির সবাই বিরক্ত হত। আমিও বকতাম, বলতাম, 'কর্মকাণ্ড তোমার জন্য নয়। তুমি ও-সবের মধ্যে যাও কেন?' দাদা অপরাধীর মত চুপ করে থাকত। তারপর কৈফিয়ত দেওয়ার মত করে বলত, 'আমি কি আর সব করি, যা করবার ওরাই করে। আমি শুধু দেখেটেখে দিই। লাইব্রেরীটাকে যদি দাঁড় করান যায় মন্দ কি। দু বছর পরে রিটায়ার করব। তখন একটা বসবার জায়গা তো চাই।'

দাদাকে আর রিটায়ার করার দুঃখ পেতে হল না।

আমি অফিসে যাওয়ার পথে আমাদের তিনতলার কাঠামোর দিকে তাকাই। দাদারই একটা কথা মনে পড়ে। চেনা জানা কেউ হঠাৎ মারা গেলে দাদা বলত, 'জীবন এই রকম। চলতে চলতে হঠাৎ কখন থেমে যায়। সব কিছু অসমাপ্ত পড়ে থাকে।' সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কথা মনে হয়। বহুদিন আগে দেশের সাহিত্য সংখ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখতে গিয়ে দাদা লিখেছিল, 'মৃত্যু সব কেড়ে নেয়, কিন্তু স্মৃতি সব ফিরে দেয় না।' কথাটা হয়ত ঠিক। কিন্তু যেটুকু ফিরে দেয়, তার ভারই কি কম। দুঃখ তারও কম নয়।

—ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র